প্রথম ভাগ। ২

৺বামদেব দত্ত ও

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি

সম্পাদিত।

Calcutta

PROGRESSIVE LITERATURE PUBLISHING Co.,

127, MUSJID BARI STREET, AND

14/3 OLIVE ROW.

1891.

মূল্য ২, টাকা মাত্র।]

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

সাহিত্য সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড। বৈশাখ ১২৯৭। প্রথম সংখ্যা।

প্রতিমা।

আমরা প্রতিমাপূজক প্রতিমাসেবক বাঙ্গালী। এই প্রতিমাপূজার জন্যই দেশ বিদেশে আমাদের কলঙ্ক রটিয়াছে যে আমরা পৌত্তলিক। সে কলঙ্কের ভার আমরা মাথায় করিয়া বহিতে প্রস্তুত আছি। চিরকাল বহিয়া সহিয়া আসিতেছি। এখনও বহিব, এখনও সহিব। আর আশীর্ব্বাদ করিতেছি আমাদের বংশপরম্পরা অনন্ত কাল এই কলঙ্ককীর্ত্তি যেন বুকে করিয়া রাখিয়া দেয়।

কলঙ্ক বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে বটে, প্রতিমা কিন্তু মানবমাত্রেরই আছে। প্রতিমা আমাদের প্রাণে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত, প্রতিমাই আমাদের ইহ জীবনের অবলম্বন। যিনি মৃৎপাষাণে, রজতকাঞ্চনে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার চরণে ফুলচন্দন দিয়া প্রণাম করেন, তাঁহারও যেমন প্রতিমা আছে; তেমনি যিনি যোগবলে পরমাত্ম-তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাইয়া বিশ্বরূপের বিরাট-

ছবি হৃদয়মধ্যে ধারণা করিয়া সদানন্দ সম্ভোগ করেন, তাঁহারও তেমনি প্রতিমা আছে। যিনি বলেন ভগবানের শক্তি অসীম, মূর্ত্তি অনন্ত; তিনি কখনও কোমল কখনও কঠিন, কখনও ললিত কখনও ভীষণ, কখনও রৌদ্র কখনও শান্ত, তাঁহার কথাও যেমন সত্য;—তেমনি যিনি বলেন সেই পরম পুরুষের রূপ নাই গুণ নাই, ক্রিয়া নাই চেষ্টা নাই, তিনি জ্ঞানাতীত ধ্যানাতীত, তিনি "অবাঙ্‌মনসগোচর"—তাঁহার কথাও তেমনি সত্য। কিন্তু এই নিরাকার নির্গুণবাদীগণেরই সেই—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

মানুষের প্রাণ স্বভাবতই বড় প্রতিমাপ্রিয়। মানুষ এই দেহপ্রতিমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, প্রাণের ভিতর একটা প্রতিমাকে অবলম্বন করিবার জন্য মানুষ বড় লালায়িত। নিরাকার ভাবিতে যিনি ভাল বাসেন, তিনিও বলেন আমার দেবতা জ্যোতির্ম্ময়। তিনি জানেন না যে জ্যোতিও একটা রূপের ছটা। কিন্তু সে কথা যাক্। যিনি উপাসক, প্রতিমা নহিলে তাঁহার চলে না। নিরাকারের উপাসনা হইতে পারে না। উপাসনার সামগ্রী সাকার হওয়া চাই। চিত্ত নিরাকারকে ধারণা করিতে পারে না। যাহা অতীন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা অবলম্বন করা যায় না। এই জন্যই প্রতিমার প্রয়োজন।

প্রয়োজন বুঝিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ কর। তুমি সাধক, যে ভাবের প্রতিমা লইয়া তোমার সাধ পূর্ণ হয়, তাহারই সাধনা করিয়া সিদ্ধকাম হইতে পার। তিনি নিজেই আদেশ করিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

তুমি করুণাময়ী স্নেহময়ী জননী বলিয়া তাঁহাকে চাও, মাতৃরূপেই তিনি তোমার চক্ষে বিরাজমানা। পিতা বল সখা বল, পতি বল পুত্র বল, বিশ্বরূপের সকল রূপের প্রতিমা তোমার হিতার্থ প্রতিষ্ঠিত আছে।

সাধকের রুচিভেদে, প্রকৃতিভেদে ভগবানের প্রতিমা অনন্ত। যিনি নিজে অনাদিমধ্যান্ত, তাঁহার প্রতিমা অনন্ত না হইবে কেন? রামপ্রসাদ শাক্ত। রামপ্রসাদের প্রতিমা—

নবনীলনীরদরুচি কে?
ঐ মনোমোহিনী রে!

জয়দেব বৈষ্ণব। জয়দেবের প্রতিমা—

চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবর পীতবসনবনমালী।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডল মণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী॥

শঙ্কর শৈব। শঙ্কর আপনার প্রতিমার পায়ে প্রণাম করিয়াছেন—

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং।
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিং॥
বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং।
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করং॥

যিনি সৌর, তাঁহার ঐ "জবাকুসুমসঙ্কাশ" জ্বলন্ত প্রতিমার দিকে চাহিয়া তিনি বলেন—

সর্ব্বদেবাত্মকো হ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ।
এষ দেবাসুরগণান্ লোকান্ পাতি গভস্তিভিঃ॥

সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্র রাবণবধার্থ স্বয়ং এই সৌরস্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। যিনি গণপতিসেবক, তাঁহার প্রতিমাকে তিনি বন্দনা করেন।—

খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং।
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলং॥
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং।
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদং॥

স্থূলতঃ এই পঞ্চবিধ উপাসকের পঞ্চ-প্রতিমা প্রদর্শিত হইল। কিন্তু উপরে বলিয়াছি ত, প্রতিমার সংখ্যা নাই, প্রতিমার অন্ত নাই। বিশ্বরূপের রূপরাশির সীমা নির্দ্দেশ কে করিতে পারে? প্রকৃতিভেদে, এক এক জনের এক একটি প্রতিমার প্রয়োজন হইলেও প্রতিমার অভাব নাই। তেত্রিশ কোটি যাঁহাদের কল্পনা, প্রতিমার মহিমা তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন।

প্রতিমা সকলেরই আছে। প্রতিমা কেবল উপাসকের নয়. প্রতিমা সকলেরই আছে। যিনি যোগী, যিনি তপস্বী, তাঁহারও প্রতিমা আছে। তাঁহার প্রতিমাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার প্রতিমাই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন, সর্ব্বার্থপূর্ণ। অন্যে বিশ্বরূপের এক একটা অবয়ব লইয়া, এক একটা উপাদান বা বিভূতি লইয়া এক একটি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু যিনি যোগী, তাঁহার হৃদয় উদার, তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত। তিনি তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে বিশ্বরূপের বিরাটমূর্ত্তি ধারণা করিয়া দেখিতেছেন,—চরাচর জগৎ তাঁহারই রূপে পরিব্যাপ্ত, জগতের যা কিছু সকলই তাঁহার রূপের নিশান, তা ছাড়া আর কিছুই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই। পরম যোগী ধ্রুব এই বিরাটরূপের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন;—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
ভূতাদিরাদি প্রকৃতির্যস্য রূপং নতোঽস্মি তম্॥
সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মোঽখিলব্যাপী প্রধানাৎ পরতঃ পুমান্।
যস্য রূপং নমস্তস্মৈ পুরুষায় গুণাশিনে॥

"ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চভূত, মন বুদ্ধি ও আদি প্রকৃতি যাঁহার রূপ; যাঁহার রূপ অতি সূক্ষ্ম অথচ বিশ্বব্যাপী; যিনি শুদ্ধ, পরাৎপর, যিনি গুণ-সাক্ষী, সেই পরম পুরুষকে প্রণাম করি।"

যোগীগণের যাহা চিন্তনীয়, যাহা বিকার-শূন্য, যাহা বৃহৎ, যাহা বিরাট, তাহাই ত পরব্রহ্মের পরম প্রতিমা। ধ্রুব তাই বলিয়াছেন;—

বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।
তস্মৈ নমস্তে সর্ব্বাত্মন্ যোগিচিন্ত্যাবিকারবৎ॥

ধ্রুব প্রহ্লাদের এই আদরের প্রতিমা কয়জনের ভাগ্যে দেখিতে পাওয়া যায়?

কিন্তু প্রতিমা কেবল সাধক উপাসক, কেবল যোগী তপস্বীর আছে; আর কাহারও নাই কি? সে কথা কে বলিল? প্রতিমা সকলেরই আছে, প্রতিমা সর্ব্বত্রই আছে। কবি বল ভক্ত বল, গায়ক বল প্রেমিক বল, সকলেরই প্রতিমা আছে, সকলেই প্রতিমার উপাসক। কবির কল্পনা প্রতিমার পায়ে মস্তক লুটাইয়া দেয়, ভক্তের হৃদয় প্রতিমার জন্য অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষ খুলিয়া দেয়। গায়ক প্রতিমার ধ্যান করিয়াই সময়োচিত স্বরতরঙ্গের সৃষ্টি করেন; আর যিনি প্রেমিক, তিনি প্রণয়ের প্রতিমাখানি কত সন্তর্পণে অন্তরে বাহিরে পূজা করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

কবি প্রকৃতির উপাসক, প্রকৃতির কিঙ্কর; তিনি প্রকৃতির প্রেমিক। প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গেই কত রাশি রাশি প্রতিমা তাঁহার চক্ষে ঝলমল করিতেছে। এই গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডিতা

বন-পর্ব্বত-সরিৎ-সরোবর-শোভিতা, সাগরাম্বরা ধরণীর অঙ্গে অঙ্গে ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে কবি প্রতিমার উজ্জ্বলকান্তি নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে আমরা যেখানে দেখি কেবল শূন্য আর সলিলরাশি; কবি সেখানে সূক্ষ্মদৃষ্টিবলে অম্বর-বারিধির অনন্তনীলিমায় উন্মত্ত হইয়া, কত প্রতিমার চিত্র অঙ্কিত করিয়া, আমাদের নয়নসমক্ষে প্রতিবিম্বিত করেন। দূরপ্রান্তে সমুদ্রের তটভূমি তুমি আমি দেখি বটে; কিন্তু কবির চক্ষে দেখ, দেখিতে পাইবে;—

> দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
> তমালতালীবনরাজিনীলা।
> আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
> র্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

এই জগৎকার্য্য আমরা দেখি, কবিও দেখেন। কিন্তু আমরা যাহা দেখি না, তিনি তাহা দেখিতে পান। তিনি দেখিতে পান—

> ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে জগত গাইছে।

যিনি ভক্ত, প্রতিমাই তাঁহার সর্ব্বস্ব, প্রতিমাই তাঁহার অবলম্বন। ভক্তির একটা জীবন্ত পাত্র থাকা চাই। যাহা ভক্তি, তাহাই ত কবিতা। ভক্তি ও কবিতায় প্রভেদ কি আছে, তাহা আমি বুঝি না। যাঁহার ভক্তি নাই, কবিতা আছে; তিনি কথার কবি হইলে হইতে পারেন। প্রাণের কবি তিনি কদাচ নহেন। ভক্তি অনেক রকমের আছে। দেবভক্তিও ভক্তি, আর দেশভক্তিও ভক্তি। যিনি দেশভক্ত, তিনিই দেশের কবি। তাই বঙ্গের প্রধান ভক্ত, বঙ্গের প্রধান কবি। বঙ্গের সেই প্রধান ভক্ত, বঙ্গের সেই প্রধান কবি,—ভক্তিকবিতায় মাখামাখি করিয়া, দেবভাভক্তির সুধারসে সিঞ্চিত করিয়া, সমগ্র দেশখানাকে দুর্গোৎসবের প্রতিমা সাজাইয়া আনন্দগদ্গদভাবে গাইয়াছেন;—

> বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
> তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

যিনি গায়ক, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহার প্রতিমা আছে কিনা। তিনি রাগ রাগিণীর উপাসনা করেন, শ্রোতার হৃদয়ে করুণ শান্ত, বীর শৃঙ্গার প্রভৃতি কত রসের তরঙ্গ ছুটাইয়া দেন; তিনি নিজে কি কোন রসের ভাবুক নহেন? কোন ভাবের প্রতিমা কি তাঁহার প্রাণের ভিতর প্রতিষ্ঠিত হয় না? তাহা না হইলে চলিবে কেন? সুরই তাঁহার সহায়। সুরের সাহায্যেই তিনি রাগোদ্দীপন করেন। সুর ব্রহ্ম। সুতরাং সুর নিরাকার বটে, আবার সুর সাকারও বটে! এই জন্যই রাগ রাগিণীর এক একটা মূর্ত্তি আছে। ঐ শুন গায়ক কিসের আলাপ করিতেছেন? তিনি বসন্তের ঐ নবমল্লিকা, বসন্তের ঐ চুতমুকুলগন্ধে অন্ধ হইয়া, বসন্তানিলচুম্বিত-প্রফুল্ল-প্রাণে বসন্ত রাগের তান ছাড়িয়াছেন। দেখিতে দেখিতে দেখ রাগ মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিল। সে মূর্ত্তি কি মনোহর! সে প্রতিমা কি সুন্দর! রাগ মূর্ত্তিমান হইলে সে প্রতিমার আকার আপনা আপনি তোমার মানসনেত্রে প্রতিফলিত হইবে। মানসনেত্রে তুমি দেখিবে—

> চুতাঙ্কুরৈনৈব কৃতাবতংসো
> বিঘূর্ণমানারুণপদ্মনেত্রঃ।
> পীতাম্বরঃ কাঞ্চনচারুদেহো
> বসন্তরাগো যুবতীপ্রিয়শ্চ॥

কাঞ্চনকান্তি পীতাম্বরে রঞ্জিত করিয়া, শ্রুতিমূলে চুতমুকুলের অলঙ্কার পরিয়া, আর-

তিম চলু চুলু পল্লনেত্রে সাক্ষাৎ ঋতুরাজ আসিয়া যেন যুবতীজনের মনোহরণ করিতেছেন। এই রূপে গায়ক আলেয়ার আলাপ করিলে দেখিবে, যেন রোরুদ্যমানা রমণী আলু থালু বেশে বসিয়া নয়নজলে ধরাতল সিক্ত করিতেছেন। ইহাই রাগ রাগিণীর মূর্ত্তিরহস্য, ইহারই নাম গায়কের প্রতিমা।

দেখা গেল, প্রতিমা তবে সকলেরই আছে। প্রতিমা বাহিরে থাকুক বা না থাকুক, প্রতিমা গঠিত হউক বা না হউক, অন্তরে অন্তরে একটা না একটা প্রতিমা সকলেরই মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা আছে। বাঙ্গালীর অপরাধ এই যে বাঙ্গালী অন্তরের সেই প্রতিমা এক একবার বাহিরে গঠন করিয়া পূজা করে; আর আত্মীয় স্বজন, স্ত্রীলোক বালক সকলকে ডাকিয়া বলে—"এস এই প্রতিমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দাও।" বাঙ্গালী প্রতিমা গড়ে আবার ভাসায়, আবার গড়ে, আবার বিসর্জ্জন করে। মাটীর প্রতিমা বাঙ্গালী জলে ভাসায়, অন্তরের প্রতিমা অন্তরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইহাই বাঙ্গালীর কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আমরা মুছিতে চাহি না। এই কলঙ্কই আমাদের মাথার মণি।

প্রতিমা সকলেরই দেখিলাম। কিন্তু তোমার আমার প্রতিমা নাই কি? তুমি আমি কবি নয় ভক্ত নয়, গায়ক নয় সাধক নয়, জ্ঞানী নয় তপস্বী নয়,—তোমার আমার তবে প্রতিমা নাই কি? আমরা সামান্য জড়জীব, সংসার-মায়ায় মুগ্ধ, সাধনার পথে দৃষ্টিহীন, আমাদের তবে প্রতিমা নাই কি? কি লইয়া আমরা বাঁচিয়া আছি? এই বাত্যাবিক্ষুব্ধ, সংসারসমুদ্রে আমাদের কি একটা অবলম্বন নাই? নহিলে, কিসের ভরসায় এ ভবসমুদ্রে সন্তরণ করিতেছি? আছে বৈ কি। আমার মত সংসারপ্রেমিকেরও প্রতিমা আছে। সে প্রতিমা কি, সে প্রতিমা কোথায়? জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিতে পারি—

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীঃ—।

সেই সংসারলক্ষ্মীই সংসার-প্রেমিকের জীবন্ত প্রতিমা। সেই প্রতিমার মুখচ্ছটায় আমি কত রঙ্গের তরঙ্গ দেখি, কত ভাবের প্রবাহ পাই। সে মুখের হাসি কান্না, সে মুখের রাগ মান, সে মুখের লজ্জা সোহাগ; সকলই শোভার আধার, সকলই সৌন্দর্য্যের নিদর্শন। সে মুখে হাসি ফুটিলে আমি চাঁদের সুধা পান করি। সে মুখে কান্না ঝরিলে আমি গোমুখীনিঃসৃত পবিত্র নির্ঝর-ধারা মনে করিয়া মাথা পাতিয়া দিই। রাগ-রক্ত হইলে আমি সে মুখে অরুণোদয়ের স্বর্ণকান্তি নিরীক্ষণ করি। মানের তরঙ্গ ছুটিলে আমি আর সে মুখের দিকে চাহিতে পারি না। মাথা হেঁট করিয়া, রাঙ্গাচরণে লুব্ধ দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া, রাধানাথের সাধা গতে কৃতাঞ্জলিপুটে বলি—

———দেহি পদপল্লবমুদারং।

লজ্জা সে মুখে নন্দনের মন্দারমাধুরী ফুটাইয়া দেয়, সোহাগ সে মুখে কালিদাসের কাব্যচ্ছটা ছুটাইয়া দেয়। ভবসাগরের এই তরঙ্গতুফানে ইহাই আমার ভরসা, আমার জীবনের এই ভগ্নমন্দিরে ইহাই আমার জীবন্ত প্রতিমা। তোমরা হাসিতে হয় হাস। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমার ক্ষুদ্র

প্রতিমা দেখিয়া তোমরা আমায় লজ্জা দিতে হয়, ত দাও। কিন্তু মনে থাকে যেন যে, এই জীবন্ত প্রতিমা লোকলজ্জাভয়ে বনবাসে ভাসাইয়া দিয়া, স্বয়ং রামচন্দ্রকে উঁহার স্বর্ণপ্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া যজ্ঞস্থলে বসাইতে হইয়াছিল। জীবনযজ্ঞে সহধর্ম্মচারিণী চাই, জীবনযজ্ঞে সোণার প্রতিমা চাই। তুমি আমি এই প্রতিমার উপাসনা করিতে বাধ্য। বিধান চাও ত মনু বলিয়াছেন—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

সংসারক্ষেত্রে, এই ক্ষুদ্র প্রতিমার পূজা করিতে করিতেই মহতী প্রতিমার চরণতলে উপনীত হইতে পারা যায়।

আমাদের ঘরের প্রতিমা ঘরেই থাকুন, বাহিরে পরকে লইয়া সে কথার কোন প্রয়োজন নাই। আত্মচর্চ্চা আপনি করিব, পরচর্চ্চার কোন কথা তাহাতে নাই। কিন্তু পরচর্চ্চার অন্য কথা আছে। সংসার-প্রতিমা সংসারে রাখিয়া, সমাজে স্বর্গের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করা চাই। তোমার আমার পক্ষেও সাধনার পথে অগ্রসর না হইলে আর চলিতেছে না। প্রতিমার্চ্চনপদ্ধতি ধীরে ধীরে আমাদিগকে শিখিতে হইবে। না শিখিলে আর নিস্তার নাই। অন্য শিক্ষা না পারি, অন্য প্রতিমার পূজা করিতে না পারি,—যাহাতে জ্ঞানার্জ্জন হয়, সেই শিক্ষা, সেই প্রতিমাই এখন আমাদের আরাধনীয়। সাধকের শরণীয় প্রতিমা অনেক আছে। সে সকলের আরাধনা করিবার শক্তি বা ভক্তি আমাদের নাই। মহাশক্তির মহাপ্রতিমা আরাধনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। সে শক্তি লাভ করিবার পূর্ব্বে ভক্তিলাভ করা চাই। ভক্তির অগ্রে জ্ঞানলাভ করা চাই। জ্ঞান আসিলেই ভক্তি আসিবে, ভক্তি আসিলেই শক্তি আসিবে, শক্তি আসিলেই মুক্তি পাইবে। অতএব এখন আইস ভাই! সকলে মিলিয়া সেই জ্ঞানদায়িনীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই চরণে শরণাপন্ন হই। সে জ্ঞানদায়িনী কে? তিনি—

একা দেবী শুক্লবর্ণা বীণাপুস্তকধারিণী।
কোটিপূর্ণেন্দুশোভাঢ্যা শরৎপঙ্কজলোচনা॥
সস্মিতা সুদতী বামা সুন্দরীণাঞ্চ সুন্দরী।
শ্রেষ্ঠা শ্রুতীনা শাস্ত্রাণাং বিদুষাং জননী পরা॥
বাগধিষ্ঠাতৃ দেবী সা কবীনামিষ্টদেবতা।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ শান্তরূপা সরস্বতী॥

যোগি যাজ্ঞবল্ক্য একবার গুরুশাপে বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান মান, শক্তি স্মৃতি সকলই হারাইয়া সরস্বতীর আরাধনা করিয়া বলিয়াছিলেন "মা! আমার যাহা ছিল সব গিয়াছে, দয়া করিয়া তুমি পুনরুদ্ধার করিয়া দাও।" আমাদেরও আজ ঠিক সেই দশা। কাহার শাপে তা জানি না, পৈতৃক সম্পত্তি আমরা আজ সর্ব্বস্ব হারাইয়া বসিয়াছি। আমরাও তবে, জনে জনে মিলিয়া, তেমনি করিয়া, যোড়হাতে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় বলিতে পারি—

কৃপাং কুরু জগন্মাতর্মামেব হততেজসং।
গুরুশাপাৎ নষ্টস্মৃতিং বিদ্যাহীনং সুদুঃখিতং॥
জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে।
প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিকাং॥
গ্রন্থকর্ত্তৃত্বশক্তিঞ্চ সচ্ছিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতং।
প্রতিভাং সৎসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাং॥
লুপ্তং সর্ব্বং দৈবদোষাৎ দূরীভূতং পুনঃ পুনঃ।
যথাঙ্কুরং ভস্মনি চ করোতি দেবতা পুনঃ॥

ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী।
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বজ্জীবন্মৃতং পরং।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা।
বাগধিষ্ঠাতৃ দেবী যা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
হিমচন্দনকুন্দেন্দুকুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমো নমঃ॥

অতএব এস ঐ ধবলকমলবাসিনী, ধবলবসনধারিণী, ধবলবরণরঙ্গিণী, বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনীর চরণে আশ্রয় লইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহারই সেবায় আত্মসমর্পণ করি। এস মন্ত্র পড়ি—

ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষস্থলাং।
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীং॥
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥

প্রতিমা

১

কি সুখ জীবনে তার,
হৃদয় মন্দিরে যার,
শোভিল না প্রতিমা কখন!
শৈশবে কোমল মনে,
যৌবনে উন্মত্ত প্রাণে,
পূজিল না কভু যেই জন!
যে দিকে নয়ন রাখি,
মোহিনী প্রতিমা দেখি,
প্রতিমায় পূর্ণ এ সংসার!
সে পাষাণ প্রাণ কার;
নিভৃত অন্তরে যার,
ছায়া নাহি পড়ে প্রতিমার!

২

সে দিন সুদূর নয়,
শৈশবে পুতলি প্রায়,
নিরাশ্রয় ছিলাম যখন।
যে দেবী ধরিয়া বুকে,
অমৃত ঢালিয়া মুখে,
প্রাণ দান দিলা অনুক্ষণ—
অঙ্গে অঙ্গে রাখি আঁখি,
মল মূত্র দেহে মাখি,
বসি পার্শ্বে প্রতিমা মায়ার;
সে মূর্ত্তি কি ভুলিবার,
খুলে দেখ হৃদিদ্বার,
আলো করি প্রতিমা তাহার!

৩

ততোধিক সন্নিকটে,
নেহার স্মৃতির পটে,
চিন্তামগ্ন পিতার আকার,
ধরিয়া দধীচি-প্রাণ,
কেবলি করিলা দান,
তনুমন ক্ষয় করি তাঁর;
তব শুভধ্যান ধরি,
যান ভব পরিহরি,
জীবনের বিধাতা তোমার,
হতভাগ্য হেন কার,

হৃদয়-মন্দিরে যার,
বিরাজে না প্রতিমা তাঁহার!

৪

বসি জ্ঞান সিন্ধু-তীরে,
হেরি সে অকূল নীরে,
ভয়ে যবে শিহরিত প্রাণ;
শক্তি নাহি ছিল হেন,
ভক্তি করি উপার্জ্জন,
কে করিল অভয়প্রদান?
দিলা গূঢ় মন্ত্র কানে,
নিয়ত নির্ভয় প্রাণে,
লভিলেরে দুর্লভ রতন॥
সে গুরু-প্রতিমা বুকে,
সতত না ধরে সুখে,
কে আছেরে অভাগা এমন!

৫

যৌবনে যখন প্রাণ,
হৃদয়ে হারায়ে স্থান,
দশদিক হেরিত কাতরে;
ভিক্ষুকের বেশ ধরি,
প্রেম বিন্দু ভিক্ষা করি,
ভ্রমিত রে হতাশ অন্তরে;
ভুলিবে কি কভু মন,
সে নয়ন—সে বদন—
সে মমতা প্রাণসঞ্জীবনী;
সে সুধার অন্ত নাই,
যত চাই তত পাই
প্রিয়া বুঝি অমৃতের খনি?

৬

হেন দীন কে ধরায়?
সে-সোদর প্রতিমায়,
ভুলিলরে কখন জীবনে!
দেহে প্রতিরূপ আঁকা,
বুকে শুভসাধ মাখা,
নিরুপম সুহৃদ ভুবনে।
সে স্নেহের আচরণ,
সে স্নেহের সম্বোধন,
স্মরিলে ভরিয়া উঠে বুক;
হারায়েছে যে তাহায়,
সেই জানে কি সুধায়,
নিরমিত ভাই ভগ্নীমুখ!

৭

সহপাঠী-সহচর,
প্রতিমা কি মনোহর,
কত সুখকর তাহা প্রাণে?
সুখে দুখে তার স্থান,
খুলেছে যে মন প্রাণ,
সেই ভাগ্যবান্ তাহা জানে।
সে প্রতিমা সুখকর,
হারা'ও না কভু নর,
কুটিল স্বার্থের অন্বেষণে;
খুলে দেখ তব বুক,
স্বার্থে পেলে কত সুখ,
কত সুখ হারালে জীবনে!

৮

কে বলে রে ধরাতল,
নরপিশাচের স্থল,
ঘরে ঘরে দেবতা যথায়!
এই গৃহদেবতায়,
যে কভু না পূজে হায়,
সে কি পূজা শিখিবে ধরায়।
মহাতীর্থ ভূমণ্ডল,
চিত্ত শোধনের স্থল,

উপাসনা বিধান তাহার।
এ প্রাণের প্রতিমায়,
না যদি পূজিবি হায়,
দেবতা কোথায় পাবি আর ?
ঈশান।

প্রতিমা-তত্ত্ব।

এ জগৎ সৌন্দর্য্যের প্রতিমা। যে দিকে চাও, সৌন্দর্য্যের প্রতিমা তোমার নয়ন-সমক্ষে দেদীপ্যমান। চারিপার্শ্বে বৃক্ষলতা ও কুসুম তোমার দৃষ্টি পরিতৃপ্ত করিতেছে। বনবিহারী বিহঙ্গকুল, উড্ডীয়মান পতঙ্গকুল, জলচারী মৎস্যকুল, সকলই সৌন্দর্য্যের প্রতিমা। সামান্য কীট হইতে বৃহদ্‌কায় মাতঙ্গ পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিতেছে। আবার গগণে ঊর্দ্ধদৃষ্টি কর, দেখ চন্দ্র, সূর্য্য ও অসংখ্য নক্ষত্ররাজি রূপের প্রতিমায় উদ্ভাসিত আছে। অনুবীক্ষণ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ কর, দেখিতে পাইবে, প্রতি জলকণায়, প্রতি বৃক্ষ-পত্রে, প্রতি পুষ্পদলে, শত শত সুন্দর কীটাণু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে তোমার দৃষ্টিপথে উদিত হইতেছে। দূর-বীক্ষণ দিয়া আবার নভোমণ্ডল অবলোকন কর, দেখিতে পাইবে, কত বর্ণের কত স্থির নক্ষত্র তোমার চক্ষে জাজ্বল্যরূপে প্রতীয়-মান হইতেছে,—যে নক্ষত্র সমুদায় এক একটি বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডল, যাহারা সূর্য্য অপেক্ষা কত সহস্রগুণে বৃহত্তর এবং যাহাদিগের দীপ্তি এখনও পৃথ্বীদেশ স্পর্শ করে নাই। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বল, ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, অনন্ত সৌন্দর্য্যের রূপ, রূপের প্রতিমা অনন্ত।

প্রতিমা দুইরূপে অনন্ত। অণুবীক্ষণ দিয়া যখন আমরা জগতের রূপ দেখি, তখন দেখি জগৎ অণিমায় অনন্ত। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম প্রকৃতিরাজ্য অনন্ত সীমায় যে কোথায় মিলাইয়া যায়, অণুবীক্ষণেরও শক্তি নাই যে সে সীমার নির্দ্দেশ করে। সূক্ষ্মতম রূপপ্রতিমা পর্য্যন্ত তোমার অনুবীক্ষ-ণের দৃষ্টিশক্তি। অনুবীক্ষণের শক্তি আরও বৃদ্ধি কর, আরও সূক্ষ্মতর রূপপ্রতিমা প্রতীয়মান হইবে। তবে আর এ অনন্তের সীমা কোথা ? পরমাণু এত সূক্ষ্ম হইতে পারে, যাহার বহু সমষ্টি তোমার আণুবীক্ষণিক সূক্ষ্মতম রূপপ্রতিমা। বহু সমষ্টি নহিলে জীব সঞ্জাত হয় না। বহুসমষ্টি নহিলে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় না। বহু সমষ্টি নহিলে সৌন্দর্য্যের প্রতিমা পরিপুষ্ট হয় না। যে সমস্ত পরমাণুতে আণুবীক্ষণিক সূক্ষ্মতম জীব সৃষ্ট, সে সমস্ত পরমাণু কত সূক্ষ্ম। সে সমস্ত পরমাণুর প্রতিমা কত সূক্ষ্ম। অতএব প্রতিমা অণিমায় অনন্ত। এই প্রতিমা আবার মহিমায় অনন্ত ! দূরবীক্ষণ তাহার প্রমাণ ; অনন্ত আকাশ তাহার দেদীপ্যমান সাক্ষী। যাহা অণিমা, লঘিমা ও মহিমায় অনন্ত, তাহা নারায়ণ।

অতএব নারায়ণরূপী প্রতিমাকে নমস্কার।

এই নারায়ণের নাম পুরুষ। এই মূলতত্ত্ব তখন পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়, যখন তাহা গুণান্বিত হয়। যখন নারায়ণ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়গুণে সমন্বিত হন, যখন নারায়ণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আক্রান্ত হন, তখন তিনি পুরুষ। পুরুষ যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে এরূপে পরিণত হন, যে তাহাতে একটি সৌন্দর্য্যের প্রতিমা গঠিত হইতে থাকে, তখন তিনি সুন্দরী প্রকৃতি। প্রকৃতি স্থিতিগুণে সমন্বিত হইয়া যখন সৌন্দর্য্যের প্রতিমায় প্রকটিত হন তখন জগতের বিকাশ হয়। এই জগতের নাম স্থূল প্রকৃতি। সূক্ষ্ম প্রকৃতি তাহার সূক্ষ্ম গুণময় ভাব। সূক্ষ্ম প্রকৃতির আদি পুরুষ, পুরুষের নির্গুণ ভাব অনন্ত পরমাত্মা। এই অনন্ত পরমাত্মা সর্ব্ব-জীব ও পদার্থের সারতত্ত্ব। অথবা এই নির্গুণ-তত্ত্ব অনন্ত প্রতিমায় পরিদৃশ্যমান ও অব-স্থিত। এই প্রতিমা অনন্ত দেশে স্থিত, অনন্ত কালে স্থিত। পুরুষ, প্রকৃতি ও আত্মা কখন বিভিন্ন নহে। চিরকালই আত্মা বর্ত্তমান, চিরকালই তাহার রূপ বর্ত্ত-মান। রূপ ব্যতীত আত্মা বর্ত্তমান হইতে পারে না। সুতরাং রূপই যখন আত্মার বর্ত্তমানত্বের নিদানভূত কারণ, তখন অব-শ্যই বলিতে হইবে জগৎরূপ প্রতিমা অনন্ত দেশে ও অনন্তকালে পরিব্যাপ্ত।

সৃষ্টির এই নিগূঢ় রহস্য আর্য্যঋষি যখন প্রতীত করিলেন, তখন তিনি সেই মহো-ল্লাসে উন্মত্তপ্রায় হইয়া মনে তাহার ধারণা করিতে গেলেন। সৃষ্টির এই রহস্য নিত্য। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতিপলে এই সৃষ্টি সম্পন্ন হইতেছে, অথচ এ রহস্য দৃশ্যমান নহে। প্রকৃতির অন্তরে অন্তরে প্রতিনিয়ত এই সৃষ্টিব্যাপার চলিতেছে। কেবল ধ্যানে এ রহস্যের অনুভব হয়। যে ধ্যানে এই রহস্য প্রতীত হইয়াছে, সেই ধ্যানে তাহাকে ধারণা করিয়া তাহা বাহ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রতিমা ধ্যানজরূপ, সেই ধ্যানজ প্রতিমা অনন্তদেবের প্রতিমূর্ত্তি। যে গূঢ় তত্ত্ব বেদে জ্ঞানরূপে প্রতীত, পুরাণে তাহা প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত। পুরাণ বেদের স্থূল দেহ। জ্ঞান প্রতিমায় অঙ্কিত ও সজ্জিত হইয়া পুরাণে প্রকটিত হয়। সেই পৌরা-ণিক প্রতিমা অনন্তদেবের মূর্ত্তিতে সৃষ্টির প্রহেলিকা প্রকাশ করে। অনন্ত নাগ সহস্র ফণায় অনন্তের নিদর্শন। তন্মধ্যে অনন্ত-দেব শায়িত। কারণ, অনন্ত দেশে অনন্ত সত্ত্ব নিহিত আছেন। সেই সত্ত্বেই অনন্ত দেশ সত্তাবান্। এই অনন্ত সত্ত্ব যখন গুণান্বিত হইতে চাহে, তখনই তাহা পুরুষ। সেই পুরুষ নারায়ণরূপে অনন্ত নাগের সহস্র ফণাসজ্জিত শয্যায় শায়িত। জলের মহাসাগর দেখ, তাহা অনন্ত নীলবর্ণে প্রভাসিত। অনন্ত বায়ুসাগর ও আকাশ-দেশ ও দেখ, তাহা অনন্ত নীলবর্ণে রঞ্জিত। সেই অনন্তদেবের বর্ণ নীল। সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয়ের কারণ সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ এবং অহংকার তত্ত্ব—এই চতুর্ব্বিধ গুণ অনন্ত-দেবের চতুর্ভুজ।[১] যে জগৎ নিয়ত পরি-বর্ত্তনশীল ও ক্ষণভঙ্গুর, সেই জগৎ তমো-ময় ভুজে পদ্মরূপে অবস্থিত। জগতের

১ "সত্ত্বং রজস্তম ইতি অহংকারশ্চতুর্ভুজঃ। পঞ্চভূতাত্মকং শঙ্খং করে রজসি সংস্থিতং॥" তাপনীয়শ্রুতিঃ। উত্তর বিভাগ।

কারণ রূপ মহামায়া গদা রূপে অহংকার ভুজে বর্ত্তমান রহিয়াছে। রজোগুণময় করে ব্রহ্মাণ্ডোপকরণ পঞ্চভূতের স্বরূপ শঙ্খ শোভমান।[২] সত্বগুণাত্মকভুজে সৃষ্টিকাণ্ডের পরিপাকচক্র। ব্রহ্মাণ্ড এই চক্রে নিয়মিত হইয়া নারায়ণের কার্য্য সাধন করিতেছে। ঊর্দ্ধ ও অধোদেশ নারায়ণের পাদদ্বয়। যে তেজ চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও বাক্যের তেজোময় সত্বা—সেই তেজ কৌস্তুভমণি।[৩] স্থাবর ও জঙ্গম এই দ্বিবিধ সৃষ্টি তাঁহার কুণ্ডলদ্বয়। যে বস্তু জগতে সৎস্বরূপ ও শ্রেষ্ঠ, কিরীট সেই সৎ পদার্থের নিদর্শন ও শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।[৪] এই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী সর্ব্বসম্পদবিজয়ী অনন্ত পুরুষের পাদমূলে ঐশ্বর্য্যশীলা লক্ষ্মীদেবী স্থাপিতা। যেহেতু ঐশ্বর্য্য সমন্বিত না হইলে পুরুষ সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন না। পুরুষ, প্রকৃতিসংযুক্ত হইয়া সৃষ্টি করিতেছেন। সেই পুরুষের মধ্যদেশস্থ নাভিকুণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি-কমল সমুত্থিত। সেই সৃষ্টি-কমলে সৃষ্টিদেব ব্রহ্মার প্রতিমা। সৃষ্টিদেব, নারায়ণতেজে অগ্নিময় বালার্ক রাগরঞ্জনে দেখা দিয়াছেন। ব্রহ্মা চারিদিকে চতুর্ম্মুখে সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহার চারিদেশে চারি বাহু বিস্তৃত। যখন জীব অহংজ্ঞানে সমন্বিত হয় তখন সৃষ্টি কার্য্যের শেষ। এই অহংজ্ঞানই মহামায়া ও মিথ্যাদৃষ্টি। এই অহংজ্ঞানই অহংকার তত্ত্ব। এই অহংকারতত্ত্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টির পরিণতি। যখন জীবের অহংজ্ঞান হইল তখন তাহা জীবনপ্রাপ্ত। ব্রহ্মার ত্রিভুজে ত্রয়ী বিদ্যার অভিজ্ঞানস্বরূপ ত্রিবেদ। কারণ, বেদের অর্থই জ্ঞান। তাঁহার চতুর্থ ভুজে জীবনীশক্তিদায়ক অমৃতভাণ্ড কমণ্ডলু। এই পর্য্যন্ত সৃষ্টির পরিণতি ও শেষ। এই প্রতিমায় সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতেছে। এই প্রতিমা দেবপ্রতিমা, কারণ উহাতে দেবশক্তিরই বিকাশ হইয়াছে। যাহা দেব শক্তির বিকাশ ও অভিজ্ঞান, তাহা অবশ্য পূজনীয়। এই জন্য দেবপ্রতিমা পূজার ভাজন হইয়াছেন। আমরা যখন এই প্রতিমাকে পূজা করি, তখন সেই অনন্তদেব ভিন্ন আর কাহারই পূজা করি না। আর্য্যঋষি সমস্ত প্রতিমাপূজায় এই অনন্ত দেবেরই পূজা করিয়া থাকেন। শালগ্রাম অনন্তদেবেরই নিদর্শন মাত্র, কারণ, শিলাতেও তিনি বর্ত্তমান। শিলা সর্ব্বাপেক্ষা বহুকালস্থায়ী বলিয়া তাহাই নিদর্শন রূপে গৃহীত হইয়াছে।

সৃষ্টির পর স্থিতি, স্থিতির পর লয়। পরিবর্ত্তনশীল জগতের নিয়ম এই। যাহা পরিবর্ত্তনশীল, যাহা যায়, যাহা থাকে না তাহাই জগৎ। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই নিরত পরিবর্ত্তন

---

২ বালস্বরূপমত্যন্তং মনশ্চক্রং নিগদ্যতে।
আদ্যামায়াভবেচ্ছাঙ্গং পদ্মং বিশ্বং করেস্থিত ॥
আদ্যাবিদ্যা গদা বেদ্যা সর্ব্বদা মে করেস্থিতা।
ধর্ম্মার্থকাম কেয়ূরৈদি ব্যৈর্দিব্য মহীস্থিতৈঃ ॥
তাপনীয় শ্রুতিঃ।

বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত ১ম অংশের ২২ অধ্যায়স্থ ৬৭ হইতে ৭০ শ্লোক পর্য্যন্ত দেখ।

৩ "যেন সূর্য্যাগ্নিবাক্চন্দ্রং তেজসা স্বস্বরূপিণে।
বর্ত্ততে কৌস্তুভাখ্যং হি মণিং বদন্তীশমানিনঃ ॥"
তাপনীয় শ্রুতিঃ।

৪ "কূটস্থং সৎস্বরূপঞ্চ কিরীটং প্রবদন্তি মাং।
ক্ষরোত্তমং প্রকৃত্যন্তঃ ॥ কুণ্ডলং যুগলং স্মৃতং ॥"
তাপনীয় শ্রুতিঃ।

হইতেছে, অথচ ব্রহ্মাণ্ড চিরকাল বর্ত্তমান। যাহা চিরকাল বর্ত্তমান ও নিত্য, তাহাই তাহার বস্তু, যাহা নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহাই জগতের মিথ্যাদৃষ্টি ও মহামায়া। সমস্তই পরিবর্ত্তন হইতেছে বটে, কিন্তু সমস্তের মধ্যেই নিত্য বস্তু অবস্থান করিতেছে। সমস্তই পরিবর্ত্তন হইতেছে বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ দেহ ও রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে। জগতের এই ঘোর প্রহেলিকা। তুমি মনুষ্য—তুমি নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছ বটে, কিন্তু তোমার সমস্তই রহিয়াছে। তুমি শৈশবে যাহা ছিলে, যৌবনে তাহা নহ; আবার যৌবনে যাহা ছিলে, বার্দ্ধক্যে তাহা নহ। এমত কি, গত কল্য যাহা ছিলে অদ্য তাহা নহ। গত কল্য কি, এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যাহা ছিলে, এক ঘণ্টা পরে তাহা নহ। তোমার শরীর মন নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যে তোমাকে এক দিন শৈশবে দেখিয়াছিল, আর দেখে নাই, যৌবনে তোমাকে অন্য একদিন সহসা সে দেখিলে, হয় ত চিনিতে পারিবে না। তোমার সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অথচ তুমি অহংজ্ঞানে সেই তুমিই আছ। এই পরিবর্ত্তনে প্রতিনিয়ত তোমার শরীরে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রক্রিয়া চলিতেছে। প্রতিপলে তোমার দেহাভ্যন্তরে একদা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে।[৫] যাহার ধ্বংস হইতেছে, খাদ্য ও নিশ্বাস দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ হইতেছে। ধ্বংস হইতেছে, তাহার ক্ষতিপূরণ হইতেছে, অথচ তন্মধ্যে তুমি সজোরে বাঁচিয়া রহিয়াছ। প্রতিক্ষণে যেমন লয় হইতেছে, অমনি সৃষ্টি হইতেছে, অমনি বাঁচিয়া রহিয়াছ। এই রূপে তোমার দেহের সংসার চলিতেছে। তোমার দেহের সংসার যে রূপে চলিতেছে অপরাপর সর্ব্ব জীবের সংসার সেই রূপে চলিতেছে। জগতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর একত্রে নিত্য বর্ত্তমান, নিত্যই স্বস্ব কার্য্য করিতেছেন। কারণ, যাহা সঞ্জাত হইয়াছে তাহা ত্রিগুণ সমন্বিত হইয়া জন্মিয়াছে। যাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আশ্রিত হইয়া জন্মিয়াছে, তাহা চিরদিনই সেই ত্রিগুণের পরিচয় দিবে। অনন্তপুরুষ এই ত্রিগুণসমন্বিত হইয়া জগৎব্যাপ্ত রহিয়াছেন।[৬] তাঁহার সৃষ্টিগুণ ব্রহ্মা, তাঁহার স্থিতিগুণ বিষ্ণু, এবং তাঁহার লয়গুণ মহেশ্বর। ব্রহ্মাণ্ডে এই ত্রিবিধ শক্তি নিত্য বর্ত্তমান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর নিত্যদেবতা। এই তিন লইয়া সংসার, এই তিন লইয়া ব্রহ্মাণ্ড, অথচ এই তিনই এক অনন্তদেব। আর্য্যঋষি যখন এই অনন্তদেবের ভাবনা করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে এই ত্রিবিধ ভাবেই দেখিয়াছেন। বেদ ও পুরাণের আলোচ্য বিষয়, এই ত্রিবিধ দেবতা। এই ত্রিবিধ দেবতার প্রকৃতিপরিচয় তাঁহাদের লীলা নামে পুরাণে প্রথিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ দেবতার প্রতিমা, পুরাণে প্রথমে

---

৫ "সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তয়ঃ সর্ব্বদেহিষু।
বৈষ্ণবাঃ পরিবর্ত্তন্তে মৈত্রেয়াহর্নিশং সদা॥
বিষ্ণুপুরাণ। ১ অংশ ৭ অধ্যায়।

৬ স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যঞ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্ত্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ১ম অংশ ২য় অধ্যায়

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎপরে তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিমা লীলারূপে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই লীলাগুলি দেবতাদিগের প্রকৃতি ও কার্য্যের প্রতিরূপী প্রতিমা মাত্র।

পূর্ণচন্দ্র বসু।

মানস প্রতিমা।

কি দিয়া গঠিল বিধি, ভাবি তাই মনে।
বুঝি কোন তারালোকে বিজনে বসিয়া—
বিকাশে কুসুম যেথা সুরভি পবনে ;
উষার কনক আভা গগনে ফুটিয়া
ধীরে ধীরে কাঁপে যথা মধুর স্বননে,
বিরাজে অপূর্ব্ব স্পর্শ চিরাবেশময় ;
লাবণ্যের পরমাণু বাছিয়া যতনে
গড়িলা প্রতিমা খানি সৌন্দর্য্যনিলয়।
হাসিতে অমিয় ঢালি দামিনী নয়নে
কাদম্বিনী কেশপাশে দিল জড়াইয়া,
ত্রিদিব সুষমা আনি ঢালিল বদনে
স্বরগের মধুরতা সনে মিশাইয়া।
অনিমেষ চেয়ে রই, তাইলো ললনে!
তাই ত নেহারি তোরে আপনা ভুলিয়া।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সারস্বত ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা।

ধর্ম্মের বিলোপ-লক্ষণ দর্শনে ধার্ম্মিক লোকের প্রাণে আঘাত লাগে। হিন্দুধর্ম্মের বিলোপ হইতেছে, ইহা ভাবিয়া অনেকেই ব্যথা পান। অনেকেই মনে করেন, কলিকাল—একালে হিন্দু ধর্ম্ম থাকিবে না। ইহা ভাবিয়া অনেকেই দুঃখিত, অনেকেই ব্যথিত, অনেকেই চিন্তিত।

আমরা বলি ভয় নাই, হিন্দুধর্ম্ম যাইবে না ; একবারে যাইবে না। এই যে আন্দোলন দেখিতেছ, বিপ্লবভাব দেখিতেছ, যাহা দেখিয়া তোমাদের প্রাণে ব্যথা লাগিতেছে, দেখিবে ইহা শুভ লক্ষণ, ইহা তোমাদের ভবিষ্য অভ্যুদয়ের বীজ। এরূপ পরিবর্ত্তন, এরূপ আন্দোলন, এরূপ বিপ্লব ভাবুকে

অনেক বার হইয়া গিয়াছে, আজ নূতন হইতেছে না। শাক্য সিংহের পরলোক গমনের পর একবার,[১] তৎপূর্ব্বে সারস্বত কল্পে একবার, তৎপূর্ব্বে বেণ রাজার সময়ে একবার, তৎপূর্ব্বে মৎস্য অবতার কল্পে একবার, এতদপেক্ষা অধিক বিপ্লব ঘটনা হইয়াছিল; বেদ ও বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সে আঘাতেও হিন্দুধর্ম্ম যায় নাই, কেবল পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল মাত্র। দেশে ঝড় হয়, দেশের উপকারের জন্যই হয়; ঝড়ে গৃহ বৃক্ষাদি ভগ্ন করে বটে, কিন্তু তাহাতে মলারিষ্ট (Malaria) বিনষ্ট হইয়া স্বাস্থ্যকর বায়ুর আবির্ভাব হয়। দেশে বন্যা আইসে, জলপ্লাবন হয়, দেশের ভূমি তাহাতে উর্ব্বরা হইয়া থাকে। ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস হইলেই জলপ্লাবনের আবশ্যক হয়; জলপ্লাবন হইলেই ভূমির উর্ব্বরতা পুনরাগমন করে। বিপ্লবের গুণ নানা প্রকার। ধর্ম্মবিপ্লব দেখিয়া তোমরা ভীত হইও না, দুঃখিত হইও না। এই যে ধর্ম্মবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, ইহা আমাদের উপকারের জন্যই,—আমাদের সংশোধনের জন্যই,—আমাদের ভবিষ্য মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে। ঝড় যেমন জল বায়ুর সংশোধক, বন্যা যেমন ভূমির উর্ব্বরতাবিধায়ক, ধর্ম্মবিপ্লব তেমনি আমাদের সনাতনধর্ম্মের সংশোধক। যতবার ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, ততবারই ধর্ম্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্কার হইয়া উঠিয়াছে। উহা কেবল পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন মাত্র; তাহাতে আমাদের সমাদৃত ধর্ম্ম কিছুতেই উচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হয় নাই; সর্ব্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তনও ঘটে নাই; পুনঃ পুনঃ আন্দোলনে, ঘর্ষণ মার্জ্জনে কেবল সংশোধিত ও সুসংস্কৃত হইয়াছে।

এধর্ম্ম উচ্ছেদ হইবার নহে, এধর্ম্ম অসার নহে, ক্ষীণমূল নহে, কাহারও মনঃকল্পিত নহে, সাধারণবুদ্ধিপ্রসূতও নহে। এ ধর্ম্মের মূল অতি দৃঢ়, বীজ অলৌকিক, অভ্যন্তর সারবান্‌। সেই জন্যই এধর্ম্ম চিরস্থায়ী, স্থূলকথায় অনশ্বর। যাহা অনশ্বর, তাহার কি বিনাশ আছে? বিপ্লববাত্যায় যদি ধর্ম্মতরুর পত্র স্খলিত হয়, তাহা হইলে অচিরাৎ বসন্ত পাদপের ন্যায় অভিনব পত্রে সুশোভিত হইয়া উঠিবে; ক্ষতি কি? মনুষ্যের সাময়িক অবস্থানুরূপ, বলবীর্য্যানুরূপ, শক্তিসামর্থ্যানুরূপ যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইবে। হউক, ক্ষতি কি? ঐ প্রকার পরিবর্ত্তন না হইলে মূল বৃক্ষ কি দীর্ঘজীবী হয়? মূল বিনাশেই ক্ষতি; পত্র পরিবর্ত্তনে আমাদের ধর্ম্মবৃক্ষের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।

ধর্ম্মের ইতিহাস দেখ, দেখিতে পাইবে, আদি কল্পেও একবার বেদ অন্তর্হিত হইয়াছিল; বেদোক্ত ধর্ম্ম, বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইয়াছিল, জগন্নিয়ন্তা আদিপুরুষ তৎকালে মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদের উদ্ধার এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বৈদিকধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[২]

১ শাক্য সিংহের জীবদ্দশায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যেও বৈদিকধর্ম্মের গৌরব হ্রাস হয় নাই; তাঁহার মৃত্যুর অন্যূন দুইশত বর্ষ পরে কতকগুলি তীক্ষবুদ্ধি বৌদ্ধের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের হানি ও বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার হইয়াছিল।

২ ধর্ম্মের এইরূপ ইতিহাস বেদের ব্রাহ্মণকাণ্ডে, মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুনরায় বহুসহস্র বর্ষ পরে আর একবার বেদ বিলুপ্ত হইয়াছিল, বেণরাজার মৃত্যুর পর পূর্ব্বপ্রথিত বেদধর্ম্ম পুনর্ব্বার সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পরেও আর একবার বৈদিকধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিক তখন ঘোরতর অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; তদ্দর্শনে সরস্বতী-তীরবর্ত্তী ব্রাহ্মণেরা ব্যথিত হৃদয়ে বেদ উদ্ধারের নিমিত্ত উৎকট তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। করুণাময় আদিদেবের কৃপায় তাঁহারা সিদ্ধমনোরথ হইলেন; সনাতনবেদের পুনরুত্থান হইল।

সারস্বত ব্রাহ্মণগণ বেদলাভের নিমিত্ত সরস্বতীনদীকূলে ধ্যাননিমীলিত নেত্রে ভগবান আদিদেবের নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি প্রার্থনা এই;—

> "পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্
> পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্
> পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্।"

আমাদের সেই মন, সেই আয়ু, সেই প্রাণ, সেই আত্মা, সেই চক্ষু, সেই কর্ণ, ফিরিয়া আসুক; যাহা আমাদের বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা যেন পুনঃ প্রাপ্ত হই; আমাদের যে সুজ্ঞান ক্ষয়িত হইয়াছে, যে সত্য অপহৃত হইয়াছে, সে সমুদায় আমাদের পুনরাগত হউক।

বেদহারা জ্ঞানহারা সারস্বত ব্রাহ্মণগণের ন্যায় আজ আমাদের মনেও "আমাদের যে সুজ্ঞান ক্ষয়িত হইয়াছে, যে সত্য অপহৃত হইয়াছে, যে বীর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে, সে সমুদায় আমাদের পুনরাগত হউক;" এইরূপ প্রার্থনার উদয় হইতেছে। হে ধর্ম্মপিপাসু আর্য্য সন্তানগণ! আইস আমরা সকলে মিলিয়া সেই বিশ্বপিতা পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকট এক মনে ঐ মন্ত্রে প্রার্থনা করি। তাহা হইলেই আমরা তাঁহার প্রসাদে আমাদের অপহৃত জ্ঞান, বিনষ্ট আয়ু, বিনষ্ট বীর্য্য, বিনষ্ট বল, বিলুপ্ত দর্শনশক্তি ও বিলুপ্ত শ্রুতিশক্তি, সমস্তই পুনঃ প্রাপ্ত হইব।

সারস্বত কল্পের প্রতিষ্ঠিত বেদ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু তদুক্ত ধর্ম্মের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অশ্বমেধ, গোমেধ, সমাংসক শ্রাদ্ধ, শূদ্রাদির সহিত একত্র ভোজন, দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান, এবং দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন, এসকল এখন আর প্রচলিত নাই। অগ্নিহোত্র, ব্রহ্মচর্য্য, দীর্ঘ কাল তপস্যা, এসকল এখন বিলুপ্ত। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার আরম্ভ হইলে ধর্ম্মের এই সকল কুপরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের তাড়নায় হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, ইহা অসত্য নহে। সেই তুমুল বিপ্লব আমাদের আর এক উপকার করিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হয়, বৌদ্ধধর্ম্মই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল, অথবা পথপ্রদর্শক। অতএব আবার বলি ধর্ম্মের বিপ্লব দর্শনে তোমরা কেহ ভীত হইও না, হতাশ হইও না, দুঃখিত হইও না, কাতর হইও না। কিছুকাল পরেই দেখিতে পাইবে, আমাদের যাবন্ত সুজ্ঞান ও যাবন্ত প্রণষ্ট বস্তু আবার পুনঃ প্রাপ্ত

হইয়াছি। যদি কিছু অঙ্গবৈকল্য ঘটে, ঘটুক, ক্ষতি কি? কালধর্ম্মে যে সংস্কার আবশ্যক তাহাই হইবে, সর্ব্বাঙ্গীন সম্পাৎ কদাচই হইবে না।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

অতীতের স্মৃতি।

দিন যায়; স্মৃতি থাকে। কালস্রোতে অনেক জিনিসই ভাসিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহাদের কথা আজিও ভুলিতে পারি নাই, কখনও যে পারিব, তাহাও মনে হয় না—বুঝি তাহা ভুলিবার নহে। জীবনের এই দীর্ঘ পথ প্রা অতিক্রম করিয়া এখন দেখি, অনেক জিনিষ হারাইয়া গিয়াছে। ভিতরে, বাহিরে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে যে দিকে চাহিয়া দেখি, অনেক জিনিষ নাই। সে মানুষ নাই, সে প্রকৃতি নাই, সে অনুষ্ঠান নাই, সে সংস্কার নাই, সে কিছুই নাই। চির দিন অবশ্য কিছুই থাকে না—পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম; তবু যেন কেন মনে হয়, সে সকল কোথায় গেল? আর কাদিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—হায়, কেন গেল?

কি ছিল, আর কি হইল, ভাবিতে গেলেই সর্ব্বাগ্রে আপনাদেরই কথা মনে হয়। প্রাচীনে ও নবীনে তুলনা করিয়া হৃদয় বিষাদে ভরিয়া যায়, প্রাণ নৈরাশ্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে। চাহিয়া দেখি, ভাবিয়া দেখি, সে সকল মানুষ আর নাই; যাঁহারা সমাজ-সেবানিরত ছিলেন, যাঁহারা ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিতেন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দিতেন, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা করিতেন—সে সকল মানুষ আর নাই। যাঁহাদের ধর্ম্মে নিষ্ঠা ছিল, কর্ত্তব্যে মতি ছিল, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি ছিল, অতিথি অভ্যাগতের সেবা ছিল, সংসার-ধর্ম্মে জ্ঞান ছিল, প্রাণে মনুষ্যত্ব ছিল—তাঁহারা আর নাই। এক্ষণেও মানুষ আমরা আছি, কিন্তু কত প্রভেদ! যূথিকাও পুষ্প, কিংশুকও পুষ্প—কিন্তু কত প্রভেদ! আমরা এখন সেবক কেবল গৃহিণীর, আশ্রয় কেবল স্বর্ণকারের, বন্ধু কেবল নিজের। তাই তাঁহাদের অভাব হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিতে হয়, এবং উপস্থিতের পানে চাহিয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হয়।

একটা দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাউক। হরিহর বাবুকে দেখিয়াছিলাম। তিনি ছিলেন বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী দশ খানা গ্রামের লোক আপনাদিগকে দৈবানুগৃহীত বলিয়া মনে করিত। মনে করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল। প্রাতে তাঁহার বাটীতে সভা বসিয়া যাইত—লোকে লোকারণ্য—পণ্ডিতেরা শাস্ত্রালাপ করিতেছেন; বিষয়ী লোকেরা, কেহ বা সেই শাস্ত্রালাপ শুনিতেছেন, কেহ বা বিষয়-কর্ম্মের পরামর্শ করিতেছেন ও লইতেছেন। যে আর্ত্ত, যে বিপন্ন, যে দায়গ্রস্ত, সে আপন দুঃখ, আপন বিপদ, আপন দায় জানা-

ইতেছে এবং যথোচিত প্রতিবিধান পাইয়া সহস্র মুখে, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে, দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। অপরাহ্নে গ্রামের বৃদ্ধ ও নিশ্চিন্ত ভদ্রলোকেরা, যাহার অবসর আছে সেই, খেলা ধূলা-হাস্য-পরিহাসের জন্য এই খানে আসিয়া সমবেত হইত—উচ্ছ্বসিত, হৃদয়ানুভূত, আনন্দ-হিল্লোলে সে পুরী, প্রভাত-কমলের ন্যায়, অকুণ্ঠিত এবং মুক্তপ্রসর অনুরাগের ন্যায়, প্রফুল্ল হইয়া থাকিত। সন্ধ্যার পর চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি মহার্থপূর্ণ গ্রন্থসকল পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইত—পার্শ্ববর্ত্তী পাঁচ খানা গ্রামের স্ত্রী পুরুষ, যুবক বৃদ্ধ, ইতর ভদ্র সকলে আসিয়া সে অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিত। ভীষ্মের কাছে সত্যপালন শিখিত, যুধিষ্ঠিরের কাছে ধর্ম্মৈকপ্রাণতা শিখিত, সীতা ও সাবিত্রীর কাছে পতিপরায়ণতা শিখিত, লক্ষ্মণের কাছে ভ্রাতৃভাব শিখিত, দধীচির কাছে পরহিতব্রত শিখিত। হরিহর বাবুর দ্বারা লোকের যে কেবল আর্থিক উপকার হইত, তাহা নহে—আর্থিক, বৈষয়িক, পারমার্থিক, সকল প্রকার শুভই সাধিত হইত।

আজ কাল ত বাবুর অভাব নাই। দেশে আর বাবু ধরিতেছে না—কেরাণী বাবু, মাষ্টার বাবু, ইস্কুলের ছাত্র বাবু, বাজার সরকার বাবু, কনষ্টেবল্ বাবু—পথে পথে, গলিতে গলিতে, হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাবুর পর্ব্বত। এখন পথে চলিতে বাবু পায়ে ঠেকে। আমাদের পাড়ায় নলিন বাবু আছেন, কেবল নলিন বাবু বলিয়া নহে; এমন অনেক আছেন। দশটার পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া বাহির হইলে কাকের ডাক শুনিয়া গৃহিণীর মূর্চ্ছা হয়; সুতরাং বাবুর প্রাতঃকালের কাজ, কোলের ছেলেটিকে, কোলে করিয়া রাজপথে বায়ুসেবন করান। তার পর, আপিসের সাহেবের বুট্-মণ্ডিত শ্রীচরণকমলের ভয়ে বেলা নয়টার পূর্ব্বে নাকে মুখে দুই গ্রাস কোন প্রকারে গুঁজিয়া, ধড়াচূড়া বাঁধিয়া বহির্গমন করিতে হয়। সায়ংকালে গৃহে আসিয়া গৃহিণীর কাছে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করেন, থিয়েটরে গিয়া বেশ্যার মুখে উপদেশ লইয়া আসেন, অথবা বৈঠকখানায় বসিয়া আপনারাই লঙ্কাকাণ্ডের সৃষ্টি করেন। ইঁহাদের আত্মবিসর্জ্জন গৃহিণীর শ্রীপাদপদ্মে, সমাজসেবা কেবল বক্তৃতায়, এবং পরোপকার কেবল শুঁড়ির। ধর্ম্মনীতির আর প্রয়োজন নাই, কেননা রাজনীতিবিশারদ হইয়াছেন। সে রাজনীতির অর্থ—তোমরা সকলে টাকা দাও, আমি পার্লামেণ্টে ঢুকিয়া উপলক্ষ করিয়া বিলাতে বসিয়া তাহা উপভোগ করিব। আমি অনন্যোপায় হইয়া ভারতহিতৈষী হইয়াছি; তোমরা আমার খবরের কাগজখানির গ্রাহক হও, অথবা ভারত-ভাণ্ডার নামক আমার নিজ তহবিলে যথাসাধ্য টাকা দাও। এমন স্বার্থসর্ব্বস্ব, বচনবাগীশ, বক্তৃতানবীশ চক্ষুলজ্জাহীন নলিন বাবু অনেক দেখিতে পাই। দেখিতে অনেক পাই বলিয়াই, সে কালের হরিহর বাবুর মতন লোক—সেই বিপন্নের বন্ধু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি—তাঁহাদিগকে মনে পড়ে—মনে পড়িয়া শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠে।

বাস্তবিক আমরা প্রকৃত কার্য্য-বুদ্ধি হারাইয়াছি; হারাইয়া বেজায় বচনবাগীশ হইয়া উঠিয়াছি। প্রাচীনেরা কিছু করিবার ইচ্ছা হইলে একটা না একটা কার্য্য করিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য শিবপ্রতিষ্ঠা করিতেন, গ্রামের জন্য জলাশয় খনন করিতেন, অভ্যাগতের জন্য অতিথিশালা স্থাপন করিতেন, পথিকের জন্য সারিগাছা রোপণ করিতেন, গোষ্ঠী সম্বন্ধের জন্য আত্মীয় কুটুম্বকে অন্নদান করিতেন, সমাজের জন্য বার মাসে তের পর্ব্ব পালিতেন—কুসংস্কার হউক, ভাল হউক মন্দ হউক, একটা কাজ করিতেন। আর আমরা—কি অপূর্ব্ব জীবই যে হইয়াছি!—নিজের জন্য, পরের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, যখনই যাহা কিছু করিতে হয়, বার ভূতে একত্র হইয়া কেবল, হাত পা নাড়িয়া বক্তৃতা করি। এখন বক্তৃতাই কর্ম্ম, বক্তৃতাই ধর্ম্ম, বক্তৃতাই সাধনা, বক্তৃতাই সিদ্ধি। আমরা এমনই বচনবাগীশ হইয়া উঠিয়াছি, যে যাত্রাওয়ালারা পর্য্যন্ত গান ছাড়িয়া বক্তৃতা ধরিয়াছে, এবং আমাদের একটি চিরন্তন আমোদকে ভদ্রলোকের অশ্রাব্য করিয়া তুলিয়াছে। চাষার ছেলে, সাত পুরুষে সরস্বতীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই, কেবল পেটের দায়ে লাঙ্গল ছাড়িয়া যাত্রার দলে মিশিয়াছে—সেও এমন ভাষায় বক্তৃতা করে, যে ভবভূতির চতুর্দ্দশ পুরুষে তাহা কখন শুনে নাই।

কার্য্যবুদ্ধি ত নাই; তাহার উপর আবার বিষম ঔদাসীন্য। যাহার ঘরে আহারের সংস্থান আছে, তিনি যেন এ কার্য্যক্ষেত্রের কেহ নহেন। জীবনের উদ্দেশ্য নাই, গতির লক্ষ্য নাই—সংসার কি, মনুষ্য কি, কর্ত্তব্য কি, সে দিকে দৃক্‌পাত নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, চিন্তা নাই, ভাবনা নাই—নিরুদ্বেগে রূপের কলস বুকে বাঁধিয়া বিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া হাত পা ছাড়িয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন। যে ভাবে জীবন অতিবাহিত করেন, তাহাতে বোধ হয়, আয়ুর যেন শেষ নাই, লোভের যেন সীমা নাই, বাসনার যেন তৃপ্তি নাই; ভোগের যেন অবধি নাই। যেন দেবতার এ পৃথিবী কেবল মনুষ্যের বিলাসভবন বা প্রমোদকানন—যেন এ সংসারে কুসুমের সুষমা, যুবতীর যৌবন, কোকিলের কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন বৈ আর কিছু নাই—কর্ত্তব্য নাই, ধর্ম্ম নাই, দেবতা নাই। যাঁহারা চাকরি করেন, তাঁহারা যেন কলের পুতুল; খান, পরেন, ঘুমান, আপিসে যান—চাকরি বজায় রাখা ব্যতীত জীবনের আর যে কিছু কর্ত্তব্য, আর যে কোন লক্ষ্য আছে, ইহা তাঁহাদের জ্ঞাতব্য তত্ত্বের মধ্যে বলিয়া বোধ হয় না। বিদ্যার্থীর জ্ঞানানুশীলন কলেজ ছাড়া পর্য্যন্ত—একটা উপাধি লইয়া যাই কলেজ হইতে বাহির হইলেন, অমনি পাঁজি পুঁথি বন্ধ করিয়া, সরস্বতীকে বনবাস দিয়া, তাস, পাশা ও খোষগল্পে মন দিলেন। দেখিয়া দেখিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া মনে হয়, বাঙ্গালীর বুঝি হৃদয় নাই। মনে হয়, বাঙ্গালী যে উচ্চ ভাব ব্যক্ত করে, সে কেবল কথার কথা; বাঙ্গালী যে মহান্ সত্যের দোহাই দেয়, সে কেবল তোতা পাখীর কৃষ্ণ নাম; বাঙ্গালী যত কথা বলে, সব কেবল খানিকটা ফাজিল বায়ুর তরঙ্গাঘ-

স্বর। কেহ রাগ করিও না। কিন্তু কৈ, আজি পর্য্যন্ত কাহাকেও ত স্বার্থবিস্মৃত হইতে দেখিলাম না, আত্মবিসর্জ্জনে তৎপর দেখিলাম না—কাহাকেও ত গন্তব্য পথে অবিচলিত, কার্য্যসম্পাদনে উন্মত্ত, মন্ত্রের সাধনে অপরাহত দেখিলাম না। কেবল দেখি—বক্তৃতা আর নিশ্চেষ্টতা। দেখি আমাদের সবই—আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের স্বদেশানুরাগ, আমাদের সমাজনীতি, আমাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সবই বাক্যে পরিণত—সবই কেবল কথার মারপেঁচ। কিন্তু কেবল কথায় কি হইবে? বলি কি ভাই, তোমার বক্তৃতা রাখ, কার্য্যে মন দাও। এ দেবতার পৃথিবী মনুষ্যের কার্য্যক্ষেত্র, বক্তৃতাক্ষেত্র নহে।

মহিলাকুলের প্রতি চাহিয়া দেখি—হায়! হায়! কি ছিল, কি হইয়াছে? সুখসেব্য চন্দনতরু দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। যিনি স্নেহময়ী ছিলেন, তিনি আত্মময়ী হইয়া পড়িয়াছেন; কল্যাণী এখন রঙ্গিণী হইয়াছেন; যাঁহারা গৃহের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা এখন দেয়ালের পেইণ্টিং মাত্র। ব্রতধারিণী বিলাসিনী হইয়াছেন; লক্ষ্মী অপ্সরায় পরিণত হইয়াছেন; যিনি সহধর্ম্মিণী ছিলেন, তিনি এখন—বলিতে দুঃখ হয়—সহশায়িনী মাত্র। সেই যে হাসি অধরপ্রান্ত পার হইলে নয়নপ্রান্তে গিয়া লুকাইত, তাহা আর নাই; এখনকার হাসি কক্ষে কক্ষে তরঙ্গায়িত হয়, রাজপথের বায়ুতে বাহিত হয়। এক দিন চন্দ্র-সূর্য্যে যে মুখ দেখিতে পায় নাই, এখন আগন্তুক গৃহে আসিলে, সেও দেখিতে পায়। সে পাতা-নেকা ফুল আর দেখিতে পাই না। সেই যে—

নয়ন অমৃত নদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজ পতিবিনা কভু অন্য দিকে ধায় না।

তাহা আর নাই। এখন সে নদী সহস্রমুখী—এমন স্থান নাই, যেখানে সে দৃষ্টি প্রসারিত না হয়। যে কণ্ঠধ্বনি সখিকর্ণের বাহিরে যাইতে জানিত না, এখন তাহা সর্ব্বত্রগামী। সে লজ্জা নাই, গৃহধর্ম্মে সে অনুরাগ নাই, সে আত্মবিসর্জ্জন নাই। গৃহসেবা আত্মসেবায় পরিণত হইয়াছে, পতিভক্তির স্থান আলস্যভক্তি অধিকার করিয়াছে, ধর্ম্মানুরাগ নাটকানুরাগে পরিণত হইয়াছে। দেখিয়াছিলাম—

ফুল্ল জ্যোৎস্না পুলকিতাযামিনী।

দেখিতেছি—

ঘোর করাল মেঘে চমকিতা দামিনী।

পূর্ব্বে যাহাদিগকে দেখিয়া নয়ন জুড়াইত, এখন তাহাদিগকে দেখিয়া নয়ন ঝলসিয়া যায় মাত্র। এই সকল আত্মনিরতা, বিভ্রমতৎপরা, রঙ্গপরায়ণা, বিলাসিনীদিগকে দেখিয়া দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়,—পূর্ব্বেকার সেই আত্মবিসর্জ্জিতা, পরার্থপ্রাণা, ধর্ম্মৈকশরণা জগদ্ধাত্রীরূপিণীরা কোথায় গেলেন? আমাদের অদৃষ্ট দোষে—হায়! কেন গেলেন?

অতীতের কথা ভাবিতে গিয়া একটা বড় বিষম দুঃখের কথা মনে আসে। বাল্যক্রীড়ার সঙ্গীদিগকে মনে পড়ে। হতাশনেত্রে চাহিয়া দেখি, তাহারা আর নাই। কাহাকেও নিজের দোষে হারাইয়াছি; কাহাকেও তাহারই দোষে হারাইয়াছি; কাহাকেও হারাইয়াছি, নিজের দোষেও

নয়, তাহার দোষেও নয়—কেবল অদৃষ্ট দোষে। কাহারও ভাবান্তর ঘটিয়াছে—দেখিতে, দেখা দিতে, আগে দিনে দশ বার আসিত; এখন ডাকিলেও আর কথা কয় না। কাহারও অবস্থান্তর ঘটিয়াছে—আগে খুঁজিয়া দেখিতে যাইতাম; এখন খুঁজিলেও দেখা দিতে পারি না। কেহ দেশান্তরে—এক খানা পত্র লিখিয়াও সংবর্দ্ধনা করে না। কেহ লোকান্তরে—তাহার জন্য কাঁদিয়া রাত পোহায় না।

আর একটা বড় মর্ম্মান্তিক কথা, নির্জ্জন নিভৃত গৃহে প্রেতসঞ্চারের ন্যায়, ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে আসিয়া হৃদয়কে অবসন্ন, মৃতপ্রায় করিয়া যায়। অতীত জীবনের সে সুখ-কাহিনী মনে করিয়া আত্মবিহ্বল, আত্মহারা, বিবশ, অবসন্ন হইতে হয়। মনে পড়ে—একটি বালক ছিল; আর একটি বালিকা ছিল—প্রণয়মুগ্ধ, প্রণয়সর্ব্বস্ব, প্রণয়বিহ্বল দুই বালক বালিকা—পরমেশ্বরের মুখ দেখিয়া আপনা ভুলিত, সংসার ভুলিত, ভূতভবিষ্যৎ ভুলিত, সকলই ভুলিত—কেবল এক জন আর এক জনকে ভুলিত না—তাই মনে পড়ে। যখন পরিষ্কার রজনীতে পরিষ্কার আকাশ দেখিয়া, এ ছার মাটীর সংসার পরিত্যাগ করিয়া ছায়াপথে বিচরণ করিতে সাধ হইত—সেই কথা মনে পড়ে। তার পর কালের স্রোত বহিয়া গিয়াছে। এখন সে সকল যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। বোধ হয় যেন, কোন বসন্তরাজ্যে, কোন স্ফুটনোন্মুখ কুসুমশোভিত, কুসুমসুবাসিত, কুসুম-সৌরভ-শীতল নিভৃতকুঞ্জে, সেই স্ফুটনোন্মুখ কুসুমের স্বহস্তগ্রথিত মালা, সেই স্ফুটনোন্মুখ কুসুমাধিক সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা জীবন্ত কুসুমরূপিণী কোন এক সুরবালার কণ্ঠে পরাইতে পরাইতে বসন্তপ্রদোষে একটা বাসন্তী স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। তাহার পর, সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সেই সঙ্গে জীবনও অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। সেই স্বপ্নভঙ্গের পর তেমন ফুল আর ফুটে নাই, তেমন বাতাস আর বহে নাই, তেমন সৌরভ আর ছুটে নাই, তেমন পাখী আর ডাকে নাই, তেমন জ্যোৎস্না আর হাসে নাই। কিন্তু দূর হউক! অতীতের কথায় আর কাজ নাই। সে কথা ভাবিতে গেলে আপনাকে আপনি স্থির রাখিতে পারি না। জগদীশ্বর! শান্তি দাও।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

জাতিপ্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত।

১।

পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে—নিপীড়ন ও নির্যাতনের ভয়াবহ কালে ভারতের দুই প্রান্তে দুই বার জাতিপ্রতিষ্ঠার আবির্ভাব হইয়াছিল। দুই বার দুইটি অলোকসাধারণ বীরপুরুষ আপনাদের অসাধারণ ক্ষমতায় দুইটি নিরীহ ও নিষ্ক্রিয় জাতিকে বীরত্ব-

বৈভবে গৌরবান্বিত ও বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। এই দুই বীর-পুরুষের বীরত্ব-কীর্ত্তির বিবরণ ভারতের ইতিহাসে অক্ষয়-অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ইহাদের একজন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুদূর দক্ষিণাপথে মোগলশাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। অপর জন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুজয়ী পাঠানদিগকে নির্জ্জিত করিয়া পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে হিন্দুরাজশক্তি গৌরবান্বিত করিয়া তুলেন।

ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে পশ্চিম-শৈলমালা-পরিবৃত পবিত্রক্ষেত্রে যখন মহাশক্তিসম্পন্ন শিবজীর আবির্ভাব হয়, তখন মোগল সাম্রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। আওরঙ্গজেবের আধিপত্য ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সর্ব্বত্রই বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা এক সময়ে সাহসে ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিলেন, বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়া অনন্ত কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সন্তানগণ তখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ হইতেছিলেন, এবং স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া পরের আনুগত্য স্বীকার যেন আপনাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেছিলেন। যে তেজস্বীতায় পৃথ্বীরাজ তিরোরিক্ষেত্রে অজেয় হইয়াছিলেন, সমরসিংহ আত্মপ্রাণ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া বিধর্ম্মী শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং শেষে প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ দীর্ঘকাল প্রবল পরাক্রম ও সহায়সম্পন্ন শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া বিজয়লক্ষ্মীতে পরিশোভিত হইয়াছিলেন, তখন সে তেজস্বিতা ও স্বাধীনত্বপ্রিয়তা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছিল। বীরশ্রেষ্ঠ জয়সিংহ তখন মোগলের আদেশলিপির নিকট আত্মমস্তক অবনত করিতেছিলেন। পরাক্রান্ত যশোবন্তসিংহ তখন সিন্ধুনদের অপর পারে দুরন্ত আফ্‌গানদিগের মধ্যে মোগলের কার্য্য সাধনে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। আর তেজস্বী রাজসিংহ ক্ষমতাশালী মোগলের নিকট যথোচিত বিনয় ও শীলতার সহিত জিজিয়া কর রহিত করিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন। সুতরাং এই সময়ে আওরঙ্গজেবের প্রতাপ সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ ছিল।

বাবর সাহ যখন মধ্য এসিয়া হইতে পঞ্জাবে সমাগত হন, তখন তাঁহাকে দীর্ঘকাল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে আত্মপ্রাধান্য স্থাপন করিতে হইয়াছিল। তদীয় পুত্র হুমায়ুন পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেও শত্রুর সন্তাড়নে ষোল বৎসর কাল হীনবেশে দেশান্তরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আকবর অবাধ্য আমীরদিগকে বশীভূত করিয়া মোগলসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে কষ্টের একশেষ ভুগিয়াছিলেন। আপনার সেনাপতির বিদ্রোহে জাহাঙ্গীরকে যার পর নাই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। তনয়দিগের আত্মকলহে সাজাহান জীবনের শেষ অবস্থায় আত্মসন্তোষে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। পরিশেষে ইহাঁদিগের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন পুত্রকর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া অন্তিমে অনন্ত সন্তাপানলে বিদগ্ধ হইতেছিলেন।

এইরূপে মোগল সম্রাটগণের প্রত্যেক-কেই সাম্রাজ্যের অন্তর্বিদ্রোহ দমনে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু যখন আওরঙ্গজেব শাসনদণ্ড পরিগ্রহ করেন, তখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ নির্জ্জিত ও নিহত হইয়াছিলেন। আমীর ও ওমরাহগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, রাজস্থানের বীর্য্যবন্ত রাজপুতগণ মোগলের সরকারে চাকরি গ্রহণ করিয়া তাঁহার আদেশ পালনে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। কাবুলের পার্ব্বত্য-প্রদেশে, আর্য্যাবর্ত্তের সমৃদ্ধক্ষেত্রে, দক্ষিণা-পথের বিশাল ভূমিতে, মোগলের অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত পতাকা অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে উড়িতে-ছিল। আওরঙ্গজেব এরূপ বিস্তৃত সাম্রা-জ্যের অধিপতি, এরূপ প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী ও এরূপ বীরপুরুষগণের অধি-নায়ক হইয়াও আপনি আপনার সাম্রাজ্য বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলেন। আর শিবজী এইরূপ প্রতাপান্বিত সাম্রাজ্যের মধ্যেও স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন।

আওরঙ্গজেব বিশাল সাম্রাজ্যের অধি-কারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় বিশালভাবে পূর্ণ ছিল না। সমবেদনা বা সম্প্রীতি তাঁহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে অধিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় নাই; দয়া বা ন্যায়পরতা তাঁহাকে আত্মমহত্ত্ব বিস্তারে প্রবর্ত্তিত করে নাই। তিনি অতি সঙ্কীর্ণহৃদয় ও অতি ক্রূরপ্রকৃতি ছিলেন। লোভের পরিতর্পণ জন্য তিনি বৃদ্ধ পিতা-কেও কারারুদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই; জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদরদিগকেও নিহত করিতে কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার রাজ্যে সকলই গভীর আশঙ্কা ও উদ্বেগের তরঙ্গে আন্দোলিত হইত। তাঁহার কার্য্যপরম্পরা সর্ব্বত্রই সকল হৃদয়ে গভীর ভীতির সঞ্চার করিয়া দিত। তিনি একদিন যাহাকে হৃদয়ঙ্গম বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করি-তেন, আর একদিন তাহারই উদীয়মান ক্ষমতায় সন্ত্রস্ত হইয়া তাহাকে গুরুতর শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। আপনার পুত্রদিগের প্রতিও তাঁহার স্নেহ বা মমতা ছিল না। তিনি পিতার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া-ছিলেন, তদীয় পুত্রেরাও তাঁহার সহিত সেই রূপ ব্যবহার করিবে বলিয়া তিনি সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন, দিবসে তাঁহার শান্তি ছিল না; রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা ছিল না। প্রমোদেও তাঁহার চিত্ত বিনোদন হইত না। তিনি সর্ব্বদাই চিন্তিত, সর্ব্বদাই শঙ্কান্বিত, ও সর্ব্বদাই মহান্ বিশ্ববিপ্লবের ভয়ঙ্করী বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত থাকিতেন।

যশোবন্ত সিংহ তাঁহার কার্য্যে কাবুলে গিয়াছিলেন; প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে এই পরাক্রান্ত রাঠোর বীরের কিছুমাত্র ঔদাসীন্য ছিল না। ইহাঁর পরাক্রমে ও ইহাঁর ক্ষম-তায় আওরঙ্গজেব অনেক বার অনেক বিঘ্ন বিপত্তি হইতে বিমুক্ত হন। যদি আও-রঙ্গজেবের হৃদয় প্রশস্ত হইত, আর নিষ্ঠা যদি তাঁহাকে জীবনের মহত্ত্বের পথে পরি-চালিত করিত, তাহা হইলে এই ক্ষমতাশালী রাঠোর বীর দীর্ঘকাল তদীয় প্রভুর সুখ সৌভাগ্যের প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকি-তেন। কিন্তু সঙ্কীর্ণবুদ্ধি, নির্দ্দয় আওরঙ্গ-জেব ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। তিনি পরাক্রান্ত রাঠোরের পতন

দেখিতে উৎসুক হইলেন। তাঁহার আদেশে বা চক্রান্তে বিষপ্রয়োগে সুদূর কাবুলে যশোবন্তের প্রাণবায়ুর অবসান হইল। যশোবন্তের বিধবা পত্নী ও নিরাশ্রয় সন্তানের প্রতি তিনি কঠোরতার একশেষ দেখাইলেন। রাজপুতগণের হৃদয় ক্রোধে অপমানে কালীময় হইয়া উঠিল।

যে রাজ্যে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় একত্র অবস্থিতি করে, সে রাজ্যের রাজার ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সমদর্শিতা থাকা আবশ্যক। কিন্তু আওরঙ্গজেবের এরূপ সমদর্শিতা ছিল না। তিনি মুসলমানধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া অকারণে হিন্দুদিগের নির্যাতন করিতেন। হিন্দুদিগকে নিপীড়িত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবার জন্যই তিনি জিজিয়াকরের প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুসমাজের পরিচালক হিন্দুকুলশ্রেষ্ঠ রাণা রাজসিংহ তাঁহাকে এই অপকার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি অনুচিত ধর্ম্মান্ধ হইয়া এই সদুপদেশে কর্ণপাত করেন নাই। প্রত্যুত তিনি রাজসিংহকে শত্রু ভাবিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আওরঙ্গজেবের সন্দিগ্ধতায় যখন সমগ্র ভারত এই রূপ ভীতিগ্রস্ত, আওরঙ্গজেবের অনুদারতায় যখন সমগ্র ভারতের হিন্দু ও মুসলমান এইরূপ মর্ম্মাহত, ইহার উপর আওরঙ্গজেবের ধর্ম্মান্ধতায় যখন সমগ্র ভারতের হিন্দুধর্ম্মসম্প্রদায় এইরূপ নিপীড়িত, তখন সুদূরবর্ত্তী পশ্চিম শৈলমালার শিখরদেশ হইতে বীরপ্রবর শিবজীর বিজয়ভেরীর গভীর নিনাদ সমুত্থিত হয়। শিবজী যখন এই দুর্দ্দান্ত মোগলের কঠোর শাসন, মর্ম্মভেদী নিষ্পেষণের মধ্যে হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং আপনার অলোকসাধারণ সাহস ও অনির্ব্বচনীয় তেজস্বিতায় হিন্দুজয়ী মুসলমানের সমক্ষে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গ করিলেন, তখন হিন্দুগণ তাঁহাকে বিস্ময়-স্তিমিত নেত্রে স্বদেশের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দক্ষিণাপথের নিরীহ কৃষাণগণ তাঁহার তেজস্বিতায় অনুপ্রাণিত হইয়া বীরপুরুষের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইতে লাগিল। আওরঙ্গজেবের কঠোর শাসন হইতে নিষ্কৃতি লাভের অভিপ্রায়ে তাহারা হিন্দুবীরের পক্ষ সমর্থনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। শিবজী ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভীকচিত্তে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সাধনা যেরূপ মহীয়সী ছিল, সিদ্ধিও সেইরূপ গরীয়সী হইয়া উঠিল। তিনি রায়গড়ের উন্নতশৃঙ্গে বেদজ্ঞ গঙ্গাভট্টের মন্ত্রপূত সলিলে যথাবিধি অভিষিক্ত হইলেন। বীরপুরুষের লোকাতীত বীরত্বে মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল।

আওরঙ্গজেবের উদারতা থাকিলে তিনি সহজেই এই বীরপুরুষের সহিত মিত্রতাবন্ধন করিয়া আপনার রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন। রাজপুতসেনানী জয়সিংহ যখন শিবজীর দমনের জন্য দক্ষিণাপথে উপনীত হন, তখন শিবজী তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে বিমুখ হন নাই। তিনি জয়সিংহের উপস্থিতিতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া একাকী তাঁহার শিবিরদ্বারে গিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন। জয়সিংহ বীরপুরুষোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি

বীরধর্ম্মের গৌরব হরণ করেন নাই। জয়-সিংহ মহারাষ্ট্রপতিকে আপনার শিবিরে সমাগত দেখিয়া যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। শিবজী রাজপুত-বীরের এইরূপ সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া সম্রাটের সহিত সন্ধি বন্ধনে সম্মত হন। শেষে জয়সিংহের অনুরোধে তিনি যখন দিল্লীতে উপস্থিত হন, তখন সম্রাট তাঁহার পদোচিত অভ্যর্থনা করেন নাই। তাঁহার গৌরব রক্ষণ করিতেও উন্মুখ হন নাই। তেজস্বী বীর পুরুষ এই অপমান সহিতে পারেন নাই। তিনি অপূর্ব্ব তেজস্বীতার সহিত সম্রাটের সভামণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন এবং অপূর্ব্ব কৌশলে দিল্লী হইতে দক্ষিণাপথে উপনীত হইয়া দুর্দ্দান্ত মোগলের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিয়া স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালন করেন। আর্য্য বীরের কীর্ত্তিতে আর্য্যভূমি গৌরবান্বিত হয়।

আওরঙ্গজেবের সমদর্শিতা ও উদারতার অভাবে, তদীয় সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের যেরূপে অধঃপতন হয়, তাহা পূর্ব্বপ্রদর্শিত চিত্রে কিয়দংশে বুঝা যাইবে। আওরঙ্গজেব প্রাধান্য রক্ষার জন্য দক্ষিণাপথে যেরূপ বিশালসৈন্যদল একত্র করেন, তাহার পূর্ব্বে অন্য কোন সম্রাট সেরূপ মহা-বিশাল সৈন্য সংগ্রহে সমর্থ হন নাই। সম্রাট কেবল তরবারিদ্বারা সাম্রাজ্য শাসনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু জন সাধারণের তরঙ্গায়িত হৃদয় এই তরবারির বলেও স্থিরীকৃত হয় নাই। সমদর্শিতা ও সম্প্রীতি যে স্থলে সহজে সমস্ত দেশকে সম্রাটের অনুরক্ত করিতে পারিত, বিদ্বেষ ও বিরাগের সহিত ভয় প্রদর্শন সে স্থলে সকলকে অধিকতর উত্তেজিত, অধিকতর সংক্ষোভিত, ও অধিকতর বিরক্ত করিয়া তুলে। জনসাধারণের এইরূপ বিরাগের আবেগে আওরঙ্গজেবের দক্ষিণাপথস্থিত বিশাল অক্ষৌহিণীর অধঃপতন হয়। মহা-রাষ্ট্ররাজ্য এদিকে প্রবল পরাক্রমে সম্রাটকে ভীত ও চমকিত করিয়া তুলে। যাঁহার সমক্ষে তেজস্বী বীরপুরুষ বা অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞেরও বাক্যস্ফুট হইত না, শেষে তিনিই চারিদিকে আপনার প্রাধান্য ও ক্ষমতার শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া, অহমদ-নগরের নির্জ্জনগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দুঃসহ মনোযাতনায়, গভীর অনুশোচনায় এই স্থানেই তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দক্ষিণাপথে এই-রূপে হিন্দুজয়ী মুসলমানের সমক্ষে স্বাধীন হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার এক শতাব্দী পরে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরাংশে আর একটি হিন্দুরাজশক্তি আবির্ভূত হইয়া প্র-তাপে ও প্রাধান্যে সকলকে চমকিত করিয়া তুলে। সে কথার আলোচনা বারান্তরে করা যাইবে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

বল্লভপুর।

সার্দ্ধদ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বে বল্লভপুর গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না। কথিত আছে যে, প্রায় অষ্টম পুরুষকাল বিগত হইল, রুদ্ররাম পণ্ডিত নামক এক ব্রাহ্মণ শ্রীরামপুরের অনতিদূরবর্ত্তী চাতরা গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে বাস করিতেন। তাঁহার মাতুল ঐ গ্রামের এক জন বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। ইষ্টদেব গৌরাঙ্গদেবের প্রতিমূর্ত্তি তদীয় গৃহে গৃহদেবতার স্থান অধিকার করিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রুদ্ররাম স্বয়ং ঐ দেব-প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতেন। একদা রুদ্ররামকে গৌরাঙ্গদেবের পূজা করিতে দেখিয়া তাঁহার মাতুল অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, 'তোমার এখনও পূজার অধিকার হয় নাই, তুমি কেন পূজা করিতেছ?' এই বলিয়া তাঁহাকে যথোচিত ভৎর্সনা করিলেন। এইরূপে ভৎর্সিত হওয়াতে রুদ্ররামের মনে অত্যন্ত ধিক্কার জন্মিল;—তিনি মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া বল্লভপুরে গমন করিলেন। তৎকালে এই স্থান কেবল জঙ্গলময় ছিল—লোকের বসতি ছিল না। তিনি বনমধ্যে উপস্থিত হইয়া আপন ইষ্টদেবতার একটি প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত এবং মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহা তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

যখন রুদ্র পণ্ডিত এইরূপ যোগে অভিভূত, তখন স্বয়ং রাধাবল্লভ একদা যোগীবেশে স্বপ্নে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, 'তুমি বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় নগরে গমন কর, তথায় নবাবের অন্তঃপুরস্থ গৃহদ্বারের উপরকার প্রাচীরে এক খানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর সংলগ্ন দেখিতে পাইবে। ঐ প্রস্তরখানি মধ্যে মধ্যে ঘামিয়া থাকে। সে খানি আনয়ন করিয়া তাহাতে তোমার ইষ্টদেবতার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।'

এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া রুদ্ররাম পণ্ডিত গৌড় নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে নবাবের প্রিয়মন্ত্রী একজন গোঁড়া হিন্দু ও অতিশয় দেবভক্ত আছেন। রুদ্ররাম রাধাবল্লভের দৈববাণী মন্ত্রীর নিকট প্রকাশ করাতে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেবাজ্ঞা পালন করিতে তাঁহার সাধ্যমত ত্রুটি হইবে না। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরখানি ঘামিতে আরম্ভ হয়। এই ঘটনাতে রাজপ্রাসাদে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। ঘটনাক্রমে নবাব এই সময়ে সেই দিক দিয়া গমন করিতেছিলেন; তিনি এই ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। মন্ত্রী সুযোগ পাইয়া নবাবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রস্তর হইতে যে জলবিন্দু নির্গত হইতেছে, উহা প্রস্তরের অশ্রুজল ব্যতীত আর কিছুই নহে; এরূপ হওয়া অত্যন্ত কুলক্ষণ। অতএব এই প্রস্তরখণ্ড শীঘ্র রাজপ্রাসাদ হইতে বিদূরিত করা নিতান্ত আবশ্যক।

মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ঐ প্রস্তরখানি ভাগীরথীসলিলে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহাতে রুদ্ররামের আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু কি প্রকারে ঐ প্রস্তরখানি লইয়া যাইবেন এই ভাবিয়া তাঁহার আনন্দে বিষাদ

উপস্থিত হইল—কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে তাঁহার প্রতি দৈববাণী হইল যে, তুমি এক্ষণে বল্লভপুরে চলিয়া যাও এবং তথায় যাইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ঐ প্রস্তরের উপস্থিতির অপেক্ষা করিতে থাক, উহা আপনিই গিয়া উপস্থিত হইবে।'

রুদ্ররাম দেবাজ্ঞানুসারে বল্লভপুরে প্রত্যাগত হইলেন—আসিয়া প্রস্তর আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রুদ্ররাম বল্লভপুরের যে বাঁধাঘাটে প্রত্যহ স্নান করিতেন, এক দিন যেমন মনের উদ্বিগ্নতায় ঐ ঘাটের সোপানাবলী অবতরণ করিয়া স্নানে নিযুক্ত হইবেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, রাধাবল্লভের কৃপায় ঐ প্রস্তরখানি অসম্ভাবিত রূপে ভাসিয়া আসিয়া ঘাটে লাগিয়াছে। এই অপৌরুষেয় ঘটনায় রুদ্ররামের আনন্দের পরিসীমা রহিল না,—সানন্দে জয় জয় ধ্বনি করিতে করিতে ঐ প্রস্তর স্বস্থানে লইয়া গেলেন।

রুদ্ররাম কালবিলম্ব না করিয়া অতি ত্বরায় এক সুনিপুণ ভাস্কর আনাইয়া রাধাবল্লভমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিলেন, এবং স্বয়ং তত্ত্বাবধারকের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনতিকালমধ্যেই এক সুন্দর সুঠাম দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত হইল। ঐ মূর্ত্তিটি সৌন্দর্য্যের জন্য এতদ্দেশে বিখ্যাত—এরূপ সুন্দরমূর্ত্তি কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। রাধাবল্লভের মাহাত্ম্য ক্রমশঃ দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। লোক জন আসিয়া এই স্থানে বসতি করিতে লাগিল, এবং ভক্তগণ ও দর্শকবৃন্দ দলে দলে দর্শন করিতে আসিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে বলা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরখণ্ড হইতে তিনটী দেবমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, যথাঃ—বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, খড়দহের শ্যামসুন্দর, এবং সাঁইবনার নন্দদুলাল।

এই রূপ কিম্বদন্তী আছে যে, মুর্শিদাবাদের নবাবের কোন প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারী চিৎপুরস্থ নবাবের নিকট আগমন কালে অকস্মাৎ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই শ্রীরাধাবল্লভমূর্ত্তি দর্শন করেন। এইরূপ সুন্দর দেবমূর্ত্তি সন্দর্শনে তাঁহার হৃদয় ভক্তি ও প্রেমে আপ্লুত হইয়া উঠে। নবাব-দরবারে তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। স্বীয় ক্ষমতাপ্রভাবে ও কৌশলক্রমে তিনি আকনা[১] ও মাহেশ এই উভয় গ্রাম হইতে কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া রাধাবল্লভের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম বল্লভপুর রাখেন। সে সময়ে ঐ গ্রামের রাজস্ব বার্ষিক অষ্টাদশ মুদ্রামাত্র নির্দ্ধারিত হয়। বহুকাল—প্রায় দেড় শতাব্দী—পরে কলিকাতাস্থ রাজা নবকৃষ্ণ এই গ্রাম ভারজাই তালুক করিয়া দেন।

১৫৯৯ শকাব্দায় কলিকাতানিবাসী মৃত নয়ানচাঁদ মল্লিক উক্ত দেবপ্রতিমূর্ত্তির জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। সেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও ভাগীরথীতীরে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই মন্দির পূর্ব্বে ভাগীরথীর তীর হইতে অনেক অন্তরে ছিল। যে সময়ের কথা হইতেছে সে সময়ে

১ এই আকনা শ্রীরামপুরের পার্শ্ববর্ত্তী একটী গ্রাম। যে আকনা হইতে আকনায় ঘোষ হইয়াছে এ আকনা সে আকনা নহে।

এই স্থানে ভাগীরথীর প্রশস্ততা এত অল্প ছিল যে, এ পারের মনুষ্য নদীতীরে বসিয়া অপর তীরের লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত। কিন্তু ভাগীরথিস্রোত বল্লভপুরের দিকে প্রবল হওয়া প্রযুক্ত ভাঙ্গনে এই দিকের পাড় গঙ্গাগর্ব্ভে নিহিত হয়। ফলে বল্লভপুরও ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে সরিয়া আইসে, এবং শ্রীমূর্ত্তিকেও স্থানান্তরে যাইতে হয়।

মার্সম্যান সাহেব বলেন যে, 'রাধাবল্লভের আয় বৃদ্ধি হইয়া যখন কিঞ্চিৎ সম্বল হইল, সেই সময়ে রুদ্ররাম পণ্ডিত একটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। তৎকালে শ্রীরামপুর প্রবেশ করিতে, দক্ষিণ দিকে ঐ বৃহদাকার মন্দির একটি সুরম্য দৃশ্য ছিল। কাল সহকারে বল্লভপুরের নদীতীরস্থ ভূমি ভাগীরথীর গর্ব্ভে নিহিত হওয়ায়, এবং ভাগীরথীর স্রোতের সীমা হইতে দুই শত হস্তের মধ্যে মন্দিরের সীমা পড়াতে, রাধাবল্লভের মন্দির সে স্থান হইতে স্থানান্তরে নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। এইরূপ স্থানান্তরে মন্দির নির্ম্মাণ করিবার কারণ এই যে, হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পবিত্রতোয়া ভাগীরথীর প্রবাহিত স্রোত হইতে দুই শত হস্তের মধ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে দান গ্রহণ করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। শাস্ত্রের এই শাসন প্রযুক্ত অনেক ধনী ব্যক্তি ভাগীরথিতীরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন না।' মার্সম্যান সাহেব আরও বলেন যে, উক্ত মন্দির হইতে রাধাবল্লভের স্থানান্তরে গমনের পর ঐ মন্দির রেভারেণ্ড ডেভিড্‌ব্রাউন্ (Reverend David Brown) সাহেব ক্রয় করিয়া লয়েন। এবং ঐ নূতন মন্দির কলিকাতাস্থ কোন ধনী মল্লিকদিগের দ্বারায় নির্ম্মিত হয়।'[২]

প্রথম মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ১৮৮৫ শকাব্দায় মৃত গৌরচরণ মল্লিক কর্ত্তৃক বর্ত্তমান মন্দির যে নির্ম্মিত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উক্ত মহাত্মা কর্ত্তৃক রাধাবল্লভের সেবার নিমিত্ত দৈনিক দুই টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে মাহেশস্থ জগন্নাথ বর্ষে বর্ষে রথারোহণে আগমন করিয়া বল্লভপুরে রাধাবল্লভের মন্দিরে এক সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিতেন। ১২৫৭ সালে প্রণামী লইয়া উভয় পক্ষীয় অধিকারীগণের মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত হয়; তাহাতে জগন্নাথের অধিকারীরা পর বৎসরে আর উক্ত দেবমূর্ত্তিকে বল্লভপুরে আনয়ন করিলেন না। এই হেতু রাধাবল্লভের অধিকারীগণ, লাভের খর্ব্বতা হইল বিবেচনা করিয়া, কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারায় এক নূতন জগন্নাথ প্রতিমূর্ত্তি ও এক খানি বৃহৎ রথ পরবৎসরে নির্ম্মাণ করাইয়া লইলেন। সেই অবধি মাহেশ ও বল্লভপুরে দুই গুণ্ডিচাবাটী (গুঞ্জবাড়ী) হইতেছে।

ইঙ্গরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ কালে বঙ্গদেশে অসীম ক্ষমতাশালী শোভাবাজারস্থ রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধের সময় তাঁহার মনে এই রূপ খেয়াল হইল যে, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, খড়দহের শ্যামসুন্দর, এবং বল্লভপুরস্থ রাধাবল্লভ এই তিন দেবমূর্ত্তিকে তাঁহার রাজভবনে আনয়ন

---

২ Vide Calcutta Review. Vol. II. pp. 493-494.

করেন। তাঁহার দেশব্যাপী ক্ষমতার প্রভাবে সে কার্য্য সহজেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। সমারোহাবসানে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ এবং খড়দহের শ্যামসুন্দর এই উভয় দেবমূর্ত্তিকে তাঁহাদের নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু বল্লভপুরস্থ রাধাবল্লভের সুন্দর গঠন ও সুঠাম মূর্ত্তি সন্দর্শনে তাঁহাকে এক বৎসরকাল রাজনিকেতনে রাখিলেন। ক্রমে দিবসের পর দিবস যাইতে লাগিল, কিন্তু তিনি ঐ দেবমূর্ত্তি প্রত্যর্পণের কোন ভাবই প্রকাশ করিলেন না—ফলে ঐ মূর্ত্তি নিজস্ব করিবার জন্য অধিকারিদিগকে যথেষ্ট অর্থ দিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কথিত আছে যে রাজা দশ বার সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত প্রদানে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু অধিকারিগণ তাঁহাদের পৈত্রিক বিগ্রহ পরিত্যাগ করিতে কোনমতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য রাজার নিকট বারম্বার অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না।

বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত হইলে উহা সহজেই প্রত্যর্পিত হইত, কিন্তু তাহাতে অধিকারিদিগের অখ্যাতি দেশময় পরিব্যাপ্ত হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহারা উহা হইতে বিরত হইলেন। অবশেষে কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া,—বালক এবং মহিলাগণের যেমন শেষ অস্ত্র—ক্রন্দন, সেইরূপ ব্রাহ্মণদিগের শেষ অস্ত্র—সর্ব্বধ্বংসকারী ব্রহ্মশাপ ধনুকে যোজনা করিলেন। এই বার্ত্তা তাড়িৎবার্ত্তাবৎ রাজান্তঃপুরে রাজ্ঞীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তৎশ্রবণে রাজ্ঞী ভয়ানক ভীতা হইলেন—কি সর্ব্বনাশ! ব্রহ্মশাপে নিমেষমধ্যে রাজবংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। ফলে রাজাকে উক্ত দেবমূর্ত্তি প্রত্যর্পণে সম্মত করিতে রাজ্ঞীকে অনুনয় বিনয় ক্রোধ ও ক্রন্দন প্রভৃতি কামিনীজনের কোমল-কঠোর অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। সময় বিশেষে দোষগুণ উভয়বিধ বর্ণনাই প্রস্তাবলেখকদিগের কর্ত্তব্য। ফলতঃ এস্থলে রাজার মহত্ত্বের পরিচয় না দেওয়া নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। রাজা দেবমূর্ত্তি প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তদীয় [illegible]তার প্রকৃত পরিচয় দিলেন—রাধাবল্লভের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অধিকারিদিগকে বল্লভপুর দান করিলেন। এইস্থানের বার্ষিক আয় প্রায় আট শত টাকা। রাজা নবকৃষ্ণের ন্যায় ব্যক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত হওয়াতে বল্লভপুরের রাধাবল্লভের খ্যাতি দেশময় প্রচারিত হইল। এতদ্দেশীয় বর্ত্তমান সম্পত্তিশালী দেবালয় সকলের মধ্যে বল্লভপুরের রাধাবল্লভের মন্দিরও প্রসিদ্ধ।

কলিকাতা বৌবাজারনিবাসী শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভগ্নী আনন্দময়ী ঠাকুরাণী ১২৪৫ সালে বল্লভপুরের ঘাট প্রস্তুত করাইয়া দেন। পার্শ্বে দুইটি নহবৎখানা আছে, কলিকাতানিবাসী ৺মতি মল্লিক তাহার উপরে এক রাসমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। উহার উপরে রাধাবল্লভজী তিনদিবস রাসে উপবেশন করেন। ঐ সময় বড় ধুমধাম হইয়া থাকে।

রুদ্ররাম পণ্ডিত বিবাহ করেন নাই, সেই হেতু তদীয় ভ্রাতা রতিরাম চক্রবর্ত্তীর সন্তানেরা শ্রীরাধাবল্লভের সেবা গ্রহণ

করিয়া ছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহারা ঐ মঠের অধ্যক্ষ। রুদ্রপণ্ডিত এবং তাঁহার ভ্রাতা রতিরাম কর্ত্তৃক বল্লভপুরের লোকবসতি হয়। সেই হেতু রতিরামের বংশ অদ্যাপিও বল্লভপুরের দলপতি নামে খ্যাত।ঃ ইঁহারা প্রথমে সুবর্ণবণিকের দানগ্রহণ করিয়া পতিত হইয়াছিলেন, পরে চতুঃসাগরী করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কন্যা দান করিয়া গোষ্টিপতি হইয়াছেন। ইঁহারা রাধাবল্লভদেবের সেবাইৎ বলিয়া জমিদারী প্রভৃতি সমস্ত সম্পত্তি ভোগদখল করিতেছেন।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

৩ যে রুদ্ররাম মেলবন্ধন করেন, ইনি সে রুদ্ররাম নহেন। পাঠকের যেন ঐরূপ ভ্রম না হয়।

শৈশব-তত্ত্ব।

শিশু-পরীক্ষা।

যত রোগী চিকিৎসা করা যায়, তাহাদিগের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ শিশুরোগ; এবং শিশুপীড়া অনেক সময় এত বিপদজনক ও সাংঘাতিক হইয়া থাকে যে জন্মাইবার এক বৎসর মধ্যে প্রত্যেক পাঁচটীর ভিতর একটি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক তিনটির মধ্যে একটি মরিয়া যায়। এই কারণে শিশুদিগের পীড়ার প্রতি চিকিৎসকের বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। শিশুপীড়া, যত সামান্য হউক না, অবহেলা করা কখনই উচিত নহে। শিশুদিগের ইন্দ্রিয়গণের পরস্পরে সাহানুভূতি অতিশয় প্রবল। এই কারণে একটি ইন্দ্রিয় পীড়িত হইলে অন্য গুলি সহজেই সাহানুভূতি (sympathy) প্রকাশ করিয়া উত্তেজিত ও কতক পরিমাণে বিকৃত ভাব ধারণ করে; এমন কি স্থানীয় পীড়ার প্রভাব সমস্ত দেহে সঞ্চালিত হয়। এই জন্য অনেক সময় পীড়ার উৎপত্তির স্থান নির্দ্দেশ করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে।

পূর্ণ যৌবন অবস্থায় মনুষ্যের ঐন্দ্রিক কার্য্য অদ্য যে রূপ ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, সুস্থ শরীর থাকিলে দুই, চারি, দশ বা বিশ বৎসর পরে সেই কার্য্য সমভাবে চলিয়া আইসে; কিন্তু শিশুর ঐন্দ্রিক ক্রিয়া আজ যেরূপ ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, কিছু দিন পরে তাহার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। শিশু ক্রমান্বয়ে শ্বাস-কার্য্য, অনুভব ও চিন্তা করিতে শিক্ষা করে। প্রত্যহ তাহার দেহ বর্দ্ধিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। এই কারণে শিশু পীড়িত হইলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই অবস্থারই অপকার সাধিত হইতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় দন্ত নির্গম অবস্থায় শিশুর দেহে অনেক প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই দুই অবস্থা শিশুর পক্ষে অতিশয় বিপদজনক ও ভয়াবহ। এই দুই অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে শিশু অনেক পরিমাণে বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে।

যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থার রোগীকে যেরূপে

রক্ষা করিতে হয়, শিশুচিকিৎসায় সে রূপ করিলে চলিবে না। শিশুপরীক্ষা অতিশয় কঠিন। শিশুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় না; কথা কহিতে পারিলেও তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ ফললাভ হয় না। শিশুর মুখাকৃতি ও ভাব দেখিয়া অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। কিন্তু শিশু যদি খিট্‌খিটে হয়, তাহা হইলে তাহার দিকে তাকাইলেই মুখের ভাব সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়; নাড়ী দেখিতে গেলে ভয়ে জড়-সড় হইয়া হাত সরাইয়া লয়। বুক পেট কিম্বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। অনেক চিকিৎসক শিশুদিগের ভাবগতিক সুন্দর রূপে শিক্ষা করেন না; সেই জন্য তাঁহাদিগকে শিশুরা দেখিলে কাঁদিয়া উঠে।

শিশুরা কথা কহিতে না পারিলেও তাহা-দিগের এক প্রকার ভাষা আছে; যদি শিশু-রোগের সুচিকিৎসা করিবে, তবে শিশু-দিগের এই ভাষা শিক্ষা কর। এই ভাষা কেবলমাত্র কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা প্রদর্শিত হয়, এবং এই গুলি শিক্ষা করিতে হইলে ধৈর্য্য ও বহুদর্শন আবশ্যক। অমনোযোগী ও অধৈর্য্যশালী চিকিৎসক এবং যাহারা শিশুপ্রিয় নহে, তাহারা কখনই শিশু-ভাষা শিক্ষা করিতে পারে না। যে সকল চিকিৎ-সক শিশুপ্রিয় অর্থাৎ শিশুদিগকে ভাল বাসেন, শিশুরা তাঁহাদিগকে দুই একবার দেখিলেই ভাল বাসিয়া থাকে। শিশুরা পীড়িত হইলে কথা কিম্বা চিহ্ন (signs) দ্বারা প্রিয়জনকে মনের ভাব ব্যক্ত করে। শিশুর ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিবে। শিশুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তাহার মাতা বা অন্য কোন লোকের নিকট ধীরে ধীরে রোগবিবরণ গ্রহণ করিবে। হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করিলে কিম্বা উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে শিশু যদি ভীত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কোন মতে সান্ত্বনা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। চিকিৎসক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হইলে শিশু কোন মতে প্রকৃতিস্থ হয় না। শিশু ভীত হইয়া ক্রন্দন করিলে মুখ রক্তিমা-বর্ণ ও নাড়ীর গতি বৃদ্ধি এবং মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। শিশুকে প্রকৃত ভাল বাসিলে, অল্পদিনেই চিকিৎসক শিশু-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন।

নম্রভাব ও নম্রস্বর, পীড়িতদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ শিশুদিগের পক্ষে উপ-যোগী। যাহাতে শিশু ভীত না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইয়া কার্য্য করিলে অল্পদিনের মধ্যেই শিশুদিগের ভালবাসা পাওয়া যায় ও বিশ্বাসভাজন হওয়া যায়। গৃহে প্রবেশ করিয়া একবারে শিশুর নিকটস্থ হইলে, শিশু ভীত হইয়া কোন প্রকার পরীক্ষা করিতে দেয় না। একটু দূরে বসিয়া অন্যান্য কথা বার্ত্তার সময় শিশুর মুখের ভাব পরীক্ষা করিবে, এবং শ্বাস কার্য্য ইত্যাদিও এই ভাবে জ্ঞাত হইবে। এরূপ পরীক্ষার সময় শিশুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিরক্ত করিবে না। পরীক্ষা কালে শিশু নিদ্রাবস্থায় থাকিলে, নিদ্রার ভাব, চক্ষু মুদ্রিত বা অর্দ্ধমুদ্রিত, নিদ্রা গাঢ় কি না এবং শ্বাসকার্য্য দ্রুত বা মৃদু কি না, নাড়ী ও নিশ্বাসের গতি মিনিটে কত বার, ইত্যাদি বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইবে। পরে শিশুকে

শোয়াইয়া চক্ষু ইত্যাদি পরীক্ষা করিবে; কিন্তু ঐ সময় এরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক যে শিশু জাগ্রত হইয়াই যেন অপরিচিত ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রথমে না দেখে। শিশু জাগ্রত থাকিলে শিশুকে ভুলাইয়া গুপ্ত ভাবে সর্ব্বপ্রথমে নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিবে, কারণ সামান্য কারণে ছেলেদিগের নাড়ীর গতি মিনিটে কুড়িবার বৃদ্ধি হইতে পারে; সেই জন্য শিশুর ভীতি ও ক্রন্দন অবস্থায় নাড়ী ও শ্বাস পরীক্ষা ঠিক নহে।

নাড়ী পরীক্ষা করিবার সময় একেবারে নড়ীর উপর অঙ্গুলি না রাখিয়া শিশুহস্তের অন্য কোন স্থানে হস্ত রাখিয়া ধীরি ধীরি নাড়ীর উপর অঙ্গুলিক্ষেপ করিবে। মাতা কিম্বা ধাত্রী শিশুর হস্ত লইয়া নিজ হস্তের উপর রাখিলে শিশু বিরক্ত হয় না; অতএব শিশু নাড়ী দেখিতে না দিলে এই উপায় অবলম্বন করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিবে। তাহার পর শ্বাসকার্য্য পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য; কারণ নাড়ী ও শ্বাসকার্য্যের গতি পরস্পরের সহিত তুলনা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু শিশু যদি নাড়ী দেখিবার পর ভীত হইয়া খিট্‌খিটে হয়, তাহা হইলে শ্বাসকার্য্য পরীক্ষা না করাই ভাল। এইরূপে চতুরতা সতর্কতা ও ধীরতার সহিত শিশু পরীক্ষা করিলে কখনই বিফল মনোরথ হওয়া যায় না।

নাড়ী পরীক্ষা করিবার পর যদি দেখা যায় যে, শিশু বিরক্ত হইল না, তাহা হইলে ঘড়ী, (ষ্টেথেস্‌কোপ্‌) চোং কিম্বা কোন খেলনা দ্বারা শিশুকে আমোদিত করিয়া তাহার সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করিবে; এবং এই সময়ে ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হাত দিয়া (ফণ্টেনেলিসের) ব্রহ্মতালুর অবস্থা ও মস্তকের উত্তাপ বা শীতলতা জ্ঞাত হইবে। থারমোমেটার ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উত্তাপ পরীক্ষা করিবে। শিশু বগলে থারমোমেটার লাগাইতে না দিলে কুঁচ্‌কিতে থরমোমিটার দিবে। বগল ও কুঁচ্‌কির উত্তাপের বিভিন্নতা সামান্য মাত্র।

পেট পরীক্ষা করিবার সময় শিশুর গায়ে জামা থাকিলে আস্তে আস্তে জামার ভিতর হাত প্রবেশ করাইয়া অতিশয় ধীরতার সহিত পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবে। ক্রন্দন করিলে কি নড়িলে চড়িলে শিশুর পেট শক্ত হইয়া পড়ে; এই জন্য শিশুর অজ্ঞাতে কিম্বা জানালার নিকট লইয়া গিয়া উহাকে আমোদিত করিয়া ধীরে ধীরে পাকস্থলীর যকৃৎ প্লীহা ইত্যাদি পরীক্ষা করিবে। শিশুদিগের পেট ফাঁপা থাকিলে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিলে তাহার যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়া থাকে, এবং এই সময় পরীক্ষা করিলেও ক্রন্দন করে না।

ইহার পর বুক ও পিট্‌ ষ্টেথেস্‌কোপের দ্বারা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রথমে পিঠের উপর ষ্টেথেস্‌কোপ না বসাইয়া কান দিয়া পরীক্ষা করিবে। ইহাতে যদি শিশু আপত্তি না করে, তাহা হইলে এই রূপে দুই দিককার পাঁজরা পরীক্ষা করিবে। বুকের সম্মুখভাগ পরীক্ষা করিতে হইলে ষ্টেথেস্‌কোপ নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু সম্মুখভাগে ষ্টেথেস্‌কোপ বসাইলে শিশু উহা ধরিয়া খেলায় মত্ত হয়; অতএব সম্মুখভাগ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে না পারিলে পিঠের দিক্ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা

করিবে। শিশুদিগের সুন্দর রূপে পিট্ পরীক্ষা করিলে ফুস্‌ফুসের সম্মুখ ভাগের অবস্থা অনেকটা জ্ঞাত হওয়া যায়। কেবল যক্ষ্মা এবং ব্রণ্‌কিয়াল অর্থাৎ ফুস্‌ফুসের অন্তর্নলীগ্রন্থির সম্মুখভাগ পরীক্ষা না করিলে ভাল করিয়া জানিতে পারা যায় না।

নিশ্বাস পরীক্ষা করিবার সময় সমস্ত বুক ফুলিয়া উঠে কি না দেখিবে, কিম্বা বুক প্রসারিত না হইয়া কেবল উদর নড়িতে থাকে কি না দেখিবে। শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া নিশ্বাসের বিষয় অনেকটা জানা যায়, কাঁদিবার সময় বুক পরীক্ষা করিলে বায়ু কতদূর প্রবেশ করে ও ফুস্‌ফুসের অন্তর্নলীর ভিতর কি পরিমাণে কাশ ভরা আছে জানিতে পারিবে।

ইহার পর জিহ্বা দন্ত ও দন্তমাড়ী পরীক্ষা করিবে। এই পরীক্ষা সর্ব্বশেষে করা কর্ত্তব্য; কিন্তু যদি ইতিপূর্ব্বে শিশু ক্রন্দন করে তাহা হইলে ঐ সময়ে জিহ্বা ও অঙ্গুলি দ্বারা দন্তমাড়ী পরীক্ষা করিয়া লইবে। মুখগহ্বর, গলার ভিতর ও দন্তমাড়ী পরীক্ষা করিতে হইলে অঙ্গুলি দ্বারা শিশুর ওষ্ঠ ধীরে ধীরে চাপিলে শিশু মুখ খুলিয়া ফেলে; এই সময় শীঘ্র অথচ ধীরে ধীরে জিহ্বার উপর (ফেরিংসের) অন্ননালীর দিকে অঙ্গুলি চালিত করিয়া দিলে মুখগহ্বর সুস্পষ্ট দেখা যায়। শিশু একটু বড় হইলে ভুলাইয়া জিহ্বা পরীক্ষা করিবে। যদি শিশু অতিশয় পীড়িত হয়, তাহা হইলে এত সূক্ষ্ম সতর্কতা ও মনোযোগ আবশ্যক করে না।

উপরোক্ত সতর্কতা ইত্যাদি অল্পবয়স্ক শিশুর জন্য আবশ্যক। তিন বৎসরের উপর হইলে, ধীর ও মন্ত্রভাব দেখাইলেই শিশু পরীক্ষা কালে বিশেষ আপত্তি করে না।

রোগের পূর্ব্ব বিবরণ, কি কারণে পীড়া ভোগ করিতেছে এবং আক্রমণকালে কি কি লক্ষণ ছিল জানিতে পারিলে, রোগ নিরূপণ করিবার ও ভাবিফল জানিবার বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়; শিশুকে পরীক্ষা করিবার সময় তাহার পিতা মাতার বর্ত্তমান ও অতীত স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্যক্ রূপে জানিবে। উহার ভাই ভগ্নী কয়টি এবং তাহাদের মধ্যে কোনটি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে কি না জানিবে। যদি মরিয়া থাকে তাহা হইলে কি পীড়ায় মরিয়াছে এবং জীবিতদিগের মধ্যে কেহ পীড়িত কি না তাহাও জানিবে। অতি নিকট সম্বন্ধীয় কুটুম্বদিগেরও স্বাস্থ্যের বিষয় জানিবে। পৈতৃক বা পুরুষানুক্রমে চলিত পীড়ার বিষয় জানিবার জন্য নিকট কুটুম্ব ও পিতা মাতার স্বাস্থ্যের তথ্য জানা আবশ্যক; কারণ চালিত পীড়া দ্বারা শিশুদিগের স্বাস্থ্য এরূপ বিকৃত ভাব ধারণ করে যে, সহজেই ইহারা পীড়িত হইয়া থাকে। যদি জানিতে পারা যায় যে বংশের মধ্যে কেহ (হাইড্রোসেফেলাস্) মস্তকে জলসঞ্চার, যক্ষ্মা কিম্বা (স্ক্রফিউলা) গণ্ডমালা রোগাক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, তাহা হইলে শিশু পীড়িত হইলে ঐ সকল বিষয় স্মরণ রাখিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।

কতকগুলি পীড়া অতি অল্প বয়সে হইয়া থাকে। কতকগুলি পীড়া বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুদিগের যেরূপ মৃদুভাবে আক্রমণ করে, অল্পবয়স্ক শিশুদিগের তদপেক্ষা ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে। শিশুর বসন্ত, পানী-

বসন্ত, টিকা, (হুপিঙ্কপ্) দম্‌কা কাশী, হাম ইত্যাদি হইয়াছে কিনা জানিবে। ইতি-পূর্ব্বে শিশু অন্যান্য কোন কঠিন রোগ ভোগ করিয়াছে কিনা তাহাও জানিবে।

শিশু কেবল স্তন পান কিম্বা অন্য কোন প্রকার আহার করে কিনা জানিবে। যদি স্তনপান বন্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে কত বয়সে, কি কারণে, মাতার কোন পীড়ার জন্য এবং স্তনত্যাগের পর কি আহার দেওয়া হয় জানিবে। দন্তপরীক্ষা করিবার সময় কয়টা ও কি কি দাঁত উঠিয়াছে এবং দাঁত সহজে বা কষ্টের সহিত উঠিয়াছে কিনা ও প্রথম দাঁত কত বয়সে উঠিয়াছে এবং এখন কোন দাঁত উঠিতেছে কিনা জানিবে।

শিশুর রোগবিবরণ গ্রহণ করিবার সময় প্রথম রোগলক্ষণ আবির্ভাবের তারিখ জানিবে। ইহা জানিতে পারিলে রোগবিবরণ প্রকটিত করিবার সুবিধা হয়। শিশুর মাতা, ধাত্রী বা আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা পর পর ঠিক না হইলেও মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিবে। তাহাদিগের নিকট হইতে যাহা জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা তাচ্ছিল্য করিবে না। মাতা, ধাত্রী ও আত্মীয়বর্গেরা যদিও অনেক সময়ে সামান্য কারণে ভীত বা চিন্তান্বিত হইয়া থাকে তথাপি সর্ব্বদা রোগীর নিকট থাকিয়া লালন পালন করিবার জন্য ইহারা শিশু সম্বন্ধে যত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবে, চিকিৎসকের ততটা জানা অসম্ভব; সেই জন্য ইহাদিগের কথা তাচ্ছিল্য না করিয়া মনোযোগ দিয়া শুনিবে। শিশুর ক্ষুধা পিপাসা, কোষ্ঠ এবং বাহ্যের ও রঙ্ ইত্যাদি জানা আবশ্যক। শিশুর ক্ষুধা ও পিপাসার বিষয় নিশ্চয় কিছু জানা যায় না। অনেক সময় তৃষ্ণা অথবা ক্ষুধার জন্য ঘন ঘন স্তনপান করিতেছে কি না বলিতে পারা যায় না। শিশুর যখন স্তন পানে ইচ্ছা অতিশয় বলবতী এবং যখন স্তন পান করিলে দুগ্ধ উদরস্থ থাকে, কিন্তু দুগ্ধ পান করাইয়া দিলে শীঘ্র বমন হইয়া যায়; তখন জানিবে যে, শিশুর তৃষ্ণা আছে।

শিশু পরীক্ষা করিবার সময় জানিবে যে শিশুকে আহার করান হইয়াছে কি না, কিম্বা ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে স্নান করান ও পোষাক পরান হইয়াছে কিনা; কিম্বা অন্য কোন প্রকারে উত্যক্ত হইয়া ক্রন্দন করিয়াছে কি না। এই সকল জানিবার কারণ এই যে শিশু সামান্য কারণে উত্তেজিত হইলে নাড়ীর নিশ্বাসকার্য্য দ্রুত হইয়া থাকে।

যখন রোগ নির্ণয় করিতে সন্দেহ বা অক্ষম হইবে, তখন অধৈর্য্যের সহিত একটা স্থির না করিয়া শিশুকে আরও দুই এক বার পরীক্ষা করিবে।　　　ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থূলবিজ্ঞান ও সূক্ষ্মবিজ্ঞান।

হিন্দুহিতৈষীর কাছে নিম্নোদ্ধৃত প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না;—

"এমন সুন্দর নীতি-সম্পন্ন, বিজ্ঞান-সম্পন্ন, অক্ষুণ্ণ-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন, হিন্দুজাতির অধঃ-

পতন কেন হইল? হিন্দুই ত হিন্দুস্থানে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল; শাস্ত্রও ছিল, শাস্ত্রের আদরও ছিল, অনুশীলনও ছিল;—রাজাও হিন্দু ছিল, প্রজাও হিন্দু ছিল;—হিন্দু-সমাজের কর্ত্তাও ছিল, নিয়মাবলীও ছিল, নিয়ম প্রতিপালিতও হইত,—না হইলে দণ্ডও ত ছিল;—তবে সে হিন্দুসমাজের পতন হইল কেন? সমস্তই যখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল, তবে অধোগতির কারণ কি? পতনের কারণ ত শক্তির হ্রাস। সমস্ত থাকিতে কেন শক্তির হ্রাস হইল?"

* * * *

আবার হিন্দুদ্বেষীর কাছেও তেমনই নিম্নোদ্ধৃত প্রশ্নটীর কোন সদুত্তর মিলেনা;—"বহুকাল হইতে অধঃপতিত নির্জ্জীব এই হিন্দুজাতি কি শক্তিবলে আজিও বাঁচিয়া রহিয়াছে?—হিন্দুর যাহাতে শক্তি ক্ষয় হয়, এমন সহস্র প্রকারের অত্যাচার আবহমান কাল হইতে হিন্দু সহিয়া আসিতেছে তথাচ আজও বাঁচিয়া আছে; হিন্দুর যাহাতে ধর্ম্ম লোপ হয়, সমাজবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে,—এক কথায় হিন্দুর হিন্দুত্ব যাহাতে বিলুপ্ত হয়, এই উদ্দেশে কত শত শক্তি প্রযুক্ত, কত শত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে ও হইতেছে—তবুও হিন্দু বাঁচিয়া আছে, কিসে? বাঁচিয়া থাকার কারণ ত প্রতিরোধসক্ষমা শক্তি—কিসে হিন্দুর এমন প্রতিরোধসক্ষমা জীবনী শক্তি? অস্ত্রে ছিন্ন হয় নাই, মুদ্গরে নিষ্পেষিত হয় নাই, অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই—বলহীন হইয়াছে বটে, তবু এততেও ত বাঁচিয়া আছে। কিসে হিন্দুর এই শক্তি?"—

* * * *

বস্তুত এই দুইটী প্রশ্নই ভাবিবার বিষয়। এই দুইটী প্রশ্নের সদুত্তরে অনেক লাভালাভ নির্ভর করে। যে ধরণে, যে পন্থায়, যে প্রণালীতে ঐ দুইটী কথা ভাবিতেছি, তাহারই আভাস দিবার জন্য এই প্রবন্ধের সূচনা। পন্থায় ভ্রান্ত হইয়া থাকি, বুদ্ধিমন্তেরা সংশোধন করিয়া দিবেন, এই ভরসা।

বিভিন্ন-প্রকারের মনুষ্য-সমাজের পরিচালিকা শক্তি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার মূলে হয় স্থূলশক্তির প্রাধান্য, না হয় সূক্ষ্মশক্তির প্রাধান্য; আর না হয় দুই সমঞ্জস ভাবে বিরাজ করিতেছে। যেখানে স্থূলবিজ্ঞানের অনুশীলন অধিক, সেই খানেই স্থূলশক্তির প্রাধান্য; আর যেখানে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের অনুশীলন অধিক, সেই খানেই সূক্ষ্মশক্তির প্রাধান্য; এবং উভয় বিজ্ঞানের যথোচিত অনুশীলনেই কেবল উভয় শক্তির সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হওয়া সম্ভব।

স্থূলভাবে, জড়, জীব ও শক্তি লইয়া যে বিজ্ঞান, তাহাই স্থূল বিজ্ঞান। ইউরোপে এই বিজ্ঞানের অনুশীলনই অধিক এবং ইউরোপীয় জাতি সমূহের আজি কাল যে এত প্রভাব প্রতিপত্তি, এই স্থূল বিজ্ঞানই তাহার প্রধান সহায়। আমাদেরও এককালে স্থূল বিজ্ঞানের অনুশীলন না ছিল, এমন নহে; তবে সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের চর্চ্চাই ছিল অধিক। এখন স্থূলও যেমন, সূক্ষ্মও তেমনই; দুই গিয়াছে, দুয়েরই কেবল ভগ্নাবশেষ বিরাজ করিতেছে মাত্র। দুয়েরই পুনরনুশীলন আবশ্যক।

যাঁহারা ভাবেন যে স্থূল বিজ্ঞান বৃথা জিনিষ, উহার কিছুমাত্র দরকার নাই, এক মাত্র সূক্ষ্ম বিজ্ঞানেই যথেষ্ট হইবে, তাঁহারাও যেমন ভ্রান্ত; আবার যাঁহারা ভাবেন যে, সূক্ষ্মবিজ্ঞান পাগলের পাগলামি মাত্র, ভাষাবিদের শব্দাড়ম্বর মাত্র, উহার কার্য্যকারিতা কিছুই নাই, তাঁহারাও তেমনই বা ততোধিক ভ্রান্ত। স্থূল, সূক্ষ্ম দুই লইয়া যখন দেহ, স্থূলশক্তি সূক্ষ্মশক্তি লইয়া যখন কারবার;—কখন বা স্থূলশক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কখনও বা সূক্ষ্ম শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই যখন মানবজীবনে প্রতিমুহূর্ত্তের ঘটনা; তখন স্থূল বাদ দিয়া শুধু সূক্ষ্ম, বা সূক্ষ্ম বাদ দিয়া শুধু স্থূল অবলম্বন করিলে চলিবে কেন? স্থূলশক্তির প্রতিকুলতায় স্থূলশক্তির প্রয়োগই অধিক কার্য্যকর, সহজসাধ্য, এবং আশুফলপ্রদ; সেইরূপ সূক্ষ্মশক্তির প্রতিকুলতায় সূক্ষ্মশক্তির প্রয়োগই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। স্থূলশক্তির হীনতায় আমরা ক্রমে ক্রমে সহস্র প্রকার স্থূলশক্তিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া কি হইয়াছি, কি হইতেছি এবং কি হইব, তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সহস্র স্থূলশক্তির মর্ম্মান্তিক পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া, "ত্রাহি ত্রাহি" ডাক ছাড়িবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে -আর আমরা নিশ্চিন্ত মনে নিষ্ক্রিয়ভাবে আজিও কেবল "ধূমাৎ বহ্নি" করিয়া আসিতেছি। এদিকে বহ্নি যে ক্রমে নির্ব্বাপিত হইবার যোগাড় হইয়া আসিতেছে, তাহার ভাবনা ভুলেও একবার ভাবিতেছি না। স্থূলে এতটা ভুল করিলে, স্থূলশক্তি এতটা তাচ্ছিল্য করিলে, শুধু সূক্ষ্মের উপর এতটা একাগ্রচিত্ত হইয়া থাকিলে, সূক্ষ্ম ত এখনই হইয়াছি, কালে আরও সূক্ষ্ম হইতে হইবে—তখন হয়ত পৃথিবীময় খুঁজিয়া আমাদের অস্তিত্ব মেলা ভার হইয়া উঠিবে। চারিদিকে প্রবল স্থূলশক্তির এমনই বিষম আক্রমণ! আর, আমরা এমনই স্থূলশক্তি-হীন!

পক্ষান্তরে আবার দেখ, কেবল স্থূলশক্তি সম্বল লইয়া ইউরোপীয় জাতিগণ শুধু সূক্ষ্মশক্তির অভাবে, আজও একটা শান্ত, শিষ্ট, সুখী সমাজ সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাহিরে এত উন্নতি, এমন চাকচিক্য, পৃথিবীময় দিগ্বিজয়ী পতাকা; ভুবনব্যাপী বাণিজ্যের বহুল বিস্তার, চারিদিক্ হইতে অজস্র ধনাগম,—বিভব সৌন্দর্য্যের কোন প্রকার অভাব বা ত্রুটি নাই;—তথাচ কৈ, গৃহে ও সমাজে শান্তি কৈ? গৃহে অশান্তি, সমাজে অশান্তি—দিবানিশি বিপদ বিপ্লবের বিভীষিকা—সামাজিক সকল কাজেই ঘোর শিথিলতা, ও স্বাধীনতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা—স্ত্রীপুরুষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধনী নির্ধনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জমীদার প্রজায়, বড়মানুষ শ্রমোপজীবিতে, বিদ্বান্ মূর্খে, স্বামী স্ত্রীতে, পিতাপুত্রে,—ঘরে বাহিরে, চারিদিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে,—গৃহবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব। নিরন্তর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার ফলে, দুর্ব্বলেরা ক্রমেই পদতলে পিপীলিকার ন্যায় নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে; সবলেরা ক্রমেই সতেজ হইয়া উঠিতেছে। যে মনুষ্য-সমাজে দুর্ব্বলের মরণ, যে মনুষ্য-সমাজ দুর্ব্বলের সহায় নহে, অক্ষম দুর্ব্বলের

পীড়ন ও পেষণ যে সমাজের মূলসূত্রের অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবনীয় ফল, সে সমাজের আর মনুষ্যত্ব কোথায়? পশু-সমাজেও ত ঐ নিয়ম। তবে আর সমাজ-বন্ধন করিয়া কি বিশেষত্ব সংস্থাপন করা হইল? প্রকৃতির উপর নির্ভর করিলে বরং দুর্ব্বলেরা অধিক দিন বাঁচিত, কিন্তু তোমার স্থূল সভ্যতার কলকৌশলে তাঁহা-দের জীবিতকাল বড়ই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। শুধু স্থূল শক্তির উপর সমাজ খাড়া করিলে, তাহাতে প্রবলেরই জয়, দুর্ব্বলের ক্ষয়; যাহার উপযোগী গুণ-সমষ্টি অধিক তাহারই জয়; অনুপযোগীর নিশ্চয়ই ক্ষয়। সূক্ষ্ম শক্তির ঐকান্তিক অভাবেই এই সব ঘটিয়াছে—সূক্ষ্ম শক্তির লেশমাত্র থাকিলেও কখন এরূপ হইতে পাইত না। সূক্ষ্মশক্তিই বলিয়া দিত যে—"সবলেরা ত সহজই আত্মরক্ষা করিবে; সুতরাং দুর্ব্বলেরা যাহাতে রক্ষা পায়,সমাজে বিধিমতে এমত আয়োজন, অনুষ্ঠান কর।" শুধু স্থূলশক্তিবলে সমাজ চালান—বড়ই ভয়ঙ্কর! উপরে চাকচিক্য থাকিলেও তাহার ভিতরে বড়ই আঁধার; তাহাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বটে, কিন্তু জাতিগত বড়ই বিপত্তি! শুধু স্থূলশক্তির বলে সমাজ চালিত হইলে, তাহাতে ইহ-কালই সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়ায়; পরকালের বা পূর্ব্বকালের ভাবনা বা বিচার তথায় তিষ্টিতে পারে না;—জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে,—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যেটুকু,—শুধু সেই টুকু;—সংসারের সমস্ত কার্য্যকারণ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকলই সেই লক্ষ্যকে উদ্দিষ্ট করিয়া স্থিরীকৃত হয়, সকলই সেই সুরে বাঁধা হয়;—সুতরাং সকলই বড় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর প্রকাণ্ড প্রাসাদ টিকিবে কেন? সদাই টলমল,সদাই যেন পড় পড়। সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সকলের কার্য্যের সুচারু সঙ্কুলান হইবে কেন? সুতরাং জীবিত-চেষ্টার ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, গুঁতাগুঁতি মারা-মারিতে দুর্ব্বলের ক্ষয় হই-তেছে, সবলেরই জয় হইতেছে। শুধু স্থূল বড়ই ভয়ঙ্কর! শুধু স্থূলে নির্ভর করিলে,জীব-নটাকে স্থূলভাবে দেখিতে হয়, জীবনের লক্ষ্য-কেও স্থূল করিয়া ফেলে, কার্য্য কারণের সম্ব-ন্ধও মহা স্থূলভাবে নির্দ্দিষ্ট হয়; সুতরাং শুধু স্থূলে নির্ভর করিলে সমাজে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। হিন্দু কখনও শুধু স্থূলে নির্ভর করিতে পারেও নাই, পারিবেও না।

শুধু স্থূলে হিন্দু কখন নির্ভর করিতে পা-রিবে না বটে, কিন্তু স্থূলশক্তির অভাবে, স্থূল বিজ্ঞানের অননুশীলনে, হিন্দু মৃতপ্রায় হইয়া আসিতেছে। তবে আজিও যে বাঁচিয়া আছে, সে কেবল হিন্দুর সূক্ষ্মশক্তির, সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের বাহাদুরী। কতকাল হইতে সে বিজ্ঞানের অনুশীলন, সে শক্তির পরিচালনা দিন দিন হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে—তথাচ সেই বহু-কাল পূর্ব্বের সঞ্চারিত শক্তির বলে, আজিও যে আমরা বাঁচিয়া--নানাবিধ ভীষণ স্থূলশক্তির সাংঘাতিক পেষণেও আজিও যে আমরা বাঁচিয়া আছি, এ কেবল সেই সূক্ষ্মশক্তির গুণে। এমন তেজোময়ী সূক্ষ্মশক্তিকে যাঁহারা তুচ্ছ জ্ঞান করেন, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সূক্ষ্মবিজ্ঞানের পুনরুদ্ধারে যাঁহারা যত্নশীল নহেন, তাঁহারা নিতান্তই মূঢ়। আজ কাল

দেখা যাইতেছে যে, সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ হিন্দু-হিতৈষী দুই চারি জন, হিন্দুর সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধারে যত্নবান্ হইয়াছেন; শিক্ষিত হিন্দুদিগের মন লুপ্তপ্রায় সূক্ষ্মবিজ্ঞানের দিকে আকর্ষণ করিতে বিধিমত প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন; সূক্ষ্মশক্তির প্রভাব বুঝাইয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই শক্তি পুনরাহরণের জন্য উপদেশাদি দিতেছেন,—ইহা বাস্তবিকই এই অধঃপতিত হিন্দুজাতির উদ্ধারের পক্ষে একটী প্রকৃষ্ট পন্থা, সন্দেহ নাই। সূক্ষ্ম শক্তি যে সমাজের মজ্জাগত, সূক্ষ্ম বিজ্ঞান যে সমাজের "জান্," সে বিজ্ঞান, সে শক্তিকে তুচ্ছ করিয়া, বাদ দিয়া,হিন্দুর উদ্ধার কখনই হইবে না;—তাহা করিতে গেলে বরং হিন্দুর বিনাশ সাধনেই বিলক্ষণ সুবিধা হইতে পারে। হিন্দুর সূক্ষ্মকে বাদ দেওয়া, আর হিন্দুর বিনাশ সাধন করা, একই কথা। সূক্ষ্ম বর্জ্জন করিয়া, শুধু স্থূল অর্জ্জন করিতে গেলে, পরিণামে বিভ্রাট বিপত্তিও বিলক্ষণ। সুতরাং একের ধ্বংস করিয়া, অপর একটা—নূতন হইলেও—নিকৃষ্ট—নূতন সৃষ্টি করিতে যাওয়া বুদ্ধি-বিভ্রাটের কর্ম্ম। প্রকৃত হিন্দুহিতৈষীর হৃদয়ে এই আশঙ্কা আজ কাল দিন দিন বাড়িতেছে। ভাসমান্ তৃণখণ্ড পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাঁহারা স্রোতের গতি বুঝেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, এ আশঙ্কা নিতান্ত অসঙ্গত, অন্যায়, বা অমূলক নহে।

সূক্ষ্মের অনুশীলন যেমন হিন্দুর পক্ষে একান্তই আবশ্যক, তেমনই সেই সঙ্গে সঙ্গে স্থূলের অনুশীলনও সেইরূপ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। স্থূলের অবহেলায় আর চলিতেছে না। স্থূল বজায় থাকিলে ত সূক্ষ্মের অনুশীলন! কিন্তু স্থূলশক্তির অভাবে, স্থূল আর কত দিন বজায় থাকিবে? স্থূল পক্ষে এ দিকে যে দিন দিন ধ্বংসমুখে অবনতি হইতে চলিয়াছে! স্থূল ধ্বংস হইলে তখন আর সূক্ষ্ম কোথায় থাকিবে? অক্ষুণ্ণ প্রভাব প্রতিপত্তিও ত না ছিল, এমত নহে! সে সব কেন গেল, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। অন্যের সামান্য সূক্ষ্মশক্তির সাধ্য কি যে, হিন্দুর সূক্ষ্মশক্তির সমকক্ষ হয়?—পরাজয়করা ত দূরের কথা। বস্তুতও, আমরা সূক্ষ্মশক্তির দ্বারা কখনও আক্রান্তও হই নাই। হইলে আর এত দিন বাঁচিয়া থাকিতে হইত না। স্থূলশক্তিই হিন্দুকে 'কাবু' করিয়া ফেলিয়াছে। যত দিন বাহিরের স্থূলশক্তির প্রভাব কম ছিল, তত দিন হিন্দু নিজের স্থূলশক্তির প্রভাবেই "রাজার হালে" দিন কাটাইয়া গিয়াছে। অনুশীলনের গুণে যেই বাহিরের স্থূলশক্তি হিন্দুর স্থূলশক্তিকে ছাড়াইয়া উঠিল, আর অনুশীলনের অভাবে যে দিন হইতে হিন্দু দিন দিন স্থূলশক্তিহীন হইতে থাকিল, সুতরাং বাহিরের প্রবলতর স্থূলশক্তির প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হইল—সেই দিন হইতেই হিন্দুর অধঃপতন। স্থূলের হীনতায় হিন্দু, স্থূলের কাছে পরাস্ত হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা সূক্ষ্মপক্ষে পূর্ব্বের সহিত তুলনায় হিন্দুজাতি আজ নিতান্ত অধমাধম হইয়াও, তবু অন্যের পক্ষে পর্ব্বত। হিন্দুর সূক্ষ্মশক্তির ত্রিসীমায় ঘেঁষিতে পারে, এমন সূক্ষ্মশক্তি বাহিরে নাই। স্থূলের হীনতাতেই আমরা মরিতে বসিয়াছি। সুতরাং আর স্থূলের অবহেলা করা উচিত নয়। বাহিরের স্থূলশক্তির সহিত আভ্যন্তরীণ স্থূলশক্তির

নিরন্তর সামঞ্জস্য সংস্থাপন করাই দেহের ধর্ম্ম; জীবনের ক্রিয়া,—তাহার অভাবে অর্থাৎ বাহিরের স্থূলশক্তি অপ্রতিহত হইলেই, দেহের ক্ষয় ও বিনাশ। সমাজেও ঐ নিয়ম। যত দিন বাহিরের শক্তিকে আভ্যন্তরীণ শক্তিদ্বারা প্রতিরোধ করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে, তত দিনই সমাজের জীবন; আভ্যন্তরীণ শক্তির হীনতায় সামঞ্জস্যের ত্রুটি হইলেই, সমাজের বিপদ;—ক্রমে বিনাশ। তর্কচ্ছলে কথা উঠিতে পারে যে, সূক্ষ্মশক্তির দ্বারা স্থূলশক্তির প্রতিরোধও ত সম্ভব। মানি সম্ভব; এবং ইহাও মানি যে, হিন্দু এমন সূক্ষ্মশক্তির অহঙ্কার করিতেও পারে। কিন্তু সম্ভব হইলেও, এমন সূক্ষ্ম-শক্তির অধিকারী হইতে পারে কয় জন? যখন সূক্ষ্মশক্তির সম্যক্ পরিচালনা ছিল, তখনও ত জনে জনে সূক্ষ্মশক্তির অধিকারী ছিল না; ছিল না বলিয়াইত অধিকারভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য,শূদ্র, ভেদাভেদের অনুষ্ঠান। ব্রাহ্মণের মধ্যেই কি জনে জনে যোগী ঋষি ছিলেন? তাহাও ত ছিলেন না। আজই বা সূক্ষ্মশক্তির অধিকারী ব্রাহ্মণ কয় জন দেখিতে পাওয়া যায়? টীকা পড়া বা টিকী নাড়ার কথা বলিতেছি না; তাহাতে সুদক্ষ, এমন আছেন হয়ত অনেক;—বিদ্যার সাহায্যে সূক্ষ্মবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করিতে হয়ত অনেক ব্রাহ্মণই পারিবেন, পারেনও; সে কথা বলিতেছি না;—বলিতেছি যে, সূক্ষ্ম-শক্তির প্রকৃত অধিকারী কয় জন? কয় জন সূক্ষ্মশক্তির সম্যক্ পরিচালনা করিতে সক্ষম? সূক্ষ্মশক্তি দ্বারা স্থূলশক্তির প্রতিরোধ করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন কয় জন? বস্তুতই, সূক্ষ্মশক্তির দ্বারা স্থূলশক্তির প্রতিরোধ অতি কঠিন ব্যাপার—সুতরাং সূক্ষ্ম শক্তির অধিকারীও কম। সমাজ রক্ষা করিতে গেলে, স্থূল অবলম্বন করিতেই হইবে; দুর্ব্বলের রক্ষার উপায় করিতে হইলে, স্থূলের নিতান্তই প্রয়োজন। ইহা নূতন নহে; ছিলও তাই;—অধিকারীভেদে সূক্ষ্ম ও স্থূলের আয়োজন অনুষ্ঠানও ছিল; আর একই সমাজে সূক্ষ্ম ও স্থূল দুই ছিল বলিয়া, দুয়ে চমৎকার সামঞ্জস্যও ছিল; স্থূলের হাড়ে হাড়ে সূক্ষ্মের বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত থাকায় শুধু স্থূলে যে দোষ, সে দোষও ঘটিতে পায় নাই। এখন আবার পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, ঐরূপ পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে। সূক্ষ্ম স্থূল দুয়েরই অনুশীলন করিতে হইবে। দুয়ের অনুশীলন থাকিলে,—বিশেষ আমাদের সূক্ষ্ম বিজ্ঞান এমন প্রবল-শক্তি-সম্পন্ন যে, ইহার পাশে পাশে থাকিয়া স্থূল কখনই দুষ্টভাবাপন্ন হইতে পারিবে না। মাংসপেশীর স্তরে স্তরে যেমন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ু-শাখা পরিব্যাপ্ত হইয়া মাংসপেশীতে শক্তি সঞ্চার করিয়া দেয়, হিন্দুর সূক্ষ্মবিজ্ঞানের পাশে স্থূল বিজ্ঞানের সমাবেশ হইলে, সেই স্থূল বিজ্ঞানের স্তরে স্তরে, মর্ম্মে মর্ম্মে, সূক্ষ্ম-শক্তির সঞ্চার হইবেই হইবে। অপর অপর জাতির স্থূলে যে দোষ দেখিয়া ভীত হইতেছি, হিন্দুর হাতে স্থূল পড়িলে তখন আর সে দোষ থাকিবে না। নতুবা, শুধু সূক্ষ্ম শক্তির বেগ দিয়া কয় জনকে বাঁচাইবে? স্থূলশক্তির আহরণ যদি করিতে পার, তবেই সমগ্র সমাজকে বাঁচাইতে পারিবে; নতুবা

প্রবল স্থূল শক্তির প্রতিযোগিতায়, যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে, বুঝিবা অচিরাৎ হিন্দুকে "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" গাহিয়া, ভবলীলায় "শ্রীহরি" করিতে হইবে।

কথা কয়টা বলিলাম বটে, কিন্তু বিষয়-গুণে ও বাহুল্য ভয়ে উদাহরণ দিয়া বিশেষ-রূপে বিস্তার করিতে পারিলাম না। আপাততঃ, পাঠকের বুদ্ধির উপর খানিকটা নির্ভর করিয়াই থাকা গেল। যদি সে পক্ষে বেগতিক দেখা যায়, তখন তাহার উপায় করিলেই চলিবে।

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

পদ্য-পত্র।

পরম-প্রণয়াস্পদ শ্রীযুক্ত বামদেব দত্ত, ভাইজিউ কল্যাণবরেষু।

ভাই! প্রবন্ধ হইল না, পদ্যে পত্র লিখিতেছি।—

গঠো না গঠো না ভাই, প্রতিমা এ দেশে,
মৃত্তিকা পুত্তলীমাত্র হবে অবশেষে;
কাঠ বাঁশ খড় দড়ী তুষ মাটী রঙ্—
জড় করি করিবে হে চমৎকার সঙ্,
ফুাসী গহনা দিবে, আরসী বসাবে,
কলকায় শিখিপুচ্ছ অবশ্য লাগাবে,
ঢাক ঢোল বাজাইবে, করতালি দিবে,
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কিন্তু করিতে নারিবে।
না মিলিবে পুরোহিত, না মিলিবে মন্ত্র,
শুদ্ধ আড়ম্বর হবে—ফক্কিকার তন্ত্র।

যে দেশে ব্রাহ্মণ নাই, সে দেশে সাকার
প্রতিমা গঠার চেয়ে, ভাল নিরাকার;
চক্ষু মুদে বসে' আছি নাহিক বালাই,
ভূত শুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি, কোন শুদ্ধি নাই;
না লাগে তন্ত্র, না লাগে মন্ত্র, যন্ত্র, জল,
দেহের দোলন মাত্র সাধন কেবল;
সে বেশ! যেমন দেশ তেমনি বিধান,
হাড়ী ঝি চণ্ডিকা দেবী,—বরা' বলি খান।
তন্ত্র নাই, মন্ত্র নাই, পাই না ব্রাহ্মণ,
করো' না করো' না ভাই! প্রতিমা গঠন।

ভক্তিতে করিবে শক্তি পূজায়োজন,
নাই রৈল তন্ত্র মন্ত্র পূজক ব্রাহ্মণ—
মন্দ কথা নয়; কিন্তু সন্ধ বড় হয়,
সত্যি কি ভক্তিতে তুমি ব্যাকুল-হৃদয়?
রেগো না চটো না ভাই! ধৈর্য্য কর রক্ষে,
প্রাণের কাঁদুনি গাই, তোমা উপলক্ষে।
সাত্ত্বিকী না হৌক ভক্তি, হউক রাজসিকী,
ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, বলিতে ক্ষতি কি?
কিছু মাত্র নাই—কিন্তু সে ভক্তি হৃদয়ে
আছে কি হে তব, যাতে কামনা পুরয়ে?

সুরত সমাধি নামে ছিল আদিভক্ত,
দিয়াছিল বলি তারা নিজ গাত্র-রক্ত;
রাজসী পূজায় রাম চক্ষু উপাড়িল,
ভক্তির পরীক্ষায় পাশ তবে ত হইল।
কি শিক্ষা পেয়েছ ভাই? কি পরীক্ষা দিবে?
কাগজের প্রশ্ন নহে, কলমে সারিবে;
শক্তি নাই, রক্ত তুমি কি রূপেতে দিবে?
অন্ধ তুমি, চক্ষুদান কেমনে করিবে?
অভক্ত অশক্ত অন্ধে রাজসী পূজার
বিধান কখন নাহি দেন শাস্ত্রকার।

তবে তামসিকী ; পথে এসহ এখন,
তামাসার জন্য কর প্রতিমা গঠন ;
আচ্ছা যাও লেগে! গঠো তবে তামসী প্রতিমা
খুব সাজাও, খুব বাজাও, গাও হে মহিমা ;
বাজাইয়া ঢাক ঢোল, তুলি উচ্চ রোল,
জমক চমক সাজে কর গণ্ডগোল।
উড়াও নিশান লাল—বাঁধ নহবত,
'দিলেনা' 'দিলেনা' বোল, বল অবিরত ;
দীপ ধূপ ধুনা ধূম পাঞ্জাবী গুগ্‌গুল,
চালকলা গঙ্গাজল পত্র ফল ফুল—

আর লুচি, শুভ্র রুচি, চন্দ্রার্ক আকার,
অখণ্ড-মণ্ডলাকার মণ্ডা নাম যার,
ফোঁপকরি নাহি হয় কৌস-করি হলো ;
রাউতা রাবড়ি তায় চাট্‌নি যদি রলো,
আর, আর—
তামসী পূজা বটে, তামাসত নয়,
রাজসীর বীর বস্তু ইথে যেন রয় ;
যে বলে মহিষাসুর-মর্দ্দিনী চণ্ডিকা,
সে বল নহিলে ভাই সকলি ফক্কিকা ;
শীতলে বোতল দাও ডজন ডজন,
তবেইত প্রতিমার বাড়িবে ওজন।

দক্ষিণ কড়চে আগে প্রণামীটি লবে,
'আসিতে হউক আজ্ঞা' তার পর ক'বে।
বসিতে আসন দিয়া দেখাবে প্রতিমা,
ঝাড় বুটি খুঁটি নাটি—যতেক মহিমা ;
"সহরের কারিগর গঠেছে এমনি,
দেবী যেন ক্লিওপেট্রা—মিসর রমণী ;
বিলাত হইতে চুম্‌কি হয়েছে ইণ্ডেণ্ট,
ধাঁয়েদের, এ বাড়ীর,—একই প্যাটেণ্ট ;"
এমনি করিয়া সব বুঝাবে দর্শকে,
তবেত জাঁকিবে পূজা—জমকে চমকে।

প্রণামী গণিয়া পরে পাতাইবে পাত,
অপ্রণামী লোকে যেন যায়নাক সাথ ;
কাহারো সম্মুখ দিক, কাহারো নেপথ্য,
যে যেমন, তারে সেই ভাবে, লবে তথ্য ;
প্রণামীতে প্রসাদেতে রাখিবে সমতা,
তবেত প্রতিমা পরে, হইবে মমতা ;
এরূপ যদ্যপি হয় পদ্ধতি পূজার,
তবেই এদেশে হয় প্রতিমা প্রচার ;
হবে ঘটা, নব ছটা, মহা ধূম ধাম,
নায়কের যশ হবে, গায়কের নাম।

সাত্ত্বিকী রাজসী ভাবে যদি থাকে মন,
করো'না কারো'না ভাই প্রতিমা গঠন।
কাঠ বাঁশ খড় দড়ী তুষ মাটী রঙ্
জড় করি করিবে হে শুদ্ধ মাত্র সঙ্ ;
ফুরসী গহনা গড়ি আরসী বসাবে,
কলকায় শিখিপুচ্ছ অবশ্য লাগাবে ;
ঢাক ঢোল বাজাইবে করতালি দিবে,
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কিন্তু করিতে নারিবে।
না হইবে পূজা হোম, না মিলিবে মন্ত্র,
শুদ্ধ আড়ম্বর মাত্র—ফক্কিকার তন্ত্র ;

পুনঃ পুনঃ বলি তাই আগ্রহ বচন,
করো'না করো'না আর প্রতিমা গঠন।

একান্ত মঙ্গলাকাঙ্খী
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সাহিত্যে যিনি আমার গুরু, আর সাহিত্যের যিনি এক জন প্রধান গুরু, তাঁহাকে প্রতিমার জন্য প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। প্রবন্ধ তাঁহার লেখা হয় নাই, সেই কথা জানাইয়া পদ্যে পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি অবিকল প্রকাশ করিলাম। সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে গেলে কবিতা বা কান্নার উচ্ছাস আসে কেন, পত্র পাঠ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক যদি এ কথা বুঝেন, তবেই আমরা কৃতার্থ হইব।

শ্রীপ্রতিমা-সম্পাদক।

সাহিত্য সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড।] জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭। [দ্বিতীয় সংখ্যা।

সিংহল দর্শন।

"কমল আলয় সরঃ, উৎস রজচ্ছটা;
তরুরাজী, ফুলকুল—চক্ষুঃবিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা;—হীরাচূড়া শিরঃ
দেবগৃহ;—নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রত্নসপূর্ণ;—এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে রে চারুলঙ্কে! তোর পদতলে,
জগতবাসনা তুই, সুখের সদন।"

শ্রীমধুসূদন।

বাল্মীকির স্বর্ণলঙ্কাপুরী একণে সিংহল নামে পরিচিত। কিরূপে এই নামের উৎপত্তি হইল সিংহলে তাহার এক কিম্বদন্তী আছে। মগধের এক রাজকুমার বিজয়বাহু লঙ্কারাজ্য জয় করিয়া তথায় রাজত্ব বিস্তার করেন। লঙ্কায় তখন রক্ষপুরী

ছিল, বিজয়বাহু বঙ্গপুরীতে রাজধানী না করিয়া যেখানে তরণী হইতে অবতীর্ণ হন, সেই স্থানে (সমুদ্র উপকূলস্থ এক কাননে) তাম্রকর্ণী নামে নূতন রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তদনুসারে সমস্ত লঙ্কার নাম তাম্রকর্ণী হইয়াছিল। বিজয়বাহুর পিতা সিংহবাহু স্বহস্তে সিংহ বধ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত সেই অবধি তাঁহাদের বংশের উপাধি সিংহল; সুতরাং বিজয়বাহুর বিজিত রাজ্য সিংহল নামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন বিজয়বাহু বাঙ্গালী ছিলেন, কারণ তাঁহার পিতামহী এক বঙ্গ-রাজকন্যা এবং সিংহবাহুও বঙ্গের কতকদূর অধিকার করিয়া রাজা নাম লইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সিংহভূম তাঁহার রাজধানী ছিল। মগধরাজ অজাতশত্রুর রাজত্বকালের অষ্টাদশ বর্ষে খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচ শত ত্রিচত্বারিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে, আমাদিগের শকাব্দা আরম্ভের ৬২২ বৎসর পূর্ব্বে, বিজয়বাহু লঙ্কা বিজয় করিয়াছিলেন। যেই বৎসর শাক্য মুনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। বিজয়বাহু শৈব ছিলেন, তাঁহার রাজধানীতে চারিটী শিবালয় আছে। বিজয়ের লঙ্কায় অবতরণ সময় হইতে সিংহল অব্দ আরম্ভ। সিংহলের ইংরাজী নাম সিলোন।

লঙ্কার চতুর্দ্দিক সমুদ্রপরিবেষ্টিত।[১] সমুদ্রসন্নিহিত ভূভাগ বহুদূর পর্য্যন্ত সমতলক্ষেত্র; ভূমি উর্ব্বরা; সর্ব্ব ঋতুতেই নানাবিধ শস্য ও বৃক্ষলতায় সমলঙ্কৃত। মধ্যভাগ সুনাদিনী স্রোতস্বতী ও মনোহর পর্ব্বতমালায় পরিশোভিত। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরা লঙ্কাকে প্রাচ্যতরঙ্গের নন্দনকানন (Garden of Eden) বলিয়া সম্মান করিয়াছেন। বাস্তবিক এ গৌরব অযথাস্থানে প্রদত্ত হয় নাই। সিংহলদ্বীপ বিবিধ মহামূল্য মণিরত্নের আকর; সিংহলের সুদৃশ্য সুবিস্তৃত দারুচিনি উদ্যান জগদ্বিখ্যাত;—প্রাকৃতিক শোভা জগতে অতুলনীয়। স্থানে স্থানে অগণিত সুন্দর প্রাচীন আট্টালিকা ও কীর্ত্তিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান রাজধানী কলম্বো নগরে ইংরাজদিগের মহা বিস্তৃত বন্দর হইয়াছে; বাণিজ্যেরও বহুল বিস্তার। কলম্বো বিষুবরেখা হইতে সাত অংশ উত্তর; এখানে সৌরকর অতিশয় প্রখর, কিন্তু সমুদ্রসমুত্থিত সুশীতল সমীরণ সর্ব্বদা প্রবাহিত হইয়া সেই তীব্র রবিতেজকে স্নিগ্ধতাগুণে স্পর্শশীতল করিয়া থাকে। সিংহলে চিরবসন্ত বিরাজমান; পৌষ মাঘ মাসের রাত্রে সামান্য একখানা স্থূল বস্ত্রে দেহাবরণ করিলেই শীত নিবারণ

১ ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে লঙ্কাদ্বীপ অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ২৬৬ মাইল, প্রশস্ততা পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৪০ মাইল। পরিধি প্রায় পঁচিশ হাজার বর্গ মাইল। ১৫০৫ খ্রীঃ পোর্টুগিজেরা এই দ্বীপে কুঠী স্থাপন করেন, কিন্তু পর শতাব্দীতেই ওলন্দাজেরা তাঁহাদিগের অধিকারচ্যুত করিয়া আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করেন। ১৭৯৫ খ্রীঃ ব্রিটীশেরা ওলন্দাজী কুঠী অধিকার করিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সহিত সংযুক্ত করিয়া লয়েন। ছয় বৎসর পরে ১৮০১ খ্রীঃ সিংহলরাজ্য মান্দ্রাজ হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র উপনিবেশ হয়। এই সময় হইতেই সিংহল রাজ্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধিকার হইতে বিচ্যুত হয়। উহা ব্রিটীশাধিকৃত ঔপনিবেশিক শাসন প্রণালীর অন্তর্গত। সিংহলকে যখন ভারত সাম্রাজ্য হইতে পৃথক করিয়া ঔপনিবেশিক শাসনাধীন করা হয়, ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারেল মারকুইস অব ওয়েলেসলী তখন তদ্বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

করে। প্রতি মাসেই এখানে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়া থাকে। ইউরোপীয় ইতিহাসলেখকেরা বর্ত্তমান সিংহলকে এসিয়াখণ্ডের সুইজরলাণ্ড এবং সমৃদ্ধিশালী মিশরের সমকক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এখানে বহুসংখ্যক পরম সুন্দর উন্নতশীর্ষ মন্দিরমালা বিরাজিত; তাহার শোভাপারিপাট্য দর্শনে দর্শকনয়নে পরম প্রীতির সঞ্চার হয়। এখানে চা, কাফি, সিঙ্কোনা, নারিকেল, তাল, গুবাক, খর্জ্জুর, আবলুসকাষ্ঠ ও সাটিনকাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মহামূল্য মণিমুক্তা প্রবালাদিও এখানে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদূর্য্য, ইন্দ্রনীল, পদ্মরাগ, গোমেদ এবং প্রবাল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। মরকত মণি তত উৎকৃষ্ট হয় না। সিংহলের মুক্তা জগদ্বিখ্যাত। প্রত্যেক চতুর্থ বর্ষে মুক্তা উত্তোলন করা হয়। সাত বৎসরের কস্তুরিতে উৎকৃষ্ট মুক্তা জন্মে;—সাত বৎসরের অধিক হইলেই কস্তুরি মরিয়া যায়, মুক্তাও নষ্ট হয়।

সিংহলে চিরবসন্ত বিরাজিত। এখানে বার মাস পাকা আম, পাকা কাঁঠাল ও পাকা আনারস প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাঘ মাসে একই আম্রবৃক্ষে একই সময়ে মুকুল, কড়েয়া, অপক্ক ও অর্দ্ধপক্ক ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কলম্বো হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে কল্যাণী নদীর তীরে কল্যাণী গ্রাম। এই গ্রামে একটী মন্দিরে গ্ল্যাসকেশের মধ্যে বুদ্ধদেবের দারুময়ী বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি শায়িত আছে। উপাসকেরা সেই মূর্ত্তির নিকটস্থ কাষ্ঠফলকে নারিকেল ফুল, মল্লিকা ফুল ছড়াইয়া রাখিয়া যায়। কেহ কেহ ধূপ দীপও আলে। কিন্তু উপাসনার অন্য কোন আড়ম্বর নাই। মন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে বুদ্ধাস্থির সমাধি মন্দির। সমাধিমন্দিরটী শুভ্রবর্ণ এবং অর্দ্ধ গোলাকার। পশ্চিম পার্শ্বে একটা অশ্বত্থ বৃক্ষ। বৌদ্ধেরা অশ্বত্থ বৃক্ষকে বোধিদ্রুম বলে। কেহ কেহ বলেন, কেবল অশ্বত্থ বৃক্ষই বোধিদ্রুম নহে। বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইয়া যৎকালে বুধগয়া তীর্থে উপস্থিত হন, সেই সময়ে একটী অশথবৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই স্থানেই তিনি বোধসিদ্ধ হন। এই কারণেই অশ্বত্থ বৃক্ষের নাম বোধিদ্রুম। বস্তুত উপাসকসম্প্রদায়ের মতে অশ্বত্থের ন্যায় বট, শিরিষ ও চম্পক বৃক্ষও বোধিদ্রুম। কল্যাণীর মন্দিরের অপর পার্শ্বে ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষসমীপে যাজকদিগের পর্ণশালা। পর্ণশালা বলিলে পত্রকুটীর বুঝায়। কিন্তু ইহা সেরূপ নহে। এই পর্ণশালা ইষ্টকনির্ম্মিত। কেবল বাহিরের বারাণ্ডায় নারিকেলপত্রে ছাওয়া এক এক খানি চাল আছে। যাজকের পর্ণশালায় তালপত্রে লিখিত বিবিধ প্রকার বুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের পুঁথি রক্ষিত আছে।

কতকগুলি পুঁথির আবরণ কাষ্ঠফলকের উপর মরকত ও পদ্মরাগাদি মণিরত্নখচিত। এখানকার প্রধান যাজকের উপাধি মহাস্থেরা। ইনি সকলের সহিত শান্ত ভাবে আলাপ করেন; ধর্ম্মশাস্ত্রে তর্ক করেন না এবং সিংহল দ্বীপকে লঙ্কা বলিয়া পরিচয় দেন। যাজকেরা সকলেই পীতাম্বর পরিধান করেন, মস্তকে কেশ রাখেন না; দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন। যখন ভিক্ষা

করিতে বাহির হন, তখন বাঁয়ে দক্ষিণে কোন দিকেই দৃষ্টিপাত করেন না। নতশিরে নির্ব্বাক হইয়া চলিয়া যান। কোন গৃহস্থের নিকটে তাঁহারা ভিক্ষা চাহেন না। যে যাহা দেয় তাহাই গ্রহণ করেন। কেহ কেহ অন্নব্যঞ্জনও প্রদান করিয়া থাকেন।

সিংহলে চারি প্রকার ধর্ম্মাবলম্বীর বাস। বৌদ্ধ, শৈব, সৌর ও খ্রীষ্টান। অপর তিন সম্প্রদায়ের অপেক্ষা বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংখ্যাই বেশী।

সমুদ্রতীরে রাবণহাট বলিয়া একটী স্থান আছে। জনশ্রুতি এই যে, সেই স্থানে রাবণের পুরী ছিল। কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই পুরী এখন সাগরগর্ভে শিলাখণ্ডে পরিণত হইয়া সংসারের অনিত্যতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে।

কলম্বো নগরে চিত্রশালিকা ভিন্ন উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্য আর একটীও নাই। সিংহলের আদিম লোকেরা সাধারণতঃ স্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন। সিংহলে দুর্ভিক্ষ হয় না। নিতান্ত দরিদ্রের সংখ্যা অতি অল্প। সিংহলবাসীদের মধ্যে ভিক্ষুক নাই, স্থানে স্থানে যে দুই এক জন ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা ভারতবর্ষ হইতে সমাগত। সিংহলীরা কুলীর কর্ম্মকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করে। ইংরাজদিগের চা-ক্ষেত্রে ও কাফি ক্ষেত্রে যাহারা কার্য্য করে তাহারা ভারতবর্ষবাসী তামিল। স্যার এড্‌ওয়ার্ড ক্রেসি বলিয়াগিয়াছেন লণ্ডন নগরে শীতকালে একদিনে যত গরিব লোকের কষ্ট দেখা যায়, আমি নয় বৎসর সিংহলে আছি, ইহার মধ্যে কখন কুত্রাপি দরিদ্র লোকের তত কষ্ট দেখি নাই।

বাঙ্গালীদের অবয়বের যেরূপ বর্ণ সিংহলীদেরও তদ্রূপ। তাহারা যে বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক বলবান, লক্ষণ দেখিয়া তাহাও বোধ হয় না। স্ত্রী পুরুষের পরিচ্ছদ প্রায় এক প্রকার। পুরুষেরা কাছা দেয় না, মাথায় চিরুণি পরে। স্ত্রীলোকেরা পিরাণ গায়ে দেয়, মাথায় কাপড় দেয় না। চিরুণির পরিবর্ত্তে মস্তকের কেশে কাঁটা পরিয়া থাকে।

সিংহলে পানের বরজ দৃষ্ট হয় না। তাম্বুললতা গুবাকবৃক্ষ বেষ্টন করিয়া বর্দ্ধিত হয়।

কবিকল্পনা সার্থক; রত্নাকরগর্ভস্থ লঙ্কাপুরী প্রকৃতই রত্নালয় ও কনকলঙ্কা অভিধানে অভিহিত হইবার উপযুক্ত।

সিংহলের অধিবাসী সংখ্যা ঊনত্রিশ লক্ষ। এখানকার প্রধান নগর কলম্বো (রাজধানী), কান্দী, গালি এবং ত্রিঙ্কোমালী। সমুদ্রতীর হইতে দর্শন করিলে সিংহলদ্বীপের উদ্ভিজ্জশোভা নিরন্তর চিত্তচমৎকারিণী। যতই অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করা যায়, উর্ব্বরা ভূমির শোভাসমৃদ্ধি ততই বর্দ্ধিত হইয়া মনোনয়নের প্রীতি উৎপাদন করে। সমুন্নত পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশ হইতে ভারতসাগরের বারিবিধৌত সিকতাময় তীরভূমি পর্য্যন্ত সমস্তই নানাবর্ণের তরুলতায় সুশোভিত; সৌন্দর্য্য ও প্রাচুর্য্য, উভয়ই চিত্তাকর্ষক। তরুলতাশূন্য পাষাণভূমি প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। অল্প দিন হইল, সিংহলের সর্ব্বোচ্চ গিরি পিদ্রোতালগল পর্ব্বতের উচ্চ শিখরোপরি এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই শোভাময় উদ্ভিদ্‌রাজ্যের উদ্ভিজ্জমালার মরণজীবন উভয়ই আশুগতি সম্পন্ন হইয়া থাকে;—অদ্য যে বৃক্ষ পতিত হয়, কল্য তাহা অদৃশ্য;—

নিবিড় অরণ্যমধ্যে গতিরোধক মৃত বৃক্ষের বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না;—পতনমাত্রেই অচিরাৎ লতাজাল ও কীটপুঞ্জে সমাবৃত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়া যায়। কলম্বোতে ১ লক্ষ ২০ হাজার, কান্দীতে ২৪ হাজার, গালীতে ৩৫ হাজার, এবং ত্রিঙ্কোমালীতে ৫১ হাজার লোকের বাস। ইউরোপীয়, ইউরেসীয়, সিংহলী, তামিল, মুর, মালবারি এবং বেদা, এই সকল জাতি এক্ষণে এখানে বাস করে। শেষোক্ত কয়েক শ্রেণীর কতক কতক বিবরণ যথাস্থানে প্রকটিত হইবে।

মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ টিউটিকরিণ বন্দর হইতে কলম্বো নগর তরণীযোগে দুই দিনের পথ। দূরতায় ১৫৩ মাইল। জাহাজের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া প্রায় ৬০ টাকা। রেল-পথে কলম্বো হইতে কান্দীনগর ৭৫ মাইল দূর। প্রথম ৩০ মাইল সুবিস্তৃত পরিষ্কার সমতলভূমি। সেই ভূভাগে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতীকুল ও সুসজ্জিত তরুলতার প্রাকৃতিক শোভা সর্ব্বাংশেই চিত্তহারিণী। প্রকৃতির সেরূপ নয়নমোহিনী শোভা ও উদ্ভিজ্জাবলীর তাদৃশ মোহনীয় বর্ণবৈচিত্র্য আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর লতাকুঞ্জ, স্থানে স্থানে নয়নরঞ্জন কুসুমকানন, স্থানে স্থানে রজতসূত্রাকারা বারিধারা-প্রবাহিণী সুখময়ী নির্ঝরিণী;—শোভা অতি অনুপম। বোধ হয় যেন, প্রকৃতিসুন্দরী মনের উল্লাসে ফুল্ল ফুলের মুকুট পরিয়া রাজরাণীর ন্যায় উৎফুল্ল আননে মৃদুমন্দ হাস্যচ্ছটা বিকাশ করিতেছেন,—পরিমলবাহী মৃদুসমীরণ সেই সকল লতাপল্প মৃদুহিল্লোলে নাচাইয়া রাজ্ঞীগাত্রে মৃদু মৃদু বীজন করিতেছে, নির্ঝরিণীকুল শত শত ধারে সলিলকণা পরিবর্ষণ করিয়া রাজরাজেশ্বরীর চরণতল বিধৌত করিয়া দিতেছে; দিবা দ্বিপ্রহরের প্রখর প্রভাকর সেখানে সুস্নিগ্ধ বারিসম্পাতে সমাবৃত স্বভাবসুন্দরীর সুন্দর আননে কটাক্ষ বর্ষণে পরাভব মানিতেছেন।

বাষ্পীয় শকটে ভ্রমণকালে সেই মনোরম ক্ষেত্রে বিপুল আনন্দের সঞ্চার হয়; শকটের দ্রুত গতিতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকৃতির নব নব শোভা নয়নগোচর হইয়া থাকে। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন, ক্ষণে ক্ষণে আবর্ত্তন, ক্ষণে ক্ষণে নব নব নর্ত্তকীর নয়নমোহন নবনর্ত্তন; অপরূপ দৃশ্য!—সমতল ভূমির ক্রমশঃই তিরোধান;—দ্রুতগামী শকটের ক্রমশঃই উর্দ্ধগতি। সমুদ্র-সমতল হইতে কান্দী নগর প্রায় দেড় সহস্র ফীট উচ্চ। বাষ্পযান শনৈঃ শনৈঃ অক্ষুণ্ণ বেগে উর্দ্ধপথে আরোহণ করিতে লাগিল। বেগ যেমন আশুতর, তেমনি বিস্ময়কর। এই দেখি, শকটচক্রে কুণ্ডলাকারে বক্র হইয়া বক্র সোপান অতিক্রম করিতেছে, তখনি আবার এক এক ঘূর্ণনে আরোহীকুলকে চমৎকৃত করিয়া ঘর্ঘরশব্দে ঋজুরেখায় সঞ্চারণ করিতেছে। ক্রমশঃই উর্দ্ধগতি। উপর হইতে নিম্নভাগে দৃষ্টিপাত করিলে মনে মনে বিস্ময়রসের আবির্ভাব হয়।

কান্দী-কলম্বো-বর্ত্মের শকটগুলি অতি সুন্দর। যেমন সুপ্রশস্ত, তেমনি সুকৌশলে সমাবৃত। ইহার সহিত দার্জ্জিলিং-হিমালয় শাখার ক্রীড়া-শকটগুলির কোন অংশেই

তুলনা হইতে পারে না। ক্রমোন্নত পন্থাগুলিও বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। পার্ব্বতীয় পন্থার যে প্রকার পদ্ধতি, তদনুসারে মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত কাটিয়া পাহ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এ বিষয়েও ইঞ্জিনিয়ারগণের অসাধারণ ক্ষমতা ও দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ পথে ঐ প্রকারের ত্রয়োদশটী পাষাণভেদী সুড়ঙ্গ আছে। তন্মধ্যে একটী সুড়ঙ্গ প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। তাহার ভিতর দিয়া গাড়ী যায়। সুড়ঙ্গগর্ভ ঘোরতর তিমিরাবৃত। তলভাগে নয়ন নিক্ষেপ করিলে কেবল নিরবচ্ছিন্ন তমোরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্য! কখনও নিবিড় অন্ধকারের গর্ভে সমস্তই ডুবিয়া যাইতেছে, কখনও বা অন্ধকার ভেদ করিয়া শকটশ্রেণী আবার অতলস্পর্শ গভীর গহ্বরের মাথার উপর উঠিতেছে। নিম্নদৃষ্টিতে নেত্রপুট কেবল ঘোরগভীর অন্ধকারের সঙ্গেই মিলিত হয়। স্থানে স্থানে শুভ্ররজতবর্ণ নদী। স্ফটিকসন্নিভ স্রোতস্বতীসলিল শৃঙ্গে শৃঙ্গে লম্ফ দিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে অবিরত তিমিরগর্ভে ঝম্পপ্রদান করিতেছে। শকটের গতি প্রতি ঘণ্টায় ১২ মাইল। যাহা কিছু দেখি, তাহাই অমনি অন্তর্ধান হয়,—চক্ষের নিমেষ পড়িতে বিলম্ব সহে না। দেখিতে দেখিতে দক্ষিণভাগে গিরিদুর্গ (Castle Rock) ও বাইবেলগিরি (Bible Rock) অদৃশ্য হইয়া গেল। যাহা দেখি, তাহাই যেন শকটের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছে বোধ হয়। ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া কতই দৃশ্যপদার্থ পশ্চাতে লুকাইয়া পড়িতেছে।

শকটগতি অবিরাম। হঠাৎ গতিবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। শকটমালা কুণ্ডলাকারে বক্রীভূত হইয়া মৃদুগতিতে একটা সমুন্নত শিখরোপরি আরোহণ করিল। শিখর হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল;—শরীরের রক্ত চলাচল স্তম্ভিত হইয়া গেল;—নিদারুণ আতঙ্কে নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। বামভাগে ভীষণাকার অর্গলা পর্ব্বত;—অর্গলার অর্গলশৃঙ্গ যেন মেঘমালা ভেদ করিয়া গগণ স্পর্শ করিতে সমুত্থিত হইতেছে। আতঙ্কের উপর আরও আতঙ্ক বাড়িয়া উঠিল;—সর্ব্ব শরীর অবশ নিস্পন্দ হইয়া আসিল;—মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল;—চক্ষে যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল! জ্ঞান হইতে লাগিল যেন গাড়ী শুদ্ধ উপর হইতে পাতালে পড়িয়া যাই! বাস্তবিক আর কিয়ৎক্ষণ সেই প্রকার ঊর্দ্ধগতি থাকিলে হয়ত নিশ্বাস রোধ হইয়া যাইত। শীঘ্রই সে আশঙ্কা দূর হইল। বলবান এঞ্জিন মুহূর্ত্ত মধ্যে এক চক্র ঘুরিয়া একটা কেন্দ্র অতিক্রম করিয়া আসিল। মুহূর্ত্তমধ্যেই ভাবান্তর। আর আমরা সেখানে নাই। আতঙ্কক্ষেত্র অতিক্রান্ত। হৃদয়ে আশ্বাসের সঞ্চার। ভয়ের স্থানে ভরসার আবির্ভাব। তখন আমরা শকটের গবাক্ষ হইতে মুখ বাড়াইয়া সেই বিপদক্ষেত্র দর্শন করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে উদ্বেলগিরি (Sensation Rock) অতিক্রান্ত হইল। শকটশ্রেণী কুণ্ডলাকার ধারণ করিয়া ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, নামিতেছে। ক্রমশই ঊর্দ্ধগতির নিবৃত্তি। ধীরে ধীরে সমতল ক্ষেত্রে উপনীত। সেই

স্থানের নাম পিরাদেনিয়া সঙ্গম, (Peradeniya Junction)। আর একটী ষ্টেসন পরেই কান্দী ষ্টেসন। কান্দী হইতে ছুই মাইল দূরে পিরাদেনিয়া নামক জগদ্বিখ্যাত মনোহর উদ্যান। সন্ধ্যার সময় আমরা কান্দীনগরে উপনীত হইলাম।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী।

(ক্রমশ,)

ফুলের বিলাপ।

১

কোন কথা একদিনও, বলিতে পারিনি তারে,
কোন কথা করিনি জিজ্ঞাসা;
নীরবে নয়ন মেলি মুখ পানে চেয়ে চেয়ে
হৃদয়ে পুষিয়াছিনু আশা।

তারি মুখপানে চেয়ে, তারি ভাবে হয়ে ভোর
চিরদিন দেখিছি স্বপন;
কতদিন কতকাল তারি তরে শুনি নাই
একটিও পাখীর কূজন।

সে যবে গাহিত গান, উদাস করিয়া প্রাণ,
গুণগুণি অতি ধীরে ধীরে;
বুকেতে সুরভিরাশি, রাখিতে না পারি আর,
বিলাইয়া দিতাম সমীরে।

এতেতেও একদিন, বলিনি মনের কথা,
কেন সেকি দেখেনি হৃদয়?
স্তব্ধতার ভাষা সেকি একদিনও পড়ে নাই,
তবে কেন এত নিরদয়?

সুরভির আবরণে, কাছে এলে ঢাকিতাম
হৃদয়ের ভাবটি আমার;
চাহিলে আমার পানে, বুঝিল ভাবিয়া মনে
লুকাতেম তাহারে আবার।

ঢেকে ঢেকে রেখেছিনু, তাই বুঝি বোঝে নাই
তাই বুঝি বাসে নাই ভাল;
কি বলিব কার দোষ, জনমদুখিনি আমি,
অভাগীর দারুণ কপাল।

বুঝিল না এ অভাব, বুঝালে কি হ'ত দূর?
বুঝালেও যদি না বুঝিত,
তা হলে সে বজ্রাঘাত, অশ্রুভরা প্রাণ মোর,
বল সখি কেমনে সহিত?

ধীর চাহনির মোর, বুঝিল না ভাষা যেই
বুঝিতে কি পারিত সেজন?
আবর্ত্তনে পরিপূর্ণ আবেগ উচ্ছ্বাসময়
বিধূনিত প্রাণের প্লাবন।

২

বুঝে নাই বলিয়া তাহারে
দোষ আছে ভাল বাসিবারে?
অনন্ত সুরভিরাশি দিয়া
পূজা তারে করিব যতনে;
বসাইয়ে প্রাণের মাঝারে
নিরখিব শয়নে স্বপনে।
নীরবে ছিলাম আমি সখি,
নীরবেই থাকিব এখন;

ফেলিব নীরবে দীর্ঘশ্বাস,
নীরবেই করিব রোদন।
নীরবে পড়িব যবে ঝরি
অতি ধীরে মাটির উপরি।
সে যদি খুঁজিতে আসে মোরে
দেখাইও সমাধি আমার;
প্রাণের অমৃতরাশি ল'য়ে
ধ্যানে মগ্ন রহিব তাহার।
একবিন্দু অশ্রুজল যদি
আমা তরে করে বরিষণ;
কঙ্কালের শরীর আমার
সেই দিন মেলিবে নয়ন।
সেই দিন করিব প্রকাশ
হৃদয়ের অপার বাসনা,
মেটে যদি—মিটাইব তবে
হৃদয়ের গভীর কামনা।
নতুবা—নতুবা সখি শোন
দুদণ্ডের মত মরিব না;
এমন অগাধ মৃত্যু হবে
যাহা হতে কভু উঠিব না।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

মুসে গাম্বেতা।

অবতরণিকা।

পূর্ণিমানিশি—পারি নগর।

আজ পূর্ণিমা নিশি। নীল আকাশে চাঁদ হাসিতেছে। স্থির জগৎ আনন্দ হিল্লোলে ভাসিতেছে। সান্ধ্য সমীরণ ফুলের সৌরভ চুরি করিয়া ঈষদ্মন্দ গতিতে পলাইতেছে। সিন্ নদী কুল্ কুল্ স্বরে সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে। নদীর উভয় উপকূলে অট্টালিকাশ্রেণী। সেই শুভ্র হর্ম্ম্যমালা স্বচ্ছসলিলা সিনের বক্ষে প্রতিফলিত হইয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন পারির সুন্দর ছবিখানি জলের উপর ভাসিতেছে। প্রাসাদশ্রেণীর মধ্যে একখানি অট্টালিকা অতি বৃহৎ। উহার নাম "কেফিপ্রকোপ।" উহার সম্মুখে পারির প্রধান নাট্যমন্দির। ফরাসি বিপ্লবে যে যে মহাত্মারা প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, ঐ দেখ তাঁহাদের প্রাসাদ চতুর্দ্দিকে। বলতেয়ার ও তাঁহার পরবর্ত্তী বিদ্বানমণ্ডলী ঐ কেফিপ্রকোপে প্রতিদিন রজনীযোগে গমন করিতেন। তথায় নানা বিষয়ে তাঁহাদের তর্কবিতর্ক হইত। ঐ স্থানে মধ্যে মধ্যে একটী বিরাট সভা বসিত। আজ পূর্ণিমা নিশিতে সেই সভার অধিবেশন।

সভাগৃহ লোকে লোকারণ্য। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে কেবল একটী মাত্র শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। সভাস্থল হইতে এক মধুর নিক্কণ নিঃসৃত হইয়া কলস্রাবী নদী-বক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে। কখন বা জলদনির্ঘোষে সেই ধ্বনি চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে চমকিত করিয়া

শনৈঃ শনৈঃ গগণপথে ছুটিতেছে। উচ্চ মঞ্চ হইতে এক দীর্ঘাকৃতি যুবা পুরুষ বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিতে সুন্দর, সুশ্রী, প্রশান্তমূর্ত্তি। দেহ লাবণ্যময়; মুখশ্রী কোমল; কান্তি গৌরবর্ণ; অঙ্গসৌষ্ঠব পরিষ্কার; বিস্তৃত ললাটফলক; আকর্ণপূরিত লোচন—সে চক্ষু হইতে অবিরল এক প্রকার জ্যোতি নির্গত হইতেছে—দেখিলেই প্রতীতি জন্মিবে যে তিনি একজন অলৌকিক ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ। সেই প্রখর দৃষ্টির তীব্র সঞ্চালন দৃষ্টে বিজলীখেলা বলিয়া সহজেই ভ্রম হইতে পারে। কার্য্যকরী শক্তি, উৎসাহ, অধ্যবসায়, মানসিক বল—এই সমস্ত গুণ যেন একাধারে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার স্বর জলদগম্ভীর অথচ মধুর—যেন ভৈরবে কোমলে মিশামিশি। যুবার অধরোষ্ঠ হইতে অনর্গল বক্তৃতাধারা প্রবাহিত। বিষয়—"ফ্রান্সের ভাবী পরিণাম।" শ্রোতৃবর্গ প্রসর্পিত মন্ত্রে অহিকুলের ন্যায় বাঙ্মুগ্ধ, নিশ্চল, নিস্পন্দ, বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য।

পাঠক, বলিতে পার ঐ যুবা কে?—উঁহার নাম মুসে গাম্‌বেতা।

স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের আদর্শ-স্থল, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ মুসে গাম্‌বেতা সন্ন্যাসী-প্রবর ম্যাট্‌সিনীর ন্যায় কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সকলের হৃদয়রাজ্যে যে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন আজিও তাহা অক্ষুণ্নভাবে রহিয়াছে এবং চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকিবে। উহা বিলুপ্ত হইবার নহে। সাধনার নূতন পথ তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা অন্ধজাতির পথপ্রদর্শক ও গুরু-স্থানীয়। ওয়ালেস্, ব্রুস, টেল্, কসথ্, ওয়াসিংটন্, গারিবল্‌ডি, ও ম্যাট্‌সিনী—রাজনৈতিকগগণে ইঁহারা একটী উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডল,—"সাতভাইচম্পা।" গাম্‌বেতাও ঐ পুঞ্জের অন্যতম তারকা।

প্রথম অঙ্ক।

১।

ফ্রান্সের রাজধানী পারিনগরের অনতিদূরে কোহর গ্রাম। ১৮৩৮ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখে তথায় গাম্‌বেতার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা জেনোয়া দেশনিবাসী এক জন সমৃদ্ধিশালী বণিক ছিলেন। কোহর গ্রামে তাঁহার একখানি প্রকাণ্ড বিপণি ছিল। উহার বিপুল আয়ে তাঁহার সংসার গুজরাণ হইয়াও যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় হইত।

পুত্রের শুভকামনা করিতে পিতা মাতা কখন ত্রুটি করেন না। পুত্র ধার্ম্মিক হয়, সাধু ও সচ্চরিত্র হয়, তাঁহাদের সেই বাসনা। সেই উদ্দেশে গাম্‌বেতার পিতা তদীয় পুত্রকে মণ্টাবো গ্রামের এক বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার্থ পাঠাইয়া দিলেন; এবং যাহাতে পুত্র পরে ঋত্বিকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আপন সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহারও উপায় স্থির করিয়া রাখিলেন। যাজকের বৃত্তি গাম্‌বেতার আদৌ ভাল লাগিল না। তিনি মণ্টাবো হইতে পলায়ন করিলেন। এই সময়ে

তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট হইল। কুচক্রী লোকে এ সম্বন্ধে অনুমান করিয়া থাকে যে, স্বইচ্ছায় গাম্বেতা আপন চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। বাল্যাবধি গাম্বেতা অতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। একদিন এক কর্ম্মকারের দোকানে বসিয়া ব্যগ্রতাসহকারে তাহার কার্য্য দেখিতেছিলেন; হঠাৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ এক টুকুরা উত্তপ্ত লৌহ আসিয়া তাঁহার দক্ষিণ চক্ষে প্রবেশ করিল। কোনরূপ প্রতিকার না করাতে ক্রমে চক্ষুটি নষ্ট হইয়া গেল।

মণ্টাবো পরিত্যাগ করিয়া কোহর কলেজে আসিয়া গাম্বেতা ভর্ত্তি হইলেন। সেখানে ৮।১০ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিলেন এবং যত্ন ও অধ্যবসায়বলে সহপাঠীর মধ্যে আপন প্রতিপত্তি স্থাপন করিলেন। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কোহর কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া আইনশিক্ষা মানসে গাম্বেতা পারিতে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং হোটেলডুভার নামক পান্থশালায় আসিয়া বাসা লইলেন। এই সময়ে গাম্বেতার পিতা, পুত্রের শিক্ষা ও বাসাখরচের জন্য মাসিক ১২০৲ টাকা করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। ঐ টাকায় গাম্বেতার এক প্রকার বেশ চলিতে লাগিল। এইরূপে পারিতে তাঁহার সুখে ও সচ্ছন্দে দিন কাটে। সহাধ্যায়ীগণ সন্ধ্যার পর আসিয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইত। তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপে, তর্কবিতর্কে ও আমোদ প্রমোদে তিনি অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিতেন। বন্ধু বান্ধব স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গেলে পর তিনি রাত্রি ২।৩টা পর্য্যন্ত স্থির মনে নির্জ্জনে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। যতদিন পারিতে ছিলেন, গাম্বেতার শরীর সুস্থ ও সবল ছিল এবং তাঁহার মনে স্ফূর্ত্তিরও অভাব ছিল না। মধ্যে মধ্যে তিনি কেফি প্রকোপে উপস্থিত হইতেন। সে স্থানে কেবল বিদ্বানমণ্ডলীর সমাগম। শুনা যায় মণিয়র, বলতেয়ার, রাসিন্, কর্ণিলি, কুজান্, মণ্টেস্ক্, লা ফণ্টেন্ প্রভৃতি সাহিত্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রসকল এই স্থানে উদিত হইয়া দীপ্তিজালে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতেন। ভগবান সহায়, বলবতী ইচ্ছা, অবস্থা অনুকূল। আর চাই কি? এই ত কার্য্যসিদ্ধির উপাদান। এই তিনের সংযোগ হইলে কাহারও সফলকাম হইতে কালব্যাজ হয় না। গাম্বেতার চারিদিকে সুবিধা ও সুযোগ। তাঁহার জ্ঞানোন্নতির পথ আপনা হইতেই পরিষ্কার রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি ঐ সভাগৃহে গাম্বেতার গতিবিধি ছিল। সেই সকল গুণী ও জ্ঞানী লোকের সহবাসে ও সদালাপে গাম্বেতার বালস্বভাবসুলভ চাপল্য ও প্রগল্‌ভতা বিদূরিত হইল। মনোবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়বৃত্তি সমুদায় পরিস্ফুট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সুবিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও হৃদয়বান পুরুষ বলিয়া গাম্বেতা এখন লোকসমাজে দিন দিন পরিচিত হইতে লাগিলেন।

প্রথম অঙ্ক।

২।

একুশ বৎসর বয়সে গাম্বেতা কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এস্থলে একটী কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল বলিলে আমাদের বুঝা উচিত যে, শিক্ষার সমস্ত অঙ্গগুলি পূর্ণ মাত্রা প্রাপ্ত হইল। মনোবৃত্তির উৎকর্ষ ও শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বলাধান ও পরিবর্দ্ধন এই ত্রিবিধ বিকাশের সমষ্টিকে এক কথায় পূর্ণ শিক্ষা কহে। ইহাদের কোন একটীর অভাব বা বিকৃতি ঘটিলে শিক্ষা অঙ্গহীন হয়। সুখের বিষয় গাম্বেতার শিক্ষা বিকল, বিকৃত বা অঙ্গহীন হয় নাই। তাঁহার শিক্ষা ষোলকলায় পূর্ণ। তাঁহার বিদ্যার গৌরব যথা তথা ও যার তার মুখে শুনা যাইতে লাগিল অল্পদিন মধ্যেই গাম্বেতা আইনজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিলেন। ১৮৫৯ সালের কৌন্সিলিদলে আপন নাম লিখাইলেন; পরে মুসে ক্রিমেও নামক একজন বারিষ্টারের আপিশে কর্ম্ম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

আপিশের নিকট থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া গাম্বেতা তন্নিকটস্থ রু বোনাপার্ত্ত নামক পথে এক চারিতালা বাটীর অংশ ভাড়া লইলেন। সেখানে তিনি আপন পিতৃব্যপত্নীকে আনিলেন ও তাঁহার উপর সংসার খরচের ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত রহিলেন। গাম্বেতা পিতৃব্যপত্নীকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তাঁহার অমতে কোনও কার্য্য করিতে গাম্বেতার সাহস হইত না। মাথার উপরে কেহ না থাকিলে বালক বালিকা প্রায়ই কুপথগামী হয়। যে সংসারে বুদ্ধিমতি গৃহিণী নাই সে সংসারের কোন শ্রেয় নাই। গাম্বেতাকে পিতৃব্যপত্নীর অধীনে ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইত। মনে করিলেই যে বাটীর বাহির হইবেন তাহার উপায় ছিল না। সুখের প্রবাহে যে অঙ্গ ঢালিয়া দিবেন সে পথে কাঁটা। গৃহকর্ত্রীর ভয়ে যে সে লোক বাটীর ভিতরে আসিতে পারিত না। যার তার সহিত গাম্বেতা পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুত্ব করিতে পারিতেন না। তাঁহার বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা এখন অল্প হইল। সদাই পিতৃব্যপত্নীর চক্ষের উপর তাঁহাকে থাকিতে হইত।

অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া গাম্বেতা আপনা আপনি কার্য্য করিতেন। উৎসাহ, যত্ন, পরিশ্রম সেই কার্য্যে ঢালিয়া দিতেন। এইরূপ কিছু দিন কার্য্য করিয়া বিচারালয়ের কাজকর্ম্ম শিখিয়া ফেলিলেন, ও ক্রমে কার্য্যদক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন।

এই সমস্ত কার্য্য করিয়া তিনি যে টুকু অবসর পাইতেন তাহা অকিঞ্চিৎকর আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত না করিয়া সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রের জন্য নানা বিষয়ে প্রবন্ধ ও পত্র লিখিতেন। যে দেশে কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া তাস, পাশা, সতরঞ্চ ও খোস্‌গল্পে লোকে সময় কাটায়, সে দেশে ও সে জাতির ভাবী উন্নতির পথ রুদ্ধ।

স্কুলকলেজে যে শিক্ষা হয় তাহা নামমাত্র শিক্ষা। অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন। পর্য্যবেক্ষণ নহিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। নিখিল জগৎ, বিপুল সংসার, তোমার শিক্ষার স্থল। দেখ, ভাব, শিখ। গাম্বেতার সেই সকল পত্র ও প্রবন্ধে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার বিলক্ষণ পরিচয় দিত। যে কেহ তাঁহার লেখা পড়িতেন তিনিই তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। 'সময় ব্যয়' সম্বন্ধে উপর্য্যুপরি অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। রাজনীতি বিষয়ে গাম্বেতার কিরূপ দক্ষতা সেই প্রবন্ধগুলি তাহারই নিদর্শন।

বিনা সাধনায় সিদ্ধি হয় না। অভ্যাস বা অনুশীলন না করিলে কোন বিষয়ই আয়ত্ত হয় না। গাম্বেতা প্রতিনিয়ত লিখিতে অভ্যাস করিতেন। ক্রমে তিনি একজন খ্যাতনামা লেখক হইয়া উঠিলেন। ফ্রাঙ্কফোর্ত্ত নগরে "জার্ণাল্ দ্য ইউরোপ" নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রচারিত হইত। গাম্বেতা ঐ পত্রে পারির সমস্ত সংবাদ লিখিয়া পাঠাইতেন। ঐ গুরুভার স্কন্ধে লইয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কোর লেজিস্‌লেটিভ্ নামক আইনসভায় উপস্থিত হইতে হইত। কখন কখন সেখানে তাঁহাকে ঘোর বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইত।

সন্ধ্যার পর দুচারিটী বন্ধু তাঁহার বাসায় আসিত। তাঁহাদের সহিত তিনি নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেন ও তাঁহাদের লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন। আমোদ প্রমোদ করিতেন বটে, কিন্তু নিজ কাজ কখনও ভুলিতেন না। কৌন্সিলি বলিয়া ক্রমে তিনি পরিচিত হইয়া বাহিরের কাজ কর্ম্মও পাইতে লাগিলেন। গরিব দুঃখীর প্রতি তাঁহার দয়া ছিল। বিনা বেতনে তিনি তাঁহাদের কার্য্য করিতেন। সংবাদপত্রের পক্ষ অগ্রেই লইতেন ও নির্ভীক হৃদয়ে সত্যের গৌরব রক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেন। গরিবের সহায় বলিয়া তাঁহার নাম গরিবমহলে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছিল।

আপনার জন্য সকলে কাঁদে। তুমি তোমার জন্য, আমি আমার জন্য কাঁদিয়া থাকি। কিন্তু পরের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে, তিনিই দেবতা। গাম্বেতার অন্তর পরের জন্য পাগল, পরের দুঃখে কাতর। সে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আবেগপূর্ণ। তাই তিনি গরিবের উপাস্য দেবতা।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

(ক্রমশঃ।)

রূপ কি ?

তোমার রূপ আছে, আমি তোমায় দেখিয়া মুগ্ধ হই। আমার রূপ নাই, তুমি আমায় দেখিতে পার না—আমায় দেখিয়া তোমার তৃপ্তি-লাভ হয় না। এই মানসিক বিপর্য্যয়ের কারণ কি ?—না রূপের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব। এখন দেখা উচিত রূপ কি ?

দার্শনিক বলিবেন, বস্তু-বিশেষের তেজঃ-সমষ্টি যাহা দর্শকের নয়নপটে প্রতিফলিত হয়, তাহাই রূপ। চিত্রকর বলিবেন, আলোক-আঁধারের সামঞ্জস্তই রূপ। তুমি আমি সাদা কথায় বলিয়া থাকি বর্ণ বা রং। প্রকৃত পক্ষে রূপ যদিও বস্তুর গুণ, তথাপি দর্শকের দৃষ্টিসাপেক্ষ। বস্তুর পাঁচ গুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। একাধয়ে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। অন্ধ—চক্ষুহীন, সে রূপের বিষয় কি জানিবে, রূপের বিষয় কি বুঝিবে ? চক্ষুর বিকারে—রূপের বিকার, আবার রূপের বিকারে—মনের বিকার; উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মরুভূমে মরীচিকার রূপ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। রূপ থাকিতে যেমন বস্তু থাকা চাই—তেমনই চক্ষু থাকাও আবশ্যক। তিনটিই দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ—তিনটিই এক সূত্রে গাঁথা।

তাহাতেই বলি রূপের তারতম্য নয়ন-সাপেক্ষ। দর্শকের রুচি, মনোভাব ও সময়ভেদে রূপের তারতম্য হইয়া থাকে। রূপ ও শ্রী পৃথক—তুমি রূপবান হইতে পার, তাই বলিয়া যে তুমি শ্রীমান হইবে তাহার স্থিরতা কি ? তেমনই শ্রীমান হইলেই তাহাকে রূপবান বলিতে পারা যায় না। দর্শকের রুচি-ভেদে রূপের বৈষম্য দেখ ;—ইংরাজের মতে সুন্দরীর বর্ণ তুষার-সম শুভ্র হওয়া চাই। তোমার আমার কিন্তু বরফের মত ধবলবর্ণ ভাল লাগে কি ? তুমি হয়ত বলিবে ঐ শ্বেতবর্ণের সহিত ঈষৎ হরিদ্রা মিশিলে ভাল দেখায়, আমি হয়ত বলিব একটু লাল মিশ্রিত হইলে নয়নপ্রীতিকর হয়। শ্যামসোহাগিনী রাধা গৌরাঙ্গী—তাঁহার রূপ শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণ করিয়াছিল, আবার সেই রাধাই কালা-চাঁদের কালরূপে মজিয়াছিলেন। যিনি মনে করেন যে, সে রূপে নয়—গুণে ; রাধাকৃষ্ণের প্রণয়তত্ত্ব তিনি বুঝেন না। সৌন্দর্য্যসাগরের সৌন্দর্য্যতরঙ্গেই শ্রীমতীর চিত্ত নিমগ্ন হইয়াছিল। কালিন্দীর তটে সেই কালরূপ প্রথম্ দর্শন করিয়াই রাধিকা বিবশা, বিহ্বলা, গৃহধর্ম্মে বিরাগিণী—

"কি দেখিলাম রূপ তার, ঘরে ফেরা হলো ভার।"

তখন শ্রীকৃষ্ণের নাম পর্য্যন্ত তিনি জানেন না, গুণের পরিচয় কোথায় পাইবেন !—

"নাম যে জানি না তার, সে থাকে গোকুলে।"

তদবধি, শয়নে স্বপনে, গমনে ভোজনে, তাঁহার—

"সেই কালরূপ সদা পড়ে মনে।"

আবার অভিমানের আতিশয্যেও তাঁহার আবদার হইল—"কালরূপ আর হেরিব না।"

ও দিকে শ্রীকৃষ্ণও—

"হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধনদোহন তেজল রে।
চাঁদ চকোর জনু পায়ল রে।
রাই প্রেমরসে ভাসল রে।
মুরছি অবনীতলে পড়ল রে।
অরুণিম লোচন চর চর রে।"

এখনও আর কি বলিতে হইবে যে উভ-য়েই উভয়ের রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আবার দেখ, যখন তোমার মন প্রফুল্ল, হৃদয়ে আনন্দের লহর খেলিতেছে, তখন শারদীয় জ্যোৎস্না তোমার চক্ষে কতই প্রীতিপ্রদ। কিন্তু সেই নিশা, সেই

জ্যোৎস্না—যখন তুমি শোকে আকুল, প্রাণ কাঁদিতেছে, তখন কি তোমায় ভাল লাগে?—তখন তোমার আঁধারে থাকিতে ইচ্ছা হয়, তখন অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন রজনীই তোমার চক্ষে সুন্দর দেখায়। রূপ দৃষ্টি-সাপেক্ষও বটে, আবার রূপ সময়সাপেক্ষও বটে। কোন্ সময় কে কাহারে ভাল দেখে, কে বলিতে পারে? হয় ত এমন সময় দেখা হইয়াছে যে দেখিয়া আর ভুলা গেল না। হয় ত সেই দেখিয়াই আজীবন তাহাকে বলিতে হইল—

"কিক্ষণে নয়নে তোরে হেরেছি রে।"

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সময়-বিশেষে বস্তুবিশেষের রূপ দর্শকের চক্ষে সুন্দর দেখায়। আর বোধ হয় সেই নিমিত্তই দম্পতীর পরস্পর চারি চক্ষু মিলনের শুভক্ষণ এতই স্পৃহনীয়। যখন গগণমণ্ডল সিন্দুরাভ মেঘে আচ্ছন্ন হয়, প্রকৃতির অঙ্গে সুবর্ণের আভা প্রকাশ পায়—তখন লোকে অপভাষায় বলে "কনে বেলা"—অর্থাৎ তৎকালে শ্যামাঙ্গীদিগকেও উজ্জ্বলবর্ণা বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু অন্য সময়ে যে শ্যামাঙ্গী সেই শ্যামাঙ্গীই দেখা যায়। তাহাতেই বলি, রূপের ভাল মন্দ অনেকটা সময়ের উপরও নির্ভর করে।

অনেকে রূপের সহিত গঠনের গোল করিয়া ফেলেন। কিন্তু রূপ এক—গঠন আর। বাউল নিজ গাথায় এই দুই চিত্তের বৈষম্য সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন,—

"তার রূপ কেমন, গঠন কেমন,
গড়েছে কোন্ বিধাতায়?"

এস্থলে রূপ ও গঠন যে ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী তাহা সামান্য চিন্তায় উপলব্ধি হয়। কোন বস্তুর গঠন ভাল হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহার রূপও ভাল হইবে, এমন কথা কি?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চিত্রকরের মতে আলোক ও আঁধারের সামঞ্জস্যই রূপ। কবি ভক্তির উচ্ছ্বাসে অনেকটা ইহার সমর্থন করিয়াছেন,—

"তব চরণ-মহিমা কে জানে?
বিধু-ঘনারুণে বাদ নাই যথা মিলনে।"

এস্থলে দেবের পদযুগল জলদ-শ্যাম, উহার তলদেশ অরুণাভ ও নখররাজি শশিপ্রভ। রবি, শশী ও ঘনজাল পরস্পর বিবাদী, অর্থাৎ একত্রে মিলিত হয় না। কিন্তু কবি চরণের রূপ বর্ণনায় কেমন কল্পনাবলে আলোক-আঁধারের সমাবেশ রক্ষা করিয়াছেন!

কেহ কেহ বলেন, রূপ বস্তুতে নহে, রূপ দর্শকের চক্ষে। কারণ একই বস্তু যাহা তুমি সুন্দর দেখিতেছ, আমি সেরূপ দেখিতেছি না। যাহাকে তুমি ভাল বলিতেছ, আমি বলিতেছি মন্দ। ক্ষণেক চিন্তা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে উহা কেবল ভাষাগত বিভক্তি-বিভ্রমের ফল; পূর্ব্বোল্লিখিত সময় ও রুচিভেদ হেতু রূপ-বৈষম্যের পরিচায়ক।

এ জগত ভাল মন্দয় মিশান—সবারই ভাল মন্দ আছে। রূপের পক্ষেও তাই। রূপ প্রধানতঃ দ্বিবিধ, সু ও কু। যে রূপ দেখিয়া মন উৎফুল্ল হয়, তাহাই সুরূপ; আর তাহার বিপরীত হইলেই কুরূপ। সুরূপও যা, রূপবান্ ও তাই। দুই শব্দের একই অর্থ। স্থলবিশেষে শুদ্ধ "রূপ" বলিলে

স্বরূপ বুঝায়। যেমন—"কি দিব তার রূপের তুলনা"—এখানে স্বরূপ ব্যতীত অন্য অর্থ লাগে না। আবার মানসিক বৈষম্য রূপার্থের পরিপোষক। আমি তোমার রূপে মুগ্ধ—ইহা বলিলে বুঝিতে হইবে যে এস্থলে "রূপ" সৌন্দর্য্যের প্রতিশব্দ, এবং এই সৌন্দর্য্য অপর কিছু নহে, কেবল বর্ণ, শ্রী ও গঠনের সংযোগমাত্র।

এই ভবের হাটে অনেক রকম পাগল বেড়ায়। কেহ রূপের পাগল, কেহ রূপে পাগল। কেহ রূপেরও পাগল, আবার রূপেও পাগল। রূপের উৎকর্ষ সাধনেই যে উন্মত্ত, সেই রূপের পাগল—আহার নাই, নিদ্রা নাই, অন্য চিন্তা নাই—কেবল অহোরাত্র অঙ্গ-সংস্কারেই তৎপর। কি প্রকারে রূপবান হইব—আমায় দেখিয়া সকলে মোহিত হইবে—এই একমাত্র চিন্তাতেই আকুল! আর যে রূপে পাগল, সে হয়ত নিজরূপে পাগল, অথবা অন্যের রূপে পাগল। যে নিজরূপে পাগল—সে আপনার রূপে আপনিই মুগ্ধ—আপনার রূপে আপনিই বিভোর—আপনার রূপ-গরিমায় আপনিই উন্মত্ত। সে মনে করে এ সংসারে তেমন রূপবান আর কেহই নাই! আর যখন অন্যের রূপ দেখিয়া তোমার নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, যখন "সেই রূপ" তোমায় সদাই দেখিতে ইচ্ছা করে, যখনই দেখ তখনই তোমার মন উৎফুল্ল হয়, যখনই দেখ তখনই "নিতুই নব" বলিয়া মনে হয়, দেখিবামাত্র মনে কি জানি কিরূপ একটী ভাবের উদয় হয়—না দেখিলে থাকিতে পার না, তখন তুমি তার রূপে পাগল—তার রূপে মুগ্ধ।

কথায় কথা বাড়ে। রূপ কি ?—বলিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে। ভাষা-বিজ্ঞানে একটু লক্ষ্য করিতে হয়। মোটা-মুটি যত টুকু হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, তাহাই এস্থলে সন্নিবেশিত হইল। উচ্চ কল্পনা পাঠকের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

শ্রীপ্রঃ—

জাতিপ্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত।

২।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে দক্ষিণাপথে যেরূপে জাতিপ্রাতিষ্ঠা সংসাধন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরাংশে যেরূপে জাতিপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়, সেই চিত্র এইবার সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই সময়ে মোগলসাম্রাজ্যের গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছিল; মহারাষ্ট্রীয়েরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া, আপনাদের বল ক্ষয় করিতেছিল; পাণিপথের শেষ যুদ্ধে ও ইঙ্গরেজদিগের সহিত সংঘর্ষে ইহারা ক্রমে ভারতাধিকারের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিল; দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগের ক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছিল ·

আপনাতেই আপনি লুক্কায়িত হইয়া, বিশাল ভারতের একপ্রান্তে থাকিয়া, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে আপনাদের ক্ষতিলাভের গণনা করিতেছিল; ইঙ্গরেজ বলদর্পে ভারতের নানা স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন; সমগ্র ভারত যেন কোন অভাবনীয় শক্তিতে সঞ্চালিত হইয়া, ধীরে ধীরে একদল বিদেশী বণিকের আনুগত্য স্বীকারে উন্মুখ হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের সময়ে পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে হিন্দুর বিজয়পতাকা পুনঃস্থাপিত হয়। ক্রমে পেশাবর হইতে শতদ্রু পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড পঞ্জাবকেশরীর পদানত হইয়া পড়ে।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ যখন পঞ্জাবে আধিপত্য স্থাপন করেন, তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতের সর্ব্বত্র অপ্রতিহত ভাবে আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই। তখনও সিন্ধু ও অযোধ্যাতে মুসলমানের প্রাধান্য ছিল, মহারাষ্ট্রচক্রে মহারাষ্ট্রীয়ের ক্ষমতার শেষ চিহ্ন বিকাশ পাইতেছিল, দক্ষিণাপথের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মুসলমান ভূপতিগণের আধিপত্য ছিল। ইঙ্গরেজ এই সময়ে পঞ্জাবকেশরীর উদীয়মান সৌভাগ্য ও লোকাতীত ক্ষমতা দেখিয়া, তাঁহার সহিত মিত্রতাস্থাপনে অগ্রসর হন। এ অংশে ইঙ্গরেজ বিশিষ্ট উদারতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। পঞ্জাবকেশরীও উদারভাব দেখাইতে বিমুখ হন নাই। যখন উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব বন্ধন হয়, তখন একজন তেজস্বী শিখযুবক আপনাদের দেশে বিদেশী ইঙ্গরেজদিগকে সমাগত দেখিয়া, নির্ভয়ে নিষ্কোষিত তরবারির আস্ফালন করিতে করিতে মহারাজ রণজিৎসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া কহে, "মহারাজ! বিদেশী ইঙ্গরেজেরা আমাদের রাজ্যে আসিয়াছে; আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, তাহারা আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে; যদি এই মুহূর্ত্তে আপনি তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি না দেন, তাহা হইলে এই তরবারির আঘাতে আপনার সহিত আপনার বংশের সমুদয় ব্যক্তির প্রাণসংহার করিব।" অসময়ে অতর্কিত ভাবে যুবকের মুখে এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া, পঞ্জাবকেশরী বিচলিত হইলেন না, তিনি সস্মিতবদনে যুবকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "যুবক! তোমার সাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু ইঙ্গরেজের সহিত আমি বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ; তাহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিব না; আমি মাথা বাড়াইয়া দিতেছি; তোমার উত্তোলিত অসি আমার স্কন্ধেই পতিত হউক।" পঞ্জাবকেশরীর এইরূপ স্নেহপূর্ণ কথায় যুবকের ঔদ্ধত্য দূর হইল; যুবক সলজ্জভাবে উন্নতমস্তক অবনত করিল। রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে একজোড়া স্বর্ণাভরণ দিলেন। যুবক হৃষ্টচিত্তে মহারাজপ্রদত্ত মহাপ্রসাদ লইয়া চলিয়া গেল।

মহারাজ রণজিৎসিংহ এইরূপে চিরদিন পবিত্র মিত্রতার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন ইঙ্গরেজসেনানী তাঁহার দরবারে উপস্থিত হন, তখন তিনি আদরের সহিত তাঁহাকে অনেক গোপনীয় বিষয় দেখাইতেও বিমুখ হন নাই। তাঁহার

বিশ্বস্ত অমাত্যগণ এ বিষয়ে নানা আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। এইরূপ সহৃদয়তায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবকেশরীর সমুচিত আদর ও অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করেন নাই—এই সৌজন্যে ও এই সহৃদয়তায় উভয় পক্ষেরই রাজশক্তি অপ্রতিহত ছিল। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে আর কেহই পঞ্জাবকেশরীর ক্ষমতাস্পর্দ্ধী হয় নাই। ভারতের আক্রমণকারিগণ এই স্থান দিয়াই ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। সুলতান মহম্মুদ এই পথে ভারতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহম্মদগোরী এই পথে আসিয়া দৃশদ্বতীর তীরে বিজয়পতাকা স্থাপন করিয়াছিলেন; তৈমুরলঙ্গ, বাবরশাহ, নাদেরশাহ, অহম্মদশাহ, দোরবাণী প্রভৃতিও এই পথে সমাগত হইয়া বিভিন্ন সময়ে ভারতের ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। শেষে পঞ্জাবকেশরীর ক্ষমতায় ভারতাক্রমণের এই দ্বার নিরুদ্ধ হয়।

ইহাতে ইঙ্গরেজের বিশেষ লাভ হইয়াছিল। মহারাজ রণজিৎসিংহ মধ্যস্থলে অটল বিরাট্ পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকাতে দুরন্ত আফগান ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া গোলযোগ বাধাইতে সমর্থ হয় নাই। ফলে রণজিৎশাসিত পঞ্চনদ ইঙ্গরেজের রাজ্যরক্ষার অভেদ্য প্রাচীর স্বরূপ ছিল, এবং বীরকেশরী রণজিৎসিংহ স্বয়ং ইঙ্গরেজের রাজশক্তির অদ্বিতীয় অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। আওরঙ্গজেব শিবজীর বিরাগ উৎপাদন করিয়া, আপনার বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ করিয়াছিলেন, আর ইঙ্গরেজ রণজিৎসিংহের সহিত বন্ধুত্বগৌরব রক্ষা করিয়া, আপনাদের রাজ্য সুদৃঢ় ও সুব্যবস্থিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে দিন পঞ্চনদের এই রাজশক্তির অধঃপতন হয়, ইংরেজ যে দিন চিরমিত্র পঞ্জাবকেশরীর রাজ্য হস্তগত করেন, সেই দিন হইতেই ইঙ্গরেজ আপনাদের মধ্যে গুরুতর গোলযোগের সূত্রপাত করেন। অদ্যাপি এই গোলযোগের শান্তি হয় নাই। অদ্যাপি ইঙ্গরেজ আফ্‌গানিস্তান লইয়া নানা বিভ্রাটে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। ভারতাক্রমণের পথ নিরুদ্ধ করিতে অদ্যাপি ইঙ্গরেজের বিপুল অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের একশেষ হইতেছে।

এইরূপে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে দুইটি বিভিন্ন রাজশক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব সভ্য জগৎকে মহান্ ভাবের উপদেশ দিতেছে। একসময়ে একটি হিন্দুরাজশক্তি একটি বিস্তৃত রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল; অন্য সময়ে অন্য একটি হিন্দুরাজশক্তি, একটি বিস্তৃত রাজ্যরক্ষার অবলম্বনস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইঙ্গরেজ যে নীতি অবলম্বন করেন, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে আওরঙ্গজেব সেই নীতির অনুসরণ করিলে, বোধ হয় তদীয় বিশাল সাম্রাজ্যের অধোগতি হইত না। আর আওরঙ্গজেবের প্রবর্ত্তিত নীতি ইঙ্গরেজ অবলম্বন করিলে, বোধ হয় ভারতে তাঁহাদের প্রভুশক্তি বদ্ধমূল হইয়া উঠিত না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে লর্ড ডালহৌসী একবার এই নীতির অবমাননা করাতে, ভারতে কিরূপ ভয়াবহ

বিপ্লবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। যাঁহারা জগতে আপনাদের প্রভাব বিস্তারে উন্মুখ হন, আপনাদের প্রভুশক্তি বদ্ধমূল ও সাধারণের বরণীয় করিয়া তুলিতে যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, ইতিহাসের এই গভীর সত্য, ন্যায়ের এই গভীর উপদেশ তাঁহাদের উপেক্ষণীয় নহে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

যোগিচর্য্যা।

যোগিগণের নিত্যানুষ্ঠেয় আচার ব্যবহার যোগিচর্য্যা-নামে অভিহিত। যোগী হইবার পূর্ব্বে অথবা যোগাভ্যাসের সময়ে যোগীরা কতকগুলি নিত্যপ্রতিপাল্য নিয়ম অভ্যাস করেন। তৎপ্রভাবে তাঁহাদিগের দেহপ্রভা সমুজ্জ্বল ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসা-বৃত্তি শতগুণে উত্তেজিত হইয়া থাকে। যোগিগণের প্রকৃতি আমাদের প্রকৃতি অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে বিভিন্ন;—এত বিভিন্ন যে, তাঁহাদিগকে দেখিলে এ সংসারের লোক বলিয়া কোনক্রমেই বোধ হয় না।

যোগিগণের চরিত্র অনেক পরিমাণে শিক্ষাগঠিত। সে চরিত্র অলৌকিক যোগশক্তির উদ্দীপক, এবং সাধারণ সংসারীলোকের হৃদয়ে ভক্তিপুষ্পবিকাশক। যোগীপুরুষ দর্শন করিলে আমাদিগের মনে যে অভূতপূর্ব্ব ভক্তিভাবের আবির্ভাব হয়, তাঁহাদিগের তাদৃশ অলৌকিক যোগশক্তিই তাহার মূল। যোগীরা সচরাচর যে সকল নীতি প্রতিপালন করেন, সে সকল নীতি তাঁহাদিগের শাস্ত্রে লিখিত নাই। সুতরাং তাহা সংসারী পণ্ডিত লোকেরও অজ্ঞাত। আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছি, যোগীরা অনেকগুলি কার্য্য কেবল গুরূপদেশপরম্পরায় শিক্ষা করিয়া থাকেন। সেই সকল বিশুদ্ধ ব্যবহার অথবা যোগিচর্য্যা আমরা একে একে ক্রমান্বয়ে পত্রস্থ করিব; পাঠকেরা দেখিবেন, তাহা কেমন সুখকর ও কেমন সুকৌশলসম্পন্ন।

স্থিরাসন।

অচঞ্চল উপবেশনের নাম স্থিরাসন। আমরা অধিকক্ষণ এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না;—যোগীরা তাহা পারেন। দীর্ঘকাল একভাবে এক স্থানে বসিয়া থাকিতে হইলে আমাদের দারুণ যন্ত্রণা বোধ হয়; সেই জন্য আমরা ক্ষণে ক্ষণে এ পাশ ও পাশ করি, কখনও হেলিয়া পড়ি, কখনও কুব্জাকার ধারণ করি, মধ্যে মধ্যে পদপ্রসারণ ও পদপরিবর্ত্তন করিয়া উপবেশনকষ্ট বিদূরিত করিবার প্রয়াস পাই;—অনেকের আবার এরূপ অভ্যাস দেখা যায় যে, তাঁহারা হয় পদকম্পন, অথবা অঙ্গ অঙ্গ পরিচালন না করিয়া উপবিষ্ট থাকিতে পারেন না। বস্তুতঃ বহুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে অনেকেই অনভ্যস্ত। যোগিগণের মতে ঐরূপ চঞ্চলভাব বিশেষ দুর্নীতি বলিয়া গণ্য। তাঁহারা বলেন, যখন

বসিতে হইবে, তখন সুস্থিরভাবে বসিয়া থাকাই কর্ত্তব্য। এদিক ওদিক চাওয়া, এপাশ ওপাশ করা, অঙ্গবিকম্পন, মস্তক সঞ্চালন, এ সকল অত্যন্ত কু-অভ্যাস। ঐ সকল কু-অভ্যাস বর্জ্জন করিতে না পারিলে যোগাসনসিদ্ধি অথবা সমাধি, এই উভয়ের কিছুই আয়ত্ত করিতে পারা যায় না। অতএব, ঋজুদেহে অচল অটলভাবে বসিয়া থাকিতে অভ্যাস করা নিতান্ত বিধেয়। কিছুকাল ঐরূপ অভ্যাস হইলে উহা আর কষ্টপ্রদ বলিয়া বোধ হইবে না।

ঋজুদেহে অচল অটলভাবে উপবেশনের অনেক সুফল আছে। ঐরূপ উপবেশনের গুণে অঙ্গযষ্টি দৃঢ়, সবল ও তেজস্কর হয়; আলস্যশূন্যতা, স্বাস্থ্যকারিতা লাভ হয়;—উহাতে রজোবৃত্তির ক্ষয়, চাঞ্চল্যবিনাশ ও অন্যের দর্শনীয়তা জন্মে; এবং উহার দ্বারা বুদ্ধিস্থৈর্য্যেরও বিশেষ সহায়তা হয়।

নিষ্ঠীবনসংযম।

নিষ্ঠীবনসংযম অর্থাৎ সর্ব্বদা থুথু না ফেলা। আমরা সর্ব্বদা ছেপ্, কাশ, থুথু পরিত্যাগ করি, যোগীরা তাহা করেন না। তাঁহারা বলেন, সর্ব্বদা নিষ্ঠীবন পরিত্যাগে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। সেই ক্ষতির নিবারণ জন্য নিষ্ঠীবনসংযম নিতান্ত বিধেয়।

আমাদের রসনাযন্ত্রে সর্ব্বদাই রসসঞ্চার হইতেছে। সেই রস আমাদের হিতকারী, শরীরের পরিপোষক ও ভুক্তবস্তু পরিপাকের প্রয়োজনীয় সহায়। তাদৃশ হিতকারী সহায়-পদার্থকে বারম্বার অথবা সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিলে অবশ্যই অজীর্ণ ও অম্লরোগ জন্মে;—বার বার গলা টানিয়া থুথু ফেলা অভ্যস্ত হইলে, হৃদ্যালস্থ শ্লেষ্মা সমাকৃষ্ট হইয়া ক্রমে কাশরোগের উৎপত্তি করিতেও পারে। তদ্ভিন্ন, উহার দ্বারা শরীরস্থ আত্মতেজেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, যে সকল লোক সর্ব্বদা থুথু ফেলে, তাহারা হয় দুর্ব্বল, না হয় নিতান্ত রুগ্ন। এই সকল কারণে নিষ্ঠীবনসংযম আমাদের পক্ষেও একান্ত আবশ্যক। নিষ্ঠীবন সংযম করিতে পারিলে শরীরের বল, বর্ণ, পাচক তেজ ও আত্মজ্যোতি, সমস্তই সংরক্ষিত হয়।

নিদ্রাকালে মুখের রস শ্লেষ্মাদূষিত পূতিভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই কারণে মুখপ্রক্ষালনকালে উত্তমরূপে মুখ পরিষ্কার করা উচিত। মুখপ্রক্ষালনের পর মুখে যে নূতন রস উৎপন্ন হয়, সে রস কদাপি পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। দীর্ঘকাল এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে করিতে শরীর মন উভয়ই সুস্থ হইয়া আসিবে, এবং বাক্‌শক্তি সুপরিষ্কৃত হইবে।

হাস্যসংযম।

আনন্দজনিত মুখবিকাশের নাম হাস্য। মনোমধ্যে আনন্দের উদ্রেক হইলে অধরৌষ্ঠের প্রফুল্লভাব প্রদর্শন করাই উচিত; মুখব্যাদান করিয়া সশব্দে হাস্য করা উচিত নহে। সশব্দ হাস্যে শরীরেরও হানি হয়, চিত্তেরও লঘুতা জন্মে। পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, চিরদিন হোহো শব্দে হাস্য করা যাহাদের অভ্যাস, তাহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে না; তাহাদের বুদ্ধিশক্তিও অল্পতেজস্বিনী হয়। (ক্রমশঃ।)

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

তরঙ্গিনী।

(উপকথা।)

প্রথম অধ্যায়।

নিরঞ্জন ঘোষ, কায়স্থকুলে মহাকুলীন। নিবাস পূর্ব্ববঙ্গ, যশোর জেলা। তিনি অল্প বয়সেই পিতৃহীন। গৃহে মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভিন্ন আর কেহই নাই। ভগ্নীটি বিধবা। ভগ্নীর বিবাহ একটা বড় ঘরে হইয়াছিল; স্বামিবিয়োগের পর শ্বশুরকুলের ধনসম্পত্তি তিনি কতক পাইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই, সহোদর নিরঞ্জনের প্রতিই তাঁহার পুত্রস্নেহ বর্ত্তিয়াছিল। ভগ্নীর নাম কমলা। কমলার কল্যাণেই তাঁহার মাতা ও সহোদরটির গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছিল। নিরঞ্জনের পিতা হরিহর ঘোষ বিষয় বৈভব কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; শেষ দশায় তিনি ঘোর দারিদ্র্যে দিনপাত করিয়া গিয়াছেন।

যশোর জেলার এই ঘোষ-বংশ কিন্তু বুনিয়াদী ঘর; কুলে শীলে, ধনে মানে ইঁহারা এককালে দেশমধ্যে মহামান্য ছিলেন। সে কাল অনেক কাল গিয়াছে। চিরচঞ্চলা কমলা চিরকিঙ্করকে চীরবাস পরাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের কমলা অনেক কাল চলিয়া গিয়াছেন; এখন কিন্তু এই বিধবা কমলা, দেবতারূপিণী হইয়া ঘোষেদের সংসারে বিরাজ করিতেছিলেন। সহোদর ও জননীর মুখ চাহিয়া, আর তাহাদের দুঃখ নিবারণ করিয়া, তিনি আপনার বৈধব্যযন্ত্রণা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

পিতার পরলোকপ্রাপ্তির সময়, নিরঞ্জনের বয়ঃক্রম বারবৎসর মাত্র ছিল। আমরা শতাধিক বর্ষের কথা বলিতেছি—সে সময়ে ইংরেজীশিক্ষার প্রচলন হয় নাই। ইংরেজ সবে মাত্র রাজ্যাধিকার করিয়াছেন। পারস্য ভাষাতেই তখন রাজকার্য্য চলিত। কর্ম্মার্থীরা মৌলবীর কাছে পারসী ভাষাই শিখিত। যত দিন পিতা জীবিত ছিলেন, ততদিন নিরঞ্জনও পার্সীচর্চ্চা করিয়াছিলেন; পিতৃবিয়োগের পর সে শিক্ষার আর সুযোগ হইল না। তখন পারসী ছাড়িয়া, তিনি পুরোহিত মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পুরোহিত মহাশয় সংস্কৃতশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত। নিরঞ্জনের দৃঢ়ানুরাগ দেখিয়া তিনি অতি যত্নে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে ব্যাকরণ, কাব্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে এক প্রকার ব্যুৎপন্ন করিয়া দিলেন।

নিরঞ্জনের বয়ঃক্রম যখন উনিশ বৎসর হইল, তখন তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য মাতা ও ভগ্নী বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের এক কুলীন-কন্যার সহিত নিরঞ্জনের কুলক্রিয়া সম্পন্ন হইল। মেয়েটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা, দেখিতে শুনিতেও মাঝামাঝি রকমের;—নাটক নভেলের নায়িকা হইবার উপযোগিনী নহে। এই বিবাহের দুই মাস পরে

নিরঞ্জন একবার কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় তাঁহার মাতুলালয়। মাতা ও ভগ্নীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া, নিরঞ্জন বিষম বিপাকে পড়িলেন। নিতান্ত অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও মাতা ও ভগ্নীর অনুরোধে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইল। এ কালের পাঠক পাঠিকা কথাটা শুনিয়া চমকিয়া উঠিবেন না। তখন কায়স্থজাতির কোন কোন বংশে "আদ্যিরসের" বড় আদর ছিল। একটা কথাই আছে—

আদ্যিরস প্রতিসারণ নাইকো যার ঘরে।
হয় নয় কায়স্থ সন্দেহ করি তারে॥

এই "আদ্যিরসের" খাতিরে সহরের কোন রাজসংসারে, রাজকন্যার সহিত নিরঞ্জনের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইল। পাঠিকা সুন্দরীর ভ্রুকুটিভঙ্গী আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু কি করিব,—আমি উপাখ্যানলেখক, যাহা প্রকৃত ঘটনা, তাহার অপলাপ করিব কিরূপে? তবে নিরঞ্জনের পক্ষ হইতে ওকালতী করিয়া ইহা বলিতে পারি যে, এ বিষয়ে তাঁহার কোন হাত ছিল না। মাতৃ-আজ্ঞা তিনি লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। জননী সে কালে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" ছিলেন। নিরঞ্জনের মাতাও কতকটা রাজবংশের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, আর কতকটা উচ্চ কুটুম্বিতার লোভে পড়িয়া এই বিবাহে সম্মতা হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধনলোভের সংস্পর্শও না ছিল, এমন নহে। বিবাহে—

কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং।

এটা কনের মায়ের কথা হইলেও, বরের মায়ের ধনলোভ যে ততোধিক, আজিকার কালে, সকলেই দেখিয়া ঠেকিয়া তাহা ত বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। ইহার উপর যদি কেহ ছল ধরিয়া আমায় শওয়াল করেন যে, "মাতার আজ্ঞায় অপকর্ম্ম করা নিরঞ্জনের উচিত হইয়াছিল কি না?" তাহা হইলে আমি নাচার। ক্ষুদ্র একটু উপাখ্যান লিখিতে গিয়া যদি এত কৈফিয়তে বাধ্য হই, তবে কলম ফেলিয়া আমাকে পলায়নের পথ দেখিতে হয়। কৈফিয়ৎ কিন্তু নিতান্ত যে নাই, তাহাও নহে। প্রথমতঃ, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া বড় সহজ কথা নয়। বিশেষতঃ সংস্কারকসমাজ তখনও সংস্থাপিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ নিরঞ্জনের কোমল বয়স; প্রথম-পরিণীতা পত্নীর সহিত প্রণয়বন্ধন হওয়া দূরে থাকুক, ভালরূপ আলাপ পরিচয়ও তখন হয় নাই। সুতরাং হৃদয়ের বাধা অতিক্রম করিয়াও তাঁহাকে এ কাজ করিতে হয় নাই। যদি বল হিতাহিত বিচারও কি তাঁহার ছিল না? প্রচলিত আচারের কাছে আর সমস্ত আচার বিচারই ভাসিয়া গেল। যদি বল ধর্ম্মাধর্ম্ম,—মাতৃবাক্যপালনের কাছে আর সকল ধর্ম্মই হার মানিল। মাতৃবাক্য-পালনের অনুরোধে যে দেশের ধর্ম্মপুত্র এক রমণীর পঞ্চস্বামিগ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন, সে দেশের নিরঞ্জনকেই তোমরা এত অপরাধী করিবে কেন?

ভাল হউক মন্দ হউক, দোষ হউক গুণ হউক, রাজকন্যার সহিত নিরঞ্জনের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। রাজসংসারের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, এবং রাজপ্রাসাদের শোভা

সৌন্দর্য্য দেখিয়া দরিদ্র নিরঞ্জন বিমুগ্ধ হইলেন; আর সর্ব্বোপরি বিমুগ্ধ হইলেন, রাজকন্যার রূপলাবণ্যে। রাজকন্যা রূপসী, তাঁহার নাম তরঙ্গিনী। এই তরঙ্গিনীই আমার এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানের নায়িকা। নায়িকা সুন্দরী, নায়কও সুন্দর। এতক্ষণে বোধ হয়, পাঠকের এই আখ্যায়িকা পড়িবার কথঞ্চিৎ প্রবৃত্তি হইল। নায়ক নায়িকার রূপের চিত্র ইহার পর চিত্তেনে একটু খুলিব; ক্ষুদ্র বিষয়ের বৃহৎ আড়ম্বর বড় ভাল নয়। এখন পাঠক একটু ধৈর্য্য ধারণ করিলেই বাঁচি। বিবাহবাসরে, বা ফুলশয্যার আসরে, নায়ক নায়িকার প্রণয়ালাপ কিছু হইয়াছিল কি না, অথবা কিরূপ হইয়াছিল, সে পরিচয় আমি এখন দিতে পারিব না। রূপোন্মত্ত নবপ্রেমিকের প্রথমালাপ-চিত্রে বঞ্চিত করিলাম বলিয়া পাঠক রাগ করিবেন না। বাস্তবিক সে সন্ধান আমি পাই নাই। তখন সংবাদপত্রও ছিল না, সুতরাং সংবাদপত্রের সম্বাদদাত্রীগণও তখনকার বাসরঘরে বিরাজ করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিতেন না। আর বরকনের ঘরে আড়ি পাতিয়া যাঁহারা রাত কাটাইয়া বেড়ান, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন সুন্দরীও, ভবিষ্যতে রাজা রাজেন্দ্রলালের সাহায্যার্থ এই প্রত্নতত্ত্ব নিরূপণের পথ রাখিয়া যান নাই। আলাপ যেমনই হউক, এই পর্য্যন্ত আমি জানি যে, প্রথম দর্শনেই তরঙ্গিনীর লাবণ্যতরঙ্গে, নিরঞ্জন আপনার মানসতরী ভাসাইয়া দিয়া, মাতা ও সহোদরার সহিত স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। কথা বিচিত্র নয়। আজিকার কালের সুশিক্ষিত সহরে বাবু—তোমারাই যদি হাটে বাজারে রূপের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া, ঐন্দ্রজালিকের ইঙ্গিতে নৃত্য করিতে পার; তবে আমার যশোর জেলার এই বালক নিরঞ্জন, রাজধানীর রাজকন্যার রূপ[illegible] বাসরের আসরেই যে দিশাহারা [illegible] কি তাঁহার কলঙ্কের কথা?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিবাহের পর তিন বৎসরের মধ্যে নিরঞ্জন তরঙ্গিনীকে আর দেখেন নাই। সে কালে পুনর্ব্বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষে দেখা সাক্ষাতের বাহুল্য এতটা ছিল না। তবে প্রথম বিবাহ নিতান্ত বাড়ীর কাছে বলিয়া মাঝে দুই একবার প্রথমা পত্নীর সহিত নিরঞ্জনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল মাত্র। প্রথমা পত্নীর নাম মলিনা। তরঙ্গিনীর রূপচিন্তায় নিরঞ্জনের চিত্ত মজিয়াছিল, মলিনার প্রতি তাঁহার [illegible] মনোযোগ ছিল না। মলিনার বয়সও কম, তরঙ্গিনীর অপেক্ষা এক বৎসরের ছোট। মলিনার নবমে, ও তরঙ্গিনীর দশম বর্ষে বিবাহ হইয়াছিল। মলিনা সামান্য গৃহস্থকন্যা—নিবিড় বনে কুসুমকলিকার মত রহিয়া রহিয়া ফুটিবে; ভোগের বারি তাহাতে সিঞ্চিত হয় না, ঐশ্বর্য্যের সূর্য্যরশ্মি তাহাতে সম্প্রভাত হয় না। মলিনাকে দেখিয়া সুতরাং নিরঞ্জনের মনস্তৃপ্তি হইল না। তরঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য তিনি আগ্রহে অধীর হইয়াছিলেন।

তিন বৎসর পরে সেই আগ্রহের সামগ্রী আবার দেখিতে পাইলেন। তিন বৎসর পরে শ্বশুরালয়ে আসিয়া নিরঞ্জন যাহা দেখিলেন, দেখিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তরঙ্গিনী তখন ত্রয়োদশে পড়িয়াছে। রাজভোগের প্রসাদে, রাজকন্যা তরঙ্গিনী ত্রয়োদশেই যৌবনতরঙ্গে ঢল ঢল করিতেছেন। তুফান এখনও ছুটে নাই বটে, কটালের বান্ এখনও ডাকে নাই বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে জোয়ার সঞ্চার হইয়া তটিনী স্ফীত হইয়াছে, আর প্রভাতপবনের মৃদুমন্দ হিল্লোলে ক্ষুদ্র বীচি সমুত্থিত হইয়া তরঙ্গিনী মন্দগম্ভীরে নৃত্য করিতেছে। যৌবন সে দেহে এখনও সম্পূর্ণ অধিকার পায় নাই, শৈশবের রাজত্ব স্থানে স্থানে বিরাজিত আছে। বয়সে বয়সে সংগ্রাম কিন্তু চলিয়াছে। যৌবন আসিয়া বুকে চাপিয়া [illegible] মুখের সে বালিকাভাব এখ[illegible] [illegible]তে পারে নাই। বালিকার মুখে কিন্তু [illegible]বনের ছায়া পড়িয়াছে, যৌবনের সেনা সেখানে ছুটিয়াছে। সংগ্রামের সেই কুরুক্ষেত্রে, লজ্জার সহিত সরলতার দ্বন্দ্ব, বিভ্রমের সহিত বাল্যলীলার দ্বন্দ্ব, প্রতিপদেই দেখিতে পাওয়া যায়। রূপের ছবিখানি পেন্‌সিলে আঁকা ছিল, যৌবন-কারিগর এইবার তাহাতে তুলি ধরিয়া রং ফলাইতে বসিয়াছেন। কালিদাস বলিয়াছেন—

উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং—

বিদ্যাপতি এই বয়ঃসন্ধির শোভা বর্ণনায় ব্যাকুল। তাঁহার কাব্যে—

শৈশব যৌবন দুঁহু মেলি গেল।—

এই চিত্র আঁকিতেই তিনি আনন্দে অধীর। বাস্তবিক, কিশোরীর এই বয়ঃসন্ধির সৌন্দর্য্য যে না সম্ভোগ করিল, তাহার অদৃষ্টে ধিক্। বালিকার পবিত্রতার সহিত বয়োবিলাসের সংগ্রাম ও সামঞ্জস্য, এই অদ্ভুত সন্ধি-বিগ্রহের দৃশ্য যে না দেখিল, তাহার জন্মই বৃথা।

নিরঞ্জন দেখিলেন, সে তরঙ্গিনী আর নাই। বাসরঘরের সেই বালিকা, চঞ্চলা, ক্রীড়াশীলা, চিরহাস্যময়ী তরঙ্গিনী আর নাই। তরঙ্গিনী এখনও হাসে বটে; কিন্তু সে হাসি ফুটিতে না ফুটিতে মেঘের কোলে মৃদু বিদ্যুতের চঞ্চল খেলার মত, তখনি আবার অধরপ্রান্তে মিলাইয়া যায়। তরঙ্গিনী এখনও কথা কয় বটে, কিন্তু বাচালের মত তেমন গল্ গল্ করিয়া আর বকে না; যেন যৌবনের প্রহরী, যুবতীর রসনায় থানা গাড়িয়া বসিয়াছে, মুখ ফুটিয়া সকল কথা যেন কহিতে দেয় না। তরঙ্গিনী এখনও চায় বটে, কিন্তু সে চাহনিতে সাহসের ভাগ যেন কমিয়া গিয়াছে, যেন সোজাসুজি সকল দিকে চাহিবার শক্তি আর নাই, আঁকাবাঁকা আড় নয়নে চুপি চুপি চকিতে চাহিয়া চোখোচোখি হইবার ভয়ে দৃষ্টি অমনি ফিরাইয়া লয়। তরঙ্গিনীর গঠন সুঠাম, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনতুল্য। মুখপদ্ম স্থূলসূক্ষ্ম ভ্রূযুগলে, বিশাল লোচনে, সুচারু নাসিকায়, বিচিত্র চিবুকে, মসৃণ কোমল কপোলে এবং অলকাবৃত সুন্দর ললাটে, অপূর্ব্ব শোভায় প্রভাসিত। যৌবনের একটা গুণ এই যে, সে যখন যেখানে যায়, তখন তাহার অধিকারকালে, অসুন্দরকেও সুন্দর করিয়া তুলে। আর যে সুন্দর, তাহার ত কথাই

নাই। তরঙ্গিনীর সুন্দরকান্তি নবযৌবন-সমাগমে চন্দ্রকর-চুম্বিত কুমুদিনীর ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। নিরঞ্জন অমূল্যনিধি হাতে পাইয়া যেন আত্মহারা হইলেন।

তখন রেলের গাড়ী বা ইষ্টীমার ছিল না যে, লোকে দূরদেশে শ্বশুরবাড়ী গিয়া দুদিন থাকিয়া চলিয়া আসিবে। প্রথম গিয়া দুই তিন মাস বাস করিতেও কেহ লজ্জাবোধ করিত না। নিরঞ্জন প্রথম আসিয়া দুইমাস বাস করিলেন। এই দুই মাসে তরঙ্গিনীর সহিত আলাপে তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন না। তরঙ্গিনীর প্রকৃতি গম্ভীর নহে, বরং একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, একটু সাহসিকতা আছে। তাঁহার আচরণ ধীর, বচনবিন্যাস মধুর ও বিনয়নম্র। কিন্তু জগতে অবিমিশ্র সুখ বুঝি কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না, অবিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্য বুঝি কোন পদার্থে নাই। কলঙ্ক কেবল চাঁদের অঙ্গে নয়, কলঙ্কের রেখা বুঝি সৌন্দর্য্যমাত্রেই অঙ্কিত আছে। তরঙ্গিনীর বিনয়স্নিগ্ধ মধুর স্বভাবেও রাজমর্য্যাদার একটু অহঙ্কার, বুঝি তলে তলে লুকান ছিল। তরঙ্গিনী বুদ্ধিমতী ও ধীরপ্রকৃতিবিশিষ্টা হইলেও, তীক্ষ্ণবুদ্ধি নিরঞ্জনের কাছে তাহা চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। অহঙ্কার প্রেমের একটা প্রধান অন্তরায়। উভয়ের অহঙ্কার চূর্ণ না হইলে, প্রেমিকে প্রেমিকে মিলন সম্পূর্ণ হয় না। নিরঞ্জন এই অহঙ্কারের আভাসে মনে মনে ব্যথা পাইলেন, কিন্তু ধৈর্য্য সহকারে মনের ব্যথা মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিলেন। বাহিরে তাহার চিহ্ন কিছুমাত্র প্রকাশ করিলেন না। বয়সে এ দোষ সারিয়া যাইবে বলিয়া, নিরঞ্জন আপনা আপনি আশার প্রলোভনে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। শান্ত হইয়া আর একটু সহ্য করিতে পারিলে হয়ত সে দোষ সারিয়া যাইতেও পারিত। কিন্তু একদিনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় সে পথে কাঁটা পড়িল; নবদম্পতীর অদৃষ্টস্রোতে শিলাখণ্ড পড়িয়া, স্রোতোধারা বিভিন্ন করিয়া দিল।

জগতের কোন্ ঘটনা যে সামান্য, তাহা কিন্তু ঠিক করিয়া বলা যায় না। বিন্দুমাত্র অগ্নিকণায় যখন গ্রামনগর ধ্বংস হইয়া যায়, ইঙ্গিতে যখন রাজার রাজত্ব যায়, কটাক্ষে যখন বীরপাত হয়, তখন সামান্য যে কাহাকে বলিব, তাহা ত বুঝিতে পারি না। নিরঞ্জন যেদিন বাটী যাইবেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রে বিদায়ের বিষাদে নিদ্রার অবসর আর পাইলেন না। তরঙ্গিনী কিয়ৎক্ষণ জাগরিতা থাকিয়া কিন্তু নিদ্রালসমগ্না এবং ঈষদ্বিরক্তিবিশিষ্টা হইলেন। নিরঞ্জন ভাবিলেন, "কতদিনের পর কাল যাইব, আজ আবার নিদ্রা কি? আজিকার রাত্রি যদি তিনটা রাত্রি হয়, তথাপি আমি চক্ষু বুজিতে চাহি না; কিন্তু তরঙ্গিনীর মনের ভাব ত সে রকম নয়। তরঙ্গিনী অহঙ্কারে মত্ত, বিদায়ের বিলাপ তাহার ভাল লাগিবে কেন? তা না লাগুক, সে শয়ন করিয়া জাগিয়া থাক্, আমি কিন্তু সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইব।" নিরঞ্জনের কথা আর ফুরায় না। কোন কথাই কাজের কথা নয়, তবু কিন্তু কথা আর ফুরায় না। শুনিতে শুনিতে তরঙ্গিনীর নিদ্রাকর্ষণ হইল। নিরঞ্জন নাড়া দিয়া দু তিন বার তুলিবার চেষ্টা করি-

লেন, তন্দ্রামগ্না তরঙ্গিনী বিরক্তিসূচক অস্পষ্ট উত্তর দিয়া, পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন। শেষে নিরঞ্জন হাত ধরিয়া, তরঙ্গিনীকে খাড়া করিয়া বসাইলেন। এইবার বেশী বিরক্ত হইয়া, তরুণী রুষিলেন; চক্ষু মুছিতে মুছিতে, ঈষদ্ ভ্রুকুটিভঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন এত রাত্রে আমাকে নড়া ধরিয়া উঠাইবার তোমার দরকার?" কথাটা নিরঞ্জনের অন্তরে বড় বাজিল। কালের গতি অতি বিচিত্র। সময়ে ভাল কথাও মন্দ লাগে, আবার সময়গুণে মন্দ কথাও হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়। প্রণয়মুগ্ধ নিরঞ্জন তরঙ্গিনীর সকল কথাতেই এখন অহঙ্কারের ছায়া দেখিতে পান। তন্দ্রাতুরা তরুণীর বিরক্তি-বাণীও তিনি অহঙ্কারের অপমান ভাবিয়া, রাগের বেগ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। রাগের মাথায় উত্তর করিলেন, "দরকার, আমার তামাক খাইতে হইবে, তাহার যোগাড় তুমি করিয়া দাও।" উত্তরে শুনিলেন,—"তামাকের খবর আমরা রাখি না, বাহিরে চাকর চাকরাণী থাকে, উঠাইতে পার ত, তুমি দেখ।" নিরঞ্জন এইবার একটু কর্কশ করিয়াই জিজ্ঞাসিলেন, "উঠাইতে কি তুমি পার না? তোমার ঘর বাড়ী, আমি এখানে কাহাকে কোথায় ডাকাডাকি করিতে যাইব?" তরঙ্গিনীও সুর আর একটু চড়াইয়া উত্তর করিলেন, "না পার ত, আমার এত গরজ নাই যে এত রাত্রে লোকজনকে তোমার তামাকের জন্য উঠাইতে যাই;" বলিয়াই তরঙ্গিনী শুইয়া পড়িলেন, ও আর বলিলেন, "এবার বিরক্ত কর ত, ঘর থেকে এখনি চলিয়া যাইব।"

নিরঞ্জনের আর বিবাদ করিতে সাহস হইল না। অপমান তাঁহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিল। কথাগুলা অপমান বলিয়াই তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইল। পরস্পরের অবস্থা সমান হইলে, অনেক কথা অপমান বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু অবস্থা হীন হইলে, আর পিতৃপুরুষের পূর্ব্বগৌরব হৃদয়ে একটু জাগরুক থাকিলে, সামান্য খুঁটি-নাটিতেই অপমানের আঘাত অতি সহজেই বুকে বাজে। নিরঞ্জন আর কথা না কহিয়া, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ইহার শোধ যদি না দিতে পারি, রাজকন্যাকে যদি পতিগৌরব শিখাইতে না পারি, তবে আমি কাপুরুষ।" প্রভাত হইবামাত্র, তরঙ্গিনী জাগিতে না জাগিতে, নিরঞ্জন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা না কহিয়া নিজগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

বেদ।

উহার পূর্ব্ব আদর।

বেদ হিন্দুদিগের অতি আদরের বস্তু। পূর্ব্বকালে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বেদের কিরূপ সম্মান করিতেন তাহা সেই মহাপুরুষ মহর্ষিগণ-প্রণীত পুস্তক সকল

পাঠ করিলে কিছু কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়। ভগবান মনু বেদের কিরূপ আদর করিয়াছেন দেখ—

তিনি ধর্ম্মস্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া প্রথমেই বলিলেন,—

"কামাত্মতা ন প্রশস্তা নৈব চেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যোহি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ॥"

স্বচ্ছন্দাচারিতা প্রশস্ত নয়; কিন্তু কামনাহীন হওয়াও অসম্ভব; কারণ মনের কামনা না হইলে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। কামনা একটী মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কোন না কোন বিষয়ের কামনা ভিন্ন মন এক দণ্ড অবস্থান করিতে পারে না; এই জন্য আবার পরেই মনু বলিলেন—"কাম্যোহি বেদাধিগমঃ;" বেদের অনুশীলনই কামনীয়। মন যদি কামনা ভিন্ন ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে অক্ষম, তবে অন্যান্য বিষয়ের কামনা পরিত্যাগ করিয়া বেদানুশীলনেরই কামনা করিবে। যদি বল অনুশীলন ত কেবল আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, কেবল তাহা দ্বারা সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ হইতেই পারে না; সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে কর্ম্ম আবশ্যক। নানারূপ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্যই মনুষ্যশরীরে পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া আবার বলিলেন "কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ।" যদি কর্ম্মের কামনা করিতে হয় তবে বেদবিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানোপায়েরও কামনা করিবে। কেননা—

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং।
স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্॥

সমুদায় বেদ এবং বেদজ্ঞদিগের স্মৃতি ও শীল (আচার ব্যবহার) ইহারা ধর্ম্মের মূল। মানবজন্মের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্মসাধন। ধর্ম্মই মনুষ্যের মনুষ্যত্বের মূল, ধর্ম্মহীন মনুষ্যের আহার ব্যবহারের আচার বিচার থাকে না, যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং তাহারা পশুবৎ বিচরণ করে। ধার্ম্মিক পুরুষ সর্ব্বদা সদাচারে সুনিয়মে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, এই জন্য কেবল ইহলোকে অসামান্য উন্নতি লাভ করেন এমন নহে, পরকালেও অনন্ত সুখে যাপন করেন। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন স্ত্রী বল, পুত্র বল, ভ্রাতা বল, বন্ধু বল, সুহৃৎ বল, সম্পত্তি বল এ সকল কেবল ইহকালেরই সুখবৃদ্ধি করে, চক্ষু বুজিলে আর ইহাদের কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকে না। ইহারা নিতান্তই যদি তোমার বশীভূত হয়, নিতান্তই যদি ইহাদের সঙ্গে ভালবাসাবাসি থাকে, তবে ইহারা বড় জোর শ্মশানঘাট অবধি তোমার অনুগমন করিবে, তাহার পর তুমিও চক্ষু বুজিবে ইহারাও ফিরিয়া আসিবে, একটি কপর্দ্দকও সঙ্গে যাইবে না। নিধনের পর তুমি যে দুর্গম অন্ধকারময় পথের পথিক হইবে, তাহাতে একমাত্র সহযাত্রী ধর্ম্ম। তুমি চক্ষু বুজিয়া শ্মশান ঘাটের পরপারে গমন করিলেও ধর্ম্ম তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিবেন না, তোমাকে অনন্ত এবং ভীষণ অন্ধকারময় কালকবলে নিক্ষেপ করিয়া ধর্ম্ম কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না; তিনি সেই দুর্গম পথকে আপনার দেহের নির্ম্মল প্রভাজালে আলোকিত করত অগ্রসর হইয়া বলিবেন "এস জীব এস, আমার সঙ্গে এস,

কোন ভয় নাই; আমি তোমার সহায়, তোমার এই দুঃখমিশ্রিত ক্ষণিক সুখের নাশ হইল মাত্র, কিন্তু আমি তোমাকে অনন্ত অক্ষয় সুখে রাখিব।” এইরূপ ইহ এবং পরকালের হিতসাধন যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের মূল বেদ। সেই বেদবাক্য পালন করিলেই সৎপথের অনুসরণ করা যায়। আবার দেখ—

সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥

বেদ অধ্যয়ন করিলে আমাদের যে জ্ঞান চক্ষু লাভ হয়, সেই চক্ষু দ্বারা এই বিচিত্র বিশ্বমণ্ডলের সমুদয় বস্তুর তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি আপনার ধর্ম্ম স্থির করিবেন। বেদে মানবপ্রকৃতির বৈচিত্র্যানুসারে নানাবিধ ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে। সকল প্রকার ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক হইলেও সকল প্রকার ধর্ম্ম সকল মনুষ্যের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। দেশ, কাল ভেদে মনুষ্যের রুচি, এবং নৈসর্গিক সামর্থ্য ভিন্ন ভিন্ন। এই জন্য মনু বলিতেছেন, অগ্রে বেদ অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানচক্ষু লাভ করিবে, সেই জ্ঞানচক্ষুদ্বারা জগতের তত্ত্ব অবগত হইবে। “এই জগতের কোন্ দেশের কিরূপ প্রকৃতি, কোন্ দেশে কিরূপ আচার ব্যবহার করিতে পারা যায়, এক্ষণে কালের গতিইবা কিরূপ, আমি যে দেশে এবং যে কালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি সেই দেশে এবং সেই কাল অনুসারে কিরূপ ধর্ম্মাচরণ আমার উপযোগী”—ইত্যাদি বিচার করিয়া যাদৃশ ধর্ম্মকে আপনার সামর্থ্যের অনুরূপ বুঝিবে সেইরূপ ধর্ম্মাচরণ করিতেই প্রবৃত্ত হইবে। ইহাতে বুঝা গেল যে পূর্ব্বে বেদাধ্যয়ন না করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, এবং তত্ত্বজ্ঞান না হইলে মনুষ্য আপন আপন উপযোগী ধর্ম্মের নির্ব্বাচন করিতে পারে না। ভগবান মনু আবার কি বলিতেছেন দেখ,—

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্যচানুত্তমং সুখম্॥

শ্রুতি শব্দের অর্থ বেদ। ঐ বেদে মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং বেদতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ বেদের তাৎপর্য্যার্থ অনুস্মরণ করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, মনুষ্য যদি আপনার সামর্থ্যানুসারে সেই সকল ধর্ম্মের মধ্যে কোন একটি ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে ইহলোকে অক্ষয় কীর্ত্তি এবং পরকালে অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়। আবার দেখ—

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্রস্যাৎ তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ॥

ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে বেদই প্রধান প্রমাণ। বেদ যে ধর্ম্মের যেরূপে অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন সেই ধর্ম্মের সেই রূপেই অনুষ্ঠান করিবে, কদাচ তাহার অন্যথা করিবে না। যদি বেদে একটি কর্ম্ম দুই প্রকারে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহার একতর পক্ষ আশ্রয় করিবে। সন্দিগ্ধ হইয়া এককালে উহার অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইবে না। যিনি যে প্রকারে অনুষ্ঠান করুন না কেন, তাঁহার দ্বারা ধর্ম্মলাভ রূপ উদ্দেশ্য যে সফল হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এইরূপ সমুদয় প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রেই বেদের অসীম গৌরব লক্ষিত হয়। আমরা এস্থলে

সমুদয় শাস্ত্রীয় বচনের উদ্ধার আবশ্যক বিবেচনা করিলাম না। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতিই নিয়মপূর্ব্বক প্রথমে বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে স্ব স্ব বৃত্তির অনুকূল অপর অপর শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতেন। বেদাধ্যয়নের ভূয়সী প্রশংসা প্রতিপদেই পরিলক্ষিত হয়। (ক্রমশঃ।)

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

লেখায় ব্যাঘাত।

লিখিব কি, লিখিবার গোল পড়িয়াছে। আমি বাঙ্গালার বানান ঠিক করিতে পারি না। আজি হঠাৎ এই দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে এমন নয়, অনেক দিন অবধি আমি এই ভাবনায় ভাবিত। যত দিন যাইতেছে, ভাবনাও ততই বাড়িতেছে। হয় ত, অনেকে মনে করিবেন যে আমার এই এক রঙ্গ। কিন্তু রঙ্গ নয়, প্রকৃত কথাই বলিতেছি।

বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালা নাই, সেই জন্যই বানানের এ বিড়ম্বনা। এই যে অ, আ, ই; ক, খ, গ, লইয়া এতকাল আমাদের কাজ চলিয়া আসিতেছে, ইহা কতকটা গরজে এবং গায়ের জোরে। বস্তুতঃ অ, আ, ই; ক, খ, গ, বাঙ্গলার বর্ণমালা নহে, সংস্কৃতেরই বর্ণমালা। পরের পোষাক গায়ে ঠিক না হইবারই কথা। যে পরে, কোন রকমে তাহার কাজ সারা হয় বটে, কিন্তু তাহার মন খুঁৎখুঁৎ করিবেই করিবে। পোষাকেরও যদি একটা মন থাকিত, তাহা হইলে পোষাকও বোধ হয় খুঁৎখুঁৎ করিত।

বাঙ্গালার বর্ণমালা নাই, ইহা নূতন কথা কিনা জানি না; কিন্তু ইহা যে প্রকৃত কথা, তাহা একটু বুঝাইয়া বলিব। একটি একটি বর্ণ, একটি একটি পৃথক ধ্বনির দ্যোতক চিহ্নমাত্র। কোন একটি ভাষায় যতগুলি পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি উচ্চারিত এবং ব্যবহৃত হয়, ততগুলি পৃথক্ পৃথক্ চিহ্নের প্রয়োগ থাকিলে, তবে সে ভাষার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বর্ণমালা আছে বলা যায়। মিশ্র ভাষায় এই ধ্বনির সংখ্যা নিতান্ত অনিশ্চিত। কখন্ বাড়ে, কখন্ কমে, কিছুই বলা যায় না। এই জন্য মিশ্রভাষাতেই বর্ণবিড়ম্বনা উপস্থিত হয়। বাঙ্গলা মিশ্রভাষা।

বাঙ্গলায় কতক সংস্কৃত, কতক হিন্দী, কতক উর্দ্দূ, কিছু ফারসী, আজিকাল আবার কিছু কিছু ইংরেজীও জুটিয়াছে এবং জুটিতেছে। এই জন্যই বাঙ্গলাকে মিশ্র ভাষা বলি। যতগুলি ভাষার শব্দ, এই বাঙ্গলা ভাষায় আসিয়া স্থান লাভ করিতেছে, ততগুলি ভিন্ন জাতীয় ধ্বনিও বাঙ্গলায় প্রয়োগ করা আবশ্যক হইতেছে। অথচ, দেশের প্রকৃতিবশতঃ সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধ্বনি অবিকল রূপে তিষ্ঠিতে পারে না। ধ্বনির অল্পবিস্তর বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। তাহার ফল এই হয় যে, কোন এক ভাষার বর্ণমালাই

যথাযথরূপে এই মিশ্র ভাষার প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না; এবং সকল ভাষার বর্ণমালা একত্র করিলেও সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না।

মিশ্রভাষার প্রকৃতিবশতঃ স্বতঃই পূর্ব্বোক্ত দোষ বা বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে। তাহার উপর, আর একটা উপসর্গজনিত দোষ আছে। সে দোষ এই যে, কথোপকথনের ভাষা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অন্যান্য বিষয়ে যেমন হউক, উচ্চারণ বিষয়ে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহারই কথা এখানে বলিতেছি। বাণিজ্যের বিস্তার, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গতাগতির বৃদ্ধি, এবং তন্নিমিত্তক আলাপের বাহুল্যবশতঃ এই পরিবর্ত্তন ঘটে। বাঙ্গালা সম্বন্ধে ইহা এখন অধিক মাত্রাতে ঘটিতেছে। একটু ভাঙ্গিয়া, দৃষ্টান্ত দিয়া, কথা কয়টা বুঝান যাউক।

সংস্কৃত বর্ণমালাই বাঙ্গালার বর্ণমালা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। জ, য, আকৃতিতে ভিন্ন হইলেও ধ্বনির দ্যোতকতা বিষয়ে একবারে অভেদ। এইরূপ ণ, ন, কিম্বা শ, ষ, স, নামে ও মূর্ত্তিতে পৃথক্ হইলেও কাজে কিছুমাত্র পৃথক্ নয়। বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব কেবল বর্ণগণনায় পাওয়া যায় মাত্র, নহিলে নাম রূপ কিম্বা প্রয়োগ কোন বিষয়েই কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

স্বরবর্ণের আরও গোলযোগ। বাঙ্গালা ভাষায় হ্রস্ব-দীর্ঘের প্রভেদ নাই। অথচ সংস্কৃত ভাষায় এই হ্রস্ব-দীর্ঘই বিশেষ লক্ষ্যের সামগ্রী। সেই সংস্কৃতের "হ্রস্ব-দীর্ঘ" বাঙ্গালায় আসিয়া, আপনিও বিব্রত, আমাদিগকেও বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে। যেমন "ঘোষেদের হরি" আর "দাসেদের হরি" বলিয়া এক নামের দুই প্রতিবেশীকে চিনিতে এবং চিনাইতে হয়, বাঙ্গালায় এই হ্রস্ব-দীর্ঘ লইয়াও ঠিক সেই রকম করিতে হয়। ছেলেদের পাপের ভোগ, হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ই, হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-উ, মুখস্থ না করিয়া তাহারা বর্ণমালা হইতে কোন ক্রমেই নিস্তার পায় না। ই, ঈ, উ, ঊ যদি বস্তুতঃ বাঙ্গালায় পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনির দ্যোতক হইত, তাহা হইলে শিশুদিগকে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে কেন? বাঙ্গালা বলিয়া সংস্কৃতের বর্ণমালা আয়ত্ত করিতে হয় বলিয়াই, তাহাদের এ কর্ম্মভোগ। শুধু ছেলেদেরই বা কেন? অক্ষয় দাদার তাড়নায়, আর তাঁহার ছাপাখানার অনুরোধে, আমাদের অনেক "ঈ"কে হ্রস্ব হইতে হইয়াছে। অক্ষরের মাথা ভাঙ্গিবে বলিয়া দাদা ভয় দেখাইতেন, কাজে কাজেই ভয়ে ভয়ে আমরাই মাথা খাটো করিয়া লইতাম।

আবার ঋ, ৯, স্বরবর্ণ বলিয়া বাঙ্গালাতে পরিচিত। ৯র সঙ্গে খাটি-বাঙ্গালা-ভাষীর জন্মের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় কি না সন্দেহ। অথচ ৯ একজন স্বরবর্ণ। যদি "ঋ" আছে, তবে "রি" কেন? আর "রি"তে যদি চলে তবে "ঋ"কেন? খাটি-বাঙ্গালাভাষী কখনই ইহার কৈফিয়ৎ দিতে পারিবেন না।

আরও আছে। "শ্রুতিলিখনে" পণ্ডিত মহাশয় সুধু নম্বর কাটিয়া ছাড়েন না, কাণ মলিয়াও দেন। কিন্তু "বধূ-ঠাকুরাণী" বাঙ্গালায় "বৌ," না কি "বউ," নাকি "বঊ" তাহা আমরাও জানি না, পণ্ডিত মহাশয়ও

জানেন না। কেমন করিয়া "ঐ" লিখিব, "ঐ" লিখি, কি "অই" লিখি, কি "ওই" লিখি, তাই স্থির করিতে পাঁচ মিনিট আমার এই প্রবন্ধ কামাই গেল।

তবু এখনও ফলার কথা বলি নাই। য-ফলা আর ব-ফলা, দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয়ে, আমাদিগকে যেমন যন্ত্রণা দিয়াছেন, এখনকার নাটক-লেখকদিগের হাতে পড়িয়া তেমনি জব্দ হইতেছেন। দৃষ্টান্ত কত দিব?—কোন একখানা নাটক, কি "হরিদাসের গুপ্তকথা" দৃষ্টিমাত্রেই দৃষ্টান্ত। তবে "মৃত্যু"তে আবার একটি য-ফলা কেন, এক বানানে "সন্ধ্যঃ" আর "চোদ্দ" কেন চলে না, কেহ কি তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন? আমাদের "দ্বারায়" ব বাজে খরচ। "আত্মায়" ম থাকিয়া না থাকা; তবে চন্দ্রবিন্দু দিয়া যে "তঁ" হয়, "ম" নিজস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া ঐ রকমে ব্যাগার দেন।

আর এক রকম দেখ। অকারান্ত কি হসন্ত, বর্ণের মূর্ত্তি দেখিয়া কিছুই চিনিবার যো নাই। সংস্কৃতে হস-চিহ্ন না থাকিলেই অকার দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। বাঙ্গলায় কোন ব্যবস্থাই নাই। এই ছত্র কতক আগে "খাটো" লিখিতে গিয়া ওকার দিব কি দিব না, ভাবিতে ভাবিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছিল। অথচ দরকার মত ওকার দিতে গেলে এক ওকারের খরচেই জেরবার হইয়া পড়িতে হয়। এমন কত আছে।

যে গুলি দেখাইলাম, সে গুলি বানানের সংশয়স্থল। এমন করি কি অমন করি, ইহাই সেখানে ভাবিতে হয়। কিন্তু ইহা ছাড়া, মুলে অভাব হয়, পুঁজিতে একবারে কুলায় না, এরূপ ক্ষেত্রও বহুতর আছে। "এক" লিখিয়া "এ" যেরূপ উচ্চারণ করি, "এবং" লিখিয়া "এ"র তেমন উচ্চারণ করি না। অথচ ঐ একের "এ" আমাদের দু বেলা দরকার। কেহ একারেই কাজ সারেন, অনেকে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, বিচিকিৎস্য এক য-ফলা আকারের (্যা) সৃষ্টি করিয়াছেন। সংস্কৃত মানিতে হইলে, যাহা চাই, ইহাতে তাহা হয় না। ইহাতে "ই-আ" হয়। "চালে আগুণ লাগিয়াছে," দেখিলে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়। গৃহদাহ উপস্থিত, না কি তণ্ডুল মহার্ঘ্য, কোন মতেই ঠিক করা যায় না। তণ্ডুলের চালে যে আধখানা "ই" আছে, বর্ণমালায় সে টুকুকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "বোসেদের বাড়ী" বলিতে যে একটু মজা আছে, বানানে সে টুকু কিছুতেই আদায় হয় না।

এ দিকে অভাবে মারা যাইতে হয়, অথচ, আস্তাবলে বসিয়া বসিয়া দুই একটি বর্ণ দানা খাইতেছে, তাহাকে অন্য কাজে লাগাইবার মতি কাহারও দেখি না। একটি "ওয়া" লিখিতে—যেমন "ওয়াচ ঘড়ী," কিম্বা "জমাওয়াশীল" ইত্যাদি,—ঐ এক "ওয়া" লিখিতে দুটি স্বরবর্ণ আর একটি সন্ধ্যক্ষর ব্যঞ্জন বর্ণের খোসামোদ করিতে হয়। অথচ সকলে মিলিয়া অন্তঃস্থ "ব" টাকে লাগাইয়া দিলেই সচ্ছন্দে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু কেমন আমাদের অদৃষ্টের দোষ, কোথাও কোথাও কাজে লাগিয়াও বগ্‌ড়িয়া বসিয়াছে। "খাবার" হইল, তবু "খাওয়া" গেল না। ব আসিল তবু "ওয়া" গেল না।

বিস্তারে কেবল পুঁথি বাড়িবে। ফলে যাহা দেখাইলাম, তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, সংস্কৃত বর্ণমালায় বাঙ্গলার কাজ ঠিক চলে না। বাঙ্গলার যে অংশ সংস্কৃত-মাতৃক, তাহাতেই এই। যে অংশ অন্যান্য ভাষা হইতে আমদানি হইয়াছে, তাহার ত কথাই নাই। উর্দ্দু এবং ইংরেজীর অনেক ধ্বনি একবারে অপ্রকাশ্য।

এই সকল হেতু উপলক্ষ করিয়াই বলিয়াছি যে বাঙ্গলাভাষার বর্ণমালা নাই। নাম মাত্র সংস্কৃত বর্ণমালা বাঙ্গলায় স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ হয় নাই। তাহার উপর মিশ্রভাষা বলিয়া, বাঙ্গলায় আরও বিপত্তি উপস্থিত। বিষয়কর্ম্মঘটিত অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক নহে। এই কাগজ, কলম, দোয়াৎ, জমী, জেরাৎ, মাল, লাখরাজ, কাছারী, খাজনা, দেওয়ান অবধি চৌকীদার পর্য্যন্ত সমস্ত আমলা, যত দলিল দস্তাবেজ, ঘরের অনেক আশবাব্ প্রভৃতি কিছুই সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক নহে। এখন আবার ইংরেজীও ঐ রকমে বহুতর প্রবেশ করিতেছে।

সুতরাং বানানে বিষম গোল। বানান ঠিক না করিয়া, লিখিব কেমন করিয়া?

শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

ইতিহাস-তত্ত্ব।

শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয়শ্রেণীর আর্য্যগণের[১] মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হওয়া অবধি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ইউরোপের অধিকাংশে, পোপের রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্ম অক্ষুন্ন ভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু অনেক বিষয়েই সামাজিক বিপ্লব ও মানবজ্ঞানের পরিবর্ত্তনের সহিত ক্রমে ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠে। ক্যাথলিক্ ধর্ম্মেও কোন কোন বিষয়ে অবনতি হইয়াছিল। এদিকে ভারতবর্ষেও মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কোন কোন অংশের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে কারণেই হউক, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মার্টিন্ লুথার, জন্ ক্যাল্‌ভিন্, জন্ নক্‌স্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ পোপের অধীনত্ব অস্বীকার করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মের নূতন প্রণালী সংস্থানের নিমিত্ত যত্নবান হইলেন। অপর দিকে ইগ্‌নেসাস্, লয়েলা প্রভৃতি মহাত্মাগণ পোপের ধর্ম্মরাজ্য দৃঢ়তর রূপে বদ্ধমূল করিবার নিমিত্ত যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন। আবার দেখ এই সময়েই

১ আর্য্যজাতি ভারতের আদিমনিবাসী নহেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পরিকল্পিত একথা বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, আর্য্য জাতির একাংশ যে কোন সময় পাশ্চাত্য প্রদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আমাদের মহাভারত ও পুরাণাদিতেই পাওয়া যায়। স্থানান্তরে গিয়া তাঁহারা অদ্যাপি আর্য্যনামের অধিকারী না হইলেও, আমি আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া সেই হিসাবে তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্য-আর্য্য নামে অভিহিত করিয়াছি। অন্য কেহ তাঁহাদিগকে ম্লেচ্ছ বা আর্য্য-ম্লেচ্ছ যাহা বলুন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।

প্রাচ্য রোমের পতন হইলে পাশ্চাত্য রোমের দীপ্তি পুনঃ প্রকাশের নিমিত্ত পোপ দশম লিও যথোচিত চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং এই সময়েই কলম্বস্ আমেরিকার আবিষ্কার করায় এবং ভাস্কো-ডি-গামা ভারতবর্ষে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কার করায় ইউরোপীয়দিগের মনে নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সময়েই ভারতবর্ষেও আর্য্যদিগের ধমনীমধ্যে নূতন তেজস্কর শোণিত প্রবাহিত হইয়া উঠিল। বাঙ্গালা দেশে চৈতন্যদেব এবং অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণ; ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডে রামানন্দের শিষ্য কবীর; পঞ্চনদপ্রদেশে গুরু নানক্; দাক্ষিণাত্যে বল্লভাচার্য্য ও রামানুজ স্বামী স্ব স্ব মতপ্রচার করিতে লাগিলেন; এবং এই সময়েই গুরু গোরক্ষনাথ শিবোপাসনা ও হঠযোগ বিষয়ে স্বীয় মত প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন। বিদ্যালোচনার তরঙ্গও এই সময়ে ছুটিল। বিশেষতঃ নবদ্বীপচন্দ্রের সহাধ্যায়ী ও সমকালবর্ত্তী বাসুদেব সার্ব্বভৌমের অপর শিষ্যদ্বয় কর্ত্তৃক স্মৃতি ও দর্শনের, মিথিলায় বাচস্পতি মিশ্র কর্ত্তৃক বিবিধ দার্শনিক ও স্মার্ত্ত গ্রন্থের, প্রণয়ন ও প্রচার এইসময়েই হইয়াছিল।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—এই ঐতিহাসিক রহস্যের কারণ কি? শত যোজন ব্যবধানস্থিত, সাগর, পর্ব্বত, মরুভূমি, ও বিশাল নদীসমূহ দ্বারা বিচ্ছিন্ন আর্য্যবসতিদ্বয়ের এক কালে উচ্ছ্বাস; সেই উচ্ছ্বাসের হিল্লোল উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়া আসা; বিবিধ প্রকার রাজ্য-বিপ্লবেও সেই স্রোতের অক্ষুন্নতা প্রভৃতি সকলেরই বিচিত্র বলিয়া বোধ হইবে। সময়ে সময়ে ঘটনাক্রমে সেই স্রোত মন্দীভূত হইয়াছিল বটে; কিন্তু আজ কালের সভ্যতা, আজ কালের ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ও আজ কালের চিন্তাপ্রণালী, সকলই যেন সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর বিপ্লবের ফল। এই সময়ের তিনশত বৎসর পরে ইউরোপে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়া উন্নতিস্রোতের গতি অধিকতর বেগবতী হইয়াছিল, এবং ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা ও বিজ্ঞানোন্নতির আধিক্য সেই মহাবিপ্লব হইতে উদ্ভূত বলিয়া সকলে মনে করেন। কিন্তু ইউরোপের মহাবিপ্লবের সময়ে ভারতবর্ষ সুকঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল। তৃতীয় পানিপতের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাজয় না হইলে, ইংরাজদিগের রাজ্য দৃঢ়মূল হইয়া নিবেশিত না হইলে, ভারতবর্ষেরও দশা কি হইত বলা যায় না।

যাহা হউক, পঞ্চদশ শতাব্দীর এই উচ্ছ্বাসের কারণ কি? ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের এই একটী গুরুতর বিচার্য্য বিষয়।

এক্ষণে অনেকেই ঈশ্বরের আংশিক বা পূর্ণাবতার কিছুই স্বীকার করেন না; কিন্তু স্বীকার না করিলে কিরূপে যে এই গুরুতর প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দেওয়া যাইতে পারে, আমরা অল্পবুদ্ধিতে তাহা বুঝি না। টমাস্ কার্লাইল্ ও তন্মতাবলম্বীগণ বলিয়া থাকেন যে, সময়ে সময়ে এক একজন বীরপুরুষ (Hero) জন্ম গ্রহণ করিয়া মানবসমাজের উৎকর্ষসাধন করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে

অবনতির পথ হইতে উদ্ধার করেন। এই মতাবলম্বীগণ ঈশ্বরের আবির্ভাব স্বীকার করেন না। কিন্তু মুখে না বলুন, তাঁহারা প্রকারান্তরে এই সকল মহাত্মাদিগের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যখন মানবসমাজ ক্রমশঃ দূষিত হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হয়, যখন ধর্ম্মনিষ্ঠা হ্রাস হইয়া যায়, যখন মানবমণ্ডলীর চিন্তাশক্তি লুপ্তপ্রায় হয়, যখন পুণ্য অপেক্ষা পাপের স্রোত প্রবল হয়, অথবা যখন কিছুকাল তদবস্থায় থাকিবার পর মানবের উন্নতিসোপানে উঠিবার প্রয়োজন হয়, ঈশ্বর তখনই কোন না কোন রূপে—আংশিক বা পূর্ণভাবে, ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; অথবা অসামান্য কোন ব্যক্তি ঐশী-শক্তির সাধারণাধিক সমাবেশ লইয়া জগতের হিতার্থ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং এরূপে বিচার করিলে যে সকল মহাত্মাগণের বিদ্যাবুদ্ধি ও যত্নের প্রভাবে উভয় আর্য্যবসতিতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নূতন আলোক প্রদীপ্ত হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই অবতার। তাঁহারা অবতীর্ণ না হইলে আর্য্যসন্তানগণের জাতীয়ত্ব থাকিত না। হয়ত তুরস্কাধিপতিগণ সমস্ত ইউরোপে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া উন্নতির পথে কণ্টক স্থাপিত করিতেন। হয়ত ভারতবর্ষে মহম্মদীয় ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া আর্য্যনামের অস্তিত্ব লোপ করিত। হয়ত বর্ত্তমান পারস্যদেশীয়-গণের ন্যায় আমরাও আর্য্যনাম ও আর্য্যধর্ম্মকে ঘৃণা করিতাম, এমন কি আমরাই থাকিতাম কি না সন্দেহ। প্রকৃত প্রস্তাবে চৈতন্যদেব, কবীর, গুরু নানক, গুরু গোরক্ষনাথ, আচার্য্য বল্লভস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ; ভারতবর্ষে তাঁহারা জন্মগ্রহণ ও ধর্ম্ম-যাজকতা না করিলে শীখ, জাট্‌ ও মহারাষ্ট্রদিগের প্রাদুর্ভাব হইত না; এবং মহম্মদীয় ধর্ম্ম ও রাজত্ব আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশের ন্যায় ভারতভূমিতে চিরবদ্ধমূল হইয়া যাইত।

কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ সকল কথা বৈজ্ঞানিক নহে। সুতরাং বিজ্ঞানপ্রিয় ব্যক্তিগণের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। মহম্মদ ঘোরীর বিজয়ের পর হইতে প্রায় দেড় শত বৎসর মুসলমানেরা রাজত্ব করিলেন, এবং তাহার পরেই দ্রুতগতি অবনতির স্রোত বহিতে লাগিল। চারিদিকে মুসলমান ছত্রপতিগণ স্বাধীন হইয়া উঠিলেন এবং স্থানে স্থানে হিন্দুরাজ্যও সংস্থাপিত হইতে লাগিল। দিল্লীর সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং মুসল্‌মানদিগের এইরূপ বিচ্ছেদ হওয়ায় হিন্দুদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে আর্য্যতেজ দুই শত বর্ষ ভস্মরাশিতে আবৃত ছিল, তাহা অবকাশ পাইবামাত্র পুনরুদ্দীপ্ত হইল। যেখানে মুসল্‌মানগণ রাজা ছিলেন, সেখানেও হিন্দুদিগের অধিকার বৃদ্ধি হইল; কিন্তু অধিকার বৃদ্ধির সহিত মানসিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তেজোবৃদ্ধির আবশ্যক হইয়াছিল। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় জাতির শৌর্য্যবীর্য্য প্রবল না থাকায় অনার্য্য ভারতবাসীদিগকে সহায় করিবার জন্য তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের ক্রোড়স্থ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল।

এই অনার্য্য জাতিদিগকে হিন্দুশাস্ত্রের ছায়ায় না আনিলে তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিত। তাহারা কঠিন বৈদিক ও তান্ত্রিক মতের অনুপযুক্ত। বিশেষতঃ একেশ্বরবাদী মুসলমান-ধর্ম্ম কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিতে-ছিল। সুতরাং ধর্ম্মযাজকতার আবশ্যক হইল। এ দিকে কথঞ্চিৎ স্বাধীনতাপ্রাপ্তি-নিবন্ধন ভাবুকগণের চিন্তাশীলতা বাড়িতে লাগিল। পুরাতন হিন্দুরাজগণের দৃষ্টান্ত হিন্দুরাজগণের সম্মুখে আদর্শ স্বরূপ নিবেশিত হইল এবং শনৈঃ শনৈঃ আর্য্যকীর্ত্তির আলোক ভারতবর্ষে পুনর্বিকীর্ণ হইতে লাগিল। যে কারণে বুদ্ধদেব সংসারাশ্রমের অপরিসীম সুখ ত্যাগ করিয়া মানবসমাজের সুখবৃদ্ধির নিমিত্ত জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই কারণেই এবং সেই সমাজের সেইরূপ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণ ভারতভূমে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগের নিজ নিজ কার্য্য সাধনা করিতে লাগিলেন।

ইউরোপে এই সময়ে তুরস্কজাতিরা রুমনগর (Constantinople) গ্রহণ করায় যে সকল বিদ্বান লোকেরা ঐ স্থানে ছিলেন, তাঁহারা পশ্চিম ইউরোপে চলিয়া গেলেন। এ দিকে রোমান্‌ক্যাথলিক্‌ যাজকেরা অধিকতর অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন এবং সামান্য লোকেরা ক্রমশঃ উন্নতিশীল হইয়া উঠিল। সুতরাং বিদ্যার আলোচনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় চিন্তাশীলতাও বৃদ্ধি হইল। এবং লুথার প্রভৃতি কয়েকটী চিন্তাশীল ব্যক্তি যথাসময়ে নিজ নিজ কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা এই সময়ের অনেক কথা কহিয়াছেন। আমরা তাহার সারাংশ মাত্র সংক্ষেপে বলিলাম। কিন্তু আমরা বিজ্ঞানের কথা ভাল বুঝিতে পারি নাই। কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ আমরা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে আমরা ইহাই বুঝি যে, যখনই কোন প্রবল জাতি নিজ নিজ ধর্ম্মাচার ও বলবীর্য্য-ভ্রষ্ট হইয়া, পতনোন্মুখ ও ধ্বংসপথের পথিক হয়, তখনই ভগবান তাহাদের রক্ষাবিধান ও সমুন্নতিসাধন জন্য কোন বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যে স্থলে সেরূপ রক্ষাবিধি অবলম্বিত হয় না, তথায় সেই জাতির ধ্বংসসাধনই তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এমন ধ্বংসের নিদর্শন ইতিহাসে অনেক আছে। সে যাহা হউক, আর্য্য জাতির দুইটি শাখা,—খাঁটি আর্য্য ও ম্লেচ্ছ-শাখা, একদা এই দুই সম্প্রদায়ই যে একই সময়ে দুইটি বিভিন্ন দেশে ঐশী কৃপা বা ঐশী নিয়মে সংরক্ষিত ও সমুন্নত হইয়াছিল, ইতিহাসের এই বিচিত্র চিত্রই আমরা পাঠকের চক্ষে প্রতিফলিত করিলাম। ইহার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বা ফলাফল-তত্ত্ব দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকে বিচার করুন, সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

শিশু-স্বাস্থ্যরক্ষা।

অনেকে মনে করেন যে, উত্তম আহার ও পরিচ্ছদ পরাইতে পারিলেই শিশু পুষ্ট হইয়া উত্তম স্বাস্থ্যভোগ করিবে। এই শ্রেণীর লোকেরা শিশুকে রীতিমত পালনের জন্য কোন প্রকার নিয়ম অবলম্বন করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, একটু বয়স হইলে শিশু স্বতই সৎস্বভাববিশিষ্ট হইবে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই রীতি-মত শিশুপালনে অক্ষম। শৈশব অবস্থা হইতে যাহাতে সৎস্বভাববিশিষ্ট হইতে পারে এরূপ চেষ্টা করা অভিভাবক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। শৈশবাবস্থায় শিশু যেরূপ দেখিবে, শুনিবে ও করিতে পাইবে, তাহার চরিত্রও ঠিক সেই ভাবে গঠিত হইবে। এই জন্য অতি শৈশবাবস্থা হইতেই আহার, ব্যায়াম, স্নান, পরিচ্ছদ, আমোদ, শিক্ষা ও সকল কার্য্য নিয়মানুযায়িক সম্পন্ন হওয়া আব-শ্যক। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই শিশুকে আত্মত্যাগ শিক্ষা করাইতে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। শিশু যাহাতে শৃঙ্খলা পূর্ব্বক সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। যে শিশু শৈশবা-বস্থা হইতে দ্বেষ ও হিংসা পরায়ণ হয়, সে ভবিষ্যতে অতিশয় অসুখী হইয়া থাকে; অতএব শিশুকে যদি আত্মত্যাগ ও শৃঙ্খলা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে আজীবন সুখ, প্রতিপত্তি ও কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া থাকে।

আহার।

শিশুর আহারের সময় ও পরিমাণ নির্দ্ধারিত করা অতীব প্রয়োজনীয়। যথাযোগ্য আহার দিয়া সময় ও পরিমাণের বিষয় অমনোযোগ করিলে, পীড়িত হইয়া শিশু অজীর্ণ রোগ ভোগ করে। অনেকে শৈশব অবস্থায় শিশুকে যথেচ্ছা আহার করিতে দিয়া ভবিষ্যৎ-স্বাস্থ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া থাকেন। পিতা মাতারা মনে করেন যে, ছেলেকে অধিক পরিমাণে আহার করাইতে পারিলে স্থূলকায় ও বলিষ্ঠ হইবে। ছেলে মোটা না হইলে বাপ মার মন কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। অযথা ও অপরিমিত আহার জনিত ভবিষ্যৎ-স্বাস্থ্যের যে কত অনিষ্ট হয়, তাহা অল্পদর্শী স্নেহময় পিতা মাতা জানিতে পারেন না। শিশুকে যদি সবল ও সুস্থকায় করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে শিশুর উপযুক্ত পুষ্ট-খাদ্য, উপযুক্ত পরিমাণে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দিনের মধ্যে যতবার আহার দেওয়া আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক শিশুকে ততোধিক বার দেওয়া আবশ্যক করে না। বয়স বৃদ্ধির সহিত বারে আহার কম্ দেওয়া আবশ্যক হইলেও পরিমাণে অধিক দেওয়া কর্ত্তব্য। দুগ্ধপোষ্য শিশুরা কোন কারণে ক্রন্দন করিলেই স্তনপান করাইয়া মাতা শিশুকে সান্ত্বনা করেন। এই দোষটি আমাদের দেশে ভয়ঙ্কররূপে প্রচলিত দেখা যায়। শিশুকে সর্ব্বদা অযথারূপে ও অসময়ে স্তনপান করাইয়া মাতা ও শিশু উভয়েই রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। অনেক সময়ে

এরূপ অযথা স্তনপান জন্য শিশুর পাকস্থলীতে উৎসেচন ক্রিয়া (Fermentation) বৃদ্ধি পাইয়া বমন ও বমনোদ্বেগ হইয়া থাকে। এবং সময়ে সময়ে পেট বেদনায় শিশু অস্থির হইয়া যত ক্রন্দন করে মাতাও ক্রমাগত স্তনপান করাইয়া আরও যন্ত্রণার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। শিশু বমন করিয়া ক্রন্দন করে, মাতা স্তনপান করাইয়া সান্ত্বনা করিতে গিয়া পাকস্থলীর উৎসেচন বৃদ্ধি করিয়া যন্ত্রণা ও বমন বৃদ্ধি করিয়া শিশুকে অধিকতর পীড়িত করিয়া ফেলেন। স্তনপায়ী শিশু ক্ষুধিত হইলে ক্ষুঁৎ ক্ষুঁৎ করে; চীৎকার করিয়া ক্রন্দন ও চিড়িক মারিয়া উঠে না,—আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের এ জ্ঞান থাকিলে অনেক শিশু অকাল মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা পাইত। অযথা ও অসময় স্তনপান জন্য শিশু কোষ্টবদ্ধ, উদরাময়, পেটবেদনা, জ্বর, বমন, বমনেচ্ছা ও কনৃভল্‌সন্‌ ভোগ করিতে পারে। মাতার অজ্ঞতার জন্য এইরূপে শত সহস্র শিশু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে।

এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করান কর্ত্তব্য; মাতা সুস্থ ও সবলকায় হইলে স্তনপান করাইয়া রাখিতে পরিলেই শিশু অতি উত্তম স্বাস্থ্য ভোগ করে। স্তনে দুগ্ধ বেশী না থাকিলে গাভী-দুগ্ধ পান করান কর্ত্তব্য। স্তন্যপায়ী শিশুকে ২ ঘণ্টা অন্তর মাতৃ-দুগ্ধ কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে গো-দুগ্ধ পান করান আবশ্যক। বয়স বৃদ্ধির সহিত দুই হইতে তিন, চার বা পাঁচ ঘণ্টা অন্তর পান করান প্রয়োজন। শিশুর বয়োবৃদ্ধি হইলে রাত্রে যত কম দুগ্ধ পান করান যাইতে পারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এইরূপে রীতি পূর্ব্বক যথা সময়ে দুগ্ধ পান করাইলে শিশু যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ পাইতে পারে এবং মাতাও ভগ্নস্বাস্থ্য না হইয়া সুন্দর স্বাস্থ্য ভোগ করিয়া থাকেন।

মাতার মৃত্যু, পীড়া কিম্বা স্তন দুগ্ধশূন্য হইলে সুস্থকায় গাভীর দুগ্ধ শিশুর বিশেষ উপযোগী। এস্থলে সুস্থকায় গাভীর অর্থ জানা আবশ্যক। যে গাভী অধিকাংশ সময় আপন মনমত বিচরণ করিয়া গো জাতির স্বাভাবিক আহার করিয়া থাকে, সেই গাভীকে আমরা সুস্থকায় গাভী বলিয়া থাকি। সহরের ভিতর যে সকল গাভী সংকীর্ণ স্থানে মলমূত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া অযথা আহার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অধিক দুগ্ধ প্রদান করে, সে সকল গাভীর দুগ্ধ শিশুর উপযোগী নহে। সহরের বিশেষতঃ কলিকাতায় শিশুর পীড়া এই কারণে এত অধিক।

খাঁটি দুগ্ধ হইলে অর্দ্ধেক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত জলের ভাগ ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া দেওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় বৎসরে শিশুকে চার হইতে ছয় ঘণ্টা অন্তর দুগ্ধ পান করান আবশ্যক; কিন্তু দুগ্ধের পরিমাণও বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। এক বৎসরের পর বার্লি, রুটী, নরম ভাত ইত্যাদি আহার অল্প পরিমাণে দিলে শিশু পরিপাক করিতে পারে। যে পর্য্যন্ত শিশু চিবাইতে না শিখিবে সে পর্য্যন্ত শিশুকে জলীয় ও নরম খাদ্য খাওয়ান কর্ত্তব্য। দুই বৎসর উত্তীর্ণ হইলে শিশুকে মৎস্য,

অন্ন, আলু, রুটি ও মিষ্টান্ন দেওয়া যাইতে পারে।

নিদ্রা।

দুগ্ধপোষ্য শিশুকে যতক্ষণ ঘুম পাড়াইয়া রাখিতে পারা যায়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর নিদ্রা স্বতই কমিয়া যায়। যে শিশু অধিকক্ষণ নিদ্রাবস্থায় থাকে সে রীতিমত পালিত হইলে কদাচ পীড়িত হয়।

বায়ুসেবন।

বর্ষার বাতাস, প্রবল বায়ু ও শীতল বায়ু শিশুর গাত্রস্পর্শ না করে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া আবশ্যক। শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর বায়ু প্রচুর পরিমাণে শিশুর দেহে আসিতে দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'ছেলি।'

তোমারে দেখিয়া ছেলি, পড়ে আজি মনে
দূর অতীতের কথা; খুল্লনা সুন্দরী,
সতিনী তাড়না ভয়ে, ভ্রমি একেশ্বরী
ফিরিত তোমার পাছে নিবিড় গহনে;
তমিশ্রা রজনী, শীত, প্রখর তপনে,
বরিষার ধারা জলে, কিম্বা ভয়করী
চঞ্চলা চপলা যবে জলদ বিদরি
ভ্রুকুটি করিত তারে তিমির গগণে।
এমনি দেখিতে সেও চাঁদের কিরণ,
রোমশ শরীর বাহি পড়িছে ক্ষরিয়া;
অথবা লুকায় মিশি—মধুর মিলন,
শুভ্র কেশজাল মাঝে, পথ হারাইয়া!
সেই দিন এই দিন কত ব্যবধান
মনে হয় জগতের নূতন বিধান!

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিবাহের বিজ্ঞাপন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রতিমা-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমার এই বিজ্ঞাপনটুকু আপনার সম্পাদকীয় স্তম্ভে একবার মাত্র প্রকাশ করিলে চিরবাধিত হইব।

আমি বিবাহ করিব। আমার নাম কিরণশশী বাগ্। আমি স্ত্রীলোক। বয়স

আমার পূর্ণ ষোল। এখন বন্ধুলোকে বলিতেছে, আমার বিবাহ করা প্রয়োজন।

বাস্তবিক বিবাহে কোন প্রয়োজন আছে কি না, আমি অনেক চিন্তা করিয়া নিজে সে বিষয় কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। মিল্ ম্যাল্‌থাস, ডারুইন্ স্পেন্সার, কোম্‌ৎ চার্ব্বাক, প্রভৃতি অনেক শাস্ত্র আমি পড়িয়া দেখিয়াছি; তবুও বিবাহ করা উচিত কি না, একথার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। জীবজগৎ আমি নিজে অধ্যয়ন করিয়াছি; তাহাতে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হওয়া দূরে থাকুক, তাহা যে অনাবশ্যক ও প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, সময়ে সময়ে বরং এই চিন্তাই মনোমধ্যে সমুদিত হয়।

এই সন্দেহ-বাত্যায় কিছুদিন হইল আমার মানসলতা দোদুল্যমান হইতেছিল, এমন সময় আমার একটি বিশেষ বন্ধু,—তিনি অবশ্য স্ত্রীলোক ও বিবাহিতা—আমায় বুঝাইয়া বলিলেন যে, "যুবতীমাত্রেরই বিবাহ একটা করা চাই। সময়ে অসময়ে, অভাবে বিভাবে, আপদে বিপদে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, দিনে রাতে, প্রতিপদেই, পতিপদে নিযুক্ত যে ব্যক্তি, তাহার দ্বারায় অনেক কাজ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এই ভবের হাটে যৌবন-বেসাতির বাঁধা খরিদ্দার একটা না থাকিলে চলে না, ভবসাগরের তুফান-তরঙ্গে হাল ধরিবার জন্য মাইনে-করা মাঝী একটা থাকা চাই, সংসার-সুখের তীর্থে তীর্থে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইবার জন্য আঁচলধরা সেথো একটা থাকিলেই ভাল হয়।" আমার সেই বন্ধুবরা ব্যাকরণেও সুপণ্ডিতা। তিনি আরও বলিলেন যে, "বিবাহ শব্দের প্রকৃত অর্থ—'বি'—অর্থাৎ বিশেষরূপে 'বাহ,' কিনা বাহনক্রিয়া যদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। যিনি স্বামী, তিনিই বাহক। বাহক নহিলে তরণী বাহিবে কে? বিবাহে সেই বাহক লাভ করা যায়; আর সে বাহক বাঁধাধরা, রেজেষ্টারী-করা।"

বন্ধুর ব্যাখ্যা আমি বুঝিলাম কি না বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ লঙ্ঘন করা উচিত বিবেচনা করিলাম না। অতএব এখন কেবল অনুরোধেই যে এ বিবাহের আয়োজন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যে অনুরোধের দায়ে লোকে ঢেঁকি গেলে, সেই অনুরোধের খাতিরেই আমি বিবাহে সমুদ্যতা। বন্ধুর অনুরোধে লোকে নাটক ছাপাইতে পারে, আর বন্ধুর অনুরোধে আমি বিবাহ করিতে পারি না?

বিবাহ করিব, কিন্তু ঘটকালি বা দালালি কাহাকেও করিতে দিব না। মা বাপ্, ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, পাড়ার পাঁচজন, ঘটক দালাল কেহ যে আসিয়া আমার বিবাহে বাক্ বিতণ্ডা করিবেন, সে সব আমি চাহি না। আমার সুবিধা অসুবিধা আমি নিজে যেমন বুঝিব, অপরে তাহা কখনই পারিবে না। "আপরুচি খানা" এ কথাটা বিবাহেও ঠিক খাটে। বিবাহ খাদ্য-সামগ্রী না হউক, কিন্তু বিবাহ হৃদয়ের খোরাক ত বটে। আমার আস্বাদন তোমরা বুঝিবে কেমন করিয়া? আমি টক্ চাই কি ঝাল্ চাই,

আমার তিক্ত ভাল কি মিষ্ট ভাল, অম্লমধুর কি পানসে পছন্দ, তোমরা তাহার কি জানিবে? আমি আম্ কিনিব, তোমরা আসিয়া চাকিলে চলিবে কেন? পরের মুখ চাহিয়াই দেশটা গেল। স্বাধীনতা আমি লোপ করিতে পারিব না, সুতরাং দালালে আমার দরকার নাই।

পরের পছন্দ লইব না, কিন্তু বর পছন্দ করিতে নিজেও বাজারে বাহির হইতে পারিব না। তাহাতে আর কিছু না হউক, গুমোর ভাঙ্গিবে, লোকে গরজ ঠাওরাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইজ্জতও নষ্ট হইবে। সুতরাং বিজ্ঞাপনের পন্থাই অবলম্বন করিতে হইল। বিজ্ঞাপনে আজকাল গরু হারাইলে পাওয়া যাইতেছে, আর বিজ্ঞাপনে বর মিলিবে না?

বিবাহের উমেদারগণ আপন আপন নাম ধাম, বয়স রূপ এবং গুণাগুণাদি সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া তিনমাসের মধ্যে আমার নিকট দরখাস্ত করিবেন। যিনি এম্, এ, পাস করেন নাই, যাঁহার বয়ঃক্রম বাইশের অতীত হইয়াছে, যাঁহার দেহ সবল এবং সুন্দর নহে, যাঁহার গোঁপ দাড়ী বেশী গজাইয়া উঠিয়াছে, তিনি যেন দরখাস্ত করেন না। বাল্যকালে যিনি জিম্‌নাষ্টিক করেন নাই, যিনি ঘোড়া চড়িতে জানেন না, ট্রামগাড়ীর ফুল্ মোশনে ও রেলগাড়ীর হাফ্ মোশনে যিনি উঠিতে পারেন না, সুইচ্‌ব্যাক্ রেলে যিনি চড়েন নাই অথবা চড়িয়া যিনি শিহরিয়াছেন, তাঁহার দরখাস্ত গ্রহণ করা যাইবে না। গদ্য হউক পদ্য হউক, অন্ততঃ তিনখানি গ্রন্থ যিনি প্রণয়ন না করিয়াছেন, কোন সভার মেম্বরীতে যাঁহার নাম লেখান নাই, যে কোনরূপ বক্তৃতা যিনি অন্ততঃ একবারও না করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আবেদন করা বৃথা। যিনি থিয়েটারে নায়কের চরিত্র কখনও অভিনয় না করিয়াছেন, হারমোনিয়ামে যাঁহার হাত নাই, সেতারে যিনি আলাপ করিতে জানেন না, ঢোলক্ তবলায় যিনি ঢিমে তাল হইতে চৌদুঁদ্ বাজাইতে না জানেন, গানে যিনি অন্ততঃ আমার দোয়ারগিরি করিতেও না পারেন, তাঁহার দরখাস্ত করিবার প্রয়োজন নাই।

বিবাহার্থীর এই সকল গুণাগুণ আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া লইব। গুণাগুণ আরও কতকগুলি থাকা চাই। আমি যাঁহাকে বিবাহ করিব, পাকপ্রণালী তাঁহার বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করা হইয়াছে কিনা,—কেবল অধ্যয়ন নয়, হাতে কলমে তিনি পাকপ্রণালীর পরীক্ষা দিতে পারেন কি না— দেখিয়া লইব। বিবাহার্থীকে মান অভিমান একবারে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। চোক্‌রাঙ্গানীতেই অমনি নাকে কাঁদিবেন, ঝাঁটা দেখিলেই অমনি কাঁটা হইবেন, এ রূপ সূক্ষ্মচর্ম্মাকে আমি পতিপদে বাহাল করিতে চাহি না। বোতলে যাঁর পা টলে, কড়া তামাকেই যিনি কেশে খুন, অহিফেনে যাঁহার আত্মহত্যা সাধিত হইতে পারে, তিনি আমার বিবাহের উপযুক্ত পাত্র নহেন। শারীরিক ও মানসিক যাবতীয় বৃত্তিগুলির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি হইয়াছে কি না, তাহার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা আমি গ্রহণ করিব। গাড়ী হাঁকাইতে, নৌকা চালাইতে, গাছে

উঠিতে, প্রাচীর লঙ্ঘিতে, তেতালা হইতে লাফাইতে ও গোরা কাফ্রির সহিত ফাইট্ লড়িতে যিনি সমান মজবুৎ, তাঁহারই শারীরিক বৃত্তিসমূহ সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমি স্বীকার করিব। আর মানসিক বৃত্তির পরিচয় সহজেই পাওয়া যাইবে। ঋগ্বেদ হইতে হুতোমপ্যাচা পর্য্যন্ত যে কোন গ্রন্থের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও বৈজ্ঞানিক এই চতুর্ব্বিধ ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই বিবাহার্থী উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন।

বিবাহার্থীকে কতিপয় নিয়মের বশীভূত হইতে হইবে। তাঁহাকে এগ্রীমেণ্ট লিখিয়া দিতে হইবে যে মাসিক এত টাকা আমাকে উপার্জ্জন করিয়া দিবেন। যে মাসে না পারিবেন, সে মাসে সেই টাকাটার খৎ লিখিয়া দিবেন। তিনি যাহা উপায় করিবেন, তাহতে তাঁহার কোন হাত থাকিবে না. তাহা আমার নিজস্ব সম্পত্তি। আমার সেই নিজস্ব আয় হইতে তাঁহার খোর-পোষের একটা স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া দিব। ১০টা-৫টা হউক আর যাহাই হউক, আমার নিকট তাঁহাকে কতক্ষণ হাজির থাকিতে হইবে, তাহার একটা নিয়ম করিয়া দিব। সেই নিয়মের অন্যথা করিয়া তিনি হাজির বা গর-হাজির হইতে পারিবেন না। আমি যাহা বলিব, তাহাই তিনি শুনিবেন; বিনা দর-কারে বাজে কথা কহিবেন না। আমি যাহা দিব, তাহাই তিনি পাইবেন; অতিরিক্ত কিছু চাহিবেন না। আমি যখন ডাকিব, তখনই তিনি আমার ঘরে আসিবেন; আপন ইচ্ছায় গৃহ প্রবেশ করিতে পারিবেন না। পতিপত্নী-সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইলে, উভয়কেই এক মাস পূর্ব্বে নোটিস্ দিতে হইবে।

পাত্রের জাতিবিচার আমি চাহি না। জাতিভেদ আমি নিজে মানি না। আমার পিতৃপুরুষ বাগ্দী বলিয়া, আমি নিজে কদাচই বাগ্দী নহি। সুতরাং পাত্র ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেও তাঁহাকে বিবাহ করিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ-তনয় অদ্যাপি সূতা গলায় দিয়া বেড়ান, তাঁহাকে আমি চাহি না। তাঁহার জাতীয় পদবীটি বড় শ্রুতিকঠোর, বিবাহের পর উহা বদলাইয়া ফেলিব। বিবাহার্থী যদি দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র হন, তবে পূর্ব্ব-পত্নীর প্রদত্ত সার্টিফিকেট আমাকে দেখাইতে হইবে। এই সকল নিয়মে যাঁহারা বাধ্য হইতে চাহেন, আর উপরোক্ত গুণসমূহে যাঁহারা অলঙ্কৃত, তাঁহারা আপন আপন চরিত্রের প্রমাণ নিদর্শন সহ যথাসময়ে দরখাস্ত করিলে, তিন মাস পরে একটা দিন ধার্য্য করিয়া আমি স্বয়ং সকলের পরীক্ষা গ্রহণ করিব। পরীক্ষায় যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবেন, তিনি ছয়মাস য়্যাপ্রেণ্টিস্ থাকিয়া পরে য়্যাপ্রেণ্টিসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, পাকা পদে বাহাল হইবেন। দর-খাস্ত আমার নামে "প্রতিমা-সম্পাদকের" কেয়ারে করিলেই চলিবে।

শ্রীকিরণশশী।

সাহিত্য সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড।]　　আষাঢ়, ১২৯৭।　　[তৃতীয় সংখ্যা।

আশা।

"আঁখি বারি পারাবারে তরঙ্গের খেলা!
আশা তায় একমাত্র ভেলা।
কল্পনা মধুর বায়, সুখে ভেলা ভেসে যায়,
উন্মত্ত তরঙ্গদলে ক'রে অবহেলা।
নিরানন্দ ভবধামে আনন্দের মেলা।"

কবির অমৃতময় বাক্যের পোষকতায় আমিও বলি, এই তরঙ্গ-সমাকুল অকূল ভবসাগরে আশাই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন, এই শূন্যময় অনন্ত সংসারাকাশে আশাই আমাদিগের একমাত্র ধ্রুব-নক্ষত্র। আশা সৃষ্টি-স্থিতির মূল ভিত্তি এবং আশাই আমাদিগের কার্য্য-সম্পাদনে পরিচালিকা শক্তি। আশা আমাদিগের কার্য্য মাত্রেরই মূল কারণ; আশার প্ররোচনায় কার্য্যে আমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে এবং আশার শক্তিতে আমরা শক্তিমান হইয়া কার্য্য সমাধা করি। আশা আমাদিগের হৃদয়ের ঈশ্বরী, আমরা আশার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর— ক্রীতদাস। আশার সহিত আমাদিগের

আজীবন সম্বন্ধ। আশাই আমাদিগের সুখ এবং আশা যতই দূরব্যাপিনী, ততই আমাদিগের মনোহরণে মহীয়সী। আশার কুহকময় সঞ্জীবনী মন্ত্রে আমরা জীবনধারণ করি। ধন বল, ঐশ্বর্য্য বল, মান বল, মর্য্যাদা বল, দয়া বল, স্নেহ বল, মমতা বল, প্রীতি বল, এমন কি এ জগতে যাহা কিছু প্রিয়—সকলই বিসর্জ্জন দিতে পারি কিন্তু আশাকে মন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে, আশাকে পরিত্যাগ করিতে, পারি না। আমাদিগের আশার সীমা নাই, অবধি নাই, অন্ত নাই; সেইরূপ আশার বিষয়েরও সংখ্যা নাই, অবধি নাই ও অন্ত নাই। যতক্ষণ কণামাত্র শোণিত আমাদিগের ধমনীতে প্রবাহিত হয়, যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গণ স্বকার্য্য সাধনে সক্ষম থাকে, যতক্ষণ দেহে চৈতন্যের বিকাশ পায়, ততক্ষণ আমাদিগের আশার বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই। জীবনের অবসানেই আশার অবসান হয়। তাহাতেই আর্য্য কবিগণ আশাকে বৈতরণী নদী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে ঐ নদী প্রবাহিত, উহা পার না হইলে পরলোকে যাইবার উপায়ান্তর নাই। এই সকল কবিকল্পনা-প্রসূত বর্ণনা অলঙ্কারবিরহিত করিলে বুঝায় কি?—না, আশার নিবৃত্তি আমাদিগের মরণ-সাপেক্ষ।

আশা আমাদিগের চিত্তবিমানে বিচিত্র ইন্দ্রধনু। ইহার বিকাশ অশ্রুবিন্দু ও উল্লাস-দীপ্তি-ঘটিত। ইন্দ্রধনু, যেমন বারিধারা পতন ও অংশু-বিকাশের মধ্যবর্ত্তী সেইরূপ সন্তাপ ও উল্লাসের—দুঃখ ও সুখের মধ্যবর্ত্তিনী আশা। যখন তোমার হৃদয় ব্যথায় ব্যথিত, সন্তাপে সন্তাপিত, দুঃখে কাতর—যখন তোমার প্রাণ বিকাশহীন, স্ফূর্ত্তি হীন, শূন্যময়, নিস্পন্দ ও নিরালম্ব তখন তোমার মনে হয় এই পৃথিবী—এই সংসার—নরকের প্রতিকৃতি—এখানে সূর্য্যের দীপ্তি নাই, চন্দ্রের সুষমা নাই, পুষ্পের সৌরভ নাই, শব্দের মধুরতা নাই, বায়ুর স্নিগ্ধতা নাই, দয়ার কোমলতা নাই, স্নেহের মমতা নাই, দুঃখের সহানুভূতি নাই—ভালর ভাল কিছুই নাই। তখন মনে হয় এ ছার জীবনের অবসানেই সুখ। পরক্ষণেই মায়াবিনী আশা ভাবী সুখের প্রলোভন দেখাইয়া তোমাকে ভুলাইয়া দেয়। তখন তোমার হৃদয় আধ-অন্ধকার আধ-আলোকে পরিব্যাপ্ত; তখন তোমার প্রাণ হর্ষে বিকশিত, উল্লাসে প্রফুল্লিত ও আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। তখন তোমার মনে হয় এ সংসার—এ মরধাম সেই অমরধামের ছায়াচ্ছবি; এখানে সূর্য্যের কনক বিভায় সর্ব্বত্র আলোকময়, এখানে সুধাংশু কিরণপুঞ্জের সহিত অমৃত ধারা ঢালিয়া দেন, এখানে নন্দন-কানন-জাত পারিজাতের অভাব নাই, এখানে মন্দাকিনী-বিধৌত স্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত হয়, এখানে প্রতি-শব্দে, প্রতিঘাত-প্রতিঘাতে সুমধুর নিক্বণ উঠে। এখানে প্রেম সোহাগপূর্ণ, দয়া সুকোমল, স্নেহ মমতাজড়িত, সহানুভূতি দেদীপ্যমান; বস্তুতঃ যাহা কিছু নয়নমনঃপ্রীতিকর মনে হয় সকলই এখানে বিদ্যমান। তখন তোমার মনে হয় এই অমূল্য জীবন সুখের আধার—সুখে ভরা। ইহাকেই বলে এক চক্ষে কান্না, অপর চক্ষে

হাসি—একদিকে বারিধারা, অপরদিকে দীপ্তি। আর এই হাসিকান্নার সংযোগস্থলে বিকাশিত আশারূপী ইন্দ্রধনু। তাহাতেই বলিয়াছি আশা আমাদিগের চিত্তবিমানে বিচিত্র ইন্দ্রধনু।

বহুরূপী আশা কতরূপই ধারণ করে! যখন তামসী নিশায় বিজন প্রান্তরে পথ-ভ্রান্ত পথিক স্খলিত পদে আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তখন আশা দূরস্থিত পর্ণকুটীরে ক্ষীণ দীপালোকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে আশ্বাস দেয়। যখন নিদাঘ মধ্যাহ্নে উত্তপ্ত বালুকাময় ধূধুকার মরুভূমে দগ্ধকায় পথিক পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তখন আশা নয়নরঞ্জন শ্যামল "ওয়েসিস্" রূপে তাহার নয়নসমক্ষে প্রতীয়মান হয়! যখন ঝঞ্ঝাবাত-বিতাড়িত ঘূর্ণ-বিঘূর্ণিত ক্ষীণকায় তরী অকূল সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গগর্ভে নিমগ্ন-প্রায় হয়, তখন আশা কখন ভাসমান কাষ্ঠ কখন বা সমীপস্থ উপকূল রূপে ভয়ার্ত্ত নাবিকগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়। যখন বীরেন্দ্রগণ হৃদয়ের কুসুমাধিক কোমলতায় জলাঞ্জলি দিয়া পাষাণ-প্রাণে শাণিত কৃপাণ হস্তে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হন, তখন আশা উড্ডীয়মান জয়পতাকা রূপে তাঁহাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া নরশোণিতপাত-রূপ দুষ্কর কর্ম্মে প্রোৎসাহিত করে। বস্তুতঃ দেশ কাল ও পাত্র ভেদে আশার রূপের বা মূর্ত্তির ইয়ত্তা নাই।

কল্পনা আশার সহচরী। আশা যাহা সৃজন করে, কল্পনা তাহাকে বেশ ভূষায় সাজাইয়া দেয়। আশার দৃষ্টি স্থূল, কল্পনার দৃষ্টি সূক্ষ্ম। আশার লক্ষ্য সমষ্টি, কল্পনার লক্ষ্য প্রত্যেক পরমাণু। আশার সহিত কল্পনার নিত্য সম্বন্ধ। আশার উদয়ে কল্পনার উদয় এবং আশার বিলয়ে কল্পনার বিলয় ঘটিয়া থাকে। যেমন কোন বিষয়কার্য্যে কর্ম্মচারীর দোষে কর্ত্তার দোষ বর্ত্তে, সেই রূপ কল্পনার প্রাবল্য হেতু আমরা আশাকে দূষিত বলিয়া গণ্য করি। তখন আশা দুরাশা বলিয়া খ্যাত হয় এবং আমরা আপনাদিগকে আশার ছলনায় প্রতারিত মনে করিয়া থাকি। মরুভূমে মরীচিকাদর্শন ইহার একটি দৃষ্টান্ত স্থল।

কৌতুকময়ী আশা কখন হাসায়, কখন কাঁদায়; কখন হৃৎপট সুরাগে রঞ্জিত করে, কখন তাহার উপর কালিমা ঢালিয়া দেয়। আমরা আশার হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। আশা শিশুসুলভ চপলতায় আমাদিগকে কখন ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করে, কখন বিষাদসাগরে ফেলিয়া দেয়, কখন স্নেহভরে বক্ষে ধারণ করে, কখন আবার পদদলিত করিয়া চলিয়া যায়। আমরা মন্ত্রবিমুগ্ধের ন্যায় আশার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া থাকি। যে সকল কার্য্য দুরূহ ও অসাধ্যবোধে একেবারেই পরিত্যক্ত হয়, আশার উৎসাহে তাহা সুসাধ্য ও অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া, আমরা সাহসে বুক বাঁধিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই। আমরা আশার বলে বলী ও আশার সাহসে উৎসাহিত হই। দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জনকনন্দিনীর পাণিগ্রহণের আশায় বালক দাশরথীকে বজ্রসম হরধনু ভঙ্গ করিতেও সক্ষম করিয়াছিল। দ্রৌপদীর পাণিলাভের আশায় বনবাসী ভিখারী

অর্জ্জুন স্বয়ম্বর সভায় দুর্ভেদ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। ভীমসেনের প্রাণ-নাশে কৃতসঙ্কল্প অন্ধ কুরুরাজ বৃদ্ধ বয়সেও আশার বলে লৌহময় ভীম-প্রতিকৃতি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিলেন।

আশার প্রভাব অপরিমেয়। প্রবাসী পুনর্মিলনের আশায় দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করে। জরে জর্জ্জরিত, ব্যথায় ব্যথিত ও চিকিৎসকগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত মুমূর্ষুর নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনদীপ, আরোগ্যলাভের আশায়, নিবিয়া নিবিয়াও নির্ব্বাপিত হয় না। আশার প্রভাবে ভিক্ষান্নভোজী দরিদ্র দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়, "আজ নয় কাল" হইবে বলিয়া দুঃখের দিন অতিবাহিত করে। যে "মহাসমুদ্রের উপকূলস্থিত কতিপয় উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি" বলিয়া মহাত্মা সার আইজাক নিউটন আত্মবিদ্যা-গরিমার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, অধুনাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-গণ সেই রত্নাকরের কল্পিত রত্নস্বরূপ কতি-পয় উপাধি পাইবার আশায় অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে তৎপর হয়। নিঃসহায় কর্ম্মপ্রার্থী বিবিধ চাটুবাদের উপঢৌকন দিয়া "খালি হইলে পাইব" এই আশায় কর্তৃপক্ষের ভবনে যাতায়াত করিয়া চরণের সূতা ছিঁড়িয়া ফেলে। দুর্ভাগ্য মসীজীবী পদোন্নতির সহিত বেতনবৃদ্ধির আশায় গোরাচাঁদের রাঙ্গামুখের দাঁত্‌খামুটি ও সময়ে সময়ে শ্রীচরণদ্বয়ের সবুট-সঞ্চালন গায়ে পাতিয়া নীরবে সহ্য করে! কি রাজনীতি, কি সমাজ, কি ধর্ম্ম, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, মায়াবিনী আশার কুহকলীলা তুমি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে। বিলাতের হুইগ্ টোরি, র‍্যাডিকেল লিবারেলই বল, আর এখানকার বচনবাগীশ নকুলে রাজনীতি-ভিক্ষুকই বল, সকলেই নিজ নিজ স্বার্থলাভের আশাতেই পরস্পর নিন্দাবাদ ও বকাবকি করিয়া জগতের হিতব্রত ঘোষণা করিয়া থাকেন। সমাজেও ঠিক তাই। সমাজ-সংস্কার বা সমাজ রক্ষা সকলই সেই মায়াবিনী আশার মোহমন্ত্রে সংসাধিত হইয়া থাকে। আবার ধর্ম্মে দেখ, এই অনন্ত শাস্ত্র-শাসিত পুণ্যভূমে আজিও ঐ ক্ষীণবল ক্ষুদ্র বাইবেলকে সম্বল করিয়াই মিশনরী মহাশয়েরা পথে ঘাটে, বনে বাগানে দাঁড়াইয়া তোমার আমার কোঁচা ধরিয়া টানাটানি করেন।

মনুষ্যমাত্রেরই একটা না একটা আশা আছে। ভিক্ষুকের ভিক্ষালাভের আশা, কৃপণের ধনসঞ্চয়ের আশা, প্রেমিকের প্রেমলাভের আশা, নির্ধনের ধনের আশা, আর এতদ্দেশীয় ধনীসন্তানগণের আর কিছু না থাকুক, খেতাব্‌লাভ ও উৎসন্ন যাইবার আশাটা কিরূপ বলবতী তাহাও কি আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে?

আশা সকলেরই আছে। যাহার যাহা নাই, সে তাহা পাইবার জন্য আশা করে, আর যাহার যাহা আছে, সে তাহার বৃদ্ধির আশা চিরকালই করিয়া থাকে। আশার লক্ষ্য অতি উচ্চ, আশার বস্তু অতি দুর্লভ হইলেই সে আশাকে দুরাশা বলা যায়। যে হতাশ-প্রেমিক, প্রণয়ী যাহার প্রতি মুখ তুলিয়া চায় না, যে বলে, "যাবত জীবন রবে কারে ভাল বাসিব না" তাহার সেই হতাশ-হৃদয়েও ভাবী মিলনের একটু

অস্ফুট আশা, দূরাকাশপ্রান্তে অলক্ষ্য তারকাবিন্দুর মত কোথাকার কোন্ কোণে পড়িয়া যেন মিটি মিটি করিতে থাকে। ইহারই নাম দুরাশা। আর দুরাশা আমাদের এই হতভাগা জীবনের। আমরা যে এখনও আমাদের দেশের, আমাদের জাতির ভবিষ্যতে ভাল হইবে বলিয়া এক একবার জাগ্রতে স্বপ্ন দেখি, এটাও আমাদের ভয়ঙ্কর দুরাশা।[১]

শ্রীপ্রঃ।

ভালবাসা।

"Love is Heaven and Heaven is Love."

"ভালবাসাই স্বর্গ এবং স্বর্গের নামই ভালবাসা।" এই মহাবাক্য যে মহাকবির মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তাঁহার উদ্দেশে তাঁহাকে শত শত নমস্কার করি। মানুষ ভালবাসিতে জানিলে তাহার দেবত্ব লাভ হয়—পৃথিবীর ইতিহাস অক্ষয় অক্ষরে সে মহাপুরুষের নাম অনন্তকাল ঘোষণা করিয়া থাকে। এই আধি-ব্যাধি-শোক-তাপপূর্ণ ছার মাটীর সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, রোগ-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-সঙ্কুল বিপদরাশির সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া—মনে মনে ক্ষত বিক্ষত হইয়া বাঁচিয়া থাকায় লাভ কি?—যদি মানুষ হইয়া মানুষকে ভালবাসিতে না পারিলাম, তবে বৃথা এ জড়পিণ্ড দেহ ধারণে লাভ কি? জানি না, সে জীবনের উদ্দেশ্য কি—সে রুদ্ধ প্রাণের লক্ষ্য কি? যদি একের বিপদে বুক দিতে না পারিলাম, প্রাণ বিনিময়ে প্রাণ দিতে না শিখিলাম, সংসারের শত সহস্র বিঘ্নবিপত্তি, উপহাস ভ্রুকুটী, হিংসাদ্বেষ-পরবাদ ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া বিশ্বপ্রেমের আদর্শ ধরিতে চেষ্টা না করিলাম, তবে ধরনীর ভার বৃথা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক কি? এরূপ বিষম দুর্ব্বহ জীবনের কোন প্রয়োজন দেখি না—সে জীবন ত্যাগ করাই ভাল। ভালবাসা কি, ইহা যে না বুঝিল, না শিখিল, না ভাবিল, হৃদয়ে না উপলব্ধি করিল, তার মরণই মঙ্গল। প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া মরিয়া যাও; আমি তোমায় অপ্রশস্ত, অনুদার, অকপট নীরস প্রাণ লইয়া পৃথিবীতে বাঁচিতে পরামর্শ দিই না।

তুমি বলিবে, "আমি জগতের নিকট যেরূপ প্রত্যাশা করি, জগৎ আমাকে তাহা প্রদান করে না;—আমি মানুষকে যে চক্ষে দেখি, মানুষ আমায় সে ভাবে দেখে না;—আমি যাহাকে ভালবাসি সে আমায় ত ভালবাসে না,—তবে আমি উর্দ্ধলক্ষ্য করিব কেন? অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিব কেন?—মানুষকে ভালবাসিব কেন?" আমি বলি, তাহা না করাই তোমার নীচ, হীন, সঙ্কীর্ণ

১ সর্ব্বোপরি দুরাশা বুঝি আমাদের! আমরা যে এই গুরুজনের গঞ্জনা, বন্ধুবর্গের তাড়না ও শত্রুকুলের সানন্দ টিটকারীতে কর্ণপাত না করিয়া, চারিদিকে এই তুফান-তরঙ্গের ভীতিকর উৎপাতে বঙ্গসাহিত্য-সাগরে "প্রতিমা" প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহসী হইয়াছি, দুরাশার দৃষ্টান্ত ইহার উপর আর কিছু কোথাও আছে কি?

শ্রীপ্রতিমা-সম্পাদক।

হৃদয়ের পরিচয়—তাহা না করাই তোমার অমনুষ্যত্ব—অপ্রেমিক জীবনের নিদর্শন। দান প্রতিদান, অদল বদল, বেচা কেনা—এ প্রেমব্যবসায়ীর কথা—প্রেমিকের কথা নয়। ভবের হাটের ভব-ঘুরে প্রেমিকের পক্ষে এ কথা অসঙ্গত নয় বটে, কিন্তু যে ভালবাসা জিনিসটা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে,—ভালবাসার গোলাম হইয়াছে—প্রাণ পাইবার জন্ত যে প্রাণ দেয় নাই, তাহার নিকট তোমার একথা নিতান্ত অসার, অযৌক্তিক, অনুদার বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।—তোমার এমত, প্রেমের হাটের 'মজরো' লোকের খুচ্‌রো কেনা বোধ হইবে। এ ভালবাসার কোন মূল্য নাই—ইহার কোন সার নাই। কাচ দিলাম—কাঞ্চন পাইলাম, ছাই মুষ্টি দিলাম—কড়িমুষ্টি পাইলাম বা পক্ষান্তরে তদ্বিপরীত ফল হইল, কিন্তু সে ভালবাসার স্থায়িত্ব কতক্ষণ?—তাহার গৌরব কি? স্বার্থের অন্তস্তলে যাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে, এই আছে এই নাই যাহার সম্বন্ধ, সে ভালবাসার ক্ষমতা কতটুকু? তাহাতে অনন্তজীবজন্তু-পূরিত বিশাল জগতের কথা দূরে থাক—নিজ ক্ষুদ্র গৃহ জগতের পরিবার মণ্ডলীরই কল্যাণসাধন হয় না। তাই বলিতেছিলাম, যদি যথার্থ ভালবাসিতে চাও, যাহাকে ভালবাসা বলে, সেই মত ভালবাসিতে চাও, তবে অদল বদল, দান প্রতিদান, বেচা কেনার আশা করিও না।

যদি ভালবাসিতে চাও, তবে প্রেমিকের কাছে তাহার মন্ত্র গ্রহণ কর—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
অধরে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখিতে আসি,
দেখা দিতে আসিনে॥

ভালবাসা রোগে ঔষধ, বিপদে কুশল, শোকে শান্তি, উৎশ্বাসে প্রেমাশ্রু, নিরাশায় আশা, অভীষ্টে সিদ্ধি, অন্তে মোক্ষ। ভালবাসাই স্বর্গ, স্বর্গই ভালবাসা। ঈশ্বর কি, কখন প্রত্যক্ষ দেখি নাই। কিন্তু যখন একজনকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিয়াছি, পরের বিপদে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই নাই, তখন সেই প্রেমময়ের সত্তা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছি—বুঝিয়াছি, ভালবাসা কি? ভাষায় ইহা ব্যক্ত হইবার নহে—অপরকে ইহা বুঝাইবার জিনিস নহে। ভালবাসায় যে মজিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, ইহা কি পদার্থ। সংসারের লোকে ইহা বুঝে না—সাধারণে ইহার মহত্ত্ব অবগত নয়। দেব-দুর্লভ অপার্থিব ধন মানুষ কি বুঝিবে? যে বুঝিয়াছে, তাহার অমরত্ব লাভ হইয়াছে। নশ্বর জগতে সে অবিনশ্বর বস্তুর গৌরব কয়জনে করিতে পারে? তবে যে সংসারে একটা "ভালবাসা ভালবাসা" রব শুনিতে পাওয়া যায়, সেটা কেবল একটা কথার কথা। হৈ চৈ গণ্ডগোলের মধ্যে ভালবাসা টিকিতে পারে না। তোতাপাখীর রাধাকৃষ্ণ-বুলির মত "ভালবাসা ভালবাসা" করিলেই ভালবাসার উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইল না। ভালবাসার ব্যভিচারে অনুকরণ-প্রিয় মানুষ একটা ধুয়া তুলে মাত্র—তাহার কোন মূল্য নাই। ভবের হাটে পণ্য দ্রব্যের মত যাহার বিকিকিনি

হয়; লৌকিকতায়, সামাজিকতায় যাহার নিদর্শন, "তোমারই" "একান্ত তোমারই," "প্রাণ তোমারই," "মনে রেখ, ভুলনা আমায়" প্রভৃতি—ছাপার কথা ছাপাখানার ভাষায় যাহা ব্যবহৃত হয়, সে মুখের ভালবাসা—সে ভালবাসিতে হয় বলিয়া ভালবাসা; তাহার ত অভাব নাই; আজ কাল সর্ব্বত্রই। দাম্পত্য প্রেম, অবাধ-প্রেম, সার্ব্বজনীন প্রেম, সখ্য-প্রেম প্রভৃতি সর্ব্বত্রই প্রায় এইরূপে ভালবাসার আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এ ভালবাসার উৎপত্তি স্বার্থে—ইহার বিলয় স্বার্থের ব্যাঘাতে। এরূপ ভালবাসা-বিভ্রাট এখন যেখানে সেখানে শুনিতে পাইবে। এ ভালবাসার জীবন নাই—ইহা মৃত। সকল বস্তুরই ক্রমোন্নতির একটী স্তর আছে—ভালবাসারও একটা স্তর আছে। অপত্য-স্নেহ, ভ্রাতৃ-প্রেম, পিতৃ-ভক্তি, মাতৃ-সেবা, দাম্পত্য-প্রণয় যাহার হৃদয়ে নিহিত থাকে, কালে তাহা সমাজে, দেশে বিস্তৃত হইয়া যায়। যে যাহার সাধনা করে, সে তাহাতে সিদ্ধকাম হইবে;—ভালবাসার মহামন্ত্রে যে জীবন দীক্ষিত করিয়াছে, তাহার পরিণাম অতি অপূর্ব্ব। সে আদর্শ জীবনের জীবন-বৃত্ত পৃথিবীর ইতিহাস আবহমান কাল হইতে অনন্ত রূপে স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দেশকে ভালবাসিতে পারিলে, ক্রমে সে স্তর আরও উন্নতির পথে ধাবিত হইতে থাকে—ভালবাসার সে স্রোত আরও বর্দ্ধিত হয়। যাহার ভাগ্যে স্বদেশ-ভক্তি পর্য্যন্ত উঠিল, তাহার ভালবাসা-স্রোত ক্রমে শনৈঃ শনৈঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। ক্রমে সে মহাপুরুষ অনন্ত জীব-জন্তু-পরিপূরিত বিশাল সংসারের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে অনন্ত প্রকৃতি ও জড়রাজ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক বস্তুকেই প্রেমচক্ষে দেখিতে থাকেন। সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে প্রেমডোরে বাঁধিয়া বিশ্বজনীন প্রেমের আদর্শ স্থানীয় হন। শত্রু মিত্র, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সুন্দর কুৎসিত, সকলকেই ভ্রাতৃ-প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া ধরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। জ্ঞানচক্ষু ফুটিলে সচ্চিদানন্দের পূর্ণবিকাশ তিনি সর্ব্বত্রই দেখিতে পান। জলে স্থলে, অনলে অনিলে, গৃহে বনে, বিজনে পর্ব্বতকন্দরে, শত্রুপুরে কারাগারে, সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে নিম্নে সর্ব্বত্রই সকল সময়ে ভালবাসা সৌন্দর্য্যের পূর্ণস্ফূর্ত্তি দেখিতে পান। এই কালে তাঁহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়—পশুত্ব ঘুচিয়া দেব-চরিত্রের আদর্শ ফুটিতে থাকে, নির্জ্জীব জীবনের অবসান হইয়া নব-জীবনের স্ফূর্ত্তি লাভ হয়। কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়কন্দরে ফুটিতে থাকে—তাহারই প্রভাবে জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়া সমগ্র ধরা উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত দেখিতে থাকেন—গভীর অজ্ঞান-তিমিররাশি এককালে অন্তর্হিত হইয়া যায়। ভালবাসার এই চরম অবস্থা ইহসংসারে অতি বিরল। সচ্চিদানন্দরূপী এই ভালবাসার আদর্শ ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে।

রূপজ মোহে যে ভালবাসার উৎপত্তি, তাহাকে ত ভাল বলিই না; অধিকন্তু গুণজ প্রেমে যে ভালবাসা জন্মিয়া থাকে, তাহারও প্রশংসা করি না। যে হেতু ইহাও ক্ষণিক—

ইহারও স্থায়িত্ব কাল অল্প—সুতরাং সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থ-সম্বন্ধ। আকাঙ্ক্ষা, আশা ও উদ্দেশ্য মিটিলেই এ ভালবাসা চরিতার্থ হয়; কিন্তু তাহার অন্তরায় ঘটিলে অমনি সে ভালবাসারও হ্রাস হইতে থাকে। সুতরাং এ শ্রেণীর ভালবাসা আদর্শস্থানীয় হইতে পারে না, এবং ইহারও পোষকতা করিতে পারি না। আকাঙ্ক্ষা, আশা ও স্বার্থাভিসন্ধিশূন্য গভীর উদারভাবপূর্ণ প্রেমের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রকৃত ভালবাসা। যাহা স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃ উৎপন্ন, লৌকিক কার্য্য-কারণ উদ্দেশ্য ও স্থুলদৃষ্টির অতীত, তাহাই প্রকৃত ভালবাসা। এখন, সে বস্তু কি? সে ভালবাসার উৎপত্তিস্থান কোথায়? বিশাল বিশ্বরাজ্যে প্রাণ সংমিশ্রণই সেই ভালবাসা। এই অনন্ত জীবজন্তু-পুরিত চেতনাচেতনময় বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই সেই ভালবাসার সন্ধিস্থল। ইহারও ঊর্দ্ধে যে নিত্য, সত্য, পরম পদার্থ অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাই ভালবাসার চরম। মানুষের চরম লক্ষ্য—অনন্ত বিশ্বের চরম—পঞ্চভূতময় এই বিশাল ধরিত্রীর মূলাধার নির্ব্বিকার সচ্চিদানন্দ জগদীশ্বরই সেই নির্ব্বিকার ভালবাসার সাকার মুর্ত্তি। ভালবাসার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—ঈশ্বরের প্রতিকৃতি,—সুতরাং ভালবাসাই ঈশ্বরের অন্যতম রূপ। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই সচ্চিদানন্দ, অতএব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই ভালবাসার পাত্র। ইহার মধ্যে বাদ সাদ দিলে ত চলিবে না। তাই বলিতেছিলাম, গুণাগুণ বিচার করিয়া ভালবাসিও না। সকলকেই আপনার করিতে হইবে, ভালবাসার রাজ্যে এই বিধি। আপনাকে বা আপনার হৃদয়কে ভালবাসা-সমুদ্রে ডুবাইতে হইবে—প্রেমের ভাবে বিভোর করিতে হইবে, তবেই সম্পূর্ণত্বের অধিকারী হইতে পারিবে, নচেৎ নহে। সুতরাং অসম্পূর্ণ ভালবাসায় অসীম, অনন্ত, পূর্ণ জগদীশ্বরকে লাভ করিতে পারা যাইবে না; সমস্তই কর্ম্মনাশার জলে ডুবিয়া যাইবে, মহামিলন তোমার ভাগ্যে ঘটিবে না। যে এরূপ আদর্শ ভালবাসায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাকে আর মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না—সর্ব্বত্রই তাহার সমান ভাব বিদ্যমান।

প্রেম, ভক্তি, প্রীতি, শান্তি, দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সমস্ত সদ্বৃত্তিই ভালবাসা হইতে উৎপন্ন, সুতরাং সকলের মূলেই এই ভালবাসা নিহিত আছে। দেশ কাল পাত্রভেদে বিভিন্ন ফলের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ভজন, সাধন, প্রার্থনা সকলের মূলেই এই ভালবাসা নিহিত। অতএব জীবনের প্রথম অংশে শৈশবেই এই মহাপথের পথিক হইতে হয়। যেহেতু সংস্কার ও অনুকরণবশবর্ত্তী মানুষ শৈশবে যাহা দেখিবে, শুনিবে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণই এই ভালবাসার অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন; পৌরাণিক ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

তবেই এখন বেশ বুঝা গেল, ত্যাগ স্বীকারেই ভালবাসার অস্তিত্ব নির্ভর করে। স্বার্থের নিকট আপনাকে বলি দিতে হইবে, পরার্থপরতায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। ইহাই ভালবাসার উৎকর্ষ—ইহাই চরম।

ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না, নিষ্কাম ভাবে দান করিও—ফল আপনা হইতেই হইবে। ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ্য উপদেশ। চঞ্চলতা-শূন্য, আবেগশূন্য, উদ্বেগশূন্য, প্রশান্ত, ধীর, সুখ-দুঃখ-আকাঙ্ক্ষা-শূন্য আনন্দময় হৃদয়ক্ষেত্রেই ভগবদ্ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়—ভালবাসার প্রতিমা ফুটিতে থাকে। তখন চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই আপনার বোধ হয়—স্থূলদৃষ্টির ভেদাভেদ-জ্ঞান এক কালে লোপ পায়, প্রাণ উধাও হইয়া অনন্ত লক্ষ্যপথে ছুটিতে থাকে, সকলেরই প্রাণে প্রাণ মিশাইতে ইচ্ছা হয়। এইরূপ ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা; আর এই ভালবাসাই জগতের আদর্শ।

বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, খৃষ্ট, এই ভালবাসার প্রভাবে ধরাধামে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এই ভালবাসার সঞ্জীবনীমন্ত্রে সমস্ত জগৎ মাতাইয়াছিলেন। ভালবাসার ভক্তি-মন্ত্রে নশ্বর জগতে তাঁহারা কি অবিনশ্বর কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন! ত্যাগ-স্বীকারের এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? কেহ "অহিংসা-পরমোধর্ম্ম" প্রচার উদ্দেশে ছাগ-প্রাণ বিনি-ময়ে যূপ-কাষ্ঠে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই,—কেহ অদ্বৈতবাদ প্রচার-উদ্দেশে ভবানীর ইচ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া দুরন্ত কাপালিককে আপন মস্তক উপহার দিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, কেহ জীবের মুক্তির কারণ হরিনাম প্রচারোদ্দেশে দুর্জ্জন পাষণ্ডের শত শত অত্যাচার-ভ্রূকুটি ফুৎকারে উড়াইয়াছিলেন, আর কেহ বা প্রেম-ধর্ম্ম-নীতি প্রচারোদ্দেশে বিধর্ম্মীগণের ভীষণ অত্যাচারে জীবন্ত ক্রুশ-কাষ্ঠে সর্ব্বশরীর-বিদ্ধ হইয়া অন্তিমকালে প্রাণত্যাগ করিবার সময়ও, সরল প্রাণে মুক্ত-অন্তরে জীবন-হন্তা শত্রুগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এই ত ভালবাসা—এই ত প্রেম! এই ত ত্যাগস্বীকার—এই ত ভক্তি! এমন সার্ব্ব-ভৌমিক ভালবাসায় প্রাণ মিশাইতে না পারিলে আর কি হইল? এমন বিশ্বজনীন উদার ভালবাসা ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণ বিবরমধ্যে কেবল একের প্রতি, অথবা কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যকের প্রতি চিরকাল তোমার ভালবাসা গুটাইয়া রাখিলে আর কি হইল?

এস, জগতের সহিত জগদম্বার চরণে তোমার ভালবাসা উৎসর্গ কর। মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া, নিজ হৃদয়কন্দরে দৃষ্টিক্ষেপ কর, দেখিবে জ্ঞানালোক প্রভায় তথায় মহা-মায়ার মূর্ত্তি কেমন স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সেই জগদম্বাই ভালবাসার জীবন্তচ্ছবি। ভেদ-বুদ্ধি ঘুচাইয়া তিনি তোমায় ভাল-বাসার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন। ঐ শুন মা করুণকণ্ঠে ডাকিতেছেন—"এস বৎস! এস; তুমি ভ্রান্ত জীব! মায়াজালে জড়িত হইয়া ভালবাসার পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছ না, অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া লক্ষ্য স্থির করিতে পারিতেছ না; সুতরাং ভালবাসিয়া তোমার মনের পিপাসা আজিও মিটিতে পায় নাই। এস বৎস! আমি তোমার বন্ধন ছিঁড়িয়া দিলাম,তিমির-জাল আজ আমার কৃপায় অপসারিত হইল, এখন দেখ, ভালবাসার চরমে আসিয়া পহুঁ-ছিয়াছ। এই জগৎ আর আমি, ইহাই তোমার ভালবাসার লক্ষ্যস্থল। এস এই

জগৎ, এই তুমি, আর এই আমি, আজ এক হইয়া পরস্পর মিশিয়া যাই; তখন কে কাহাকে ভালবাসে, কাহাকে কাহার ভালবাসিতে হয় খুঁজিতে হইবে না, ভালবাসার কোন ক্ষোভই তখন আর কাহারও থাকিবে না। এস বৎস! এই ভালবাসার সাগরে তবে আত্মবিন্দু ডুবাইয়া দাও।”

ভালবাসার বংশীধ্বনি ভক্তচিত্তরূপ নিত্য-বৃন্দাবনে প্রতিনিয়তই প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তুমি যে ভাবে চাও, সেই ভাবেই সেই বাঁশীর রব তোমার কাণে বাজিবে। যদি রাধিকা হও, তবে আনন্দময়ের ঐ আনন্দনিক্কণে আহূত হইয়া, কুলমানে বিসর্জ্জন দিয়া, প্রেমময়ের চরণে ভালবাসার সাধ মিটাইতে তোমায় ছুটিতেই হইবে।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

জয় রাধে!

রাধা রাধা রাধা নাম বাজা রে বাঁশরী।
বৃন্দাবন-বন-লীলা গেলে কি বিসরি?
গেলে কি বিসরি সেই সুধাময় গান।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সুরে সুরে, ছুটিত যে তান॥
আকুল বিপিনস্থলী, আকুল নগরী।
আকুল যমুনাজল, আকুল আহীরি॥
আকুল করিয়া সবে তোমার সে তান।
ধরা হতে শূন্যপথে করিত প্রয়াণ॥
সেই স্বর কোথা বাঁশী রাখিলি লুকায়ে।
কোথা ছিলি এত দিন আপনা ভুলিয়ে?
ভুলি নাই আমি কিন্তু সে দিনের কথা।
ভুলি নাই আমি কভু ব্রজের বারতা॥
ভুলি নাই, রেখেছিনু হৃদয়ে চাপিয়ে।
বালির বন্ধন আজ গেল রে ভাসিয়ে॥
প্রবাহিল রুদ্ধ বারি দুকূল ছাপায়ে।
কার সাধ্য রোধে গতি পাষাণ চাপায়ে?
রাধা মোর শক্তি শোভা রাধা মোর প্রাণ।
রাধিকা প্রকৃতি আদ্যা রাধামন্ত্রে ধ্যান॥
রাধিকা বিহনে আমি হয়ে শক্তিহারা।
বৃথা ঘুরি, বৃথা ফিরি, দ্বারকা মথুরা॥
শক্তি গেল, কার বলে করিব সংগ্রাম।
শোভা গেল, কারে লয়ে লভিব বিরাম॥
প্রাণ গেল, কিবা রূপে করি মর্ত্যলীলা।
সকলি বৃথায় হায় ভস্মে ঘৃত ঢালা॥
প্রকৃতি ছাড়িয়ে আমি প্রকৃত যে নই।
অচল অসাড় স্তব্ধ জড়ভাবে রই॥
শক্তিমন্ত্র জপি সুধু কাটাইনু কাল।
শক্তিহীনে সহিলাম যন্ত্রণা বিশাল॥
যা হবার হইয়াছে আর না সহিব।
রাধা রাধা রাধা নাম আবার গাহিব॥
আবার বাজা রে বাঁশী ভরি ধরাধাম।
বৃন্দাবন-মনোহরা মধুভরা নাম॥
দ্বারকার রাজবেশে নাহি বসে মন।
ব্রজের রাখাল রূপ স্মরি অনুক্ষণ॥
সেই যে সে দিবারাতি আনন্দ অপার।
সেই যে সে কুঞ্জে কুঞ্জে নিভৃত বিহার॥
সেই যে আয়ান আসি তুলিলেক ছলে।
সেই যে রটাত কথা জটিলে কুটিলে॥
সেই চন্দ্রাবলী-চিত্র সেই অভিমান।
সেই যে রাধার পায়ে করি শিরোদান॥

আর সেই রাকা-শশী-শোভিতা-যামিনী।
মহারাসে মত্ত যবে ব্রজের কামিনী॥
পড়ে মনে সেই সব সে দিনের কথা।
আছে সব, নাই শুধু, দেহ প্রাণে গাঁথা॥
কোথায় দ্বারকা আর কোথা বৃন্দাবন।
কাজ নাই, কোন্ তুচ্ছ রত্ন সিংহাসন॥
কাজ নাই সত্যভামা, রুক্মিণী রূপসী।
কলঙ্কিনী নামে পুনঃ বাজাইব বাঁশী॥
রাধা কলঙ্কিনী মোর রাধা পরনারী।
হয় হোক্, ভাল মন্দ নাহিক বিচারি॥
অঙ্গে অঙ্গে রাধানাম আছে বিরাজিত।
বুক চিরি রাধানাম করিনু রোপিত॥

রোমে রোমে রাধা-রাণী রাজত্ব বিস্তারে।
অণু অণু বাঁধা সদা রাধা-প্রেম-ডোরে॥
আমারি কারণে রাধা ব্রজে কলঙ্কিনী।
বৃন্দাবন-বরনারী রাখাল-রঙ্গিণী॥
আজি সে কলঙ্কজ্বালা ঘুচাব ধরায়।
রাধা-মন্ত্র জপি যাহে জীবে মুক্তি পায়॥
এস বাঁশী দোঁহে মিশি মুখোমুখী করি।
রাধানাম-তত্ত্ব-কথা জগতে প্রচারি॥
রাধা নামে কত সুধা জানিবে সংসার।
ভিক্ষা, ভক্তি, মুক্তিপথে রাধা নাম সার॥
রাধা রাধা রাধা রবে বাঁশী গান গাও।
"জয় রাধে" বলি সাধে জগত মাতাও॥

মেয়ের বিয়ে।

আজি কালি মেয়ের বিবাহ লইয়া বঙ্গ-সমাজে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। চারিদিকে এক রব উঠিয়াছে, মেয়ের বিবাহ দেওয়া বড় দায় হইয়াছে। কন্যাভার দায় বড় দায়, তদপেক্ষা অন্যান্য দায় কিছুই নয় বলিলে হয়। এই দায় সম্বন্ধে আমরা গুটিকত কথা বলিতে চাই।

১। আমরা সকল সভ্যসমাজেই দেখিতে পাই, কন্যাভার দায় অত্যন্ত গুরুতর দায়। কোন্ কালে কোন্ সমাজে কন্যার বিবাহ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটি গুরুতর সমস্যা বলিয়া গৃহীত হয় নাই? যাহারা পর-ভাগ্যোপজীবী, পরের অধীন, তাহাদিগকে পরের হাতে ন্যস্ত করা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সহজ কথা নয়। সুতরাং মেয়ের বিবাহ যে আজিও বঙ্গসমাজে কঠিন কথা হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

২। হিন্দু মেয়ের বিবাহ কিন্তু আর এক বিশেষ কারণ বশতঃ এত কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কারণ বালিকা বিবাহ। ১১।১২ বৎসরের মধ্যে সকল হিন্দু বালিকার বিবাহ হওয়া চাই। এরূপ নিয়ম অতি কঠিন বটে। অপরাপর সমাজে এরূপ ব্যবস্থা নাই। এজন্য কেহ কেহ বলিতে চান, এ প্রথা রহিত করিয়া দিয়া অন্যান্য সমাজের সঙ্গে হিন্দু সমাজের অবস্থা সমান করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত, এ নিয়মটির পরিবর্ত্তন করিতে হইলে হিন্দুসমাজের সকল আচার ব্যব-হারেরই পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সে প্রকার পরিবর্ত্তন আরও গুরুতর। এক সমাজ পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য সমাজে পরিণত করা তত সম্ভবপর নহে। তাহা করাও কতদূর বিবেচনা-সিদ্ধ তাহা নির্ণয় করা

কঠিন। কারণ, কোন সমাজের অবস্থা নির্দ্দোষ নহে। এক সমাজে যেমন কতক ভাল; কতক মন্দ আছে, অন্য সমাজেও তদ্রূপ। তবে কি দোষে আত্মসমাজ পরিবর্ত্তন করি? এক দোষ পরিহার করিতে গিয়া যদি অন্য দোষে আসিয়া পড়ি, তবে আর সংস্কার হইল কই? বালিকা-বিবাহ উঠাইয়া দাও, ইয়োরোপীয় খৃষ্টীয় সমাজে স্ত্রীজাতির যে সকল দুর্গতি, সেই সমস্ত দুর্গতিতে আসিয়া পড়িতে হইবে। তবে আর ভাল হইল কই? যদি এক ভস্ম আর ছাই হয়, তবে যেমন আছি তেমনি থাকাই ত ভাল। তবে বালিকা-বিবাহ নিবন্ধন আমাদের সমাজে মেয়ের বিবাহের যে অসুবিধা ঘটিয়াছে, সে অসুবিধার আর উপায় নাই। অতএব, বালিকা-বিবাহকে স্থির রাখিয়া দিয়া মেয়ের বিবাহের সুবিধা করা আবশ্যক।

প্রাচীন আর্য্যেরা বোধ হয় ভাল জানিতেন যে, লোক সমাজে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা সমধিক। এ নিয়ম দৈব-ব্যবস্থা, তজ্জন্য অখণ্ডনীয়। এ নিয়মের বিরুদ্ধে যাওয়া অন্যায়। সেই জন্য প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণ স্ত্রীজাতির বাল্যবিবাহের এত বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধ এরূপ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই; পুরুষের বহুবিবাহও বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই তিনটি নিয়মই হিন্দু সমাজের বিশেষ ব্যবস্থা। যে সমাজে সকল কন্যার বিবাহ ১২ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই, সে সমাজে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ এবং বহুবিবাহ প্রচলিত না থাকিলে সকল কন্যার বিবাহ হয় কই? বালিকা-বিবাহ প্রচলিত কর, বিধবাবিবাহের নিষেধ এবং বহুবিবাহ প্রবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। যে সমাজে বালিকাবিবাহের এত কঠিন নিয়ম, সে সমাজে কি কখন বিধবা-বিবাহ চলিতে পারে, না বহুবিবাহ উঠান যায়? হিন্দু সমাজের এই ত্রিবিধ ব্যবস্থা, তাহার প্রধান বন্ধনী। অন্য কোন লোক-সমাজে এ তিন ব্যবস্থার এত ধরাধরি নিয়ম দেখা যায় না। হিন্দু-সমাজে এই তিন নিয়ম প্রচলিত থাকাতে এ সমাজে বার বৎসরের কোন কন্যা, এবং কুড়ি বাইশ বৎসরের কোন পুরুষই প্রায় অবিবাহিত থাকে না। কিন্তু যে সকল সভ্য-সমাজে এই ত্রিবিধ ব্যবস্থা প্রচলিত নাই, সেই সমস্ত সভ্যসমাজে সকল পুরুষ ও সকল স্ত্রীর বিবাহ হওয়া দুর্ঘট। ইউরোপীয় পাশ্চাত্য সমাজ একথার দৃষ্টান্ত। সে যাহা হউক, আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ লোকসমাজের স্ত্রী-সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে এই ত্রিবিধ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনায়াসে অনুমিত হয়। এই তিনটি নিয়ম এক সূত্রে গাঁথা। সুতরাং উহাদের মধ্যে একটির বন্ধন খুলিলে সকল গুলিই আলগা হইয়া যায়। পারলৌকিক উদ্দেশ্য যাহাই হউক, উহাদের সামাজিক উদ্দেশ্যের বিচার করিতে গেলেও উহারা পালনীয় হইয়া পড়ে। অতএব, এই তিন ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মেয়ের বিবাহের সুবিধা করা আবশ্যক।

পুরুষের বহুবিবাহ আছে বলিয়া যাঁহারা ধর্ম্মার্থবিহীন হইয়া এক ভার্য্যা বর্ত্তমান

থাকিতেও কেবল অর্থলোভে অপর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারা হিন্দু ব্যবস্থানুযায়ী চলেন না, অবশ্য বলিতে হইবে। হিন্দু ব্যবস্থায় কতিপয় বিশেষ কারণে একাধিক ভার্য্যা গ্রহণীয়। যে স্থলে সেই কয়েক কারণের মধ্যে কোনটিই বর্ত্তমান নাই, সে স্থলে একাধিক ভার্য্যা গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু বহুবিবাহের এই নিয়মের সৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া যাঁহারা ধর্ম্মার্থবিহীন হইয়া একত্রে ও এককালীন একাধিক স্ত্রী লইয়া ঘর করেন তাঁহারা নির্ব্বোধের ন্যায় আপনার কুকার্য্যের ফল আপনারাই পান। কারণ, ব্যভিচার মাত্রেরই শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে।

৩। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের মেয়ের বিয়ের তৃতীয় অসুবিধার কারণ কৌলীন্যপ্রথা। এই প্রথানুসারে ব্রাহ্মণজাতির কুল কন্যাগত এবং কায়স্থজাতির কুল পুত্রগত। ব্রাহ্মণকে গর্ভ দেখিতে হইবে এবং কায়স্থকে ঔরস দেখিতে হইবে। কেন হইবে, একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা গর্ভের প্রতি লক্ষ্য না রাখাতে হিন্দুসমাজে অনেক বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে। এই আগাছার জাতি আর বাড়ান উচিত নয়। এই জন্য আমাদের পূর্ব্ব স্মৃতিকরেরা ব্রাহ্মণের গর্ভ বাঁধিয়া দিলেন। বাঁধিয়া দিলেন এই জন্য যে, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ব্রাহ্মণজাতির গুণগৌরব যেন ব্রাহ্মণ জাতিতেই নিবদ্ধ থাকে। বৈজিক নিয়মে গুণাবলির যত রক্ষা হয়, অন্য নিয়মে তত হয় না। সজ্জাত ব্রাহ্মণে যত গুণাবলির সমাবেশ ঘটিবে, অসজ্জাত ব্রাহ্মণে তত ঘটিবে না। গুণের প্রতি এরূপ লক্ষ্য থাকাতে কায়স্থের ঔরসও ব্যবস্থাপকগণ বাঁধিয়া দিয়াছেন। কায়স্থের যে কোন ঘর হউক না কেন, কায়স্থকে কুলীনের তিন ঘরের মধ্যে এক ঘরে বিবাহ করিতে হইবেই হইবে। কি কুলীন, কি সম্মৌলিক, কি অসম্মৌলিক, সকলেরই প্রতি এই নিয়ম। কায়স্থের কুলীন ছাড়া বিবাহ নাই। এ বড় কম কথা নয়। কুলীন কে? যাঁহার এই সকল গুণ আছে:—

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন।
নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ, দান নবধা কুল লক্ষণ॥

কুলীন মাত্রেই কি এই সমস্ত গুণের সমাবেশ হইবে? হইবারই কথা;—কারণ, এই সমস্ত গুণের মূলগুণ বিদ্যা। বিদ্যাই লোককে বিনয় দান, সদাচারী, সচ্চরিত্র ও প্রতিষ্ঠা-ভাজন করে, এবং নানা তীর্থস্থানে লইয়া যায়। বিদ্যাই লোককে ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান করে, বৃত্তি অর্থাৎ ধন সম্পত্তির অধিকারী করায়, তপস্যাশীল অর্থাৎ সৎকর্ম্মে দৃঢ়ব্রত করায় এবং দানশীল ও ক্ষমাবান করায়। বিদ্যা এই সমস্ত গুণেরই আধার। যে স্থলে বিদ্যার এই সমস্ত গুণের ফল ফলে না, সে স্থলে বিদ্যা যথানিয়মে অর্জ্জিত হয় নাই। যে ব্যক্তি প্রকৃত বিদ্যাবান, তিনি এই সমস্ত গুণেরই আধার। সুতরাং যে কুলীন, তাঁহার প্রধান গুণ বিদ্যা, অন্য অষ্টবিধ গুণ সেই বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ত্তমান। আজিও আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা সদ্বিদ্বান, তাঁহারা অপর অষ্টবিধ গুণেও সম্পন্ন। সুতরাং কৌলীন্য নিয়ম বড় আদরের সামগ্রী। এই কৌলীন্য নিয়ম সর্ব্বদেশেই প্রচলিত। সর্ব্বদেশেই

গুণ দেখিয়া পাত্রের বিচার। সৌন্দর্য্য দেখিয়া যেমন কন্যার বিচার, গুণ দেখিয়া তেমনি পাত্রের বিচার। এই কৌলীন্যকে পদদলিত করা অন্যায়। এই কৌলীন্য আছে বলিয়া আজিও আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সাত আনা ব্রাহ্মণ জাতীয় ছাত্র, প্রায় ততোধিক কায়স্থ জাতীয় এবং অপরাপর জাতীয়ছাত্র বক্রী দুই আনা। কৌলীন্য নিয়ম না থাকিলে এরূপ ফল ঘটিত না। সুবীজ হইলে যে সুফল হয়, যাঁহারা এই নিয়ম ভাল বুঝেন, তাঁহারা কৌলীন্য প্রথা নষ্ট করিতে কখনই উদ্যত হইবেন না। সকল সমাজেই একরূপ না হয় অন্যরূপ আকারে কৌলীন্য প্রথা আছে, এবং সর্ব্বসমাজেই উহা শুভফল সমুৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং কৌলীন্য কখন পরিবর্জ্জনীয় নহে। কৌলীন্য সমাজে চলিবেই চলিবে।

মধ্যে এ দেশে কৌলীন্যের অনেক ব্যভিচার ঘটিয়া ছিল। বহুবিবাহের ব্যাভিচারই এই ব্যাভিচারের মূল। বহুবিবাহের ব্যভিচার তিরোহিত হইয়াছে, কৌলীন্যও যথাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কৌলীন্যের যে মূলগুণ বিদ্যা, এক্ষণে সেই বিদ্যারই আদর বাড়িয়াছে। বিদ্যার ফল যদি সৎজ্ঞান ও সদ্‌বুদ্ধি হয়, তবে তাহা সকল ভাষাতেই লাভ করা যায়। কারণ, সকল ভাষাতেই বিদ্যা আছে। সকল ভাষাতেই সৎজ্ঞান আছে। ইংরাজীতেই বা কেন থাকিবে না? ইংরাজী যখন রাজভাষা, তখন সে ভাষা-জ্ঞান অর্জ্জন করিতেই হইবে। সুতরাং সেই ভাষাজ্ঞান অর্জ্জন করিয়া যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইয়াছেন, তাঁহারই আজ কাল পণ্ডিত বলিয়া সমাজে সমাদৃত ও পূজিত হইতেছেন। এই রূপ প্রকৃত বিদ্যাবান ব্যক্তিতেও আমরা উক্ত নয় লক্ষণ জাজ্বল্যমান দেখি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, এক্ষণকার মহামান্য হাইকোর্টের জজ্ শ্রীমান গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অপরাপর এম, এ, বি এলেরা যে ভবিষ্যতে এক একজন গুরুদাস না হইতে পারেন, এমত নহে। সুতরাং কৌলীন্য ঘুরিয়া আসিয়া এক্ষণে ঐরূপ উপাধিধারী ছাত্রেরই আদর বাড়াইয়াছে। কৌলীন্য যথা স্থলেই দাঁড়াইয়াছে। এখনকার মধ্যে কুলীন কে?—যিনি উক্ত নবধা লক্ষণ সম্পন্ন। উক্ত নবধা লক্ষণ-সম্পন্ন কে? —যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইয়া সদ্বিদ্যান হইয়াছেন—যিনি সদ্বিদ্যা লাভ করিয়া বিনয়ী, প্রতিষ্ঠা-ভাজন ও ধর্ম্মশীল হইয়াছেন। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, বিবাহ সময়ে পাশ করা ছেলের এত আদর। আদর কেন—সেইরূপ পাশেরই কুলীন হইবার সম্ভাবনা।

তবু ও বৈজিক নিয়ম রক্ষা করা চাই। সদ্বংশজাত ঘোষ, বসু, মিত্রের সঙ্গে সকল কায়স্থের বিবাহসূত্রে আবদ্ধ থাকা ভাল। কন্যা পক্ষেই হউক, আর পাত্র পক্ষেই হউক, আদি সদ্বংশজাত কুল-ক্রমাগত গুণাবলি রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মৌলিকের মধ্যে যে পাত্রের কুলীনত্ব জন্মে সে পাত্র অবশ্য কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য পাত্র। এক্ষণে এরূপ পাত্র সে

মর্য্যাদাও লাভ করিতেছে। ব্রাহ্মণ জাতি-তেও ঐরূপ ঘটিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বকার কৌলীন্য প্রথা বজায় রহিয়াছে। মৌলিকের সৎপাত্র কুলীনের মর্য্যাদা পাইয়া পূর্ব্বকার কুলীনের ঘরের কন্যাকে বিবাহ করিতে-ছেন। তদ্দ্বারা গর্ব্বের গৌরবও বজায় রহিতেছে। এ প্রথা কি মন্দ? কি বলিয়া এই বর্ত্তমান প্রথাকে মন্দ বলিব? কি বলিয়া তবে বর্ত্তমান মেয়ের বিবাহ প্রথার নিন্দা করিব? যেই করুক, আমি ত করিতে পারি না।

৪। কিন্তু প্রধান কথা পয়সা। আজ কাল বিবাহের দেনা পাওনা লইয়াই যত গোল। ভাল পাত্রের এত দর কেন? এত দর হইলে কি মেয়ে বিকায়? এই দরের জন্যই কন্যাভার দায় এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দর কমাইবার জন্য কতবার কতস্থানে কত সভা সমিতি আহুত হইল, তবুও ছেলের দর কমিল না। কেবল শুনা যায়—হায়, কি হইল! মেয়ের বিবাহ হওয়া ভার হইয়াছে!

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই এ সমস্যার মীমাংসা করা যায়। সভা সমিতি করিয়া এ কথা মিটিবে না। কথা এই, বিবাহ যোগ্য ছেলের এত দর কেন? প্রথমে ধর, ভাল ছেলের কথা। একথা ত আজি নূতন নহে। আমরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি, আজি কালি ভাল ছেলে কে? তার পর কথা এই, ভাল জিনিসের ভাল দর হইবে না ত কিসের হইবে? কৌলীন্য মর্য্যাদা ত আবহমান কাল আছে। কুলীন কবে টাকা না লইয়া বিবাহ করিয়াছে। পূর্ব্বে কৌলীন্য মর্য্যাদার এত বাড়বাড়ি ছিল, যে তজ্জন্য কুলীনেরা ঘোর মূর্খ হইয়া কেবল বিবাহ করা ব্যবসা ধরিয়াছিলেন। এক্ষণে সে কাল গিয়াছে। গিয়াছে—আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু প্রকৃত কুলীনের কাল ত যায় নাই। এক জাতীয় কুলীন গিয়া অন্য জাতীয় কুলীন আসিয়াছে। লোকে বলিতেছে, এ পরিবর্ত্তন ভাল, এ কিছু মন্দ হয় নাই। কিন্তু আমরা ভাল জিনিস শস্তা দরে চাই। এ কথার উত্তরে আমরা বলি, সমাজে কোন দ্রব্যের দর আপনা আপনি উঠে না, দশ জনে না উঠাইলে দর উঠে না। প্রয়োজন অনুসারে দ্রব্যের দর উঠে। যে সন্দেশের দর আজি দেড় সের, সে সন্দেশের দর এক দিন তিন পোয়া হইয়া দাঁড়ায়। কেন দাঁড়ায়? খরিদদার অনেক, দ্রব্য কম। সেইরূপ বিবাহের বাজার। বিবাহের বাজারে ভাল পাশকরা ছেলের সংখ্যা খুব কম। যত কম, তত তাদের কৌলীন্য মর্য্যাদা ও দর। যদি বল, দর হউক, এত দর কেন? পূর্ব্বকালে ত কৌলীন্য মর্য্যাদা ছিল; তখন ত এত দর ছিল না। এত দূর দর উঠিবার বিশেষ কারণ আছে।

সর্ব্বস্থলেই দ্রব্যের দর তোলে খরিদ দারে। দ্রব্যের দর চড়িবে বলিয়া লোকে নিলাম ডাকে। নিলামে এত দর চড়িয়া যায় কেন? পাঁচ খরিদদারে দর তুলিয়া দেয়। খরিদদারের সামর্থ্য যেমন, দ্রব্যের দর তেমনি চড়িতে থাকে। প্রয়োজন হইলেও যদি অর্থ না থাকে, তবে দর দিব কিসে? লোকের সামর্থ্য অনুসারে দ্রব্যের

দর উঠে। আমরা বিবাহের বাজারেই দেখিতে পাই, এক্ষণে লোকের অর্থ বাড়িয়াছে। আজি কালি অনেক মধ্যবিত্ত লোক বিলক্ষণ সম্পন্ন। পূর্ব্বকার অপেক্ষা এক্ষণে অনেক লোকের হাতে অনেক পয়সা হইয়াছে। অনেক লোক বড় চাকুরে অথবা মহাজন হইয়াছে। অনেক লোক দশ টাকা খরচ পত্র করিতে পারে। পূর্ব্বে এত ছিল না। জমিদারের সংখ্যা এত ছিল না, বড় চাকরের অথবা ব্যবসায়ীর সংখ্যা এত ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে পরস্পরের অর্থ-পার্থক্য এত অধিক ছিল না। এক্ষণে মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে দশ টাকার লোক আছে, দশশ টাকার লোক আছে, আবার দশ হাজার টাকারও লোক আছে। দশ হাজার কেন, বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার চল্লিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার প্রভৃতি অনেক রকমের সম্পন্ন লোক এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। সমাজে এত রকম লোক, কিন্তু সবাই চায় পাশ করা ভাল ছেলে। সকলেই চায় মেয়ে সুখে থাকিবে। এরূপ স্থলে, পাশ করা ছেলের দর উঠিবে না ত কোথায় উঠিবে। যেমন সুন্দরী মেয়ে থাকিলে ধনীলোকে তুলিয়া লইয়া যায়, মধ্যবিত্ত লোকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে; তেমনি ভাল ছেলে বিবাহ-বাজারে উপস্থিত হইলে, ধনীলোকেরা তার এত দর তুলিয়া দেয়, যে তদপেক্ষা নির্ধন লোকের সাধ্য কি তথায় ঘেঁসে। বরকর্ত্তা যদি ভাল মেয়ে, ভাল দর ও ভাল ঘর পান, তবে কেন তিনি নিচু ঘরে, নিচু দরে ও নিচু সুন্দরীতে নামিবেন। বরকর্ত্তার কিছু দোষ নাই। বিবাহ বাজারে ভাল ছেলের নিলাম উঠে। ভাল দর, ভাল ঘর, আপনি আসিয়া জুটে। সুতরাং ভাল ছেলে উচ্চ দরে বিকাইয়া যায়। যাঁহারা বাজার ও নিজ সামর্থ্য না বুঝিয়া উচ্চ আশা করেন, তাঁহারাই বিফল হন। বিফল হইয়া চীৎকার করেন, মেয়ের বিয়ে হওয়া এখন বড়ই দায় হইয়াছে। কিন্তু নিজে যে নির্ব্বোধের মত কাজ করিয়াছেন, তাহা এক দিনও ভাবেন না। দোষ বরকর্ত্তার নয়, দোষ কন্যাকর্ত্তার। সে কেন বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে গিয়াছিল। কেউ কি ভাল জিনিস শস্তা দরে পাইতে পারে? সে যে চায়, তার ঠকাইবার ইচ্ছা। সুতরাং ঠক বরকর্ত্তা নয়, ঠক কন্যাকর্ত্তা। শস্তা দরে দুই একটা যে ভাল দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা অনেক কারণে। তাহা নিয়ম নয়, নিয়মের নিপাতন। নিপাতন নিয়মকেই দৃঢ় করে।

এখন বোধ হয় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, পাশ করা ছেলের দর এত বাড়িয়াছে কেন,—আজি কালি কৌলীন্য মর্য্যাদা এত অধিক হইয়াছে কেন? একথা বুঝিলে আরও বুঝা যাইতে পারে যে সভা সমিতি করিয়া মেয়ের বিবাহ শস্তা করিতে যাওয়া নির্ব্বোধের কার্য্য। অবস্থা গতিকে তাহা ঘটিয়া উঠিবে না। একটা ভাল ছেলের উপর যদি দশ জন কন্যাকর্ত্তা পড়ে, তবে সে ছেলে কাহার হইবে? যাহার ঘর ভাল, কন্যা ভাল, অর্থ ভাল। একথা ত পড়িয়াই রহিয়াছে। যাঁহারা এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যাইতে চাহেন, তাঁহারা সমাজ বুঝেন না।

যাহা সমাজের প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহা ভঙ্গ করে কাহার সাধ্য?

পাশকরা ছেলের দর অনুসারে এখন অবস্থানুযায়ী সকল পাত্রের দর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এক দিকে যেমন সৎপাত্রের দর বাড়িয়াছে, অন্য দিকে তেমনি অসৎ পাত্রের দর খুব কমিয়া যাইতেছে। এদিকের দর যেমন বাড়িতেছে, ওদিকের দর তেমনি কমিতেছে। লোকে অসৎ পাত্র মূলেই খুঁজে না। খুঁজে না বলিয়া তেমনি শস্তা দরে বিকাইয়া যায়। তবে এখন কথা এই, যাঁহার যেমন অবস্থা, তাঁহার তেমনি পাত্র দেখা উচিত। নহিলে আমার সামর্থ্য যদি দশ টাকা হয়, আর আমি যদি চাই হাজার টাকার জিনিস, তাহা হইলে কাজেই আমাকে হটিয়া আসিতে হইবে। যে হাজার টাকা দিতে সমর্থ, সে হাজার টাকার মাল পাইবে। আমি দশ টাকার লোক হইয়া যদি দশ টাকার মত জিনিস খুঁজি, অবশ্য পাইব, নহিলে নহে। বাজার বুঝিয়া কাজ করিলে কখন বিফল হইতে হয় না। বঙ্গ সমাজে অবিবাহিতা কোন কন্যা নাই। কিন্তু নিয়ম এই, বাজার গতিকে "যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।" যে যেমন যোগ্য লোক, তার তেমনি যোগ্য পাত্র জুটিয়াছে। এ সংসার যাঁহার হাতে তিনি চক্রপাণি। সংসার-চক্র তাঁহার হাতে। যে চক্র তাঁহার হাতে, সে চক্রের নাম "সুদর্শন চক্র।" অন্ধ মানব যাহা না দেখে, যাহা "অদৃষ্ট" সেই চক্র তাহা দেখিতে পায়। এই চক্র মহাস্ত্র, সর্ব্ব অস্ত্রই তাহার নিকট পরাভূত। ধন-বল, জন-বল, বিদ্যা-বল, বুদ্ধি-বল, অস্ত্র-বল প্রভৃতি মানুষিক সকল বলই দৈববলে পর্য্যুদস্ত হইয়া যায়। সংসারের সমস্ত ঘটনা এই অনন্ত চক্রে ঘুরিয়া পরিপাক হইতেছে। যাঁহার হাতে সেই চক্র, তিনি সংসারীকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া যথাস্থানে আনিয়া দেন। তুমি এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইলে কি হইবে, সমাজকে নিন্দা করিলে কি হইবে? তুমি সমাজের ব্যবস্থা বুঝ না, তাই এত ঘুরচক্র খাও। মূর্খতা করিয়া যত আঁকুবাঁকু করিবে, তত ঘুরিয়া বেড়াইবে। যিনি চক্রী, তিনি তোমাকে ঠিক জায়গায় আনিয়া উপনীত করিবেন। সকলই ভগবানের হাত। এই জন্য বলে, বিবাহ-কার্য্য সকলই বিধির নির্ব্বন্ধ। তুমি ভাল মেয়ের জন্য, ভাল ছেলের জন্য হাজার কেন চেষ্টা কর না, এ সংসারের নিয়ম ও এ সমাজের ব্যবস্থা অনুসারে তুমি ঠিক যোগ্য পাত্রী ও পাত্র লাভ করিবে। তুমি সমাজকে বুঝ না, এই জন্য অন্ধের মত ঘুরিয়া বেড়াও। যাহা অবশেষে ঘটিয়া উঠে, তাহা সুতরাং নির্ব্বন্ধ হইয়া দাঁড়ায়। অন্ধবৎ চক্রে ঘুরিয়া তুমি যথাস্থানে উপনীত হও। একেই বলে নির্ব্বন্ধ ও বিধিলিপি।

পূর্ণচন্দ্র বসু।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিজ্ঞান।

আজি কালি বিজ্ঞানের মৌখিক সমাদর বড় বাড়িয়াছে। যিনি বিজ্ঞানের 'ব' জানেন না, তিনিও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা শুনিতে চাহেন না। আধুনিক শিক্ষিত আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলিয়া সনাতন পৈতৃক ধর্ম্ম, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবা, এবং চিরাচরিত অতি কল্যাণকর রীতি নীতি সকল পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তৎসমস্ত বাস্তবিক বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কি না এবং কেবল মাত্র বিজ্ঞানই মানবের শিক্ষক অথবা অন্য কোনরূপ শিক্ষক আছে কি না তাহা তাঁহারা বুঝিতে আদৌ চেষ্টা করেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতার কৃত্রিম চাকচিক্যে চক্ষুরোগগ্রস্ত হইয়া অন্ধের ন্যায় মিথ্যা দর্শন করেন। অধিক কি যে বিজ্ঞান তাঁহাদের প্রায় যথাসর্ব্বস্ব হইয়াছে সেই বিজ্ঞানের অর্থ কি, বিজ্ঞান বলিলে কি বুঝায় তাহাও কেহ জানেন না। তজ্জন্য আমরা সর্ব্ব প্রথমে বিজ্ঞানের লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

প্রথমে শব্দবিদ্যার আশ্রয় লইয়া বিজ্ঞান শব্দের প্রকৃতি ও মৌলিক অর্থ নিরূপণ করা যাইতেছে। বি + জ্ঞা + অন = বিজ্ঞান। অর্থাৎ বি পূর্ব্বক জ্ঞা ধাতু অনট্ প্রত্যয় দ্বারা বিজ্ঞান শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জ্ঞা ধাতুই ঐ শব্দের মূল। জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানা। যদ্দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন করিলে জানা যায় তাহাকেই বিজ্ঞান কহে। ইংরাজী শব্দবিদ্যা অনুসারেও বিজ্ঞানের (Science) ঐরূপ অর্থ হয়, যথা—L. *Scientia*,—knowledge; from *Scio, I know*. It. *Scienzia*. Fr. *Science*. সুতরাং উহার মূল Knowledge বা জ্ঞান এবং উহার আভিধানিক অর্থ—Profound or complete knowledge. Pure Science অর্থ—The knowledge of powers, causes, or laws considered apart from all applications; the knowledge of reasons and their conclusions.

যখন জানিতে না পারিলে আমরা কিছুই করিতে পারি না—যে কোন কার্য্য করি তাহার উপায় ও ফল জানা আবশ্যক—তখন 'জানা' আমাদের সর্ব্ব প্রধান আবশ্যক। আমাদের ক্ষুধা হইয়াছে যদি জানিতে না পারি, কি উপায়ে ক্ষুধা নিবারণ হইতে পারে? যদি জানিতে না পারি কি উপায়ে খাদ্য উৎপন্ন করিতে হয়, তবে কি প্রকারে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করিব? কি প্রকারে প্রাণরক্ষা করিব? পীড়া হইয়াছে—যদি জানিতে না পারি, কি উপায়ে পীড়া নিবারণ করিতে হয়, কি রূপে রোগ ও ঔষধ নির্ণয় করিতে হয়, তবে কি প্রকারে আমরা আরোগ্য লাভ করিব? কি প্রকারে প্রাণরক্ষা হইবে? সুতরাং জানাই যে আমাদের সর্ব্বপ্রধান আবশ্যক, সে বিষয় বুঝাইবার জন্য অধিক

প্রয়াস পাইতে হইবে না। এমন আবশ্যক জানার নিদান যখন বিজ্ঞান, তখন বিজ্ঞানের তুল্য শ্রেষ্ঠ বিষয় আর কি আছে?

সুতরাং বিজ্ঞান সঙ্কীর্ণ নহে—নির্দ্দিষ্ট-সীমা-বিশিষ্ট নহে। উহার অধিকার অতি বিস্তীর্ণ, অথবা বিশ্ব ব্যাপিয়া উহার অধিকার। কেন-না, সমগ্র বিশ্ব আমাদের জ্ঞাতব্য। আমরা কি, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, কি জন্য আসিয়াছি, কে আনিয়াছে, আমাদের কার্য্য কি, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি; সুখ-দুঃখ কাহাকে বলে, দুঃখ নিবারণ ও সুখ লাভ আবশ্যক কি না, যদি আবশ্যক হয় তবে কি প্রকারে তৎসমস্ত সাধিত হইবে; বিশ্ব কি, তাহার সহিত আমাদের সম্পর্ক আছে কি না, যদি থাকে তাহা কি প্রকার; অপর পদার্থ, অন্য জীব ও অন্য মানবের সহিত আমাদের কিরূপ ব্যবহার আবশ্যক, আমাদের স্বার্থপরতা প্রয়োজন না পরার্থপরতা প্রয়োজন; যাহা প্রয়োজন তাহা কিরূপে সাধিত হয়; ইহকাল ভিন্ন পরকাল আছে কি না, যদি থাকে তবে তাহাদের পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ এবং কোন্ কাল আমাদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয়; বিশ্ব ভিন্ন আর কিছু আছে কি না, যদি থাকে তবে সে কি, তাহার সহিত বিশ্বের সম্পর্ক কি? সেই বিশ্বাতিরিক্ত বা বিশ্বময় পদার্থই (ঈশ্বর?) কি কেবল আমাদের সেবনীয়, না আর কিছু আমাদের কার্য্য আছে? আমাদের হিতাহিত কাহাকে বলে, কি প্রকারে হিতাহিত সাধিত হয় এবং কি প্রকারে ঐ সাধনের প্রয়োগ করিতে হয়, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই আমাদের জ্ঞাতব্য। কেবলমাত্র পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, প্রভৃতি আমাদের জ্ঞাতব্য নহে। ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই বিজ্ঞানের অন্তর্গত।

এ কথায় একটি আপত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ যদ্দ্বারা জানা যায় তৎসমস্তই যদি বিজ্ঞানবাচ্য হইল, তবে ত আর বিজ্ঞান ভিন্ন কিছুই থাকে না—তাহা হইলে পৃথিবীতে যত গ্রন্থ আছে সমস্তকেই বিজ্ঞান বলিতে হয়—তাহা হইলে,—বেদ, কোরাণ, বাইবেল; পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র;—কাব্য, উপন্যাস, নাটক সমস্তকেই বিজ্ঞান বলিতে হয়। কেন-না, সকল পুস্তক হইতেই কিছু না কিছু জানা যায়। কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানলাভ হয় না, এমত পুস্তকই বিদ্যমান নাই। সত্য বটে, গ্রন্থ মাত্রে কিছু না কিছু জ্ঞাতব্য আছে,—কিছু না কিছু সত্য আছে, কিন্তু যাহার অধিকাংশই ভ্রমাত্মক তাহা কি প্রকারে বিজ্ঞান-বাচক হইবে? সত্যপ্রকাশক না হইলে বিজ্ঞান বলিয়া পরিচিত গ্রন্থও বিজ্ঞান পদবী লাভ করিতে পারে না। সত্যপ্রকাশক হইলে নাটক নবেল প্রভৃতিকেও বিজ্ঞান বলিতে পারা যায়।

এই খানে একটী বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। জানিয়াছি বলিয়া সংস্কার হইলেই জানা হয় না, প্রকৃত জ্ঞান হওয়া চাই—সত্য জানা চাই, শারীরিক[১] ইন্দ্রিয় ও বৃত্তির সহিত বাহ্য বা অন্তরস্থ পদার্থান্তরের সংযোগ-জনিত ভাবকে প্রকৃত জ্ঞান বলে। অনেক

১ শরীর বলিলে কেবল দেহ বুঝিতে হইবে না, মন ও আত্মাসহ সমস্ত দেহ যাহা লইয়া ব্যক্তি অভিহিত হয় তাহাই বুঝিতে হইবে।

সময়ে ঐ সংযোগ প্রকৃত রূপ হয় না অথচ বোধ হয় যেন সংযোগ হইয়াছে। সেরূপ সময়ে যাহা জানা হয় তাহাকে কখনও জ্ঞান বা জানা বলা যাইতে পারে না। তুমি এক গাছি রজ্জু দেখিলে কিন্তু উহা তোমার চক্ষে সর্প বলিয়া বোধ হইল। কেন হইল? সর্পের সহিত রজ্জুর কিয়ৎপরিমাণ সাদৃশ্য আছে। যে অংশে সর্পের সহিত রজ্জুর সাদৃশ্য আছে, সেই অংশটুকু মাত্র তোমার ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছিল বলিয়া ঐ রজ্জুকে তোমার সর্পজ্ঞান হইয়াছিল। ঐ জ্ঞানকে কি জ্ঞান বলা যায়? কখনই না, প্রত্যুত উহাকে ভ্রান্তিই বলিতে হয়। এক জন ঐরূপ সর্প দেখিয়া আসিয়া কহিল আমি সর্প দেখিয়া আসিয়াছি, তুমি তথায় যাইও না। ঐ লোক কি সত্য কথা বলিয়াছে? কখনই না। সে ইচ্ছাপুর্ব্বক মিথ্যা বলে নাই, যেমন জানিয়াছে, সেইরূপই বলিয়াছে বটে, কিন্তু যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য নহে। সুতরাং তাহার বিশ্বাসানুযায়ী সেই সত্য কথা হইতে তোমার যে জ্ঞান জন্মিল, তাহা কখন প্রকৃত নহে। অতএব জানা হইল বলিয়া সংস্কার হইলেই যে জানা হয় তাহা নহে। এইজন্য সকল গ্রন্থ বা সকল জানাকে বিজ্ঞান ও জ্ঞান বলা যায় না। যদ্দারা সত্য অবগত হওয়া যায় তাহাকে বিজ্ঞান এবং সত্য জানাকেই জ্ঞান বলে। যাহা যাহা, তাহাকে তাহা বলিয়া জানাই সত্য এবং যাহা সত্য নির্ণায়ক তাহাই বিজ্ঞান। বাইবেলাদি গ্রন্থ যদি ঐরূপ সত্যনির্ণায়ক হয়, তবে অবশ্যই উহা বিজ্ঞান। বাইবেল বলিল, 'খ্রীষ্ট উপাসনা ব্যতিরেকে মানবের উদ্ধারের উপায় নাই।' একথা যদি সত্য হয় তবে অবশ্য উহা বিজ্ঞান-বাক্য।

এক্ষণে কথা এই যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি সত্য নয়, জানিব কি প্রকারে? ওখানে যাহা দেখিলাম, তাহা সর্প না রজ্জু? আমি ত দেখিয়াছি সর্প, কিন্তু তুমি বলিতেছ রজ্জু। তুমিও আপন চক্ষে দেখিয়াছ, আমিও আপন চক্ষে দেখিয়াছি; কি প্রকারে জানিব, আমার কথা সত্য, কি তোমার কথা সত্য? সর্পকে সর্প ও রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিবার উপায় কি? অবশ্য বলিতে হইবে অবিকৃত চক্ষু ও মন, আবশ্যক মত আলোক, দর্শনীয় পদার্থের সন্নিকর্ষ প্রভৃতি দর্শনজ্ঞান জন্মিবার কারণাবলীর সংযোগই প্রকৃত দর্শন-জ্ঞানের নিদান। ঐরূপ হইলেই যে বস্তু যাহা, সেই বস্তু তদাকারে চক্ষে পতিত হইবে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণ ব্যতিক্রম হইলে প্রকৃত দর্শনজ্ঞান জন্মে না। আমি যে সর্প দেখিয়াছি, তাহা কি ঐ প্রকারে দেখিয়াছি? যদি তাহা না হইয়া থাকে, যদি কোনও অঙ্গের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, তবে কখনই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় নাই, বরং তদ্বিপরীতে ভ্রান্তিই হইয়াছে। অতএব যে প্রকারে দেখিলে স্বরূপ দৃষ্টি হয় সেইরূপে পুনরায় দেখিলে অবশ্য বুঝিতে পারিব ঐ সর্পদর্শন সত্য কি না? ঐরূপে বাইবেল যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য কি না বুঝিতে হইলে যে উপায় অবলম্বন করিলে ঐরূপ সত্য প্রতিভাত হইতে পারে, সে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। কিন্তু এরূপ স্থলে দর্শনোপযোগী উপায় অবলম্বন করিলে হইবে না, শ্রবণোপযোগী উপায় অবলম্বন করিলেও চলিবে

না। এরূপ স্থলে যে উপায় অবলম্বিত হয় তাহার প্রচলিত নাম যুক্তি। তাই যুক্তি বিরুদ্ধ কথা বিজ্ঞানবাচ্য নহে। তাই আভিধানিকেরা Science শব্দের অর্থ Reasonable অর্থাৎ 'যাহা যুক্তিসঙ্গত তাহাকেই বিজ্ঞান' বলিয়াছেন।

'যাহা যুক্তিসঙ্গত তাহা সত্য, যাহা যুক্তিসঙ্গত নয় তাহা মিথ্যা।' এই জন্য সত্য স্থির করিতে হইলে যুক্তি অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু যুক্তি কাহাকে বলে? অনেকে সম্ভব অসম্ভব লইয়া যুক্তি শব্দের ব্যবহার করেন। অর্থাৎ যাহা সম্ভব তাহা যুক্তিসিদ্ধ এবং যাহা অসম্ভব তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ। কিন্তু সম্ভব অসম্ভবের লক্ষণ কৈ? আজি যাহা সম্পূর্ণ সম্ভব শতবর্ষ পূর্ব্বে তাহা একান্ত অসম্ভব ছিল; শতবর্ষ পূর্ব্বে যাহা সম্ভব ছিল এক্ষণে তাহা একান্ত অসম্ভব। শতবর্ষ পূর্ব্বে যদি কেহ বলিত শত যোজন পথ এক দিনে যাওয়া যায়, ছয় মাসের পথের সংবাদ এক মুহূর্ত্তে লওয়া যায়, শত যোড়া বস্ত্র এক দিনে বুনা যায়, অযুত পুস্তক এক দিনে লেখা যায়, তাহা হইলে কি কেহ সম্ভব মনে করিত? না, প্রাচীন কালের লোকেরা যে সকল আশ্চর্য্য বলবীর্য্য ও সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন এখনকার লোকেরা তাহা সম্ভব মনে করে? বাস্তবিক সম্ভব অসম্ভবের কোন সীমানির্দ্দেশ করা কঠিন। কাযেই সম্ভব অসম্ভবের উপর যুক্তি দাঁড়াইতে পারে না। অনেকে কোন একটী মূল বিষয় সত্য বলিয়া মনে করিয়া লইয়া, তাহার উপর যুক্তি স্থাপনা করেন। যেমন অনেকে বলেন, যখন ঈশ্বর সকল মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন অবশ্য সকল মনুষ্যকে সমান করিয়াছেন, নচেৎ তাঁহাকে পক্ষপাতী বলিতে হয়, এই মূল ধরিয়া তাঁহারা বলেন সকল মনুষ্যকে সমান স্বত্ব দেওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহাদের এই মূলবাক্যের সত্যতার প্রমাণ নাই। কেন-না, ঈশ্বরকে সৃষ্ট-বস্তুমাত্রকেই সমান করিতে হইবে, তাহা না করিলে তাঁহার পক্ষপাত করা হইবে এ কথার প্রমাণ কি? কেহ বলেন উন্নতিকর কার্য্যই মানবের একান্ত কর্ত্তব্য, কেন-না, উন্নতিই জগতের লক্ষ্য। কিন্তু উন্নতি যে জগতের লক্ষ্য তাহার প্রমাণ কি? বরং দেখা যাইতেছে জন্মের সহিত যেমন মৃত্যুর চিরসম্বন্ধ, উন্নতির সহিতও সেইরূপ অবনতির চিরসম্বন্ধ। অনেক পণ্ডিতের স্থির সিদ্ধান্ত পরমাণু নামক সূক্ষ্মতম পদার্থ সমস্ত পদার্থেরই মূল উপদান। কিন্তু বাস্তবিক পরমাণু সকল বৃহৎ পদার্থ সকলের মূল, কি বৃহৎ পদার্থ সকল পরমাণু সকলের মূল? বৃক্ষ বীজের কারণ, কি বীজ বৃক্ষের কারণ তাহা কে বলিতে পারে? এইরূপ অনেক যুক্তি, সংস্কার, বিশ্বাস বা অনুমানবিশেষের উপর স্থাপিত। সুতরাং এরূপ যুক্তির উপর স্থাপিত সত্যকে সত্য বলা যাইতে পারে না। যাহা শারীর বৃত্তি বিশেষ দ্বারা উপলব্ধ নহে তাহা সত্য নহে। এই জন্য প্রত্যক্ষের অগোচর বিষয়ে সকলের বিশ্বাস নাই। ফল কথা প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত যুক্তিই প্রকৃত যুক্তি।

আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অবগত হওয়া যায় তাহাকেই সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ বলে। কিন্তু দেখা

যাইতেছে সকল সময়ে ঐরূপ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান সত্য হয় না। রজ্জুকে যখন সর্প দেখি তখন ঐ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান সত্য হয় না। ঐরূপ আকাশস্থ চন্দ্র, সূর্য্য, তারাগণকে যেরূপ ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল দেখি তাহাও সত্য নয়। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইলেই প্রত্যক্ষ হয় না। প্রকৃত প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সাক্ষাৎ কারণ ইন্দ্রিয় ব্যতীত আরও অনেক প্রকার শারীরিক ও মানসিক শক্তির সহায়তা আবশ্যক। বিশেষতঃ সকল বিষয় সকলের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে না; যদি আপন ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ভিন্ন জ্ঞান লাভের আর কোন উপায় নাই বলা যায়, তবে নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলাম তাহার জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি? যদি পরের প্রত্যক্ষ বিষয়কে জ্ঞানাধাররূপে গণ্য না করা যায় তবে যে কালে ও যে প্রদেশে আমি উপস্থিত থাকি না, সে কালে ও সে দেশের জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই জানিতে পারি না। আমি কতটুকু কাল ও কতটুকু স্থান অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান থাকি? আমি কত বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারি? জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া বলিতে হইলে আপন প্রত্যক্ষকে অণুপ্রমাণও বলা যায় না। সুতরাং পরের প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের কারণ না বলিলে আমাদের কিছুই জানা হয় না। এই জন্য অর্য্য-দার্শনিকেরা উহাকে শব্দপ্রমাণ নাম দিয়া জ্ঞানের কারণমধ্যে ধরিয়া গিয়াছেন। পরের বাক্য সকল সময়ে সত্য হয় না বলিয়া যদি পরের বাক্যকে জ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তবে আপনার প্রত্যক্ষকেও জ্ঞানের কারণ বলিতে পারা যায় না। কেন-না, তাহাতেও অনেক প্রমাদ আছে। আপন ও পরের প্রত্যক্ষ উভয়তেই সত্য আছে, উভয়তেই প্রমাদ আছে। কখনও আপন প্রত্যক্ষ সত্য ও পরের প্রত্যক্ষ মিথ্যা হয় ও কখনও পরের প্রত্যক্ষ সত্য ও আপন প্রত্যক্ষ মিথ্যা হয়। এই জন্য নিজ প্রত্যক্ষকে সত্য করিবার জন্য যেমন নানা প্রকার প্রক্রিয়ার সাহায্য আবশ্যক হয়, পর-প্রত্যক্ষ ব্যবহার করিবার সময়েও সেইরূপ নানা প্রকার সংস্কার ক্রিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ভিন্ন কোন প্রকার জ্ঞান লাভ হইতে পারে না বটে, কিন্তু সকল সময়েই ইন্দ্রিয়ের বর্ত্তমানতার আবশ্যক হয় না। মনে কর, পূর্ব্বে তুমি একদিন হস্তী দেখিয়াছিলে, দেখিয়া তাহার আকৃতি আদি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলে। এক দিন তুমি বসিয়া আছ, এমত সময়ে সেই হস্তীর আকার তোমার নয়নপথে উপস্থিত হইল। বাস্তবিক সে হস্তী তখন তোমার সম্মুখে না থাকিলেও তুমি কি প্রকারে ঐ হস্তী দেখিলে? এখানে তোমার দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত হস্তীর সংযোগ না হইলেও কি প্রকারে হস্তী দর্শন হইল? অবশ্য বলিতে হইবে ঐ হস্তীচিত্র তোমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল, ধারণা তাহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং স্মৃতি ঐ চিত্রপট তোমার চক্ষুসমীপে আনিয়াছিল। এই অবস্থায় তোমার যে হস্তীজ্ঞান হইল তাহার বর্ত্তমান কারণ ইন্দ্রিয় না হইলেও ইন্দ্রিয় উহার মূল কারণ। কেন-না, যদি তুমি কখন হস্তী না

দেখিতে তাহা হইলে কখনও ধারণাদি তোমাকে উহা দেখাইতে পারিত না। আবার, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলেও মন বা উপযোগী বৃত্ত্যাদির সংযোগাভাবে আদৌ কোন জ্ঞান জন্মে না। যদি ধারণাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকালে কার্য্য না করে তাহা হইলে হস্তীদর্শন হয় না ও পুনরায় হস্তী দেখিয়া চিনিতে পারা যায় না, আন্তরিক বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তা ভিন্ন কোন জ্ঞানই বিস্তৃত ও স্থায়ী হইতে পারে না। অতএব ঐ সকল বৃত্তি নিয়ত প্রত্যক্ষের সহচর ও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সমবায় কারণ।

তুমি পর্ব্বতে ধূম দৃষ্টি করিলে। পূর্ব্বে জানিয়াছ অগ্নিই ধূমের কারণ, কখনও অগ্নি ভিন্ন ধূম দেখ নাই, এক্ষণে যদিও তুমি পর্ব্বতস্থ অগ্নি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছ না, তথাপি তুমি জানিলে পর্ব্বতে অগ্নি আছে। তুমি জানিয়াছ পৃথিবীস্থ জীবগণ জন্মিতেছে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, সুখ-দুঃখের অধীন হইতেছে, মরিতেছে আবার জন্মিতেছে ইত্যাদি। যদিও তুমি দেখিতেছ না যে পরে কি হইবে তথাপি তুমি বুঝিতেছ যে ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে,—তুমি বুঝিয়াছ কিছুই চিরস্থায়ী নহে। দার্শনিকেরা জ্ঞানের এই প্রকার কারণকে অনুমান বলিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহা প্রত্যক্ষ ভিন্ন কিছুই নহে। ঐ সকল জ্ঞান সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়মূলক না হইলেও প্রত্যক্ষ-মূলক। কেন-না, উহার একদেশ অর্থাৎ এক অংশ তোমার প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছে। দার্শনিকেরা এই সকল প্রকার প্রত্যক্ষকে বিভাগ করিয়া প্রত্যক্ষ, শাব্দ, অনুমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। ফলতঃ বাহ্যিক ও আন্তরিক ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই সমস্ত জ্ঞানের নিদান। যেমন মাঝি ভিন্ন কেবল দাঁড়ির দ্বারা নৌকা চলে না, কেবল দাঁড়ির ভরসায় নৌকা চালাইলে নৌকা চলা দূরে থাকুক তৎক্ষণাৎ বানচাল হয়, সেইরূপ কেবল ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া জ্ঞান লাভ করিলে জ্ঞান লাভ না হইয়া ভ্রান্তিই হয়। এই জন্য মাঝি স্বরূপে নিয়ত বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে রাখিতে হইবে। যত মাঝি ভাল হইবে, ততই নৌকা ঠিক চলিবে—ততই জ্ঞান সত্যপথে চলিবে। ঐ দাঁড়ি মাঝির সম্মিলনকে—ঐ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের সম্মিলনকে যুক্তি বলে এবং তজ্জাত জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। এই জন্য বিজ্ঞান আমাদের প্রধান নেতা। বিজ্ঞান আমাদের প্রকৃত পথদর্শক। প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই বিজ্ঞানসম্মত হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, পদার্থতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই বিজ্ঞান দ্বারা স্থির হওয়া আবশ্যক; অধিক কি ইতিহাস, জীবনচরিত, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতিকেও বিজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে দেওয়া উচিত নয়।

আশ্চর্য্য এই যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মানবের প্রধান অবলম্বনীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে বিজ্ঞান-মধ্যে ধরিতে চাহেন না; কেন চাহেন না—তাঁহারা বলেন উহাতে প্রত্যক্ষতা নাই, যুক্তি নাই। প্রত্যক্ষের প্রকৃত লক্ষণ না জানিয়াই তাঁহারা এরূপ বলেন। সকল দিক্ দর্শন না করিয়াই এইরূপ বলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের দশা দেখিয়াই এইরূপ বলেন।

প্রকৃত অনুসন্ধান করিতে না পারিলে সত্য স্থির হয় না। বাহ্য শক্তিমাত্র দেখিয়া নিরস্ত হইলে বিজ্ঞানালোচনা হয় না; যে বায়ু পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী স্থানে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে তাহা যে উপরে পশ্চিমাভিমুখে গমনশীল তাহা না জানিলে যেমন বায়ুর প্রকৃত গতি জানা হয় না, সেইরূপ পদার্থ সকলের আভ্যন্তরিক গুণ না জানিয়া আপাতদৃষ্ট বাহ্য গুণ মাত্র জানিলেই তাহাদের গুণ জানা হয় না, সমস্ত দেখা আবশ্যক। আধুনিক বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতেরা জানেন বিবাদ বা বিরুদ্ধ বল-প্রয়োগই জয়লাভের বা বিরুদ্ধ-শক্তি দমনের একমাত্র উপায়। সদ্ভাব বা বিরুদ্ধ-শক্তির অবিরোধাচরণ যে জয়ের প্রকৃত উপায় তাহা তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা জানেন শরীরে তাপ লাগিয়াছে, শীতল করিলে তাপ যাইবে, অর্থাৎ শরীরস্থ তাপের সহিত বিরুদ্ধ-শক্তি হিমের দ্বন্দ্ব বাধাইতে পারিলেই —হিমের বৃদ্ধি করিয়া তাপের অল্পতা করিয়া দিতে পারিলেই, তাপের দমন হয়, বা তাপ-জনিত শারীরিক কষ্ট বিদূরিত হয়। তাঁহারা ইহা জানেন না যে, তাপের সহিত তাপের সম্মিলনে অর্থাৎ তাপের উপর তাপ লাগা-ইতে পারিলে শারীরিক তাপজনিত কষ্ট নিবারিত হয়। "বিষস্য বিষমৌষধম্" এই সারবান বাক্য তাঁহাদের বিজ্ঞানে অদ্যাপি প্রবিষ্ট হয় নাই। এই জন্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞা-নিকদিগের মতে যে কোন দুঃখ বা অভাব উপস্থিত হউক, তাহা নিবারণ করিতে হইলে, তাহার বিপরীত অর্থাৎ অভাবের সদ্ভাব বা সংস্তাপ দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে। সুতরাং ক্রোধরিপু উত্তেজিত হইলে পরা-নিষ্ট করা আবশ্যক, লোভরিপু জনিত কষ্ট দূর করিতে হইলে লোভনীয় পদার্থ প্রাপ্তির আবশ্যক, তাপ নিবারণ করিয়া শীতল হইতে হইলে শীতল বায়ু ও বরফ-জলের আবশ্যক ইত্যাদি। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ঐরূপে ইচ্ছা সকলের যত চরিতার্থ করা যায়, ততই সেই ইচ্ছা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে এমন অভ্যাস হইয়া যায় যে, তখন এক জনের অনিষ্ট দ্বারা ক্রোধ নিবারিত হয় না, অল্প দ্রব্য প্রাপ্তিতে লোভ চরিতার্থ হয় না, অল্প বায়ু ও বা এক গ্লাস বরফ-জলে তাপ দূর হয় না, অল্প মদে নেশা হয় না ও অল্প কুইনাইনে জ্বর সারে না। যে ইচ্ছা যত চরিতার্থ করা যায়, সে ইচ্ছা তত বলবতী হয় এবং সেই ইচ্ছা পুরণ করিতে তত অধিক ব্যগ্র হইতে হয়। সুতরাং প্রকৃত দুঃখ বা অভাব নিবৃত্ত হয় না—অভাব নিরাকরণ-জনিত তৃপ্তি সুখ কোন অবস্থাতেই স্থায়ী হয় না।

নিঃস্বোবষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো।
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ॥
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রাহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কোগতঃ॥

দরিদ্র ব্যক্তি শতমুদ্রা পাইলে তুষ্ট হইবে বিবেচনা করে, শত মুদ্রাবান সহস্র পাইলে সুখী হইবে ভাবে, সহস্রবান লক্ষ প্রার্থনা করে, লক্ষপতি রাজত্ব কামনা করেন, রাজা সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইতে চাহেন, সার্ব্বভৌম নরপতি ইন্দ্রত্বপদ, ইন্দ্র ব্রহ্মার পদ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা করেন। এই প্রকারে উত্তরোত্তর আশার বৃদ্ধি হইতে

থাকে। কেহই আশার প্রান্তসীমায় যাইতে পারেন না—অর্থাৎ আর প্রয়োজন নাই মনে করিয়া কেহই তৃপ্তিসুখ লাভ করিতে পারেন না।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে॥

উপভোগ দ্বারা কামনা প্রশমিত হয় না; প্রত্যুত ঘৃত দ্বারা যেমন বহ্নি প্রদীপ্ত হয় সেইরূপ ভোগ দ্বারা কামনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বাস্তবিক বিরোধ না করিয়া সম্মিলন সহ্য করিতে অভ্যাস করিলেও দুঃখ নিবারিত হয়। সহ্য করিতে পারিলে রৌদ্র আজি যে কষ্ট দিতেছে, কল্য তাহা দিবে না, পরশ্ব তাহাও দিবে না; রিপু সকল আজি যে কষ্ট দিতেছে, সহ্য করিলে কালি তাহা দিবে না, পরশ্ব তাহার কষ্ট আরও মন্দীভূত হইবে। এই প্রকারে যে দুঃখের নিবৃত্তি হয় সেই নিবৃত্তিই প্রকৃত নিবৃত্তি। সম্ভোগ দ্বারা যে দুঃখের নিবৃত্তি, তাহা বাস্তবিক নিবৃত্তি নহে। উহা অধিক দুঃখেরই কারণ মাত্র।[২] বিজ্ঞানের এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধর্ম্মশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলিতে চাহেন না—ঈশ্বরকে বিজ্ঞানচক্ষে দেখিতে পান না। কিন্তু যে ধর্ম্মশাস্ত্র মানবের চিরারাধ্য বস্তু, যাহার বলেই মানব দেবপদবাচ্য, তাহা যদি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ সুতরাং মানবের অনবলম্বনীয় হইল তবে মানব ও পশুতে প্রভেদ কি থাকিল? বাস্তবিক ধর্ম্মশাস্ত্র বিজ্ঞানের বহির্ভূত নহে, ঈশ্বর মানবের একান্ত অগোচর নহেন—প্রকৃত বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা দিব্যচক্ষু লাভ করিলে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

যে বিজ্ঞানেরই আলোচনা করা হউক, যে জ্ঞানলাভেরই চেষ্টা করা হউক, আলোচ্য বিষয় ধারাবাহিক রূপে সর্ব্বাবয়বনিরীক্ষণ না করিলে প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না। "সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখস্থ বাহুর বর্গ সমকোণের পার্শ্বস্থ বাহুদ্বয়ের বর্গের যোগতুল্য" এই একটী সামান্য প্রতিজ্ঞা সহজে বুঝা যায় না। জ্যামিতির পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৬ টী প্রতিজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধগুলি অগ্রে অধ্যয়ন না করিলে কেহই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। অথবা কেহ যদি এককালে ঐ প্রতিজ্ঞা বুঝিবার সময় ঐ প্রতিজ্ঞার প্রতিকৃতির উপর পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত প্রতিজ্ঞার প্রক্রিয়া সাধন করিতে চেষ্টা করেন, তিনি তাহা বুঝিতে ত পারেনই না, অধিকন্তু নিতান্ত আকুল হইয়া পড়েন। সকল জ্ঞান সম্বন্ধেই ঐরূপ। কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ঐ জ্ঞানের সাধন জন্য অগ্রে যে যে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক, ধারাবাহিক রূপে সেই গুলি অগ্রে লাভ করিতে হইবে—তবে সে জ্ঞান লাভের উপযোগী হইতে পারা যাইবে। তাহাও আবার উপযুক্ত শক্তি বা সামর্থ্য না থাকিলে হয় না। যাঁহার গণিতের উপযুক্ত বুদ্ধি নাই তিনি কখনও গণিতবিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শী হইতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানলাভের উপযোগী আরও অনেক ব্যাপার আছে, সঙ্গীতবিদ্যার উদাহরণ দ্বারা দুই একটী বুঝাইবার

২ ইহার বিস্তৃত আলোচনা ক্রমশঃ করা যাইবে।

চেষ্টা করা যাইতেছে। সঙ্গীতবিজ্ঞানে সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি, নামক সাতটী সুর সমস্ত প্রকার সুরের মূল বলিয়া ধৃত হইয়াছে; যাঁহার সেই সুর বোধ হইয়াছে তিনি ঐ সকল সুর প্রকৃত হইয়াছে কি না তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। তানপুরার সুর বাঁধিবার সময় তাহার কান মোড়া দেওয়া হইতে থাকে ও তারে আঘাত করা হইতে থাকে; ঐরূপ মোড়া দিতে দিতে ঠিক যে সময়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সুর বাহির হইবার উপযুক্ত তার কসা হয়, স্বরনিপুণ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারেন; তুমি আমি কি বুঝিতে পারি? ঐরূপ তাল বা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তরে সুরের ছেদ বুঝিবার শক্তি সেই সঙ্গীত-নিপুণেরই আছে, একটু বেতাল হইলেই তিনি বুঝিতে পারেন, তুমি আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। সমস্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধেই ঐরূপ। সুর ও তাল বুঝিবার শক্তি না জন্মিলে কোন তত্ত্বই বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু সামান্য সঙ্গীতের সুর ও তালের জ্ঞানলাভ করিতে কত সাধনার আবশ্যক? ঈশ্বরজ্ঞানের সুর তাল বুঝিতে কি তাহা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক সাধনার প্রয়োজন নহে? এ পৃথিবীতে কয়জন সেরূপ সাধনা করিতে পারেন? কয়জনের সেরূপ উচ্চশক্তি, সেরূপ অধ্যবসায়, সেরূপ দীর্ঘ নীরোগ জীবন, সেরূপ অনন্য মন, সেরূপ অবসর ও সেরূপ প্রবৃত্তি আছে? প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের মধ্যেই সেরূপ লোক অতি অল্প ছিলেন। অল্প উন্নতি করিলে মানব ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিবার উপযুক্ত হয় না। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি সামান্য বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানলাভের উপযোগী লোকই যখন পৃথিবীতে নিতান্ত অল্প, তখন মহোচ্চ ঈশ্বরবিজ্ঞানে পারদর্শী হইবার উপযোগী লোক কত অল্প হওয়া সম্ভব? ঐ সকল ক্ষুদ্র বিজ্ঞানই শিক্ষা করিতে যখন আমাদের গুরুর নিতান্ত আবশ্যক তখন ঈশ্বর-বিজ্ঞানের আর কথা কি? অন্ততঃ সুর ও তালবোধ পর্য্যন্ত গুরুর নিকট না শিখিলে যেমন সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা হয় না, অন্ততঃ গণিতশাস্ত্র গুরুর নিকট না শিখিলে যেমন জ্যোতিঃশাস্ত্র শিখিবার অধিকারী হওয়া যায় না, ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট বিষয় পর্য্যন্ত গুরুর নিকট শিক্ষা না করিলে ঈশ্বরজ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ঈশ্বরবিজ্ঞান সম্বন্ধে মানবগণ সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকেন। অগ্রে গুরুর নিকট কিয়ৎ পরিমাণ শিক্ষা করিয়া সকল বিজ্ঞানেরই সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ঈশ্বর নিরূপণ সময়ে প্রত্যেকেই ক, খ, বা ১, ২ হইতে বৈজ্ঞানিক তর্ক আরম্ভ করেন। কোন স্থানেই কাহারও সহায়তা লইতে চাহেন না। একদিনেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বুঝিয়া লয়েন। একদিনেই ধর্ম্মের মর্ম্ম ও প্রকৃতি আদি বুঝিয়া লয়েন, এই জন্য ঈশ্বরবিজ্ঞানের ও ধর্ম্মবিজ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিতে পারেন না। গুরুবাক্যে—আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিয়া তদবলম্বনে সাধনা করিয়া বুঝিবার উপযোগী না হইলে, ঈশ্বরবিজ্ঞান কি কোন বিজ্ঞানেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে না।

যাঁহারা আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলেন, তাঁহারা আদৌ বিজ্ঞান বুঝেন নাই। কেন না আপ্তবাক্য বিজ্ঞান হইতে জাত এবং বিজ্ঞানের আকর। যদি আপ্তবাক্য ভ্রমসঙ্কুল হয় তবে বিজ্ঞানও ভ্রমসঙ্কুল। এই সকল না বুঝিয়াই আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্ম্মশাস্ত্রকে ও ব্রহ্মবিদ্যাকে বিজ্ঞানের অবিষয় বলেন। শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

তাম্রলিপ্তি।

তম্লুক এখন মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা বা উপবিভাগ। যে নগরে উক্ত মহকুমার সদর আড্ডা, তাহার নামই তম্লুক। তম্লুক মেদিনীপুর সহরের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে রূপনারায়ণ নদতীরে ২২°, ২৭', ৫০" অক্ষরেখা এবং ৮৭°, ৫৭', ৩০" দ্রাঘিমায় অবস্থিত। প্রাচীন অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের কথা সকলেই শুনিয়াছেন। তম্লুক সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের প্রাচীন বিভাগ কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। অতি প্রাচীন অথবা ইতিহাসাতীত কাল হইতে এই স্থানকে তমোলিপ্ত বা তাম্রলিপ্তি বলিত। পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থ এবং অভিধানাদিতে উক্ত নগর এই নামেই অভিহিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।[১]

কথিত আছে, ইতিহাসাতীত কালে তম্লুকের নৃপতিগণ উড়িষ্যা রাজ্য জয় করেন এবং উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত বহুদূরবিস্তৃত স্থানের নাম রাখেন তাম্রলিপ্তি।[২] সেই সময় হইতে তাম্রলিপ্তি সুসম্পন্ন ও পরাক্রান্ত রাজ্যে পরিণত হয়। তখন তাম্রলিপ্তি নগরীই সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল, এবং উহার সমৃদ্ধি ও কীর্ত্তি গৌরব বহুদূরব্যাপী হইয়াছিল। মহাভারত এবং পুরাণাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তম্লুক অতি প্রাচীন রাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি, মহাভারত-বর্ণিত যুদ্ধের সহিত এই রাজ্যের সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীদাসী মহাভারতে এই নগর রত্নাবতীপুর নামে অভিহিত হইয়াছে।[৩] পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ ঘোষাল তাঁহার পুস্তকে মহাভারতীয় যুদ্ধের সহিত তাম্রলিপ্তির সংস্রব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—"দ্বাপরের অবসান-সময়ে নিখিল বীরবিধ্বংশকারী কুরুক্ষেত্রের সেই ভৈরব সমর আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে ভগদত্ত অস্মদ্দেশের একজন প্রধান নরপতি ছিলেন। সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত তাঁহার

১ তমোলিপ্তি (স্ত্রী) দেশবিশেষঃ। তমোলুক (১) ইতি ভাষা। তৎপর্য্যায়ঃ। তামলিপ্তঃ (২) বেলাকূলং (৩) তমালিকা (৪)। ইতি শব্দ রত্নাবলী॥ তামলিপ্তং (৫) তামলিপ্তী (৬)। ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ॥ দামলিপ্তং (৭) তমালিনী (৮) স্তম্ব পুঃ (৯) বিষ্ণু গৃহং (১০)। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥—শব্দকল্পদ্রুমঃ তৃতীয়ঃ কাণ্ডঃ।

২ The Kingdom of Tamluk was then about two hundred and fifty miles in circumference.—*Vide* Documents Geographiques, p. 450.

৩ কাশীরাম দাস কৃত মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্ব দেখ।

রাজত্ব ছিল। তিনি কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ সংগ্রামভূমে অবতীর্ণ হয়েন। কয়েক দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে ভগদত্ত সমরশায়ী হইলেন। অঙ্গরাজ সেনা-নায়ক হইলে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও তাম্রলিপ্তি দেশীয় বীরগণ ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে বঙ্গাধিপতি সাত্যকির হস্তে ও পুণ্ড্রাধিপতি সহদেবের হস্তে নিহত হইলেন। তাম্রলিপ্তের অধিপতি নকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক পরাজিত হইলেন।"[৪] তাম্রলিপ্ত রাজ্য যে অতীব প্রাচীন কালে,—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু পূর্ব্বে—সংস্থাপিত হয়, সে সম্বন্ধে উপরোক্ত লেখক বলেন :—"নিমিবংশ অস্তমিত হইবার পূর্ব্বেই ত্রেতাযুগমধ্যে সোমবংশসমুদ্ভূত বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্ম নামক পঞ্চ ক্ষেত্রজ তনয় পঞ্চ স্থানে রাজ্য স্থাপন করিলেন। ভাগলপুরের সন্নিহিত স্থান অঙ্গের রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল। এই বংশীয় লোমপাদ রাজা দশরথের পরম বন্ধু ছিলেন। বঙ্গ প্রতীচ্য (প্রাচ্য ?) দেশ আশ্রয় করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তম্‌লুকের সন্নিহিত স্থান তাম্রলিপ্তের ছিল। কলিঙ্গ, কলিঙ্গদেশে অবস্থান করিলেন। সুহ্ম ভোট সন্নিকটে রাজ্য স্থাপন করিলেন। মুরশিদাবাদের সন্নিহিত স্থানাদিতে পৌণ্ড্রের আধিপত্য হইল।"[৫] উপরোক্ত বর্ণনাটি সত্য হইলে, তাম্রলিপ্ত রাজ্যের নামকরণ তাম্রলিপ্তি নরপতি হইতে হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

তম্‌লুক বা তাম্রলিপ্তি রাজ্য সম্বন্ধে আর একটি পরম্পরাশ্রুত কথায় অবগত হওয়া যায় যে, এই রাজ্য ময়ূরভঞ্জ নৃপতিগণ কর্তৃক সংস্থাপিত হয়। ইহা সত্যই হউক অথবা মিথ্যাই হউক তাম্রলিপ্তির সঙ্গে যে ময়ূরভঞ্জের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তম্‌লুকের প্রথম ভূপালগণ ময়ূরধ্বজ এবং শিখিধ্বজ উপাধিধারী ছিলেন। ইহাঁরা ক্ষত্রিয় জাতীয়। এই বংশীয় দ্বাত্রিংশ জন নরপতি ক্রমান্বয়ে তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। অধুনা ময়ূরভঞ্জ রাজাদিগের রাজকীয় চিহ্ন যেমন ময়ূরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্তির উপরোক্ত রাজবংশীয়দেরও নিদর্শন ঠিক ঐরূপই ছিল। ময়ূরধ্বজ ও শিখিধ্বজ উপাধিধারী রাজবংশের অবসানে ময়ূরভঞ্জের চারিজন "ময়ূরবংশীয়" রাজা তম্‌লুক রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই ঘটনা উপলক্ষেই অনেকে স্থির করিয়া থাকেন যে, ময়ূরভঞ্জ নরপালগণ কর্ত্তৃক তাম্রলিপ্তি বা তম্‌লুক রাজ্যের নামকরণ হইয়াছিল।[৬]

মহাভারত, এবং পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রীয় পুস্তকাদিতে তাম্রলিপ্তির সম্বন্ধে যে সকল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং লোকপরম্পরাগত বাক্যে যে সকল গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই ইতিহাসাতীত কালের কথা, এবং এরূপ দুর্ভেদ্য তমসাচ্ছন্ন

৪ গৌড়ীয় ভাবতত্ত্ব, প্রথম খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা দেখ।
৫ ঐ ঐ ঐ ১৯ ও ২০ পৃঃ দেখ।

৬ *Vide* "Orissa" by W. W. Hunter. Vol. I. pp. 308. and 309.

যে উহা ভেদ করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যে উপনীত হওয়া অতীব সুকঠিন। আমরা বৌদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর বলিয়া এই নগরের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ দেখিতে পাই। পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভ (খ্রীঃ অঃ ৩৯৯—৪১৪) কালে চীনদেশীয় পরিব্রাজক বা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী ফা হিয়ান[৭] এই স্থানে উপস্থিত হয়েন। তিনি দুই বৎসর কাল এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-পুস্তক সমূহের প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়া, পোতারোহণে এইস্থান হইতে সিংহল যাত্রা করেন। ইহার স্বার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী পরে হিওয়েন থসং নামক আর একজন প্রথিত-নামা চীনদেশীয় ভ্রমণকারী এই নগর পরিদর্শন করেন। তখনও এই নগর সমুদ্রোপ-কূলবর্ত্তী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিচিত ছিল। তৎকৃত এই স্থানের বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে এই নগরে দশটী বৌদ্ধ সন্ন্যাসাশ্রম (সন্ন্যাসীদিগের মঠ) প্রতিষ্ঠিত ছিল,—ঐ মঠসমূহে এক সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন, এবং তথায় অশোক রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুই শত ফিট (প্রায় ১৩৪॥ হস্ত) উচ্চ একটি অভ্রভেদী স্তম্ভ দণ্ডায়মান ছিল। এমন কি হিন্দু ধর্ম্ম কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরাভব হইবার পরও তমলুক সমুদ্রসন্নিহিত একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-নগরী বলিয়া পরিগণিত ছিল। সমুদ্রপথে গমনাগমন জন্য বিবিধ পণ্য দ্রব্যাদি এইখানে সুরক্ষিত হইত। তৎকালে এইখানে বহুসংখ্যক ধনী বণিক ও পোতাধিকারীগণের বাস ছিল। তাঁহারা সমুদ্রপরপারবাসিদিগের সহিত সুবিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায় পরিচালনায় সংলিপ্ত ছিলেন। নীল, তুঁত, রেশম প্রভৃতি উড়িষ্যা এবং বঙ্গদেশজাত দুর্ম্মূল্য দ্রব্য-গুলি বহুকাল হইতে প্রাচীন তমলুকের বহির্ব্বাণিজ্যের দ্রব্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বহু শতাব্দী অতীত হইল, জলনিধি তমলুকের পাদক্ষালনক্রিয়া হইতে বিরত ও স্থানান্তরিত হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাহার অনেক কাল পর পর্য্যন্ত তাম্রলিপ্তি উপকূলনগরী বলিয়া গুণগরিমায় দিগন্ত-বিখ্যাত ছিল। ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশীয় ভ্রমণকারী হিওয়েন থসং দেখিয়াছিলেন, তাম্রলিপ্তির চরণতল সাগরজলে বিধৌত হইতেছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে লোকসাধারণ মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন পরম্পরাগত আখ্যায়িকা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, অনন্তব্যাপী-সাগর-তীর ঐ নগর হইতে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। অধুনা তমলুক সমুদ্র উপকূল হইতে পূর্ণ ত্রিংশ ক্রোশ অন্তরে সন্নিবেশিত। বহুকাল হইতে হুগলী নদী অথবা ভাগীরথীর মুখের নিকটে ক্রমশঃ ভূমি সংগঠিত হইতে থাকে। ঐ সংগঠন-প্রণালী অল্পে অল্পে হইলেও উহা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে—এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদ্র হইতে অন্তরিত হইয়া তমলুক এক্ষণে সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী রূপনারায়ণ-তীরস্থ একটি গ্রামমাত্রে পরিণত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এই নগরের তদানীন্তন ঐশ্বর্য্যের

[৭] Fa Hian; translated into French by M. Remusat, and thence into English by Mr. Laidley. Calcutta, 1848.

সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে, দুইটি বিষয় ব্যতীত এরূপ সামগ্রী আধুনিক তম্লুকে আর কিছুই আমাদিগের দৃষ্টি অথবা শ্রুতি-গোচর হয় না। প্রথমতঃ কোন সময়ে কৃষক-গণকর্ত্তৃক একটি পুষ্করিণী খনন কালে নিম্নে দশ হইতে বিংশতি ফিটের মধ্যে কতক-গুলি সামুদ্রিক শম্বুকাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ উক্ত নগরের অতীত ও বিস্মৃত-প্রায় প্রাচীন নাম রত্নাকর অথবা রত্নাবতী। অদ্যাপিও অনেকে তম্লুককে ঐ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।[৮] কথিত আছে তম্লুকের প্রাচীন ময়ূরবংশীয় ভূপালদিগের শাসনকালে, রাজপ্রাসাদ এবং উহার সংলগ্ন ভূভাগের বিস্তৃতি চারি ক্রোশ ব্যাপী এবং উহা সুদৃঢ় প্রাকারপরিবেষ্টিত ও গভীর পরিখা দ্বারায় পরিরক্ষিত ছিল। উহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ নদের তীরে বিনির্ম্মিত। উহার চতুর্দ্দিকে গড়খাই আছে। এই রাজবাটীর এবং উহার সংযুক্ত ভূমির পরিধি পঁচাত্তর বিঘা হইবে।[৯]

বর্গভীমার[১০] মন্দিরই তম্লুকে দেখিবার প্রধান সামগ্রী। এই দেবী কাহা দ্বারায় কোন্ সময়ে কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহা নিবিড় তমসাচ্ছাদনে আবৃত। কিন্তু ইনি যে বহুকাল হইতে এখানে অধিষ্ঠিত আছেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। পুরাণ প্রভৃতি[১১] সংস্কৃত এবং প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তকে[১২] ইঁহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরটি নির্ম্মিত এবং দেবী প্রতিষ্ঠিত হইবার মূল কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার পরম্পরাগত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত প্রবাদটি সর্ব্বাপেক্ষা লৌকিক এবং সর্ব্বজনগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। গরুড়ধ্বজ নামক জনৈক ময়ূরবংশীয় নরপতির আহারের নিমিত্ত নিয়মিতরূপে প্রত্যহ একটি করিয়া শাল মৎস্য সংগ্রহ করিবার জন্য কোন ধীবরকে নিযুক্ত করা হয়। ঘটনাক্রমে ধীবর এক দিবস ঐ মৎস্য ধৃত করিতে অকৃতকার্য্য হইলে রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া উহার প্রাণবধের অনুমতি প্রদান করেন। এই ভীষণ আজ্ঞা শ্রবণে ধীবর বেচারা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া কোন উপায়ে পলায়ন পূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বনমধ্যে অবস্থিতিকালে একদা ভীমা দেবী ঐ ধীবরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত জাতীয় বহুসংখ্যক মৎস্য একত্রিত করিয়া ধীবরকে তৎসমস্ত শুষ্ক করিতে আদেশ করিলেন। দেবী

৮ কাশীদাসী মহাভারতে এই নগর রত্নাবতীপুর নামে বর্ণিত হইয়াছে।

৯ Vide Statistical Acct. of Hugli, Midnapore and Howrah.

১০ কাহার কাহার মতে পূর্ব্বে এই দেবীকে কালী বা পথু পার্ব্বতী কহিত।

১১ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণ।

১২ দক্ষসুতা আদি মাতা, কালীপুরে বিশালাক্ষী লিঙ্গধরা নৈমিষ কাননে।
প্রয়াগে ললিতা নামে, বিমলা পুরুষোত্তমে,
কামবতী গন্ধমাদনে॥
গোকুলে গোমতী নামা, তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা;
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।—

প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাগ কবিকঙ্কন,

গোকুলে গোমতী নাম, তমোলুকে বর্গভীমা;
ইত্যাদি।—ঐ।

আরও বলিলেন যে, "অমুক স্থানে একটী কূপ আছে,—কূপটি অমরকূপ নামে অভিহিত; উহার জল মৃত-সঞ্জীবনী-গুণাত্মক। অতএব যখন তোমার আবশ্যক হইবে তখনই ঐ কূপের বারি সিঞ্চন করিলেই ঐ মৃত মৎস্যগুলি জীবন প্রাপ্ত হইবে।" দেবীর আদেশ পালন করাতে ধীবর দেখিল যে তৎসমস্তই কার্য্যে পরিণত হইল। তদবধি ঐ ব্যক্তি পুনর্ব্বার সজীব মৎস্য লইয়া প্রত্যহ রাজসমীপে উপস্থিত হইতে লাগিল। কোথাও মৎস্য না পাইলে, ঐরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা সে মৎস্য সংগ্রহ করিয়া লইত। নৃপতি দেখিলেন ধীবর তাঁহাকে সময়ে অসময়ে সর্ব্বকালেই প্রত্যহ রীতিমত মৎস্য যোগাইতেছে। এই ব্যাপার সন্দর্শনে রাজান্তঃকরণে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তিনি একদিবস ধীবরকে ইহার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু ধীবর উহার প্রকৃত উত্তর না দেওয়াতে অবশেষে নৃপতি বলপ্রকাশে ও ভয়প্রদর্শনে উহার নিকট হইতে সেই অবিনশ্বর কূপের রহস্য জ্ঞাত হইলেন। ধীবরকে সাক্ষাৎ দেওয়া অবধি ভীমাদেবী উহার গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক এই রূপে মৃতসঞ্জীবনী কূপের রহস্য প্রকাশ করায় দেবী ধীবরের প্রতি ক্রোধান্বিতা হইয়া তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, ঐ কূপকে জনসাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত করিবার অভিপ্রায়ে প্রস্তর-মূর্ত্তি-রূপিনী হইয়া উহার মুখাবরণ করিয়া অধিষ্ঠিতা হইলেন। ধীবর নৃপতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া কূপসমীপে উপস্থিত হইল, কিন্তু রাজা কূপের পরিবর্ত্তে তথায় দেবী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া তাঁহার চমক হইল, সকল রহস্য তখনি বুঝিলেন। কথিত আছে, সেই ভূপালই এই স্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, অবিনশ্বরত্ব গুণ ব্যতীত ঐ কূপের আর এক ধর্ম্ম ছিল যে, যে কোন ধাতব দ্রব্য হউক না কেন উহার বারিমধ্যে নিমজ্জিত করিলেই তাহা সুবর্ণে পরিণত হইত।

দেবীমন্দির রূপনারায়ণ নদতীরে সন্নিবেশিত। এই মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা এই দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। সাধারণতঃ বিশ্বাস যে, কোন ময়ূরবংশীয় নরপাল ইহার নির্ম্মাতা। তম্লুকের বর্ত্তমান রাজবংশীয়েরা বলেন যে, তাঁহাদের বংশের আদিপুরুষ কর্ত্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্বন্ধে আর একটি জনশ্রুতি আছে। বঙ্গদেশে সুবিখ্যাত ধনপতি বণিকের নাম বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। বাণিজ্যোপলক্ষে যখন তিনি রূপনারায়ণ নদ বাহিয়া যাইতেছিলেন, যাইবার পথে তাঁহার বাণিজ্যতরী তম্লুকে নঙ্গর করা হয়।[১৩] ঐ স্থানে অবস্থিতিকালে তিনি জনৈক সামান্য ব্যক্তিকে একটি সুবর্ণ জলপাত্র লইয়া যাইতে দেখিতে পান। হীনাবস্থাপন্ন ব্যক্তির হস্তে সুবর্ণপাত্র সন্দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বণিকরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,

[১৩] *Vide* "Orissa." by W. W. Hunter. Vol. I. p. 312.

"এ সুবর্ণপাত্র তুমি কোথায় পাইলে?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উক্ত ব্যক্তি বলিল যে, "অতি সন্নিকটস্থ বনমধ্যে একটি কূপ আছে, উহার বারিসিঞ্চনে পিত্তলপাত্র এইরূপ সুবর্ণে পরিণত হইয়াছে।" পরে ঐ ব্যক্তি ধনপতিকে ঐ কূপ দেখাইয়া দেয়। বণিক ধনপতি এবম্প্রকার সুবিধা দেখিয়া ঐ নগরে সম্ভবমত যত পিত্তল পাওয়া গেল, ক্রয় করিলেন,—ক্রয় করিয়া ঐ সকল পাত্র সেই কূপজলে নিমজ্জিত করিয়া সুবর্ণে পরিণত করিয়া লইলেন। বণিক সানন্দে ঐ সকল বহুমূল্য দ্রব্য তরণী পূর্ণ করিয়া সিংহল যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ সুবর্ণপাত্র সকল বিক্রয়ে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে যথেষ্ট অর্থব্যয়ে কৃতজ্ঞতার উপহার স্বরূপ তমলুক নগরে তিনিই এই দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই মন্দির নির্ম্মাণকার্য্যে ঈদৃশ শিল্পচাতুর্য্য ও নিপুণতা প্রদর্শিত হইয়াছে, যে, তদ্দর্শনে অদ্যাবধিও দর্শকের চিত্ত বিস্ময়রসে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। স্তরসন্নিবিষ্ট বিচিত্র প্রাচীরত্রয়ে মন্দির পরিবেষ্টিত। যে সমুচ্চ ভূমির উপর মন্দিরটি নির্ম্মিত উহার সর্ব্ব নিম্নভাগে বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা উচ্চ ভিত্তিমূল প্রস্তুত হইয়াছে। তদুপরি বিংশ হস্ত প্রস্তর ও ইষ্টক দ্বারায় গ্রথিত; এবং উহার উপরে প্রাচীর ও মন্দির দণ্ডায়মান। কথিত প্রাকার তিনটি সংযুক্ত হইয়া একটি দৃঢ় প্রাচীরে পরিণত হইয়াছে। ঐ প্রাচীর এমনি কঠিন যে, রূপনারায়ণের প্রবল তরঙ্গাঘাতেও উহার কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারে নাই। রূপনারায়ণে মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গান ধরিয়া পার্শ্ববর্ত্তী তটভূমি কত বার উদরসাৎ করিয়াছে, কিন্তু মন্দিরভিত্তি কত শতাব্দীকাল তেমনি অটল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নদে বান ডাকিবার সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, মন্দিরতলে বান আসিয়া যেন মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া যায়। তখন আর উহার সাড়া শব্দ পর্য্যন্ত থাকে না। মন্দিরসীমা অতিক্রম করিয়া বান আবার মস্তক উন্নত করিয়া প্রবল বিক্রমে ছুটিতে থাকে।

উপরে আমরা যে তেহারা প্রাচীরের কথা বলিয়াছি, ঐ প্রাচীর তিনটির মধ্যে বহিঃস্থ দুইটি ইষ্টক এবং মধ্যবর্ত্তীটি প্রস্তরবিনির্ম্মিত। ভিত্তিমূল বা বুনিয়াদের উপর প্রাচীরমূলের প্রশস্ততা নয় ফিট বা ছয় হস্ত হইবে। সমগ্র দেবনিকেতনটি একটি গুম্বজাকৃতি ছাদ দ্বারায় আবৃত। ইহা নির্ম্মাণ করিতে বৃহদাকার প্রস্তর সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সময়ে যন্ত্রাদির আদৌ ব্যবহার ছিল না, সে সময়ে কি প্রকারে যে এরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল উত্তোলন করা হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া দর্শকবৃন্দকে এবং বিজ্ঞানস্পর্দ্ধী ইয়রোপীয় শিল্পীগণকেও চমৎকৃত ও বিস্মিত হইতে হয়।

মন্দিরাভ্যন্তরে ভীমাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। দেবীর হস্ত পদ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পূর্ণাবয়ব একখানি প্রস্তরখণ্ড হইতে খোদিত। দেবী শিবের উপর উপবিষ্টা।

তাঁহার অঙ্গে বিষধর বিরাজিত। সম্ভবতঃ তারামূর্ত্তি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু দেবীর "ভীমা" মূর্ত্তি ধারণ ও "ভীমা" নাম গ্রহণের পরিচয় মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাই দেবী স্বয়ং সুরগণকে বলিয়া দিতেছেন,—

পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যা নম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ, "পুনর্ব্বার আমি যখন মুনিজনের রক্ষাহেতু, হিমাচলে ভীমকান্তি ধারণপূর্ব্বক রাক্ষসকুলের ক্ষয়সাধন করিব, তখন মুনিগণ বিনীতবেশে আমার স্তব করিবে, এবং আমার নাম ভীমাদেবী বলিয়া বিখ্যাত হইবে।" শুম্ভাসুরের নিধনসাধনের পর কৃতজ্ঞ ও স্তুতিপরায়ণ সুরগণের সহিত দেবীর এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল।

মন্দিরের শিখরদেশে বিষ্ণুচক্র সন্নিবেশিত এবং ঐ চক্রের উপরিভাগে একটি ময়ূরাকৃতি পরিশোভিত। দেবালয়টি চারিটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সর্ব্বপ্রথমে বড় দেউল, —যেখানে দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; তৎপরে জগমোহন—যেস্থান হইতে দর্শকমণ্ডলী দেবী দর্শন করিয়া থাকে; তাহার পরে যজ্ঞমণ্ডপ—যথায় বলি প্রভৃতি সম্পন্ন হয়; সর্ব্বশেষে নাটমন্দির,—যেখানে বাদ্য, গীত এবং নৃত্যাদি হইয়া থাকে। মন্দিরের বহির্দ্বার হইতে সাধারণ বর্ত্ম পর্য্যন্ত সুদৃশ্য সোপানাবলী পরিশোভিত। ঐ সোপানশ্রেণীর উভয় পার্শ্বে দুইটি স্তম্ভ স্থাপিত রহিয়াছে। সম্মুখে নহবৎখানা আছে। দেবালয়ের বহির্দ্দেশে অথচ উহার সীমার মধ্যে একটি কেলি-কদম্ব বৃক্ষ বহুকাল হইতে আছে। শুনা যায় এই পাদপের এরূপ ধর্ম্ম আছে যাহাতে বন্ধ্যা স্ত্রী পুত্রবতী হইতে পারে। পুত্র যাচ্ঞা করিবার মানসে পুরস্ত্রীগণ দলে দলে এই বৃক্ষসমীপে উপস্থিত হয়েন এবং পূর্ণমনস্কাম হইবার অভিপ্রায়ে বহুকালাশ্রিত রীত্যনুসারে কুন্তলরাশি-বিশ্লিষ্ট-কেশ-বিনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারায় লোষ্ট্রখণ্ড সকল উহার শাখায় বিলম্বিত করিয়া থাকেন। এইরূপে উক্ত বৃক্ষের শাখানিচয় লম্বমান লোষ্ট্রখণ্ডে সমাচ্ছাদিত।

দেবী বর্গভীমার ক্রোধ অতীব ভয়ানক বলিয়া ঐ অঞ্চলে সকলে বিদিত আছেন। পাছে কেহ তাঁহার কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হয়েন এই আশঙ্কা ঐ দেশবাসিদিগের হৃদয়ে সদাই জাগরিত। কথিত আছে যে, যে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ (বর্গী) নিম্ন বঙ্গদেশ লুণ্ঠনে পরিব্যাপ্ত ছিল,—এমন কি যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া ঐ নরপিশাচগণ গমন করিয়াছিল,—পথিমধ্যে সমৃদ্ধিশালী নগর, শান্তিপ্রিয় জনগণসমন্বিত গ্রাম, শ্যামল-শস্য-শোভিত ক্ষেত্র এবং ফল-কুসুম-শোভিত উদ্যান প্রভৃতি অগ্নিসংযোগে বিদগ্ধ ও বিনষ্ট করিতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। সেই হৃদয়বিহীন দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন তম্লুকে উপস্থিত হইল, তখন উক্ত স্থানের কোন প্রকার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, এমন কি ভয়ে ভীত হইয়া ভীমা দেবীর চরণে যোড়শোপচারে পূজা করিল এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিল।

আর একটি প্রবাদ সম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া আমরা ভীমাদেবী এবং তাঁহার মন্দির সম্বন্ধে বর্ণনা শেষ করিব। কথিত আছে যে, রূপনারায়ণ নদের জলপ্রবাহ অত্যন্ত ভীষণ বেগে বহিতে থাকিত, কিন্তু নদ-হৃদয়ে দেবী-ক্রোধ-ভীতি এতই প্রবল ছিল যে, মন্দিরসন্নিকটে এবং উহার নিম্নভাগে গমনকালে উহা অতি মৃদুভাবে নিঃশব্দে প্রবাহিত হইত। সময়ে সময়ে নদের জল মন্দিরের সীমা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিত। একদা ঐ জল দেবালয়ের প্রাকার হইতে দশ হস্তের মধ্যে উপস্থিত হয়;—দেখিয়া পুরোহিতগণ মন্দির পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু নদের জল আর বাড়িল না। নদের জল কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার অধিকার ছিল, কিন্তু ঐ সীমা অতিক্রম করিলেই দেবীর আজ্ঞানুসারে নদের বর্দ্ধিত জলরাশি দূরে প্রক্ষিপ্ত হইত। ফলে দেবালয়ের কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিত না।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

স্বয়ম্বরার বর।

মান্যবর শ্রীযুক্ত "প্রতিমা" সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়! আপনি বাগ্ মহাশয়ার বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া যে স্বয়ম্বরার সভা আহ্বান করিয়াছেন, সেই সভায় আমি উপস্থিত। বাগ্ মহাশয়াকে খবর দিবেন যে, সিংহ মহাশয় আসিয়াছেন। আর তাঁহাকে যদি আমার সম্যক্ পরিচয় দিতে হয় তবে বলিবেন :—

আমার নাম এচ্, কে, সিংহ। আমি পুরুষ মানুষ। পুরুষ মানুষ বলিয়া আমি এক জন সামান্য পুরুষ নই। আমার অনেক জ্ঞাতি-ভাইকে দেখিতে পাইবেন, তাহাদের কাছা আছে বটে, কিন্তু তাহারা কাছা দিয়াও মেয়ে মানুষের চৌদ্দপুরুষ। আমি ঘৃণায় সেই জন্য কাছা ত্যাগ করিয়া প্যাণ্টুলেন পরিয়াছি। হাজার গ্রীষ্ম হউক না কেন, হাজার গায়ের ঘামে দুর্গন্ধ হউক না কেন, তবু কখন সার্ট ও ফ্লানেলের ওভার-কোট ছাড়ি না। যদিও কোন কোন মুখফোঁড় লোকে আমায় ট্যাসের মামা বলিয়া ঠাট্টা করে বটে, তবুও আমি এমন হাল-পাতলা নই যে, সে কথায় টুপি ছাড়ি। আমি লেখাপড়া শিখিয়া সভ্য হইয়াছি। বাহিরে বেরুলেই চুরুট মুখে দিয়া সর্ব্বদা নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করি। হাতে দেড় হাত একগাছি বাঁশের ছড়ি। আমি একে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ সুশ্রী পুরুষ, তাহাতে দাড়ি রাখিয়াছি আর কোট প্যাণ্টুলন পরিয়াছি, আমার রূপের বাহার দেখে কে? ঘাড়ে চুল খুব কম আছে, কিন্তু সাম্‌নে বেশ সিঁথি-কাটা। তার উপর টুপি। কি বলিব আমি বাগ্ মহাশয়াকে সাক্ষাৎ রূপ দেখাইতে পারিলাম না, তাহলে আমাকে দেখিলেই তিনি নিশ্চয় ভুলিয়া যাইতেন। আমার বাপ মা আমাকে এই প্রকার রূপবান হইতে

শিখাইয়াছেন। তাঁহারা ছেলেবেলা হইতে আমাকে সাহেবি ধরণে সাজাইয়া আসিতেছেন। এখন টেলার সপের দৌলতে আর সাহেবি ধরণের চাল-চুল করিতে বেশি কষ্ট নাই। আমি আমার বাপ মার তরিবদে বেশ সাহেব হইয়া উঠিয়াছি। আর আমার ভগ্নী বেশ বিবি হইয়া উঠিয়াছেন। অতএব, আমার বনিয়াদ হইতে আমি সাহেব, আর আমার ভগ্নী বনিয়াদ হইতে বিবি।

আমার বাপ যে শুদ্ধ সাহেব হইতে শিখাইয়াছেন এমত নহে, আমাকে তিনি আবগারি মহলেরও অধিকারী হইতে শিখাইয়াছেন। তিনি ছেলেবেলা ইস্তকই আমাকে একটু একটু মদ খাওয়াইতে শিখাইয়াছেন। আমি, আমার মা, আমার ভগ্নী আমার বাপ আমরা সকলেই একত্রে বসিয়া মদ খাইতাম। আমার পৈতৃক সংস্কার এই, একটু একটু মদ না খাইলে শরীর ভাল থাকে না। আমি এই পৈতৃক সংস্কারবশতঃ শুদ্ধ যে বোতলে পরিপক্ব হইয়াছি এমত নহে, আবগারির কিছু বাকি রাখি নাই।

আমি বিলাতী সভ্যতায়ও পাকা। নমস্কার ও কোলাকুলির স্থানে ঘাড়-নাড়া ও সেকহ্যাণ্ড করিতে শিখিয়াছি। এমন কি বাপ মায়ের গায়ে হঠাৎ পা লাগিলে, আগে "বেগ ইয়র পার্ডন" করি। আমি এইরূপ শিষ্টাচারে এত অভ্যস্ত হইয়াছি যে, সে দিন বাড়ীতে আমাদের পৈতৃক গুরু আসিয়াছিলেন, তাঁহাকেও সেকহ্যাণ্ড করিয়া কেদারা বাড়াইয়া দিয়াছিলাম। আমার জেঠাতুত ভগ্নী দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখচুম্বন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া গাড়ী হইতে তাঁহাকে নামাইয়াছিলাম। এ সকল বিলাতী সভ্যতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। আমাকে কেহ অসভ্য বলিতে পারিবেন না। হায়! কবে আমাদের দেশের লোক সবাই এইরূপ শিষ্টাচার শিখিয়া প্রকৃত সভ্য নামের যোগ্য হইবে?

স্ত্রীলোকের আদর আমি বেশ জানি। এটি আমার পৈতৃক গুণ। আমি যে শুদ্ধ বিলাতী সভ্যতায় স্ত্রীর আদর শিখিয়াছি এমত নহে, আধুনিক শাস্ত্র ব্যাখ্যানুসারে শিখিয়াছি যে পত্নী হিন্দুর পরম দেবতা। অতএব বাগ্ মহাশয়া আমাকে শুদ্ধ বাহক হইতে কি বলেন, আমি তাঁহাকে হাতে ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইব, তাঁহাকে বিবি সাজাইব, তাঁহার গাউনের এক বস্তা কাপড় চোপড় ধরিয়া তাঁহাকে বসাইব। আর গৃহে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিব। তাঁহাকে কখন রাঁধিতে দিব না, যদি রাঁধুনীর এক দিন অসুখ বিসুখ হয়, বাজার হইতে খাবার আনাইয়া খাইব সেও ভাল, তবু হাঁড়ী ধরিতে বলিব না। আর তিনি আমার বাড়ীর কর্ত্রী হইয়া থাকিবেন। তাঁহাকে তেতালায় বসাইয়া রাখিব, বাড়ীতে এক বুড়া বিধবা পিশী আছেন, তাঁহাকে দিয়াই রাঁধাইব। না হয় একাদশীর দিন পিশীকে চারিটা পয়সা ফেলিয়া দিব। যদি বাগ্ মহাশয়ার শ্বশুর শাশুড়ীর সহিত বনিবনাও ভাল না হয়, তবে তাঁহাদিগকে শীঘ্র কাশী পাঠাইতে চেষ্টা দেখিব, না হয় তাঁহাকে লইয়া ভিন্ন হইব। তাঁহাদিগকে মাসে মাসে দুপাঁচ

টাকা খোরাকী দিলেই চলিবে। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিব। বাগ্ মহাশয়া আমার গৃহের দেবতা হইয়া তেতালায় আমার বাক্সের চাবিটা লইয়া বসিয়া থাকিবেন। এ সমস্ত আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি করিব, করিব, করিব। যদি না করি, আমি লায়ার। লায়ারের বাড়া আর গাল নাই। আমি রাজা দশরথের মত সত্য পালন করিব।

বাগ্ মহাশয়া বলিয়াছেন, আমি এক জন এম, এ, চাই। আমি এক রকমে এম, এ, বটি। কারণ, আমার এক দল বন্ধু বান্ধব আমাকে মা বলিয়া ডাকে, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেন আমাকে মা বলিয়া সম্বোধন কর। তাহারা বলিল, আমরা ভগবতীকে যেরূপ ভক্তি করি, তোমাকেও সেইরূপ ভক্তি করি, এই জন্য মা বলিয়া ডাকি। তবে, আমার এক ঝুড়ি দাড়ি আছে, বাগ্ মহাশয়া যদি সেই জন্য কোন আপত্তি না করেন, তবে এমন সুপাত্র আর পাইবেন না। বিবাহের দিন না হয় আমি গোঁপ দাড়ী ফেলিয়া যাইব।

আমি দুইখানি নাটক লিখিয়াছি, আর একখানা কাব্য ছাপাইয়াছি। নাটক দুইখানির নাম "বকাধার্ম্মিক" ও "বউদিদি"। কবিতাগ্রন্থের নাম "বেসুরে"। যে বাজারে কেবল উপরের চাকৃচিক্য দেখিয়া সব সামগ্রী বিক্রয় হয়, সে বাজারে যে আমার মজাড়ে নামের দুইএক খানি বই বিক্রয় না হইবে, এরূপ সম্ভাবনা নহে। এজন্য আমার বই কখানি নামেই বিক্রয় হইয়া যায়। কেনে, যত স্কুলের ছেলে, ডবকা বাবু, দোকানদার, মেয়েরা, যুবক ও যুবতীগণ। আমি ত বাজার বুঝি, সেইরূপ রসেই বই লিখি। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালা বই পড়ে, ঐরূপ লোকে। ঐরূপ লোকের রুচি অনুসারে বই না লিখিতে পারিলে সে বই বিক্রয় হয় না। আমার গলার এরূপ ডাক ডোক, আমি এত চেঁচাইতে পারি যে তাহা শুনিয়া রঙ্গভূমির সভ্যগণ আমাকে নাটকের নায়কের যোগ্য পাত্র বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন, আমি তজ্জন্য দুইবার রঙ্গভূমিতে নায়ক সাজিয়াছিলাম। সে সময় আমার বক্তৃতার ছটা দেখে কে? আমি অনেকবার সম্পাদকীয় কার্য্যও করিয়াছি। প্রতি বৈশাখে বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল কাগজ বৈশাখী বাচ্ছার মত বাহির হয়, আর দিন কয়েক পরে গা-ঢাকা দেয়, সেইরূপ অনেক কাগজের সম্পাদকীয় কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমার যে কলমের জোর কম, এমন বিবেচনা করিবেন না। কারণ, যে দেশ "বঙ্গদর্শন" "আর্য্যদর্শন" ও "বান্ধব"কে জাহান্নমে দিতে পারে, সে দেশে যে আমার কাগজও ডুবিয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি!

আমি অনেক বড় বড় সভার সভ্য বলিয়া বিখ্যাত। ফ্রান্সে "সেণ্ট জোসেপস্ বিধবা ফণ্ড" নামক যে সমিতি আছে, আমেরিকায় ক্রীতদাস দুঃখ মোচনের জন্য যে মহাসভা আছে, অষ্ট্রেলিয়ায় কুলির জন্য যে সভা আছে, সেই সমস্ত সভার আমি সভ্য। মধ্যে মধ্যে তাহাতে দান দিই। এই জন্য আমার নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। সেদিন রাজপৌত্রকে খানা

দিবার জন্য যে চাঁদা উঠে তাহাতেও আমি সাহায্য দান করিয়াছিলাম। ইংরাজমহলে আমার খুব নাম আছে। শীঘ্র একটা টাইটেল লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি।

আর গান বাজনার কথা কি বলিব! এখন গলিতে গলিতে যে এক একটা হরি-সভা নামধারী আড্ডা খুলিতেছে, তাহার কোন কোন সভার কোন কোন সভ্যেরা আমারই মন্ত্রশিষ্য। তাহারা আমার কাছে সুর লইতে আইসে. কেউ কেউ মৃদঙ্গ শিখিয়া যায়। আমার ভগ্নীকে আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পিয়ানোতে বিদ্যা-সুন্দর যাত্রার সুর শিখাই। পিয়ানো বাজিয়া উঠে :—

বিদ্যে লো তোর এ নব যৌবন গেল অকারণ!
ইত্যাদি।

এত গুণ ও এত সার্টিফিকেট আর কোন পাত্রে পাওয়া দুর্ল্লভ। আমার ডাকে যদি বাগ্ মহাশয়া না ভুলেন তবে তাঁহার বিবাহ হওয়া দুষ্কর। পূর্ব্বে আমার বাপ যখন আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগ করেন, তখন আমি বলিয়াছিলাম আমি এখন বিবাহ করিব না। মনে মনে করিতাম, আমার বিবাহে তাঁহারা কে? কই ছেলের বিবাহের জন্য যে জনক জননী পাত্রী নির্ব্বাচন করিবেন এমত বিধান ত কোন শাস্ত্রে নাই। অভিভাবকেরা কন্যাকে সৎপাত্রে দান করিবেন। ছেলের বিবাহ জন্য অভিভাবকদিগের ভাবনা কেন? আমার যেরূপ কন্যা মনোমত, তাঁহারা কিরূপে জানিবেন। আমি বাগ্ মহাশয়ার ন্যায় একটি কন্যা খুঁজিতেছিলাম। ভাগ্য-ক্রমে তিনি নিজেই দেখা দিয়াছেন। তিনিও যখন মনোমত পাত্র চান, আর আমিও যখন মনোমত পাত্রী চাই, তখন দেশাচারের মাথায় পদাঘাত করিয়া স্থির করুন, আমাদের পরস্পর পরীক্ষার কাল (যাহাকে ইংরাজীতে কোর্টসিপ বলে) কত দিন হইবে। তিনি যদি পাত্রকে বাজাইয়া লইতে চান, তবে কি পাত্রও তাঁহাকে বাজাইয়া লইবে না? আমাদের পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলেই বিবাহ হইবে।

আমাকে যদি বাগ্ মহাশয়া মনোনীত করেন, তবে আমি এই কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার পরীক্ষা লইতে চাই। তিনি ঘোড়া চড়িতে জানেন কি না? তিনি পশম বুনিতে জানেন কি না? তিনি গৃহস্থালী ও রন্ধা-কার্য্যে হস্তীমূর্খ কি না? তিনি ট্যাসের মেয়েদের মত নাকী সুরে চাকর বাকরকে ডাকিতে শিখিয়াছেন কি না? বাড়ীর কর্ত্তার অবর্ত্তমানে বাড়ীতে কোন ভদ্রলোক আসিলে, পর্দ্দার বা দুয়ারের আড়াল থেকে কথা কহিয়া এবং অর্দ্ধেক আবছাওয়ায় দেখা দিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বসা-ইয়া রাখিতে পারিবেন কি না? কোন্দল ঝগড়া করিয়া চাকর চাকরাণীদিগকে মাসে মাসে তাড়াইতে পারিবেন কি না? পুরুষ-বেশ ধরিয়া আমার সঙ্গে সারকসে এবং থিয়েটারে যাইতে পারিবেন কি না? এবং সর্ব্বশেষে আমি জানিতে চাহি তিনি আমার সঙ্গে মদ খাইতে পারিবেন কি না? এই সমস্ত পরীক্ষায় তিনি যদি উত্তীর্ণা হয়েন, তবে আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিবাহ করিব।

আমার কুলগৌরব দেখিতে হইবে না।

স্বয়ং ব্রহ্মার কায়া থেকে যিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, আমি তাঁহারই বংশজ। অতএব, কুলে, শীলে, মানে, আমার মত পাত্র পাওয়া দুর্ল্লভ। এচ্, কে, সিংহ।

বিবাহের দরখাস্ত।

মহামহিমাময়ী শ্রীযুতা শ্রীকিরণশশী বাগ্ মহাশয়া —

গুজরতে মান্যবর শ্রীযুক্ত "প্রতিমা" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—

লিখিতং শ্রীপদ্মলোচন পোদ্দ, পিতা ৺ রামলোচন চক্রবর্ত্তী, জাতি বাঙ্গালী, হালসাকিম চুণোগলি, পেশা কোর্টসিপ, কস্য বিবাহের দরখাস্তপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে।

আমি এক জন বিবাহের উমেদার। পাত্রীর তল্লাসে পথে পথে ফিরিতেছি। পাকাপাকি এপর্য্যন্ত কোথাও হয় নাই। যাচাই করিয়া অনেক স্থলে দরে বনে নাই, কষ্টির ঘর্ষণে পাকা সোনাগুলাও কেমন তামা হইয়া দাঁড়ায়। এখন "প্রতিমার" কল্যাণে বাগ্ মহাশয়াকে বাগ মানাইতে পারিলেই আমার আইবুড় নামের অবসান হয়। বাগ্ মহাশয়ার পাত্রাভাব, আমারও একটি সুপাত্রীর দরকার। সুতরাং আমি হই হেলে গরু, আর তিনি হন বীজ ধান। এখন ভবিতব্যতা উভয়ের সংযোজন করিয়া দিলে পরস্পারের অভাব পুরণ হইয়া যায়। অতএব আমি নিয়মিতরূপে উমেদারী স্বীকার করিয়া, বাগ্ মহাশয়ার নিকট নিম্নে আমার গুণাগুণাদির পরিচয় প্রদান করিতেছি।

এম, এ, আমার পাশ করা হইয়াছে। এম, এ, মে, যেদিন পড়িয়াছি, সেই দিন হইতেই উহার অর্থ বুঝিয়াছি। ওটা কেবল বানান শিখিবার জন্য একটা শব্দাংশ মাত্র। আসল কথা যে 'মে' (may) তাহার অর্থ "পারা"। সর্ব্ববিষয়ে পারগতা যার আছে, সেই যেন বিবাহ করে। আর সংস্কৃত "মে" শব্দের অর্থ "আমার।" এই "আমার" কথাটাও বিবাহে বিশেষ প্রয়োজন; নিজদ্রব্য পরদ্রব্য, সর্ব্বস্বই আমার ভাবিয়া গৃহিণীর পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে হইবে। আর ভাবিতে হইবে যে এই পৃথিবীতে,—এই লোকালয়পূর্ণ সংসারধামে কেবল দুইটি মাত্র জীব আছে—আমি ও আমার গৃহিণী। আমাদের জন্যই সব, আমাদের জন্যই সংসার, আমাদের জন্যই বিশ্ববিধাতার এই বিচিত্র সৃষ্টিলীলা। ইংরাজী মতে এম্, এ শব্দের আর একটা ব্যুৎপত্তি আছে—মাষ্টার অফ্ আর্টস্। উহার অর্থ শিল্প সকলের শিক্ষক। ইহা অতি সহজ কথা। শিখি আর না শিখি, নানাবিধ শিল্প সকল অনায়াসে আমি শিখাইতে পারি। কোন কিছু শিখাইতে হইলেই যে, নিজে তাহা শিখিতে হইবে, ব্যবহার-জগতে এরূপ কুনিয়ম আজ কাল আর প্রচলিত নাই। বেদপাঠ না করিলে যে বৈদিক হওয়া যায় না, ব্যাকরণ না জানিলে যে পণ্ডিত হওয়া যায় না, লেখা পড়া না জানিলে যে গ্রন্থ রচনা করা যায় না, এর

প্রাচীন কুসংস্কার, সৌভাগ্যবলেই এদেশ হইতে অনেককাল উঠিয়া গিয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। চুরী একটা শিল্পবিদ্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিদ্যা শিখান হয় কি না জানি না; কিন্তু না শিখিয়া কি উহার চর্চ্চা করা যায় না? কলেজে না শিখিলেও, লেখক ও গ্রন্থকার মহাশয়েরা নিজ নিজ রচনামধ্যে এ বিদ্যার পরিচয় প্রদান করেন কিরূপে? তবে শিখিলে না হয় একটু পাকা, না শিখিলে না হয় একটু কাঁচা হইবে, এইমাত্র প্রভেদ। কিন্তু বাগ্ মহাশয়া কাঁচা পাকার কোন তারতম্য করেন নাই। কেবল মাত্র এম, এ, পাশ চাহিয়াছেন মাত্র। সে সার্টিফিকেট আমি অনায়াসে দেখাইতে পারিব।

বয়ঃক্রম আমার কত তাহার ঠিক হিসাব রাখি না, ঠিকুজী কুষ্ঠীও নাই। বয়স্‌টা আজ কাল বড় বিবাদের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বিবাদের জিনিস ঘরে না রাখাই ভাল। পরীক্ষায় বয়স লইয়া টানা-টানি, চাকুরী ধরিতে ও চাকুরী ছাড়িতেও বয়স লইয়া মারামারি, আবার বিবাহেও বয়সের এত বাঁধুনী। তা হউক, সে বাঁধু-নিতে আমার বিবাহ কেহ বাধাইতে পারিবে না। বাগ্ মহাশয়া চান বাইশ। আমার বয়স যতই হউক, চেহারার এমনি বাঁধুনী, গঠনের এমনি গাঁথুনী, রঙ্গের এমনি আভা, রূপের এমনি প্রভা যে লোকে দেখিলে হঠাৎ বা!-ইস্! বলিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারে না। বল আমার সব রকমই আছে—বাহুবল বুদ্ধিবল, হৃদয়বল পৃষ্ঠবল, মাথার বল পায়ের বল, কোন বলেরই অভাব আমার নাই। বাহুবলের পরিচয় আমার আহারে, এবং চরণবলের পরিচয় আমার স্বভয়বিহারে পাইবেন। বুকের বল আমার যথেষ্ট, বুকে বসিয়া দাড়ি তুলিলেও অনা-য়াসে তাহাকে বুকে ধরিয়া রাখিতে পারি। পৃষ্ঠদেশের সহিষ্ণুতা ততোধিক, কুসুম-কোমলার চরণতল হইতে মৎস্যবিশেষের পুচ্ছপ্রহার পর্য্যন্ত যাহা দিয়া হউক, পরীক্ষা করিয়া লইবেন। মাথার বলের কথা আর কি বলিব? মাথায় সকল বোঝাই বহিতে পারি—তা হ্যাট পুচুনীই হউক, আর কলঙ্কের বোঝাই হউক, বোঝার ব্যাপারে আমার মাথা যেমন, এমনটি আর কাহারও নাই। বুদ্ধিখানিও আমার মাথারই অনুরূপ; মাথার কথা যখন বলিয়াছি, বুদ্ধির বিষয় তখন আর স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। গোঁপ দাড়ি আমার উঠিয়াছে বটে, কিন্তু গজায় নাই, লতায় নাই। ছাঁটুনির গুণে ইডেন বাগানের কেয়ারি-করা চারাগাছ পরাজিত হয়।

জিম্‌নাষ্টিক্ আমি বাল্যকালে যথেষ্ট করিয়াছি। হাতে খড়ি হইতেই কত কস্-লতের সুরু হইয়াছে। পাঠশালে ইঁটে-খাড়া, স্কুলে বেঞ্চে খাড়া, আমায় দুবেলাই অভ্যাস করিতে হইত। ঘোড়া আমি চড়িতে পারি, তা যতই ছুট্‌ক না কেন, কিন্তু কদমে চলা চাই; বেতালা চলিলে আমি বেটক্করে হোঁচোট খাইয়া মারা পড়িব। গাড়ীর মোশনে উঠিতে নামিতে খুব পারি, নামা উঠা আমার বেশ অভ্যাস আছে। সুইচ্-ব্যাক রেলে কতবার চড়িয়াছি, শিহরিয়া কখনও কাহাকে জড়াইয়া ধরি নাই। গদ্য

পদ্য গ্রন্থ আমার তিন দশে ত্রিশখানা আছে; উহার কোনখানাই সাফ্ গদ্য বা খাঁটি পদ্য নহে, সকলই গদ্য-পদ্যময়। থিয়েটারের এই নূতন ছাঁদ্ আমি বেশ সাধিয়া লইয়াছি। থিয়েটারে আমি অনেকবার সাজিয়াছি, হনূমান হইতে হোঁদলকুৎকুতে পর্য্যন্ত অনেক সাজই সাজা হইয়াছে। শেষ রাইরাজা নাটকের রাইরাজা সাজিয়া নায়কের চরিত্রও আমা কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে। মাদকতা-বিবর্দ্ধিনী সভার আমি মেম্বর, এবং সেই সভাতেই;—মদ না খাইলে যে গ্রন্থ লেখা যায় না,—এই কথা ইউরোপ আমেরিকা এবং ভারতবর্ষীয় বঙ্গদেশের গ্রন্থকারগণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণ করিয়া, একটি অতি সারগর্ভ সুদীর্ঘ হৃদয়বিদারিণী বক্তৃতায় প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছি। হারমোনিয়ামে আমার বেশ হাত আছে, সুরে সুর মিলাইতে আমি খুব পারি। ঢোলক তবলায় চৌদুঁদ্ পরদুঁদ্ আমি বেশ বাজাইতে পারি; সঙ্গতে আমি সিদ্ধহস্ত, কিন্তু আড় গাইলে আমি হাল ছাড়িয়া দিব। দোয়ারের জন্য বাগ্ মহাশয়াকে ভাবিতে হইবে না। আমি থাকিতে তাঁর গানের দোয়ার পানের দোয়ার আর কোথাও খুঁজিতে হইবে না। সানাইয়ের পোঁ ধরিতে বলিলেও আমি তাহাতেও পেছপাও নহি।

পাকপ্রণালীতে আমি বড় পাকা পোক্ত। সে পরীক্ষা হাতে হাতে না লইয়া ছাড়িবেন কেন? গাজনতলায় চড়কগাছে পিঠ ফুড়িয়া আমি "দে পাক্ দে পাক্" করিয়া কত পাক খাইয়াছি, আর সাত পাকের সময় পিছাইব কি? সাত পাক্ কেন, সাত সাত্তে উনপঞ্চাশ পাকের প্রণালী আমি পরীক্ষাস্থলে একে একে দেখাইয়া দিব। উনপঞ্চাশ বায়ু আমার দেহে সদা বিরাজমান। মান অভিমান আমার কোন কিছুতেই নাই। ঝাঁটা আমার অঙ্গের ভূষণ, আর বাগ্ মহাশয়া চোক্ রাঙ্গানীর কথা যে বলিয়াছেন, সে ত আমার সাধের সামগ্রী। শ্রীমুখের রাঙ্গা চক্ষের চঞ্চল চাহনি আমার এই ভাঙ্গে-ঢুলু-ঢুলু রক্তিম লোচনের সহিত মিশিয়া যে মাধুরী বিকাশ করিবে, তাহার বর্ণনা আধুনিক কবির কর্ম্ম নয়, সে জন্য অন্ততঃ রায়গুণাকরের পায়ে আবার শরণাপন্ন হইতে হয়। আফগারীর পরীক্ষার বাগ্ মহাশয়া আমাকে কিছুতেই পারিবেন না। আমি যে সভার উপযুক্ত মেম্বর, তাহার পরিচয় ইত্যগ্রেই দিয়াছি। আমার বৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা সচ্ছন্দে লইতে পারেন। সদ্বৃত্তি অসদ্ বৃত্তি সকল বৃত্তির পরীক্ষাই লইবেন। মোটের উপর জড় করিয়া এক একটি বৃত্তির এক এক নম্বর দিলেও বৃত্তির পরীক্ষায় আমি অনায়াসে পাস হইয়া যাইব। বৃত্তি আমার প্রায় সকলই দেখিতে পাইবেন, পাইবেন না কেবল ছাত্রবৃত্তি। সেরূপ উঞ্ছবৃত্তি বোধ হয় বাগ্ মহাশয়া চাহেন না। গাড়ী আমি জুড়ি চৌঘুড়ী সবই হাঁকাইতে পারি; নৌকা বানের মুখেও চালাইতে পারি,—ভাউলে পান্সী ভড় যাহা দাও, তাহাতেই রাজী। গাছে উঠিতেও আমি বিলক্ষণ পটু; বাগ্ মহাশয়া যদি ডালে ডালে যান, আমি তাঁহার উপর পাতায় পাতায় পা দিয়া বেড়াইব। প্রাচীর লঙ্ঘন আমার

অনেক কাল হইয়াছে। হিন্দুসমাজের সেই সেকেলে উঁচু দেওয়ালটা যখন এক লাফে টপ্‌কাইয়াছি, তখন আর কোন প্রাচীরে আমি ডরাই কি? লম্ফনে তেতালা কেন, লম্ফনে সাগর পার হইয়া, শ্বেতদ্বীপে সঞ্চরণ করিয়া আসিয়াছি। দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তা গোরা কালা সকলকেই পারি। বাগ্ মহাশয়া স্বয়ং দেখিয়া লইবেন। গ্রন্থের ব্যাখ্যা চারি রকম কেন, পাঁচ রকম আমি করিতে পারি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও বৈজ্ঞানিক এই চারি রকম ছাড়া বায়বিক ব্যাখ্যা এখন এক রকম বাহির হইয়াছে, তাহার প্রণালী পরীক্ষা-স্থলে আমি দেখাইয়া দিতে পারি।

বাগ্ মহাশয়াকে মাসিক বরাদ্দ একটা করিয়া দিতে হইবে। আর আমি যে দিন দিন দশটা পাঁচটা হাজির থাকিব, তাহার বেতন কি পাইব? দেনা পাওনা উভয়ে গায়ে গায়ে শোধ যাইবে না কি? আমি দেনা হই, অবশ্য খৎ দিব,—দশ হাত মাপিয়া নাকে খৎ দিব। টাকা কড়িতে আমার হাত অবশ্যই থাকিবে না;—উপায় তাঁহার, আমি নিমিত্ত মাত্র থাকিব। আমার খোরাকি তাঁহার খেয়ালমত দুবেলা দুমুঠা দিবেন, তবে জল-খাবারটাও যেন বাদ না যায়। ক্ষীর ছানা না হয়, ছাগল-ছানা বা পাখীর ছানা হইলেও চলিবে। তাও না হয়, নারিকেল-মুড়িও ত পাইতে পারি। আর এক কথা; দিনের বেলা দশটা পাঁচটা ত হাজির থাকিব, রাত্রে কোথা যাই? বুঝিলাম না হয়, "দিনে ভাগ, রাত্রে ঠিকে।"—কিন্তু রাত্রে কোন দিন যদি ঠিকে কাজ করিতেই হয়, আমায় ওভার-চার্জ্জ ধরিয়া দিতে হইবে। কোন নিয়মেরই অন্যথা আমি করিব না; আশা করি, আমার উপরও অনিয়ম কিছু হইবে না। বাজে কথা আমি কহিব না, কাজেও কখন কামাই করিব না। অতিরিক্ত আমি চাহিব না, শ্রীমতীর ডাকে ডাকে ঠিক হাজির থাকিব। তাঁহার গরজ না হইলে আমি ঘরে ঢুকিতেও চাহিব না। সম্বন্ধ-ত্যাগের নিয়ম আইনেই আছে, বলা বাহুল্য মাত্র।

আমি ব্রাহ্মণতনয়, কিন্তু পৈতা আমার কখনই নাই। বিবাহ আমার নিজের নাই, আমার পিতারও কখন ছিল না। য়্যাপ্রেণ্টিস্ বাঙ্গালীর ছেলে খাটিতে না পারিব কেন? অতএব অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনীয় যে বাগ্ মহাশয়া আমার রীতিমত পরীক্ষা গ্রহণান্তর আমাকে তদীয় পতিপদের শিক্ষা-নবিশীতে নিযুক্ত করিবার হুকুম আজ্ঞা প্রদান করেন; আমার কার্য্যদক্ষতায় তিনি সর্ব্বাংশে সন্তুষ্ট হইবেন, তত্র সন্দেহো নাস্তি

শ্রীপদ্মলোচন পোদ্।

প্রাচীন ভারতে কৃষিবিদ্যা।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল কৃষি গোরক্ষা প্রভৃতি বিষয় লইয়া ভারতবর্ষে সুমহান্ আন্দোলন চলিতেছে। ভারতবর্ষ কৃষি-জীবির দেশ, সুতরাং এখানে এরূপ আন্দোলন যত হয় ততই ভাল বলিতে হইবে। কৃষির কথা বলিলেই স্বভাবতঃ ভূমি, শস্য-

রক্ষা, গোপালন, কর্ষক, ভূমিপতি, রাজা, তাঁহাদের ভূমিগত স্বত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ের কথা মনে হয়; এবং প্রাচীন ভারতবর্ষেই বা ঐ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদিগের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল তাহা জানিতে ঔৎসুক্য হয়। অদ্যকার প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে সেই ঔৎসুক্য বিনোদন করিতে চেষ্টা করিব। কৃষি লোকযাত্রার মূল ও সভ্যতার নিদান ও অনুমাপক, শিল্প বাণিজ্যাদি সমস্তই কৃষিতন্ত্র। সুতরাং সমস্ত সভ্য দেশেই অতি প্রাচীন কাল হইতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিষয়ে চেষ্টা অবলম্বিত হইয়াছিল। ভারত অতি প্রাচীন সভ্যদেশ, সুতরাং এদেশে যে অতি প্রাচীনকাল হইতে লোকে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এদেশের,—বোধ হয় সমস্ত জগতের, প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত ঋগ্বেদে, তদানীন্তন কৃষিবিদ্যার ভূয়িষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ বেদের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৭ সূক্তটী (সূক্ত পদে ঋকসমষ্টি বুঝায়) নিরবচ্ছিন্ন কৃষিবিষয়ক কথায় পরিপূর্ণ। প্রমাণের নিমিত্ত কয়েকটী ঋক্ সানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থমণ্ডল ৫৭ সূক্ত ১ম্ ঋক্—

ক্ষেত্রস্য পতিনাবয়ং হিতেনেব জয়ামসি।
গামশ্বং পোষয়িত্বা সনো মৃলাতি দৃশে॥

আমরা বন্ধুসদৃশ ক্ষেত্রপতি (রুদ্রের) সাহায্যে ক্ষেত্র জয় করিব। তিনি আমাদিগের গো অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন; কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করেন।

৪র্থ ঋক্—শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলং
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাম্ শুনমষ্ট্রামুদিঙ্গয়॥

বাহগণ সুখে বহন করুক, কর্ষকগণ সুখে কার্য্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক, প্রগ্রহসমূহ সুখে বদ্ধ হউক এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর।

শুনং নঃ ফালা বিকৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভিযন্তু বাহৈঃ। শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মা সুধত্তং॥

ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দ্দের সহিত সুখে গমন করুক, পর্জন্য মধুর জলধারা (পৃথিবী সিক্ত করুন) হে ইন্দ্র! হে বায়ু! তোমরা আমাদিগকে ধন বা সুখ প্রদান কর।[১]

ভারতবর্ষে অনেক স্থলে নদ্যম্বু দ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিবার সুবিধা থাকিলেও ইহা প্রধানতঃ দেবমাতৃক দেশ, সুতরাং বৈদিক ঋষিগণ যে পর্জন্যের মধুর জলপ্রার্থনায় রুদ্রদেবের উপাসনা করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি? ঋগ্বেদে চর্ষণী[২] ও কৃষ্টি[৩] এই দুইটী মনুষ্যবাচক শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটী শব্দই কর্ষণার্থ কৃষ্ ধাতু হইবে উৎপন্ন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে অতি পূর্ব্বকালে ভূকর্ষণ মনুষ্যের অতি প্রধানতম কার্য্য

১ অনুবাদাংশ স্থানে স্থানে রমেশ বাবুর কৃত বেদের বঙ্গানুবাদ হইতে গৃহীত। সায়ণাচার্য্যের টীকা আপাততঃ সম্মুখে না থাকায় অনুবাদ কতদূর শুদ্ধ হইয়াছে বলিতে পারিতেছি না।

২ ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বে দেবাস আগত। ১ম অধ্যায় তৃতীয় সূক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতেও এক স্থানে চর্ষণী শব্দের প্রয়োগ আছে।

৩ উতনঃ সুতপাঃ অগ্নিবেদিচন্ বন কৃষ্টয়ঃ। ঐ চতুর্থ সূক্ত।

বলিয়া বিবেচিত হইত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করিলে আর্য্য শব্দ হইতেও উপরিউক্ত অনুমানের সামগ্রী পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান কালে এদেশে কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত লাঙ্গলাদি যে সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার আছে ঋগ্বেদে তৎসমস্তেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রৈহেয়, যব্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শস্যোৎপাদনোপযোগী ক্ষেত্রের নাম, জলসেচনার্থ এখনকার মত কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি সমস্তেরই উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ান্তরে এ বিষয়ের প্রমাণ উদ্ধার করিব এরূপ কল্পনা রহিল। চতুর্গব (চারিটি বলীবর্দ্দযোজিত) হলের উল্লেখও বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভূমির কাঠিন্যবশতঃ বোধ হয় পূর্ব্বে চতুর্গব হলের ব্যবহার ছিল। এখন বক্তব্য এই যে বঙ্গ প্রভৃতি কোমল মৃত্তিকার দেশে দ্বিগব হলের ব্যবহার থাকিলেও ঐ ব্যবহার কোন মতেই শাস্ত্রানুমোদিত নহে। শাস্ত্রকারদিগের মতে গোভক্ষকেরাই দ্বিগব হল ব্যবহার করে। তাঁহারা বলেন যে অষ্টগব হলই ধর্ম্ম্য অর্থাৎ ধর্ম্মানুমোদিত; ব্যবসায়িরা ষড়্‌গব হল ব্যবহার করে; অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি চতুর্গব হল ও গোভক্ষকেরা দ্বিগব হল দ্বারা কৃষিকার্য্য করে।

হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্‌গবং ব্যবসায়িনাং।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ গবাশিনাং॥

বঙ্গদেশ সম্প্রতি গবাশির (গো-ভক্ষকের) দেশ হইয়াছে সুতরাং এদেশে যে দ্বিগব হলের ব্যবহার হইবে তাহা কোন মতেই আশ্চর্য্যজনক নহে। প্রকৃত পক্ষে বোধ হয় অতি কোমল মৃত্তিকার দেশ বলিয়া এদেশে দ্বিগব হলের ব্যবহার হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে, কর্ণাট ও তৎসমীপস্থ প্রদেশে কিন্তু [illegible]দশ হইতে ষোড়শ-বলীবর্দ্দযুক্ত হলের ব্যবহার আছে। ঐ সমস্ত দেশে নূতন ভূমিতে চাষ করিবার সময় প্রথম বার বৎসর ঐরূপ হলদ্বারা ভূকর্ষণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। বোধ হয় ঋষিগণ ভূমির কাঠিন্যের তারতম্য বিবেচনায় ও বলীবর্দ্দগণের ক্লেশলাঘবেচ্ছায় অষ্টগব হলকে অবিশেষে সর্ব্বত্র ধর্ম্ম্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা গোরক্ষা, গোপালন, ইত্যাদি বিষয়ে কতদূর যত্ন করিতেন তাহা পরে উল্লিখিত হইবে।

এস্থলে আমরা আর একটী বিষয়ের অবতারণা করিব। ভূমি না থাকিলে কৃষিকার্য্য হয় না। সেই ভূমিতে আবার সাধারণতঃ রাজা, ভূস্বামী ও কর্ষক (Ryot) এই তিনের সমষ্টি বা ব্যষ্টিভাবে স্বত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্বত্ব লোকব্যবহারসিদ্ধ এবং করগ্রহণ ও ভোগলাভাদির দ্বারা অনুমেয়। অর্থাৎ, রাজা করগ্রহণ করেন সুতরাং তাঁহার স্বরাজ্যান্তর্গত ভূমিতে স্বত্ব আছে বলিয়া অনুমিত হয়। সেইরূপ ভূমিপতি ও কর্ষকের স্বত্বভোগ ও যথেষ্ট বিনিময়াদি ক্রিয়া পরম্পরা দ্বারা সিদ্ধ। সম্প্রতি কয়েক বৎসর অতীত হইল বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক বিধি প্রণয়নের সময় এই বিষয় লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হয়। কেহ কেহ বলেন ভূমিতে রাজারই স্বত্ব, ভূম্যধিকারী ও কর্ষকের স্বত্ব রাজ-স্বত্বমূলক। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমান ভূম্যধিকারীগণ কেহই নহেন, ভূমিতে কেবল

রাজা ও কর্ষকের স্বত্ব আছে। এ বিষয়ে আমরা নিজের মতপ্রকাশ না করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের মতপ্রদান করিতে চেষ্টা করিব। নারদস্মৃতির মতে রাজা প্রজাদিগের নিকট হইতে যে কর গ্রহণ করেন তাহা প্রজাপালনের বেতনস্বরূপ 'প্রজাপালনবেতনং,' নতুবা ভূমিতে স্বত্বমূলক নহে। মীমাংসা-দর্শনকার ভগবান জৈমিনিরও এই মত। তিনি স্বকৃত দর্শনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তমপাদের ২য় সূত্রে বিশ্বজিৎ-যজ্ঞে ভূমি দান করা যাইতে পারে কি না এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। বিশ্বজিৎ যজ্ঞটী সর্ব্বস্বদক্ষিণ, অর্থাৎ এই যাগকর্ত্তাকে তাঁহার 'সর্ব্বস্ব' দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে হয়।[৪] পূর্ব্বে সূর্য্যবংশাবতংস রঘু রাজা এই যজ্ঞে পৃথিবীজয়লব্ধ সমস্ত ঐশ্বর্য্য মৃৎপাত্রশেষ করিয়াছিলেন।[৫] এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, যদি ঐরূপ যাগকর্ত্তা সম্রাট বা রাজা হন তাহা হইলে তাঁহারা নিজের অধিকারভুক্ত সমস্ত পৃথিবী ঐ যাগোপলক্ষে দান করিতে পারিবেন কি না। ইহার উত্তরে জৈমিনি বলেন ভূমি কাহারও নহে, সুতরাং বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সার্ব্বভৌম (Emperor) মহাপৃথিবী ও মাণ্ডলিক (মণ্ডলেশ্বর রাজা) তাঁহার মণ্ডল দান করিতে পারিবেন না। তাঁহার মতে রাজ্য শব্দের অর্থ স্বাধিকৃত বিষয় পরিপালন ও দস্যু তস্করাদি কণ্টকের উদ্ধরণ; উহা কর্ষকাদির নিকট করাদান ও দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ডদান এই সম্বন্ধ মাত্রবোধক, স্বামিত্ববোধক নহে।[৬] অর্থাৎ রাজা স্ববিষয় পরিপালন ও দস্যু তস্করাদির উদ্ধরণ করেন বলিয়া কর্ষকাদির নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন, নতুবা ঐ কর গ্রহণ ভূমিতে স্বামিত্বমূলক নহে; কারণ **ভূমি কাহারও নহে, উহা সকলের পক্ষে সমান**[৭]। অতএব দেখা যাইতেছে যে জৈমিনি ও নারদের মতে রাজার বা অন্য কোন ব্যক্তিরই ভূমিতে স্বেতর-ব্যবচ্ছেদক স্বত্ব (exclusive right) নাই। ভগবান মনুর মত কিন্তু আপাততঃ ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ের এক স্থলে ব্যবস্থা আছে যে যদি কোন ভূমিতে আকর আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলে আকরোৎপন্ন দ্রব্যের কিয়দংশ রাজগামী হইবে, কারণ রাজা ভূমির অধিপতি "ভূমেরধিপতির্হিসঃ"। এস্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে মনু কোন চিরপ্রচলিত ব্যবহারের উপপত্তি-মুখে 'ভূমেরধিপতির্হিসঃ' এই কথা বলিয়াছেন, ভূমিস্বত্ব বিষয়ক বিচারপ্রসঙ্গে বলেন নাই; সুতরাং তাঁহার সহিত জৈমিনি ও নারদের বাস্তবিক বিরোধ নাই এরূপ মীমাংসা করা বোধ হয় অন্যায় নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

---

৪ বিশ্বজিতি সর্ব্বস্বং দদাতীতি শ্রুতেঃ।

৫ "চতুর্দিগাবর্জ্জিতসম্ভৃতাং যঃ মৃৎপাত্রশেষাকরোৎ বিভূতিং।" রঘুবংশ।

৬ রাজ্যং হি স্ববিষয়পরিপালনকণ্টকোদ্ধরণবৃত্তিত্বেন কর্ষকাদিভ্যঃ করাদানং দণ্ড্যেভ্যশ্চ দণ্ডাদানং ইতি এতাবান্ সম্বন্ধ ন স্বামিত্বমতো ন সার্ব্বভৌমো মহাপৃথিবীং দদ্যাৎ মাণ্ডলিকশ্চ মণ্ডলং।

৭ ন ভূমিঃ স্যাৎ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ। মীমাংসা দর্শন, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৭ম পাদ, ২ সূত্র।

বিদায় ।

আকাশে একটি তারা অনিমিখ চায়,
সপ্তমীর চাঁদ ডুবে মেঘের ছায়ায় ।
সজল করুণ আঁখি,
সজল নয়নে রাখি,
নীরব তটিনী তীরে মাগিল বিদায় ।

নীরবে বহিতেছিল রজনী-সমীর,
কুলু কুলু নদীজলে ভেঙ্গে পড়ে তীর ।
কুসুম সুবাসে সারা,
পাপিয়াটি আত্মহারা,
তার সে বিলাপ গীতে পরাণ অধীর ।

সেই তটিনীর তীরে ক্ষীণ জ্যোছনায়,
অবশ মুগধ দোঁহে দোঁহা পানে চায় ।
তার পর হাত ধরে,
মুখ পানে চেয়ে ধীরে,
চলে গেল কোথায় সে লইয়া বিদায় ।

রমণী আকুল হয়ে চেয়ে পথ পানে,
অজানা দুইটি অশ্রু ঝরিল নয়ানে ।
একেলা সে পথহারা,
ডুবে গেল শুকতারা,
ডুবে গেল কোন্‌খানে কোথায় কে জানে ?

শ্রীসরোজকুমারী দেবী ।

মধ্যাহ্ন ।

কোথায় বকুলতলে নীরব বিপিনে,
কাঁদিছে আপনা ভুলে এলোকেশী মেয়ে ;
মধ্যাহ্নের সুশীতল উদাস সমীরে,
রবির অলস ছায়ে কার পথ চেয়ে ।

ঘুঘুঘু মধুর স্বন কাঁদিছে বিনায়,
হিয়ায় লুকান ব্যথা দেখান না যায়,
কাঁপিছে পরশে কার শ্যাম দুর্ব্বা হায়,
নীরবে ঝরিছে ফুল বকুল তলায়।

মর্ম্মে গাঁথা অশরীরী বীণার ঝঙ্কার,
স্ফটিক অম্বরতলে কে বেঁধেছে আজ?
ধরায় গগনে তাই রুণন সলাজ
সে রাঙ্গা চরণবিভা করিছে বিথার।
পথ চেয়ে বুক পেতে কাটে নিশিযামি,
কোথা তুমি এলোকেশী হেথায় যে আমি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

গান।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

সে কেন এমন হলো!
আশাপথ চেয়ে, থাকিত বসিয়ে,
আশার বাসা আজি ভাঙ্গিল॥
কত দুখে হলো দেখা, সাধিয়ে না গেল রাখা,
তার কাজ মুখ রাখা, প্রাণ রাখা নহেত লো।
সে মুখ দেখিনু চেয়ে, দেখিনু লো মাথা খেয়ে,
আমি চাই, সে আমায় আর নাহি চাহেত লো॥
কাঁদিলাম শতধারে, সে রহিল মুখ ফিরে,
চকিতে নেহারি মোরে উপহাসে হাসিল।
বুঝিনু তাহার ধারা, সরলে গরল ভরা,
কালকূট দিয়ে বিধি আমারে বধিল॥

বেহাগ—একতালা।

পরাণ হেরিতে চায় তারে,
মনে কি আছে তার, আমারে ?
পদে সে ঠ্যালে সদা, তবু প্রাণ বাঁধা
রহিয়াছে তার চরণে ;
এত করি, ভুলিতে নারি তাহারে ॥
তবু কেন মন, চাহে অনুক্ষণ
যে জন মোরে, করিয়াছে, হায় !
অপমান বারে বারে।
অবোধ মনে বুঝালে পরে,
কোনও মতে বুঝে না রে ॥

আলিয়া—মধ্যমান।

কেন মিছে বহ প্রেমভার !
ত্যজিলে ত্যজিতে পার,
দুখ ঘুচিবে তোমার ॥
যখন আপনি আসিতে, অভাগীরে দেখিতে,
সে দিন গিয়েছে আমার !

এখন, যদি ত্যজি সুখী হবে,
তাই শুনে প্রাণ জুড়াবে,
না হয় অভাগিনীর হবে,
দুখ যা হবার ॥

সমালোচন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা। ১ম ভাগ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এল্, এম্, এস্ প্রণীত। বাঙ্গালা গ্রন্থের আজকাল বড়ই বিড়ম্বনা হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার সাহিত্যরাজ্যে এখন ঘোরতর অরাজকতা বিরাজ করিতেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতার সীমা নাই। যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করিতেছেন। বিচার নাই, শাসন নাই, বন্ধন নাই। যিনি যাহা বুঝেন না, তিনি তাহাই পাঠবর্গকে বুঝাইতে অগ্রসর। কাব্য কাহাকে বলে যিনি কখন মনে মনেও এ কথা একবার চিন্তা করেন নাই, তিনিও অনায়াসে সহস্রপাতা কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া বিজ্ঞাপনের বাহারে বাজারে আপনার নাম জাহির করিতেছেন। কোন্ কোন্ উপকরণ লইয়া নাটক হয়, এ কথা স্বপ্নেও যাঁহার মনে উদয় হয় নাই, তিনি এক টাকা মাত্র মূল্যের ঝুড়ি ঝুড়ি নাটক লিখিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মাথা খাইয়া বন্ধুমহলে মাথা নাড়িয়া আপনার পসার জাঁকাইয়া বেড়াইতেছেন। ছন্দ অলঙ্কার বা ভাবসমাবেশের কোন ধারই যিনি ধারেন না, তিনিও অনর্গল ছড়া কাটিয়া কবিতা-গ্রন্থ প্রচার করিতেছেন। থিয়েটারের কাঁদুনীকেই গান বলিয়া যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনিও কতকগুলা কথা সাজাইয়া সঙ্গীত বলিয়া এখনকার এই গদ্যময় সমাজে অনায়াসে চালাইয়া দিতেছেন। আর শাস্ত্র না পড়িয়া শাস্ত্রবিচার, সংস্কৃত না পড়িয়া ষড়্দর্শনের বিচার, না বুঝিয়া সকল কথার বিচার, এ সকল দৌরাত্ম্যের জ্বালায় জ্বালাতন হওয়া গিয়াছে। আবার সমালোচনাও আজকাল বড় বিষম দায় হইয়া পড়িয়াছে। সমালোচনে এখন কাজীর বিচারই চলিয়াছে। সাধু লিখিলেন গ্রন্থ,

নিধু তার সমালোচক; লেখক বিচারক উভয়েই সমান। কিন্তু হইলে কি হয়, তুইজনেরই ব্যবসায়ে পরস্পর স্বার্থ আছে। নিধু অমনি সেই সুরে গাইলেন—"আহা মরি ভাইরে! এমন জিনিস আর হচ্ছে আছে?" জঞ্জালরাশি এমনি করিয়া আজকাল বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। সদ্‌গ্রন্থের আদর কেহ করে না, করিতে চায় না। সদ্‌গ্রন্থ এ বাজারে বিকাইবে কেন বল? এমন অবস্থায় বাঙ্গালা গ্রন্থের বিচার করিতে যাওয়াও এক প্রকার বিড়ম্বনা বৈ কি।

তা হউক, কিন্তু ব্রজেন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থ খানি পড়িয়া আমরা বড় প্রীত হইয়াছি। এমন দিনে একখানা সদ্‌গ্রন্থের সাক্ষাৎ পাইলেও সুখী হওয়া যায়। এই হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থখানি সাহিত্যক্ষেত্রে অতুলনীয়, বা কাব্যাংশে কমনীয়, এমন কথা আমরা অবশ্য বলিতেছি না। যিনি যাহা লিখিবার যোগ্য, যিনি যাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝিয়াছেন, তিনি সেই কথা বুঝাইয়া আজিকার দিনে গ্রন্থ প্রচার করিতেছেন, ইহাই আমাদের সুখের কারণ। এ হিসাবে, এক জন ভাল দোকানদার যদি তাহার মূর্খের ভাষায় দোকানদারী বিষয়টা বুঝাইয়া লিখিতে পারে, তবে তাহার গ্রন্থকেও আমরা মাইকেলী ছন্দের সহস্র বঙ্গীয় কাব্যাপেক্ষা উচ্চাসন প্রদান করিব। ব্রজেন্দ্র বাবু আজকাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কলিকাতা সহরে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার চিকিৎসাগুণে সকলেই সন্তুষ্ট। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালীও অধুনা ধীরে ধীরে সমাজমধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। এমন দিনে ব্রজেন্দ্র বাবুর মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও চিন্তাশীল চিকিৎসকের দ্বারা এই চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রচারে সাধারণেরও একটা মহদুপকার আছে। কেবল চিকিৎসক হইলেই চিকিৎসা-গ্রন্থ লেখা যায় না। ব্রজেন্দ্র বাবু চিকিৎসক ও ব্রজেন্দ্র বাবু লেখক—লেখক অর্থে আমরা এখানে ভাষাতত্ত্বে পাণ্ডিত্যের কথা বলিতেছি না। আমরা বলি, ব্রজেন্দ্র বাবু চিকিৎসা-তত্ত্ব বুঝেন, এবং বুঝাইতেও জানেন। যাঁহার কৌতূহল হইবে, তিনি এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই আমাদের কথার অর্থ বুঝিবেন।

আক্ষেপ। পদ্যগ্রন্থ। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক প্রণীত। কলিকাতা ৭৭ নং বীডন্ ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীযাদবকৃষ্ণ বসু দ্বারা প্রকাশিত। এখানি ক্ষুদ্র কবিতা-গ্রন্থ;—একাদশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাখণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রকাশক পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার লেখক একজন অপ্রাপ্তবয়া বালক; কতকগুলি কবিতা তাঁহার শৈশবকালের রচিত। বালকের লেখা হইলে প্রশংসনীয় বটে। কবিতাগুলির স্থলে স্থলে উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ আছে। রচনা-ভঙ্গী সরল, আধুনিক নব্য কবিগণের মত হেঁয়ালির ভাষায় বিজটিল নহে। কিন্তু বালকের "আক্ষেপে" ভগ্ন প্রণয়ের অবসাদ দেখিয়া আমরা কিছু আক্ষিপ্ত হইয়াছি।

সাহিত্যসমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড।] শ্রাবণ, ১২৯১। [চতুর্থ সংখ্যা।

তরঙ্গিণী।

(উপকথা।)

তৃতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীরা আমাদের অপেক্ষা সমধিক অধ্যবসায়শীল। "বাঙ্গালের গোঁ" বলিয়া আমরা তাঁহাদের নামে যে একটা কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকি, উহা বাস্তবিক কলঙ্কের কথা কি না ঠিক বলা যায় না; কিন্তু কথাটা নিতান্ত অমূলক নহে। ভাল-হউক মন্দ হউক, হৃদয়ের যে কোন সংকল্প প্রাণপণে রক্ষা করিতেই হইবে, ইহাই তাঁহাদের আন্তরিক প্রতিজ্ঞা। সেই সংকল্প সৎ হইলে, তাহার সাধনপ্রয়াসকে অধ্যবসায় বলিয়া প্রশংসিত, এবং সংকল্প অসৎ বা অন্যায় হইলে, তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টাকে অন্যায় জেদ্ বা "গোঁ" বলিয়া নিন্দিত করা যায়। যে প্রবৃত্তির বলে, মানুষ এইরূপ

প্রকৃতি লাভ করে, সে প্রবৃত্তি অবশ্যই নিন্দনীয় নহে। বাস্তবিক একাগ্রতা ও অধ্যবসায়বলে, পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা আজিও আমাদের চক্ষের উপর অনেক বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদের নায়ক নিরঞ্জনও স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় প্রকৃতির প্ররোচনাতেই তরুণী রাজনন্দিনীকে শিক্ষা দিবার সংকল্প হৃদয়মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী হইলে, এ সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইত কি না জানি না; বাঙ্গালী যুবক নবোঢ়ার লাথি খাইয়াও রাগের গৌরব অধিক দিন রাখিতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু সংকল্প সাধন না করিয়া নিরস্ত হইবার পাত্র নিরঞ্জন নহেন। এস্থানে নিরঞ্জনের এই সংকল্পের ভাল মন্দ বিচার আমি করিতে চাহি না, আর সে অধিকারও আমার হাতে থাকা উচিত নহে। তবে, আমার পক্ষে এটুকু অবশ্য বলিয়া দেওয়া উচিত যে তাঁহার সেই সংকল্পের ভিতর প্রতিহিংসার লেশ মাত্র ছিল না; তরঙ্গিণীকে কষ্ট দিবেন বা জব্দ করিবেন বলিয়া কোন রূপ অসদভিসন্ধি তাঁহার মনে একবারও সমুদিত হয় নাই। তবে রাজকন্যাকে রাজমর্য্যাদা ভুলাইয়া পতিমর্য্যাদা শিখাইতে হইবে, তরঙ্গিণীর হাতের তামাক-সাজা খাইয়া জন্ম সার্থক ও সুখভোগ করিতে হইবে, এবং সহধর্ম্মিণীকে আপনার দুঃখে দুঃখিনী করিয়া, অহঙ্কারের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে, ইহাই নিরঞ্জনের মর্ম্মান্তিক বাসনা। বালকের কৌতুক বল, প্রেমিকের সাধ বল, আর অভিমানের আব্‌দার বল, নিরঞ্জন এই সংকল্পে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

কিন্তু রাজবাটীতে গিয়া রাজনন্দিনীর সহিত এ সব সাধ মিটান একরূপ অসাধ্য বলিয়াই নিরঞ্জন জানিতেন। অতএব সাধ মিটাইতে বা সংকল্প সাধন করিতে রাজকন্যাকে দরিদ্রের কুটীরে একবার আনিতেই হইবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া, নিরঞ্জন মাতার নিকট সেই প্রস্তাব করিলেন। রাজনন্দিনী-পুত্রবধূ আসিয়া আঁধার-ঘরে চাঁদের আলো ছড়াইবেন, এই আহ্লাদে জননী যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। কিন্তু রাজনন্দিনী ত সহজে আসিবেন না, রাজার ঘরের মেয়েরা শ্বশুরালয় গমনের সম্পর্ক বড় একটা রাখিতেন না। সুতরাং একটা ছল করা চাই। মাতাপুত্রে পরামর্শ হইতে লাগিল। নিরঞ্জনের মাতাই একটা উপায় স্থির করিলেন; উপায়টা প্রথমতঃ সন্তানের মনোনীত না হইলেও, অবশেষে জননীর জেদে, ও প্রতিজ্ঞারক্ষার দুরন্ত বাসনার বশে অন্ধ হইয়া নিরঞ্জন অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলেন।

শ্বশুরবাটী হইতে ফিরিয়া আসার প্রায় ছয় মাস পরে, নিরঞ্জন একাকী হটাৎ এক দিন আবার কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত। রাজবাটী গিয়া তিনি শ্বশুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নিরঞ্জনের গলায় কাচা, মুখখানি বিষাদে বিবর্ণ। দেখিয়াই শ্বশুর মহাশয় ব্যাপার বুঝিলেন, আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না; কেবল জিজ্ঞাসিলেন, "আজ হলো ক দিন?" নিরঞ্জন উত্তর করিলেন, "এক পক্ষ অতীত হইয়াছে।"

অনন্তর, আর পাঁচটা কথাবার্ত্তার পর, কাজের কথা পাড়িয়া নিরঞ্জন জানাইলেন যে, "সস্ত্রীকং ধর্ম্মমাচরেৎ" এই শাস্ত্রবাক্যের অনুরোধে, চিরকাল ধরিয়া তাঁহাদের কুলে প্রথা আছে যে, বাটীতে নিত্য নৈমিত্তিক যে কোন ক্রিয়াকলাপে গৃহস্থের সহধর্ম্মিণীকে উপস্থিত থাকিতেই হইবে। অতএব, মাতৃশ্রাদ্ধের সময়, তরঙ্গণীকে অতন্তঃ কিছুদিনের জন্য একবার শ্বশুরালয়ে পাঠাইতেই হইবে, দুঃখীর ঘর বলিয়া এ সময় ওজর করিলে চলিবে না। কথা শুনিয়া রাজা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, তাড়াতাড়ী অন্তঃপুরে গিয়া রাণী-গৃহীণীর সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। তথায় অনেক তর্কবিতর্কের পর, রাজা মহাশয় দুই তিনবার রাণীঠাকুরাণীর মুখ্‌নাড়া খাইয়া, অনেক কষ্টে, জামতার প্রস্তাবে তাঁহাকে সম্মতা করিলেন। নিরঞ্জনকে সে সম্বাদ তখনি জানান হইল। শুনিয়া তিনি নিশ্চিন্তচিত্তে, তরঙ্গিণীর সহিত একবার সাক্ষাৎমাত্র করিয়া, সে রাত্রি পৃথক্ গৃহে শয়ন করিলেন। স্ত্রী পুরুষে প্রণয় বিভাগের কোন কথাবার্ত্তা সে দিন আর কিছু হইল না। মাতৃদায়ের উপলক্ষে প্রেমের আপিস আপাততঃ বন্দ হইয়া গিয়াছে। না হইবে কেন? সে ত আর আজি কালিকার পেটের দায়ে সাহেবের চাকরী করা নয় যে, পিতৃদায়ে বা দুর্গোৎসবেও ছুটি মিলিবে না!

পরদিন যথাকালে নিরঞ্জন গৃহিণীকে লইয়া গৃহযাত্রা করিলেন। রাজবাটীর দাসদাসী, লোকজন রাজকায়দার সহিত রাজকন্যার অনুগমন করিল। গঙ্গাবক্ষে তরণীর উপর, তরুণী তরঙ্গিণীর অনুপম কান্তি নিরঞ্জনের চক্ষে যেন নবীনতর লাবণ্যচ্ছটা বিকীরণ করিতে লাগিল। শরতের নীলাকাশে সিতপক্ষীয় শশধরের হসিতচ্ছবির ন্যায়, তরঙ্গিণীর চারুচিত্র সহসা যেন নবীনালোকে প্রভাসিত হইল। প্রভাতপবনরঙ্গে সুরধুনী ক্ষুদ্র বীচিবিভ্রমে নাচিয়া নাচিয়া মনের উল্লাসে সাগরসঙ্গমে ছুটিয়াছেন; নিরঞ্জনের তরণী সেই সঙ্গে নাচিতে নাচিতে, বক্ষারূঢ়া বরকামিনীকে যেন নৃত্যাভিনলীলা শিখাইতে লাগিল। নিরঞ্জন নির্ণিমেষ লোচনে দেখিলেন নৃত্যজনিত অঙ্গসঞ্চালনে, তরঙ্গিণীর লাবণ্যলহরী উথলিয়া উথলিয়া, ক্ষণে ক্ষণে যেন তরঙ্গিণী গঙ্গার লহরী লীলায় মিশাইয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে নিরঞ্জনের প্রতিজ্ঞা প্রায় ভাসিয়া গিয়াছিল। প্রণয়িনীকে ছলনা করিতেছেন বলিয়া মনে মনে তাঁহার বিষম লজ্জা হইল। মনে করিলেন, তরঙ্গিণীকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া তাঁহার পায়ে কাঁদিয়া পড়িয়া, সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। এই মনে করিয়া নিরঞ্জন প্রিয়তমার সহিত দুটা মিষ্টালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তরঙ্গিণী তখন বিষাদে ম্রিয়মানা—পিত্রালয়ে বিদায়জনিত রোদনের ধারা বাহিরে আর বহিতেছে না বটে, ভিতরে ফল্গু প্রবাহ ধীকিধীকি ছুটিতেছে। নিরঞ্জনের মিষ্টালাপে তিনি বড় একটা কর্ণপাত করিলেন না। নিরঞ্জন বুঝিলেন, আশা বিফল। রাজনন্দিনীর অহঙ্কার চূর্ণ না হইলে, প্রিয়াসমাগমে কোন সুখোদয়ই হইবে না। প্রণয়ের

আবেগ বড় ভয়ঙ্কর পদার্থ। সে আবেগে বাধা পাইলে মানুষ আত্মহারা হয়। প্রণয়াবেগে বাধা পাইয়া নিরঞ্জনের প্রতিজ্ঞা বহ্নি আবার দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া নিরঞ্জন তরঙ্গিণীকে বুঝাইলেন—"দেখ একটা কথা বলি, শুন। আমার অবস্থা তোমার জানিতে বাকী নাই। তোমার কাছে আমার লজ্জাই বা কি? কিন্তু তোমার বাপের বাড়ীর এই সব লোক জন—রাজবাড়ীর চাকর বাকর, ইহারা গিয়া তোমার শ্বশুরবাড়ীর ভাঙ্গা মন্দির দেখিয়া অসিবে, সেটা আমার যত না হউক, তোমারই মাথা হেঁট হইবার কথা। অতএব লোকজনদিগকে এই খান হইতে বিদায় করিয়া দিলেই ভাল হয় না? ক দিনের জন্য মিছে ভ্রম ভাঙ্গিয়া কাজ কি?"

আত্মগৌরবের অনুরোধেই তরঙ্গিণী কথাটায় স্বীকৃতা হইয়া বলিলেন—"তা মন্দ কি?" তখন উভয়ে বুঝাইয়া শুঝাইয়া লোক জন সব বিদায় করিয়া দিলেন। কেবল সৌরভ নাম্নী তরঙ্গিণীর খাস্ চাকরাণীটা কিছুতেই গেল না। তরঙ্গিণী তাহাতে বিশেষ আপত্তিও বড় করিলেন না। একটা লোক নিতান্ত না থাকিলেই বা চলে কৈ? জালিম্ সিং পাঁড়ে যাইবার সময় সৌরভের সহিত গোপনে দুই চারি কথা কহিয়া, শেষ একটা কথা প্রকাশ্যে বলিয়া গেল,—"হামার বখ্‌শিস্‌ঠো আদায় করিয়ে তোহার পাস্ রাখিয়ে দিস্।"

গ্রামে প্রবেশ করিবার আগে তরঙ্গিণীকে দাসীর সহিত নৌকায় রাখিয়া নিরঞ্জন নিজে পাল্কী দেখিতে গেলেন। নৌকা একটা খালের ভিতর রহিল। পাল্কী একখানি বৈ পাওয়া গেল না। পাল্কী আনিয়া নিরঞ্জন বলিলেন, "বাড়ী এখান হইতে বেশী দূর নয়। আমি আগে পঁহুছিয়া, তোমার জন্য এখনি আবার পাল্কী ফেরৎ পাঠাইতেছি।" সে পথটুকু নিরঞ্জনের পাল্কী না চড়িলে চলিত না, এমন নয়। কিন্তু পত্নীকে পাল্কী চড়াইয়া আপনি বেহারা হইয়া ছুটিবেন,—তা ত আর হয় না। আর এক কথা, গাঁয়ের মাঝে কাচা গলায় দেওয়াটা ঢাকিয়া যাইতে হইবে। অতএব পাল্কীর বাড়্ বন্ধ করিয়া নিরঞ্জন বাটী গিয়া পঁহুছিলেন; এবং একজন লোক সঙ্গে দিয়া তখনি আবার খালের ঘাটে পাল্কী পাঠাইয়া দিলেন। গ্রামের মেয়ে ছেলে, ঝি বউ রাজকন্যা দেখিবার জন্য আগে আগে ছুটিল। পুরুষগুলা বাটীর বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইল। রাজকন্যা তাহারা দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু বাহকগণের হুম্ হাম্-সম্বলিত সবীজ বহন মন্ত্র শ্রবণ করিয়া, এবং দানাপরা সৌরভ-দাসীর সদর্প পদবিক্ষেপ দেখিয়া বোধ হয় অনেকটা তৃপ্তিলাভ করিল।

পাল্কী দরজায় গিয়া লাগিবা মাত্র, নিরঞ্জন সর্ব্বাগ্রে গিয়া তরঙ্গিণীর কানে চুপি চুপি বলিয়া দিলেন,—"মাপ করিও, তোমাকে ঘরে আনিবার জন্য মিথ্যা ছলনা করিয়াছি।

মা আমার মরেন নাই। তিনি ঐ তোমায় লইতে আসিতেছেন, তাঁহার পায়ে প্রণাম করিও। সব্ কথা ইহার পর ভাঙ্গিয়া বলিব। এখন গোল করিও না।"

নিরঞ্জনের গলায় তখন আর কাচা নাই। দেখিয়া শুনিয়া তরঙ্গিণীর চমক্ হইল। রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। "এমন ঠকের হাতেও বাবা আমায় দিয়াছেন!" বলিয়া মনে মনে তিনি আক্ষেপ করিলেন। মনের আবেগে শাশুড়ীকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়া, তরঙ্গিণী অন্যমনে স্খলিত-গমনে শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর অনুগামিনী হইলেন। পুরাতন বংশের পতন হইলে বাড়ী ঘরের অবস্থা যেরূপ হয়, ঘোষের বাড়ীর দশাও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। বাড়ীতে জায়গার অভাব নাই; কিন্তু কেবল জায়গাই আছে! এখানে বন, ওখানে ভাঙ্গা, শৃঙ্খল ও পারি-পাট্যের অভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। দরিদ্রের সেই ভগ্ন গৃহসরোবরে, রাজকন্যা তরঙ্গিণী, রূপের ছটায় শতদল ফুটাইয়া দিগন্ত আলোকিত করিয়া বসিলেন।

পুত্রবধূ ঘরে আসিয়াছে, এই আহ্লাদেই নিরঞ্জনের মাতা অধীরা। রাজকন্যাকে ঘরে আনিতে হইবে, পুত্রের সহিত এই পরামর্শই তিনি করিয়াছিলেন, ভিতরকার কথা আর কিছু ত জানিতেন না। তরঙ্গিণীকে পাইয়া তিনি এখন মাথায় করিয়া রাখিলেন। গ্রামশুদ্ধ স্ত্রীলোককে ডাকিয়া বধূমাতার রূপলাবণ্য দেখাইতে লাগিলেন। কমলা কত যত্ন করি-লেন, কতমিষ্ট কথা বলিলেন কিছুতেই কিন্তু তরঙ্গিণীর মন উঠিল না। কাহারও সহিত তিনি ভাল করিয়া কথা কহিলেন না। ছলনা ব্যাপারে তিনি এমনি ব্যথিত ও বিরক্ত হইয়া-ছিলেন যে বাড়ীর সকলের উপরই তাঁহার কেমন একটা ঘৃণা জন্মিয়াছিল। এক এক বার সমস্ত গ্রামটাকেই যেন "ঠকের গাঁ" বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইতে লাগিল।

গ্রামের দুইটি মুখরা স্ত্রীলোক—এরূপ রত্ন সকল গ্রামেই দুই চারিটি থাকে—তরঙ্গিণীকে দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার সময়, পথে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—"হোক্ ম্যানে রাজকন্যে! হোক্ ম্যানে রূপসী! তা বলে কি আর ঠেকারে ভুঁয়ে পা পড়ে না গা! নাক্ বাঁশীপারা হলে কি হবে, নাক্ যে অমন শিট্‌কেই আছে!"

সৌরভ দাসী সেই সময় কোথা হইতে আসিতেছিল। কথাগুলা তাহার কাণে গেল। সৌরভ সব দেখিয়া শুনিয়া এতক্ষণ কেবল খর খর গর গর করিয়া বেড়াইতেছিল। এই বার আর তার গায়ে সহিল না। সৌরভের মুখ ছুটিল—"বলি হ্যাগা ও ভালমনুষের মেয়েরা! এ গাঁ খানাই কি এমনি ধরা গা। মাগ্ আনবার জন্যে ভালমানুষের ছেলে জীয়ন্ত মায়ের ছরাদ্ কত্তে চায়, সে কথা চুলোয় গেল, উল্‌টে আবার রাজকন্যার নিন্দে! রাজকন্যের মনে কি সুখ আছে, না সোয়াস্তি আছে যে তোমাদের সঙ্গে মুখ তুলে কথা কবে! এ দেশের রীৎ চরিত্তির দেখে তাঁর ঘেন্না ধরে গেছে।" গ্রামের স্ত্রীলোক দুটি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। সৌরভের মুখ কিন্তু থামিল না। সৌরভ শ্রোতার অপেক্ষা করিল না, সমানে বকিতে বকিতে গিয়া বাড়ী ঢুকিল।—

বলি, সাধ যায় বোষ্টম হতে।
বুক ফাটে মোচ্ছব্ দিতে॥

সৌরভ তখন অন্দর বাড়ীর উঠানে গিয়া পঁহুছিয়াছে। এইবার সে উঠানময় কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কি কাজ করিবে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। কিন্তু বকুনি কি একটা কাজ নয়? সৌরভের পক্ষে সেটা একটা প্রধান কাজ। সে এখন তাহাতেই উন্মত্ত।—"বলি কাচা গলায় দিয়ে রাজকন্যে আনৃতে যে ছুটলে বাবু! রাজকন্যে এসে বসে কোথা, দাঁড়ায় কোথা? এ সব ঘরে রাজবাড়ীর পাইখানাও যে হয় না গো!" কমলা তখন সৌরভকে ঠাণ্ডা করিতে গেলেন, বলিলেন,—"হ্যাগা গরিবের ভাঙ্গা ঘরে রাজকন্যাকে না হয় সাধ করে আনা হয়েছে, তাতেই এত কথা তোমায় বল্‌তে হয় গা?" নিরঞ্জনের মাতা বলিলেন—"অপরাধ হয়ে থাকে আমার বউ না হয় রাগ করবে, বউ না হয় দুকথা বল্‌বে; আর বউয়ের বাপ ত রাজা, রাজালোক না হয় গরিবের দণ্ড করিবেন, তুমি মেয়ে লোক সঙ্গে এসেছ, তোমার অত রাগ কেন বাছা?" সৌরভ এইবার সপ্তমে চড়িল। "মেয়ে লোক সঙ্গে এসেছ" এ কথায় সৌরভের মহা অপমান। "চাকৃরাণী বলে কি মুখে ওলপ দিয়ে থাকৃবো গা? চাকৃরাণী তোমরা কবে কটা রেখেছ গো, চাকৃরাণী বলে নাক্ তুলে নাক্ কথা যে কোচ্ছো?" এইরূপে মোহাড়া ধরিয়া সৌরভ যথানিয়মে, যথা-সুরে, চিতেন্ পরচিতেন্, আস্তায়ী, অন্তরা-সম্বলিত পুরা একপালা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, নিরঞ্জনের মাতা ও ভগ্নীর মুখের গোড়ায় ঘন ঘন হাতনাড়া সহকারে সটান গাহিয়া শুনাইয়া দিল। শুনিয়া নিরঞ্জনের মাতার চক্ষে জল আসিল। "বেটার বিয়ে দিয়ে আমার কপালে এত লাঞ্ছনা" বলিয়া তিনি চক্ষের জল মুছিলেন। এ ঘটনার সময় নিরঞ্জন বাড়ীতে ছিলেন না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি বাড়ী আসিয়া সব শুনিলেন। শুনিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, রাত্রে তরঙ্গিণীর সহিত ইহার বুঝা পড়া করিতে হইবে। তরঙ্গিণী কনে বউ, বিবাদের কথায় কোন কথাই তিনি কহেন নাই!

রাত্রিকালে, নিরঞ্জনের শয়নকক্ষে স্ত্রী-পুরুষে এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল।

নিরঞ্জন। রাজনন্দিনি! গরিবের দর-বারটা আজ শুনবে কি, না আজও সেই কালঘুমে ধরেছে?

তরঙ্গিণী। কি বল্‌বে বল না, আমি কি মরিচি? কথা কবে ত অত ঠাট্টা কেন, আর অত চিপ্টেনই বা কেন?

নির। তোমার কাছে সকলই ঠাট্টা। তোমার সৌরভ দাসী আজ যে কাণ্ডটা করিল সেটাও বুঝি ঠাট্টা! তোমার রাজ বাড়ীর লোক বলে কি আমার বাড়ীতে এসে আমার মা বোনের অপমান করে যাবে?

তর। অপমান কি করেছে? গালি মন্দও দেয় নাই, কিছুই নয়। তবে ছোট লোক, একটা ছুতো পেলেই দশ কথা করে বোকে মরে। ছুতো ত তোমা হতেই পেলে। মিছামিছি কাচা গলায় দিয়ে ঢলান কি তোমার ভাল হয়েছে, না লোকে ভাল বল্‌চে?

নির। আমার ভাল মন্দ আমি বুঝিব, সে মাগীর তাতে কি? আর ঢলান ত তা হতেই হলো। আমার গাঁয়ে ত কাচা গলায় দেওয়ার খবর কেহ জানিত না। এই জন্যই তোমার বাড়ী ঢুকিবার সময় গোড়ায় গোল করিতে বারণ করিয়া দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম যে পরে সব কথা বলিব।

তর। গোল ত আর আমি নিজে করি নি। লোকের মুখ চাপা দিয়া কি রকম রাখি বল? আর তোমার এ কাণ্ড করিবার দরকার কি, বলই না শুনি।

নির। দরকার তোমার গুমোর ভাঙ্গিতে হবে। রাজবাড়ীর বালাখানায় থেকে তোমার মেজাজ বড় কড়া হয়ে আছে। অত রাজকন্যেগিরি আমার কাছে খাটিবে না।

তর। গুমোর আবার কোন্‌খানটা দেখলে? আর যদিই গুমোর থাকে, তবে তুমি সে গুমোর ভাঙ্গবে কিসে?

নির। বদ্‌মাইসের গুমোর ভাঙ্গে কিসে জান না? জেলখানায় ঘানী টেনে। আমিও এখানে তোমার সেই সব খাটুনীর ব্যবস্থা করিব। আমরা গরিব লোক, আমার মা বোনের সঙ্গে তোমায় রাঁধিতে হইবে, ধানসিদ্ধ করিতে হইবে, আর দিনে রেতে দণ্ডে দণ্ডে তামাক সেজে আমাকে খাওয়াইতে হইবে।

তর। শিবপূজা করেছিনু ভাল। বড় পুণ্য না হলে কি তোমার হাতে পড়ি? পাপের ভোগ যদিন থাকে, ততদিন না হয় জেল খাটিব। কিন্তু জেলে রাখবে ক দিন। তার পর কি হবে? তার পর, "তোমারও পায়ে গোদ্, আমারও জন্মের শোধ।"

নির। হলো হলোই। তা বলে, তোমার অত গুমোর আর সহা যায় না।

তরঙ্গিণী আর কথা কহিলেন না। বসিয়া বসিয়া তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। শয্যার উপর অঙ্গ ঢালিয়া তিনি সচ্ছন্দে শান্তি লাভ করিলেন। নিরঞ্জনও নিরস্ত হইয়া শয়ন করিলেন। তিনি ঘুমাইয়াছিলেন কি না জানি না। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে আট কল্কে তামাকের গুল তাঁহার ঘরে জড় হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া নিরঞ্জন দিদিকে দিব্য দিয়া বলিয়া গেলেন যে, বউকে হাঁড়ী ধরাতেই হবে, নতুবা তিনি আহার করিবেন না। আহারের সময় বাড়ীর ভিতর গিয়া, নিরঞ্জন ভগ্নীকে জিজ্ঞাসিয়া জানিলেন, কনে বউ হাঁড়ী ধরিয়া পাককার্য্যে সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু আমরা গোড়ার খবর জানি, সংবাদটা মিথ্যা। রন্ধনের সময় কমলা কনে বউকে কোলে করিয়া বসিয়া ছিলেন। তরঙ্গিণীকে লইয়াই তিনি ব্যতিব্যস্ত। তাহাকে খাওয়াইতে ধোওয়াইতে, সাজাইতে মুছাইতে তিনি আর মাতার রন্ধনকার্য্যে কোনরূপ সাহায্য করিবার অবকাশই পান নাই। বিধবা কমলা কিন্তু ভাইয়ের কাছে অনায়াসে মিথ্যা কথা বলিল। এ মিথ্যার দণ্ড পরকালে আছে কি না জানি না, হাল আইনে ইহা অবশ্যই দণ্ডনীয়। এক আধবার নয়, যে কয়েকদিন তরঙ্গিণী ছিল, সে কয়েকদিনই কমলা এইরূপ মিথ্যাচরণ করিতেন।

সৌরভ দাসী ঝগড়া ঝাঁটী করিয়া সেই

দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। যাই-বার সময় কমলা তাহার হাতে একটি টাকা ও একখানি কাপড় দিলেন। সৌরভ তখনই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসি-হাসি মুখে কত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "আমি কি আর তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে পারি দিদি! আমি ভাল কথাই বলেছিলুম, তোমরা রাগ কল্লে, আর তোমার মা আমায় শুধু শুধু শাপ্ মন্নি দিলে। বেঁচে থাক্ জামাই বাবু, উনি রাজা হোন, আমরা এর পর কত খাবো, কত মাখ্‌বো।" কমলা উত্তরে কেবল বলিলেন, "দেখো বোন, ঝগড়া ঝাঁটীর কথা সেখানে কিছু তুলো না, নিরঞ্জ-নের শ্বশুর শ্বাশুড়ী যেন তার উপর রাগ না করেন। ছেলে মানুষ, এক কাজ করে ফেলেছে, কি হবে বল?" সৌরভ এক হাত জিব কাটিয়া বলিয়া গেল, "আমাকে তুমি এমনি লোকই পেয়েছ দিদি!"

সৌরভ রাজবাড়ী গিয়া কি বলিয়াছিল না বলিয়াছিল, ভগবান জানেন; কিন্তু যে দিন সে পঁহুছিল, সেই দিনই রাজবাটীর দেওয়ান হইতে দরোয়ান পর্য্যন্ত ১৬ জন লোক তরঙ্গিণীকে আনিবার জন্য যশোর যাত্রা করিল। গ্রামে পঁহুছিয়া, পাল্কী বেহারা ও নৌকা প্রভৃতি যান বাহন ঠিক করিয়া, তখনই তাহারা রাজকন্যাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। নিরঞ্জন কোন আপত্তি করিলেন না। তরঙ্গিণীর প্রতি তিনি এক প্রকার হতাশ হইয়াছিলেন। শাসনে সংশোধন হইবে ভাবিয়াছিলেন, শাসনে কিন্তু বিপরীত ফলই ফলিল। প্রণয় কখনও শাসনাধীন থাকে না, প্রণয় স্বতন্ত্র রাজ্য। তরঙ্গিণী এ কয়েকদিন যেন বন্দিনীর ন্যায় ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন। পিতৃগৃহে যাই-বার সময় তাঁহার মুখকমল ঈষৎ প্রফুল্ল হইল। সেই প্রফুল্ল কমলাননে সৌন্দর্য্যের ললিতলীলা দেখিয়া নিরঞ্জনের আবার লোভ হইল; আশার কুহকে পড়িয়া, আর এক-বার, শেষ বিদায়ের সময় শেষ চেষ্টা করি-বার জন্য তিনি সোৎসুক হইলেন। বিদায়-কালে, নিরঞ্জনকে প্রণাম করিবার জন্য, নিরঞ্জনের মাতা তরঙ্গিণীকে জোর করিয়া পুত্রের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। প্রণাম তরঙ্গিণী করিতে পারিলেন না, নিরঞ্জন শশ-ব্যস্তে উঠিয়া, প্রস্থানোদ্যতা প্রেয়সীর হস্ত ধারণ করিয়া সকাতরে জিজ্ঞাসিলেন,—"সত্য সত্যই কি তবে জনমের মত চলিলে? যা হইয়াছে, তাহার কি ক্ষমা নাই?" মৃদুস্বরে তরঙ্গিণী উত্তর করিলেন,—"যেতে পার যেও না কেন, কিন্তু আর কোন্ মুখ লইয়া রাজ-বাটী ঢুকিবে।" আর কথা হইল না। তর-ঙ্গিণী দ্রুতপদে গৃহত্যাগ করিলেন। নিরঞ্জন শুইয়া পড়িলেন। সেদিন তাঁহার মাথা ধরিয়াছিল, আহারাদি কিছু করেন নাই। মাথা ধরিলে কি মাথায় ঘাম হয়? নিরঞ্জনের মাথার বালিশটা কিন্তু ভিজিয়া গিয়াছিল।

বেদান্ত-দর্শন বিবৃতি।

সত্য প্রধানতঃ দ্বিবিধ—পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্য। সশক্তিক ব্রহ্ম পার-

মার্থিক সত্য এবং বিশ্বই ব্যবহারিক সত্য। উভয় সত্যের সমবায় ভিন্ন বিশ্ব সম্বন্ধে বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই প্রকাশিত হয় না; জ্ঞানে উভয় সত্যেরই সমন্বয়ের প্রয়োজন। বিশ্বকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে জানা যায় না, ব্রহ্মকে ছাড়িয়াও বিশ্বকে অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং সকল জ্ঞানেরই মূল বিশ্ব ও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, অখণ্ড; ব্রহ্মবস্তুর বিভাগ নাই। বিশ্বকে জীব, স্বভাব, কর্ম্ম ও কাল এই চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ জীবাদি বস্তুচতুষ্টয়ের অতিরিক্ত বিশ্ব নাই। এই বিপুল বিশ্বরাজ্যে আমরা যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয়ীভূত দেখি, সে সকলই ঐ জীবাদি বস্তুচতুষ্টয়ের অন্তর্গত; সকলই উহাদের পরস্পরমিলনে, শক্তিপ্রকাশে সমুৎপন্ন। কি মহত্তত্ত্ব (জগতের সূক্ষ্মাবস্থা), কি সাত্ত্বিকাদি অহঙ্কারত্রয়, কি দেবতা, কি মন, কি চক্ষুরাদি দশ ইন্দ্রিয়, কি রূপাদি পঞ্চতন্মাত্র, কি ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, সকলই জীবাদি বস্তুচতুষ্টয়েরই পরিণাম। কারণরূপ জীবাদি বিষয় হইতে কার্য্যরূপী মহত্তত্ত্বাদি বিষয়ের প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল অব্যক্ত এবং শেষোক্ত বিষয় সকল ক্রমান্বয়ে ব্যক্তদশাপন্ন। জীবাদি বিষয়সকল ব্যাপ্য বিষয়ক, এবং মহত্তত্ত্বাদি বিষয় সকল ব্যাপ্য বিষয়। মহত্ত্বাদি ব্যাপ্য বিষয়সকলের মধ্যে আবার মহত্ত্বাদি কতিপয় বিষয় অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বলিয়া অতীন্দ্রিয় এবং চক্ষুরাদি অবশিষ্ট বিষয় সকল অপেক্ষাকৃত স্থূল বলিয়া ইন্দ্রিয়গম্য। চক্ষুরাদি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়গম্য হইয়াও তদ্‌গম্য অপেক্ষাকৃত কব্যাপ সত্য সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের বুদ্ধির বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। ঐ সকল জ্ঞেয় বিষয় সাক্ষীস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ সত্যজ্ঞানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভিন্ন উপলব্ধিও হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞেয় বস্তুমাত্রের অস্তিত্বের উপলব্ধির সহিত নিয়ন্ত্রিত জ্ঞাতার ও নিয়ামক সাক্ষীর অস্তিত্বোপলব্ধিও অবশ্যম্ভাবিনী। ফলতঃ, ঈশ্বর, জীব, স্বভাব, কাল ও কর্ম্ম এই পঞ্চতত্ত্বের এক তত্ত্বকেও পরিত্যাগ করিয়া—বাহ্যজগতের উপলব্ধি হইতে পারে না। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না; জ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞেয় বস্তুর প্রকাশ হয় না; স্বভাব ব্যতিরেকে স্বরূপব্যক্তি হয় না; চেষ্টা ব্যতিরেকে ক্রিয়া হয় না; অদৃষ্ট ও পুরুষকার ব্যতিরেকে ফলোৎপত্তি হয় না। ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ামক ও সাক্ষী স্বরূপ। জীবতত্ত্ব নিয়মিত ও ফলভোক্তা; স্বভাবতত্ত্ব—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি স্বরূপিনী, ঐ তত্ত্বের প্রকাশই জগৎ; ঐশ্বরিক চেষ্টাই কালতত্ত্ব এবং জৈব অদৃষ্ট ও পুরুষকারেরই নামান্তর কর্ম্ম। এই পঞ্চ তত্ত্বই সংসারের মূল। এই পঞ্চতত্ত্বকে পরিত্যাগ করিয়া পরীক্ষাকার্য্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না। স্বরূপভূত মূলতত্ত্ব ব্যতিরেকে, লক্ষ্যবস্তু ব্যতিরেকে লক্ষণের স্থান কোথায়? বুদ্ধি-সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য নিরূপণ দ্বারা কার্য্য-কারণানুসন্ধান দ্বারা যাহার স্বরূপ ও লক্ষণ নির্দ্দেশ এবং পরীক্ষা করিবেন, তাহার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ ও অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকারে যদিও দেখা যাইতেছে যে, মূলতত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস আমাদিগের স্বাভাবিক, উহা আমাদিগের

বুদ্ধির সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে অবস্থিত ও অপরিহার্য্য ; যদিও বৈধর্ম্ম্যের মূলে সাধর্ম্ম্য, গুণের মূলে গুণীবস্তু, ক্রিয়ার মূলে কাল, কার্য্যের মূলে কারণ ও কল্পনার মূলে কল্পনীয় বস্তুর অস্তিত্বজ্ঞান অপরিহার্য্য ; তথাপি কেবল ঐ বুদ্ধিবিচারে আমরা এ মূলতত্ত্বে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপনীত হইতে পারি না। মূলতত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে জ্ঞেয় না হইলেও উহা এককালে অজ্ঞেয় নহে। যাহা আমাদিগের প্রকৃতিতে অনুস্যুত, যাহা সর্ব্বজনীন বিশ্বাসের মূলে অবস্থিত, তাহার আংশিক জ্ঞেয়ত্ব আশ্চর্য্য কার্য্য।

বিষয়ের অস্তিত্ব ও তাহার আবির্ভাব পদার্থ। আবির্ভাবজ্ঞান ইন্দ্রিয়গম্য, কিন্তু অস্তিত্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়বেদ্য নহে। অস্তিত্বজ্ঞান আমাদিগের প্রকৃতিতে সংমিশ্রিত। আবির্ভাবজ্ঞানে ব্যাপ্তি ও পরিবর্ত্তন থাকিবেই থাকিবে। আন্তরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও বিষয়ের বহির্ব্যাপ্তি ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে অবস্থিত। কোন একটি বিষয় ইন্দ্রিগোচর হইবামাত্র তৎসঙ্গেই আন্তরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও উক্ত বিষয়ের বহির্ব্ব্যাপ্তি অনুভূত হইয়া থাকে। ঐ বহির্ব্ব্যাপ্তি দ্বিবিধ ;—স্থানব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি। গুণসন্নিকর্ষ দ্বারা স্থানব্যাপ্তি ও ক্রিয়াসন্নিকর্ষ দ্বারা কালব্যাপ্তির অনুভব হয়। এইরূপে বহির্ব্বিষয়ানুভবে আমরা প্রকৃতি বা স্থান ও কাল উভয়েরই উপলব্ধি করিলেও বাহ্যাস্তিত্বের প্রতি প্রকৃতির এবং অন্তরাবস্থা পরিবর্ত্তনের প্রতি কালেরই কারণতা স্বীকার করিয়া থাকি। তথাপি প্রকৃতি ও কালকে ইন্দ্রিয়গম্য বলা যায় না। কারণ, প্রকৃতি বা কালের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধই ঘটে না। লৌকিক সন্নিকর্ষ দ্বারা যাহা কিছু উপলব্ধ হয়, তাহা কতকগুলি গুণমাত্র। তবে আমরা অলৌকিক সন্নিকর্ষ দ্বারা ঐ সকল জ্ঞেয় বস্তুর আধারকাল-ব্যাপকত্ব পরম্পরাসম্বন্ধে অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু ঐ আধার ও কাল এই প্রকারে আমাদিগের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ং নিয়ামক স্বরূপ ঈশ্বর ও নিয়মিত জ্ঞাতা জীবের ন্যায় বাহ্য বা অন্তরবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে অসমর্থা। বুদ্ধিতে যে আবার কালব্যাপকতা প্রকাশিত হয়, তাহা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে সাম্বন্ধিক ভাবেই হইয়া থাকে। আমাদিগের অন্তঃকরণের অবস্থাবিশেষ সম্বন্ধে বহির্ব্বিষয় সাম্বন্ধিকভাবে আধারে অবস্থান করে এবং বহির্ব্বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগের আন্তরিক অবস্থা সাম্বন্ধিক ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞান ও জীবজ্ঞানের ন্যায় সংখ্যার ভিন্ন আধার বা কালের নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ববিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না।

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ, এই তিনটি আধারের গুণ বা অবয়ব। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিনটি কালের গুণ বা অবয়ব। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান বা বিষয়ের অবয়ব সকলের পরস্পর ব্যবধানই দৈর্ঘ্যাদির বোধক। এইরূপ মনে মনে পূর্ব্বোপলব্ধ বস্তুর পুনরাবির্ভাব বা স্মৃতি অতীতকালের, কল্পনা বা উপস্থিতসন্নিকর্ষ বর্ত্তমানকালের এবং আশা ভবি-

ষ্যৎকালের জ্ঞান উৎপাদন করে। আধার-গুণে বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ এবং কালগুণে তাহাদের অন্তঃকরণে আবির্ভাব হয়। এই আধার ও কাল আপাততঃ ঈশ্বর ও জীবের ন্যায় শূন্যবৎ প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধে উহারাই সর্ব্বস্ব। আধার ও কাল ব্যতিরেকে কোন জ্ঞানই সম্ভব হয় না।

আধার ও কাল ভিন্ন বাহ্য বস্তুর সহিত অন্তরের সম্বন্ধ সংঘটনে একটি ক্রিয়ার মধ্যতা লক্ষিত হয়। ঐ ক্রিয়ার আধার ও কালের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। ঐ ক্রিয়ার সমাধানে কাল লঙ্ঘন ও আধারব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ইন্দ্রিয়কাল-জ্ঞানের প্রথম লক্ষণই ক্রিয়া, দ্বিতীয় লক্ষণ প্রকাশ। কালের ব্যত্যয় ও আধারব্যাপ্তি হইতেই ক্রিয়ার বোধ হইয়া থাকে।

এইরূপে বুদ্ধিতে আধার ও কাল ও ক্রিয়া প্রতিভাত হইলেও বুদ্ধি উহাদের জয়িত্রী নহে। ঐ সকল বস্তু আমাদিগের আত্ম-গত বিজ্ঞানশক্তির সামর্থ্যে স্বতঃসিদ্ধভাবে বুদ্ধিদ্বারে প্রতিবিম্বিত হইয়া জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যাহার সাহায্যে বিষয়ের উপলব্ধি, তাহাই ইন্দ্রিয়। যাহার সাহায্যে বস্তুবিষয়ক বিশেষজ্ঞান বা সামান্য জ্ঞান, তাহারই নাম বুদ্ধি। ঐ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সমুৎপন্ন বা প্রকাশিত ফল দ্বিবিধ:—জ্ঞান ও বিজ্ঞান। জ্ঞান শব্দের অর্থ বস্তুজ্ঞান এবং বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বস্তুর আবির্ভাবমাত্র উপলব্ধি করাইয়াই নিবৃত্ত হয় না। বুদ্ধি উক্ত উপলব্ধির কারণের তত্ত্বানুসন্ধান ও স্বত্বানুসন্ধান করে। সুতরাং কাল ও আধার যেরূপ ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের সাধন, স্বত্বাও তদ্রূপ বুদ্ধ্যনুমেয় জ্ঞানের সাধন। অতএব প্রমাতৃ বিষয়টী ও প্রমেয় বিষয়ের অস্তিত্ব বিশ্বাস ব্যতিরেকে কোন বুদ্ধিকার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। কথঞ্চিৎ ঘটিলেও উহা প্রমাত্মক জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। প্রমাতার অবয়ব জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া এবং প্রমেয়ের অবয়ব শক্তি ও গতি বা পরিমাণ বিষয়ীর জ্ঞান, বিষয় গ্রহণসামর্থ্য ও চেষ্টা এবং বিষয়ের গুণো-দ্ভাবিনী শক্তি ও তাহার আধারকালব্যাপক ক্রিয়াই বিশেষ লক্ষণ। কারণ, ঐ সকল লক্ষণ না থাকিলে উহারা বিষয়ী বা বিষয় বলিয়া গণ্যই হইতে পারিবে না। বিষয়ীর জ্ঞান বিষয় ও বিষয়ের ভেদমূলক। কারণ, প্রত্যেক বিষয়-জ্ঞানেই আত্মার বিষয়ী রূপে জ্ঞান এবং বিষ-য়ের তাহা হইতে স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান অপরিহার্য্য। বিষয়ী ইচ্ছাশক্তি-সমন্বিত বলিয়া স্বাধীন এবং তদ্রহিত বিষয়ে পরাধীন। ঐ বিষয়ী ঈশ্বর ও জীবভেদে দ্বিবিধ। স্বতন্ত্র পরিপূর্ণ সমষ্টি বিষয়ীর নাম ঈশ্বর এবং ভোগে স্বাত-ন্ত্র্যশক্তিরহিত খণ্ডশক্তিসমন্বিত বিষয়ীর নাম জীব। পরাধীন বিষয় রূপ বিশ্বকার্য্য হইতেই স্বাধীন বিষয়ী রূপ ঈশ্বরের ও জীবের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। তত্ত্ববিজ্ঞানের অধিকারই উক্ত অনুমান হইতে আপন্নত বিষয়ী ও বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে তত্ত্ব-নির্ণয় করা।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

সিংহল দর্শন।

গিরিমালাপরিবেষ্টিত সুপ্রশস্ত সমুচ্চ স্থানে কান্দীনগর অবস্থিত। ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজেরা এই স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাহার বহুপূর্ব্বে এখানকার পূর্ব্বতন শেষ রাজা এই স্থানে একটী মনোহর হ্রদ প্রতিষ্ঠা করেন। হ্রদটী প্রায় এক মাইল দীর্ঘ; দেখিতেও অতি সুন্দর। নগরের মধ্যে সেই হ্রদটী সর্ব্বজনের প্রীতিপ্রদ অতি নয়নরঞ্জন দৃশ্য। গমনাগমনের রাস্তাগুলিও উত্তর দক্ষিণে এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে সমসূত্রপাতে বিনির্ম্মিত; মধ্যে মধ্যে সর্পগতির ন্যায় বক্র। এই স্থানের একটী পথ দিয়া "আর্থর নিকেতনে" যাইতে হয়। পাহাড়ে উঠিবার অর্দ্ধপথে আর্থর নিকেতন। সেই স্থান হইতে পূর্ব্বোক্ত হ্রদটি এবং সমস্ত কান্দী নগরের অতি সুন্দর শোভা-পারিপাট্য পরিষ্কার রূপে নয়নগোচর হইয়া থাকে। পর্ব্বতের ঢালুভাগে নানাজাতীয় বৃক্ষলতা জন্মিয়াছে; মধ্যে মধ্যে চলাচলের পথ। তথায় দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলে চতুর্দ্দিকেই পরম রমণীয় চমৎকার দৃশ্য বিলোকিত হয়। হ্রদের শোভাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিপ্রদায়িনী। হ্রদসলিলে শুভ্র শুভ্র জলদ-রেখা-রঞ্জিত আকাশের সুন্দর প্রতিবিম্ব, পর্ব্বতগাত্রে সুসজ্জিত হরিদ্বর্ণের বৃক্ষলতা এবং তীরবর্ত্তী সুন্দর সুন্দর অট্টালিকামালার পরম সুন্দর ছায়া। মধ্যস্থলে দ্বীপ। বোধ হয় যেন, কাঞ্চনপ্রোত মরকতখচিত হইয়া প্রভাতকালীন সূর্য্যমূর্ত্তির ন্যায় নেত্ররঞ্জন আরক্তিম শোভা বিস্তার করিতেছে। হ্রদের পরপারে সুবিস্তৃত সমভূমি,—সুবিস্তৃত হরিৎক্ষেত্র। ইহাই এখানকার গড়ের মাঠ নামে বিখ্যাত। তাহার এক দিকে "দলদামলিগা" নামক স্থান এবং অন্য দিকে ওয়েন সাহেবের হোটেল। সেই স্থানের নিকটেই "সুবারা এলিয়া।" এই স্থানটী সিংহলদ্বীপের স্বাস্থ্য-নিবাস। স্থানের সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রকৃতই নয়ন মনের পরিতৃপ্তি জন্মে। ইহার বহুদূর পর্য্যন্ত পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ক্রমশঃ উচ্চতা হইতে সমতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির শষ্যাপ্রসাদে অতি অপরূপ শ্রীধারণ করিয়াছে। এখানকার কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ এবং সেই স্তম্ভ-সংলগ্ন ভূমি-মণ্ডল দেবভূমি নামে সুপ্রসিদ্ধ।

আমরা এখন নির্ব্বিঘ্নে কান্দীনগরে উপনীত হইয়া পাঠকবর্গকেও সঙ্গে করিয়া আনিলাম। তথায় তাঁহাদিগকে আপততঃ বিশ্রাম করিতে দিয়া, সিংহলের অন্যান্য বৃত্তান্ত তাঁহাদিগের সমীপে বর্ণন করিব। পাঠকগণ এখন পথশ্রমের পর নিশ্চিন্তচিত্তে সিংহলের মণিরত্ন-রহস্য আমাদের মুখে অবগত হইয়া, বিশ্রামসুখ লাভান্তে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন।

সিংহলের মণিরত্ন।

সিংহলের মহামূল্য রত্নাবলী বিশ্ববিখ্যাত। প্রাচীন ঐতিহ্যসিকেরা বলেন, এই দ্বীপের চন্দ্র-রত্নক্ষেত্রের রত্নরাজী পৃথিবীতে অতুল্য। একজন কবি এই স্থানের

রত্নাধিকার সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। চন্দ্ররত্নক্ষেত্র কোথায়, আধুনিক রত্নান্বেষীরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া সাধ্যমত সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। তাঁহারা অনুমান করেন, কান্দীনগরের নুবারা এলিয়া নামক সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র, যাহা সিংহলের স্বাস্থ্যনিবাস নামে সুপ্রসিদ্ধ, সেই স্থানটীই চন্দ্রমণিক্ষেত্র। কেন না, আজিও সেই স্থানে প্রচুর পরিমাণে চন্দ্রকান্তমণি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই যে কিম্বদন্তী, তাহা প্রকারান্তরে আরবীয় মনোরঞ্জন উপন্যাসের গল্পান্তর বলিলেও নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কিম্বদন্তী বলে, সাপের মাথায় মাণিক জ্বলে;—সাপেরা পর্ব্বতের উপত্যকাখণ্ডে সেই সকল মাণিক খুলিয়া রাখিয়া ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়ায়; মুক্তক্ষেত্রে রাশি রাশি মাণিক ঝক্‌মক্ করিতে থাকে। সেই সময় বুদ্ধিমান রত্নজীবীরা পর্ব্বতশিখর হইতে বহুতর মাংসখণ্ড নিম্নক্ষেত্রে নিক্ষেপ করে; মাণিকগুলি তাহাতে ঢাকা পড়িয়া যায়, এবং মাংসের সঙ্গে লিপ্ত হইয়া জমাট লাগে। শিকারী বাজপক্ষীরা শূন্যপথে উড়িতে উড়িতে সেই সকল মাংসখণ্ড দেখিতে পাইয়া উপর হইতে ছোঁ মারিয়া পড়ে, এবং মাংসখণ্ড মুখে করিয়া, নখে লইয়া, আপন আপন বাসায় উড়িয়া যায়। বাজপক্ষীর নীড়েই অসংখ্য মাণিক পাওয়া গিয়া থাকে।

সিংহলে যখন দেশীয় রাজা ছিলেন, তখন তাঁহারা মণিরত্ন আহরণ-স্বত্বটী আপনাদেরই একচেটে করিয়া রাখিতেন। ইংরাজেরা যখন মোরাবাক্-করালী, নুবারা এলিয়া, রাক্‌বাণী, এবং রত্নপুরীর রত্নক্ষেত্র অধিকার করেন, সে সময় পর্য্যন্ত ঐ রীতি প্রচলিত ছিল। রাক্‌বাণী ও রত্নপুরী প্রদেশে নীলকান্তমণি ও বিড়ালাক্ষ-মণির মহাগৌরব; ঐ দুই মণি ঐ দুই প্রদেশে বহুল পরিমাণে সমুৎপন্ন হয়। রত্নপুরীর নীলকান্তমণি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সুনীল মখ্‌মলের ন্যায় কোমল এবং উজ্জ্বল বর্ণ।

সিংহলের পদ্মরাগমণি জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্যামদেশে যে সকল পদ্মরাগের উৎপত্তি, কেবল তাহাই সিংহলী পদ্মরাগের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, নতুবা সিংহলী পদ্মরাগ সমগ্র পৃথিবীতে অনুপম। নদীর স্তরে এবং অয়স্কান্তের আকরমৃত্তিকায় ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। নীলকান্তমণির আকরে আর এক প্রকার মণি পাওয়া যায়, তাহা পীতবর্ণ; কোন কোন জহুরী উহাকে তোপাজ বলেন। উহার আদর ও মূল্য উভয়ই অধিক। সিংহলে মরকতমণিও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ সুমার্জ্জিত লঘু হরিৎ। কান্দীর নিকটবর্ত্তী মহাবিল গঙ্গাপ্রদেশেই ইহার প্রধান আকর। বেগুণী বর্ণের মরকত এতৎ প্রদেশে দুর্ল্লভ নহে। বস্তুতঃ নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, বৈদূর্য্য, অয়স্কান্ত, পদ্মরাগ, প্রবাল, চুণি, পান্না, ইত্যাদি নানাজাতি রত্নের ন্যায় সিংহল আরও অনেক প্রকার বিচিত্র বর্ণের—বিচিত্র গঠনের মূল্যবান সুন্দর সুন্দর মণিপ্রস্তর প্রসব করে। সিংহলের বিড়ালাক্ষমণির অধিক আদর এই দেশেই ছিল, এখন ইউরোপের অনেক স্থলে অনেক

বড় বড় বিলাসীদলে উহা বিলক্ষণ আদরণীয় হইয়াছে। মোরাবাক্স্ ফরাসী প্রদেশের বিড়ালাক্ষমণিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু উহার আকর কম; সুতরাং অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রদেশে সম্প্রতি আর এক প্রকার নূতন মণি বাহির হইয়াছে। এদেশে আজিও তাহার নামকরণ হয় নাই। ইংরাজ বলেন, "আলেক্জেণ্ড্রিয়া।" সেই মণির গঠন ও জ্যোতি নীলকান্তমণির ন্যায়, দেখিতে অতি সুন্দর ও অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু বাস্তবিক উহা সবুজবর্ণ। ইহার আর একটী আশ্চর্য্য ধর্ম্ম এই যে, যেগুলি সর্ব্বপ্রকারে নিখুঁত, সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট আদর্শ, সেগুলি দিবারাত্রে ভিন্নবর্ণ দেখায়। দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে অথবা সূর্য্য-অপ্রকাশে দিব্য সবুজবর্ণ; রাত্রিকালে কৃত্রিম আলোতে রক্তবর্ণ ধারণ করে।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ হইতে নানা দেশের জহরৎ নানা দেশে প্রেরিত হইত। এক সময়ে বিস্তর নীলকান্তমণি লণ্ডনের বাজারে এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাজারে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে সিংহলী নীলকান্তও ছিল। কিন্তু কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, তাহা স্থির করিবার সময় সিংহল উচ্চ স্থান পায় নাই। ব্যবসায়ী-সমাজ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, ব্যবসায়ী বাজার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল; সিংহল অধিক জহরৎ প্রদান করে, অথচ প্রতিযোগিতায় সিংহল জয়লাভ করিতে পারিল না, এই এক আতঙ্ক ব্যবসায়ীবাজারকে কম্পিত করিয়াছিল। কিন্তু শেষে সপ্রমাণ হইয়াছে, প্রকৃত সৌন্দর্য্যে এবং বর্ণের উজ্জ্বলতায় সিংহলের নীলকান্তই জগতের মধ্যে অদ্বিতীয়। এত গুণ, তথাপি দোষ আছে। দোকানীরা এক প্রকার জঘন্য ও কৃত্রিম মণি খণ্ডে খণ্ডে কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে, যাঁহারা নূতন সিংহল দেখিতে যান, তাঁহাদিগকে যাহা বিক্রয় করিয়া অধিক মূল্য লয়, বাস্তবিক তাহা কিছুই নহে,—তাহার কিছুই মূল্য নাই। এই কারণেই সাধারণতঃ দেশের দুর্নাম রটনা হয়।

যেরূপে আকর খনন করিয়া মণি বাহির করিবার প্রথা পূর্ব্বে ছিল, এখনও তাহাই আছে। লোকেরা মাটী কাটিয়া কাঁড়ি করে, তাহার পর উপযুক্ত চালুনীতে ঝাড়িয়া, ধুইয়া, পরিষ্কার করিয়া, তাহার ভিতর হইতে মণি বাহির করে। হস্ত এবং ঐ চালুনি, ইহা ভিন্ন অন্য কোন যন্ত্র নাই। মাটী কাটিবার কোদাল অবশ্যই আছে। যাহারা এই কাজ করে, তাহাদের দৃষ্টি এমনি তীক্ষ্ণ যে, রাশীকৃত মাটী ঝাড়িয়া, ধুইয়া, পরিষ্কার করে; পরে তাহার ভিতর কোথায় কি ভাবে মণি রহিয়াছে, পলকমাত্রেই তাহা ধরিয়া ফেলে। ইহারা সরকার হইতে বেতন পায়। তাহা ছাড়া, যে যত মণি বাহির করে, তাহা বিক্রীত হইলে যে মূল্য হয়, সে তাহার কমিশন পায়। আর যাহারা গর্ত্ত খুঁড়িয়া মণি বাহির করে, তাহাদের দলে মণিচোরা অনেক থাকিলেও থাকিতে পারে।

দুই হাজার বৎসরেরও অধিক কাল এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। এখনকার ইংরাজ অধিকারীরা প্রস্তাব করিতেছেন, কলের শক্তি চালনা করিয়া অনেক দূর

গভীরতা পর্য্যন্ত খনন করিয়া অধিক মণি সংগ্রহ করিবেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাও তাঁহাদের প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া রায় দিয়াছেন,—অধিক মাটীর নীচে অধিক মণি আছে, কল চালাইলে কার্য্য ভাল চলিবে। হাতচালা অপেক্ষা কল-চালা বহুসহস্রগুণে হিতকর ও সুবিধাজনক।

শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী।

মুসে গাম্বেতা।

৩।

গাম্বেতার বয়স এখন ত্রিশ বৎসর। তিনি সেই চারিতালা বাটীতে বাসা করিয়া থাকেন। কাযকর্ম্ম বেশ চলিতেছে। এমন সময় ফ্রান্সের রাজনীতিক গগণে এক খণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ দেখা দিল। মেঘ শনৈঃ শনৈঃ বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নীল-নভস্থল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ক্রমে বজ্রনাদ ও অশনিপাত আরম্ভ হইল। রূপক ছাড়িয়া স্পষ্ট করিয়া বলি। ফ্রান্স-সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ। রাজ্যভারপ্রাপ্ত প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা মোর্ণির মৃত্যু হইয়াছে। চলিত কথায় বলে "ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপনের গোড়া।" মোর্ণি সম্বন্ধে ঐ বাক্য অবাধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ভাগ্যদোষে ফরাসিক্ষেত্রে তিনি যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন কালবশে তাহা বিশাল শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট মহাবৃক্ষে পরিণত হইল। উহার বিষময় ফলে সকলের মনঃপ্রাণ জর্জ্জরিত করিয়াছিল। ফ্রান্সের প্রথম অবস্থা হইতে অনুষ্ঠিত সামন্ত্র-তন্ত্র একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। মোর্ণি-প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালী মুখ ব্যাদান করিয়া অনবরত অনলরাশি উদ্গার করিতেছিল। সন্তপ্তহৃদয় প্রজাকুল ভয়ে স্তম্ভিত, সম্মুখে বিষের ঢেউ যেন তাহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, যেন ফরাসিদেশে মধ্যযুগের পুনরাবির্ভাব। অনেক অত্যাচার, অনাচার, অবিচার মোর্ণির পরামর্শে সংঘটিত হয়। যথেচ্ছাচারিত্ব চরম সীমায় উঠিয়াছিল। মোর্ণি সকলের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। শব্দ হইলেই প্রতিধ্বনি, ঘাত হইলেই প্রতিঘাত, ক্রিয়া হইলেই প্রতিক্রিয়া—এই নিয়মে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ শাসিত হয়। সুতরাং অত্যাচার-প্রপীড়িত প্রজাপুঞ্জ ফ্রান্সের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। মুসে ফ্লোকে নামক এক ব্যক্তি সাধারণের মুখপাত্র হইয়া সাহসপূর্ব্বক রাজ্য-শাসনের দোষ-গুণ বিচার করিতে আরম্ভ করিল। এবং সত্যের খাতিরে যথেষ্ট নিন্দাবাদও করিল। শুনা যায় ১৮৬৭ সালের পারির জাতীয় প্রদর্শনী মেলা উপলক্ষে সকলে আনন্দোৎসব করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের মনের ভিতর দুঃখপ্রবাহ অন্তঃসিলা হইয়া অনবরতই বহিতেছিল। সাধারণের মনের ভাব এইরূপ,—উপরে শীতলতাময় তুষ্ণীম্ভাব, কিন্তু অন্তরের অন্তরে বিষাদের অনলকণা। সুযোগ ও নেতা অভাবে প্রকাশ্যতঃ এতদিন বিদ্রোহের কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই। আজ

সে সুযোগ উপস্থিত, সে নেতা সম্মুখে। আজ সমগ্র ফ্রান্সে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমগ্র ফরাসি দেশ কাঁপিয়া উঠিল।

য়ুজিনী টিনো নামক এক ব্যক্তি ফ্রান্সের রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। ঐ গ্রন্থ পুরাতন ঘটনাবলী-সম্বলিত শোকাবেগপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাস। ফ্রান্স, সাম্রাজ্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে রাজপুরুষেরা যে ঘোষণা প্রচার করেন তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রজাসমূহ বদ্ধপরিকর হয়। তাহাতে রাজকর্ম্মচারীগণ বিষম বিরক্ত হইয়া ও আপনাদিগকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া রাজসৈন্য সাহায্যে প্রজাবিদ্রোহ দমন করিতে যান ও নিরীহ প্রজাদের উপর গোলাবর্ষণ ও অস্ত্র প্রহার করিয়া তাহাদের বিনাশ করেন। ইহার চরম ফল—বুলিভাঁর হত্যাকাণ্ড ও বডিনের মৃত্যু। এই সমস্ত অত্যাচারের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল আর অমনি আপামর সাধারণ প্রতিশোধ লইবার জন্য তৎপর হইল।

সাধারণের মনের অবস্থা ত এইরূপ, এমন সময় আর এক ঘটনা উপস্থিত। সোনায় সোহাগা। ফরাসি জাতির মধ্যে এক প্রথা আছে All soul's day পর্ব্বদিনে সকলে ফ্রান্সের প্রকাণ্ড সমাধিক্ষেত্রে ও আপন আপন মৃত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কবরে ফুলমালা দিয়া তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করে। আজ ঐ পর্ব্বদিন উপস্থিত। সকল প্রজা মিলিয়া প্রজাবন্ধু পরলোকগত বডিনের সমাধিস্থানে গেল ও ফুলের মালা দিয়া ভক্তিভাবে বডিনের কঙ্কালাবশিষ্টের অর্চ্চনা করিল। উদারস্বভাব বডিন দরিদ্রের সন্তান, পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়া স্বদেশবাসীর জন্য রাজার হাতে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সেই সমাধিক্ষেত্রে সমবেত প্রজামণ্ডলী ক্ষণঃকাল স্থিরচিত্তে মহাত্মা বডিনের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন তাঁহার প্রেতাত্মা আসিয়া সকলের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিল। অমনি এক সময়ে সকলের হৃদয়যন্ত্র হইতে একটী সুর বাহির হইল—সকলে সমস্বরে গাহিয়া উঠিল—"স্বাধীনতা সম ধন নাহি ক্ষিতিতলে।"

রাজকর্ম্মচারিরা গুপ্তভাবে এই সকল ব্যাপার সন্দর্শন করিতেছিলেন। এত বাড়াবাড়ি তাঁহাদের আর সহ্য হইল না, অথবা এ উদ্ধতভাবকে প্রশ্রয় দিতে তাঁহাদের সাহসে কুলাইল না। পুলিস লইয়া গিয়া সেই সমস্ত লোককে বন্দী করা হইল। "রেঁভিলে" পত্রিকার সম্পাদক দেলাক্লু ঐ অপরাধে অপরাধী বলিয়া তাঁহাকেও বন্দী হইতে হইল। সকলেই বিচারে আনীত হইলেন। ১৮৬৮ সাল ১৭ই নভেম্বর তারিখে "পেলেডি জষ্টিস্" নামক বিচারালয়ে ইহাঁদের বিচার আরম্ভ হইল। গাম্বেতা দেলার উকিল হইলেন।

মিরাবোঁর ন্যায় বীরদর্পে ও জুলে ফেবারের ন্যায় তীব্র শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপাত্মক ভাষায় গাম্বেতা বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—

"এই বিচারে দুই পক্ষ। একদিকে রাজপুরুষেরা,—শাসনকর্ত্তার দল; অপরদিকে শাসিত প্রজামণ্ডলী। একা দেলাক্লঁ লইয়া এ বিবাদ নহে।

"একাদিক্রমে ১৬ বৎসর ধরিয়া প্রজারা অশেষ ক্লেশ ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছে। সে কষ্টের আর অবধি নাই, সে দুঃখের সীমা নাই, সে যন্ত্রণার অন্ত নাই। গরীব, নিঃসহায়, নিঃসম্বল প্রজাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে অনলশিখা ধীকি ধীকি জ্বলিতেছিল আজ তাহা প্রচণ্ড দাবাগ্নিসম জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দুস্তর সাগরের অসীম জলরাশি ঢালিলেও সে অগ্নিকুণ্ড নির্ব্বাপিত হইবার নহে। হে রাজন্যবর্গ! ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে তোমরা স্বদেশে কর্তৃত্ব ও শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছ। পাইয়াছ বলিয়াই কি দুর্ব্বল প্রজার উপর এত অত্যাচার অবিচার করিতে হয়? অকারণে তাহাদিগকে অহরহঃ নিষ্পেষিত করিতেছ। বুঝিয়াছি, দুর্ব্বলকে পদদলিত না করিতে পারিলে বীরের বীরত্ব কোথায়? মহতের মহত্ব কোথায়? তোমরা নির্ব্বিরোধী গরীব প্রজার রক্তে ফ্রান্সের পুণ্যভূমি প্লাবিত ও কলঙ্কিত করিলে। তাহাদের অর্থ যাদুকরের ন্যায় মন্ত্রবলে উড়াইয়া দিলে। তাহাদের মান সম্ভ্রম, পদ মর্য্যাদা, জাতীয় গৌরব সকলই লোপ করিলে। এক কথায় তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ নষ্ট হইল। তোমাদের নিকট এখন সানুনয়ে এই মিনতি করি ও এই ভিক্ষা চাই,—স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রের অনুরোধে আজ একবার দীনহীনা, চিরসন্তাপিতা ফ্রান্সের প্রতি কৃপাকটাক্ষে চাও—একবার চাহিয়া দেখ মাতৃভূমির কি দুর্দ্দশা, কি লাঞ্ছনা ঘটিয়াছে।"

৪।

কোরলেজিস্‌লেটিভ্ নামক ব্যবস্থাপক সভায় বেরিয়ঁা এক জন সভ্য ছিলেন। বেরিয়ঁার মৃত্যুর পর ঐ সভায় তাঁহার পদ শূন্য হইল। মুসে থেয়ার্স, মুসে লেসিপে ও মুসে গাম্বেতা এই তিন জন সেই পদের জন্য প্রার্থী হইলেন। যাহার যত গুণ তাহার তত আদর। কুসুম পদদলিত হয় না। সংসাররত্ন বাসুকীর মস্তকেই শোভা পায়। প্রতিযোগিতায় যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই স্থায়ী হয়। দেশের লোক গাম্বেতার পক্ষ হইল। গাম্বেতাই মনোনীত হইলেন। নির্ব্বাচনকালে তিনি এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।—

"নির্ব্বাচনপ্রথা সুসভ্য জাতির সভ্যতার পরিচয়স্থল। আত্মশাসন ইহার ভিত্তিমূলক। প্রজা নিজের অবস্থা বেশ বুঝে। আমার অভাব আমি যতটা বুঝিতে পারি, অপরে কি ততটা বুঝিতে পারে,—না বুঝিবে? প্রজার অভাব প্রজা যতটা বুঝে, রাজা তাহার শতাংশের এক অংশও বুঝে কি না সন্দেহ। রাজা চিকিৎসকের ন্যায় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহার ফলও কোন স্থলে হিতকর, কোনস্থলে অহিতকর হইতে দেখা যায়। কোথাও বা রোগ আরোগ্য হয়, কোথাও বা রোগের উপশম হয়, কোথাও বা হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যিনি সুচিকিৎসক, তাঁহার চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা অতি সুন্দর। তিনি স্থিরচিত্তে রোগীর শারীরিক ও মানসিক সমস্ত অবস্থা শুনেন, তৎপরে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা স্থির করেন। সুতরাং প্রায়ই সুফল

ফলিয়া থাকে। রাজারা প্রায়ই প্রজার সমস্ত অবস্থা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করেন না। অনেক স্থলে সেরূপ করাও সম্ভবপর নহে। প্রজার কি অভাব কি দুঃখ তাহা তিনি আদৌ অবগত নহেন, অথবা আংশিকরূপে অবগত। হয়ত যাহা শুনিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক। এ জন্য কোন ফল ফলে না। প্রজার যে অভাব সেই অভাবই থাকিয়া যায়; আজিও যে দুঃখ, কালিও সেই দুঃখ। প্রজা সুখে থাকিলে রাজার সুখ, প্রজার কষ্টে রাজার কষ্ট। যে শাসন-প্রণালী ন্যায়, সুবিচার, একতা ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী তাহার নাম নিয়মতন্ত্র। যাহাতে প্রজার সুখ-সচ্ছন্দ বিবিধ প্রকারে বৃদ্ধি করে তাহার নাম প্রজাতন্ত্র। প্রজার হাতে গ্রাম গণ্ডগ্রাম, নগর উপনগর ও পল্লীর শাসনভার দিলে শাসনকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়, রাজারও পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইয়া থাকে। দেশের শাসন দেশের হাতে, ইহাই শাসনতন্ত্রের মূলমন্ত্র। প্রজাতন্ত্র ইহার একটী অঙ্গমাত্র। আত্মশাসনে দেশের গৌরব, জাতির গৌরব, রাজার গৌরব। নির্ব্বাচনপ্রথা আত্মশাসন-বৃক্ষের একটী ফলমাত্র। এ প্রথার দোষও আছে, গুণও আছে। তন্মধ্যে দোষের ভাগ সামান্য, গুণের ভাগই অধিক। ইহার প্রধান দোষ দলাদলী, হিংসা হানি, দ্বন্দ্ব দ্বেষ, উৎকোচ দান প্রভৃতি। যে জাতির মধ্যে এই সমস্ত দোষ পরিলক্ষিত হয় সে জাতি আত্ম-শাসন পাইবার উপযুক্ত পাত্র নহে। কিন্তু হায়! ফ্রান্সের অবস্থা অতীব শোচনীয়। রাজার সহায়, শাসন-প্রণালীর সোপান, উন্নতির সেতু, সুখের আকর—এ হেন প্রজাতন্ত্র,—এ প্রজাতন্ত্রের মর্ম্ম অভাগা ফরাসি জাতি বুঝিল না; এ পোড়া দেশে এ হেন অমূল্য রত্নের আদর কেহ করিল না।”

অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন মনের নিভৃত কক্ষে ক্রমে জ্ঞানরশ্মি প্রবেশ করিল, আর সেই তিমিরাবৃত কক্ষ অমনি আলোকিত হইল। বক্তৃতা শুনিয়া অজ্ঞ লোকের চমক হইল; নিষাড় ও নিস্পন্দ দেহ সচেতন হইল। গাম্বেতার নির্ব্বাচনে আর একটী নূতন রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হইল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতন্ত্র-প্রণালী ফ্রান্সে অচিরে পুনঃপ্রবেশ করিবে তাহারও আভাস পাওয়া গেল। গাম্বেতা পদাভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বেই এক প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। এই সুসংবাদে প্রজাদের মনে আনন্দলহরী ছুটিতে লাগিল। গাম্বেতা এখন প্রজার প্রতিনিধি। কিসে প্রজাদের সুখ বৃদ্ধি হয়, কিসে তাহাদের দুঃখ ও অভাব মোচন হয়, কিসে তাহাদের রাজনীতিক স্বত্ব, ক্ষমতা ও অধিকার বিস্তার হয়—দিবা রাত্রি গাম্বেতার এই ইষ্টমন্ত্র। এমন কি দুঃখী প্রজার জন্য গাম্বেতা আপন প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এ কথা প্রজারা বিলক্ষণ জানিত ও বুঝিত। আর সেই জ্ঞান ও বিশ্বাসে তাহারা তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিত ও দেবতার ন্যায় পূজা করিত। এ সংবাদ তারযোগে য়ুরোপের সকল দেশে পৌঁছিল এবং মার্কিণ দেশেও সংবাদ পাঠান হইল। সকল দেশেই খল কপট কুতন্ত্রী লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সুসভ্য ফ্রান্সেও তাহার অপ্রতুল নাই।

এই সকল লোক গাম্‌বেতার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কের কালী দিবার মানসে প্রয়াস পাইতে লাগিল। দেশের ধনকুবেরগণ, জমিদারকুল ঈর্ষাপরবশ হইয়া গাম্‌বেতাকে বিষনয়নে দেখিতে লাগিল ও "একচক্ষুহীন" বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ ও উপহাস করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বিধিমতে গাম্‌বেতার স্ফটিকের ন্যায় বিশুদ্ধ কীর্ত্তি লোপ করিবার জন্য চেষ্টিত হইল। তাহারা সংবাদপত্রে ও প্রকাশ্য সভাস্থলে এই অপবাদ রটনা করিল যে, গাম্‌বেতা দেশের কণ্টক স্বরূপ ও সকল অনিষ্টপাতের মূল। অতএব উহাকে প্রশ্রয় দেওয়া অবিধেয়। ইহাতে প্রজাদের দৃঢ়ভক্তির বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। তাহাদের মনে সেই পূর্ব্বের স্থির বিশ্বাস অটল ভাবেই রহিল। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় বলিত—গাম্‌বেতা দুষ্টের দমন, দানবের দলন, অসহায়ের সহায়, সত্যের অবতার, সাহসের প্রতিকৃতি, স্বাধীনতার বরপুত্র, প্রজাদের উপাস্যদেবতা—অধঃপাতিত ফরাসি জাতির একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

বেদ।

ইহার অধ্যয়নাদি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই বেদাধ্যয়নে অধিকার ছিল। এক্ষণে সেই বেদাধ্যয়নের বিষয় কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। মনু বলেন—

অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ।
গুরৌ বসন্ সঞ্চিনুয়াদ্ ব্রহ্মাধিগমিকং তপঃ॥

দ্বিজাতির গর্ভাধান হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কারের বিধান করা হইয়াছে, যথাক্রমে, যথাকালে ঐ সকল সংস্কারকর্ম্মের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া দ্বিজগণ গুরুগৃহে বাস করত বেদাধ্যয়ন রূপ তপস্যার সঞ্চয় করিবে।

দ্বিজাতি হইলেই যে বেদাধ্যয়নে অধিকার হইবে এমন নহে। তবে যাহাদের দ্বিজকুলে জন্ম এবং শরীর ও মন গর্ভাধানাদি সংস্কার কর্ম্মদ্বারা সংস্কৃত সুতরাং পরিশুদ্ধ হইবে তাহারই বেদ অধ্যয়নে অধিকার হইবে; কারণ শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যথাকালে যাহার উক্ত সংস্কারকর্ম্মের অনুষ্ঠান না হয়, তাহাকে পতিত বলিয়া গণ্য করা হয়। সেই সংস্কারহীন পতিতের দ্বিজকুলে জন্ম হইলেও বেদ অধ্যয়নে অধিকার নাই। সংস্কারকর্ম্মাদির বিষয় পরে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে বলিতে ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে পিতার শুক্র ও মাতার শোণিত হইতে আমাদের শরীরের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় ও প্রতি শোণিতবিন্দুতে যে সকল মল প্রবেশ করে, সংস্কারকর্ম্মসকল ঐ মল অপনীত করিয়া সংস্কৃত ব্যক্তির বুদ্ধিকে এরূপ সর্ব্বতোভাবে পরিমার্জ্জিত ও সুতীক্ষ্ণ করে যে উহা গভীর অর্থ সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

উক্ত সংস্কার সকলের মধ্যে বিদ্যারম্ভের পূর্ব্বে অনুষ্ঠেয় সংস্কারের নাম উপনয়ন।

উপ শব্দের অর্থ সমীপে, নয়ন শব্দের অর্থ লইয়া যাওয়া; অর্থাৎ যাহার দ্বারা গুরু-সমীপে নীত হয়, তাহার নাম উপনয়ন। এই উপনয়ন সংস্কারের পর হইতে দ্বিজ-তনয়েরা গুরুর নিকট অবস্থিত হইয়া বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিতেন, এবং যাহার বেদাধ্যয়ন শেষ না হইত তিনি তাবৎকাল গুরুগৃহে বাস ও গুরুর পরিচর্য্যা করত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রমনে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতেন।

পিতা মাতা বন্ধুবান্ধবদিগের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর গুরুগৃহে বস বাস করত অধ্যয়ন যে বিশেষ ফলপ্রদ ইহা এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বোন্নত সভ্যগণও স্বীকার করেন; কেবল স্বীকার করেন এমন নহে, এই রীতিতেই তাঁহাদের অধ্যয়নকার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বর্ত্তমান য়ুরোপীয় শিক্ষাকার্য্যের বিষয় কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান রাখেন তাঁহারা ইহা বিশেষ অবগত আছেন যে, য়ুরোপীয় পিতা মাতাগণ প্রায় স্তন্যত্যাগের পর হইতেই স্ব স্ব শিশুসন্তানদিগকে অধ্যয়নের নিমিত্ত গুরুগৃহে প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত য়ুরোপের উন্নত দেশসমূহে নানা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম অতি-শিশু সন্তানদিগের অধ্যয়নোপযোগী বিদ্যালয়, তাহার পর অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্কদিগের অধ্যয়নোপযোগী বিদ্যালয়, এইরূপ ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় আছে। সকল প্রকার বিদ্যালয়েই ছাত্রদিগের সুখস্বচ্ছন্দে থাকার জন্য এক একটি আশ্রম সংশ্লিষ্ট আছে, ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই আশ্রমের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ছাত্রগণকে কেবল পুস্তক পড়াইয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা, আহার বিহার, আচার বিচার ইত্যাদি সমুদায়ের উপর সমান দৃষ্টি রাখেন। তাঁহারা ছাত্রদিগের সহিত একত্র আহার করেন, একত্র ক্রীড়া করেন, একত্র ভ্রমণ করেন, একত্র ধর্ম্মালোচনা করেন এবং পড়িবাব সময় একত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহারা ছাত্রদিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন, মাতার ন্যায় আদর করেন, গুরুর ন্যায় উপদেশ দেন, সুহৃতের ন্যায় আনন্দিত করেন এবং ভৃত্যের ন্যায় সেবা করেন। আমরা ইহাও শুনিতে পাই সেখানে নাকি অনেকস্থলে কলেজের প্রোফেসরগণ ছাত্রদিগের আশ্রমে অবস্থানকালে ফ্রি-ওয়ালার মত প্রত্যেক ছাত্রের কক্ষে গমন করিয়া তাহার পাঠ্য পুস্তকের অধীতাংশের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থান ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, সর্ব্বদা ইহা জিজ্ঞাসা করেন।

সেখানে শিক্ষকদিগের এইরূপ ব্যবহার বলিয়াই পিতা মাতা আপনাদের অতি-শিশু সন্তানকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের হস্তে বিন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। ছেলে আজ কুসঙ্গে বেড়াইতেছে, আজ পাড়ায় পাড়ায় খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, প্রতিবেশীগণের উদ্যানে বৃক্ষলতার ছেদ করিয়া ফুল ও ফলের অপচয় করিতেছে; পুত্রের উক্তরূপ অসংখ্য অপকর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের জন্য অভিযুক্ত বা দুঃখিত হইতে হয় না। পুত্রের আজ মস্তকবেদনা, আজ হৃদয়বেদনা, আজ উদরাময়, আজ কফ,

আজ জ্বর ইত্যাদি নানাবিধ পীড়ার জন্য চিন্তা করিতে হয় না। সে সকল দুঃখ বা চিন্তা শিক্ষক নিজস্কন্ধে গ্রহণ করেন; আর কেবল গ্রহণ করেন এমন নহে, ঐরূপ ঘটনা সঙ্ঘটিত হইলে বিধিমতে তাহার প্রতিকারের চিন্তা করেন। আরও শুনা যায় যে, যাহাতে অতি দরিদ্র হইতে রাজ-রাজেশ্বরের পুত্র অবধি স্ব স্ব অবস্থোচিত সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে সেখানে এইরূপ বন্দোবস্ত আছে। সভ্যদেশে অর্থব্যয় ভিন্ন কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, সমুচিত বেতন ব্যতীত কেহ এক-গাছি তৃণ নাড়াইয়াও উপকার করে না, তবে সেখানকার মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য-প্রতি-পালন-জ্ঞান প্রবল থাকায় পয়সা ব্যয় করিতে পারিলে কষ্টেরও বিশৃঙ্খলতার ভাবনা থাকে না।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের বিদ্যার্থিগণ গুরুগৃহে বাস করতই অধ্যয়ন সমাপন করিতেন। এ বিষয়ে আমাদের দেশের রীতিনীতি অতি উচ্চ ও পবিত্র ছিল। য়ুরোপীর শিক্ষকগণ বেতন গ্রহণ করিয়া যে সকল কার্য্য করেন, ভারতীয় অধ্যাপক-গণ বিনা বেতনে নিজ হইতে ছাত্রদিগকে আবাসস্থান ও আহারাদি দান করিয়া সেই সকল কার্য্যই করিতেন। তাঁহারাও প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত ছাত্রগণের সহিত একত্র অবস্থান করিয়া কখন তাহাদিগকে পুস্তক পড়াইতেন, কখন তাহাদিগকে মুখে মুখে নানাবিধ নীতি উপদেশ করিতেন, কখন তাহাদিগকে পুরাণ ইতিহাসের গল্প শুনাইতেন, কখন বা তাহাদের সহিত ধর্ম্মান্দোলন করিতেন। তাঁহারাও ছাত্রদিগকে পিতার ন্যায় প্রতি-পালন, মাতার ন্যায় সমাদর, ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ, সুহৃদের ন্যায় প্রেম করিতেন; তবে বিশেষ এই য়ুরোপীয় শিক্ষকগণ বেতন লইয়া এইরূপ ব্যবহার করেন সুতরাং তাঁহাদের কার্য্য স্বার্থ-প্রণোদিত, ভারতীয় পণ্ডিতগণ বিনা বেতনে নিজ ব্যয়ে এইরূপ ব্যবহার করিতেন, কাযেই তাঁহাদের কার্য্য নিঃস্বার্থ হওয়ায় আরও মধুর বলিয়া প্রতীয়-মান হয়। আর একটি কথা, য়ুরোপীয় গুরুগণ ছাত্রদিগকে স্ব স্ব অবস্থানুসারে সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিয়া শিক্ষাদান করেন। গরীবের ছেলে গরীবানা চালে থাকিয়া এবং ধনবানের ছেলে বড়মানষী ভাবে থাকিয়া বিদ্যাভাস করে; কিন্তু ভারতীয় অধ্যাপকগণের নিকট সেরূপ তারতম্য ছিল না; তাঁহারা কি দীন হীন দরিদ্রের পুত্র, কি লক্ষপতির পুত্র সকল ছাত্রকেই একভাবে দেখিতেন, সকলের উপর সমান যত্ন করিতেন এবং সকলের প্রতি সমান পরিশ্রম করিয়া শিক্ষাদান করিতেন। অদ্যাপিও ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে এই রীতির ছায়ামাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক আমরা গুরুগৃহে বাস করিয়া অধ্যয়ন বিশেষ ফলপ্রদ এবং যুক্তিসঙ্গত ইহা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনে-কটা অন্য কথা বলিয়া ফেলিলাম। এক্ষণে আবার মূল বিষয়ের অনুসরণ করি। অধ্যয়ন কালে গুরুগৃহে বাস সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। দেখ, পিতা মাতা সন্তানের সম্পূর্ণ মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী হইলেও স্বাভাবিক উদ্বেল স্নেহে অভিভূত হওয়ায় সন্তানদিগকে সমুচিত

শাসন করিতে অক্ষম। সন্তানের সকল কার্য্যই তাঁহাদিগের চক্ষে মধুরতাময়, সন্তানের সৎপথ হইতে স্খলন সহজে তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, আর দৃষ্টি-গোচর হইলেও স্নেহে মুগ্ধ হইয়া সহজে তাঁহারা সন্তানের উপর কোন রূপ রূঢ় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন না ; ফল পিতা মাতার স্নেহ বল, আদর বল, অনবধানতা বল বা ঔদাস্য বল ঐ জন্য যে অনেক সন্তা-নের অধোগতি হয়, তাহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করি।

আরও দেখ, কি দরিদ্র, কি ধনী সংসারী মাত্রেই নিজ নিজ অবস্থানুসারে ভোগ-বিলাসে আসক্ত। বালকেরা সম্মুখে যাহা দেখে তাহারই অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে, সুতরাং বিদ্যাভাসের সময় পিতা মাতার সহিত একত্র থাকিলে বালকদিগের বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্তি না হইয়া বিষয়াসক্তি প্রবল হয়। অপিচ পিতৃগৃহবাসী বালক-দিগের সামাজিক ব্যবহার, বন্ধু বান্ধবের সহিত আলাপ পরিচয়, সমবয়স্কদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুক, গ্রাম্যোৎসবাদি পরিদর্শন প্রভৃতি বিদ্যাভাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্তরায় হইয়া উঠে। এই সকল কারণে গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বিদ্যাভাসের বিধান করা হইয়াছে।

বিদ্যাভ্যাস এক প্রকার তপস্যার স্বরূপ। ইহাতে মনের একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়ের সংযম, আহারাদির নিয়ম, বাহ্যাভ্যন্তরের পরিশুদ্ধি, সদাচার প্রভৃতির সম্পূর্ণ আবশ্যকতা আছে ; এই নিমিত্তই মহর্ষি মনু বিদ্যাভ্যাসকে তপস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনু আবার বলিতেছেন—

তপোবিশেষৈর্ব্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ।
বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা॥

দ্বিজাতিগণ নানা প্রকার নিয়ম এবং শাস্ত্রোক্ত বহুবিধ ব্রতের অনুষ্ঠান করত উপনিষদভাগের সহিত সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিবে।

অনাচারী ব্যভিচারী পতিত সূপকার ব্রাহ্মণ বা অন্ত্যজ বাবুর্জ্জী দ্বারা প্রস্তুত রশুন পলাণ্ডু প্রভৃতি গরম মশলার সহিত সংস্কৃত, মৎস্য-মাংস-ভূয়িষ্ঠ, অপবিত্র অন্ন-রাশি দ্বারা পরিপুষ্টাঙ্গ ও পূর্ণোদর হইয়া তাম্বূলপূরিত মুখে হর্ম্ম্যতলে সুশীতল কক্ষা-ভ্যন্তরে উপবেশন পূর্ব্বক সন্ধ্যাহ্নিক-বর্জ্জিত অনাচারী যথেচ্ছাচারী নাস্তিক গুরুর নিকট পবিত্র বেদশাস্ত্রের অধ্যয়ন অস-ম্ভব। কারণ তাদৃশ শিক্ষক বা শিষ্য কেহই বেদের গভীর অর্থ ও পবিত্র ভাব সংগ্রহ করিতে সক্ষম নহে। এই নিমিত্ত শাস্ত্র-কারেরা বলিলেন নানাবিধ পবিত্র নিয়ম ও পবিত্র ব্রতাদির অনুষ্ঠান করত পবিত্র বেদ সমুদয় অধ্যয়ন করিবে। আবার দেখ—

বেদমেব সদাভ্যসেত্তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসোহি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে॥

কোন দ্বিজতনয় যদি তপস্যাচরণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে সর্ব্বদা বেদাভ্যাস করিবেন ; কারণ দ্বিজাতির পক্ষে বেদাভ্যাসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা।

এক্ষণে কিরূপ নিয়ম সকলের অনুষ্ঠান করত বেদাধ্যয়ন করিবে ভগবান্ মনু তাহা উল্লেখ করিতেছেন।

সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥

উপনীত ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করত বক্ষ্যমান নিয়ম সমূহের অনুষ্ঠান করিবে এবং আপনার তপস্যাজনিত পবিত্র ভাব বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণের সংযম করিবে। আর কি করিবে ?—

নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেবচ॥
বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যংরসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বানি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষোরূপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্॥
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥

শরীর ও মনকে সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ রাখিয়া নিত্যস্নান করিবে, দেবর্ষি ও পিতৃগণের তর্পণ, দেবতার অর্চ্চনা এবং সমিৎ ও কুশের আহরণ করিবে। মদ্য, মাংস, গন্ধ, মাল্য নানাবিধ রস ও অশেষ প্রকার শুক্ত পরিত্যাগ করিবে এবং প্রাণিগণের উপর হিংসা করিবে না। অঙ্গে তৈলাদি লেপন করিবে না, নেত্রে অঞ্জনদান করিবে না, জুতা ও ছাতি ব্যবহার করিবে না। এতদ্ভিন্ন কামভাবের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, দ্যূতক্রীড়া, লোকের নিন্দা, পরের সহিত বিবাদ এবং মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীগণের দর্শন বা তাহাদের সহিত একত্র সহবাস করিবে না, কোন প্রকারে পরের অপকারেও প্রবৃত্ত হইবে না। এইরূপ নিয়ম সকলের প্রতিপালন করত বেদজ্ঞ এবং বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণদিগের গৃহে প্রত্যহ আপনার জীবিকোপযোগী ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। নিতান্ত নিঃসম্পর্ক লোকদিগের গৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, গুরুর কুলে অথবা আপনার জ্ঞাতিকুল ও বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবে না। তবে অন্যত্র ভিক্ষা লাভ না হইলে উহাদিগের নিকট হইতেও ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পার। প্রত্যহ দূরদেশ হইতে সমিৎ কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়ম ও সংযমের অনুষ্ঠান করত যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করে সেই প্রকৃত বেদজ্ঞ পদবাচ্য হয়, এবং লোকসমাজে সম্মান প্রাপ্ত হয়। মনু বলেন—

যঃ স্বাধ্যায়মধীতেঽব্দং বিধিনা নিয়তঃ শুচিঃ।
তস্য নিত্যং ক্ষরত্যেষ পয়ো দধি ঘৃতং মধু।

পবিত্র ভাব আশ্রয় করিয়া যদি কেহ এক বৎসর পর্য্যন্তও বেদাধ্যয়ন করিতে সক্ষম হন, ঐ বেদই তাঁহার নিমিত্ত নিত্য দুগ্ধ, দধি এবং মধু ক্ষরণ করে। অর্থাৎ এই সংসারের সর্ব্বপ্রকার উত্তম উত্তম ভোগ্য বস্তু তিনি প্রাপ্ত হন। বেদাধ্যয়নের আরও ফল শুনা যায়। আমরা পর প্রবন্ধে তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলির বিষয় কীর্ত্তন করিব, এবং দ্বিজাতির পক্ষে বেদাধ্যয়ন না করা যে অধিক দোষাবহ তাহাও দেখাইব।

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

ভাষায় বড় গোল।

বার বার আমাকে লিখিতে বলিবেন না। অনুরোধ রাখিতে পারি না বলিয়া আমারও লজ্জা হয়, আপনারও কাজ হয় না। তবে মিছা এ অনুরোধ করা কেন?

লিখিবার নানা গোল। বানানের কথা ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছি, এবার আর এক গোলের কথা বলি শুন। এ গোল—ভাষার গোল। ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, ভাষার প্রয়োজন। কিন্তু আজি কালি দেখিতে পাই যে অনেকের সঙ্গেই আমার ভাষা মিলে না। অন্যে যাহা বলেন, কিম্বা লেখেন, অতি কষ্ট করিয়াও তাহা আমি বুঝিবার চেষ্টা করি; শেষে ঠিক বুঝিতে পারিলাম কি না, সে সংশয়ও থাকিয়া যায়। আবার আমি এক ভাবিয়া লিখি কি বলি, অন্যে বুঝেন আর! এ কি কম বিড়ম্বনা?

গোলটা কেন হইয়াছে জানেন? গোল হইয়াছে শুধু বিজাতীয় লোকের আম্দানীতে। বিজাতীয় লোকে বিজাতীয় ভাষাও সঙ্গে করিয়া আইসে। আর সেই বিজাতীয় ভাষার ভিতরে বিজাতীয় ভাবই বোঝাই করা থাকে। গোল ত হইবেই।

আমাদের ভাষা সংস্কৃত। বাঙ্গলা মুলুকে বাস হইলেও সংস্কৃতই আমাদের ভাষা। বেশ প্রণিধান করিয়া বুঝুন। ডালা কুলা ধুচুনী প্রভৃতি নিতান্ত মোটা মোটা জিনিসের নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষার দরকার হয় না বটে, কিন্তু ভাষার কাজ ত শুধু ডালা কুলা ধুচুনী লইয়া নহে। ডালা কুলা ধুচুনীর ভিতর ভাবের গোল কিছু নাই; গোল হয়, যেখানে ভাবের পরিচায়ক পদার্থ প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনা নাই,—সেই-খানে। যে পদার্থ বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হয় না, কেবল অন্তরিন্দ্রিয়েরই গোচর হয়, তাহার বেলাতেই গোল। কুলা ডালা ধুচুনী বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর পদার্থ, কাজেই তাহাতে গোল নাই। কিন্তু আত্মা, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, জ্ঞান, বিজ্ঞান প্রভৃতি ত বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হয় না—গোলও সেই-খানে বাধিয়া যায়।

গোলের বাড়াবাড়ি হইয়াছে, ইংরেজীর এই ছড়াছড়ীতে। মুসলমানেরাও এ দেশে আধিপত্য করিয়াছিল, তাহাদের ভাষাও আমাদের ঘরে আসিয়া জুটিয়াছে; কিন্তু ইংরেজীর মত উৎপাত করিতে পারে নাই। ইংরেজীর সঙ্গে আমাদের এখন যেমন মিশামিশি, আরবী ফারসীর সঙ্গে তেমন মিশামিশি কখনই হয় নাই। পরের ভাষা যেমন আসিয়াছিল, তাহা রহিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তেমনি পর হইয়াই রহিয়াছে। এখন যেমন হিন্দু মুসলমান এক গ্রামে বাস করিতেছে, অথচ আদান প্রদান বিষয়ে সাবধান থাকায় হিন্দু হিন্দুই আছে, মুসল-মান মুসলমানই রহিয়াছে; সেইরূপ আমা-দের কথা বার্ত্তায় আরবী ফারসী চলিত থাকিলেও আরবী ফারসীর কোন শব্দ স্বরূপ পরিত্যাগ করে নাই, আমাদের কোন শব্দকেও বিকৃত করিতে পারে নাই। তবে সে সকল শব্দে তাহাদেরই উপযুক্ত কাজ অবশ্য চলিয়া যাইতেছে। তেমন

মুসলমানকে দিয়াও হিন্দুর অনেক কাজ হইতেছে, আর হিন্দুকে দিয়াও মুসলমানের অনেক কাজ হইতেছে।

কিন্তু ইংরেজী ভাষার সঙ্গে তেমন সম্বন্ধটি আমরা রাখি নাই। আস্ত ইংরেজী শব্দকে গ্রহণ করিতে আমরা নিতান্তই নারাজ। গোড়াতেই বলিয়াছি যে ভাবের দ্যোতক শব্দ লইয়াই ভাষা। তা আমরা এখন ইংরেজী ভাবটুকু গ্রহণ করি; ভাবের সেই আবরণটি বদলাইয়া দিয়া, তাহাকে একটি ঘরের পোষাক পরাইয়া লই। তাহার ফলে ভাবেও গোল পড়িতেছে, ভাষাতেও দোষ ঘটিতেছে।

ইংরেজও মানুষ, হিঁদুর ছেলে বাঙ্গালীও মানুষ। কিন্তু দুটীতে ভয়ানক অমিল। বাহিরেও অমিল আছে, কিন্তু ভিতরের তুলনায় সে অমিল অতি অল্প। ভিতরে ব্রাহ্মণ-ম্লেচ্ছের প্রভেদ! আর অধিক কি বলিব? খুব ফর্সা রঙ্গের ঘোষের পো-কে কোট্ হাট্ পরাইয়া দিলে ঘোষের পো কিছু ইংরেজ বনিয়া যায় না; আর মোক্ষমুলরের টিকি রাখিয়া, মাথা চাঁচিয়া, তাঁহাকে উপবীত দিয়া ত্রিকচ্ছ করিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেও তিনি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য হইবেন না। তবে এটুকু হয় যে এই ভাবান্তরের দরুণ ঘোষের পো-কে আর ঘোষের পো বলিয়া ঠিক্ মনে হয় না, এবং মোক্ষমুলরকেও, অক্সফোর্ডের সেই জর্ম্মণ প্রোফেসর মনে করিতে সংশয় হয়। ভাষাবিষয়েও এই উপসর্গ উপস্থিত।

এখনকার যাঁহারা লিখেন কি বলেন বাঙ্গলায়, তাঁহারা প্রায়ই শিখেন ইংরেজীতে, তাঁহাদের মনের যে ভাবটি প্রকাশ পায়, তাহা প্রায়ই ইংরেজী ভাব। কিন্তু সেটিকে আমাদের পরিচ্ছদ পরাইয়া বাহির করা হয়। অনুবাদ বা ভাষান্তর করা আজি কালি খুব প্রচলিত। কিন্তু অনুবাদ বা ভাষান্তর প্রায়ই হয় না, হইতে কেবল ভাবান্তরই হয়। মনে করুন আমি শিখিয়াছি God (গড্)। এখন গড্ শব্দ যে ভাবের পরিচায়ক, যাহাদের গড্ তাহারাই সে শব্দলক্ষ্য ভাবের স্বরূপ জানে। আবার "ঈশ্বর" এই শব্দটি যাহাদের, তাহারাই ঈশ্বর পদার্থের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারে। কিন্তু যদি গড্ শিখিয়া ঈশ্বর বলি, তাহা হইলেই গোলযোগের সম্ভাবনা হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুসলমানদের সময়ে এ গোল হয় নাই; কিন্তু এখন এই ইংরেজীর আমলে এই গোল বিলক্ষণ হইতেছে। সংস্কৃত শব্দগুলিকে ইংরেজী ভাবের পরিচায়ক করিতে গিয়া একে আর হইয়া উঠিতেছে। সংস্কৃত বিকৃত হইতেছে, আর ইংরেজীরও প্রকৃত পরিচয় হইতেছে না।

দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অধুনাতন যত লেখা বাহির হইতেছে প্রায়ই তাহা এই বিকারগ্রস্ত। অবশ্য প্রত্যক্ষের বিষয় স্থূল পদার্থের কথা যে লেখায় থাকে, তাহার কথা বলিতেছি না। সূক্ষ্ম ভাবের কথা যেখানে, গোলও সেই খানে। তবু গোলযোগের দুই একটা দৃষ্টান্ত দিব না কি?

ইংরেজী পড়িয়া জানিলাম যে যাট্ কি পঁয়ষট্টি এই রকম কত elements (এলিমেণ্ট্স্) আছে। যদি বলিবার সময় ঐ শব্দেরই প্রয়োগ করি, তাহা হইলে কোন

গোলই হয় না। কিন্তু তা না করিয়া সাহেবকে ধুতি চাদর পরাইলাম—অর্থাৎ elements (এলিমেণ্ট স্) না বলিয়া বলিলাম—ভূত। এখন আমাদের গ্রন্থে লেখে যে ভূতের সংখ্যা পাঁচটি মাত্র। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, সেই এলিমেণ্টগুলিকেই ভূত করিয়া লইলাম। দেশী ভূত বিলাতী ভূতের কাজ করিতে গিয়া ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্ট করিল; আপনিও উপহাসাস্পদ হইল, এবং নিজের চৌদ্দ পুরুষকেও গালাগালি খাওয়াইল। অর্থাৎ ইংরেজীতে শিখার গুণে স্থির করিলাম যে ভূত পাঁচটি নয় যাট পঁয়ষট্টিই বটে; আর ক্ষিতি কি জল, কি তেজ, কি বায়ু, কি আকাশ ইহারা কেহই ভূত নহে, আর যাহারা ইহাদিগকে ভূত বলিয়াছে তাহারা নিতান্ত বর্ব্বর। বিলাতী ভূতের বেগার দিতে গিয়া দেশী ভূতের পরিচয় নষ্ট হইল, আর পূর্ব্ব পুরুষকেও গালি খাইতে হইল। এমন ভূতে-পাওয়া দৃষ্টান্ত যত ইচ্ছা ততই দেওয়া যাইতে পারে।

এই জন্য আমি বলি যে আগে ভাষার বিবাদটা মিটান যাউক, তাহার পর যাহা লিখিতে হয় লিখিলেই চলিবে। এখনকার প্রচলিত ঐ রূপ ভূতগত ব্যাপারে ইংরেজীর কোন লাভ নাই, আমাদেরও সম্পূর্ণই ক্ষতি। বিবাদ মিটাইতে হইলে সংস্কৃত শব্দগুলির স্বরূপ পরিচয় লইতে হইবে। এই ভূত শব্দের দৃষ্টান্তে কথাটা বুঝাইয়া দিতেছি।

আমাদের সৃষ্টি-প্রকরণে দেখা যায় যে, প্রকৃতি হইতে মহতের উৎপত্তি। ঐ মহান্ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। এই অহঙ্কার ত্রিবিধ। সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতার সৃষ্টি, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে ভূতের সৃষ্টি।

পঞ্চীকৃত ভূত লইয়াই জগৎ। অপঞ্চীকৃত ভূত ইন্দ্রিয়গোচর হয় না, তাহা সূক্ষ্ম। পঞ্চীকৃত ভূতময় এই জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়করণক জ্ঞানগম্য হয়। এখন দেখুন যে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটিমাত্র; শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা। শ্রোত্রের দ্বারা শব্দজ্ঞান হয়, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ, চক্ষুর দ্বারা রূপ, জিহ্বার দ্বারা রস, এবং নাসিকার দ্বারা গন্ধ। এই পঞ্চ প্রকারের অতিরিক্ত জ্ঞান আমাদের হয় না, এবং হইতে পারে না। তাহার পর দেখুন শব্দ, আকাশের গুণ; স্পর্শ, বায়ুর গুণ; রূপ, তেজের গুণ; রস, জলের গুণ; গন্ধ, ক্ষিতির গুণ। সুতরাং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, এবং ক্ষিতি এই পাঁচ বিষয়েরই জ্ঞান হইল; পাঁচের অধিক বিষয়ের জ্ঞান হইল না। আর এই পাঁচটির নামই ভূত। তাহা যদি হইল, তবে বলুন দেখি এই পঞ্চভূতকেই ভূত বলিব, না কি এলিমেণ্টদিগকে ভূত সংজ্ঞা দিয়া এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার উপস্থিত করিব?

আজি কালি এই রূপ দাঁড়াইয়াছে যে, আপনারা লিখেন বিজ্ঞান, বুঝেন science; লিখেন বিবেক, বুঝেন conscience; লিখেন যুক্তি, বুঝেন reason; লিখেন ব্রহ্ম, বুঝেন god; লিখেন আত্মা, বুঝেন soul; লিখেন মুক্তি, বুঝেন salvation; লিখেন সংস্কার, বুঝেন idea; লিখেন বৃত্তি, বুঝেন faculty; লিখেন ইতিহাস, বুঝেন history;—কত

বলিব? আপনারও ত্যক্ত হইয়া উঠিবেন, আমারও কোন কাজ হইবে না।

হয় ইংরেজী ভাষা ঠিক রাখিয়া ঐ ভাষাতেই ইংরেজী ভাব প্রকাশ করুন; এবং আমাদের ভাষা ঠিক রাখিয়া যে শব্দে যাহা বুঝায়, তাহাই বুঝিবার এবং বুঝাইবার ব্যবস্থা করুন। না হয়, এখন যেমন মাথা মুণ্ড করিতেছেন তাই করুন; আমাকে আর লিখিতে অনুরোধ করিবেন না।

শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

মর্ম্মকথা।

মর্ম্মকথা বলিতে গেলেই মর্ম্মে আঘাত লাগে তাহা জানি। কিন্তু চিরকাল চাপিয়া রাখিলেই বা চলে কৈ? সুতরাং বলাই ভাল। আমরা হিন্দুসন্তান, ধর্ম্মকথাই আমাদের মর্ম্মকথা। অতএব যিনি যাহাই বুঝুন, আমরা এই প্রসঙ্গে সেই কথারই অবতারণা করিব।

হিন্দু-সন্তান আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিত;—হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর আচার; হিন্দুর দীক্ষা, হিন্দুর শিক্ষা; হিন্দুর পূজা, হিন্দুর উৎসব; এ সকলে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া আপনাকে উন্নত শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত করিত—এমন দিন আমাদের গিয়াছে। অধিক দিনের কথা নয়, হয় ত দশ বৎসর পূর্ব্বে এমন দিন ছিল। দশ বৎসর পূর্ব্বে সুশিক্ষিত হিন্দু-সন্তান সাহেবের মুখে শিখিয়া, সাকারোপাসনাকে অসভ্যের পুত্তলপূজা বলিয়া বুঝিতেন, আচার ব্যবহারকে ধর্ম্মতত্ত্বের বহির্ভূত সামাজিক প্রথামাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন, খাদ্যাখাদ্যের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া শাস্ত্রশাসনে উপহাস করিতেন। এখন ভগবানের কৃপায় ধীরে ধীরে সেই দুর্দ্দিনের যেন অবসান হইতেছে। কিন্তু এমন দিন কেন আসিয়াছিল, আর কিরূপে উহার অবসান হইতে পারে, সে বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

এমন দিন যে আমাদের কখনও ছিল, ইহা লজ্জার কথা, কলঙ্কের কথা, দুঃখের কথা হইলেও,—আশ্চর্য্যের কথা নহে। ব্যক্তিবিশেষ বা পরিবারবিশেষের উত্থান পতনের ন্যায়, জাতিবিশেষের উত্থান পতনও জগতের একটা নিয়ম। জগতের এই অনিবার্য্য নিয়মবশেই আর্য্যজাতির এই শোচনীয় অধঃপতন সংসাধিত হইয়াছিল। অধঃপতন সময়ে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায়, হিতাহিত বোধ থাকে না, দিন রাত্রি ঠিক থাকে না, আলোক অন্ধকারে প্রভেদ থাকে না, উচ্চ নীচ জ্ঞান থাকে না; তখন বুদ্ধি বিপরীতগামিনী হইয়া উঠে, কালকে তখন সাদা বলিয়া ভ্রম জন্মে, পতনকেই তখন উত্থান বলিয়া অনুমান হয়। পতনসময়ে আত্মপর বোধ একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যে আপনার লোক তাহাকে পর বলিয়া শত্রুতা করি, যে পর তাহাকে আদর করিয়া ঘরে আনিয়া ঘর মজাইয়া বসি। ইহার দৃষ্টান্ত যেমন ব্যক্তিবিশেষে,

তেমনি জাতিবিশেষেও জ্বলন্ত অক্ষরে দেখিতে পাই। ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত আজিও আমরা বাঙ্গলার পতনোম্মুখ ধনী পরিবারের ঘরে ঘরে নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি; আর জাতিগত দৃষ্টান্তের নিদর্শন দেখিয়া আসিতেছি,—কুরুক্ষেত্রের সেই মহাসমর হইতে দৃশদ্বতীর তীরে কাগারের রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত। বঙ্গীয় ধনীসন্তানগণ আজিও বুঝেন নাই যে পর কখনও আপনার হয় না, আপনার কখনও পর হয় না। না বুঝিয়াই তাঁহারা ভাই ভাই শক্রতা করিয়া আপনার মন্দ আপনি করিতেছেন, আপনার পতন আপনি সাধন করিতেছেন। ভারতের আর্য্যজাতির অধঃপতনও এমনি করিয়াই সংসাধিত হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজের সহিত শক্রতা করিবার জন্য জয়চন্দ্র প্রভৃতি স্বজনবর্গে জুটিয়া, পরাজিত পলায়িত মহম্মদ ঘোরীকে আত্মীয় ভাবিয়া, গিজনী হইতে আর্য্যাবর্ত্তে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

মুসলমান জয়োন্মাদে, ধর্ম্মোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া, কোরাণ-কৃপাণ করে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিতেছিলেন। তাঁহাদের অভ্যুদয়ের অল্পকাল মধ্যেই অর্দ্ধভূখণ্ড তাঁহাদের কর-কবলিত হইল, সীরিয়া আফ্রিকা, মিশর পারস্য, তুর্ক স্পেন, কাবুল কান্দাহার এ সকল পরাক্রান্ত রাজ্য অধিকৃত করিয়াও মুসলমান বহু চেষ্টায় বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই। মুসলমান বার বার পরাজিত বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। ১১৯১ খৃষ্টাব্দেও দুরন্ত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপধারী মহম্মদ ঘোরী তিরোরীর সমরক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের প্রবল প্রতাপে মস্তক নমিত করিয়া অতিকষ্টে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার দুই বৎসর পরেই ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে সেই মহম্মদ ঘোরীর পরাক্রমেই ভারতের পতন হইল। এ পতন কালকৃত ভিন্ন আর কি বলিব? পতনের কাল তখন সমুপস্থিত। কাল যত দিন হয় নাই, ততদিন মুসলমান কিছুই করিতে পারেন নাই। প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা ভারতজয়ের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সর্ব্বপ্রথম ভারতাক্রমণ করেন; তদবধি কতবার কত চেষ্টা করিয়াছেন, অবশেষে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে—৫২৯ বৎসর পরে কালকৃপায় সে চেষ্টা সফল হইল। এত দিন এ চেষ্টা কেন সফল হয় নাই, এত দিন প্রকৃত কাল কেন আসে নাই, এত দিন এই হিন্দু জাতি দুরন্ত দিগ্বিজয়ী মুসলমানের নিকট অজেয় হইয়াছিল কেন? বিদেশী বিধর্ম্মী, ইংরেজ ইতিহাসকারও স্পষ্টাক্ষরে ইহার উত্তর দিয়াছেন, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—"হিন্দুদিগের স্বজাতীয় ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়ানুরাগই এই অজেয়তার কারণ।" রাজস্থানের ইতিবৃত্তকার মহামতি টড্ সাহেবও একস্থানে বলিয়াছেন যে, "স্বধর্ম্মে ও স্বজাতীয় আচার ব্যবহারে ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকাতেই রাজপুত জাতি মোগল সম্রাটের প্রবল পরাক্রমেও পরাজিত হয় নাই।" ইংরেজের এখন সুসময়, ইংরেজ সৌভাগ্যশালী, তাই ইংরেজ এখন এ কথার অর্থ বুঝেন। বুঝাই-

লেও কিন্তু এ কথা আমরা এখনও ভাল করিয়া বুঝি না। স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বজাতি-নিষ্ঠাই যে জাতীয় শক্তি ও জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি, এই মহামন্ত্র আমরা সেই দৃশ-দ্বতীর তীরে পৃথ্বীরাজের শোণিতস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছি; অধঃপতনের প্রথম সোপানে সেই দিন পদক্ষেপ করিয়াছি; আত্মপর জ্ঞান, হিতাহিত জ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছি।

ধর্ম্মাধর্ম্মই যে জয় পরাজয়ের, উত্থান পতনের মূলমন্ত্র, এ কথা কি আর কখনও আমরা শুনি নাই? ইংরেজের ইতিহাস আছে, আমাদেরই কি নাই? আমাদের ইতিহাস নাই বলিয়া আক্ষেপ করা এখন-কারকালে একটা প্রচলিত প্রথা হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। ইতিহাসে কি শিখায় তা জানি না; কিন্তু এই যে বেদ পুরাণ, এই যে তন্ত্র সংহিতা, এই যে কাব্য দর্শন, এ সকলের ভিতর শিখি-বার সামগ্রী কি আমাদের কিছুমাত্র নাই? এ সকলও না বুঝি, এ সকলও না শিখি, ত রামায়ণ মহাভারতের ভিতরেও—আর কিছু না হউক, তোমার ইতিহাস-তত্ত্ব কিছু-মাত্র খুঁজিয়া পাই না কি? আজ সাহেবের ইতিহাসে যাহা শিখিয়া আমরা কৃতকৃতার্থ হইতেছি, আমাদের ইতিহাসে সেই তত্ত্বের অন্বেষণ করিয়া দেখিলে কিছু ক্ষতি আছে কি? ধর্ম্মে উন্নতি, আর অধর্ম্মেই পতন, এই মহাতত্ত্ব মহাভারতের সেই মহাসমরে যেমন প্রতিফলিত হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও আছে কি না তাহা জানি না। "যতো ধর্ম্ম-স্ততো জয়ঃ" এই মহামন্ত্র মহাভারতের মর্ম্মে মর্ম্মে যেন গাঁথা আছে। মহাভারত মহা-গ্রন্থ, মহাভারত মহাকাব্য,—মহাভারত ইতিহাস নয় কেন? যদি সন তারিখ ও রাজা-রাজড়ার নাম ধাম কণ্ঠস্থ করা ভিন্ন ইতিহাসে শিখিবার জিনিস আর কিছু থাকে বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে মহাভারতের তুল্য মহদিতিহাস জগতের আর কোন জাতির নাই। যদি বল মহাভারতের পর আমাদের ইতিহাস আর নাই; থাকুক না থাকুক সে কথায় কাজ নাই, কিন্তু মুসল-মান-বিজয়ের পর আমাদের ইতিহাস আর না থাকাই ভাল—অধঃপতনের আর ইতি-হাস কেন, পাপের আর পসার কেন, দরি-দ্রের আর দুন্দুভিধ্বনি কেন?

মহাভারতে বর্ণিত কৌরবপক্ষের অধঃ-পতনের পর আর্য্যজাতির আবার সমুত্থান হইয়াছিল। কলির প্রারম্ভেই একবার কুরু-ক্ষেত্র বাধিয়াছিল, কিন্তু কলির অধিকার তখনও সুবিস্তৃত হয় নাই; সনাতন ধর্ম্মের সমূলে সমুচ্ছেদ হয় নাই। তাহার পর, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল আন্দোলনেও সনাতন ধর্ম্মে একটা আঘাত লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু সে আঘাতে বৃদ্ধ মহীরুহ একবার মাথা ঝাড়া দিয়া মাথা নাড়িয়া আবার দৃঢ় হইয়া দাঁড়া-ইলেন; বৌদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুর হুহুঙ্কারে ভারত ছাড়িয়া দেশ দেশান্তরে চলিয়া গেল। কিন্তু "কালস্য কুটিলা গতিঃ।" ধীরে ধীরে দুরন্ত কাল আপনার প্রভাবজাল বিস্তার করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে লোক সকল উহার প্রভাবে অভিভূত হইয়া স্বধর্ম্ম ও সদাচারভ্রষ্ট হইয়া ইহ পরকাল নষ্ট করিতে বসিল। বিকার একটু বাড়িয়া দাঁড়াইলে, মুসলমান সুযোগ পাইয়া দিল্লীর সিংহ-

দ্বারে আসিয়া পদাঘাত করিলেন। ধর্ম্মচ্যুত আর্য্যসন্তান সেই পদাঘাতে পতিত হইয়া আর মাথা তুলিতে পারিল না। তদবধি ধর্ম্মবন্ধন যতই শিথিল হইয়া আসিতেছে, আর্য্যজাতির অধোগতি ততই দ্রুতপদে সংসাধিত হইতেছে।

মুসলমানের পর ইংরেজ আসিলেন। ইংরেজের আমল হইতেই সর্ব্বনাশের পথটা আরও পরিষ্কৃত হইয়া আসিল। দোষ ইংরেজের নয়, দোষ আমাদেরও নয়, দোষ আমাদের দুরদৃষ্টের। ইংরেজ যত্ন করিয়া, সাধ করিয়া, আমাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। মুসলমান আমাদিগকে ধর্ম্ম শিখান নাই, ধর্ম্ম ছাড়াইবার জন্য তাড়না করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু ইংরেজ অধ্যাপকতার পদ গ্রহণ করিয়া, আদর করিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া, অন্নবস্ত্র দানের আশা দিয়া, ধর্ম্ম শিক্ষা কর্ম্ম শিক্ষা সকল শিক্ষার ভারই গ্রহণ করিলেন। এইবার সোণায় সোহাগা হইল। কাল কলি, শিক্ষক ম্লেচ্ছ, শিক্ষার্থী স্বধর্ম্মভ্রষ্ট—সুতরাং আত্মজ্ঞানবিরহিত। হীনমতি হীনবীর্য্য আর্য্যসন্তান ঘরের পয়সা খরচ করিয়া শৈশবকাল হইতেই সন্তানবর্গকে বিদ্যাশিক্ষার্থ স্কুল কলেজে পাঠাইলেন। বালক বিদ্যাভ্যাস সাঙ্গ করিয়া, ঘরে আসিয়া পরিচয় দিল—"বাবা তুমি মুর্খ, ভারতবাসী অসভ্য, আমাদের পিতৃ পিতামহাদি চৌদ্দ পুরুষ চোয়াড়ের চূড়ান্ত; আমাদের ধর্ম্ম মিথ্যা, কর্ম্ম মিথ্যা; শাস্ত্র মিথ্যা, সমাজ মিথ্যা; ধর্ম্ম আছে বাইবেলে, কর্ম্ম আছে ইউরোপে, সতী ছিল মিশরে, ভক্তি ছিল লুথারে, মুক্তি আছে গির্জ্জা-ঘরে।" পেটের দায়ে, এই শিক্ষাই সুশিক্ষা বলিয়া চলিয়া গেল। গ্রহ-বৈগুণ্যে, বুদ্ধিভ্রংশ-দোষে, কাচকে কাঞ্চন বলিয়া লোকে পূজা করিল, অমৃতভ্রমে গরলধারা গ্রাস করিল, সাক্ষাৎ বিষধরকে কুসুমদাম জ্ঞানে কণ্ঠে জড়াইয়া আদর করিয়া বুকে ধরিল। অধোগতির চরম সীমায় এমনি করিয়াই আসা হইয়াছিল। মুসলমানের পঞ্চশতাধিক বর্ষে যাহা হয় নাই, ইংরেজের শতাধিক বর্ষে তাহার শত গুণ সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উত্থান পতনই জগতের নিয়ম। কলিযুগে এমনি করিয়া উঠিয়া পড়িয়াই বুঝি আমাদিগকে কাল কাটাইতে হইবে। অবনতির চরম সীমায় নামিয়া এখন একবার উঠিবার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া যেন বোধ হয়। সে চেষ্টা কিরূপ হইতেছে, এবং প্রয়োজনানুরূপ হইতেছে কি না, বারান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

একটি চিত্র।

বাখানি সে চিত্রকরে, তূলিকা যাহার
আঁকিল মূরতি হেন,
জীবিত র'য়েছে যেন,
যেন কোন দেববালা পথভ্রান্ত হ'য়ে
চেয়ে আছে অনিমিষে শূন্যেতে দাঁড়ায়ে॥

জীবিত অথবা মৃত না পারি বুঝিতে,
সেই আঁখি, সেই মুখ,
অধরোষ্ঠ সে চিবুক,
সেই সে অলকারাশি ঈষদ কুঞ্চিত,
মৃদুল পবনে যাহা সদাই নাচিত॥

সেই কৃষ্ণ যুগ্ম ভুরু তিলক শোভিত,
নয়নে অঞ্জন রেখা,
সেই মুখ হাসিমাখা,
নাসাপ্রান্তে সেই মুক্তা তেমনি শোভিছে,
কর্ণ আভরণ কর্ণে তেমনি দুলিছে॥

সেই হার মুকুতার, শোভিত গলায়,
সেই স্বর্ণ আভরণ,
সেই বস্ত্র সুশোভন
সেই সব, কিন্তু হায় জীবন কোথায়?
জীবন বিহনে জীব কে জানে কি হয়॥

ইচ্ছা হয় ওই ওষ্ঠ কম্পিত হইয়া
কহিবে প্রাণের কথা,
জুড়াবে হৃদয় ব্যথা
অনিমিষ নয়নেতে পলক পড়িবে,
আবার যেমন ছিল তেমনি হইবে॥

আবার যেমন ছিল তেমনি হইবে?
ধন্য আশা মায়াবিনী,
কি কুহকে নাহি জানি,
ভুলাও মানব মন এমন কঠিন,
কঠিন হ'লেও তবু তোমার অধীন॥

বল দেখি চিত্রকর, কোথায় শিখিলে,
হেন বিদ্যা অপরূপ,
নাহি যার অনুরূপ,
হৃত বস্তু পুনরায় দেখাও নয়নে।
একমাত্র আছে যাহা হৃদয় আসনে॥

মানস দর্পণে চাহি মিলাই যখন
সুন্দর আলেখ্যখানি,
কেঁদে উঠে এ পরাণী,
ওই মুখে মৃদুহাসি না করি দর্শন,
উথলে শোকের সিন্ধু হৃদি-বিদারণ॥

পার যদি হাসিবারে হাস একবার,
তৃষিত চাতক প্রাণ,
বারিবিন্দু করি পান;
তেমনি তৃষিত হায় আমার অন্তর
জুড়াবে, হেরিয়া তব সে হাসি সুন্দর॥

ওই মুখে সুধাধ্বনি বর্ষিতে যখন;
মনে আছে সেই দিন,
বাজিত হৃদয় বীণ,
নাচিত পরাণ মম সে মধুর গানে,
ময়ূর ময়ূরী যথা মেঘের গর্জ্জনে॥

চিত্রকর আঁকিয়াছ অপূর্ব্ব প্রতিমা।
মানিলাম তব শক্তি,
দেখিলাম সেই মূর্ত্তি;
কিন্তু তবু পূর্ণ তৃপ্তি হলো না দেখায়।
চিত্রিতে চৈতন্য দিতে কে পারে ধরায়?

শ্রীযতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

কহত সজনি।

কহত সজনি!
মধুর যামিনী,
গাইছে তটিনী,
বহিতেছে বায়।

ফুল্লফুলদল,
ভাবে ঢল ঢল,
দিয়া পরিমল,
পবনে মাতায়॥

হাসিছে রজনী,
হাসিছে ধরণী,
ভাসিছে তরণী—
সলিল উপর।

সুমন্দ সমীরে
দুলিতেছে ধীরে
সরসীর নীরে
কমল নিকর॥

শ্যামল পাতায়,
কুসুম লতায়,
অতুল আভায়,
শশীকর ঝরি।

মরি কি শোভায়,
প্রকৃতি সাজায়,
সুন্দরী নিশায়,
স্মিতময়ী করি॥

বল'না লো সখি
সকলেই সুখী,
কেবলি কি দুখী
এ অভাগী হায়!

কহত সজনি,—
কিসে ধৈর্য্য মানি?
এমন রজনী
বিফলেতে যায়॥

বড় সাধ করি,
বাঁধিনু কবরী,
ফুলহার পরি,
সুখেতে সাজিনু।

কুসুমের হারে,
সাজাইতে তাঁরে,
বড় সাধ করে—
মালিকা গাঁথিনু॥

সখীরে সে আশা,
প্রেমের পিপাসা,
ফুরাল ভরসা,
আজি কি আমার?

কই সে এলো না?
বিফল বাসনা,
বিধিরে জানি না
কি বাদ তোমার॥

কি বাদে বিরোধী ;
মোরে নিরবধি,
দুখের অবধি.
না পাই দুখিনী।

কি করিব হায়,
কপালে ঘটায়,
বিফলেতে যায়,
চাঁদিমা রজনী॥

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক।

সংসার।

"I hold the world but as the world......
A stage, where every man must play a part"
Shakespeare.

পিতা মাতা, পতি পত্নী, পুত্র কন্যা, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন লইয়াই সংসার। কিন্তু এ সংসার বুঝে কয় জন? ইহাতে কৃতিত্বই বা লাভ করে কয় জন? সংসারী মাত্রেই ইহার জ্বালায় অস্থির। আবার সংসার না হইলে কাহারও চলে না। মানবের প্রকৃতি-গত ধর্ম্ম লোপ করিবার ক্ষমতা মানবের নাই, স্রষ্টার অপরিমেয় কৌশল-গ্রন্থির বিশ্লেষণ করা মানববুদ্ধির আয়ত্ত নহে। সুতরাং মানব ইহার জ্বালায় অস্থির হইলেও প্রকৃতিবশে আবার ইহাতে অঙ্গ ঢালিয়া দেয়, ইহার মোহিনীশক্তিতে তাহার মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, এই দগ্ধ সংসার তাহার চক্ষে সোণার সংসার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সংসারে বীতরাগ ব্যক্তিও সহজে ইহার কুহক হইতে নিস্তার পান না; অজ্ঞানান্ধ মায়ামুগ্ধ মানব বিষয়াশক্তিতে আবদ্ধ হইয়া এই সংসারকে চিরকালের জন্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। একবারে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানের সঞ্চার মানবপ্রকৃতিতে বিরল. হইলেও, ভোগাদি বাসনাপরম্পরা হইতে অল্পে অল্পে নিষ্কৃতি দেহীর পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু এইরূপে সংসার-বাসনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে, সংসারকে তুচ্ছ করিলে চলিবে না ; সংসারে থাকিয়া মানবকে সংসারী সাজিতে হইবে। পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুখ দুঃখ, পর্য্যায়-ক্রমে তাহার দৈহিক ও মানসিক শক্তির সংকোচন ও সম্প্রসারণ করিবে। অগ্রে কার্য্যের ফলোদয়বাসনা, তৎপরে সেই কার্য্যে অসিদ্ধ-কামহেতু মানবচিত্তের স্থৈর্য্যহীনতা ও ক্রমে কামনা-পরিশূন্যতা, কালে তাহার অন্তর্জগতে এমন একটী শক্তির আবির্ভাব হইবে যে, তখন তাহার চিত্ত কার্য্য-সাফল্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, 'কার্য্যহেতুই কার্য্য,' এইরূপ ভাবিয়া নিষ্কামতার পথে অগ্রসর হইতে শিখিবে। সদাচারে থাকিয়া ভগবানে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক সংসারধর্ম্ম পালন করিতে করিতেই মানব-চিত্ত ক্রমেই ঈদৃশ অবস্থাপন হইয়া আসে।

সংসার সুখ-দুঃখ-বিমিশ্রিত, মানব-বুদ্ধির অগম্য, এক অদ্ভুত বস্তু। ইহাতে নাই, এমন কিছুই নাই, আবার সকলই আছে, আবার যেন কিছুই নাই। একবার সংসা-

রীর চক্ষে ইহা সর্ব্বপ্রকার সুখের আবাস-স্থল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আবার পরক্ষণেই ইহা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের ও অশান্তির আধার বলিয়া মনে হইয়া থাকে। যখন ইহা সর্ব্বপ্রকার অশুভদায়িনী ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মানবের কার্য্যস্রোতে প্রতিমুহূর্ত্তে অশুভ সংঘটন করে, তখন ক্রমে মানবের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। উদ্বেগে, শোকে, সন্তাপে, নৈরাশ্যে মানব তখন বিহ্বল হইয়া স্বীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়; তখন তাহার মনে হয়, এ সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-শোক-সঙ্কুল; ইহাতে শান্তি নাই, সুখ নাই; আছে কেবল নৈরাশ্যের অপ্রতিহত তরঙ্গ, অসুখের ঘোর নিনাদী তুফান ও অশান্তির প্রবল ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত। তখন স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য আর থাকে না, মোহে তখন তাহার চিত্ত অভিভূত হয়। সংসার তখন তাহার চক্ষে আর সোণার সংসার নহে, পাষাণের কারাগার মাত্র। তখন মনে হয়, শান্তি বুঝি ইহ জগতে নাই, ইহা যেন কেবল অশান্তিরই আলয়। তখন তাহার মনে হয়, এই সংসারই নরক, দ্বিতীয় নরক বুঝি আর স্বতন্ত্র নাই।

এইরূপ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মানবচিত্ত যে কি এক বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা মনে হইলেও অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। তখন মানব অজ্ঞানোপহত হইয়া প্রত্যক্ষেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহে না, স্বজনের আশ্বাস-বাণী তখন আর তাহার কর্ণকুহরে স্থান পায় না, স্বকীয় ভ্রমসঙ্কুল সিদ্ধান্ত-নিচয় তখন অমোঘ বলিয়া তাহার নিকট প্রতিপন্ন হয়, শান্তির পবিত্র রসে তখন তাহার চিত্ত আর পরিতুষ্ট হয় না; তখন মনে হয়, এ জগতে দুঃখের অন্ত নাই, পাপ পুণ্যের নিয়ন্তা নাই, অজ্ঞানসমুৎপন্ন অন্ধকারের নিরাস করিবার ক্ষমতা মানবের নাই। তখন সে ভুলিয়া যায়, যে কর্ম্মফলেই তাহাকে এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে; পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারেই যে মানব সুখ, দুঃখ, শুভাশুভ লাভ করে, এই স্মৃতি, একেবারেই তাহার হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন ক্রোধ, দর্প, অভিমান, অনিষ্টচিন্তা, অন্যের অপ্রিয় অনুষ্ঠান ও পাপাচরণ-প্রবৃত্তি স্বতঃই তাহার মানসপটে উদিত হইয়া থাকে ও তাহাদিগের মোহিনী মূর্ত্তিতে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া নানাবিধ অনর্থ-সংঘটনে তাহাকে প্রবৃত্ত করায়। ইন্দ্রিয়াশক্ত, বিষয়-পরতন্ত্র সংসারী তখন দম্ভ ও মোহবশতঃ অহিতাচরণে ও অশুভ-সংঘটনে স্বকীয় চিত্তবৃত্তির কলুষিত লালসা চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। তখন হিতাহিত জ্ঞান তাহাতে একবারে লোপ পাইয়া যায়, বিধাতার অস্তিত্বে তখন আর সে বিশ্বাসবান নহে; সে তখন উন্মত্ত, সংসার-সাগরে তখন সে পিশাচের ক্রীড়নক; সে তখন অনীশ্বরবাদী, মূঢ়, কামদ্বেষাদি দ্বারা অভিভূত এবং অহঙ্কারে পরিপূর্ণ।

কিন্তু ঘটনাস্রোতের কেন্দ্রগত, মানব-বুদ্ধির অগম্য এমন এক অপরিমেয় প্রভাব বা শক্তি আছে, যে ঐরূপ অজ্ঞানোপহত ব্যক্তিও সেই প্রভাব বা শক্তির শাসনে পরিশাসিত হয়; কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে, মানবের মনে জ্ঞানভক্তি সমুদিত হইলে সংসার-রহস্যের অপূর্ব্ব মহিমা সে অল্পে অল্পে বুঝিতে

পারে। মানবের অন্তর্জগতে এইরূপ ভাবের আবির্ভাব হইলে সে পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতিনিচয়ের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে; কুক্রিয়াপরম্পরার আপাতমোহিনী, সর্ব্বনাশিনী মূর্ত্তি আর তাহার হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য করিতে সমর্থ হয় না; তখন হিতাহিত জ্ঞানের উজ্জ্বল অথচ অস্ফুট রশ্মি ক্রমে ক্রমে যেন তাহার মানসচক্ষে প্রতিভাত হইতে থাকে। বিষয়ে ঔদাসীন্য, অলব্ধ পদার্থে বিরাগ ও লব্ধ বস্তুতে নিস্পৃহতা প্রযুক্ত তাহার চিত্তশান্তির পথ আপনা আপনি দেখিতে পায়।

সংসারী তখন সংসারে লিপ্ত থাকিয়াও যেন নির্লিপ্ত; তখন তাহার জ্ঞান হইয়াছে, যে বিষয়ের ভোগ দ্বারাই বিষয়-বাসনা সঙ্কুচিত হয়, তখন সে বুঝিয়াছে, যে উৎপত্তি হইতেই নিবৃত্তি, আরম্ভ হইতেই শেষ, সুখ হইতেই দুঃখ ও দুঃখ হইতেই সুখ; তখন বুঝিয়াছে যে যাহা আদি তাহাই অন্ত ও যাহা অন্ত তাহাই আদি; সংসারীর তখন জ্ঞান হইয়াছে যে, যে অহঙ্কারবলে মানব সংসার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়, এখন সেই অহঙ্কার-ভোগলালসাকে সঙ্কুচিত করিয়া সংসারে লিপ্ত জীবকে নিরহঙ্কার করিতে পারে; তখন বিকৃতমূর্ত্তি মানব প্রকৃত জ্ঞানের সোপানে অধিরোহণ করিয়াছে, তখন সে বিধি-বিধান সাধন করিতে অগ্রসর, তখন আর তাহার অভাব কি? তখন কি বিধাতার অপূর্ব্ব লীলাস্থান স্বর্গোপম এই সোণার সংসার তাহার চক্ষে দগ্ধ সংসার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে? তখন শরীর ও মনের প্রীতিকর, অনুপম সাত্ত্বিক ভাব সকল পূর্ণাবয়বে তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে। অবিবেক মোহ প্রমাদ প্রভৃতি তামসিক গুণরাশি তখন আর তাহার নিকট স্থান পাইতেছে না; তখন তাহাকে মমতা, অহঙ্কার ও সংশয়জনিত দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির যন্ত্রণা আর উপলব্ধি করিতে হয় না, বিষয়-সম্ভূত ভোগলালসা ও স্বার্থ সিদ্ধির ঐকান্তিকতা তখন আর তাহার মনে স্থান পায় না, তখন স্রষ্টার বিপুল কৌশলময় অনিন্দনীয় এই সংসারক্ষেত্র মনে হয়, যেন সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়োলাভের অক্ষয় ভাণ্ডার, কর্ম্মভূমির এই বিশ্বসংসার কর্ম্মনিরত মানবের একমাত্র উপজীব্য, তাহার পুরুষকার প্রকাশের একমাত্র আশ্রয়ভূমি, তাহার জ্ঞান, ধর্ম্ম উপার্জ্জনের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কেন্দ্রস্থল, তাহার অন্তঃস্থিত আত্মার উৎকর্ষ সাধনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ও তাহার আত্মজ্ঞানলাভের প্রকৃত সোপান। পূর্ব্বে যাহা সংসারীর চক্ষে মোহজালজড়িত, ঘোর-তমসাচ্ছন্ন, দুর্জ্ঞেয় ও মানববুদ্ধির প্রমাদকর বলিয়া অনুভূত হইত ও ঘোর তামসিক আত্মাভিমান জন্মাইয়া দিত, এক্ষণে প্রশান্ত সাত্ত্বিক গুণের বিমল কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া সেই সংসার কেমন শোভমান বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। অসহিষ্ণুতা, সংশয় ও প্রমাদজাল পূর্ব্বে যে চিত্তকে অহর্নিশি শতবৃশ্চিকের দংশনে প্রপীড়িত করিত, এক্ষণে সেই চিত্ত কেমন প্রীতিকর প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে। মানবের অন্তশ্চক্ষু এক্ষণে এই সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া যেন আত্মহারা হইয়াছে, বহির্জগতে সেই সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইয়া এই চির-সৌন্দর্য্যময়

বিশ্বসংসারকে যেন সমধিক সুষমান্বিত করিয়াছে।

এস দেখি মানব! একবার এই সৌন্দর্য্যে অঙ্গ ঢালিয়া দিই; শান্তির অনন্ত পারাবার, সৌন্দর্য্যের অক্ষয় ভাণ্ডার, জ্ঞানের পবিত্র প্রস্রবণে একবার চিত্ত নিমজ্জিত করি; দেখিবে সংসার কেমন সুখের স্থান, প্রকৃতির কি মোহিনী মূর্ত্তি, বিধাতার কি অনন্ত প্রভাব; দেখিবে, এ সংসারে পাপের পূতি-গন্ধ নাই, হিংসার নিদারুণ প্রকোপ নাই, বিষয়বাসনার দুর্নিবার হুতাশন এখানে ধক্ ধক্ জ্বলে না, অনুতাপের প্রজ্বলিত বহ্নি এখানে মানবচিত্তকে অহর্নিশি দগ্ধ করে না। আরও দেখিবে যে এ সংসার অলীক স্বপ্নময় নহে, ইহার ঘটনাস্রোত অনন্ত-কালের অনন্ত-সাগরে একেবারে বিলীন হইয়া যায় না, কাল তাহার অনন্ত-দেহে তাহাদের চিহ্ন সকল ধারণ করিয়া থাকে, মানবের কার্য্য-পরম্পরা ইহার পর পর-লোকে তাহার সুখ দুঃখের নিদর্শন স্বরূপ হইয়া তাহার অদৃষ্টচক্রের গতি নিরূপণ করে। আরও বুঝিবে যে সংসার যাহা তাহাই আছে, তাহাই ছিল, ও তাহাই থাকিবে; অনন্ত-কালের অনন্ত চক্ষে ইহা আপনার অনন্ত-দেহ ঢালিয়া দিয়া আছে, মোহপরবশ সামান্য সংসারীর চক্ষে ইহা যেরূপই প্রতীয়-মান হউক না কেন, প্রজ্ঞাচক্ষু জ্ঞানীর চক্ষে ইহা যে স্রষ্টার অপরিসীম অনন্ত কৌশল ও শক্তির পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তাই বলি, মানব! আশ্বস্ত হও, কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য যত্নবান হও, সংসার নির-বচ্ছিন্ন দুঃখের আগার মনে করিয়া নৈরাশ্যের ভীষণ কবলে দেহ মন সমর্পণ করিও না। এই সংসার ক্ষেত্রেই সর্ব্বপ্রকার সুখের বীজ রোপিত আছে। মানব কর্ম্মফলে ও স্বকীয় বুদ্ধিবলে সেই বীজোদ্ভূত ফলের অধিকারী হইয়া থাকে মাত্র। স্রষ্টার অনুপম লীলাস্থল এই মর্ত্ত্যভূমি মানবের পক্ষে কর্ম্মভূমি ভিন্ন আর কিছুই নহে, কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানই এই সংসারের সার বস্তু, কর্ত্তব্যে উদাসীন হইলে, অনন্ত দুঃখের ভাগী হইবে; কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা থাকিলে চরমে পরম সুখভোগে অধি-কারী হইবে। সংসার রঙ্গালয়, যেমন খেলা খেলিবে, তেমনি ফল এখানে পাইবে। কবি তাই বলিয়াছেন,—

I hold the world but as the world...
A stage where every man must play a part.

শ্রীবামাচরণ ভট্টাচার্য্য।

আজ।

বিষম জীবিকা-রণ
যুঝে—যুঝে অনুক্ষণ,
—হা বিধি-লিখন!—

ঘুচে গেল সে মত্ততা,
সে সুখ-কল্পনা-কথা,
সে দূর স্বপন।

আর সে কৈশোর-স্মৃতি
নাহি ফোটে নিতি নিতি
কবিতা-সুবাসে ;
আর সে যৌবন-রাগে
শত প্রাণ নাহি জাগে
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে।

ঘুচে গেছে সে রোদন,
কোকিলের কুহরণ,
তরুর মর্ম্মর ;
ঘুচেছে সে অশ্রুধারা,
শ্বাসে শ্বাসে কেঁদে সারা
শিশির সুন্দর।

ঘুচেছে সে চির হাসি,
ঊষার কিরণ-রাশি
মধুর মদির,—
জলে স্থলে শূন্যে প'ড়ে
সবারে অধীর ক'রে,
অধীর যে ছিল !

কোথায় সে প্রেম-আশ,
সাগরের পূর্ণোচ্ছ্বাস,
প্রণয়ের দোলা—
হেথা সৃষ্টি ভেসে যায়,
হোথায় না ফিরে চায়,
সতী-হারা ভোলা।

নাহি সে সম্পূর্ণে শূন্য,
প্রতি পাপে মহাপুণ্য,
আনন্দ আবেগে ;
জগতে জীবনে হেলা,
গ্রহে উপগ্রহে খেলা,
নিদ্রা মেঘে মেঘে।

দেবতার গৃহ সম
কোথা সে হৃদয় মম,
সদামুক্ত দ্বার ;
আত্ম পর নাহি জানে,
ধূপে দীপে ফুলে গানে,
সব আপনার।

কোথায় সে ছবি-ভরা,
নিত্য-নব-আশে গড়া,
প্রিয় ভবিষ্যত—
সুনূপুর নিনাদিত,
জ্যোৎস্নাপ্লুত, কুসুমিত
দূর বন-পথ !

একে একে কলি ফোটে,
একে একে ঊর্ম্মি ছোটে,
বিধি বিধাতার ;
একেবারে গেল ঘুচে,
জ্ব'লে পুড়ে ধুয়ে মুছে
যা কিছু আমার !

গত-জন্ম-স্মৃতি প্রায়,
রণভূমে মিছে, হায়,
আলস্য-জৃম্ভন ;
যুঝিতে হতেছে যবে,
যুঝি—যুঝি—যুঝি তবে
করি প্রাণপণ।

একি নির্ম্মমতা দেখি—
নিত্য আত্মহত্যা একি
বিধির বিধান ?
আঁধারে লুকাব দীপ্তি,
পাই বা না পাই তৃপ্তি,
তৃষা অবসান !

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সমালোচন।

প্রমীলা।—কলিকাতা ১৯৬ নং, বহু-বাজার ষ্ট্রীট্ কহিনূর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থখানি স্ত্রীলোকের লেখা। রচয়িত্রীর নাম প্রকাশ নাই; কিন্তু উৎসর্গপত্রে দেখা যায় ভক্তিমতী কন্যা পরমারাধ্য পিতৃদেবের চরণে "কুমারী-হৃদয়-সম্ভূত" কবিতাকুসুম সমর্পণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এখানি কবিতাগ্রন্থ। পঞ্চাশটি খণ্ডকবিতায় গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ইহার অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা দেশে আজ কাল কবিতার যেমন ছড়াছড়ি বাড়াবাড়ি হইয়াছে, কবিতার আদরও তেমনি কমিয়া যাইতেছে। সাহিত্যকাননে বিচরণ করিতে গেলে কবিতা-কণ্টকের জ্বালায়, পথ চলা ভার। বড় দুঃখেই এ কথা বলিতে হইল। চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম ঘনরাম, জয়দেব বিদ্যাপতির দেশে, কবিতাকে আজ কণ্টক বলিয়া বিদ্রূপ করিতে হইল। প্রাণের ভিতর যে পরিজাত ফুটে তাহার নামই কবিতা; হৃদয় হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া বাহিরে সেই কুসুমের শোভা যিনি দেখাইতে পারেন, তাঁহার নামই কবি। দুঃখের বিষয় এদেশে কবি এখন সবাই, কবিতা কিন্তু নাই বলিলেই হয়। বুক হইতে ছিঁড়িয়া ফুল ত কেহ বড় তুলেন না, মুখে মুখে কবিতা প্রসব করেন মাত্র। বুক যে বাঙ্গালীর নাই; মুখের জোরেই কেবল বাঁচিয়া থাকা বৈ ত নয়। কবিতা কোথায় জন্মিবে? যে নন্দনে মন্দার ফুটিবে, সেই নন্দনই এখন শ্মশানে পরিণত!

প্রাণ যাহাদের নাই, প্রাণের কথাও তাহারা বুঝে না। কবিতার আদরও তাই এখন কমিয়া গিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস যে কবিতায় লোক কাজ-হারা হয়,—কাজ হয় কেবল গদ্যে; তাই বঙ্গসমাজ আজ সাহেবজাতির সদনুকরণ করিতেছি মনে করিয়া গদ্যময় হইতে বসিয়াছে। এ প্রবৃত্তি যে নিতান্ত ভ্রান্ত সে কথা আমরা অবসরমত স্বতন্ত্র বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আজ এই রমণী-হৃদয়ের মধুর ঝঙ্কারে যদি কাহারও ভ্রান্তি নিরসন হয়, তদর্থে এই প্রমীলা-কাব্যের একটু পরিচয় প্রদান করিব। বালিকার বীণা ললিতপঞ্চমে নববর্ষের তান ধরিয়া অলস অসার, অন্ধ নির্ব্বোধ, ভ্রান্ত বিমোহিত বাঙ্গালী জাতিকে কার্য্য-তৎপরতায় কেমন প্রোৎসাহিত করিতেছে দেখুন,—

যেতেছে বরষ দিন, জীবন হতেছে ক্ষীণ,
অন্ধ আঁখি দেখনা চাহিয়া।
ধীরে ধীরে যবনিকা নামিছে কালের সনে,
ভ্রান্ত প্রাণ মোহিতে ডুবিয়া।
অলীক আমোদে হায় আশার কুহকে ভুলে
দেখিলে না নারেক চাহিয়া,
একটি বরষ দীর্ঘ, আবার অলস মন,
চলে গেল বিদ্রূপ করিয়া;
সাধুতার সুখ পথে, সংসার কর্ত্তব্য কাযে
অগ্রসর হও এই বেলা;
কে জানে ভাঙ্গিয়া যাবে, কখন জীবনমেলা
ফুরাইবে এ সাধের খেলা।

চঞ্চল কালের গতি, চঞ্চল জীবন তায়
পদ্মপত্রে জলের মতন,
ওই বর্ষের মত ফুরাইবে কোন দিন
ভাঙ্গিবে রে জীবন স্বপন।

কিন্তু বাঙ্গালীর কি চৈতন্য হইবে? অবলা যাহাকে লজ্জা দেয়, তাহারও কি আবার পদার্থ আছে? থাকিলে বালিকার হতাশ-গীতি শুনিয়া আমাদের মাথা হেঁট হইত,—

কত সাধে শক্তি-হীন মরমবীণার তান
তুলেছিনু গাহিবারে স্বদেশের দুখ-গান;
সে দুখ সঙ্গীত যদি
দ্রবিত একটী হৃদি,
বিংশতি কোটীর মাঝে কাঁদিত একটী প্রাণ,
আমার সাধের ব্রত হ'ত তবে সমাধান।

ব্রত সমাধান নাই হউক, কিন্তু কবির হৃদয় কাঁদিতে ছাড়িবে কেন? যন্ত্রের তারে আঘাত লাগিলেই ত বাজিবে। কেহ শুনুক না শুনুক, তথাপি সেই মোহিনী বীণার মৃদুল ঝঙ্কার পুরবীর বৈরাগ্যে ব্যাকুল হইয়া কল্লোলিনীর কূলে কূলে তরঙ্গায়িত হইতেছে—

গাও তবে হৃদিবীণা, গাও তুমি সেই গান,
মংমের ব্যথা গাও তুলিয়া মৃদুল তান;
বিদ্রূপ করিলে লোকে,
ব্যথা পাইও না বুকে,
পুরবীতে ধীরে ধীরে তোল গো বিষাদ তান।
নীরবে বিরলে বসি অশ্রুমুখে কর গান॥
জগত না শোনে তায়,
সংসার না ফিরে চায়,
বিজন তটিনী কূলে বসি তুমি গাহ গান
পরদুঃখে দুখী সেই কাঁদিবে তটিনী প্রাণ।

মানুষের প্রাণ নাই, প্রাণের কথা মানুষ শুনিল না; কিন্তু, বনের পাখী, লতা পাতা, জড়জগতকে কবি আপনার মরমগীতি ডাকিয়া শুনাইতেছেন—

শুনিবে বনের পাখী কাঁদিবে সে তোর দুখে,
কাঁদিবে পাদপলতা, হিম অশ্রুময় মুখে;
সাঁঝের আকাশে তারা,
হইয়া আপন হারা
ঢালিবে করুণ আভা ও তোর দুখের গানে;
চন্দ্রমা কাঁদিবে আহা নীরবে যামিনী সনে।

এত যত্ন করিয়া বীণা যে গাহিল, তবু বুঝি মনের কথা সব বলা হইল না। চিত্ত নিরাশায় নিতান্ত ব্যাকুল হইলে, মনের কথা মুখ ফুটিয়া সব বাহির হয় না; উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে ভাষা গদ্গদ হইয়া আসে—

হোলো না মনের মত আমার সাধের গান,
বাসনা লুকায়ে প্রাণে শেষ তবে করি তান;
কতই যতন করে, জোড়া দিয়ে ছেঁড়া তারে
কতবার নব সুরে গাহিতে গেলাম গান,
তবুও উঠিল সেই ভাঙ্গা সুরে ভাঙ্গা তান।

ভাব তখন তাহার উপযোগী ভাষা খুঁজিয়া পায় না। তখন—

যে গান গাহিতে চাই পাই না যে ভাষা তার,
যে কথা বলিতে চাই বীণায় না সহে ভার।

পরিশেষে নিরাশার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কোমলপ্রাণা কবি "শেষ" কবিতায় গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন—

আশার মধুর আলো, স্বপনের মোহজাল
নিরাশার অন্ধকারে ডুবে যাও একবারে;
বিষাদ কল্পনা চিন্তা, এ হৃদয়ে এসোনারে।
হৃদি যদি আশা-হীন, থাম তবে থাম বীণ;
কে চাহে শুনিতে তোর সুর-লয় হীন তান,
অর্থ-হীন ভাবহীন নীরস শৈশব গান।

এমন মধুময় বীণাধ্বনি অনেক দিন আমরা শুনি নাই। বঙ্গের অনেক আধুনিক

কবি, এই রমণীর চরণে প্রণত হইয়া কবিতা কাহাকে বলে তাহা শিখিতে পারেন। লেখিকার প্রাণ আছে, প্রাণের কথা প্রকাশ করিবার শক্তিও আছে। ইনি প্রাণের কবি বটেন; ইঁহার কবিতার ভিতর এমন একটু মোহকারিতা আছে যে, হৃদয়ের অন্তস্তলে গিয়া একবারে আঘাত করে। নবীনা কবি, এমনি করিয়া, কোমল প্রাণের মর্ম্মব্যথা জানাইয়া সাহিত্য-সংসারে চিরবিরাজিত হউন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক বাসনা।

মজ্‌লিস্।—বৈঠকী আলাপ, সঙ্গীত, কবিতা, খোস গল্প, চরিত্র সমালোচন, রং তামাসাপূর্ণ মাসিক পত্রিকা। কলিকাতা ৭১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ষ্টার এজেন্সি হইতে শ্রীদুর্গাদাস দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক দর্শনী ১।০ মাত্র।

আমরা প্রতিমাপূজক, মজ্‌লিসের আদর আমরা যত বুঝিব, এত আর কেহ বুঝিবে কি? আমদের প্রতিমা আবার কোম্পানীর প্রতিমা, সুতরাং বারইয়ারীর বৈ কি? বারইয়ারী হইলেই তার মজ্‌লিস্ চাই। গান বাজনা, নাচ তামাসায় মজ্‌লিস্ গরম হইবে, তবে ত পূজা জাঁকাইবে। বিশেষতঃ নৃত্য গীতাদি পূজাপদ্ধতির অঙ্গবিশেষ, দুর্গোৎসবেও ইহার বিধান আছে। আমাদের প্রতিমা সাক্ষাৎ সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী,—সুতরাং মজ্‌লিসে আমাদের পরম প্রীতি। মজ্‌লিসে সবই চলে। মজ্‌লিসে কথকতার তানও ছুটে, আবার মজ্‌লিসে নর্ত্তকীর নূপুরও বাজে। আমাদের আলোচ্য মজ্‌লিসে আছেও সব। ইহাতে বিরাট বৃহস্পতির মহিমাবর্ণনের সহিত বঙ্কিমবিনোদিনীর বীণাধ্বনিও আছে। মজ্‌লিসে দুই একটা ওস্তাদী দলের গানও আমরা চক্ষে না দেখি, কান পাতিয়া শুনিয়াছি। এক জন কেবল ধরা দিয়াছেন “খুতুরায়।”

আমাদের কিরণশশীর সেই বিবাহ ব্যাপারটা মজ্‌লিসে গড়াইয়াছে। সে কালে শ্রাদ্ধ গড়াইত, এখনকার কালে বিবাহগুলাও গড়াইয়া পড়ে। তা পড়ুক, অস্থানে না পড়িয়া যে মজ্‌লিসে পড়িয়াছে, ইহা সুখের বিষয় বটে। কিন্তু বিবাহটা যদি মজ্‌লিসেই হয়, আমরা যেন নিমন্ত্রণে বাদ না পড়ি, এমন অনুরোধ মজলিসী মহাশয়দিগকে করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। কিরণশশী আমাদের হাতে আসিয়া পড়ায় ওপাড়ার অনেকের আবার হিংসা হইয়াছে; সুগন্ধে যাঁহাদের আমোদ, তাঁহারা কেহ কেহ কুরুচির গন্ধ পাইয়া নাসিকা কুঞ্চন ও প্রতিমা বিসর্জ্জনের কামনা করিয়াছেন। তাঁহারা অবশ্য মজ্‌লিস্ ভাঙ্গিয়া দিতেও উদ্যত হইবেন। মজ্‌লিস্ একটু সাবধান থাকিবেন, ঝাড়্ লণ্ঠনে ইট পাট্‌খেল না পড়ে। আর প্রতিমার উৎসবে যাঁহারা কাঁদিয়া ব্যাকুল তাঁহাদের নয়নজলে যদি প্রতিমা ভাসিয়া যায়, আমাদের তাহাতে আর হাত কি? যত দিন ভক্তি থাকিবে, তত দিন আমরা মায়ের পূজা করিব; যত দিন আনন্দময়ী আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিবেন তত দিন মজ্‌লিসেও মাতিব। পূজামোদে যাঁহাদের অরুচি, তাঁহাদের জন্য আমাদের বড় দুঃখ হয়।
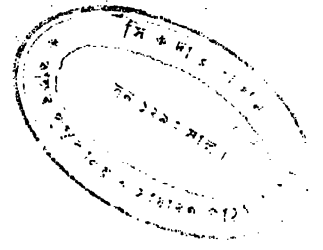
সাহিত্য-সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড।] ভাদ্র, ১২৯৭। [পঞ্চম সংখ্যা।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান।

আপ্তবাক্য।

বিজ্ঞান জ্ঞানের একমাত্র উপায় হইলেও সকল লোকের ও সকল কালের উপযোগী নহে। প্রায় সকল লোককেই অধিকাংশ সময়ে আপ্তবাক্য অবলম্বনে চলিতে হয়। এবং কোন বিজ্ঞানই আপ্তবাক্যের সহায়তা ভিন্ন সম্পূর্ণ হয় না। যদি আপ্তবাক্যে মানবের বিশ্বাস না থাকে, সকলকে সকল অবস্থাতেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বনে চলিতে হয়, তাহা হইলে মানবের দুঃখের সীমা থাকে না, এমন কি তাহা হইলে মানবের অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতদল আপ্তবাক্যের নিতান্ত বিদ্বেষী। তাঁহাদের মতে পরের বাক্যানুসরণ করিলে স্বাধীনতার হানি হয়, স্বাধীনতা মানবের প্রধান ধন, সে ধন নষ্ট করিলে মানবের মানবত্বই থাকে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি মানব কি আপনা আপনি বুঝিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে পারে? সমস্ত দূরে থাকুক কিছু কার্য্যও কি করিতে পারে? কখনই নয়। কেন না মানব ভূমিষ্ঠ হইয়াই সর্ব্বপ্রকারে পরের অধীন হয়। শুধু পরের বাক্যের অধীন নয়, সর্ব্বপ্রকারেই

পরের অধীন হয়। পরে খাওয়াইলে খাইতে পায়, পরে রক্ষা করিলে রক্ষিত হয়। অন্যে যাহা শিখায় শিশু তাহাই শিখে। শিশু বড় হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করে; অর্থাৎ গুরু যাহা বলেন, গ্রন্থকর্ত্তা যাহা বলেন বালক তাহাই শিখে। পিতা, মাতা, গুরু ও অন্য পদস্থ লোকে যে উপদেশ দেন, যে নীতি শিক্ষা দেন শিশু তাহাই শিখে ও তদনুযায়ী কার্য্য করে। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার অর্থ এই যে, অন্য লোকের জ্ঞাত প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যগুলি শিক্ষা করা হইয়াছে—যাঁহাদের মতামত সত্য বলিয়া জানা আবশ্যক তাহার অধিকাংশ জানা হইয়াছে। সেই মহাজন-পরিজ্ঞাত উপদেশগুলি স্মরণ করিয়া, যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ করিয়া কার্য্য করিতে পারিবে বলিয়া শিক্ষিতের এত মান, তাই শিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত হয়েন। নিজ বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করেন বলিয়া শিক্ষিতের মান নহে। নিজ বিবেচনায় কার্য্য করার জন্য মান হইলে মূর্খেরই মান হইত—পশুপক্ষ্যাদিরই মান হইত। শিক্ষিত ব্যক্তি জানিয়াছেন কিরূপ স্থলে কিরূপ কার্য্য করিয়া লোকে কিরূপ ফল পাইয়াছে, প্রাচীন ও বিজ্ঞগণ কিরূপ কার্য্য করিয়া সুফল পাইয়াছেন, সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া যথাপ্রয়োগ করিতে পারেন বলিয়াই শিক্ষিতের এত মান। মূর্খ তৎসমস্ত জানে না, আপন বুদ্ধি ও প্রকৃতি অনুসারে যত দূর সম্ভব তাহাই মাত্র করে; এই জন্যই মূর্খের কার্য্যের এত দোষ ও এত নিন্দা। কিন্তু মূর্খেরা যে আদৌ শিক্ষা করে না, আদৌ পরমতাবলম্বনে চলে না, তাহা নহে। তাহাদের শিক্ষা প্রচুর নহে অথবা সত্যানুসন্ধায়ী নহে, অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানীর বাক্য তাহারা অল্পই জানিতে পারে এবং সকল অবস্থার উপযোগী জ্ঞাতব্যও তাহারা জানিতে পারে না। তাই তাহাদের জ্ঞান ঠিক নহে। বস্তুতঃ কি মূর্খ কি পণ্ডিত সকলেই বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত যে কিছু কার্য্য করেন সমস্তই পরের বাক্যানুসরণে করিয়া থাকেন। নিজ মতে কখনই কেহ কার্য্য করেন না। তবে প্রবল বৃত্তিবিশেষের অধীন হইয়া কখন কখন মানব স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে—পরধন দেখিয়া লোভবান হইয়া 'চুরি করিতে নাই' ইত্যাদি বাক্যের অন্যথা করিয়া স্বাধীন ভাবে লোভাদি প্রবৃত্তির অনুয়ায়ী পরস্বাপহরণ প্রভৃতি করে বটে; কিন্তু তদ্রূপ আচরণ ভাল নহে, তাই ঐরূপ কার্য্যকারীদিগকে স্বাধীন না বলিয়া স্বেচ্ছাচারী বলে। ঐ স্বেচ্ছাচারীরাও প্রকৃত স্বাধীন নহে। কেন না তাহারা শারীরিক বৃত্তি ও ইন্দ্রিয় সকলের অধীন এবং তস্কর, সুরাপায়ী প্রভৃতি অসৎ লোকের শিক্ষাধীন।

আধুনিক শিক্ষিতদল বিবেচনা করেন তাঁহারা আপন স্বাধীন বিবেচনায় কার্য্য করেন, কিন্তু, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তবে ইংরাজী না পড়িলে, ইংরাজী ব্যাপার সকল না দেখিলে তাঁহাদের মতে কাহারও স্বাধীন বুদ্ধি ও স্বাধীন মত হয় না কেন? এবং যিনিই ইংরাজি পড়েন তাঁহারাই তাঁহাদের ন্যায় স্বাধীনবুদ্ধি হন কেন?

যিনি টোলে পড়েন তিনি শিখা রাখিতে, ফোঁটা কাটিতে,উপবাস ও হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে শিখেন কেন? আর যিনি স্কুলে পড়েন তিনি চুল ফিরাইতে, পমেটম মাখিতে ও পলাণ্ডু, মদ্য, মাংস ভক্ষণ করিতে শিখেন কেন? বাস্তবিক যেমন গুরু তেমনি শিক্ষা, ও যেমন শিক্ষা সেইরূপ কার্য্য। যিনি যাহা করেন সমস্তই পরের বাক্যানুসারে করেন, নিজ মতে কেহই কিছু করেন না। নিজ মতে কার্য্য করি বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যাহা যাহা আমি শিখিয়াছি তাহার মধ্যে যেটী আমার প্রকৃতি অনুসারে বা অপেক্ষাকৃত অধিক অভ্যাস হওয়ায় ভাল লাগিয়াছে, তদনুরূপ করিতেছি, নিজ উদ্ভাবিত মতানুসারে করিতেছি না।

সত্য বটে কেহ কেহ নূতন তত্ত্ব আবিস্কার, নূতন মত স্থাপন ও নূতন চিন্তার ফল প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু সেরূপ লোক অতি বিরল; এবং তাঁহারাও নিজ চিন্তার ফল নিজে প্রায়ই ভোগ করিতে পারেন না। তাঁহাদের কার্য্যের ফল প্রায়ই পরানুগত হয়। কেন না মানব অল্প বয়সে নিজে নূতন চিন্তা করিতে সক্ষম হয়েন না এবং যখন নূতন চিন্তা তাঁহার মনে প্রথমে উদিত হয় তখনই তিনি সে চিন্তার ফললাভ করিতে পারেন না; অনেক পরীক্ষা ও অনেক গবেষণার পর সেই চিন্তার ফল জন্মে। কিন্তু ফল জন্মিলেই তদনুসারে নিজে কার্য্য করিতে পারা যায় না। অভ্যাস ও সংস্কার ছাড়িতে পারা বড় সহজ নহে। অন্যকে শিখাইতে পারা যায় বটে, কিন্তু সহসা আপনি ব্যবহার করিতে পারা যায় না। যদি অনেক চেষ্টা করিয়া কেহ আপনি তদনুরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন, তাহাও অল্প বয়সে নহে। সে সময়ের পরে মানবকে প্রায়ই অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে হয় না। সুতরাং যখন কার্য্য করিবার কাল অর্থাৎ শৈশব, বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়কালে তাঁহাকে পরানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইল, যখন কার্য্যত্যাগের সময়—পরকে শিক্ষা দিবার সময়, সম্পূর্ণ পরাধীন হইবার সময়, —সেই বৃদ্ধকালে স্বানুবর্ত্তী হইবার শক্তি হইল। তাহাও কি সকল বিষয়ে কেহ স্বমত স্থাপন করিতে পারেন? কখনই নহে। যিনি যে বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা ও গবেষণা করিয়াছেন তিনি সেই বিষয়েরই মাত্র নূতন সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অপর লক্ষ লক্ষ বিষয়ে তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ পরানুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হয়। সুতরাং মানব নিজ উদ্ভাবিত মতানুযায়ী কার্য্য নিজে করিতে পারেই না বলিতে হয়।

বাস্তবিক মানবের অধিকার ও শক্তি কি? মানব কতদিন বাঁচে ও কতটুকু স্থান অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে? পরের জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া কি প্রত্যেক মানব সকল কালের, সকল দেশের ও সকল বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে পারে? এই রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, অট্টালিকা, ও মুদ্রাযন্ত্র; এই জ্যোতিষ, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও শারীরবিদ্যা; এই সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি কি একজনের চেষ্টায় হইতে পারে? লক্ষ লক্ষ বৎসর লক্ষ লক্ষ মানব যাহা শিখিয়াছে তাহা যদি স্তূপাকারে

সজ্জিত না হইত তাহা হইলে কি মানব এ সকলের ফলভোগ করিতে পারিত? যদি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই মানব নিজ চেষ্টায় কার্য্য আরম্ভ করিত, তাহা হইলেও কি একজন মানব আপন জীবৎকালে ইহার কোটীতম অংশ পরিমিত কার্য্য করিতে পারিত? অবশ্য কখনই না। চিরজীবন অতি কঠোর চেষ্টা করিলেও মানব আপন দেশেরই সমুদায় দেখিতে পারে না। কিন্তু অসংখ্য দেশ, সাগর, পর্ব্বত, অরণ্য প্রভৃতি রহিয়াছে; অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য্য প্রভৃতি রহিয়াছে; অসংখ্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, স্থল, বায়ু, আকাশাদি জড়াজড় পদার্থ সকল রহিয়াছে,—ভূতত্ত্ব, রসায়ন, প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, শারীরস্থান, চিকিৎসা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, ধর্ম্ম প্রভৃতি অসংখ্য ব্যাপার রহিয়াছে। মানব একা কত দেখিবে? সমস্ত দূরে থাকুক, নিতান্ত প্রয়োজনীয় বর্ব্বর জাতির পরিজ্ঞাত বিষয়গুলিও কেহ চিরজীবনে আপন চেষ্টামাত্রে শিখিতে পারে না।

আবার এমত অনেক বিষয় আছে যে, তৎসমস্ত চেষ্টামাত্রের উপর নির্ভর করিতে পারাই যায় না। কেন না একবার হাত পোড়াইয়া 'অগ্নিতে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়,' এতত্ত্ব শিখিতে পারা যায় বটে, কিন্তু বিষ খাইয়া মরিয়া গিয়া ত 'বিষ খাইলে মানুষ মরে' এ তত্ত্ব শিখিতে পারা যায় না! অন্যকে বিষ খাইয়া মরিতে দেখিয়াই বা কয় জন এ তত্ত্ব শিখিতে পারে? সর্ব্বথা পরের শিক্ষাধীন না হইলে মানব একদিনও পৃথিবীতে বাস করিতে পারে না। নিজ চেষ্টায় মানবকে চলিতে হইলে তাহাকে এক দিনেই পৃথিবীর মায়া কাটাইতে হইত। এক দিন পশু পক্ষীরা বলিতে পারে, তাহারা নিজ চেষ্টায় বাস করিতে পারে। কেন না ঈশ্বর তাহাদের স্বয়ং সাক্ষাৎ রক্ষক, তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে চলিবার শক্তি তিনি দিয়াছেন। মানবকে তাহা তিনি দেন নাই। ঈশ্বর মানবকে সর্ব্বপ্রকারে পরপ্রত্যাশী করিয়াছেন। সকল মানবই পরস্পর পরস্পরের অধীন;—শিশু যুবার অধীন, যুবা বৃদ্ধের অধীন, প্রজা রাজার অধীন, শিষ্য গুরুর অধীন, স্ত্রী পুরুষের অধীন। এই অধীনতাই মানবত্ব এবং এই স্বাধীনতাই পশুত্ব। নচেৎ পশুতে ও মানবে অন্য প্রভেদ নাই। পশুর আপনিই সর্ব্বস্ব, মানবের সকলই আপনার। পশু শিখিবে না—শিখাইবে না। মানব শিখিবে ও শিখাইবে,— যেরূপ পরের নিকট শিখিবে সেইরূপ কার্য্য করিবে—যেরূপ আপনি শিখিবে সেইরূপ পরকে শিখাইবে। এই জন্য একটী ইংরাজী প্রবাদ আছে 'Do what I say, not what I do;' ইহার তাৎপর্য্য "আমি যাহা শিখিয়াছি ও জানিয়াছি তাহা স্বভাব ও অভ্যাসদোষে নিজে করিতে পারি না বটে, কিন্তু তাহা পরকে শিখাইতে পারি।" অতএব স্বাধীনতার হানি হয় বলিয়া পরবাক্য অনুসারে চলিব না বা পরবাক্য সত্য মনে করিব না একথা বলা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ।

যদি বল যত দিন মানবের জ্ঞানোদয় না হয় ততদিন তাহাকে পরের মতানুসারে চলিতে হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানোদয় হইলে, বুঝিবার শক্তি জন্মিলে, পরমতাবলম্বন করিয়া চলা আবশ্যক হয় না; যদিও আবশ্যক

হয় তাহাও আপন বিবেচনার সহিত মিলাইয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইলে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বুঝা কাহাকে বলে? দেখা যাইতেছে তুমিও বুঝিয়াছ মনে কর, আমিও বুঝিয়াছি মনে করি; অথচ তোমার মত ও আমার মত সম্পূর্ণ বিপরীত। যখন উভয়েই বুঝিলাম তখন এরূপ বিপরীত ফল হইল কেন? তোমার সহিত আমার মতদ্বন্দ্ব হয় কেন? অবশ্য বলিতে হইবে কখনই তুমি ও আমি দুই জনে ঠিক বুঝি নাই। কিন্তু কাহার বুঝা সত্য? সকলেই বিবেচনা করে আমি বুঝিয়াছি। অতি মূর্খও আপন মতকে বজায় রাখিবার জন্য পণ্ডিতের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করে এবং অতি শিশুও বৃদ্ধের মতকে ভ্রান্ত মনে করে। কিন্তু বাস্তবিক যাহারা বুঝিয়াছে মনে করে তাহারা কি প্রকৃতই বুঝিয়াছে? ঐ যে অজাতশ্মশ্রু বালকগণ স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীস্বাধীনতা বলিয়া ক্ষেপিয়া বেড়াইতেছে, উহারা স্ত্রী কি পদার্থ তাহারই কি কিছু বুঝিযাছে? না স্ত্রীপুরুষের সচ্ছন্দবিহারে কি ভাল বা কি মন্দ ফল হইতে পারে তাহা কিছু বুঝিয়াছে? উহারা কি আপনারা ভাবে যে উহা তাহারা বুঝে নাই? ঐ যে বালকটী মনে মনে শিক্ষককে গালি দিতেছে ও কি বুঝিয়াছে যে, শিক্ষক তাহার হিতকারী? ঐ যে তস্করটী দণ্ডাজ্ঞা পাইয়া বিচারকের প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ করিতেছে ও কি বুঝিয়াছে যে, বিচারক ন্যায়কার্য্য করিয়াছেন? ঐ যে হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম্মসম্বন্ধে ঘোর দ্বন্দ্ব করিতেছে, উহারা কি উভয়েই বুঝিয়াছে আপনার অবলম্বিত ধর্ম্ম সত্য? বুঝিবার নিয়ম সর্ব্বত্রই এইরূপ। যাহার যেমন শিক্ষা, যাহার যেমন সংসর্গ, যাহার যেমন স্বভাব, যাহার যেমন বুদ্ধি, যাহার যেমন আবশ্যক সে ঠিক সেইরূপ বুঝে। কে বলে আমি বুঝি না? ঐ প্রত্যেক বুঝাকে কি বুঝা বলিব? না ঐ প্রত্যেক বুঝার উপর নির্ভর করিয়া মত নির্ব্বাচিত হইবে? আমরা স্পষ্ট দেখিয়া বুঝিতেছি সূর্য্য একখানি থালার মত, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিলেন উহা পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দ লক্ষ গুণ বড়,—আমরা স্পষ্ট দেখিয়া বুঝিতেছি সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছেন, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ বলিলেন পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এক্ষণে আমাদের বুঝাকে সত্য বলিব, না জ্যোতির্ব্বিদের কথা সত্য বলিব? যদি বল জ্যোতির্ব্বিদ যে প্রমাণের বলে ঐ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিলে আমি জ্যোতির্ব্বিদের কথা গ্রাহ্য করিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কয় জন লোকের উহা বুঝিবার শক্তি আছে বা হইতে পারে? কয় জন তদুপযোগী বুদ্ধি ও অবস্থা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে? কেবল জ্যোতির্ব্বিদ্যা আমাদের জ্ঞাতব্য নহে, অসংখ্য তত্ত্ব আমাদের জ্ঞাতব্য। এ পৃথিবীতে কয় জন সে সকলের সূক্ষ্মানুসন্ধান বুঝিতে পারে? সকল বিষয় বুঝা দূরে থাকুক দুই একটী বিষয় বুঝিতে পারে এমত লোকই নিতান্ত অল্প। অতএব না বুঝিতে পারিলে পরের নির্ণীত সত্যে বিশ্বাস না করা কিম্বা পরনির্ণীত সত্যের ভ্রান্তি বুঝিয়াছি ভাবিয়াই তাহাতে অবিশ্বাস করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। এরূপ হইলে সত্য

নির্ণয় করিতে বা সত্যপথে চলিতে প্রায় কেহই পারে না।

তবে কি পরের বাক্যমাত্রই সত্য মনে করিতে হইবে? তাহা কখনই নহে। আপন প্রত্যক্ষে যেরূপ পদে পদে অসত্য দৃষ্ট হয়, পরের কথায় তদপেক্ষায়ও অধিক অসত্য থাকা সম্ভব। কেন না, যে যে কারণে আপন প্রত্যক্ষজ্ঞান ভ্রান্ত হয়, পরের প্রত্যক্ষেও সে সকল কারণের বিদ্যমানতা আছে। অধিকন্তু অনেক সময়ে অনেকে স্বার্থসাধনমানসে ও কুপ্রবৃত্তিপ্রেরিত হইয়া অনেক মিথ্যাবাক্য প্রচার করিয়া থাকেন। যে বিষয় বুঝিবার আমাদের নিজের সামর্থ্য নাই তাহাই পরবাক্য অবলম্বনে জানিতে হয়। সুতরাং যেরূপ ব্যক্তির নিকট তাহা জানিতে পারার সম্ভব অর্থাৎ শক্তি ও চরিত্রে যিনি শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বাস্য তাঁহারই নিকট তাহা জানা আবশ্যক। শিশু বৃদ্ধের নিকট এবং মূর্খ পণ্ডিতের নিকট, জিজ্ঞাসা করিয়া সত্য অবগত হইতে পারে। কিন্তু শিশু যদি আর একটি শিশুর নিকট কিম্বা মূর্খ যদি আর একজন মূর্খের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সত্য অবগত হয়, তাহা হইলে তাহার কখনও প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। যে ব্যক্তির যে বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান নাই তাহার নিকট হইতে তদ্বিষয়ক সত্য জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহার বাক্যই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাহার তাহার বাক্য সত্য মনে করিতে হইবে না। এক্ষণে কথা এই যে, কাহার বাক্য সত্য তাহা জানিব কি প্রকারে? যখন আপন বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া মত নির্ব্বাচন করিলেও সত্য নির্ণীত হয় না, প্রত্যুত ভ্রান্তি হইবারই সম্ভাবনা, তখন কি প্রকারে বুঝিব কাহার বাক্য সত্য? কিপ্রকারে সহস্র সহস্র লোকের সত্য বলিয়া প্রচারিত সহস্র সহস্র প্রকার বাক্যের মধ্য হইতে সত্য নির্ব্বাচিত হইবে? ইহারই উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।' জ্ঞানীসম্প্রদায় যে বাক্যকে সত্য বলিয়া গণ্য করেন তাহাকেই সত্য মনে করিতে হইবে। ঐ সত্য নিরূপণ জন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রাচীনগণ যে সকল তত্ত্ব প্রচারিত করিয়াছেন তাহা ভ্রান্তি-দূষিত কি না তাহার পরীক্ষা উপযুক্ত পণ্ডিতগণই করিবেন। সাধারণের সে বিচার করিবার অধিকার নাই। সেই পণ্ডিতগণের নিরূপিত সত্যকেই সাধারণের সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে পরের বাক্য সত্য কি না বুঝিয়া লওয়া হয়, অথচ বুঝিবার দোষে সত্যের অপলাপ হয় না। পণ্ডিতেরও কখন কখন ভ্রম হয় বটে, কিন্তু সমস্ত জ্ঞানী সম্প্রদায়েরই একবিধ ভ্রম নিতান্ত অসম্ভব। হইলেও তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তদ্ভিন্ন মানবের গত্যন্তর নাই। কেন না, প্রত্যক্ষ দর্শন, বিজ্ঞানবাক্য ও পরবাক্য বা আপ্তবাক্যের সহায়তা ভিন্ন জ্ঞানলাভের উপায়ান্তর নাই, অথচ তিনেতেই ভ্রান্তি আছে। ভ্রান্তিভয়ে যদি আপ্তবাক্য অবিশ্বাস করিতে হয়, তবে বিজ্ঞানবাক্য অবিশ্বাস করিতে হইবে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও অবিশ্বাস করিতে হইবে। তাহা

হইলে কোন জ্ঞানকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কিন্তু জ্ঞানে বিশ্বাস না থাকিলে মানবের কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। যেমন চিকিৎসকের চিকিৎসায় বিশ্বাস না থাকিলে রোগ আরাম হয় না, যেমন গুরুর বিদ্যার প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে বিদ্যালাভ হয় না, সেইরূপ সত্যে বিশ্বাস না থাকিলে কার্য্যকুশলী হওয়া যায় না। কোন বিষয়ে সফলকাম ও তৃপ্ত বা সুখী হইতে পারা যায় না।

বাস্তবিক বিজ্ঞানবাক্য অপেক্ষা আপ্তবাক্য অধিক ভ্রমাত্মক নহে, অথবা আপ্তবাক্য ও বিজ্ঞানবাক্য একই কথা। বরং স্থলবিশেষে বিজ্ঞানবাক্য অপেক্ষা আপ্তবাক্য অধিকতর সত্যনির্দ্দেশক। বিজ্ঞানবাক্য ও আপ্তবাক্যের প্রভেদ বুঝিতে পারিলেই এ কথা বুঝা যাইবে। যাহা চেষ্টা করিলে যুক্তি বা প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দ্বারা বুঝিয়া লওয়া যায় তাহাকেই বিজ্ঞানবাক্য বলিয়া থাকে। আর যে বাক্য ঐরূপে বুঝিতে পারা সহজ নহে, অথচ তাহা পূর্ব্বমনীষীগণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রকৃত আপ্তবাক্য। এই জন্যই আপ্তবাক্যের প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। মূলতঃ ও ফলতঃ বিজ্ঞানবাক্য ও আপ্তবাক্য একই। কেন না, উভয়ই যুক্তি আদি অবলম্বনে স্থিরীকৃত। পারদ ও গন্ধক-সংযোগে হিঙ্গুল হয়, অম্লকর ও জলকর বায়ু সংযোগে জল হয় এ সকল বিজ্ঞানবাক্য। কেন না ঐ সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে। সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী সমসূত্রপাতে অবস্থিত হইলে গ্রহণ হয়, গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল আকাশের যে স্থানে আছে বোধ হয় ঠিক সে স্থানে নাই, উহার আলোক রেখা বক্রীভূত হইয়া আসাতে উহাদিগকে স্থানান্তরে পরিলক্ষিত হইতেছে ইত্যাদি বাক্য বিজ্ঞানবাক্য। কেন না এ সকল অনায়াসে শিক্ষার্থীকে বুঝাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু চুরি করা, মিথ্যা কহা, রিপু ও ইন্দ্রিয়ের অধীন হওয়া, পরানিষ্ট করা প্রভৃতি অন্যায় কার্য্য এবং পরোপকার ও দান করা, রিপু ও ইন্দ্রিয়ের দমন করা, সত্য কহা প্রভৃতি সৎকর্ম্ম এ সকল বাক্য আপ্তবাক্য বলিয়া মানিতে হয়। কারণ এ সমস্তই বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে; কিন্তু সকলকে প্রত্যক্ষদর্শনের ন্যায় বুঝাইয়া দেওয়া যায় না, শিক্ষার্থীরাও সহজে বুঝিতে পারেন না। কেন না, ঐ সকল পাপের রাজদণ্ড ও সামাজিক দণ্ড প্রাপ্তিরূপ অনিষ্ট ব্যতিরেকে আর কোনরূপ অবশ্যম্ভাবী অপকার দেখান যায় না। কেন না, এ পৃথিবীতে অনেকে চুরি করিয়া, মিথ্যা কহিয়া ও পরানিষ্ট প্রভৃতি দ্বারা অতুল অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন এবং অনেকে সত্যপরায়ণ, দয়াবান প্রভৃতি হইয়া এক কালে নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছেন। পাপপরায়ণের বাহ্যসুখ ও পুণ্যবানের দুঃখ পাওয়ার উদাহরণ অল্প দৃষ্ট হয় না। সুতরাং উপরোক্ত পাপানুষ্ঠানের অবশ্যম্ভাবী কুফল ও পুণ্যানুষ্ঠানের অবশ্যম্ভাবী সুফলের বিষয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা সহজ নহে। এই জন্য যাঁহারা আপ্তবাক্য বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা ঈশ্বর, পরকাল ও পাপপুণ্য প্রভৃ-

তিকে কল্পনা-সমুদ্ভূত বলেন। বাস্তবিক যে ঐ সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সিদ্ধ তাহা তাঁহারা বুঝেন না। আর একটু বিশদ করিবার জন্য আমরা একটী বিজ্ঞানের কথা লইয়া আপ্ত-বাক্যের লক্ষণ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। মনে কর, সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে জ্যোতি-র্ব্বিদ্‌গণ আকাশস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আকার প্রকার অবস্থান ও গতি প্রভৃতির বিবরণ লিখিয়া আসিতেছেন। ঐ সময়ে কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ একটী নির্দ্দিষ্ট ধূমকেতুর সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। দেড়শত বৎসর পরে আর এক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ ঐরূপ একটি ধূমকেতু গগণে উদিত হইতে দেখেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের তালিকা দৃষ্টে উহার আকারাদি মিলাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্ট ধূম-কেতুর আকারাদির সহিত ইহার সম্পূর্ণ মিল আছে। তিনি তদ্বিবরণ লিখিয়া যান এবং মনে করেন মধ্যবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ হয় এটী দেখিতে পান নাই অথবা এ ধূম-কেতু একালমধ্যে আর উদিত হয় নাই। পুনরায় ১৫০ বৎসর পরে অন্য এক জন ঐ ধূমকেতু দেখিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ধূমকেতু বলিয়া চিনিতে পারেন। এই প্রকারে ৮।৯ শত বৎসর ক্রমাগত ১৫০ বৎসর অন্তর ঐরূপ ধূমকেতুর উদয়ের বিবরণ দেখিয়া ও নানা প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়া কোন জ্যোতি-র্ব্বিদ স্থির করিলেন ঐ ধূমকেতু ১৫০ শত বৎসরে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। ইহা যদি সত্য হয় তবে ইহা বিজ্ঞানবাক্য হই-য়াও আপ্তবাক্য। কেন না, কোন ব্যক্তিরই এমত সাধ্য নাই যে, তিনি কেবলমাত্র নিজ প্রত্যক্ষ দ্বারা ঐ বাক্যের সত্যতা স্থির করেন। যদি ঐ বাক্যকে আমরা আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস না করি তবে ঐ জ্ঞান হইতে আমরা এক বারে বঞ্চিত থাকি।

বিজ্ঞান ও আপ্তবাক্যের আর একটু প্রভেদ আছে। যে সকল প্রাচীন মহাত্মাগণ প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ও সত্যানুরাগী বলিয়া প্রথিত, তাঁহাদের বাক্য যুক্তিদ্বারা প্রমাণযোগ্য হউক আর না হউক, তাঁহাদের বাক্যের প্রমাণের আবশ্যকতা নাই বিবেচনা করিয়া লোকে আপ্তবাক্যের ন্যায় বিশ্বাস করে। কিন্তু যদি কোন নূতন মহাজ্ঞানী লোক কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কেহই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না। তাঁহার বাক্য সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হওয়া আবশ্যক। আবার ঐ ব্যক্তি যদি কালে প্রাচীনগণের ন্যায় প্রতি-ষ্ঠিত হইয়া যান, তাহা হইলে সে সময়ে তাঁহার বাক্য আপ্তবাক্যের ন্যায় গণ্য হইবে। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যাহা পূর্ব্বে বিজ্ঞানবাক্য ছিল তাহারই কতকগুলি, অর্থাৎ যেগুলির সত্যতা বিষয়ে অধিক লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছিল, সেইগুলি এক্ষণে আপ্তবাক্যরূপে পরিগণিত; এবং এক্ষণে যাহা বিজ্ঞানবাক্য বলিয়া কথিত কালে তাহার কতকগুলি আপ্তবাক্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

যে বিজ্ঞানবাক্য বহুতর লোকে বহুকাল হইতে বিনা প্রমাণপ্রয়োগে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং যে প্রমা-ণাদির বলে তাহার সত্যতা স্থিরীকৃত হইয়া-ছিল তাহার ব্যবহারের আবশ্যকতা না

থাকায় তাহার অপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহাই আপ্তবাক্য বলিয়া অভিহিত হয়। উহাকে অভ্রান্ত সত্য মনে করাতেই উহার প্রমাণ প্রয়োগের এত অল্পতা দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক ঐ সকল আদৌ অপ্রামাণ্য বা অযৌক্তিক নহে। যেমন অ, আ, ক, খ, প্রভৃতির প্রতি বিশ্বাস না করিলে কেহ ভাষাবিজ্ঞানে অধিকারী হইতে পারে না, যেমন ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্কে বিশ্বাস না থাকিলে গণিতবিদ্যায় অধিকার হয় না, সেইরূপ আপ্তবাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে কোন তত্ত্বজ্ঞানেই অধিকারী হওয়া যায় না। পরম পণ্ডিত নিউটন বলিয়াছিলেন (I am gathering pebbles on the sea-shore) "আমি সমুদ্রতীরে লোষ্ট্রসংগ্রহ করিতেছি মাত্র;" এবং মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম;" "আমি ভেলা দ্বারা সাগর পার হইবার ইচ্ছা করিতেছি।" মহাজনবাক্য অবলম্বনে সুপণ্ডিত হইয়াও সামান্য সামান্য বিষয়ক জ্ঞান লাভে যত্নশীল মহাপণ্ডিতগণের যখন এইরূপ দুর্দ্দশা, তখন যে-সে ব্যক্তির আদ্যোপান্ত নিজ বুদ্ধিবলে পরমতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে যাওয়া কতদূ নির্বুদ্ধির কার্য্য?

আজি কালি শিক্ষিতসমাজ পণ্ডিত বলিয়া যাঁহাদিগকে মনে করেন ও যাঁহাদিগের উপদেশ অনুসারে তাঁহারা সনাতন ধর্ম্ম ও চিরপ্রচলিত হিতকর রীতি নীতি পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে বিজ্ঞ হইলেও প্রকৃত তত্ত্বাভিজ্ঞ নহেন। যদিও দুই এক জন প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধায়ী হয়েন তাঁহারা কেবল মাত্র পাশ্চাত্য বিদ্যারই অনুশীলন করেন, আর্য্যবিদ্যার কিছু মাত্র আলোচনা করেন না। যে দুই একজন এক্ষণে আর্য্যবিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেছেন তাঁহাদেরও প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। কেন না তাঁহারা সংস্কারান্ধ। বাল্যকাল হইতে পাশ্চাত্য মতের আলোচনা করিয়া তাঁহাদের হৃদয় তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং আর্য্য ঋষিগণের অভিপ্রায় তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। এই জন্য উক্ত পণ্ডিতগণের মত একদেশমাত্র-দর্শন-দোষে দূষিত। আবার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানভিজ্ঞ দেশীয় পণ্ডিতগণ প্রাচীন তত্ত্বের যৌক্তিকতাদির বিষয় আদৌ আলোচনা করেন না, অনভিজ্ঞের ন্যায় শাস্ত্রবাক্যের অনুবর্ত্তন ও তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন মাত্র। এই জন্য মহাজনের অভাবে, গুরুর অভাবে, আপ্তবাক্য স্থির না হওয়াতেই আপ্তবাক্যের প্রতি মানবের এত অনাস্থা হইয়াছে।

সূক্ষ্ম বুদ্ধি, সুস্থ শরীর, উপযুক্ত অবস্থা, অবিচলিত অধ্যবসায়, দৃঢ় ঐকান্তিকতা ও সত্যানুরাগ-সম্পন্ন উচ্চাশয় ব্যক্তি উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া একাগ্রচিত্তে দৃঢ় পরিশ্রম সহকারে পর্য্যবেক্ষণ রূপ তপশ্চর্য্যায় জীবন যাপন করিয়া যে বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহার তদ্বিষয়ক বাক্যের নাম আপ্তবাক্য। কিন্তু তাঁহার বাল্যকালের বাক্য নয়, যৌবনকালের বাক্য নয়, বৃদ্ধকালের বাক্য—যখন (শতমারী ভবেদ্ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ) তিনি সহস্র ভ্রম সংশোধন করিয়া খাঁটি হইয়াছেন, যখন তাঁহার আর বাঁচিবার কাল

নাই, যখন তাঁহার মিথ্যা বলিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিবার আবশ্যকতা নাই—যখন নিজের কোন অভীষ্ট নাই—সেই প্রাচীন কালে বহুকালসাধ্য দৃঢ় তপশ্চর্য্যাবলে যাহা জানিয়াছেন তাহা সত্য সত্যই আপ্তবাক্য—অভ্রান্ত সত্যবাক্য। এই সকল মহাপুরুষদিগের বাক্য অবলম্বন করিয়া চলা সকলেরই আবশ্যক। ইহা বিজ্ঞানসম্মত ও ঈশ্বরাভিপ্রেত।

আশ্চর্য্য এই যে আধুনিক শিক্ষিতগণ মিল, স্পেন্সর, কম্‌টি, নিউটন, ও আর্কিমিডিস প্রভৃতির বাক্য প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন অথচ যে আর্য্য ঋষিগণ নিয়ত তপশ্চর্য্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, যাঁহারা ক্ষণেকের নিমিত্তও সুখের চেষ্টা করেন নাই,এক মনে এক ধ্যানে সত্য উপাসনার জন্য শরীরপাত করিয়াছেন,তাঁহাদের বাক্য আপ্তবাক্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা ভোগপরাঙ্মুখ, স্বার্থশূন্য, পরহিতৈকব্রতী সত্য ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মহাপুরুষ। তাঁহারা অপরিসীম অধ্যবসায় ও দৃঢ় তপস্যার বলে দিব্য বা বিজ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছেন। দিব্য চক্ষু দ্বারা তাঁহারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞাসকল স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন, মানবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ জানিয়া তবে তাঁহারা মানবের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন। যাহা মনে আইসে তাহাই বলিয়া প্রতারণা করেন নাই। সেই মহাপুরুষগণ প্রকৃত জগতের হিতকারী ও তাঁহাদের বাক্যই আপ্তবাক্য।

তবে যে কখনও কখনও আমরা মহাপুরুষবাক্যে ভ্রান্তি দেখিতে পাই, তাহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ হয়ত যে সকল ব্যক্তিকে আমরা মহাপুরুষ বলিয়া জানিয়াছি তাঁহারা প্রকৃত মহাপুরুষ নহেন, দ্বিতীয়তঃ আমরা অনেক সময়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারি না, তৃতীয়তঃ আমাদের বুদ্ধি ও সংস্কার দূষিত হওয়ায় সত্য আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়।

এই জন্য গুরু আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। যখন যে সন্দেহ উপস্থিত হইবে গুরু তাহা নিরাকরণ করিবেন। ভ্রম দেখা যাহার তাহার কর্ম্ম নহে। জ্যোতির্ব্বিদের ভুল জ্যোতির্ব্বিদ্‌ ভিন্ন বুঝিতে পারে না; পণ্ডিতের ভুল পণ্ডিত ভিন্ন বুঝিতে পারে না। সুতরাং কোন স্থানে মতদ্বৈধ দেখিলে আমাদের উপযুক্ত গুরুর উপদেশ গ্রহণ আবশ্যক। তাহা হইলেই কোন্‌টী আপ্তবাক্য ও কোন্‌টী ভ্রান্ত বাক্য বুঝিতে পারা যাইবে। সর্ব্বথা আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করাইবার জন্যই পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তিবৃত্তির সমাবেশ করিয়াছেন। আপ্তবাক্যবিশ্বাসে পরমোপকার লাভ হয় বলিয়াই ভক্তির এত মাহাত্ম্য এবং ভক্তই সাধক ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

সফল স্বপ্ন।

কেন এ আঁধার গেহে,
মলয় পবন বহে,
গবাক্ষের পথে কেন জ্যোছনা পড়েছে আসি ?
জানি না কেন এ ভুল,
মিলনের অনুকূল,
বিরহনিকুঞ্জে যেন, বাজিছে মিলন বাঁশী।
বসে থাকি বাতায়নে,
কত ভুল হয় মনে,
দূরে শুনি কার গান, কারে করে ফেলি ভুল,
ঘুমঘোরে জাগরণ,
ভাবি কার আগমন,
যেন কার ডাক শুনি তুলিতে তুলিতে ফুল।
সম্মুখে পিছনে যার,
ছায়া হেরি বার বার,
হৃদয়ের মাঝে তার, সর্ব্বদা পাই না দেখা।
কত ভুলে—ভুলে থাকি,
আসিবে না হেথা সে কি ?
তার প্রেমে তার মুখে, ধরণী পড়িলে ঢাকা।
দূরে কাছে দেখিবার,
কিছু না রহিবে আর,
শুধু সেই প্রেমমুখ, অধরে আকুল হাসি।
সুস্বপনে কুস্বপনে,
থাকি মোহে অচেতনে,
তাহারি মধুর মুখ, সম্মুখে রহিবে ভাসি।
সে এয়েছে অনুমান,
কেবলি কি ভুল গান ?
কত পিপাসায় রবে পিপাসিত প্রাণ মন ;
আজি কেন এ হৃদয়,
শিহরি চঞ্চল হয়,
ভাবে ভুল কাজে ভুল, এত অগণন ?

কে জানে কাহার গানে,
চাহি গো পথের পানে,
হৃদয় হতাশ হয়, হেরি পুন সে যে নয়,
সদা সুখ-স্বপ্ন টুটে,
তবু ভুলে যাই ছুটে,
ভুলে আঁখি ভুলে প্রাণ, ভুলে ভুল কত হয়।
স্বপনেতে হল মনে,
যেন অতি সন্তর্পণে,
ঘুম ভাঙ্গাবার গান, গাহে কে শিয়রে বসি ?
হৃদয় মিলনাকুল,
(তাই) একি স্বপ্ন ! একি ভুল ?—
মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রম, হেরি যে আলোকরাশি ?
দিবানিশি যার ধ্যান,
সেই মুখ সে নয়ান,
মধুর পরশ সেই, মধুর মদিরামময়।
আজিকার তোলা ফুল,
—সফল সফল—ভুল,
সফল স্বপন আজ, জাগরণে ঘুমে নয় ?

শ্রীপ্রিয়নাথ রক্ষিত।

কবিরত্নের মনস্বিতা।

(উপক্রমণিকা)

তারাপুরে বসুরা এককালে বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। লক্ষ্মী চিরকালই চঞ্চলা, বসুদের আজি আর পূর্ব্বাবস্থা নাই। কিন্তু বসুরা হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের পূর্ব্বকীর্ত্তি এখন একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কপোতাবাসকল্প বহু-প্রকোষ্ঠশালী ভদ্রাসন বাটী, সুপ্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপ, সুচারু শিবমন্দির, প্রসন্নসলিলা দীর্ঘিকা, রম্যোদ্যান সকলই রহিয়াছে। দীর্ঘিকার জলে স্নান পান নির্ব্বাহ করিয়া, শিবমন্দিরে ভূতনাথের পূজা করিয়া, সায়ম্প্রাতঃ চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হইয়া, গ্রামের লোকে অদ্যাপি বসুদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে।

ভদ্রাসন বাটীর অনতিদূরে, গ্রামের মধ্যভাগে এক প্রশস্ত ভূখণ্ডে বসুদের চণ্ডীমণ্ডপ

প্রতিষ্ঠিত। অপরাহ্নে গ্রামের সমস্ত ভদ্রলোকই সেই চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং নানাবিষয়িণী কথাবার্ত্তায় সকলেই নিরতিশয় সংলাপসুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

তারাপুরের প্রান্তভাগে একটি সামান্য চতুষ্পাঠীতে এক জন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করেন—জনসমাজে তিনি সোমনাথ কবিরত্ন বলিয়া পরিচিত। তাঁহার জন্ম তারাপুরে নহে—দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসর হইল তিনি ঐ গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছেন। তিনি একাকী এতদিন দিনপাত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্র আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কোনও উত্তর দেন না। তবে কেহ কেহ বলেন যে পুত্রকলত্রের কথা উত্থাপন করিলে, তাঁহার দৃষ্টি যেন ঈষৎ ভূসংলগ্না হয় এবং মুখে কালিমার ছায়া পড়ে। যাহা হউক, তারাপুরে তাঁহার জীবনের পূর্ব্বভাগের কথা কেহই অবগত ছিলেন না। এক দিন, কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে কেহ সংসারবিরাগী যোগী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি সস্মিত বচনে বলিয়াছিলেন যে তিনি ঘোর সংসারী, আমাদের সাধারণে যদ্রূপ বিষয়সুখাভিলাষী তিনিও প্রায় তদ্রূপ। তিনি স্বয়ং কখনও কাহারও বাটিতে পদার্পণ করিতেন না; লোকে যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর তাঁহাকে স্বস্বগৃহে আহ্বান করিলে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন এবং মৃদু মন্দবচনে যাইতে অস্বীকার করিতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রায়ই তিনি নিরুত্তর থাকিতেন; নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইলে বলিতেন, যে সংসারে সকল কর্ম্মের কারণ স্থির করা দুরূহ এবং স্থির করিতে পারিলেও সকল সময়ে যত্রতত্র কারণ নির্দ্দেশ করা অবিধেয়। কৌতূহলবশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা তাঁহার চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইতেন সকলেই তাঁহার সকাশে জাত্যনুরূপ সাদর সম্ভাষণ পাইতেন। সকলেই তাঁহার ধীর শান্ত শিষ্ট ব্যবহারে ও মৃদুমধুর বচনে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইয়া, প্রত্যাগত হইতেন। কিন্তু তাঁহারা যে কৌতূহলের কুহকে পড়িয়া চতুষ্পাঠীসন্দর্শনে যাইতেন সেই কৌতূহলের আদৌ তৃপ্তি হইত না। সম্মুখে শ্যামল প্রাঙ্গণ, চতুঃসীমায় মল্লিকা, জাতিযূথিকা, জবা, বক, করবীর প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ, মধ্যস্থলে পর্ণাচ্ছাদিত সামান্য কুটীর; চতুষ্পাঠীতে উপনীত হইলে, এই সকল বস্তুই সকলের নেত্রপথে প্রথমে পতিত হইত। কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে কেহই এ পর্য্যন্ত সক্ষম হন নাই—কবিরত্নের সাক্ষাৎকার জন্য চতুষ্পাঠীতে কেহ উপস্থিত হইলে তিনি ভদ্রাভদ্রনির্ব্বিশেষে দেহলীতে সমাসীন হইয়া তাহার সহিত সংলাপে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু উন্মুক্তদ্বার থাকিলে দেহলী হইতেই লোকে প্রকোষ্ঠের কিয়দংশ দেখিতে পাইত। যাহাদের ভাগ্যে এইরূপ সুযোগ ঘটিয়াছে তাহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে গৃহাভ্যন্তরে কেবল এক খণ্ড আস্তৃত আসন ও আসনের আসন্ন কোণে স্তূপাকার সংস্কৃত গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি এবং গ্রন্থরাশির কিয়দ্দূরে তাম্রকোষ তাম্রকুণ্ড প্রভৃতি কতিপয় যথাস্থানে বিন্যস্ত পূজোপকরণ লক্ষিত হয়। প্রকোষ্ঠমধ্যে যদি আর কিছু সামগ্রী থাকে তাহা জনসাধারণের

অবিদিত। নিজকুটীরে তাঁহার জনমনেচ্ছা আদৌ অভিলক্ষিত হইত না; অভ্যাগতের সম্বর্দ্ধনা ও সম্মাননা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন। কেহ কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অত্যল্প কথায় তাহার উত্তর দিতেন। যদি কোনও ব্যক্তি নিজেই নানা কথার অবতারণা করিয়া কথাপ্রসঙ্গ পল্লবিত করিয়া তুলিতেন, তাহা হইলে কবিরত্ন প্রায়ই নীরবে তাঁহার আখ্যাব্যাখ্যা শুনিতেন ও মৃদুমন্দ হাস্যে তাহার প্রতি মুহুর্মুহুঃ সৌজন্য দেখাইতেন। কিন্তু নিজে কখন স্বীয় অভিমতি খ্যাপনে প্রবৃত্ত হইতেন না। ফলতঃ চতুষ্পাঠীতে গিয়া কবিরত্নের অন্ত না পাইয়া অনেকেই তাঁহাকে এক দুর্জ্জ্বেয় অপূর্ব্ব জীব বলিয়া ভাবিতেন।

সূর্য্যাস্তের চারি পাঁচ দণ্ড পূর্ব্বে, প্রতিদিন সায়াহ্নকালে কবিরত্ন পদব্রজে বসুদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে ধীরে ধীরে স্বগৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা সকল ঋতুতেই সায়ংকালে কবিরত্নকে বসুদের চণ্ডীমণ্ডপে দেখিতে পাওয়া যাইত। অবিশ্রান্তভাবে বৃষ্টি পড়িতেছে, সান্ধ্য-গগনে ঘনঘটা ছুটিতেছে, দিকচক্রে তমোরাশি ক্রমশঃ আসিয়া দেখা দিতেছে—চণ্ডীমণ্ডপ নীরব নিস্তব্ধ জনসমাগমশূন্য—এমন সময়ে সেই স্থলে যাইয়া উপস্থিত হও, অস্ফুট পদধ্বনি তোমার শ্রুতিগোচর হইবে এবং সংবর্দ্ধমান অন্ধকারমধ্যে এক মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে; আর নিকটস্থ হইলে কবিরত্নকে চিনিতেও পারিবে। কিন্তু প্রায়ই তাঁহাকে চণ্ডীমণ্ডপে একক থাকিতে হইত না। গ্রামস্থ সমুদয় ভদ্র লোকের সহিত তাঁহার সেই স্থানে নিত্যই সাক্ষাৎ হইত। গ্রামের মধ্যে বসুদের চণ্ডীমণ্ডপই একমাত্র সমাগমস্থান। সকলেই অবসর পাইলে, অপরাহ্নে একবার সেই স্থলে দর্শন দিতেন।

মানুষের বাদানুরাগ চিরপ্রসিদ্ধ। কতিপয় লোকে একত্রিত হইলেই বিবিধবিধানে কথাবার্ত্তা চলিয়া থাকে। তারাপুরে তাহাই ঘটিত। সকলে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট হইলেই, সংলাপস্রোতঃ প্রবাহিত হইত এবং অবিলম্বে সেই স্রোতে আবালবৃদ্ধ সকলেই ভাসমান হইতেন। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, কবিরত্নের উক্তিপ্রত্যুক্তিতেই উপচিতকলেবর হইয়া অনুদিন সেই সংলাপধারা অসীম অনন্ত কালতরঙ্গে মিশাইয়া যাইত। বসুদের চণ্ডীমণ্ডপে প্রধান বক্তা কবিরত্ন, অপরাপর লোকে শ্রোতা মাত্র। যে জন সেই মনোরম দেবীগৃহে তাঁহার মুখনিঃসৃত বচনপীযূষ পান করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছেন। চতুষ্পাঠীতে যে ব্যক্তি কবিরত্নের মুখে কথা শ্রবণ করেন নাই, ইঙ্গিতে মনোভাব বুঝিয়াছেন, সেই ব্যক্তি দেবীমণ্ডপে তাঁহার বচনচ্ছটা দেখিয়া মনে মনে কতবার বিস্ময় মানিয়াছেন। সময়ভেদে, স্থানভেদে কবিরত্নের প্রকৃতিবৈলক্ষণ্য দেখিয়া অনেকেই স্তম্ভিত, চমৎকৃত হইয়াছেন; কিন্তু কেহই এই বৈষম্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কবিরত্ন এক নূতনবিধ অদ্ভুত জীব—সচরাচর মানুষের মত নহে—তারাপুরবাসীরা এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কবিরত্নের সদৃশ পণ্ডিত তারাপুরে কেহ ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও যথেষ্ট ছিল। তিনি কোন বিষয়ে ব্যবস্থা দিলে তারাপুরে দ্বিরুক্তি করিবার লোক মিলিত না—সকলেই তাঁহার কথা অসন্দিগ্ধচিত্তে শাস্ত্রসঙ্গত সুব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেন। যে দুই চারি জন ব্রাহ্মণপণ্ডিত পৌরোহিত্যকার্য্যে ব্রতী ছিলেন তাঁহারা কবিরত্নেরই মতামত লইয়া তারাপুরে ধর্ম্ম্য ক্রিয়া সম্পাদন করাইতেন। শাস্ত্রার্থগ্রহণে কি কাব্যার্থবোধে কাহারও কোনও সংশয় উপস্থিত হইলে তিনিই তাহার নিরাকরণ করিতেন। দর্শনের কূটপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেও কবিরত্ন মৌনাবলম্বন করিতেন না—ক্রমশঃ কুণ্ডলীকৃত অজগর যদ্রূপ বিপক্ষ শত্রুকে নিষ্পেষিত করে, তাঁহার বচনপরম্পরাও তদ্রূপ ক্রমশঃ বিপক্ষ পক্ষকে নির্ব্বাক্ করিয়া তুলিত। ফলতঃ সমকক্ষাভাবে তারাপুরে কবিরত্নের একছত্রত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কবিরত্ন সম্বন্ধে এত কথা শুনিয়া অনেকের মনেই তাঁহার বাহ্য মূর্ত্তি কিরূপ, বয়ঃক্রম কত, তদ্বিষয়ে জ্ঞাত হইবার কৌতূহল জন্মিতে পারে। তজ্জন্য তাঁহার বয়োরূপবিষয়িণী দুই চারি কথার অবতারণা করিলে বিশেষ দোষ হইবে না। তিনি স্ফুট গৌরবর্ণ ছিলেন না—তবে চম্পকদামগৌর বটে। মস্তক মুণ্ডিত, কেবল মধ্যভাগে এক গ্রন্থিমতী শিখা। ললাট প্রশস্ত, চক্ষু কৃষ্ণতার, বিশাল জ্যোতির্ম্ময়; নাসিকা উন্নত, ওষ্ঠাধর প্রতনু, রক্তাভ তেজঃব্যঞ্জক। গ্রীবাদেশ ঈষৎ দীর্ঘায়ত, বক্ষঃস্থল বিস্ফারিত—সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সৌষ্ঠবসম্পন্ন। শরীর দীর্ঘাকার নাতিকৃশ নাতিস্থূল—তাঁহাকে দেখিলেই কর্ম্মঠ, শ্রমসহিষ্ণু বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তাঁহার বয়ঃক্রম অন্যূন চত্বারিংশৎবর্ষ। সংক্ষেপতঃ বলিতে হইলে, কবিবাক্যে কবিরত্নকে অগ্নিগর্ভশমীবৃক্ষের সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার আকৃতি দেখিলে মনে মনে এইরূপ ধারণা হয়—যেন বিধাতা অঘটন ঘটাইয়াছেন, বজ্রের কাঠিন্য ও কুসুমের মার্দ্দবে এক অদ্ভুত জীব নির্ম্মাণ করিয়া মর্ত্ত্যে জঙ্গমকুলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার আদৌ বেশভূষার পারিপাট্য ছিল না—সামান্য কার্পাস বস্ত্র ও একখণ্ড উত্তরীয় মাত্র পরিধানার্থ ব্যবহার করিতেন। পাদুকাকুলের মধ্যে উৎকলদেশীয় পাদুকারই তাঁহার পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু সময়ে সময়ে কবিরত্ন অনাবৃতপদে ক্ষিপ্রগতিতে চণ্ডীমণ্ডপাভিমুখে আসিতেছেন, ইহাও অনেকের নয়নগোচর হইয়াছে। তাঁহার ললাটে সততই ত্রিপুণ্ড্র শোভা পাইত এবং গলদেশে সংস্কারোজ্জ্বল যজ্ঞোপবীত নিরন্তর দোদুল্যমান দেখা যাইত।

কবিরত্নের উপজীবিকা কি ছিল সেই বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেই, তৎসম্বন্ধিনী প্রায় সমস্ত কথারই একপ্রকার আভাস দেওয়া হইবে। কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহাকে এখনও সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ বৃত্তি দিতেন তাহাতেই তাঁহার কথঞ্চিৎ দিনযাপন হইত। পূর্ব্বে অনেকেই তাঁহাকে

বৃত্তি ও বার্ষিক দিতেন, এবং তিনিও সানন্দে দশ পঞ্চদশ ছাত্রকে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া বিদ্যাদান করিতেন। কালস্রোতে লোকের গতিমতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, পূর্ব্বতন বৃত্তিদাতার মধ্যে এখন অনেকেই তাঁহার বৃত্তিলোপ করিয়াছিল—তাঁহাকেও অগত্যা অধ্যাপন কার্য্যে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। তিনি অধ্যাপনা করেন কিনা এই কথা কেহ জিজ্ঞাসু হইলে, কবিরত্ন ধীরভাবে অস্ফুটস্বরে "না" বলিতেন; কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে প্রায়ই মালিন্য-মেঘে তাঁহার মুখচন্দ্র আবৃত করিত। অল্প কথায় বলিতে হইলে কবিরত্ন এখন দৈন্য-দশাগ্রস্ত। তথাপি তিনি ধনলোভে, বিদায়ের প্রত্যাশায়, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেন না—সকলেই একবাক্যে বলিত যে, তিনি একজন প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থ-লালসা-শূন্য নিস্পৃহ লোক।

(৯)

দিনান্তরম্য নিদাঘকাল সমুপস্থিত। আজি বৈশাখের শেষে তারাপুরের চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামস্থ ভদ্র ও ভদ্রাভিমানী সকলেই আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন। গ্রীষ্মাবকাশ নিবন্ধন বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র ও অধ্যাপক তারাপুরে বিশ্রামসুখ উপভোগার্থ সমাগত। তন্মধ্যে দুই জনকে আজি প্রদোষে দেবীগৃহে দেখিতে পাইতেছি। শ্রীমান বিপ্রদাস ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমুজ্জল রত্ন; তাঁহার পঠদ্দশা অতিক্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে তিনি একটি উচ্চ আদর্শের নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পাঠনকার্য্যে ব্রতী। তারাপুরে তাঁহার শ্বশুরালয়। সম্প্রতি তিনি ঐ গ্রামে এক কায়স্থ-ললনার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। নবাগতের মধ্যে অন্যতর ব্যক্তির নাম সুধাময় চক্রবর্ত্তী; তাঁহার ঐ গ্রামেই বাস, গ্রীষ্মাবকাশে বাটী আসিয়াছেন। তাঁহার এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোলকলা পাঠ সমাপ্ত হয় নাই—সম্প্রতি তিনি দেশীয় বিদেশীয় বিধিব্যবহারের সারসংগ্রহে অনুরক্ত। তাঁহার ধারণা যে শ্রীমান বিপ্রদাস দ্বাদশাদিত্যপ্রতিম তাঁহার প্রাতিভ চক্ষু মহীসিন্ধু ব্যোম ভেদ করিয়া সকল সময়েই তত্ত্বদর্শী। উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য ও আনুগত্য জন্মিয়াছে; সৌরোপম বিপ্রদাসের তেজঃপুঞ্জ সুধাময়-রূপী সুধাময়ে সততই প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিরত্নও আজি চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—এখন তিনি এক খণ্ড জীর্ণ কম্বলের উপর একাকী সমাসীন। অপরাপর সকলে কবিরত্নের অনতিদূরে একাসনে সমুপবিষ্ট। অভ্যাগত শ্রীমান বিপ্রদাসের পরিচয় কবিরত্ন সত্বরই পাইলেন—সকলেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধিধীষণার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ আলাপ পরিচয়ের পর, শ্রীমান্ বিপ্রদাস মৃদুহাস্যোদ্ভাসিত মুখে কবিরত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! আপনি দূরে পৃথকাসনে কি জন্য উপবেশন করিয়া আছেন? শূদ্রের সঙ্গে একাসনে বসিলে কি আপনার ব্রাহ্মণত্ব লোপ পাইবে, আপনার পুরুষানুক্রমাগত তেজঃপুঞ্জ কি নিঃশেষিত হইয়া যাইবে?"

কবিরত্ন ধীরভাবে উত্তর করিলেন "এক-দিনে না যাউক, দশদিনে যাইতে পারে—

শূদ্রসহবাস ব্রাহ্মণের পক্ষে শুভকর নহে।” শ্রীমান্ বিপ্রদাসের অধরপ্রান্তে যে মৃদুহাস্য দেখা যাইতেছিল তাহা এতক্ষণে স্ফুটীকৃত হইল। তিনি বলিলেন “শৈশবসংস্কারের কি অসীম ক্ষমতা! আপনার মত সুপণ্ডিতও জাতিভেদের অপকারিতা কি অযৌক্তিকতা দেখিতেছেন না?”

এই কথা শুনিয়া কবিরত্নের জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুতে যেন নবজ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল, মুখে যেন রক্তবিন্দু ঈষচ্ছুরিত হইল। শ্রুতিমধুর মর্ম্মস্পৃক্ স্বরে কবিরত্ন বলিতে লাগিলেন—“চিন্তাশীল লোকে কখনই আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের নিন্দা করিবেন না।—অধিকন্তু উহার উপকারিতা ও যৌক্তিকতা দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিবেন। আপনি যদি নিজে শূদ্র এই জ্ঞানপরিশূন্য হইয়া, নিরপেক্ষভাবে আমাদের সমাজে যেরূপ জাতিভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে,ইহার উপকারিতাপকারিতা বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ যে আদর্শস্থলীয় ইহা আপনারও হৃদয়ঙ্গম হইবে।”

সামাজিক রীতি নীতির উৎকর্ষাপকর্ষ স্থির করিতে হইলে সকলেই একবাক্যে যে সব রীতি নীতির অনুশীলনে,যেরূপ প্রথার প্রচলনে সমাজ সুরক্ষিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়া থাকে সেই সব প্রথাদিরই মুক্তকণ্ঠে যৌক্তিকতা ও শুভকারিতা স্বীকার করিয়া থাকেন। জাতিভেদে আমাদের সমাজে শুভ কি অশুভ সংসাধিত হইতেছে, তাহা স্থিরচিত্তে ক্ষণকাল অনুধাবন করিলে নির্ম্মৎসর উদারচিত্ত লোকে কখনও চতুর্বর্ণলোপ করিতে ইচ্ছুক হইবেন না।

সমাজে প্রত্যেক মানুষে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত—একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। সমাজ-সংরক্ষার্থ করণীয় কার্য্য বিভাগ করিয়া লইতে হয়—প্রত্যেকে স্বস্ব অভিলষিত, সাধ্যায়ত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হয়। এই ব্যাপার মনুষ্যসমাজ মাত্রেই সকল সময়ে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইহাও সহজে অনুমেয়। আমাদের মধ্যে কর্ম্মবিভাগে এই মৌলিক নিয়মেরই প্রাধান্য অভিলক্ষিত হইতেছে। প্রত্যেক বর্ণেরই কতিপয় অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, শ্রুতি স্মৃতি অধ্যয়ন অধ্যাপনে, যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম্য ও মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্রতী থাকিবেন—সমাজে সকলের উপদেষ্টা স্বরূপ বিরাজ করিবেন—এই শাস্ত্রনিয়োগ। ক্ষত্রিয় নিজরাষ্ট্র শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, দুর্ব্বৃত্ত লোকের দমন করিবেন, প্রজাবৃন্দের যাহাতে সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে অহরহঃ সচেষ্ট থাকিবেন, তাঁহার পক্ষে এই ব্যবস্থা। বৈশ্য বাণিজ্য কৃষিকার্য্য পশুপালন প্রভৃতি আর্থিক ব্যাপারে সংলিপ্ত থাকিবেন, ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। শূদ্র প্রসন্নচিত্তে দ্বিজসেবায় জীবনোৎসর্গ করিবেন, ইহাই শাস্ত্রাভিপ্রেত। এইরূপে বর্ণভেদে কর্ম্মভেদ অনুসূচিত হইতেছে। ঈদৃশ বর্ণবিভাগের দোষ কি? সামান্য পরিবারমধ্যে যদি পরিবারস্থ প্রত্যেক নরনারীর কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে,তাহা হইলে সেই পরিবারের কার্য্যকলাপে কোনও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না, সকল কর্ম্মই সুনিয়মে হইয়া থাকে। কিন্তু সকলের

করণীয় কর্ম্ম স্থির না থাকিলে সেই পরিবার-মধ্যে কোন কার্য্যই সুসম্পাদিত হয় না; চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলার ঘোরোর্ম্মি প্রসূত হইয়া আশু সেই পরিবারের বিনাশ সাধন করে। কি ক্ষুদ্র পরিবারে কি বৃহৎ সমাজে, সংসারের এই দুর্লঙ্ঘ্য রীতি কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। যে বর্ণাধিভাগগুণে সমাজে সকলেরি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যাহার কল্যাণে আমাদের সমাজ যুগযুগান্ত-ব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে, সেই সর্ব্বমঙ্গলকর জাতিভেদের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আপনি সন্দিহান! বিরলে বসিয়া সুস্থিরচিত্তে এই বিষয় একবার একাগ্রচিত্তে ভাবিয়া দেখিবেন—দীন ব্রাহ্মণতনয়ের এই নিবেদন।

জাতিভেদ বিষয়ে অনেক কথা মনে হইতেছে—অন্ততঃ আরও দুই একটি কথার উল্লেখ করিব। যদি কোনও লোক একটি বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকে, সেই বিষয়েরই উৎকর্ষ সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হয় এবং আজীবন সাবহিত চিত্তে সেই কার্য্যেই সংলিপ্ত থাকে, তাহা হইলে যে সেই বিষয়ে তাহার অসামান্য পারদর্শিতা জন্মিবে, এ কথায় কেহ দ্বিরুক্তি করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। পিতৃমাতৃগুণ পুত্র যে সংপ্রাপ্ত হইতে পারে,ইহাও চক্ষুরুন্মীলন করিলে চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মনতনয়ের যেরূপ শাস্ত্রাভ্যাসে পটুতা ও আনুরক্তি দেখা যাইবে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রসুতে কখনই তাহা অভিলক্ষিত হইবে না। এই নিয়মের যে ব্যভিচার নাই একথা বলিতেছি না, তবে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। ক্ষত্রিয়জ যেরূপ স্বল্পকাল মধ্যে শৌর্য্যবীর্য্যে অতুল হইয়া উঠে, ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্রসূনুর সেইরূপ হওয়া অসম্ভব। বৈশ্য শূদ্র যেরূপ কৃষিবাণিজ্যের দ্বারা অর্থাহরণ করিতে পারিবে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রাত্মজে তদ্রূপ কখনই পারিবে না। মূলকথা এই, পিতৃমাতৃগুণ পুত্রে প্রায়ই বর্ত্তিয়া থাকে। জাতিভেদ থাকায়, পূর্ব্বপ্রকটিত দ্বিবিধ উপায়েই লোকের কার্য্যকুশলতা জন্মিবার সম্ভাবনা।

প্রত্যেক বর্ণের অবধারিত কর্ম্ম থাকায় সেই বর্ণস্থ সকলেই আজীবন সেই সব কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাকিবে; ক্রমশঃ স্বকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিবে, ইহাই অনুমানসিদ্ধ। আবার লোকে পুত্র পৌত্রাদি-ক্রমে আবহমান কাল একই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে তৎকার্য্য সম্পাদনে যে কালক্রমে অনেক ধুরন্ধরের আবির্ভাব হইবে, ইহাও যুক্তিসিদ্ধ। যে জাতিভেদের কল্যাণে ঈদৃশ মহদুপকার সংসাধিত হইতেছে সেই চাতুর্ব্বণ্য-বিভাগ অযৌক্তিক ও অমঙ্গলকর এই কথা আপনি সর্ব্বজনসমক্ষে অম্লানবদনে কি করিয়া বলিলেন আমি ভাবিয়া আকুল।

অনেকে বারম্বার এই কথা বলিয়া থাকেন যে বর্ণবিভাগ-নিবন্ধন আমাদের সমাজ ঘোর বৈষম্যের লীলাভূমি, চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে সাম্যাভাব এতাদৃশ প্রবৃদ্ধ হইয়াছে যে সকলে নরযোনিসমুদ্ভূত বলিয়া বোধ হয় না; শূদ্র পশুবৎ অনাদৃত, ব্রাহ্মণ দেববৎ পূজিত। তাঁহাদের মতে যে বর্ণভেদগুণে সমাজে এবম্বিধ কৃত্রিম বৈষম্য লব্ধপদ হইয়াছে তাহা সমূহ দোষের আস্পদ ও অমঙ্গলের কারণ।

মমাজে শূদ্রাপেক্ষা ব্রাহ্মণের অধিক সমাদর দেখিতে পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু তজ্জন্য কি জাতিভেদের অযথা কুৎসা করিতে হইবে? এ জগতে সাম্য কোথায়! বৈষম্যই সংসারের নিয়ম। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বলিয়া থাকে যে হস্তের পঞ্চাঙ্গুলী সমান নহে। সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশে মানুষে মানুষে সাম্য নাই। বিদ্যা বুদ্ধি, বলবীর্য্য, কুল শীল, বিভব সম্পদ, সুকৃতি দুষ্কৃতি প্রভৃতি নানাবিধ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক কারণে মনুষ্যসমাজে বৈষম্য ঘটিতেছে। কোন ক্ষণজন্মা পুরুষকে দেখিবার জন্য রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়; বিলাসীকুল বিলাস বিভ্রম বিসর্জ্জন দিয়া সন্ত্রস্তপদবিক্ষেপে গৃহচূড় গবাক্ষ বাতায়নে সরোজসন্ধান করেন; আবার কোন হীনকর্ম্মা হতভাগ্যের মুখাবলোকন করিতে হইবে না বলিয়া, আবর্ত্তিতনয়নে তৎসামীপ্য পরিহার করিয়া সকলে চলিয়া যায়। এই সর্ব্বজনীন বৈষম্যে দোষারোপ করা নিতান্ত অবিধেয়—মনুষ্য-প্রকৃতিই ইহার জন্য দায়ী। প্রথমে বর্ণবন্ধনের সময় আদিব্রাহ্মণগণের অবশ্যই বিশেষত্ব ছিল, তাহাতেই তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-বর্ণভুক্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন;—

বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতিশ্রৈষ্ঠ্যাৎ নিয়মস্যচ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥

তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে গুণহীন মূর্খ ব্রাহ্মণতনয়ের সামাজিক মর্য্যাদা সর্ব্বগুণালঙ্কৃত শূদ্রসুতের অপেক্ষা কি কারণে অধিক, তাহা হইলে আমি বলিব যে সামাজিক মান মর্য্যাদা ব্যক্তিগত নহে, বর্ণগত। নির্গুণ ব্রাহ্মণসন্তান সম্মান সমাদর পাইয়া থাকেন সত্য; কিন্তু সে সম্মান তিনি নিজগুণে পান না; বর্ণগুণে, অন্বয়গুণে, পূর্ব্বপুরুষগণের মাহাত্ম্যে সংপ্রাপ্ত হন। এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। বর্ণগত সম্মান রক্ষিত না হইলে চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজ সংরক্ষা করা নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিবে। বর্ণবিভাগ যে সমাজরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় পূর্ব্বেই তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

শূদ্র সহস্র গুণান্বিত হইলেও যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে না, ঈদৃশ সামাজিক নিয়ম অতীব কঠোর ও অহিতকর, এই কথা কেহ কেহ উত্থাপন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে এই কারণেও জাতিভেদকে দূষিতে পারা যায় না। সর্ব্বাধম বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া এই জন্মেই ক্রমশঃ সর্ব্বোচ্চ বর্ণে অধিরোহণ করিতে পারে, লোকের এই জ্ঞান থাকিলে স্বস্ব কর্ম্মে একাগ্রতার অভাব হইবে; সকলেই সর্ব্বোচ্চ বর্ণে অধিরূঢ় হইয়া কর্ম্মী হইব, মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া বর্ণোচিত কর্ম্মে ঔদাস্য প্রকাশ করিবে এবং অনাস্থা দেখাইবে। সামাজিকগণের মতি গতি এইরূপ হইলে সমাজে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে; সমাজ শিথিল-গ্রন্থি হইয়া পড়িবে। ঈদৃশ পরিণাম অতীব ভয়ানক এবং সর্ব্বথা পরিহার্য্য। মুষ্টিমেয় শূদ্রসন্তানের মনস্তাপ সাধন করিয়া যদি এই বৃহৎ সমাজের শুভ সম্পাদিত হয় তাহা হইলে আমাদের ক্ষোভের কারণ নাই; সংসারীর পক্ষে সমাজ-সংরক্ষাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়—সমাজ অক্ষুন্ন

রাখিতে পারিলেই সকলের কৃতার্থম্মন্য হওয়া উচিত। ব্যষ্টির অকল্যাণে যদি সমষ্টির মঙ্গল হয়, তাহা হইলে সামাজিকের পক্ষে সেই পথই প্রশস্ত।

যাহা হউক শাস্ত্রকারেরা শূদ্রের আশা একেবারে নির্ম্মূল করেন নাই, জন্ম জন্মান্তরে শূদ্রেরও ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্ভব। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে,—

বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং গৃহস্থানাং যশস্বিনাং।
শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্ম্মো নৈশ্রেয়সঃ পরঃ॥
শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রূষু র্ম্মৃ বাগনহঙ্কৃতঃ।
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়োনিত্যমুৎকৃষ্টাং জাতিমশ্নুতে॥

জন্মপর্য্যায়ক্রমে কালবশে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।

ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। অলৌকিক মনস্বিতা ও অধ্যবসায় থাকিলে, অসম্ভব সম্ভব হইয়া উঠে। অসীমতেজা বিশ্বামিত্র মুনি ব্রহ্মপদস্পর্দ্ধী হইয়া নিজেই নূতন সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভবপর। কিন্তু সামান্য মানুষের পক্ষে অসাধ্য সাধনচেষ্টা দুরাশা মাত্র।

আর একটি কথা বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব। চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গৃহস্থের পক্ষে আবশ্যক,মুমুক্ষুর পক্ষে নহে। সকল বর্ণেরই মোক্ষলাভের সমান অধিকার আছে। সংসার বিসর্জ্জন দিয়া পরমহংস অবধূত সন্ন্যাসী হইলে, বর্ণভেদের প্রয়োজন থাকে না। যে শূদ্র মোক্ষপ্রয়াসী তাহার সমীপে জাতিভেদ কোন ক্ষোভের কারণ নহে। বৃষল শম্বুকের কথা, সদয়োদ্যত-খড়্গ রামচন্দ্রের কথা মনে পড়িতেছে—"শম্বূকো নাম বৃষলঃ পৃথিব্যাস্তপ্যতে তপঃ।"

এই কথা বলিতে বলিতে কবিরত্নের যেন স্বরভঙ্গ হইল, তিনি সহসা মৌনাবলম্বন করিলেন।

শ্রীমান বিপ্রদাস ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "কবিরত্নের মুখে নূতন কথা আর কি শুনিলাম—জাতিবন্ধন সমাজসংরক্ষার উপযোগী, এই কথা দুই একজন পাশ্চাত্য দার্শনিকেও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন; আর শূদ্র হইয়াও ব্রাহ্মণ হইতে পারে এইমত কবিরত্ন প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছেন। ফলতঃ কবিরত্নের সহিত আমার বিশেষ মতভেদ নাই—যদি থাকে, তাহা যৎসামান্য।"

সভাস্থ সকলে শ্রীমান বিপ্রদাসের এই সব কথায় তাদৃশ কর্ণপাত করিলেন না। সুশীল সুধাময়ই কেবল নীরবে তাঁহার বচনসুধা পান করিলেন। অপর সকলে স্তিমিতনয়নে কবিরত্নের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখশ্রী এখন এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে দেখিয়া সকলের মনে স্বতঃ ভক্তিভাবের উদয় হইতে লাগিল।

সায়ংসন্ধ্যার সময় উপস্থিত বলিয়া কবিরত্ন গাত্রোত্থান করিলেন, এবং মৃদুমন্দপদবিক্ষেপে নিজ কুটীরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

শ্রীপঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নিভৃত-চিন্তা।

পরের জন্য প্রাণ টানে কেন? কিছু চাই নাই, কিছু চায় নাই; কিছু দিই নাই, কিছু দেয় নাই; কিছু দিবার ইচ্ছাও নাই, পাইবার প্রত্যাশাও নাই; তথাপি আমার প্রাণ আমাতে তুষ্ট না হইয়া অকারণে পথে পথে বিচরণ করে কেন? যদি মাটির ঘট মাটিই হয়, তবে প্রাণের পর্য্যটন বৃথা; কারণ যাহা ভিতরে নাই, তাহা বাহিরেও নাই। আর যদি মাটিতে কোন বস্তু থাকে, তবে অবশ্যই তাহা গৃহে বাহিরে সর্ব্বত্রই সুলভ। সুতরাং সেরূপ সামগ্রীর জন্য প্রাণের পরপদাঙ্কচারিতার প্রয়োজন কি? গৃহ যদি অভাবের উত্তরসাধক হয়, তবে আবার জগতের মুখাপেক্ষিতা কেন? এখন কথা হইতেছে, পরস্কন্ধচারিতা প্রাণের স্বতঃসিদ্ধধর্ম্ম, কি তাহার কোন অন্তর্নিহিত গূঢ় জিজ্ঞাসার প্রতিবাদ? প্রয়াসীরই স্থৈর্য্য থাকে না। প্রয়াসী পদ্ম-প্রভাকরের প্রভায় আত্ম হারাইয়া বসে; প্রয়াসী বণিক অর্থের নিমিত্ত অস্থির হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হয়। ফল কথা, যেখানে প্রয়াস নাই, সেখানে আকুলতা নাই। প্রাণ যদি কিছু চায় না, প্রত্যাশা করে না, তবে তাহার আকুলতা কেন? সুখের শয্যা পরিত্যাগ করিয়া সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, প্রাণের কিছু প্রার্থনীয় আছে। কিন্তু সেটী কি এবং কোথায় পাওয়া যাইবে, অজ্ঞান প্রাণ তাহা জানে না; আর জানে না বলিয়াই কাহারও নিকটে কিছু চায় না; কেবল এখানে সেখানে ইতস্ততঃ করিয়া বেড়ায়।

চিত্ত প্রাণের আরামভূমি, চিত্তের মৌলিক উপাদান ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় জগতের চিহ্নিত দাস; জগৎ যে পথে, ইন্দ্রিয় সেই পথে। সুতরাং জগতের ভাবে চিত্ত বিভোর। সেই বিহ্বল চিত্তে যে প্রাণের লীলাখেলা, তাহার আত্মনিষ্ঠা কোথায়? তটস্থ জীব অতীন্দ্রিয়চক্রে অধ্যাসীন হইয়া চক্ষুরুন্মীলিত করিল; ইন্দ্রিয় সন্দেহে অমনি সহস্র চিত্রে জগৎ চিত্রিত করিয়া সম্মুখে ধরিল। কৃষ্ণের জীব আত্ম ভুলিয়া সেই চিত্রে নিমজ্জিত হইল, ক্ষুদ্র শলভ দিশাহারা হইয়া জলন্ত জ্বালায় ঝাঁপ দিল। আর জীবের শান্তি নাই, তাহার আর আপনার প্রতি দৃষ্টি নাই; অথচ অপরিবর্ত্তনীয় একতান বহিঃস্থ দৃশ্যে প্রীতি নাই। আত্মানুসন্ধিৎসু সরল জীব আত্ম হারাইয়া উন্মত্ত হইল। উন্মত্ত জানে না যে, অন্তরের জ্বালা জুড়ায় কিসে। তাই সে কিছু চায় না, প্রত্যাশা করে না; নাবিকবিহীন তরণীর ন্যায় অপ্রতিরুদ্ধভাবে বিশাল ভবসাগরে কেবল ভাসিয়া বেড়ায়। জগতের প্রতি যে প্রাণের টান, সে কেবল ইহারই জন্য।

আর এক কথা, প্রাণ ও জগৎ পরস্পর নিঃসম্পর্ক নহে। যেমন বনরক্ষিত শিব, শিবরক্ষিত বন; সেইরূপ এই জগৎরক্ষক প্রাণ, প্রাণরক্ষক জগৎ। জগৎ ও জীব পরস্পর সংমিলিত হইয়া যে কে কাহার আধার ও আধেয় ভাবে অবস্থিতি করিতেছে,

তাহার স্থিরতা নাই। জীব না থাকিলে জগতের অস্তিত্ব বোধ কে করিত? আবার জগতের অসত্বে জীবের অধিষ্ঠানভূত দেহের সংস্কার কিসে হইত? ফলতঃ জীব ও জগৎ সৃষ্টির প্রাণ ও পুত্তলী; একটীকে অপসারিত কর, সৃষ্টির সৃষ্টিত্ব লোপ হইবে। জগতের প্রতি যে প্রাণের টান, উহাদের এই ঘনিষ্ট সম্বন্ধও তাহার অন্যতম কারণ। এই অনিবার্য্য আকর্ষণের বিশ্লেষ করিতে পারে, এরূপ ঘটনাই অপ্রসিদ্ধ।

মনে করিলাম,আর আপনাকে চিনিলাম, জগৎ ছাড়িলাম, সর্ব্বত্যাগী হইলাম, এ সৌভাগ্য জীবের ঘটে না। জীব জগৎকে অগ্রে প্রকৃষ্টরূপে না চিনিলে আপনাকে চিনিতে পারে না। কিন্তু জগৎ এত বিস্তৃত যে, তাহার সমীচীন পরিচয় পাইতে অনেক কালবিলম্ব হয়। ধ্রুব প্রহ্লাদাদির ন্যায় যাঁহারা অতি ভাগ্যবান, তাঁহারাই কেবল একবার দেখিয়া লোকরহস্যের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন; নতুবা সাধারণ প্রাকৃত জনেরা না আত্মগবেষণাই করিতে পারেন, না জগতের ব্যাসকূটের সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। কাযে কাযেই জগৎ লইয়া তাঁহাদিগের অনেক সময় অপবাহিত হইয়া যায়। জগৎ তাঁহাদিগকে ছাড়ে না, তাঁহারাও জগৎকে ছাড়িতে পারেন না। সুতরাং জীবের জগন্নিষ্ঠতা,—পরের নিমিত্ত প্রাণের টান—অস্বাভাবিক বা অনর্থক নহে।

যে আপনাকে চিনিল, আর যে চিনিতে পারিল না, অর্থাৎ যে আত্মাকে লইয়া থাকিল ও যে ব্যক্তি জগৎকে লইয়া থাকিল ইহাদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র নহে। অভিন্ন লক্ষ্যে উভয়েরই চিত্ত লালসিত। সেই লক্ষ্য নির্বৃতি, সেই লক্ষ্য প্রেম।—জীব আত্মনিষ্ঠ বা জীব পরনিষ্ঠ, উভয়েরই অর্থ জীব প্রেমনিষ্ঠ। জীবের মর্ম্মে প্রেম, জীবের কর্ম্মে প্রেম, জীবের ধর্ম্মে প্রেম; প্রেম ভিন্ন জীব আর কিছু চায় না। প্রেম যে পথে, জীব সেই পথে। প্রেমশূন্য স্থানাভাব। সুতরাং স্থানশূন্য জীব নাই। জীব এই জন্যই জগন্নিষ্ঠ। তবে যাহার জগতের প্রেমে মন মজে না, সে অজগৎ অতীন্দ্রিয় প্রেমরসের রসিক হয়। প্রেম পদার্থ এক এবং অদ্বিতীয়। সুতরাং অন্তরের প্রেম ও বাহিরের প্রেমে ভেদ নাই। তবে কিনা, আত্মগত প্রেম গৃহে বসিয়াই লব্ধ হয়, আর জগতের প্রেম কিঞ্চিৎ আয়াসসাপেক্ষ।

এক অভিন্ন সলিল হইতেই নদ, নদী, হ্রদ, সিন্ধু ও মেঘের উৎপত্তি। সেইরূপ এক অভিন্ন প্রেম হইতে দয়া, মায়া, স্নেহ, ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। রুচি-অনুসারে কেহ নদীজলের পক্ষপাতী, কেহ কেহ মেঘজল ভালবাসে। যে যে জলই পান করুক, উভয়েই তৃষ্ণানাশ হয়। সেইরূপ রুচি-অনুসারে কেহ আত্মার, কেহ জগতের প্রেমের পক্ষপাতী। ফল কথা, যে যাহার পক্ষপাতী হউক না কেন, প্রেমজনিত তৃপ্তিলাভ হইবেই হইবে। সেই তৃপ্তির জন্যই যোগী যোগের পক্ষপাতী, জননী শিশুর পক্ষপাতিনী, যুবক যুবতী প্রণয়ের পক্ষপাতী। সেই তৃপ্তিই আত্মনিষ্ঠ জগন্নিষ্ঠ সকলকেই ভুলাইয়া রাখে। যে জগৎ

দেখিয়া ভুলিয়া গেল, তাহার আর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন কি? আর যে ব্যক্তি বিষয়-ব্যাপার ত্যাগ করিয়া আপনাকে লইয়া ভুলিয়া থাকিল, তাহার আর বহির্দৃষ্টির আবশ্যকতা কি? যে যাহাতে মজিয়া গেল, সে তাহাতেই মজিয়া থাক, যে যাহাতে তুষ্ট সে তাহাই লইয়া থাক্। স্থূল কথা, মুখ্য উদ্দেশ্য তৃপ্তিলাভ, কোনরূপে তাহা আয়ত্ত হইলেই হইল।

তবে কিনা, জগতের বস্তুতে বিকার আছে; সুতরাং জগৎসাধনায়ও ব্যভিচার আছে। জননীর প্রীতির বস্তু শিশু। সে যদি শুক্লপক্ষের শশীকলার ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইয়া কুলে শীলে, যশে মানে, সুখে সচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারে, যদি কৃষ্ণপক্ষীয় অপচয়ের ভাব দিনৈকের নিমিত্তও তাহার দেহ-মনঃপ্রাণে সংক্রামিত না হয়, যদি কাল বাদ সাধিয়া অসময়ে তাহাকে আত্মসাৎ না করে, তবে সেই শিশুগতপ্রাণা জননীর আর আনন্দের সীমা নাই. জগতের জীব জগতে ভুলিয়া সখের জীবন সুখে কাটাইতে পারেন। কিন্তু যদি সেই স্নেহের পুত্তলীকে অবশ্যম্ভাব্য অত্যাচারে আজীবন জর্জ্জরিত হইতে হয়, তবেই তো প্রমাদ। আর এই প্রকার প্রমাদকর ঘটনাই জগতের নাড়ীগত। কিন্তু আত্মস্থ জীবের এরূপ আশঙ্কা নাই। তাহাতে ঘূর্ণ্য ঝটিকার আবর্ত্ত নাই, উদ্বেল লহরীর উচ্ছ্বাস নাই, চঞ্চল চিকুরের পর্য্যায় নাই। তাহাতে নিদাঘের জ্বালা নাই, শরতের আড়ম্বর নাই, শিশিরের শৈত্য নাই। তাহাতে দিবারাত্রিভেদ নাই, জাতিবর্ণ বিচার নাই, সুখদুঃখ ভাণ নাই। "তাহাতে কেবল যোগানন্দের উৎস, প্রেমানন্দের উৎস, ব্রহ্মানন্দের উৎস, নিরন্তর উৎসারিত" হইয়া থাকে।

আত্মস্থ জীব যোগী, বহিঃস্থ জীব ভোগী। যোগী ও ভোগী উভয়েরই সমীহিত প্রেম। যোগীর প্রেম নিত্য-প্রবহমান একধার; ভোগীর প্রেম সহস্রধার, সুতরাং আশুনিঃশেষশীল। দেবভোগ্য সুধা, আর যোগ-জন্মা প্রীতি। ভোগভাব্য সুখ, আর সর্পসেব্য বিষ। সুধাও অমৃত, বিষেও অমৃত আছে; উভয়েরই নাড়ীলক্ষ্য এক, কিন্তু একে প্রাণ যায়, অন্যে প্রাণ রক্ষা করে। সুতরাং যোগ রক্ষক, ভোগ ভক্ষক। যোগ আত্মবঞ্চনা করিয়া পশ্চাৎ অখিল পুরিয়া দেয়, কিন্তু ভোগ অগ্রে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দেয়, পরে তাহা কুশীদসহ আদায় করিয়া লয়। কিন্তু তথাপি দগ্ধ হৃদয়ের যে কি প্রকৃতি, যে সেই ভঙ্গীয়ান ভোগেরই আয়ত্ত হইয়া, সেই আপাত-সুখকর সংসারের চিহ্নিত চর হইয়া সে চলিতে চায়।

সংসারের গরল হইতে অমিয়াটুকু বাছিয়া লইয়া যিনি পান করিতে পারেন, তাঁহার নিকটে আত্মস্থ ও বহিঃস্থ এই দ্বৈত-ভাব কোথায়? তিনি প্রেম পদার্থ কি, তাহা বুঝিয়াছেন, প্রেমে মজিতে শিখিয়াছেন। তিনি যদি জগতে মিশিয়া থাকিতে চান, থাকুন, তাঁহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু সেরূপ জহুরি কে? সে প্রকার অদৃষ্টবান কয়জন এই জগতীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন?

সুন্দর শিশুর সুন্দর নেত্রে সকলই সুন্দর। সুন্দর বলিয়া সে সমগ্র জগৎ আত্মসাৎ করিতে চায়। যাহা আপনি পাইতে

পারে না, তাহার জন্য জননীকে অনুরোধ করে। জগতের স্বরূপ কি, সে তাহা জানে না। সে সুন্দরতারই পক্ষপাতী। এই পক্ষপাতিতাই প্রেমিকতা। যিনি শিশুর হৃদয়ে জগৎ অনুভূত করেন, তাঁহার পক্ষে শিশুর ন্যায় অন্তর্দ্দৃষ্টির প্রয়োজনাভাব। তিনি জগৎ লইয়াই থাকিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শিশুর হৃদয় মনুষ্যের হৃদয়ে পরিণত হইলে তাহাতে আর সে পূর্ব্বতন দেবভাব, সে পবিত্র প্রেমিকতা থাকে না। তাহার সেই সৌন্দর্য্য-পরতা কালে স্বার্থপরতায় পরিণত হইয়া অমৃতে গরল উৎপাদন করে। কাযে কাযেই আর তাহার জগতে তৃপ্তি জন্মে না। সে তখন অগত্যা ভিন্ন উপায়ে নির্ব্বৃতিলাভের চেষ্টা করে। সেই উপায়ই আত্মগবেষণা।

আত্মগবেষণা সুতরাং নিরপেক্ষ নহে। ইহা জগতের সহকারিতার উপরে সর্ব্বাংশে নির্ভরিত। জগদ্বিরক্তি না জন্মিলে প্রাণের আত্মাভিমুখী গতি হয় না। জগচ্চর্চ্চাই আত্মজ্ঞানের অনুক্রমণিকা। জগৎই প্রেমিকের প্রেমসংস্কারের দীক্ষাগুরু। প্রেমার্ণবের প্রেম জগতে আকীর্ণ রহিয়াছে। জগৎ তিল তিল করিয়া সেই প্রেমের কণিকা-দ্বারা তাপিত প্রাণের কণ্ঠ শীতল করে। রসিক প্রাণ তাহাতেই শিক্ষা পাইয়া অবশেষে প্রেমের মূল প্রস্রবণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। জগৎ এরূপে শিক্ষা না দিলে জীবের ঈদৃশী মহীয়সী সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। সুতরাং জগতের জন্য প্রাণ টানিবে না কেন? জীব জগতের পক্ষপাতী না হইবে কেন?

নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মল প্রেমেরই জন্য যিনি জগৎসন্নিধানে উপনীত হইবেন, জগৎ তাঁহাকে পরম সমাদরে ক্রোড়ে লইয়া সেই মহান উৎসের পথ দেখাইয়া দিবে। কিন্তু যিনি না বুঝিয়া তাহার গণ্ডী স্পর্শ করিবেন, তাঁহাকে অনধিকারচর্চ্চার পরিণামভূত ভয়ানক কালকূটজ্বালায় জ্বলিতে হইবে।

যাঁহার অন্তরের যোগ প্রেমের দিকে, তিনি যদি প্রেম ও জগৎকে ভেদবুদ্ধির দ্বারা অনুভূত করেন, তবে নিশ্চিৎ তাঁহার যোগ-ভঙ্গ হইবে। জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, সত্য; জগতে দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই নাই ইহাও সত্য। কিন্তু দুঃখ কি? দুঃখই প্রেম। যাহার বৈজ্ঞানিকের চিন্তাপ্রবণ হৃদয় আছে, সেই এই মহাসত্যের মধুরতা উপলব্ধি করে; অন্যে দুঃখের নাম শুনিয়াই অভিভূত হইয়া পড়ে। এই অভিভূতিই জগৎসংশক্তির কারণ। যেহেতু যে ব্যক্তি জগতের দুঃখে ঐকান্তিকরূপে অবসন্ন হয়, জগতের সুখ তাহার পক্ষে সেই পরিমাণে উত্তেজক। দুঃখাত্মক জগতে আবার সুখ কোথায়, এ জিজ্ঞাসার প্রতিবাদ সে এই বলিয়া করিবে যে, প্রবৃত্তিবিষয়িণী তৃপ্তিই সুখ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে সুখ সুখই নয়। কেননা তাহার ব্যভিচার আছে এবং তাহা দুঃখের অনুমাপক। ইন্দ্রিয়সেবায় যেমন মন উত্তেজিত হইল, অমনি পরক্ষণে আপনা হইতেই তাহাতে অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। শরীরের ন্যায় মনেরও স্বাভাবিক নিরাময়তাশক্তি আছে। মনে যেমনই অবসাদের সঞ্চার হইল, অমনি তাহার প্রতীকার-চেষ্টা স্বতঃই বলবতী হইয়া পার্থিব বস্তুতে

আত্মসমর্পণ করে। এইরূপে অবসাদ ও উত্তেজনার অভিভূতি হইতেই জগৎসংশক্তি বাড়িয়া যায়। কিন্তু চিন্তাশীল প্রেমিক জগতের দুঃখে অভিভূত হয়েন না, তাঁহার অন্তরে তাঁহার ভঙ্গীমান সুখেরও উত্তেজনা নাই। তিনি জগতের দুঃখরাশির মধ্য দিয়া প্রেমেরই গবেষণা করিয়া তৃপ্ত থাকেন। বহ্নিতে যেমন সুবর্ণের সংস্কার সাধন হয়, তেমনি শোক তাপ আদি দুঃখ দ্বারা তাঁহার মানসিক উৎকর্ষ সাধন হয়। পীড়িতের পক্ষে যেমন ভিষক, তাঁহার পক্ষে সেইরূপ জগৎ; পীড়িতের ঔষধ, তাঁহার দুঃখ। ঔষধে শারীরিক ব্যাধি নাশ হয়, দুঃখে আন্তরিক রোগ উপশম করে। দুঃখ যতই নিজ প্রতিপত্তি প্রকাশ করিতে থাকে, ততই তিনি নিত্যপ্রেমের স্বরূপার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকেন। সুতরাং মানিতে হইবে যে, দুঃখই প্রেম। আবার যখন দুঃখ জগন্মূলক, তখন জগৎ ও প্রেম অভিন্ন। অতএব জাগতিক না হইলে প্রেমিক হওয়া যায় না। যিনি প্রেম চান, তাঁহাকে জগৎ ছাড়িলে চলিবে না। কিন্তু যিনি জগৎ চান, তিনি প্রেম পাইতে পারেন না। আবার প্রেম বিনা মর্ম্মান্তিক জ্বালা জুড়ায় না। সুতরাং অপ্রেমিক জাগতিকের মনোবেদনার অন্ত নাই। যাহা হউক, প্রেমিক হউক, আর অপ্রেমিক হউক, জীবমাত্রেই জাগতিক। জগতের প্রতি যে প্রাণের টান, সে কেবল ইহারই জন্য।

তপোধন-যুবা উদয়ন তপোবনপ্রান্ত-চারিণী নর্ম্মদাতটিনীর সৈকতপুলিনে উপবেশন করিয়া এইরূপ নানা বিতর্কের পর স্থির করিলেন, জগৎ ছাড়িব না, প্রেমের সংসার ত্যাগ করিব না, আমার প্রাণের প্রাণ অঞ্জলিকার প্রেম কখনই ভুলিব না। হরীতকীর কষায় রসে মধু আছে, বৈরাগ্যব্রতে মধু আছে, আর দাম্পত্যধর্ম্মে মধু নাই? মধু কি? মধুই ত প্রেম। প্রেম উহাতে আছে, ইহাতে নাই, ইহাও কি কখন হইতে পারে? প্রেমের অঙ্গহানি, প্রেমের বৈক্লব্য? কখনই নয়, পূর্ণ প্রেমে বিকৃতি অসম্ভব। প্রেম যদি স্বর্গে থাকে, তবে মর্ত্ত্যেও আছে; প্রেম যদি পর্ণকুটীরে থাকে, প্রেম প্রাসাদেও আছে; প্রেম যদি শুষ্ক তপস্যার অভ্যন্তরে থাকে, তবে অবশ্যই আমার অঞ্জলিকার সরস হৃদয়েও প্রেম আছে; আছেই আছে, সন্দেহ নাই।

উদয়নের অন্তরের তন্ত্রী বাজিয়া প্রতিবাদ করিল, প্রেমিক! প্রেম যদি সার্ব্বভৌমিক তবে একদেশচারিণী নির্ব্বৃতির পক্ষপাতিতা কেন? বিশ্বজননীর ভাবে অবহেলা করিয়া ব্যষ্টিগত ভাবে নিষ্ঠা কেন? জগৎ জুড়িয়া যে প্রেমের ছড়াছড়ি, তাহার জন্য অঞ্জলিকার উপাসনা কেন? হৃদয় কি এত সঙ্কীর্ণ যে, তাহা একবারে সমস্ত জগতে ঢালিয়া দেওয়া যায় না? প্রেমময়ের ভাণ্ডারে প্রেমশূন্য উপাদান নাই। যদি প্রেম চাও, তবে প্রেমের রাজ্যে মিশাইয়া যাও; আপনাকে ভুলিয়া, অঞ্জলিকাকে ভুলিয়া, প্রেমের নামে হৃদয় বিকাইয়া দাও।

উদয়ন অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার প্রতিবাদ করিলেন; কহিলেন, অপার্থিব পূর্ণ প্রেমের আবার অন্ত কোথায়? অনন্ত প্রেম অনন্ত গগণের ন্যায় ঘটপটাবচ্ছিন্ন হইয়া অনন্ত

জগতে ব্যাপিয়া আছে। ভঙ্গীয়ান ঘট ভাঙ্গিয়া যাইবে, ভঙ্গুর পট বিচ্ছিন্ন হইবে; কিন্তু নির্ব্বিকার শূন্যের বিকার নাই, নির্ব্বিকার প্রেমেরও ব্যভিচার নাই। ঘটপটাদিতে প্রেমের একত্বের অপলোপ হয় না, সার্ব্বভৌমিকত্বেরও অন্যথা হয় না। জগৎ জুড়িয়া হৃদয় ছড়াইয়া দাও, আর জগতের একদেশে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখ, ফল একই। এক বিন্দু অমৃতপানেও অমরত্ব লাভ হয়, আর সমগ্র ক্ষীরোদ সিন্ধু উদরসাৎ করিলেও তাহাই হইবে। সেইরূপ প্রেমের নিমিত্ত ঘটপটাদির নিষ্ঠা যাহা, আর সমগ্র জগতের নিষ্ঠাও তাহাই। প্রেম যেখানে লক্ষ্য, সেখানে জগত্বেরই বা ইষ্ট কি, আর ঘটত্বেরই বা আপত্তি কি? ভক্ত প্রেমের পূজাই করিয়া থাকে, ঘটের পূজাও করে না, জগতের পূজাও করে না। যিনি জগৎ লইয়া থাকেন, তিনি যদি পৌত্তলিক না হন, তবে ঘটের অনুসরণকারীও পৌত্তলিক নহেন। জগৎ কি? ঘটেরই সমষ্টি। ঘটের যদি ভঙ্গুরতাগুণ থাকে, জগতেরও তাহা আছে। জগতের ব্যভিচারে প্রেমিকের যদি প্রেমের নিষ্ঠা না যায়, ঘট ভাঙ্গিলেও যাইবে না। অঞ্জলিকা যদি আজ এই বিশাল জগতের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায়, অঞ্জলিকার প্রেমটুকু লইয়াই প্রেমের ভিখারী উদয়ন কাল কাটাইয়া দিবে।

নর্ম্মদার জল তরতর ধারায় খেলিতে খেলিতে জলধিজলে মিশাইতে লাগিল। ক্রীড়াশীল বিহঙ্গ প্রাণ ভরিয়া প্রেমময়ের নাম গায়িতে গায়িতে আপনাপন কুলায়ে নিলীন হইল। বসন্তের ফুল কতক ফুটিয়া মিলাইয়া গেল, কতক আবার মধুর পরিমল ছড়াইতে ছড়াইতে ফুটিতে লাগিল। মেদুর পবন কখন ধীরভাবে, কখন চঞ্চলপদে, কখন খেলৎ শিশুর ন্যায় হেলিতে দুলিতে, কখন কুপিত উরগের ন্যায় ফুৎকার দিতে দিতে শাখীর শাখা কাঁপাইয়া, নর্ম্মদার জল দোলাইয়া,কুসুমের পরাগ ছড়াইয়া, ইতস্ততঃ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতি-অঙ্গে কালি ঢালিয়া দিয়া কে যেন আকাশ ভরিয়া হীরার কণিকা ছড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল। উদয়ন সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া সায়ন্তন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিবার জন্য নর্ম্মদানীরে অবগাহন করিলেন। অন্তরাল হইতে অঞ্জলিকা তাঁহার হৃদয়ের ছবি তুলিয়া লইয়া অতর্কিতভাবে অন্তর্হিতা হইলেন।

শ্রীকেদারনাথ মিত্র।

প্রেম।

আমরা সব প্রেমের ভিখারী, প্রেমের কাঙ্গালী— আজীবন প্রেমের জন্য লালায়িত। যত পাই তত চাই, আমাদিগের প্রেম-লালসার হ্রাস নাই, বিরাম নাই, শান্তি নাই। ভূতময় দেহের যেমন অন্নগতপ্রাণ, চিন্ময় আত্মার সেইরূপ প্রেমগত প্রাণ। আমাদিগের জীবন মরণ প্রেম-সাপেক্ষ। আমাদিগের জীবন-প্রস্রবণের আদিতে প্রেম, মধ্যে প্রেম ও অন্তে প্রেম। প্রেমের সৃজনে আমাদিগের সৃজন, প্রেমের স্থিতিতে আমা-

দিগের স্থিতি—ও প্রেমের লয়ে আমাদিগের লয়। আবার আমাদিগর স্বজনে প্রেমের সৃষ্টি—আমাদের জীবনধারণে প্রেমের স্থিতি—এরং আমাদিগের জীবনের অবসানে প্রেমের লয়। তাহাতেই বলি—সৃষ্টিস্থিতি-লয় প্রেমাধীন, আর প্রেম সৃষ্টিস্থিতিলয়ের অধীন। প্রেম বিশ্বসংসারের সুকোমল হিরণ্ময় শৃঙ্খল—কি সজীব, কি নির্জীব, পদার্থমাত্রই সেই গুণে আবদ্ধ। সত্য বটে, বিজ্ঞানের দর্শনে জড়জগৎ প্রেমরহিত, জড় জগতে ইহার অস্তিত্ব নাই, জড় জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয় আর্কষণ-শক্তির অধীন। কিন্তু যাহাকে—যে শক্তিকে, বিজ্ঞান আকর্ষণশক্তি বলে, আমি যদি তাহাকেই প্রেম বলি—তাহাতে ক্ষতি কি?

বিশ্বমণ্ডল প্রেমময়, আর এই ভবলীলা কেবলই প্রেমের খেলা। যদি মনকে পাশবী চিন্তা হইতে বিমুক্ত করিয়া সেই স্বর্গীয় বিমল ভাবে উন্নত করিতে পার তবে বুঝিবে যে প্রেম সর্ব্বত্র বিরাজমান,প্রেম সর্ব্বব্যাপী। যে দিকে চাহিবে, সর্ব্বত্রই প্রেমের বিকাশ, প্রেমের স্ফূর্ত্তি, প্রেমের পরিণতি দেখিতে পাইবে। সূর্য্যের দীপ্তি, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, তারার ক্ষীণ জ্যোতিঃ, উষার কনক-বিভা, পুষ্পের সুষমা, অলির গুঞ্জন,বিহঙ্গের কূজন, সমুদ্রের প্রসর, নদীর তরঙ্গমালা ও কলধ্বনি এবং জগৎ ও সৌরজগতের স্থিতি ও পরিভ্রমণ—বস্তুতঃ প্রকৃতির এই সমস্ত হাব ভাব, লীলাখেলা, দেখিয়া শুনিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া তোমার মনে কি কখন কোন বৈষম্য, কোন বিকার, কোন ভাবান্তর হয় নাই? যদি হইয়া থাকে তবে তুমি তাহার কারণ যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে পার; আমি বলিব উহার কারণ প্রেম।

আবার অন্য প্রকারে ভাবিয়া দেখ। যখন কুমুদবল্লভ চন্দ্রের বিশদ হাস্যে তারাগণের নয়ন ঢুলু ঢুলু করিতে থাকে; যখন নলিনী-জীবন সূর্য্যের কনক বিভায় কমলিনী প্রফুল্লিত হয়; যখন ফুলভূষা উষার হাসিতে ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিহঙ্গগণ মাতোয়ারা হইয়া গান করে; যখন মধুপানে প্রমত্ত অলিকুল ফুলের সুষমায় বিভোর হইয়া গুণ গুণ স্বরে মনোভাব প্রকাশ করে, যখন স্রোতস্বতী কল্লোলিনী সাগর-সম্মিলনে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়; যখন সৌরমণ্ডলে জ্যোতিস্কগণ পরস্পর দীপ্তি লাভে উল্লসিত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে;—যখন বিশ্বের এইরূপ ভাব তোমার মনে হয়, তখন নায়ক নায়িকার প্রেমভাব তোমার মনে জাগিয়া উঠে না কি? তখন তুমি জড়জগতে প্রেমের অস্তিত্ব অনুভব কর। তখন তোমার জ্ঞান হয় কি স্থাবর কি জঙ্গম সকলেই সেই প্রেমের অধীন!

এই সব গেল অলঙ্কারের কথা। এক্ষণে বিজ্ঞানে প্রেমের পরিচয় কিরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় দেখা যাউক। বিজ্ঞানের উপদেশে প্রেম—মনোবৃত্তি-মাত্র। মনোবৃত্তি-মাত্র! হরি হরি! সবইত বুঝিলাম। "হযবরল"র আবশ্যক নাই। বিজ্ঞানের কূটতর্কপূর্ণ তীক্ষ্ণ সমালোচনায় এমন কোমল পদার্থের মর্ম্মচ্ছেদ করিতে আমাদের মমতা হয়, আমরা কুণ্ঠিত হই।

প্রেমের প্রসঙ্গে সেই পুরাকালের সেই বহুদিনগত দ্বাপরযুগের লীলা মনে আইসে।

সে যুগ নাই, সে নায়ক নায়িকা নাই, সে বিচিত্র মধুমাখা লীলাও নাই! প্রেমের সেই মনোমাদক, কি-জানি-কেমন আধ-ঘুমন্ত ঢুলু-ঢুলু-ভাবোন্মেষ-পরিপূর্ণ সজীব চিত্র, পরিমল-পরিপ্লুত জীবন্ত প্রতিমা এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে! ইচ্ছা হয়, সেই যুগ ফিরিয়া আসুক, সেই নায়ক নায়িকার পুনরবতরণ হউক, সেই লীলার আবার অভিনয় হউক। আমরা সেই নায়ক নায়িকাকে গুরুত্বে বরণ করি, তাঁহাদিগের লীলা স্বচক্ষে দর্শন করি, তাঁহাদিগের চরণ-প্রান্তে বসিয়া সেই প্রেমময়-মুখনিঃসৃত উপদেশরাশি গ্রহণ করি; প্রেম কাহাকে বলে শিখিয়া লই, প্রেমের মর্ম্ম বুঝিয়া লই। কিন্তু তাহা হইবার নহে, যাহা একবার গিয়াছে তাহা আর ফিরে না——কালের এই দুরপনেয় কলঙ্ক! কালের এই নিত্য নিয়ম!

প্রেমের প্রকৃত মর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইলে ঠেকিয়া শিক্ষাই ভাল। শিক্ষা দুই প্রকার; —"দেখিয়া শিক্ষা" আর "ঠেকিয়া শিক্ষা"। "দেখিয়া শিক্ষার" অপেক্ষা "ঠেকিয়া শিক্ষা"র ফল অধিকতর সারবান ও দীর্ঘতর কাল-স্থায়ী। বিজ্ঞানের শিক্ষা—"দেখিয়া শিক্ষা"র অন্তর্গত। স্বচক্ষে দর্শন, স্বকর্ণে শ্রবণ ও স্বীয় কার্য্যকলাপ দ্বারা যে শিক্ষা তাহাই শ্রেয়স্কর।

এক্ষণে সাদা কথায় প্রেমের তত্ব বুঝা যাউক। একের প্রতি অন্যের আসক্তি বা ভালবাসার নাম প্রেম। প্রেম হয় বস্তুগত না হয় ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত প্রেমে দুইটি লোক থাকা চাই, আর বস্তুগত প্রেমে একটী লোক ও একটি বস্তু থাকা আবশ্যক। তোমাতে আমাতে ভালবাসার নাম ব্যক্তিগত প্রেম। আর যখন তুমি কোন বস্তুকে তোমার প্রিয় বলিয়া মান, তখন প্রেম বস্তুগত। যেমন—"তোমায় সঁপেছি প্রাণ মন, মদিরা!" এস্থলে সুরাপায়ীর সুরার সহিত প্রেম (বস্তুগত প্রেম) প্রকাশ পাইতেছে।

যদি প্রেম কি সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে চাও, তাহা হইলে "দেওয়ানা" তাতার বালকের গীতটী স্মরণ কর। বালক গাহিতেছে;—

ফুলপদে.

"হিয়া হিয়া মিলি, চখে চখে খেলি,
বদন নেহারি, আপনা পাশরি,—"

প্রেমের কি সুন্দর ছবি, কি হৃদয়গ্রাহী স্বরূপ বর্ণনা! উভয়ের মনের ভাব একরূপ হইয়া ও সেই ভাব উভয়ের চক্ষে প্রকাশিত হইয়া একজনের মুখসন্দর্শনে অন্যের আত্ম-বিস্মৃতির নাম প্রেম বা চিত্তবিনিময়। উদাহরণস্থলে মনে কর, তুমি একটী রমণীকে দর্শন করিলে। তাহার সহিত ইতিপূর্ব্বে তোমার পরিচয় ছিল না, তাহাকে কখন দেখ নাই। আর সেও তোমাকে কখন দেখে নাই, তোমার সহিত তাহার পরিচয় নাই। তাহাকে দেখিবামাত্র কি-জানি-কেন-বলিতে-পারি-না আর বোধ হয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমিও বলিবে, কি-জানি-কেন-জানিনা, তাহার সহিত আলাপ করিতে, তাহার সহিত সম্মিলিত হইতে, তোমার অভিলাষ জন্মিল। তুমি তাহার মুখ প্রতি চাহিলে—চারিচক্ষু একত্রিত হইল। উভয়ে উভয়ের নয়নদর্পণে হৃদয়ের ছায়া দেখিতে পাইলে। তুমি যতবার তাহার মুখের প্রতি চাহিলে, ততবারই

তোমার আত্ম-বিস্মৃতি হইল, ততবারই তুমি আপনাকে ভুলিয়া তন্ময় হইলে। মনের এই ভাবের, এই অবস্থার নাম প্রেম। তখন তুমি সেই রমণীর প্রেমিক। আর যদি সেই রমণীর মনের ভাব, মনের অবস্থা তোমার ন্যায় হয় তবে সে তোমার প্রেমিকা, তোমরা উভয়ে উভয়ের প্রেমে আবদ্ধ—উভয়ে উভয়কে ভালবাস। আর ইহাই তোমাদের চিত্তবিনিময়।

ঐহিক সম্বন্ধানুসারে প্রেমের নানা আখ্যায়িকা। পিতা মাতার পক্ষে উহা ভক্তি ও সন্তানের পক্ষে স্নেহ বলিয়া খ্যাত। ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে প্রেমের নাম ভ্রাতৃস্নেহ। প্রেম গুরুর পক্ষে শ্রদ্ধা ও শিষ্যের প্রতি বাৎসল্য বলিয়া অভিহিত হয়। ধর্ম্মের সহিত যে প্রেম তাহার নাম ভক্তি ও বন্ধুদিগের মধ্যে যে প্রেম তাহার নাম বন্ধুত্ব। পতি ও বনিতার পরস্পর প্রেমের নাম প্রণয় বা প্রেম এবং প্রেম বলিলেই অনেকে এই সম্বন্ধের আভাস ধরিয়া লয়েন। এই রূপ প্রেমের যে কত নাম তাহা বলা দুরূহ।

প্রেম দ্বিবিধ—পবিত্র আর কলুষিত। যে প্রেমে স্বার্থপরতা নাই, ঈর্ষা নাই, মাৎসর্য্য নাই; যে প্রেম রিপুগণের প্ররোচনায় প্রণোদিত নহে; যে প্রেম সুখেও যেরূপ দুঃখেও সেই রূপ; যে প্রেমে বিচ্ছেদ নাই, বিরাম নাই, অবধি নাই; যে প্রেম প্রিয়জনের জীবনান্তেও প্রেমিকের হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকে; যে প্রেমের কারণ অনির্দ্দেশ্য, যে প্রেমে কেবল ভাল বাসিতে হয় বলিয়া ভালবাসা, যে প্রেমের উক্তি—

"জানিনা যে কেন ভালবাসি;
জানিবা না জানি ভাল,
ভাল বেসে থাকি ভাল—"

যে প্রেমের কালবশে হ্রাস নাই বরং প্রগাঢ়তম পরিণতি, যে প্রেম দুঃখের অপরিচিত এবং যে প্রেমে অনন্তসুখ তাহাই পবিত্র প্রেম। অপর পক্ষে উহা কলুষিত বলিয়া গণ্য।

প্রেমের অপার মহিমা, প্রেমের অসীম শক্তি। প্রেম মায়াময় বাজীকর, চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বিমোহিত করে। প্রেমের চক্ষে কুৎসিত ও কুরূপ সুশ্রী ও সুন্দর দেখায়। প্রেম প্রেমিকের অভাব পূরণ করে। প্রেম নির্ভীকের চিত্তে ভয় ও ভীতের চিত্তে অভয় দান করে। প্রেম কত শত সমরানল প্রজ্বলিত করে, আবার সেই প্রেমই সমরানল নিভাইয়া দেয়। প্রেমে সুখের উৎকর্ষ ও দুঃখের অপনয়ন হয়, প্রেম সন্তাপিত চিত্তকে সুশীতল করে। প্রেমের কুহকে কত দুরূহ ও অসাধ্য কার্য্যও সুসাধিত হয়। তাহাতেই কবি বলিয়াছেন—

শূর হলো নর, ধরি করাল কৃপাণ
পদ্মমুখী প্রেমের আশায়;—
বিপদে না গণে অণু
লক্ষ্য বিন্ধে, ভাঙ্গে ধনু,
একাকী অভীত শত্রুরণে!—
সবক্ষত পূরে প্রিয়া-প্রেম-প্রলেপনে!

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রেমের অপর একটী নাম চিত্ত-বিনিময়। বিনিময়কার্য্যে লাভ অলাভ দুই আছে; লাভেই সুখ আর লোকসানেই পরিতাপ। এই ভবের হাটে চিত্ত-বিনিময়ে পদে পদে লোকসানের ভয়! এখানে ভগ্ন, অর্দ্ধভগ্ন, সুরাগ-যুক্ত,

বিরাগ-যুক্ত, কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত, অপ্রশস্ত, কলুষিত, উজ্জ্বল, কলঙ্কিত, নিষ্কলঙ্ক, সরল ও কঠিন প্রভৃতি ভাল মন্দয় মিশান নানাপ্রকার মনের আমাদানি। সাবধান ভাই! যখন চিত্ত-বিনিময় করিবে অন্যের মন বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া নিজের মন বিনিময় করিও। লাভ হইলে তোমার জিৎ, নতুবা তোমারই ক্ষতি![1] শ্রীপ্রঃ।

তাম্রলিপ্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বর্গভীমার মন্দির ব্যতীত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি মন্দির তমলুকের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, মহাভারত-পাঠকদিগের নিকট তাহা অবিদিত নাই। এই মহদনুষ্ঠান উপলক্ষে বীরবর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরাট সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া যজ্ঞীয় অশ্বের পরিরক্ষণে ভারতবর্ষময় পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। অশ্ববর তমলুকে উপস্থিত হইলে, তাম্রধ্বজ নামক জনৈক ময়ূরবংশীয় নৃপতিতনয় উহাকে ধৃত করেন, এবং যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জ্জুনকে বন্দী করিয়া জয়োল্লাসে নগরমধ্যে প্রবেশ করেন। নগর-প্রবেশানন্তর রাজকুমার পিতার সমীপে উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ তাঁহার গোচর করিলেন। শুনিয়া নৃপতি হর্ষবিষাদে অভিভূত হইলেন। পাণ্ডবসখা তাঁহার রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন, শুনিয়া তিনি যেমন প্রীতিগদ্গদ[14] আবার ধৃষ্টপুত্র তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছে শুনিয়া তেমনি ব্যথিত ও ভীত হইলেন। পুত্রকে তিনি যথোচিত ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। নরপতি পরম বৈষ্ণব ও কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ ছিলেন; অন্তর্যামী তাহা জানিতেন, এবং রাজার ভক্তি যে কত দূর গভীর তাহা অর্জ্জুনকে দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ বিপ্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে শিষ্য সাজাইয়া লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন।[15] ইষ্টদেবের সেই ছদ্মবেশ দর্শনেও শিখিধ্বজ নৃপতি ভক্তিগদগদ চিত্তে তাঁহার চরণে মস্তক লুটাইলেন। তদনন্তর যাহা যাহা ঘটিল তাহা এস্থলে উল্লেখ করিলে প্রবন্ধ বাড়িয়া উঠে, কৌতূহলী পাঠক মহাভারত দেখিলেই তাহা অবগত হইতে পারি-

[1] কিন্তু প্রেমে এত সাবধানতা, এত দোকানদারী, এত যাচাই এত দর-কসাকসী করিতে গেলে প্রেমটা আবার খেলো হইয়া পড়ে। না করিলে ঠকিতে হয় সত্য। কিন্তু নিজে না ঠকিলে প্রেমের মাহাত্ম্য কি? ত্যাগস্বীকারই প্রেমের পূর্ণ লক্ষণ! শ্রীসম্পাদক।

[14] পুত্রের বচন শুনি আনন্দ পাইল।
আলিঙ্গন দিয়া রাজা পুত্রকে তুষিল ॥
শুভ সমাচার পুত্র কহিলা আমারে।
আইলেন নারায়ণ রত্নাবতীপুরে ॥
কাশীদাসী মহাভারত।

[15] বৃদ্ধ বিপ্ররূপ হইলেন নারায়ণ।
রাজাকে করিতে কৃপা করিলা গমন ॥
খুঞ্জি পুঁথি কাঁখে শিষ্য রূপে ধনঞ্জয়।
নৃপতির স্থানে যান হইয়া নির্ভয় ॥
কাশীদাসী মহাভারত।

বেন। সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, ভক্ত-বৎসল ভগবান ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভক্ত ভূপতির মনস্তুপ্তি করিয়াছিলেন। ভূপতি নর নারায়ণ রূপী কৃষ্ণার্জ্জুনের সহবাসে থাকিতে ও তাঁহাদিগকে চক্ষুর সম্মুখে রাখিতে পারেন এই অভিলাষে একটি সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উহার মধ্যে উভয়ের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিলেন। মূর্ত্তি দুইটি জিষ্ণু-নারায়ণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, তমোলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রীতিকর স্থান। সেই অংশটী আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলামঃ—

পুরা দ্বারাবতী মধ্যে গোষ্ঠীমধ্যে গতোঽর্জ্জুনঃ।
শ্রীকৃষ্ণং পরিপপ্রচ্ছ সাদরং বিস্ময়ান্বিতঃ॥
নাথ ভূতলমধ্যে তে সর্ব্বথা কুত্র সংস্থিতিঃ।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি দেবেশ তত্রমে প্রীতিরুত্তমা॥
এতৎ শ্রুত্বার্জ্জুনং প্রাহ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
তমোলিপ্তাৎ পরং স্থানং নাস্মাকং প্রীতিরিষ্যতে॥
মামকং হৃদয়ং লক্ষ্ম্যা যথাত্যাজ্যং তথা ময়া।
তমোলিপ্তং হি নত্যাজ্যমিদমেব সুনিশ্চিতং॥
ত্যজামি সর্ব্ব তীর্থানি কালে কালে যুগে যুগে।
তমোলিপ্তন্তু কৌন্তেয় ন ত্যজামি কদাচন॥

অর্থাৎ—পুরাকালে দ্বারাবতীর (দ্বারকার) সভামধ্যে অর্জ্জুন উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "হে প্রভো! আপনি পৃথিবীর মধ্যে কোন্ স্থানে সর্ব্বথা বাস করেন, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি, এবং সেই বিষয় শুনিতে আমার অতিশয় প্রীতি হয়।" কমললোচন কৃষ্ণ ইহা শুনিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "তমোলিপ্ত অপেক্ষা আমার প্রীতিকর অপর স্থান আর নাই। লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করেন না, তেমনি আমিও তমোলিপ্ত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হে কৌন্তেয়! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও যে, আমি কালে কালে যুগে যুগে আর আর সমস্ত তীর্থ ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তমোলিপ্ত তীর্থ কদাচ পরিত্যাগ করিব না।"

জিষ্ণু নারায়ণের আদি-মন্দিরটি কাল-সহকারে নদের প্রবল স্রোতে বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঐ পবিত্র মূর্ত্তিদ্বয়ের পুনরুদ্ধার হইয়াছিল। প্রায় চার পাঁচ শতাব্দী বিগত হইল, ঐ প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়কে রক্ষা করিবার জন্য একজন সঙ্গতিপন্না গোপাঙ্গনা কর্ত্তৃক একটী নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়। সেই দেবালয় অদ্যাপিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মন্দিরটির গঠন এবং নির্ম্মাণ-প্রণালী ঠিক বর্গভীমার মন্দিরের সদৃশ।

গত বৎসর রূপনারায়ণ নদের ভাঙ্গান পড়িয়াছে। ঐ ভগ্নাংশমধ্যে বহুতর কূপ ও ইষ্টকাদি বিনির্ম্মিত ভবনাদি দৃষ্ট হইয়াছে এবং তন্মধ্যে সুবর্ণের মোহর এবং রৌপ্য-মুদ্রা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। উহার কতক-গুলি এসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠান হয়। মুদ্রাগুলি বহুকালের। কতকগুলিতে বিদেশীয় বণিকগণের নামাঙ্কিত আছে। ইহা ভিন্ন কেহ কেহ হীরকাদি বহুমূল্য প্রস্তরাদিও পাইয়াছে।

এক্ষণে আমরা তমলুকের রাজগণের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। তমলুকের সর্ব্বপ্রাচীন নরপতিগণ ময়ূরবংশীয়। তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই বংশের শেষ রাজা নিশঙ্কনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় মানব-

লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কালুভূইয়া নামক জনৈক ক্ষমতাশালী আদিম জাতীয় নায়ক কর্ত্তৃক ঐ সিংহাসন অপহৃত হয়। এই ব্যক্তিই তমলুকস্থ কৈবর্ত্ত রাজবংশের আদিপুরুষ। সাধারণত এই রূপ বিশ্বাস যে, কৈবর্ত্ত জাতি আদিম জাতীয় ভুঁইয়াদিগের বংশসম্ভূত—উহাঁরা পরে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৈবর্ত্ত রাজবংশের আদিপুরুষ পূর্ব্বোক্ত আদিম জাতীয় ভুঁইয়া হইতে বর্ত্তমান রাজা পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশ অথবা ষড়বিংশ পুরুষ হইবেন।[১৬]

মহামতি বেলি সাহেব তমলুকের রাজবংশের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন—পরম্পরাশ্রুত ইতিহাসানুসারে প্রাচীনকালে যে সকল নৃপতি এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ, গরুড়ধ্বজ এবং বিদ্যাধর রায়, এই পঞ্চজন নৃপতির নামের প্রথম উল্লেখ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের পর সপ্তত্রিংশ জন নরপতি রায় উপাধিধারী ছিলেন। এই ভূপালগণ কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন সে বিষয় কিছু নির্ণয় করা যায় না। ইহাঁদিগের পর ভরের ভুইয়া রায় সিংহাসনারূঢ় হয়েন, ইনি যে কবে শাসনভার গ্রহণ করেন সে বিষয় কিছু অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়—তাম্রলিপ্তির রাজগণের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কালের এই প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর আরও পাঁচ জন ভূপাল রাজত্ব করিলে কেশবরায়ের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত হয়। মোগল-রাজভাণ্ডারে রাজস্ব প্রেরণ না করাতে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ইহাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। এই সময় হইতে ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হরিরায় রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। রাজা হরিরায়ের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মধ্যে অত্যন্ত বিবাদ উপস্থিত হয়। পরিশেষে ঐ রাজ্য দুই জন মধ্যে বিভক্ত হওয়াতে বিবাদের শান্তি হয়। রাজ্য এইরূপ বিভক্ত হইয়া ১৭০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিষয় সম্পত্তি দুই শাখাগত থাকে, তৎপরে কথিত দুই শাখার মধ্যে একটি শাখা উত্তরাধিকারীবিহীন হওয়া প্রযুক্ত পুনরায় দুইটি শাখায় বিভক্ত বিষয় সম্পত্তি একত্রীভূত হয়। নারায়ণ রায় ঐ সমস্তের একাধীশ্বর হইয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উপভোগ করিতে থাকেন। পরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মির্জ্জা দিদারবেগ নামক জনৈক মুসলমান ঐ সমস্ত বিষয় বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়া ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহার স্বত্বাধিকারী হইয়া ভোগ দখল করিতে থাকেন। এই সময়ের পরে তাৎকালিক শাসনকর্ত্তার অনুমত্যনুসারে পূর্ব্বাধিকারীবংশীয় রাণী সন্তোষপ্রিয়া এবং রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া নাম্নী বিধবাদ্বয়ের হস্তে রাজ্য প্রত্যর্পিত হয়। এই রাণীদিগের মধ্যে প্রথমোক্তা একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং শেষোক্তার গর্ভজাত একটী পুত্র থাকে। পুত্রদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ঐ বিষয় সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত হয়; পোষ্য-পুত্র সাত আনা এবং রাজবংশের

---

১৬ Vide. Statistical Acct Vol. III. Midnapore, Hugli and Howrah p. 67. W. W. Hunter.

ঔরসজাত পুত্র নয় আনা অংশ প্রাপ্ত হয়েন। ১৭৯৫খৃষ্টাব্দে নয় আনা অংশের স্বত্বাধিকারী আনন্দনারায়ণ রায় এবং সাত আনা অংশের স্বত্বাধিকারী শিবনারায়ণ রায়, এই উভয়ের মধ্যে বিষয় লইয়া ধর্ম্মাধিকরণে একটি অভিযোগ উপস্থিত হয়। বিচারে নয় আনা অংশের স্বত্বাধিকারী আনন্দনারায়ণ রায় সমস্ত বিষয়ের অধিকারিত্ব প্রাপ্ত হয়েন। আনন্দনারায়ণ পরলোক গমন করিলে তাঁহার দুই বিধবা স্ত্রী ঐ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়া একজন লক্ষ্মীনারায়ণ এবং অন্যজন রুদ্রনারায়ণকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। ঐ সমগ্র বিষয় লইয়া দুই জনের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতে থাকে, পরিশেষে প্রথমে পূর্ব্বোক্ত এবং পরে পশ্চাদোক্ত ভ্রাতার বিষয় সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া যায়।[১৬]

বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্পূর্ণরূপ পরাভব হইলে হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণরূপ আধিপত্য সম্যক্ সংস্থাপিত হইবার উত্তরকাল পর্য্যন্ত তম্লুক সমুদ্রবাহিত বাণিজ্যদ্রব্যাদি রক্ষা করিবার স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাণিজ্যোপলক্ষে যে সকল জাতি সদাসর্ব্বদা সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিত,এই স্থানে সেই সকল জাতির আধিপত্য ক্রমশঃ সংস্থাপিত হইতে থাকে। ফলে ময়ূরবংশের ধ্বংস হইবার পর তম্লুকের সিংহাসন কৈবর্ত্তরাজবংশ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। এই বংশের আদিপুরুষ উড়িষ্যাদেশ হইতে সমাগত হয়েন। তিনি চারিশত ঘর স্বজাতীয় আত্মীয়বর্গকে সমভিব্যাহারে আনিয়া নিজাধিকৃত ভূম্যাদিতে বসতি করান।

১৭২৫ খৃীষ্টাব্দে তম্লুক স্থায়ী রূপে বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত হয়। প্রাচীন কালে উড়িষ্যার সঙ্গে যে এই নগরের বিশেষ সংস্রব ছিল তাহা এই উভয় স্থানের রীতি নীতি এবং ভাষা প্রভৃতির পরীক্ষা করিলেই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যে অঞ্চল বাঙ্গালার সহিত উড়িষ্যাপ্রদেশকে সংশ্লিষ্ট করিয়া থাকে এবং যাহা এক্ষণে মেদিনীপুর বলিয়া অভিহিত, উহা পূর্ব্বে মধ্যদেশ নামে পরিচিত ছিল। এক্ষণেও কেহ কেহ উহাকে ঐ নাম প্রদান করিয়া থাকেন। ইংরাজ-শাসনাধীন রাজকার্য্যাদি সমাধা করিবার জন্য যদিও এতদঞ্চলে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হইয়াছে, তথাপি অতি অল্পকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত তম্লুকে বাঙ্গালা এবং উড়িয়া উভয়ের বিমিশ্রিত বর্ণ এবং ভাষা লেখায় ব্যবহৃত হইত। তম্লুক অথবা মেদিনীপুর অঞ্চলে অদ্যাপিও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল যে উৎকলদেশজাত তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে; যথা—মহাপাত্র,বেহারা,জানা,মাহন্তি, মাইতি, পাটনাইক, পাণ্ডা, সামন্ত প্রভৃতি সকলই উড়িষ্যা-দেশজাত উপাধি। যে সকল কৈবর্ত্তজাতি চব্বিশ পরগণা, হুগলী এবং বর্দ্ধমানবিভাগে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছে, তাহারা তাহাদিগের সঙ্গে উপরোক্ত-উপাধিনিচয়ও লইয়া আসিয়াছে।[১৭]

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কোন কোন

১৬ *Vide* Baley's MSS. Report.

১৭ *Vide* Orissa *Vol.* I. by W. W. Hunter p. 314.

গ্রাম্য পাঠশালায় বালকগণের প্রাতে বাঙ্গালা এবং অপরাহ্নে উড়িয়া ভাষা অভ্যাস করিবার রীতি অদ্যাপিও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বিভাগে আজিও উড়িষ্যাদেশীয় পঞ্জিকা প্রচলিত রহিয়াছে। বাঙ্গালায় প্রচলিত মাসের শেষ দিবস উক্ত প্রণালীতে আগামী মাসের প্রথম দিবস বলিয়া গণিত হয়। নূতন বৎসর আরম্ভও উড়িষ্যা দেশীয় প্রণালীতে হইয়া থাকে। যে দিবস বাঙ্গলায় ৩০শে বৈশাখ সে দিবস উড়িষ্যা-প্রণালীতে ১লা জ্যৈষ্ঠ হইয়া থাকে; বাঙ্গালা মতে যেমন চৈত্রের শেষে বৎসরের শেষ, তথায় সেরূপ না হইয়া শ্রাবণের শুক্ল পক্ষীয় দ্বাদশীতে বৎসরের শেষ হইয়া থাকে। যদিও বহুকাল হইল তম্‌লুক সমুদ্রে পণ্যদ্রব্যাদি প্রেরণকার্য্য হইতে বিরত হইয়াছে, তথাচ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের কেন্দ্রপাড়া পয়ঃপ্রণালী canal উন্মুক্ত হইবার পূর্ব্বে উক্ত স্থানে উড়িষ্যা দেশজাত অন্তর্ব্বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মুসলমান অধিকারকালের প্রথমাবস্থায় তম্‌লুক জলেশ্বর সরকারের অন্তর্ভূ্ত ছিল। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে মুর্সিদকুলিখাঁ মেদিনীপুরকে উড়িষ্যা হইতে বিচ্যুত করিয়া বাঙ্গালার অন্তর্ভূ্ত করিয়াছেন। জলেশ্বর সরকার চারিটি উপবিভাগে বিভক্ত ছিল;—প্রকৃত জলেশ্বর proper, মলঘেটে, (malghetiya) মাজকুরি এবং গোয়ালপাড়া। প্রাচীন কালে তম্‌লুক এই শেষোক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত ছিল। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা হুগলী বিভাগের অন্তর্গত ছিল।[১৮]

তম্‌লুকে আর একটী বিশেষ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও বহুশতাব্দী বিগত হইল তম্‌লুক হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্রব বিশ্লিষ্ট হইয়াছে, উক্ত ধর্ম্ম এক্ষণে তম্‌লুকের বিগত ঘটনার মধ্যে পরিগণিত বলা যাইতে পারে, এমন কি উহার চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। তথাপিও দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্তস্থানীয় কতকগুলি হিন্দু পরিবার বৌদ্ধধর্ম্মানুসারে আজিও তাহাদের মৃতদেহের সমাধি প্রদান করিয়া থাকে। উক্ত স্থানের আর একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, এইস্থান হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান হইলেও কৈবর্ত্ত এবং অন্যান্য জাতির বাসই অধিক। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতির সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তম্‌লুকে প্রায় সাত আট হাজার পরিবার কৈবর্ত্তজাতির বাস হইবে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত, কেহ কেহ বা বাণিজ্য ব্যবসায়ে সংলিপ্ত এবং কেহ কেহ বা রাজদ্বারে সমান্য কর্ম্মচারীর কার্য্যে নিযুক্ত। ফলে সংক্ষেপে বলিতে গেলে উহারাই পোনের আনা রকমে তম্‌লুকের অধিবাসী। (ক্রমশঃ।)

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

---

১৮ *Vide* Mr. Baley's Mss. Memorandum.

তরঙ্গিণী।

পঞ্চম অধ্যায়।

তরঙ্গিণী চলিয়া গেল, নিরঞ্জনের চিত্তে অনুরাগের তরঙ্গ কিন্তু থামিল না। কাদম্বিনী গগনাঙ্গন বিমুক্ত করিল, দিনদেব তবু দেখা দেন না কেন? নিরঞ্জনের পক্ষে চারি দিকেই এখন অন্ধকার, চারিদিকেই তুফান। চারিদিকেই অতল বারিধি—হু হু রবে জলরাশি গর্জ্জন করিতেছে—অন্ত নাই, কূল নাই, দ্বীপ নাই, তলা নাই। গরীব নিরঞ্জনের দোষ কি? দোষ সেই বিধাতার,—যিনি রূপের কাঙ্গালকে রূপরত্ন হাতে দিয়া তখনি আবার কাড়িয়া লইয়া গেলেন। দোষ তরঙ্গিণীর সেই পিতার—যিনি চক্ষুষ্মানের চক্ষের উপর অকস্মাৎ বিদ্যুদ্দীপ্তি বিকাশ করিয়া দিয়া তাহার চক্ষের মাথাটী খাইয়া দিলেন। দোষ সেই তরঙ্গিণীর—যে আপনার সৌন্দর্য্যগর্ব্বে অবগাহনমগ্ন যুবজনকে তরঙ্গাঘাতে ফেলিয়া দিয়া নাচিতে নাচিতে ক্রীড়াশীল বালকের মত স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

বিরহে বিকার বাড়ে, রোগ ত কৈ কমে না। প্রণয় কি রোগ তা জানি না; কিন্তু আমার মন যাকে চায় না,আমার প্রাণ তাকে চায় কেন? আমি মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছি যে তাহার সঙ্গে আমার প্রাণে মিলিবে না, তবু পোড়া প্রাণ সেই দিকেই ছুটে কেন? দুরন্ত যে বালক, সেও বুঝাইলে বুঝে; প্রেমিকের প্রাণ কোন বারণ মানে না কেন? অবোধ শিশু,—যে ভালবাসে না, তখনি তাহাকে বুঝিতে পারে, বুঝিয়া তাহার কোলে উঠিতে চায় না; কিন্তু প্রেমিকের প্রাণ শিশুরও অধম—যে চায় না, যে নাক্ বাঁকায়, যে ঘৃণা করে, তাহারও পিছু পিছু, দীন হীন ভিখারীর মত, নিতান্ত নির্লজ্জের মত হাত পাতিয়া হাঁ করিয়া ছুটীতে থাকে। আজিকার বাজারের চাকুরীর উমেদার অপেক্ষাও প্রেমিকের প্রাণ লজ্জাহীন ঘৃণাহীন; উমেদার বেচারী মুরুব্বি মহাশয়ের কাছে দশ দিন হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া অবশেষে এক দিন তাড়া খাইলেই অন্ততঃ তাঁহার কাছে সব আশা ছাড়িয়া দিয়া পলায়। কিন্তু প্রেমিকের প্রাণ শত অপমানে, শত ঘৃণায়, শত শিক্ষায়, শত হতাশ্বাসেও হার মানিতে চায় না, লজ্জাবোধ করে না, উমেদারী ছাড়িতে পারে না। নিরঞ্জন এ সকলই মনে মনে বুঝিতেন, কিন্তু বুঝিয়াও পোড়া প্রাণকে ত ভুলাইতে পারিলেন না।

বিরহে আর একটা বড় গোল আছে, সেই উপসর্গেই রোগ আরও বাড়ায়, বিপদ আরও বৃদ্ধি করে। যাকে দেখিতে চাই সে কাছে থাকিলে, তার দোষ গুণ সকলই দেখিতে পাই; কিন্তু সে কাছে না থাকিলে, দোষগুলা ক্রমে ক্রমে যেন অদৃশ্য হইয়া যায়—তার রূপের ছটায়, তার গুণের ঘটায়, দোষের তৃণ ক্রমে ক্রমে যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। সে কাছে থাকিলে, যে দোষের কোন ওজর নাই মনে করিতাম, কাছ-ছাড়া হইলে সে সকল দোষের কত

ওজর আসিয়া আপনা আপনি উপস্থিত হয়, মনে মনে কত উকীল আসিয়া খাড়া হয়, বিচার বিতর্কে প্রাণে প্রাণে অবশেষে রায় প্রকাশ হইয়া যায় যে মকদ্দমা ডিস্‌মিশ—আসামী সকল দোষে খালাস—বেকসুর খালাস। তখন আবার এমনি বিশ্বাস হইয়া যায় যে আসামী আমার নামে উল্‌টিয়া নালিশ করিলে আমি ড্যামেজ দিতে বাধ্য। তখন মনে হয় যে আমি যে তাহার সেই দোষটা দোষ বলিয়া ধরিয়াছিলাম—সে কেবল আমারই বোকামী মাত্র। তাহার গুণগরিমা, তাহার সৌন্দর্য্যরশ্মি নিশাবসানে অরুণোদয়বৎ, তমোরাশি নিরসন করিয়া দিব্য প্রভায় চিত্তক্ষেত্র চমৎকৃত করে।

এতটুকু হয় কিন্তু খুঁটি-নাটি দোষে, আর এতটা হয় অনেক দিনের পরে। নিরঞ্জনের ততটা এখন হয় নাই, আর নিরঞ্জন তরঙ্গিণীর অহঙ্কারকেও ততটা সামান্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। তরঙ্গিণীর সেই গর্ব্বিত ভাব—বাস্তবিক গর্ব্বিত কিনা তাহা জানি না,—যাই হউক, নিরঞ্জনের হাড়ে হাড়ে কিন্তু বিঁধিয়াছিল; আর একদিকে তরঙ্গিণীর সেই অতুলনীয় রূপ-রাশি তাঁহার প্রাণের ভিতর যেন দিব্য পীযূষধারা বর্ষণ করিতেছিল। নিরঞ্জনের মহাবিপদ। অমৃত ও গরল একাধারে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায় গরলটুকু যদি না থাকিত! তাহাও না হউক, অমৃত আবার ইহার ভিতর থাকিল কেন? একবারে গরল হইলে ত কোন বালাই ছিল না। বাঘিনীর হাত এড়াইতে পারা যায়; বাঘিনীর মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী, দেখিয়াই পিছাইয়া পড়ি। কিন্তু কালভুজঙ্গী কি সর্ব্বনাশিনী! কালফণিনী ঐ যে কালীয়দমনের পদরেখাঙ্কিত ফণামণ্ডল বিস্তারিত করিয়া, দুলিয়া দুলিয়া নৃত্য করে, সে নৃত্য কি মনোহর! সে মূর্ত্তি কি সুন্দর! ঐ সৌন্দর্য্যে বিভীষিকা আছে স্বীকার করি; কিন্তু ঐ যে মধুরে ভৈরবে মিশামিশি, উহাও ত সৌন্দর্য্য বটে। তরঙ্গিণী সুন্দরী, তরঙ্গিণীর স্বভাবও সুন্দর। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যে হলাহল মাখান আছে; —বিষমাখা ক্ষীরের বাটী, কাঁটাময় গোলাপ ফুল, নিরঞ্জন ছাড়িতেও পারেন না, রাখিতেও পারেন না। এ যে বড় বিষম দায়। যাকে ভুলিলে আমার ভাল হয়, যাকে ভাবিলে আমার কষ্ট হয়, তাকে ভুলিবার কথা মনে হইলেও মনে মনে কষ্ট হয়। মনের এ অবস্থা বর্ণন করিবার ভাষা নাই কেন?

এই বিষম সংকটে পড়িয়া নিরঞ্জনের চিত্ত কিছুতেই স্থৈর্য্য মানে না। আহারে নিদ্রায়, কাজে কর্ম্মে, আমোদে ক্রীড়ায় কিছুতেই তাঁহার মন বসে না। মনে সুখত নাই, দুঃখেরও যেন অবসর নাই। অর্থাৎ তরঙ্গিণীর চিন্তা ভিন্ন অন্য দুঃখে দুঃখবোধ করিতে গেলেও নিরঞ্জনের যেন বৃথা চিন্তা বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া, আর শরীরের গতিক দেখিয়া মাতা ও ভগ্নী মনের কথা কতকটা বুঝিলেন। বুঝিয়া, তাঁহার মন ভুলাইবার জন্য মলিনাকে পিত্রালয় হইতে ঘরে আনিলেন। আনিয়া ভাবিলেন, রাজকন্যায় আর কাজ নাই, দুঃখীর ঘরে দরিদ্রকন্যার সহিত ঘর করিয়া সকল সাধ মিটিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মলিনা আসিয়া নিরঞ্জনের ভগ্ন মন্দিরে অধিষ্ঠান করিলেন। মলিনা কুৎসিতা নহে, কিন্তু মলিনা সুন্দরীও নহে। বলিয়াছি ত, মলিনা সামান্য বনকুসুমমাত্র—গোলাব নয় শতদল নয়, বেল নয় বকুল নয়, চম্পক নয় মল্লিকা নয়। সামান্য বনফুলটি, ফোট-ফোট হইয়া দরিদ্রের সেই গৃহারণ্যে কোথায় লুকাইয়া রহিল; তাহার গন্ধে দিগন্ত আমোদিত হয় না, তাহার রূপের ছটায় আঁধার ঘরে মাণিকের আলো জ্বলে না। নিরঞ্জনের তখন তাহাতে তৃপ্তি হইবে কেন? পতঙ্গ দীপশিখায় ঝাঁপ্‌ দিতে চায়, খদ্যোতের ক্ষণোদ্দীপ্ত ক্ষণ-প্রসুপ্ত ক্ষীণালোকে তাহার সাধ মিটিবে কেন?

মলিনা সুন্দরী না হউক, কিন্তু মলিনাকে লইয়া নিরঞ্জনের মাতা ভগ্নী বড় সুখিনী হইলেন। মলিনা সামান্য গৃহস্থের কন্যা, সামান্যেই সন্তুষ্টা। শাশুড়ী ননদের ঈষদাদরেই মলিনা আহ্লাদে গলিয়া যায়; নিরঞ্জনের মধুরালাপে মলিনা আপনাকে চিরচরিতার্থ বোধ করে। মলিনার স্বভাব বড় মধুর; মুখে কোন কথাটি নাই; আপনা হইতে কোন কথাই সে কহে না; কিন্তু কথা যখন কয়, তখন মনে হয় বিনয়ের বীজমন্ত্র যেন মলিনা জপ করিতেছে। তাহার গতি অতি ধীর, পদশব্দ কেহ কখন শুনিতে পাইত না। তাহার দৃষ্টি সদাই নিম্নগামিনী, ঊর্দ্ধে চাহিতে যেন জানিত না। মলিনার মুখখানি স্নেহে মাখা, লজ্জায় ঢাকা; করুণায় পূর্ণ, বিনয়ে বিভূষিত। মলিনার বর্ণ কাল নয়, কটা নয়—যে বর্ণকে কাল ফর্সা এ দুয়ের কিছুই বলা যায় না, বরং দুয়ের মিশাল বলিলে চলে, মলিনা সেইরূপ বর্ণশালিনী। মলিনার গঠন সুঠাম না হউক, সুসঙ্গত বটে। হাত পা, মুখ চোখ, নাক কান, এ সকলই আপন আপন আয়তনে অবস্থিত; কেহ কাহাকে ছাপাইয়া উঠে নাই, বাঁকা চুরা, বিশ্রী বিষম হইয়া কেহ কিছু বাহাদুরী প্রকাশ করে নাই। মলিনার আকৃতি খর্ব্ব নহে, বরং একটু দীর্ঘ; দেহভার স্থূল ও কৃশের মাঝামাঝি, কৃশতার দিকেই একটু আসক্তি বরং বেশী; কিন্তু তাহা হইলেও গঠনটি বেশ গোলগাল বটে। মোটের উপর মলিনা মনোমোহিনী না হইলেও সর্ব্বাংশেই অনিন্দনীয়া বটে।

নিরঞ্জনের চক্ষে মলিনার রূপ গুণ কিছুই ত মন্দ লাগে নাই। মলিনার প্রতি বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, মলিনার প্রতি তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তরঙ্গিণীর অভাব কি মলিনার দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে? নেসার খোঁয়ারীতে পেট ভরিয়া ভাত খাইলে কি হইবে বল? সন্তোষ এক, মোহ আর এক পদার্থ। মোহের ঘোরে মাথা ঘুরিতেছে, তাহার ঠিক ঔষধটি পেটে না পড়িলে, কেবল সুপথ্য করিলে চলিবে কেন? তরঙ্গিণী ও মলিনায় কি তুলনা হইতে পারে? মলিনা যেমনই হউক, নিরঞ্জনের চক্ষে বিনয়মধুরা সচরাচরদৃষ্টা সামান্যা সুন্দরী মাত্র। কিন্তু তরঙ্গিণী—সেই গর্ব্বিতে মধুরা, মধুরে গর্ব্বিতা; সেই সুন্দরে ভয়ঙ্করী, ভয়ঙ্করে

সুন্দরী; সেই জ্যোৎস্নাপ্লুত জ্যোৎস্না-গঠিত নবনীতকোমলা কামিনী; সেই স্বর্গচ্যুতসুরসুন্দরীবৎ অনুপমরূপিণী তরঙ্গিণী নিরঞ্জনের চক্ষে যে মোহজাল বিস্তার করিয়াছিল, তাহার বন্ধন কি মলিনার সাধ্য যে ছিন্ন করিয়া দিতে পারে?

মলিনাকে দেখিয়া নিরঞ্জনের দয়া হয়, মলিনাকে লইয়া সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারেন না বলিয়া দুঃখও হয়। কিন্তু তবু একবারও মনে হয় না যে মলিনাকে লইয়া তরঙ্গিণী-চিন্তা আমি বিস্মৃত হই। তরঙ্গিণীর প্রতি রাগে হৃদয় ভরিয়া রহিয়াছে, তবু ত সেই তরঙ্গিণী প্রাণের চক্ষে অতুলনীয়া। নিরঞ্জনের কেবল মনে হইত, তরঙ্গিণীর সকলই ভাল, সকলই সুন্দর; তরঙ্গিণী রূপে সুন্দরী, হৃদয়েও সুন্দরী, কেবল এক দোষ সেই অহঙ্কারটুকু; কেবল এক দোষ যে আমি যেমন তার জন্য লালায়িত, আমার জন্য সে তেমন লালায়িত নয়। লালসাবতী না হউক, তরঙ্গিণী যদি নিরঞ্জনের প্রতি একটু দয়াবতীও হইতেন, তাহা হইলেও নিরঞ্জন অপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেন। সেই দয়াটুকুর অভাবেই তরঙ্গিণীর সৌন্দর্য্যে যেন একটু অভাব রহিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন। নহিলে তরঙ্গিণীর তুলনা জগতে যেন নাই।

আচ্ছা, নিরঞ্জন মলিনাকে যেরূপ দয়া করিতেন, তরঙ্গিণী নিরঞ্জনকে সেইরূপ দয়া করিতেন না কেন? এ কথার উত্তর আমরা দিতে পারিব না। রমণী-হৃদয় অতল সাগর, ডুব দিয়া তাহার তলস্পর্শ করা, তোমার আমার কর্ম্ম নয়। আমি ডুবুরী নই জহুরী নই, রত্ন তুলিতে বা রত্ন চিনিতে আমার শক্তি তাদৃশ পর্য্যাপ্ত নহে। তরঙ্গিণীর লুকান কথা আমি ত কিছু জানি না; তবে যাহা কিছু সন্ধান যখনই পাইব, তখনই তাহা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না। রমণী-হৃদয়ের কাছে হার মানিয়া, রমণী-হৃদয়কে প্রণাম করিয়া, আমি নিস্তার পাইলাম; কিন্তু পুরুষের কথা পুরুষ মানুষের কাছে শুনিতে তোমরা হয় ত ছাড়িবে না। তোমরা হয় ত ধরিবে—নিরঞ্জন মলিনাকে যে দয়া করিতেন,—সেই দয়া হইতে মায়া, মায়া হইতে অনুরাগ, অনুরাগ হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে আত্ম-বিস্মৃতি জন্মাইয়া ক্রমে ক্রমে তরঙ্গিণীর স্মৃতি নিরঞ্জনের হৃদয় হইতে কি অপসৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল না? এইবার বড় বিষম গোলে পড়িলাম। এ প্রশ্ন ত বড় সহজ নয়। দর্শনশাস্ত্রে ও জ্যোতিষী বিদ্যায় একটু অভিজ্ঞতা না থাকিলে ইহার সদুত্তর প্রদান করিতে পারা যায় না। আমার দর্শন-জ্ঞান তত প্রখর নহে, জ্যোতিষেও আমি পণ্ডিত নহি, সুতরাং অনুমান প্রমাণের বিচার, বা ভবিষ্যতের গণনা স্থির আমার দ্বারা সম্ভবে না। অতীত ও বর্ত্তমানের চিত্রই আমি আঁকিতে পারি, ভবিষ্যতের আশা আপনারা আমার কাছে করিবেন না।

মলিনা ও নিরঞ্জন উভয়ে পরস্পর চির-কাল একত্র বাস করিলে, উভয়ের মনোভাব কিরূপ দাঁড়াইত সে কথা আমি জানি না; কিন্তু আসল ঘটনা কিরূপ হইয়াছিল, তাহার বিবরণ, আমি আখ্যায়িকালেখক, আমাকে অবশ্যই সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

বৎসরান্তে এই অসম্পূর্ণ মিলনে চিরবিয়োগ ঘটিল। কেন ঘটিল তা কে জানে? ইচ্ছা-ময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, যাহার যে কর্ম্মফল তাহাকে তাহা ভোগ করিতে হইবে; ভাল মন্দ বিচার আমরা করিলে চলিবে কেন? মলিনা-নিরঞ্জনের চিরমিলন বিধা-তার কলমে ত লেখা হয় নাই; অদৃষ্টের যে ফল তাহা ফলিবেই ফলিবে, কাহার সাধ্য অন্যথা করে? এক বৎসর শ্বশুরালয়বাসের পর, মলিনা হঠাৎ অতি কঠিন রোগে আক্রান্তা হইল। বহু চেষ্টায়, বহু চিকিৎ-সায়, কিছুতেই সে রোগের হাতে নিস্তার পাইল না। রোগের ঔষধ থাকিতে পারে, মৃত্যুর কোন ঔষধ আছে কি?

পাছে তারে ভুলে যাই!

মনে করি দিব দিব,
দিতে যে গো পারি নাই;
এড়ায়ে সে ঋণদায়,
পাছে তারে ভু'লে যাই!

কত যে করেছি ভুল,
দেখি ব'লে দেখি নাই;
দেখিলে পলাই দূরে,
পাছে তারে ভু'লে যাই!

মিলন মধুর অতি,
মিলন চাহিনে ভাই;
বুকে ধ'রে ভাবভরে,
পাছে তারে ভুলে যাই!

দূরে থাকি সেই ভাল,
অন্তরে দেখিতে পাই;
কাছে যেয়ে চেয়ে চেয়ে,
পাছে তারে ভুলে যাই!

সে মৃণাল তুলে আর,
গলে না দোলাব ভাই;
কোমল পরশে তার,
পাছে তারে ভুলে যাই!

সে কণ্ঠের মধুমাখা
শুনিতে বাসনা নাই;
সে সুধায় ডুবে ডুবে,
পাছে তারে ভুলে যাই!

ভাব-ভরা চারু আঁখি,
দেখিতে গো ভয় পাই;
নয়নহিল্লোলে তার,
পাছে তারে ভুলে যাই!

শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর।

স্বপনে বাসনা।

"The moon looks upon many night-flowers;
The night-flowers see but one moon."

যেথায় উষার কম রক্তিম অধরে
প্রতিবিম্ব অলকার যায় মিশাইয়া;
সুরভি হাসিয়া উঠে কমলের স্তরে,
উদার অলস বায়ু পড়ে মুরছিয়া।

যেথায় বেণুর রাবে তাপসী পাগল,
বরষার নবঘন করি দরশন,
বিথারে কলাপী দিব্য কলাপ উজল
সেথায় বঁধুরে মোর দেখেছি স্বপন।
সে কপোলে এ অধর হল সম্মিলন
জীবন মিশিয়া যাবে সুধার সাগরে,
আলিঙ্গনে হর-গৌরী হইব দুজন,
বহে যাবে মন্দাকিনী অন্তরে অন্তরে।
কবে সে চাঁদায় পাব হৃদয় মাঝার
কবে রোদনেরি হবে সমাপ্তি আমার।

শ্রীএমিলিয়া গুপ্তা।

সায়াহ্নে।

"I have no other but a woman's reason
I think him so, because think him so."

সেথায় প্রাণেশ মোর মলিন বয়ানে,
আপনারে হারাইয়ে ভাবিছে আমায়;
কনয় নলিন মুখে যুগল নয়নে
ফুটাইছে অবসাদ করিয়া সন্ধ্যায়।
ঘন-ঘনান্বিত ঘোর অসীম যাতনা,
আপনারে সিন্ধুমাঝে মিশাইতে চায়;
তুচ্ছ আত্ম পরিজন বিষয় বাসনা,
সকলি ভাসিয়া যায় প্রেম বরিষায়।
বঁধু—বঙ্গ—শারদের পূর্ণিমার চাঁদ,
অধরের কম রাগে, সুধার নিঝর!
মুরলী নিক্কণ বাণী হরিণীর ফাঁদ,
স্নেহ আলিঙ্গনে হবে পরাণ অমর।
এস নাথ তোমা ভেবে কাটাইব যামি
এক দিন মিশে যাব তুমি আর আমি।

সিল্‌ভিয়া গুপ্তা।

গান।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি চোখে দেখেছি তারে!
সদা জাগে সে প্রতিমা, কি আলোকে কি আঁধারে॥
ধরি ধরি এই পাই, আর যেন সেথা নাই,
শূন্য প্রাণে শূন্যে চাই, বুক ভাসে শত ধারে।
মনে করি ভুলে যাই, ভুলিতে কি পারি ছাই,
অকূলের কূল নাই এ ভাবনা পারাবারে।
বুঝেছি আশার ফাঁদে, জন্ম যাবে কেঁদে কেঁদে,
বাজিবে রে ভাঙা হৃদে, স্মৃতি-শেল বারে বারে।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সাহিত্যসমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড।] আশ্বিন, ১২৯৭। [ষষ্ঠ সংখ্যা।

বিশুদ্ধ হিন্দু আচার।

যাঁহারা মানবপ্রকৃতির সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ থাকা বিশ্বাস করেন, হিন্দুসদাচারের সহিত হিন্দুশরীরের হিন্দুমনের ও হিন্দু-ধর্ম্মের সম্বন্ধ থাকা তাঁহারা কি জন্য না বিশ্বাস করিবেন? অবশ্যই তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া সদাচারের সহিত শরীরের, মনের ও ধর্ম্মের অচ্ছেদ্য অভেদ্য কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকা বিশ্বাস করিতে হইবে।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ আছে, এই কথা আর সদাচারের সহিত শরীরের, মনের সুতরাং ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, এই কথা প্রায় সমান। ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত নিরামিষ ভোজন, বিবাহ, স্ত্রীসংব্যবহার এইরূপে দুই পাঁচটি বাহ্যতত্ত্ব লইয়া একখণ্ড বৃহদাকার পুস্তক প্রচার করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করিবে, কিন্তু মনু, অত্রি, বিষ্ণু

হারীত ও যাগ্যবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিরা যে "প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া জল ব্যবহার করিও" "আহারের সময় কথা কহিও না, উদ্বিগ্ন হইও না, কোনরূপে উৎকট চিন্তা করিও না" প্রভৃতি অল্প কথায় যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিব না, এ সামান্য বুদ্ধিমোহ নহে। এরূপ বুদ্ধির পক্ষাঘাত রোগ কোথা হইতে আসিল, কোন কুপথ্য হইতে উৎপন্ন হইল, কেন এদেশে উক্ত রোগের প্রাচুর্ভাব হইল, বিজ্ঞ মাত্রেই, শান্তস্বভাব অনুদ্ধতব্যক্তি মাত্রেই তাহা জ্ঞাত আছেন। এরোগ যে শীঘ্র এদেশ হইতে অপনীত হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। কারণসত্ত্বে কার্য্যের বিলোপ কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। যদি কেহ অনন্ত ভবিষ্যৎ কালের প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাবিতে সক্ষম থাকেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই বলিবেন যে, এই রোগ হইতেই এদেশের একটা বিখ্যাত জাতির (আর্য্যজাতির) লোপ হইবে। কিছুকাল পরে হয়ত আর্য্যজাতির নাম চিহ্ন কিছুই থাকিবে না, সকলেই ইংরেজাকার হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষে হিন্দু নামে এক প্রকার জাতি ছিল, এইরূপ দুই একটী কথা যদি কোন ইতিহাসে লিখিত থাকে ত' ইতিহাস পাঠক তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য, বুদ্ধ্যারোহ করিবার জন্য, উদাহরণ বা নিদর্শন খুঁজিয়া পাইবেন না। একটা বিস্তীর্ণ জাতি ও একটী বিশাল জাতীয় ভাব পৃথিবী হইতে এককালে অন্তর্হিত হইবে, ভাবিতে গেলে মস্তিষ্ক শুকাইয়া যায়, বিকল হইয়া পড়ে। হোক, যা হইবার তাহাই হবে, নিরর্থক চিন্তা ত্যাগ করাই ভাল। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকার ন্যায়, উপকার্য্য উপকারক ভাব থাকার ন্যায়, হিন্দু সদাচারের সহিত হিন্দুশরীরের হিন্দুমনের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বা উপকার্য্য উপকারক ভাব আছে ইহা দেখানই, ইহা প্রতিপন্ন করাই "বিশুদ্ধ হিন্দু আচার" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিজ্ঞা বা উদ্দেশ্য।

অগ্নির সহিত জলের, উষ্ণতার সহিত শৈত্যের কিরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। সেই সম্বন্ধের অনুসরণ করিয়া, ইয়ুরোপের ও ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক প্রভেদ চিন্তা কর। শীত প্রধান ইংলণ্ডের লোকেরা অধিক জল ব্যবহার করে না, করিতেও পারে না। শীত শীতের নিবারক ও উপকারক নহে বলিয়াই তাহারা অধিক জল ব্যবহার করে না, করিতে পারেও না। গ্রীষ্ম প্রধান ভারতবাসীরা অধিক জল ব্যবহার করে, করিতেও পারে, করিলে উপকৃতও হয়। তৎকারণেই হিন্দুদিগের জল ব্যবহার ঘটিত অনেক সদাচার অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে এবং শাস্ত্রও তদনুসারে বার বার পদক্ষালন ও বার বার স্নান প্রভৃতির উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। এখন তাহার ব্যতিক্রমে, শীত প্রধান ইংলণ্ডের অনুকরণে হস্তপদাদি ধৌত না করায়, আমাদের হিত হইতেছে কি অহিত হইতেছে, অন্ততঃ তাহা একবারও বুঝিয়া দেখা আবশ্যক, ভাবিয়া দেখা উচিত। অন্যে ভাবেন কি না বা ভাবিবেন কি না তাহা জানি না, আমরা ভাবিতে ইচ্ছুক ও ভাবিতে প্রবৃত্ত। দেখিতে পাই জলশৌচের অল্পতায় ও এক কালীন অভাবে আমাদের

হিত হয় না—অহিতই হয় এবং যথাশাস্ত্র জল ব্যবহারে আমাদের উপকারই হয়, অপকার হয় না।

হিন্দু শাস্ত্রে জল শৌচের বিধানগুলি অতি গভীর ভাবে অভিহিত হইয়াছে। সে সকল বিধান কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি,জলশৌচ ঘটিত বিধান ও সদাচার অসংখ্য। তথাপি তন্মধ্য হইতে সহজে বুঝা যায় ও অদ্যাবধি প্রচলিত আছে এরূপ কতকগুলি জলশৌচ-তত্ত্ব উপস্থিত প্রসঙ্গ ব্যক্ত করিব এরূপ ইচ্ছা করিয়াছি। জলশৌচ-তত্ত্ব বর্ণন করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ ঘটিত আরও কতকগুলি কথা ও একের ক্রিয়ার সহিত অপরের সম্বন্ধ থাকার কথা বলিতে হইতেছে।

প্রথম কথা,—কেহ কেহ সদা সর্ব্বদা পরিস্কার থাকিতে ভালবাসে,এমন কি অন্যকেও অপরিস্কৃত দেখিলে অসুখী হয়। এরূপ ব্যক্তি দেখিলে অনুমান করিতে হইবে, তাদৃশ ব্যক্তির অন্তঃকরণ পরিচিকীর্ষা-বৃত্তি (পরিস্কার থাকিবার ইচ্ছা) অতি প্রবল। তাই সে নিজে পরিস্কার থাকিতে ইচ্ছা করে, অন্যকেও পরিস্কার রাখিতে চেষ্টা করে। নিজদেহে মল স্পর্শ হইলে যেমন অসুস্থতা বোধ করে, অন্যের দেহে মল স্পর্শ হইতে দেখিলেও সে সেই দর্শন সম্বন্ধ বশতঃ বিরক্ত হয়, উদ্বিগ্ন হয় সুতরাং অসুস্থের ন্যায় হয়। ইহা দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে যে, পাপ দর্শনও পাপের অনুবন্ধী, পাপ দেখিলেও,অন্যায় অত্যাচার দেখিলেও তৎপ্রকৃতিক লোকদিগের অহিত হয়। আবার এমন লোকও আছে যে উক্ত প্রকার পরিচিকীর্ষা বৃত্তি তাহার আদৌ নাই। উক্ত মনোবৃত্তি যাহার নাই, যদিও সে পাপদর্শনে পাপী হয় না বটে, কিন্তু অন্যের অনুরোধে, অন্যের উপকারার্থ অন্যকে পাপ প্রদর্শন না করাই তাহার ভাল। এই কারণেই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে,"অস্বর্গং লোকবিদ্বিষ্টং যস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ।" আপনার অপ্রিয় না হইলেও,অহিতকর না হইলেও,উদ্বেগকর না হইলেও, যাহা লোকের উদ্বেগকর, অসুখকর ও অহিতকর সেরূপ কার্য্যও যত্নপূর্ব্বক (একটু কষ্ট স্বীকার করিয়াও) বর্জ্জন করিবে। এরূপ ভাবে পরস্পর পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে বলিয়া অবশ্য এই সংসার সুখের হয়, স্বর্গ তুল্য হয় সকলেই স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, কাহারও সহিত কাহারও কলহ হয় না, কেহ কাহারও শত্রু হয় না, সকলের সহিত সকলের সমভাবিত্য থাকিয়া যায়। যদিও মনুষ্য এত দূর সাবধান হইয়া চলিতে পারে না, তথাপি উপদেশকারীকের এতদূর চিন্তা করিয়াই উপদেশ দিতে হয়। পরে তাহার যতটুকু ফল ফলে ততটুকুই ভাল, ততটুকই উপকার।

দ্বিতীয় কথা এই যে, হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সদাচার—যাহার সহিত শরীরের মনের সুতরাং ধর্ম্মেরও সম্বন্ধ আছে বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছি—তত্তাবৎ সদাচার একরূপে কার্য্যকারণভাবে ব্যবস্থিত নহে। কোন কোন আচার বা অনুষ্ঠান কেবল নিজের শরীরের উপকারী, হিতজনক ও স্বাস্থ্যরক্ষক, কোন কোন সদাচার মনের উন্নতিকারক, বুদ্ধি

বৃদ্ধিকারক, সদ্বুদ্ধির উত্তেজক, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ। কোন কোন সদাচার শরীর-ভাল করিয়া মনোমালিন্য দূর করিয়া জ্ঞানের দিকে, ঈশ্বরতত্ত্বের দিকে, আস্তিক্যের দিকে পরলোক প্রবৃত্তির দিকে ও মুক্তিপথের দিকে লইয়া যায় এবং কোন কোন সদাচার অনুপকার ও অহিত নাশ করিয়া সুখজনক হয়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কথা যাহা আছে, তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

নিভৃত চিন্তা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পলকে পলকে সময়ের অপচয়, পলকে পলকে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন। আবার কত শত পলকে একটি দিন হয়; এমন কত দিন অতীত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বিশ্বপ্রকৃতির যে কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কতিপয় পলক সমষ্টি জীবের জীবন তাহার কি ইয়ত্তা করিবে? সে দিন নর্ম্মদাপুলিনে মধুর মধুর বাসরে লতাগুল্মগণের যে সুখের বাসরোচিত কুসুমসজ্জা দেখিয়াছিলাম, উপস্থিত দুরন্ত শীতের দৌরাত্ম্যে কি আর তাহার কণা মাত্রও থাকিতে পারে? আর নর্ম্মদাহৃদয়ে বালকহৃদয়ের চাপল্য নাই; কূলে কূলে শুষ্ক সিকতার হাসি নাই; বিন্ধ্যাটবীর মুনিজনমনোহারিণী সে শ্রী নাই। যে সুধা স্বর্গে নাই, পুষ্পের মধুতে নাই, চন্দ্রের চন্দ্রিকায় নাই, ক্ষীরোদের নীরে নাই; যে সুধা যোগীযুবা উদয়নের মনে একমাত্র অঞ্জলিকার ধ্যানে নির্গলিত হইত, সময়ের পরিবর্ত্তনে সেই অবারিত সুধার প্রবাহও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উদয়ন তাই উদ্ভ্রান্ত উন্মাদ নিরুদ্দেশ। তাঁহার সেই সুশ্রাব্য সুললিত প্রেমের গীতিকা আর বিন্ধ্যগুহায় প্রতিধ্বনিত হয় না, কুরঙ্গকামিনী কোমল শষ্প পরিহার করিয়া আর তাঁহার মধুময় বেণুধ্বনি শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে না। পুণ্য তপোবন এক্ষণে হিংস্র শ্বাপদের বাসভবন হইয়াছে।

যোগের জীব জগৎ চান না, অথচ ভোগের সিন্ধু মথিয়া তাহার সারাংশ অমৃত গ্রহণ করিবেন, সেদিন স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি অঞ্জলিকাকে চান না, তাঁহার প্রেমটুকু চান। দাম্ভিক নৈয়ায়িকের কূট যুক্তি ধরিয়া তিনি কথার ভাবে সে দিন প্রকাশ করিয়াছিলেন, অঞ্জলিকা অনুকূলা হউন, আর প্রতিকূলাই হউন, অথবা তিনি ইহলীলা পরিহার করিয়া যেখানে ইচ্ছা গমন করুন, তাঁহার মনের লক্ষ্য প্রেমের দিকেই থাকিবে। অঞ্জলিকার অভাব তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। এরূপ দম্ভের পরিণাম কি উন্মত্ততা? যে হৃদয় প্রীতির বিরামভূমি, যে হৃদয় প্রেম বিলাইয়া ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া তৃপ্ত থাকিতে চায়, প্রতিদান চায় না, তাহাতে বিকার! কোথায় প্রেম, কোথায় অঞ্জলিকা,

আর কোথায় সেই নৈয়ায়িক প্রেমিক উদয়ন। জগৎ কি সহজ সামগ্রী? জগতের নিকট ন্যায়ের যুক্তি? ঘর্ঘর শব্দে কুলালচক্রের মত জগতের দুইটি ফলক আকাশ ও ধরিত্রী ঐশিক দণ্ডে বিদ্ধ হইয়া অনবরত আবর্ত্তন করিতেছে, কার সাধ্য যে, তাহাতে আগুসার করিয়া নির্ভীকভাবে অস্খলিত পদে সেই কীলক ধরিয়া অবস্থান করিবে? ভাগ্যবান তিনি, মহাপুরুষ, তিনি দেবতা যিনি সেই কীলক ধরিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু সেরূপ ভাগ্যবান কয়জন? কয়টী শলভ হুতাশনজ্বালার প্রলোভনে পরাভুতি মানে? জগতে থাকিব, জগৎ মাখিব না, এ দম্ভ কি ক্ষীণ মানবের শোভা পায়? জীব! তুমি কত শাস্ত্র পড়িবে, কত কলা শিখিবে, কত চতুর হইবে? তোমার পণ্ডশ্রম; তুমি জগতের চক্র ভেদ করিতে পারিবে না। তবে তোমার স্পর্দ্ধা কেন, দম্ভ কেন, আস্ফালন কেন? যতক্ষণ চক্ষু কর্ণ থাকিবে, মন বুদ্ধি থাকিবে, জ্ঞান প্রাণ থাকিবে; যতক্ষণ তুমি আমি না যায়, গুরুলঘু না যায়, বিষ্ঠা চন্দন না যায়, ততক্ষণ তোমার অহঙ্কার বালকত্ব। উদয়ন বালক, নতুবা স্পর্দ্ধা করিবেন কেন?

উদয়ন হরীতকীক্ষেত্রে লালিত হইয়াছেন, হরীতকী উপযোগ করিয়া ভস্ম মাখিয়া হরিগুণ গাইয়া কাল কাটাইয়াছেন। সংসারের গোলকধাঁধাঁয় ত প্রবেশ করেন নাই; সংসারের মানচিত্র পুঁথিতেই দেখিয়াছেন। সুতরাং সংসারের রীতি চরিত্র বুঝিবেন কিসে? অন্তর্ব্বিষয়ের সহিত বহির্ব্যাপারের যে কি ঘনিষ্ট সংবাদ, ব্যাপারী না হইলে কখন উদ্বুদ্ধ হইতে পারে? যতদিন বুঝেন নাই, চক্ষু ফুটে নাই, ততদিন তাঁহার দর্প ছিল, প্রগল্‌ভতা ছিল, অহমিকা ছিল। পরে যখন তালপত্রের পুঁথি ফেলিয়া শালশূলপূর্ণ পৃথিবীতে পদার্পণ করিলেন, তখন দেখিলেন সেই তালপত্রের চিত্রিত ছবি দর্পণফলিত আলেখ্যের ন্যায় বিপরীত। তিনি ভাবিয়াছিলেন, একতারা বাজাইয়া হরিনাম করিবামাত্রই হৃদয় যেমন প্রেমে ভরিয়া যায়, জগতের বস্তু হইতে সেইরূপ সহজে প্রেম ঢালিয়া লইবেন। ঢালিয়া আশা মিটাইয়া পান করিয়া শীতল হইবেন। তাই সোহাগভরে প্রীতির চমক অঙ্গুলিকার প্রতি হাত বাড়াইলেন। চমক সরিয়া গেল। বারম্বার প্রয়াস পাইলেন, চমক ধরা দিল না, যোগীর চক্ষু ফুটিল; যোগী দেখিলেন, জগৎ ঐন্দ্রজালিক। তখন তাঁহার গর্ব্ব গেল, আশা ভরসা গেল। তিনি বৈরাগ্য ফেলিয়া গার্হস্থ্যে আসিয়াছিলেন; এখন বৈরাগ্য গেল, গার্হস্থ্যও গেল। কাযেই তাঁহাকে পাগল না বলিয়া আর কি বলিব? পাগল আশ্রম ছাড়িয়া, আশ্রমসুলভ সুখের লালসা ছাড়িয়া, অঙ্গুলিকার দৃষ্টিপথ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা কেহ জানে না।

যুবক যে দিন হইতে নিরুদ্দেশ, যুবতীরও সেই দিন হইতে সংবাদ নাই। যুবতী যুবকের সর্ব্বস্ব লইয়াছিলেন, তাঁহার অমূল্য হৃদয়খানি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিদান স্বরূপ এক কপর্দ্দকও প্রদান করেন নাই। সুতরাং তিনি যে যুবকের পদচিহ্ন ধরিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বেড়াইবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। তবে তিনি গৃহত্যা-

গিনী হইলেন কেন? যুবতীর সঙ্গিনী রুচিরা জগৎসমীপে এ জিজ্ঞাসা শতসহস্রবার করিয়া কোন উত্তর পান নাই। তিনি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, গিরি নদী বন উপবন পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া অন্বেষণ করিয়াছেন, সেই পর্য্যটন ব্যাপ্যকালে মনুষ্যের অবিজ্ঞাত কত রহস্যেরই আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের হৃদয় অঞ্জলিকার সন্ধান করিতে পারেন নাই।

তবে কি অঞ্জলিকা নাই! এ কূটসমস্যার সমাধান কে করিবে? উন্মাদ উদয়নের উন্মাদিনী রুচিরার অন্তঃকরণে এ ভীষণ জিজ্ঞাসার স্থানাভাব। তাঁহারা ভাবিতেন, অঞ্জলিকা মঙ্গলময়ী; অঞ্জলিকার অমঙ্গল এ জগতে অসম্ভব। উদয়ন জানিতেন, অঞ্জলিকা অপার্থিব স্বর্গীয় উপচার; তাহার বিকার ব্যভিচার কিছুই নাই। সুতরাং তাহার অপলোপ কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। রুচিরা কি ভাবিতেন? রুচিরা ভাবিতেন, বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য সাধনের নিমিত্তই বিশেষ বিশেষ সামগ্রীর সৃষ্টি, যাবৎ সেই লক্ষ্যের পূরণ না হয়, তাবৎ তৎতৎ সামগ্রীর বিকার বা ব্যভিচার ঘটে না। তিনি যেন দেখিয়াছিলেন,—অঞ্জলিকার ভাগ্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, অঞ্জলিকা নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর পৃথিবীর সামগ্রী হইলেও তদ্দ্বারা একটী অপার্থিব উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। সে উদ্দেশ্য অদ্যাপি কার্য্যে অন্বর্থ হয় নাই, সময়ে হইবে। সুতরাং রুচিরার সিদ্ধান্ত অনুসারে অঞ্জলিকা সম্বন্ধে কোন রূপ অভদ্র সংঘটন অসম্ভব।

ভাল মানিলাম,—উন্মাদ উন্মাদিনীর সিদ্ধান্তে আরূঢ় হইয়া উপসংহার করিলাম, অঞ্জলিকা কলাকলঙ্কশূন্য চন্দ্রমা। কিন্তু মীমাংসায় ফল কি? উন্মত্ত উদয়নেরই বা ইষ্ট কি? উন্মাদিনী রুচিরারই বা লাভ কি? যাহার নির্দ্দেশ নাই, নিদর্শন নাই, রত্নাকরের এ প্রকার রত্নের অস্তিত্বে সংসারের ইষ্ট কি?

শ্রীকেদারনাথ মিত্র।

আসিবে না ফিরে?

Oph. :—And will he not come again?

HAMLET.

১

সে কি আর অসিবে না ফিরে?
আশাপথ চেয়ে চেয়ে—
সারা দিন সারা রাত—
প্রভাতের বুকে যায় ঝ'রে—
ফুলগুলি কাঁদিয়া নীহারে।
সে কি আর আসিবে না ফিরে?

২

গগনের গবাক্ষ খুলিয়া—
ঊষা আসি ফুলবনে
একাকিনী নিরজনে
খুঁজে খুঁজে না দেখিয়া তায়
আঁখিনীরে ভেসে চ'লে যায়!
সে কি আর আসিবে না হায়?

৩

সারা মধ্যাহ্নটী ধ'রে—
ছুটে ছুটে দিশেহারা—
কোকিল ডাকিয়া সারা ;
পাখীগুলি কাতর চীৎকারে—
অবিরত ডাকিতেছে তারে,
সে কি আর আসিবে না ফিরে ?

৪

নীরব নিশীথ কালে—
বিমল কৌমুদী রাশি
শূন্য হতে নেমে আসি—
ধরাময় খুঁজিয়া বেড়ায়
তবু তার দেখা নাহি পায় !
সে কি আর আসিবে না হায় !

৫

ধরণী আকুল তার তরে—
হেথা হোথা আশে পাশে
কাঁদে বায়ু হা হুতাশে !
নদীতীরে, কাননের গায়
নীরবতা করে "হায় হায়" !
লুকায়ে সে রহিল কোথায় ?

৬

সে যে ফুল বাসিত রে ভাল
সাজাইতে কণ্ঠ তার
রচিয়া কুসুমহার
পথ চেয়ে রয়েছি বসিয়া
কত সাধ বুকেতে ধরিয়া
সে কেন গো আসে না ফিরিয়া ?

৭

সারা নিশি দেখিয়া স্বপন—
রজনী না যেতে চলি'
পূরব গবাক্ষ খুলি
চেয়ে থাকি আশাময় হৃদে
উষার কনক ছায়াপথে—
পাই যদি তাহারে দেখিতে !

৮

নিরাশায় আশা বিজড়িত—
ভাবি যদি পিক বোলে
মধ্যাহ্ন গভীর হ'লে
বসিতে আসে সে কুঞ্জ ছায়—
বিজনে সে গাহিত যথায় !
হায় সে ত আসে না তথায় !

৯

সন্ধ্যার আঁধার ছায়া ধীরে—
মৃদুল মলয় সঙ্গে
মিশে যবে ধরা অঙ্গে,
যাই একা তটিনীর তীরে,
কত অশ্রু ঝ'রে পড়ে নীরে।
সে কি আর আসিবে না ফিরে ?

১০

কোথা সেই অমরপ্রদেশ,
সংসার যাতনা ভুলি
সে যেথায় গেছে চলি' ?
গেলে সেথা আসে না কি ফিরে ?
এত স্নেহ ভালবাসা কি রে
ডুবে যায় বিস্মৃতির নীরে ?

১১

সে কি আর আসিবে না ফিরে?
আর কি হবে না দেখা,
চির দিন রব একা?
প্রভাত মধ্যাহ্ন, সাঁঝে হায়,
শূন্য প্রাণে ভ্রমিয়া ধরায়
কত দিন বাঁচিব আশায়?

শ্রীপ্রমীলা বসু।

প্রবাসী বাঙ্গালী।

বাঙ্গালীর আজ বড়ই দুঃখের দিন। নানাকারণে বাঙ্গালী এক্ষণে অনেকেরই চক্ষের শূল—ঘরে, বাহিরে, রাজদ্বারে সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী লাঞ্ছিত। অতএব এই সময়ে দেশের বাহিরে বাঙ্গালী কিরূপ আদর অভ্যর্থনা পান, কি রূপেই বা তৎপ্রদেশে তাঁহার চরিত্রের বিকাশ হইয়াছে সে বিষয়ের একবার পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় বিশেষ ক্ষতি নাই। এক্ষেত্রে আমরা ইয়ুরোপ প্রবাসীর কথা বলিব না—প্রবাসী শব্দ কেবল ভারতবর্ষীয় অপরাপর প্রদেশস্থ বাঙ্গালী অর্থে ব্যবহৃত হইবে। সত্য বটে ভারতবর্ষ বলিলে একটী অখণ্ড দেশ বুঝায়। সেটী কেবলমাত্র এক রাজার শাসনাধীনতা বশতঃ। কি ভাষা, কি ধর্ম্ম, কি রীতিনীতি, কি জাতিতত্ব (Ethnology) বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষীয় সম্প্রদায়গুলি সর্ব্ব প্রকারেই বিভিন্ন;—এক জাতীয় নহে। মহারাষ্ট্র ও বাঙ্গালায়, গুজরাট ও মহীশুরে, দ্রাবিড় ও কর্ণাটে যে সম্পর্ক ইংলণ্ড ও রুষিয়া, জার্ম্মাণি ও গ্রীস্, সুইডেন ও ইংলণ্ডে তদ্রূপই সম্পর্ক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাষা ও ধর্ম্ম সমাজের বিশেষ বন্ধন, বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে একত্রীকরণের মুখ্য উপায়; উহাদের দ্বারাই পরস্পরের মনের ভাব স্বেচ্ছাক্রমে প্রকাশ এবং স্বতঃই সখ্যভাব সংস্থাপন করা যায়।

কিন্তু তাহা কোথায়? কতিপয় সহস্রমাত্র ভারতবাসী একভাষা ব্যবহার করেন ও এক ধর্ম্মাবলম্বী। কেহ কেহ বলেন যে ইংরাজী ভাষাই এই জাতি নিচয়ের একভাষা হইবে। ফলেও অধুনা দেখা যায় শিক্ষিত ভারতবাসী এই ইংরাজীভাষার সাহায্যে পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কংগ্রেস্ তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। কিন্তু ঐ ভাষা যে দেশের সকল লোকেই শিক্ষা করিতে পারিবে এরূপ সকলের বিশ্বাস নহে। আর অনেকে এ কথাও বলেন যে সকলকার ঐ ভাষায় শিক্ষিত হওয়া;—ইংরাজীভাবে, ইংরাজীমতে দীক্ষিত হওয়া; দেশের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। সেই জন্য তাহাদের মতে উর্দ্দু ভাষা সমগ্র ভারতবাসীর একভাষা হওয়া বিধেয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও বিশেষ গোল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবল উত্থানের সময় কেহ কেহ বলিতেন যে ঐ ধর্ম্ম সমস্ত ভারতবাসীর এক ধর্ম্ম হইবে। কিন্তু এখন সে আশা কই? আর ধর্ম্ম এক হইলেও সকল সময়ে সমস্ত লোক একসমাজভুক্ত হয় না। দেখুন মহারাষ্ট্র-হিন্দু ও বাঙ্গালী-হিন্দু এই উভয় সম্প্রদায় পরস্পর

সমাজে চলিত নহে। একত্রে আহার একত্রে বাস উভয়ে সম্ভবে না। প্রথমটী অপরটীকে খৃষ্টান বলিয়া বিদ্রূপ করেন। পূর্ব্বের ভ্রাতৃভাব আর নাই; উহঁারা যে একবংশসম্ভূত তাহা প্রতীয়মান হয় না। বোধ হয় ইংরাজী প্রথার অনুকরণই এই অনর্থের মূল। বঙ্গে ইংরাজরাজ্যের রাজধানী ও ইংরাজের বাস অধিক। সেই জন্যই বাঙ্গালী তাঁহার আচার ব্যবহার, হাবভাব প্রভৃতি বিশেষরূপে দেখিতে পান। আর জেতার সকলই ভাল এই জ্ঞানেই হউক, বা অপর কোন কারণবশতঃই হউক নিস্তব্ধে সেই গুলির অনুকরণ করেন। মুসলমানদিগের যখন ভয়ানক আধিপত্য ও অখণ্ড প্রতাপ,যখন "দিল্লীশ্বরোবা" "জগদীশ্বরোবা" তুল্য অর্থে ব্যবহৃত হইত, তখন দেখিতে পাই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুগণ মুসলমানদিগের অনেকগুলি আচার পদ্ধতি অনুকরণ করিয়াছিলেন। আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি বিদেশে কোন কার্য্যোপলক্ষে যান। তাঁহার মস্তকের চুল আজকালকার ধরণে কাটা ছিল, এজন্য দুই সপ্তাহকাল কোন হিন্দু-মান্দ্রাজী তাঁহার সহিত মিশেন নাই, তিনি খৃষ্টাননামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া তত্রত্য সমাজে পরিচিত হইতে দুই সপ্তাহকাল সময় লাগিয়াছিল।

কিন্তু কি বলিতে কি বলিতেছি। ফলে কথাগুলি বিশেষ অসংশ্লিষ্টও নহে। বঙ্গের বাহিরে প্রবাসী শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিতে গেলে বোধ হয় ঐ গুলি মনে রাখা আবশ্যক। বাঙ্গালী যেখানেই থাকুন, অনায়াসে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়। ভিন্নদেশীয় দুই সহস্র লোক থাকিলেও তাহার মধ্যে তাঁহাকে বাছিয়া লওয়া যায়। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কণ্ঠের স্বর, কথার উচ্চারণ, ভাবভঙ্গী ইত্যাদি সবই কি জানি যেন বাঙ্গালী অপর সকল জাতি হইতে কেমন একটু পৃথক। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার মুখে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দী শুনিলেই বাঙ্গালী বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার অগম্য স্থান কোথাও নাই। কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমাচল অবধি তিনি সর্ব্বত্রই বিরাজমান। একজন কৃতবিদ্য সংবাদপত্রলেখক বাঙ্গালীকে ভারতবর্ষের (Scotchman) বলিয়া আখ্যাত করেন। প্রবাদ আছে উত্তরমেরুতে (North Pole) যাইতে সক্ষম হইলে তথায় একজনও স্কটলণ্ডবাসী দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে! বাঙ্গালীর পক্ষে প্রায়ই তদ্রূপ। কে বলিতে পারে যে ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল দুর্জ্জয় অরণ্যপরিব্যাপ্ত মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিতুল গ্রামে অথবা দক্ষিণভাগের সুদূরপ্রান্তে পালমকোট নগরে বাঙ্গালী নাই? প্রথমেই তাঁহার পোষাকের কথা বলা আবশ্যক। মহাকবি সেক্সপীয়র ১৭শ শতাব্দীর বিলাতী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের (Nobles) বেশভূষা সুন্দররূপে চিত্রিত করেন। * তখন ইংরাজেরা আপনার বলিতে বড় কিছুই ছিল না—আধুনিক নব্য সম্প্রদায় বাঙ্গালীর মত অনুকরণের স্রোত তীব্র-

* Portia.—How oddly he is suited! I think he bought his doublet in Italy, his roundhose in France, bonnet in Germany &c.—MERCHANT OF VENICE.

বেগে বহিতেছিল—জাতীয় অস্তিত্বের কোন লক্ষণই পরিদৃষ্ট হইত না। এক্ষণে বাঙ্গালীর সাজ সজ্জার দিকে একবার দৃষ্টি-পাত করুন। পায়ে বিলাতী জুতা, লেডীজ্ ফুল মোজা, পরিধানে পাতলা কালাপেড়ে ধুতি, গাত্রে বিলাতি ধরণের সার্ট বিলাতি অনুকরণে লং কোট,—মস্তক অনাবৃত। পৃথিবীর অপর কোন জাতিকে মাথা খুলিয়া রাখিতে দেখা যায় না। লেঙ্গট্ পরা অতি দরিদ্র জাতিও মাথায় পাগড়ি দেয়। বাঙ্গা-লীর কেবল মাথা-খোলা—উহা লইয়াই বাঙ্গালী আপনার মনে গর্ব্বিত। কালের নিদারুণ আবর্ত্তনে তাঁহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি এখন টেবিল চেয়ার ভাল-বাসেন, নমস্কারপ্রথা একরকম তুলিয়া দিয়া-ছেন, গুড্ মর্ণিং প্রভৃতি ইংরাজী পদ্ধতি অনুকরণ করেন; চাপকান, কোট, পেণ্টালুন, ছড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করেন, অনেক ইংরাজী হাবভাব এখন তাঁহার সত্ত্বার অংশীভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মাথায় টুপি কয়জনে দেন?—আবশ্যকীয় স্থান ব্যতীত টুপি ব্যবহার করিতে তিনি নিতান্ত নারাজ।

অপর জাতি হইতে এইরূপ বিশেষ বৈল-ক্ষণ্য ভাবের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও তিনি সকল জাতির সহিত মিশিতে পারেন। অতিমাত্র বুদ্ধিকৌশল, অসাধারণ বাক্‌পটুতা, সহৃদয় কোমলতা থাকাতে তিনি স্বতঃই মনুষ্য হৃদ-য়ের রাজা—মানসিক বৃত্তির পরিচালক। যেখানেই থাকুন সেখানেই তথাকার ভদ্র-মণ্ডলীর দলপতি হয়েন—সেইখানেই তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য জুটিয়া যায়। আর তাহাদিগকে কোন ভাবে উত্তেজিত করিতে, নিজ পথে লওয়াইতে, নিজমত অবলম্বন ও সমর্থন করাইতে তিনি অতিশয় দক্ষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দুইটী বাঙ্গালী একস্থানে কোনমতে সদ্ভাবে বাস করিতে অক্ষম। তিন জন বাঙ্গালী এক স্থানে থাকিলে, সেখানে আড়াই খানি দল হইবে, ইহা নিশ্চিত; বলিতে কি, ইংরাজের যেরূপ সকল বিষয়েই অসন্তোষভাব—কিছুতেই মন উঠে না, সেইরূপ বাঙ্গালীর দলাদলি—তিনি যেখানে যান উহা তাঁহার সঙ্গের সাথী; মনের মিল নাই—মতের একতা নাই—সকলেই স্ব স্ব প্রধান। ঐ দোষটীই অনেক সময় বাঙ্গালী জাতির অধোগতির কারণ বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। সর্ব্বোপরি আপনার প্রভুত্ব সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী থাকাতে অনেক সময়ে তিনি নিজের এবং সমগ্রজাতির উন্নতির পথ কণ্টকিত করেন। ইংরাজী মন্ত্রে অনেক অংশে দীক্ষিত হইয়াও তিনি এ অবধি ঐ দোষটী সম্যক প্রকারে পরি-হার করিতে সমর্থ হন নাই।

তাঁহার একটী বিশেষ গুণ আছে তাহার পরিচালন ও উৎকর্ষ হেতু তিনি জনসমাজে মান্য ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। কৃত-জ্ঞতাভাবের উচ্ছ্বাস তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল। হণ্টার সাহেব একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন যে বাঙ্গালীহৃদয়ে কৃতজ্ঞতাভাব কেবল উপকৃতের সঙ্গে শেষ হয় না—উপকৃতের পুত্রপৌত্রাদিও তাহা স্মরণ করিয়া রাখেন, উপকারী ব্যক্তিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন এবং কোন মতে তাঁহার উপ-

কার সাধন করিতে পারিলে আপনাকে সৌভাগ্যান্বিত মনে করেন। বাঙ্গালীহৃদয়ে ভক্তিরসের চিরন্তন প্রাদুর্ভাব। আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মান করা, বিনীত ভাবে পূজনীয়দিগের আদেশ পালন করা, তাঁহার বহুযুগব্যাপী অভ্যাস। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে অধুনা তাহার কিছু ব্যতিক্রম হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার উপরেই তাঁহারা এবিষয়ের দোষারোপ করেন। ফলত গুরুজনের প্রতি সে অপার ভক্তি, মাননীয়দিগের প্রতি সে অসীম শ্রদ্ধা এ কালে আর নাই। আত্মপরিজন হইতে পৃথক থাকিয়া স্ত্রীর আজ্ঞা অক্ষুণ্ণভাবে পালন করাই এখন তাঁহার একপ্রকার ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এস্থলে মধ্যবিৎ অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার বিষয়, তাঁহার ভীরুতার কথা উল্লেখ করিবার বোধ হয় আবশ্যক নাই। ফলতঃ আমাদের (Paternal) গবর্ণমেণ্টের গুণে এবং নিজেদের ভাগ্যদোষে অনেক কাল হইতে যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা কিম্বা বীরধর্ম্মোপযোগী অঙ্গসঞ্চালনক্রিয়ায় অনভ্যস্ত হওয়ায় সেই দুর্ব্বলতা, সেই ভীরুতা বাঙ্গালীজীবনে একরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আর সেই মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোকই বিদেশে গতিবিধি করিতেন, এজন্য দোষগুলি সম্যক বাঙ্গালীচরিত্রের লক্ষণ বলিয়া কোন কোন স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যাহা হউক উপরে কতকগুলি বাঙ্গালীচরিত্রের বিশেষ ভাবের কথা উল্লেখ করা গেল—বাঙ্গালীমাত্রই স্বল্পাধিক পরিমাণে উহা বর্ত্তমান আছে। অবশ্যই নানারঙ্গের বাঙ্গালী দেখিতে পাওয়া যায়। পরিবর্ত্তনশীল জগতে শ্রেণীবিভেদের অভাব কি? প্রথমেই একটী প্রৌঢ়বয়স্ক প্রবাসীর কথা স্মরণ হইল। যে সময়ে রেলপথ বা টেলিগ্রাফ্ সম্বন্ধে এখনকার মত সুবিধা ছিল না, সেই সময়ে ইনি বন্ধুপরিজনকে না বলিয়া চুপি চুপি একদিন দেশত্যাগী হন। নানাস্থানে অনুসন্ধান করিবার পর, আত্মকুটুম্বেরা তাঁহার আশা একপ্রকার জলাঞ্জলি দিলেন। অনেকদিন অতিবাহিত হইল, তাঁহার কোনও উদ্দেশ হইল না। এদিকে তিনি যাহা কিছু লইয়া পলাইয়াছিলেন তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। অগত্যা চাকরী স্বীকার করিতে হইল এবং "ডাকবাবুর" অথবা কালেক্টরী সেরেস্তার কোন সুবিধা রকমের চাকরী জুটাইয়া লইলেন। তৎপরে যৌবনে একক থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে, সিদ্ধান্ত করিয়া তত্রস্থ এক তরুণীর প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, এবং তাহার সহিত স্ত্রীপুরুষের ন্যায় সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। সংসারে এক্ষণে তাঁহার মমতা জন্মিল—অর্থোপার্জ্জনের আসক্তি তাহার হৃদয়ে এক্ষণে বিশেষ বলবতী হইল—তিনি বেশ দুদশ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। মধ্যে একবার বেড়াইয়া আসিবার সাধ হইল। সে কালে তীর্থস্থান পর্য্যটনের একপ্রকার সুবিধা ছিল, অন্যত্র যাইতে অতিমাত্র কষ্ট হইত—ভ্রমণে কোন তৃপ্তিলাভ হইত না। ইহার উপর, হিন্দুভাব তাঁহার হৃদয়ে সম্যক প্রকারে বর্ত্তমান ছিল। এইরূপে চারিদিক বিবেচনা করিয়া বিশ্বেশ্বরদর্শন মানসে তিনি কাশী যাত্রা করিলেন।

ঘটনাক্রমে তথায় তাঁহার কোন আত্মীয় কুটম্বের সহিত দেখা হইয়া গেলে তিনি বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন। আত্মীয় কুটুম্বেরা বহুকালাবধি তাঁহার সন্দর্শন পান নাই—এমন কি পুনঃপ্রাপ্তির আশা স্বপ্নেও ভাবেন নাই—তাঁহাকে আজ দৈব-ক্রমে সম্মুখে পাইয়া কোন ক্রমেই তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। এদিকে তাঁহার সাহায্যসাপেক্ষী কয়েক জন তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিল—তাহাদের কোন ব্যবস্থাও করিতে পারিলেন না। সে যাহা হউক আত্মীয়েরা কোন মতে তাঁহাকে দেশে লইয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া শাস্ত্রমত তাঁহার একটী বিবাহ দিলেন। উপযুক্ত সময়ে তিনি কর্ম্মস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন—সহধর্ম্মিণী তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। অবশেষে তিনি রক্ষিতা রমণী ও তাহার সন্তানাদির ভরণপোষণের একরকম ব্যবস্থা করিয়া দিয়া—পত্নীকে লইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইদানীং তীর্থক্ষেত্রে এক প্রকারের অর্দ্ধবাঙ্গালী অর্দ্ধগুণ্ডা যুবা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা ঈদৃশ বংশসম্ভূত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমাদের নায়ক গোঁড়াহিন্দু—আধুনিক সমাজ সমিতি ইত্যাদি তাঁহার ভাল লাগে না। স্কুলবুক সোসাইটীর থার্ড্ নম্বর রিডার অবধি তাঁহার বিদ্যা। অথচ তাঁহার কালে এখনকার এণ্ট্রান্স কিম্বা বি-এ,এম-এ, ওয়ালাদের অপেক্ষা তিনি অধিক উপার্জ্জন করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার গর্ব্বকথা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাজারে হিন্দী কথা কহিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। বেশ শ্রুতিমধুর সুন্দর সুন্দর গল্প করিতে পারেন;—তাহাদের মধ্যে আষাঢ়ে গল্পই অধিক বলিয়া বোধ হয়, সেই জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে বড়ই বিরক্তিজনক বলিয়া মনে হয়। কখন কখন তাঁহার অতীত জীবনের অসমসাহসিক ঘটনাবলী আবৃত্তি করেন—শুনিতে শুনিতে শ্রোতার সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চ হয়—পর পর আরও জানিতে কৌতূহল জন্মায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার সহবাসে ক্ষণ-কাল মাত্র সুখে অতিবাহিত করা যায়। পরিশেষে, প্রায়ই দেখা যায় তিনি যে স্থানে থাকেন সেখানকার বালক বালিকাদের মহলে বৃদ্ধঠাকুরমার মত 'সরকারী গল্পে' হইয়া উঠেন।

কোন একটী ষ্টেশনে পঁহুছিলেই সময়ে "ইয়েস্ স্যর"ই ধরণে ইংরাজী কথা কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে—গলায় পশমের গলাবন্ধ, গাত্রে চায়নাকোট,পরিধানে পায়জামা, এই রঙ্গের একটী বাঙ্গালী আমাদের নয়ন গোচর হয়—উনি আমাদের "রেলওয়ে বাবু।" উহাঁর হৃদয় অকপট—মন উন্নত। কোন বাঙ্গালী দেখিলে আপনার লোক মনে করেন—ঘরের লোকের মত বড়ই আদর করেন। দুঃখের বিষয় এই যে নূতন নেশা করিতে শিখিয়াছেন, এক আধ্ পেগ্ টানিয়া যত্রতত্র অনেক সময়ে জ্বালাতন করিয়াও মারেন। গার্ড ও ড্রাইভার তাঁহার বন্ধু—তাঁহাদের সমাজে মিশিয়া কতকগুলি ইংরাজী ভাষার সর্ব্বনাম পদ আর পাদপুরাণের শব্দ শিক্ষা করিয়াছেন, সেই গুলি যেখানে সেখানে ব্যবহার করেন। তাহাদিগকে অনুকরণ করিতে গিয়া বিয়ার ব্রাণ্ডি পানে পটু হইয়াছেন—আর ঐ

কুপ্রথাগুলিই পালন করাই সাহেবী, তাঁহার এই সংস্কার জন্মিয়াছে। কার্য্যে অতিমাত্র তৎপর কিছু ভাবনা চিন্তা না করিয়া কোন একটী কর্ম্ম করা তাঁহার অভ্যাস। দেশ-দেশান্তরে বাস করিতে তিনি কিছুতেই ভীত হন না—আজ এলাহাবাদে আছেন, কাল আলিগড়ে যাইতে তাঁহার কোন কষ্ট হয় না। বিঘ্নবিপত্তি তিনি কিছুই গ্রাহ্য করেন না—ভ্রমণে প্রতিবন্ধক তাঁহার সামান্যই আছে। আপনাকে সুরসিক বলিয়াই তাঁহার ধারণা—প্রতিবাসীর মতামতের দিকে একবারও ভ্রুক্ষেপ করেন না। সহজেই আপ্যায়িত হন;—এক উপায়ে তাঁহাকে অনায়াসে হস্তগত করা যায়—এক গেলাস মাত্র দিলে তিনি আপনার গোলাম হইতে পারেন।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর ব্যক্তি ব্যতীত অন্য প্রকৃতির প্রবাসী আছে, তন্মধ্যে দুই এক জনের বিষয় সংক্ষেপে বলি। প্রথমেই, ইঞ্জিনিয়ার বাবুর খুড়ার কথা। কমিসেরিয়েট—গোমস্তার কোন এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ও উহাঁর মতন। উহাঁদের কোন কাযকর্ম্ম নাই—কেবল তামাক টানেন, সতরঞ্চ বা তাস খেলেন আর গালগল্প করেন। বারইয়ারী পূজার এক একটী প্রধান উদ্যোগী-সুমহান পাণ্ডা। ভালমন্দ কর্ম্ম করিতে কিছুই আপত্তি নাই। মধ্যে মধ্যে কণ্ট্র্যাক্টারদিগের সহিত মুরুব্বির নামে সংগোপনে বন্দোবস্ত করেন—তাহাতেই যাহা হউক তাঁহার দুপয়সা রোজগার—তাহাতেই তাঁহার বাবুয়ানা। প্রকৃতি নিতান্ত মন্দ নহে—সময়ে সময়ে কিন্তু ভীষণ নারকীয় ভাব ধারণ করেন।

তৎপরেই একটী—যুবকের কথা বলি। ইনি সম্প্রতি স্কুল হইতে আউট্ হইয়াছেন। কথা কহিতে গিয়া বাঙ্গালার সহিত ইংরাজী মিশ্রিত না করিয়া ইনি একটী কথাও কহিতে পারেন না। হিন্দুস্থানী তাঁহার দুচক্ষের বিষ—"সাতু" বলিয়া তাহাদের ঘৃণা বাক্য প্রয়োগ করেন। নূতন ধরণে চুল কাটিতে, নূতন রকমে সাজ সজ্জা করিতে সর্ব্বদাই মনোযোগ—হোটেলে খাইতে বড়ই স্পৃহা—ইংরাজী খাদ্য তাঁহার মুখে অমৃত সমান লাগে। দাম্ভিক ইংরাজদের ঘৃণাব্যঞ্জক "বাবু" উপাধিটী তাঁহার ভাল লাগে না—"মিষ্টার"হইতে বড়ই সাধ। দেখিলে বোধ হয় কলিকাতার 'হাওয়া' তাঁহার গায়ে বেশ লাগিয়াছে। আমাদের দেশের আচার ব্যবহার তাঁহার কাছে সব মন্দ—ইংরাজী সকলই উৎকৃষ্ট। নানারকমে আপনাকে অনেকটা সাহেব করিয়া তুলিয়াছেন। হায়! হিন্দুর কি এই পরিণাম!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমরা ২৫।৩০ বৎসরের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ্ প্রভৃতির সুযোগ তখন কিছুই ছিল না। রাস্তাঘাটেরও এখনকার মত সুবন্দোবস্ত তখন হয় নাই। এই সকল কারণবশতঃ দেখাণ যায় যে, যে সকল যুবক কোন কারণে একবার দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন, তাঁহাদের প্রত্যাগমনের আশা বড় কেহই করিতেন না—তাঁহারা একবারে বাটীর সংস্রব হইতে দূরে থাকিতেন। বিদেশে বন্ধু-পরিজন-পরিব্যাপ্ত না থাকায় তাঁহারা কোন এক নির্দ্দিষ্ট সামাজিক নিয়মদ্বারা পরিচালিত হইতেন না। ভূরি

ভূরি অত্যাচার করিতেন—এবং কুৎসিত কর্ম্ম করিতেও ইতস্ততঃ করিতেন না। এই সকল উপদ্রবে বিদেশে বাঙ্গালীর দুর্নাম হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালী নামে লোকে তখন ভয় করিত—ঘৃণাও করিত। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ শীঘ্রই এই ভীতিপ্রদ দৃশ্য-পটের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রেলপথ হইয়া আজকাল দূরদেশে ভ্রমণ করিতে কষ্ট কিম্বা কোন আশঙ্কা হয় না—টেলিগ্রাফসংযোগে পলাতক যুবাকে বিনা কালবিলম্বে বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারা যায়। ফলতঃ কেবল-মাত্র সৎপ্রকৃতির ভদ্রগণ কার্য্য উপলক্ষে এখন বিদেশে থাকেন। সেই জন্যই অধুনা তরুণবয়স্ক অসম্পূর্ণচরিত্রের দুষ্ট বালকের পরিবর্ত্তে সৎস্বভাববিশিষ্ট পরিণতবয়স্ক অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ভদ্রকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর, যে স্থানে পূর্ব্বে ২।১ জন মাত্র বাঙ্গালী মিলিত, সে স্থানে এখন ১০।১২ বা ততোধিক বাঙ্গালী বাস করেন। ইহাও একটী উল্লিখিত মন্দ কার্য্যের অন্তরায়ের কারণ বটে। অব-শেষে শিক্ষিতের ভাগ অধিক হওয়াতে এই ইঙ্গিত পরিবর্ত্তনের বিশেষ সুবিধা হই-য়াছে। অবশ্যই এখানে স্বীকার করিতে হইবে যে মন্দ প্রকৃতির লোক এখন বিদেশে একেবারে লোপ পায় নাই।

যাহা হউক আসুন এক্ষণে আমরা আজ-কালের ভিন্ন অঙ্গের প্রবাসী বাঙ্গালীর দুই একটী চিত্র প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করি। ইহাঁরাই এখন বিদেশীর নিকট বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল করিতে সাধ্যমত যোগ দিয়াছেন এবং ইহাঁদেরই যত্নে তাহা অনেক পরি-মাণে সম্পাদিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। কথিত সম্প্রদায়ভুক্ত কতকগুলি পরিণত-বয়স্ক মধ্যমাকারে শিক্ষিত সুবুদ্ধিমান, নিরীহ প্রকৃতির লোক সর্ব্বপ্রথমেই আসেন। তাঁহারা প্রায়ই কোন রকমের উচ্চশ্রেণীর চাকুরে।—গৃহস্থের ন্যায় মানের সহিত সংসার লইয়া বাস করিতেন, পুত্রকন্যার বিবাহ-কার্য্য দেশে আসিয়া সম্পন্ন করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা হিন্দু ছিলেন—হিন্দুয়ানির ভাণ করিতেন না। অর্থব্যয়ে হউক বা সাহে-বের নিকট হইতে চাহিয়া হউক একখানি সংবাদপত্র তাঁহার পড়া আবশ্যক হইত। উপার্জ্জন করিতে বিদেশে আসিয়াছেন—তাহা তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত। দশ টাকা উপার্জ্জনও করিতেন—কিছু কিছু সঞ্চয়ও হইত।

তাঁহার সমসাময়িক আর এক ধরণের লোক উপস্থিত হন। তাহারা অপেক্ষা-কৃত কিঞ্চিৎ উচ্চ অঙ্গের শিক্ষিত। উহাঁরা প্রায়ই জনষ্টুয়ার্টমিলের মতাবলম্বী; উহাঁদের মুখে হিন্দুয়ানীর ভাণ ছিল কিন্তু গোপনে ইংরাজী খাদ্যের বিফ্ হ্যাম প্রভৃতি কিছুই বাকি থাকিত না, সবই চলিত। সভা-সমিতিতে যাইয়া দুই এক কথা উচ্চকণ্ঠে বলিতেন—যদি কোন কর্ম্ম করিতে যাইতেন তাহাতেই তেজ দেখাইতেন। সামাজিক বা মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে সকল ব্যাপারেই ইনি সংলিপ্ত এবং বিশেষ উদ্যোগী। টাকা থাকিলেই বিলাত যাইতাম ইহা মধ্যে মধ্যে গর্ব্বচ্ছলে বলিতেন। দেশীয় রাজাদের ষ্টেটে ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

তৎপরেই উকিল ডাক্তার ইত্যাদি। ইংরাজী ভাষায় ইহাঁরা সুপণ্ডিত, ইংরাজী মন্ত্রে দীক্ষিত—ইংরাজী ইতিহাস পাঠ করিয়া ইংরাজী উন্নতির হেতু পরিজ্ঞাত। ইংরাজী শাসনপ্রণালী বিশিষ্ট মনঃসংযোগ-পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়াছেন—উহাই আদর্শ-প্রণালী বলিয়া তাঁহাদের সংস্কার হইয়াছে। ভারতের জাতীয় উন্নতির দিকে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি আছে—সেই উদ্দেশ্য সাধনেই সর্ব্বদা যত্নবান। রাজনৈতিক, সামাজিক বা মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ কার্য্য ইহা-দের অতিমাত্র প্রিয়। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনের জন্য ইহাঁরা বিশেষ সচেষ্ট। যেখানে থাকেন তথাকার বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয় সংস্থাপন—দরিদ্র রোগী-দিগের চিকিৎসার জন্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা—গ্রামের স্বাস্থ্যবিধানের জন্য সময়ক্ষেপ ও অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। আচার ব্যব-হার প্রায় সকলকার বিশিষ্ট ভদ্রোচিত। প্রভুত অর্থ উপার্জ্জন হেতু ও বিপুল সম্মান প্রযুক্ত অনেককে প্রতিলালন করিতে ও দুর্ব্ব-লকে নানাপ্রকার অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম। অনাথদিগের হইয়া কথা কহে এরূপ স্বাধীনচেতা, নির্ভীক পুরুষ বিরল—তাহাদের দুঃখ জনসমাজে ও রাজ-সরকারে জানায় এরূপ বন্ধু কম। ইহাঁরা কিন্তু সাধ্যমত তাহা করিতে বিমুখ হন না। এখনকার কালে ইহাঁরা এক রকম দেশের নেতা, তজ্জন্যই দেশের লোকেরা ইহাঁদের ভালবাসে ও ভক্তি করে এবং তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়।

কঙ্গ্রেস্ হইয়া অবধি কলিকাতা হইতে অনেক গণ্যমান্য উচ্চ অঙ্গের শিক্ষিত ভদ্রগণ চতুর্দ্দিকে যাতায়াত করেন। তজ্জন্যই বাঙ্গালীচরিত্রের প্রকৃতভাব ভিন্নদেশবাসীগণ বিশদরূপে জানিতে সমর্থ হইয়াছেন। বাঙ্গা-লীর উপর পূর্ব্বের কুভাব এক্ষণে অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে। পরিশেষে পর-স্পরের অধিকতর বিমিশ্রণে সে ভাব একে-বারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ইহা আমাদি-গের বিশ্বাস—তদ্বিধানে আমাদের সকলকার সবিশেষ প্রয়াস পাওয়া আবশ্যক। জগতে বাঙ্গালীনামের যশঃকীর্ত্তন হয় ইহাই আমা-দিগের আশা—ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। উহার সাফল্যেই আমাদের উৎকৃষ্ট সুখ।[১]

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।

সিংহল-দর্শন।

কৃষিকার্য্য।

সিংহলের ভূমি সাধারণতঃ অত্যন্ত অনুর্ব্বরা। কতক পরিমাণে এ কথা সত্য; কেন না, অত্যল্প জনপদ ব্যতীত সিংহলের সমস্ত ভূমি সারশূন্য ও গভীরতাবর্জ্জিত। প্রদেশীয় যে সকল ক্ষেত্রে কাফি উৎপন্ন হয়, তাহা এক সময়ে বিলক্ষণ উর্ব্বরা থাকে,

১ এই প্রবন্ধ সাহিত্য সমিতির অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

বর্ষাকালে বহুবৃষ্টিতে সেই সকল ভূমির মৃত্তিকা ধুইয়া নদীতে ও ভিন্ন ভিন্ন স্রোতে অবশেষে সমুদ্রে গিয়া পড়ে; তাহাতেই ভূমি নিস্তেজ হইয়া যায়, একথা সত্য; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে যেরূপ উৎকৃষ্ট তল-মৃত্তিকা অবশিষ্ট থাকে, পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, সেই সকল নীচের মাটীতে চা-বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহার পত্রগুলি চমৎকার সতেজ হয়।

সমুদ্রের পশ্চিম দক্ষিণ উপকূল ও পর্ব্বত-মালার মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তৃত ভূভাগ আর্দ্র-ভূমি বলিয়া পরিগণিত; তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্র প্রকৃত উর্ব্বর ক্ষেত্রশ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে না; কিন্তু সেই সকল স্থলের উৎপাদিকা শক্তি অবিসম্বাদিনী; বর্ষাবায়ুর শীতোষ্ণতাগুণে সেই সকল ক্ষেত্রে সুন্দর ফসল সমুৎপন্ন হয়। দক্ষিণপশ্চিমে বায়ু-বহন সময়ে সিংহলের এই অংশে সুবৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই বৃষ্টির জল প্রকৃত পর্য্যায়ে দ্বাদশ মাসের উপকারে আইসে; বৃষ্টির জলের পরিমাণ ৮০ ইঞ্চ হইতে ১৫০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট। সিংহলের নিম্নভূমির শস্যাদির উৎপাদনপ্রাচুর্য্যে ইহা সবিশেষ উপকারী। কস্মিন্‌কালেও যে সকল ভূমিতে সার দেওয়া হয় না, ঐ প্রকার বারিবর্ষণ ও সূর্য্যকিরণে সেই সকল ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে; ক্রমাগত দুই সহস্র বৎসর সমান ফসল জন্মে; এবং সমভাবে দারুচিনি সমুৎপন্ন হয়, অধিকাংশ দারুচিনিক্ষেত্রের মৃত্তিকায় শতকরা ৯০ অংশ বিশুদ্ধ জলজানক্ষার নিহিত থাকে। বার মাস সমান বৃষ্টি হয় না, কোন কোন সময়ে অত্যল্প বৃষ্টিপাত হয়। আর্দ্র ভূমি প্রধান চারিটী প্রদেশে এক বৎসরে গড়ে ১৪৯ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বশুদ্ধ ১৮১ দিনের অধিক বৃষ্টি হয় নাই। ইহাতেই বোধ হয়, কেবল বৃষ্টির জলই সিংহলের শস্যাদি উৎপাদনের সহায় নহে, প্রাকৃতিক অপরাপর আকর্ষ-ণেও ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়। প্রাগুক্ত সীমাবচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের পরিমাণ অনুমান ৫৫ লক্ষ একার; (প্রায় ১৬৫ লক্ষ বিঘা) ইহার মধ্যে কেবল ১৫ লক্ষ একার হাসিল জমী, অবশিষ্ট ৪০ লক্ষ একার অকৃষ্ট পতিত।

স্থানে স্থানে অকৃষ্ট ও অনুর্ব্বর ভূমি থাকিলেও অধিকাংশ স্থলে বিশেষ উর্ব্বরা ও সুগভীর মৃত্তিকা প্রচুর। সেই সকল ভূমিতে চা ও কেকাও বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কৃষকেরা বিশেষ মনোযোগী হইলে অল্পদিনের মধ্যেই নূতন নূতন ফসল উৎপন্ন করিয়া বিলক্ষণ লাভবান্ হইতে পারিবে।

বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সিংহলে চায়ের চাষ আরম্ভ হয়, দ্বাদশ বর্ষের অধিককাল অল্প পরিমাণে ঐ কার্য্য চলিয়া আসিয়াছিল; কাফির চাষ তৎকালে বহুবিস্তৃত ছিল; অনন্তর ছয় সাত বৎসর হইল, কাফি চাষে ও কাফির বাণিজ্যে দিন দিন অসম্ভব খর্ব্বতা হইয়া আসাতে চা-চাষের প্রতিই কৃষিদিগের দৃষ্টি পড়ে; ক্রমশঃ অধিক পরিমিত ভূমিতে চা-চাষ আরম্ভ হইয়াছে। ছয়টী নির্দ্দিষ্ট কাফিক্ষেত্রের উচ্চ উচ্চ ভূখণ্ডে চা উৎপন্ন হইত; ক্ষেত্রের উচ্চতা ন্যূনাধিক পরিমাণে ২৫০০ হইতে ৫৫০০ ফীট। তখন-কার উৎপন্ন চা বিলাতের বাজারে আদর

প্রাপ্ত হইত না, সিংহলী চা ভাল নহে, এই বলিয়া বিলাতী লোকেরা উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন ;—তাহারও অন্তর্ভূত অন্য কারণ ছিল। স্থলবিশেষে কোন কোন অংশে পারিপাট্যের ত্রুটি হইত ; কি প্রকারে চা-পত্র প্রক্রিয়ামত প্রস্তুত করিতে হয়, অভিজ্ঞতার অপূর্ণতা নিবন্ধন চা-করেরা সকলে তাহা সুন্দররূপ জানিতেন না।

ক্রমশঃই উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। রুক্‌ উড এবং লুলকন্দুরা নামক দুইটী প্রসিদ্ধ ও পুরাতন জমীদারীর চিহ্নিত বাক্‌সের প্রতি ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের দৃষ্টি নিপতিত হইল ; কিন্তু সিংহলী চা ব্যবহারোপযোগী নহে ভাবিয়া খরিদ্দারেরা তত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না এবং দালালের রিপোর্টেও তাহার কোন বার্ত্তা স্থান প্রাপ্ত হইত না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। কৃষি ও পারিপাট্যবিষয়ে বিশেষ যত্ন হওয়াতে ঐ বৎসরের চা উৎকৃষ্ট হয় ; তাহা বিলাতে রপ্তানি হইলে সকলেই উহার আদর করিতে আরম্ভ করেন, দালালেরাও আগ্রহবান্ হইয়া উহার বাণিজ্য বিস্তারে যত্নবান্ হয়। যাঁহারা চা খান, তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন, সিংহলী চা এক্ষণে চীনের অধিকাংশ চা অপেক্ষা উত্তম, এবং ভারতবর্ষোৎপন্ন উৎকৃষ্ট চায়ের তুল্য। দালালেরা এখন সিংহলী চায়ের বিশেষ পক্ষপাতী, লণ্ডনের মিন্‌সিং লেনের একটী প্রসিদ্ধ প্রধান ফারম হইতে একখানি পাক্ষিক বিজ্ঞাপনী প্রকাশ হয়, তাহাতে কেবল সিংহলী চা ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গ থাকে না। বিস্তৃত বাণিজ্যে ক্রয়বিক্রয়ের আধিক্য দর্শনে সকলেই এখন ঐ বিষয়ের বিজ্ঞাপনী প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা চা উৎপাদন করেন ও বিক্রয় করেন, এইরূপ বাণিজ্য বিস্তৃতি দেখিয়া তাঁহারা প্রায় সকলেই এখন সিংহলের চা-ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগে অনুরাগী হইয়াছেন।

সিংহলের কাফি চাষ ও কাফিবাণিজ্য এক সময়ে মহাসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৮৪০ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩১বৎসরে কাফিকরেরা কোটি কোটি টাকা লাভ করিয়াছিলেন। উন্নতির চরম সীমার সময় ব্যবসায়ী কোম্পানিরা দেখিয়াছিলেন, প্রায় দুই লক্ষ একার (ছয় লক্ষ বিঘা) ভূমিতে কাফি চাষ হইত ; প্রায় সার্দ্ধ দুইলক্ষ তামিল কুলী সিংহলের কাফি-ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া প্রতিবৎসর প্রচুর অর্থ স্বদেশে (ভারতবর্ষে) পাঠাইয়া দিত। কাফির বাণিজ্যের এতদূর বিস্তার জগতের মধ্যে আর কোথাও ছিল না। হায়! সেই মহাসমৃদ্ধিশালী লাভকর বাণিজ্য এক্ষণে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কাফিবৃক্ষে কি এক প্রকার রোগ ও মড়ক ধরিয়াছে, তাহা নিবারণের কোন উপায় এপর্য্যন্ত কেহই কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। এই কারণেই সিংহলে এখন কাফি-বাণিজ্যের শোচনীয় পতন।

সিংহলে সিঙ্কোনা বৃক্ষের চাষ হইতেছে। প্রথমতঃ ১৮৬১ অব্দে গবর্ণমেণ্টের নিজ ব্যয়ে অল্প পরিমিত ভূমিতে উহার পত্তন হয়। অপরাপর কৃষিকোম্পানিরা সিঙ্কোনা চাষে অনিচ্ছুক ছিলেন। তৎকালে কাফি-চাষে বিলক্ষণ লাভ ছিল, সুতরাং কেহই নূতন চাষে অনুরাগী হন নাই।

গবর্ণমেণ্ট পুনঃ পুন উত্তেজনা করিয়াছিলেন কিন্তু সমস্তই বিফল হইয়াছিল। এক্ষণে অনেকেই পূর্ব্ব উপেক্ষায় আক্ষেপ করিয়া প্রচুর পরিমাণে সিঙ্কোনা চাষ আরম্ভ করিয়াছেন। সিংহলে এখন কুইনাইন-বৃক্ষের চাষে যথেষ্ট উপকার ও লাভ হইতেছে।

কাকাও, দারুচিনি, নারিকেল এবং মণিমুক্তা সিংহলের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। সমুদ্রের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল প্রদেশে বহুযোজন বিস্তৃত নারিকেল বন। নারিকেল সিংহলীদিগের প্রধান উপজীবিকার উপায়। নারিকেল তৈল, নারিকেলের দড়ী, নারিকেল ফল, নারিকেল পাতা, সমস্তই আদরণীয় ও যথেষ্ট লাভজনক। তৈল ও দড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য এখানে অনেকগুলি কল আছে। নারিকেলপত্রে এখানকার লোকে ঘর ছায়;—বিচালী দুর্লভ। কেন না, সিংহলে ধান্যচাষ নাই বলিলেই হয়, কেবল উত্তরাংশে কিয়ৎপরিমিত ভুমিতে ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, উত্তর সিংহল ভারতবর্ষের অংশ। আদিম সিংহলীদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতবর্ষ হইতে সমাগত। সিংহলে যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে স্থানীয় অন্নাহারী লোকের কিছুই কুলায় না। বঙ্গদেশ হইতে চাউল রপ্তানী হইয়া সিংহলে আমদানী হয়। নারিকেল বৃক্ষের প্রতিই সিংহলীদের অধিক যত্ন ও অধিক আদর। সিংহলে সর্ষপতৈলের ব্যবহার নাই; সকলেই প্রায় নারিকেল তৈলে ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করে;—কেহ কেহ তিলতৈলও ব্যবহার করিয়া থাকে। পিপাসার সময় অনেক লোক জল পান না করিয়া নারিকেলোদক পান করে। যাহাদের নারিকেল বৃক্ষ বেশী আছে, তাহারা কোন প্রকার পরিশ্রমের কার্য্য করিতে সম্মত নহে। নারিকেল পাড়িবার সময় সিংহলীরা একটী চমৎকার কৌশল করিয়া থাকে। এক এক করিয়া সমস্ত বৃক্ষে দড়ী বাঁধিয়া, পরস্পর একযোগ করিয়া লয়; একটী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দড়ীর উপর দিয়াই সমস্ত বৃক্ষে যাওয়া আসা করে; মাটীতে পা দিতে হয় না। নারিকেলের বাণিজ্যে প্রতিবৎসর সিংহলে বিস্তর আয় হইয়া থাকে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী।

অনন্ত।

অনন্ত! অনন্ত কিবা? কে তোমরা জান বল
বড় সাধ বুঝিব বারেক;
অনন্ত অনন্ত করে, জীবনের এত দিন
নিশি দিন ঘুরেছি অনেক!

আকুল হৃদয় ল'য়ে,—নিবিড় আঁধারে ভরা—
ছুটে ছুটে হয়েছি পাগল;
দিশাহারা হ'য়ে শেষে, এইখানে বসে বসে
কাঁদিতেছি নীরবে কেবল!

কে যেন দেখায়ে পথ, হেসে হেসে হাতে ধরে
নিয়ে এল এত দূর দেশে;
মাঝামাঝি এনে শেষে, কোথায় ফেলিয়ে গেল
কুহকি কী আশার আবেশে!

গেল গেল সব গেল,—হুহু বুক জলে যায়—
কে দিয়েছে লাগায়ে অনল ;
প্রাণের পিয়াসে মোর, আশার নির্ঝরে আজ
দুরাশার পশেছে গরল !

আর আমি ছুটিব না, আর কি ছুটিতে পারি ?
ছুটে ছুটে এনু কত বার ;
বার বার আসা যাওয়া, শুধু শুধু ফেরা ঘোরা
এ কি ?—কার খেলা চমৎকার !

কোন্ দূর দেশ হ'তে, ছুটিয়ে ছুটিয়ে শেষে
ভেসে যাই দূরদূরান্তরে ;
আধেক জনম বুঝি, এখন হয়নি শেষ—
কি ভীষণ যাতনা অন্তরে !

আসিয়ে আধেক পথ, কেন রে কাতর প্রাণ—
না না—তবে চল ছুটে যাই ;
কার তরে বসে র'বি, কে তোরে সান্ত্বনা দিবে
অই দেখ—ছুটেছে সবাই ।

অসীম আকাশ পানে, কেন চাও শূন্য প্রাণ ?
—শূন্যে শূন্যে মহা মিশামিশি ;
ছুটে যায় মেঘগুলা, উঠে পড়ে—ছুটে চল
কেন বসে ফেল অশ্রুরাশি ?

কেহ কারে দেখেনা রে, বারেক ত সুধায় না
কোন দেশে কার কাছে যায় ;
বিষম অচেনা দেশ, বন্ধুর অজানা পথ
উঠে—পড়ে—কেহ ফিরে চায় ।

সে যে শান্তিময় স্থান, চির সুধানন্দধাম
কোটী কোটী জীবের নিবাস ;
সেথা নিশি দিন কত, অণু পরমাণু মিশি
হইতেছে প্রাণীর বিকাশ ।

মনের অগম্য স্থান, না পশে কল্পনা তথা
কি যেন আঁধারে আবরিত ;
জড়েতে মিশিয়া শক্তি, শক্তিতে ব্যাপিয়া জড়
যুগ যুগ হ'তে অবস্থিত ।

অই যে বিহগগুলা, অই পশু পতঙ্গম
ছুটে সেই অনন্তের মুখে ;
ডেকে যায়—বলে যায়, চল্ চল্ চল্ সবে
মিশিবারে অনন্তের বুকে !

সর সর ছাড় পথ, কে অই প্রাচীন আসে ?
থর-থর কম্পিত সঘন ;
অই বুঝি পড়ে গেল, অই যষ্টি ভর দিয়ে—
ট'লে ট'লে করিছে গমন !

অই পাশে শিশু যুবা, কাণা খোঁড়া বোবা কালা
নর নারী পাশাপাশি যায় ;
হ্যাঁগা তোরা কোথা যাবি? যেথা হ'তে এসেছিস্
যাস্ বুঝি সকলে তথায় !

অই নদী ছুটে যায়, কি বলে তরঙ্গগুলা
সিকতায় খাইছে আছাড় ;
কি ভীষণ খর স্রোত, অনিবার এক টান
মুহুর্মুহু ভাঙ্গিছে দুধার ।

কোথা ভেঙ্গে নিয়ে যায়, কোথায় বা ছুটে যায়
ভাঙ্গে ছুটে অনন্ত বৎসর;
তবু কই থামে না ত, বহু দূর যাবে বুঝি
সেথা কাল অনন্ত সাগর!

ভাসিব ভেসেছি আমি, অই স্রোতে ভেসে যাব
নীরবেতে থাকিব না আর;
উঁহু বুঝি হল না রে, কে যেন টানিল পাছে—
সর—এযে মায়াডুরি কার!

কে তুই পাষাণ প্রাণ,—কোমল দেহের মাঝে
একি খেলা!—কি ছল প্রেয়সি?
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, খুলে দাও মায়া-বাঁধ
আমি যে রে বিষম উদাসী!

সরে যাও সরে যাও, কেন কাঁদ পায়ে ধরে
নয় চল দুজনায় যাই;
দুই জনে ভেসে যাব, একেলা কি যাওয়া যায়
তুমি আমি কিছু ভিন্ন নাই।

উঠ তবে ত্বরা করে, ছিঁড়ে ফেল মায়াডোর
—মায়াবদ্ধ পরাণ নিশ্চল;
ভাঙ্গ তবে পদাঘাতে, সাধের কুটীর খানি
বেলায়—বেলায়—চল্ চল্।

না না তুই পারিবি না, মিছামিছি এত দেরি—
থাক তবে পড়ে থাক পাছে;
শতেক বাঁধনে বাঁধা, সংসারে রমণী-প্রাণ!
শিশুগুলি আসে পাছে পাছে।

দূর হ রে মায়াপাশ! হাতে গলে কেন ধর?
আমি কেহ নহেক তোদের;
কেবা কার ভ্রাতা বল, কেবা ভগ্নী কেবা সখা—
কি বিষম ছলনা এদের!

ছাড় ছাড় রে সংসার, পাতিয়া সুখের হাট
কেন পথ আছ আগুলিয়ে;
বহু দূর—বহু দূর—এখন যে হবে যেতে
দে দে পথ ত্বরায় ছাড়িয়ে।

অই দেখ রবি তারা, অসীম গগন বয়ে—
ভেসে ভেসে কোথা ছুটে যায়;
নিতি উঠে—নিতি ছুটে, এক মনে চলে যায়
তবু পথ নাহিক ফুরায়।

আমিও ত যা'ব ভাই, এখন আলোক আছে
এই বেলা ধীরে ধীরে যাব;
এর পরে আঁধারেতে, আরো দিশা হারা হ'ব—
কোথা পথ কাহারে শুধা'ব!

জীবন তপন মম, মরণ আঁধার মাঝে
গেছে আজ আধেক ডুবিয়ে;
তরল মেঘের মত, বাকীটুকু ছেঁড়া ছেঁড়া
মায়া-ঘোরে রয়েছে মিশিয়ে!

অই যে ফুটেছে ফুল, বৃন্তেতে বসিয়া কীট
কাটিয়াছে আধেক তাহার;
এ দেহ-কুসুমে পাপ, জীববৃন্তে বসে বসে
কত খানা কেটেছে আমার!

শুখায়ে শুখায়ে শেষে, কোন অনন্তের দেশে
ঐ ফুল মিশিবে ত্বরায় ;
ধূলার এ ছার দেহ, ধূলি হয়ে মিশে যাবে—
ধীরে ধীরে অনন্ত ধূলায় !

অই—অই অই হোথা, তটিনীর খরস্রোতে
ফেঁপে ফেঁপে ক্ষুদ্র জলকণা
উঠিয়ে মিলায়ে গেল ! অমনি মিশিবে প্রাণ
হা হা হরি ! একি হে যাতনা !

এই দেখ এই দেখ, শিশিরের বিন্দু কত
হেথা পড়ে তপনে মিশায় ;
অনন্তের দেশে যেতে, বুঝি তরু কেঁদে কেঁদে
অশ্রুকণা ফেলেছে হেথায়।

ডালে ডালে মিশামিশি, লতায় পাতায় প্রেম
পত্রে পত্রে অনন্ত চুম্বন ;
আজি দেখ শুষ্ক তরু, ছিঁড়েছে লতার প্রেম
কেন ভূমে করেছে শয়ন ?

নশ্বর সে কিশলয়, আহা কত মনোহর
আজি কেন গিয়াছে শুখায়ে ;
শাখা হ'তে ভূমে পড়ে, ধূলায় মিশায়ে প্রাণ
যায় বুঝি অনন্তে মিশায়ে !

তবে আমি কাঁদিব না—তাওত' পারিনে আর
চল্ প্রাণ ছুটে ছুটে যাই ;
সবাই চলেছে দেখ্, তুইত একেলা নোস
বিলম্বেতে কোন ফল নাই।

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

বেদ।

(৩।)

এইরূপ আমাদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্রসমূহে অনেক স্থলে বেদের অসীম সম্মান লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতিই নিয়মপূর্ব্বক প্রথমে বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে স্ব স্ব বৃত্তি অনুরূপ অপর অপর শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতেন। নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন না করিলে দ্বিজাতিদিগের দ্বিজত্ব বিলুপ্ত হইত। মনু বলিতেছেন—

যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু-গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে দ্বিজাতি বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অপর শাস্ত্রে পরিশ্রম করে সে ইহ জীবনেই আপনার বংশের সহিত অবিলম্বে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

বেদাধ্যয়নই দ্বিজাতির দ্বিজত্বের প্রতি কারণ, যে দ্বিজাতি অবহেলা, ক্রমে বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনায়াসবোধ্য অপর শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি জীবিত অবস্থাতেই স্বয়ং শূদ্র হয়েন এমন নহে, তাঁহার সন্তান সন্ততি প্রভৃতি ভাবী বংশপরম্পরাও তাদৃশ অধোগতি লাভ করে। ইহার দৃষ্টান্ত জাজ্বল্যমান। এই ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে বেদাধ্যয়নের চর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থানেই দ্বিজাতিগণের শূদ্রত্ব লাভ

হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগের পর কুলের অধস্তন পুরুষেরা ক্রমশঃ সন্ধ্যা গায়ত্রী অবধিও পরিত্যাগ করে। ক্রমে পিতৃ পিতামহের উপর সন্ধ্যা গায়ত্রী জ্ঞানের ভার অর্পণ করিয়া চতুর্ব্বেদীয় পুত্র "চৌবে" হন। কেবল তাহা নহে, শূদ্রবৎ নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র ঘৃণা বা লজ্জা বোধ করেন না। কেহ বা দীর্ঘ যষ্টি স্কন্ধে করিয়া যে কোন জাতীয় ধনীর দ্বারপালত্বেও সম্মানের কার্য্য মনে করেন, কেহবা তদপেক্ষাও হীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এইরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রও বানরজী রূপ ধারণ পূর্ব্বক বাপ দাদার উপর সন্ধ্যা গায়ত্রী জানার ভার দিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইয়া জুতার দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন। আরও কত কি করিতেছেন, বোধ হয় সে সকল কার্য্য করিলে শূদ্রও জলাচরণীয় হয় না।

আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যদি এখনও সেই পুরাকালের মত বেদাভ্যাসের চর্চ্চা থাকিত, তাহা হইলে কখনই বর্ত্তমান সময়ে বর্ণাশ্রমচারীদিগের মধ্যে যেরূপ সমাজবিপ্লব, ধর্ম্ম বিপ্লব এবং আচারবিপ্লব ঘটিয়াছে, তাহা ঘটিত না। বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল সন্ধ্যা গায়ত্রীর বন্দনা দ্বারা দ্বিজত্ব রক্ষা অনেক কাল অবধি হইতে পারে না। কারণ সন্ধ্যা গায়ত্রীর উপাসনার মন্ত্র সকল বেদমন্ত্র। বেদাধ্যয়নের নিবৃত্তির সঙ্গে উহাদিগের অর্থবোধ এবং উচ্চারণ-ক্রমজ্ঞানও নিবৃত্তি পায়, ক্রমশঃ উহারা ভূতের বা ডাইনের মন্ত্রের মত হইয়া উঠে। সুতরাং কালক্রমে উহাদিগের উচ্চারণ ভূতের ব্যাগার বলিয়া বোধ হয়। কাজেই যাহাদের বুদ্ধির একটু চাঞ্চল্য আছে, তাহারা আর সেরূপ ভূতের ব্যাগার দিতে ইচ্ছা করে না, একেবারেই সন্ধ্যা গায়ত্রী পরিত্যাগ করিয়া বসে। সন্ধ্যা গায়ত্রী পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য থাকে না। ফল বেদই বর্ণাশ্রমাচারের মূল ; সেই বেদকে পরিত্যাগ করিয়া বর্ণাশ্রমাচার কিরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারে ? তাই বলি, ভগবান মনু যথার্থইবলিয়াছেন বেদাধ্যয়ন ব্যতীত দ্বিজাতির দ্বিজত্ব রক্ষা করিবার আর কোন উপায় নাই। বিশেষ ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদাধ্যয়ন না করা অতীব শাস্ত্রগর্হিত। দেখ এ বিষয় মনু কি বলিতেছেন—

> ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন বন্ধুভিঃ।
> ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ সনো মহান্॥

প্রাচীন ঋষিগণ এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে আমাদের মধ্যে বয়সের আধিক্যে, কেশের শুভ্রতায়, ধনাধিক্য হেতু বা অনেক বন্ধুবত্তা প্রযুক্ত কেহ মহৎ বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু কেবল যে ব্যক্তি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিবে সেই মহৎ বলিয়া গণ্য হইবে। সেই আদি কালের ঋষিগণের এই রূপ নিয়ম করিবার তাৎপর্য্য বোধ হয় সহৃদয় পাঠকমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় আর কিছুই নয় ; যাহাতে বেদাধ্যয়ন বিলুপ্ত না হয়,—প্রত্যুত পরম আগ্রহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, এই নিমিত্তই মহর্ষিগণ এই নিয়ম করিয়াছেন। আমরা মানবগণের চিত্তবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিয়া স্পষ্টই জানিতে পারি যে মনুষ্যের যত কিছু

উদ্যম, যত কিছু আশা এবং যত কিছু কার্য্য এতৎ সমুদয়েরই এক মাত্র উদ্দেশ্য আত্মোৎকর্ষ লাভ; আপনি বড় হইব, আপনি শ্রেষ্ঠ হইব, গুণিগণের গণনায় আমার নামেই অগ্রে কঠিনীপাত হইবে, এই একমাত্র উদ্দেশ্যে মনুষ্যের প্রবৃত্তি, চেষ্টা ও কার্য্য হইয়া থাকে। তাই মহর্ষিগণ নিয়ম করিলেন যদি আমাদের মধ্যে কেহ মহৎ হইতে চাও, তবে তোমার প্রবৃত্তি চেষ্টা এবং ক্রিয়া এ সকল বেদাধ্যয়নে প্রযুক্ত কর। যিনি সাঙ্গ বেদের অধ্যয়ন করিবেন, তিনি ধনহীন দীন দরিদ্রই হউন, আর বন্ধুহীন অনাথি হউন, আর অল্প বয়স্ক বালকই হউন, আমরা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিব, আমরা তাঁহাকে প্রধান বলিয়া মান্য করিব এবং গুণিগণের গণনায় আমরা তাঁহার নামেই অগ্রে কঠিনীপাত করিব। কিন্তু বেদাধ্যয়ন না করিয়া যদি তুমি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর একেশ্বর হও, সমুদয় জগৎ তোমার আত্মীয় বন্ধু হয়, তথাপি আমরা তোমাকে মহৎ বলিয়া গণ্য করিব না। আরও দেখ।—

> যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
> যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥

যেমন কাঠের হাতী, চামের হরিণ, বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত ব্রাহ্মণও তেমনি, ইহারা কেবল নামধারী মাত্র। কাটের হাতী যেমন নামে হাতী, চামের হরিণ যেমন নামে হরিণ, তেমনি বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত ব্রাহ্মণও নামে ব্রাহ্মণ। বেদাধ্যয়নশূন্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য যজনযাজন প্রভৃতি কোন কার্য্যই করিতে সক্ষম হয় না, তবে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলিয়া ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হয় মাত্র। পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাত আছেন আমাদের পুরোহিতগণ শ্রাদ্ধাদি করাইতে করাইতে বৈদিক মন্ত্র পাঠের সময় মন্ত্রগুলিকে একে বারে কিরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলেন। শুধু কি তাই? "বোধনের" স্থানে "রোদন" পাঠ করিয়া কত যে অনর্থ ঘটান তাহা কে বলিতে পারে।

মনু আবার কি বলিতেছেন দেখ,—

> 'যথাষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গোর্গাবিনিষ্ফলা।
> যথাচাজ্ঞে ফলংদানং তথাবিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥'

ক্লীব পতি যেমন স্ত্রীর নিকট নিষ্ফল, স্ত্রীগরু যেমন স্ত্রীগরুর নিকট নিষ্ফল, মুর্খে দান যেমন নিষ্ফল, তেমনি বেদজ্ঞানশূন্য ব্রাহ্মণও নিষ্ফল। অর্থাৎ বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত ব্রাহ্মণের নিকট ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কোন কার্য্যেরই সিদ্ধির আশা করা যাইতে পারে না। বেদাধ্যয়ন-বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ বাহিরে হাজার ত্রিকচ্ছ ত্রিপুণ্ড্র প্রভৃতি সুব্রাহ্মণের চিহ্ন ধারণ করুক না কেন কার্য্যকালে তাঁহার সকলই নিষ্ফল।

এইরূপ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই বেদাধ্যয়নপরাঙ্মুখের নানা প্রকার নিন্দাবাদ শুনিতে পাই। বস্তুতঃ হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র পরম্পরা সমালোচনা করিলে বেদ যে হিন্দুদিগের পরম যত্নের সামগ্রী ইহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

যেমন খৃষ্টানের বাইবল, মুসলমানের কোরাণ, হিন্দুর পক্ষে বেদও সেইরূপ পবিত্র ও পূজনীয় পুস্তক। এই বেদ হইতেই হিন্দুর হিন্দুত্ব। দেখ মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা, পঞ্জাব এবং হিন্দুস্থান প্রভৃতির অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার, আকৃতি

প্রকৃতি ইত্যাদি পরস্পর এরূপ বিভিন্ন যে, তাহাদিগকে দেখিয়া একধর্ম্মী বলিয়া বোধ করিবার কিছুই নাই, অথবা একদেশীয় মনুষ্যদিগের মধ্যেও শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ভেদে আচার ব্যবহার এরূপ বিভিন্ন যে, তাহা দেখিলেই পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মাচারী বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এরূপ স্থলে উহারা সকলে যে এক হিন্দু নামে অভিহিত হইতেছে, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল বেদের গৌরব। কেন না যাহারা এই বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু বলিয়া অভিহিত হয়, তাহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র বিষয়ের অনৈক্য থাকিলেও এক বিষয়ের ঐক্য আছে। কি পাঞ্জাবী হিন্দু, কি মাদ্রাজী হিন্দু, সকলেই বেদকে আপন আপন ধর্ম্মের মূল বলিয়া স্বীকার করেন। শাক্ত, বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর ঘোর মারামারি চুলোচুলি প্রচলিত থাকিলেও উভয়ের ধর্ম্ম বেদানুগত। আর এক কথা, হিন্দু খোট্টাই হউক, আর বাঙ্গালী হউক, শাক্তই হউক, আর বৈষ্ণবই হউক সকলেরই দশ প্রকার সংস্কার হইয়া থাকে, ঐ সংস্কারগুলি আবার একমাত্র বেদমন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হয়। এইটুকুমাত্র ঐক্য থাকাতেই উঁহারা সকলেই হিন্দু বলিয়া অভিহিত হয়। তাই বলি বেদ হইতে হিন্দুয়ানী, হিন্দুয়ানীর মূল বেদ, সুতরাং যদি কেহ হিন্দু নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন এবং মনে মনে যাহাতে হিন্দু ধর্ম্মের বিলোপ না হয় এরূপ যত্ন করেন, তাঁহার সর্ব্বতোভাবে বেদের গৌরব করিতে শিক্ষা করা উচিত। কারণ বেদই হিন্দুর ধর্ম্মের মূল, এবং বেদই হিন্দু কর্ম্মের উপদেষ্টা। হিন্দুর গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অবধি যাবতীয় কর্ম্ম বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। হিন্দুর ঐহিক পারত্রিক নিত্য নৈমিত্তিক সকল প্রকার কর্ম্মই বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদ হিন্দুর পিতা-মাতা, বেদ হিন্দুর মন্ত্রদাতা এবং বেদই হিন্দুর অধ্যাপক। বেদ হিন্দুকে আহার বিহার করিতে শিক্ষা দেন, বেদ হিন্দুকে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে শিক্ষা দেন, এবং বেদই হিন্দুকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়া থাকেন। বেদ লইয়াই হিন্দুর হিন্দুত্ব এবং বেদ হইতেই হিন্দুজীবনের অস্তিত্ব। অধিক কি বলিব, কেবল বেদ ছিল বলিয়াই শত শত রাষ্ট্রবিপ্লব, শত শত সমাজবিপ্লব, এবং শত সহস্র ধর্ম্মবিপ্লবের পরও এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও হিন্দুর হিন্দুত্ব প্রলয়পয়োধিজলের অন্তঃস্তলে বিলীন হয় নাই। ইহাতেই বুঝিয়া লও প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে বেদ কিরূপ আদরের বস্তু।

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

মর্ম্মকথা।

২।

আঁধারে অনেক কাল আমরা কাটাইয়াছি, এখন আশার একটু ক্ষীণালোক পূর্ব্বদিকে যেন দেখা দিয়াছে। নিদ্রার ঘোরে অনেক দিন মগ্ন ছিলাম, এখন জাগরিত হইয়া না বসি—ঘুমের ঘোরটা কাটিয়া গিয়াছে। পাশমোড়া দিয়া, হাই তুলিয়া, চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিতেছি, দিনদেব দেখা দিলেন কি না। দিনদেব এখনও দূরে আছেন, অরুণোদয় পর্য্যন্ত হয় নাই; অন্ধকার এখনও তাল পাকাইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তবে অন্ধকার পাৎলা হইয়া গিয়াছে. অন্ধকার চঞ্চল হইয়াছে—তিমিরনাশনের ভয়ে ভীত হইয়া অন্ধকার যেন পলাইবার পথ দেখিতেছে। কদাচিৎ কোন বিহঙ্গম বৃক্ষনীড়ে মধুর কূজন করিয়া প্রভাতবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। সেই কলকণ্ঠ কাণে পশিয়াছে বলিয়াই ত আমরা আধ-সন্দিগ্ধ, আধ-বিশ্বস্ত,আধ-নিদ্রিত, আধ-জাগরিত হইয়া চাহিয়া দেখিতেছি রজনী প্রভাত হইল কি না।

প্রভাত না হউক, ঊষার আলোকে জগৎ আলোকিত না হউক, যামিনী কিন্তু শেষ হইয়া আসিয়াছে, শুকতারা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—যামিনীর এই ত শেষ প্রহর বটে। এই শেষ প্রহরে শিবাকুল মিলিত হইয়া তারস্বরে অশিব চীৎকার করিয়া শেষ ডাক ডাকিয়া লইতেছে। নিশাচর প্রাণী শশব্যস্তে সঞ্চরণ পূর্ব্বক শেষ শিকার সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেছে। কালপেচকের হতাশাজড়িত কর্কশকণ্ঠ মধ্যে মধ্যে শ্রবণে পশিয়া কর্ণকুহরে শেলবিদ্ধ করিতেছে।

ভাষার অলঙ্কারে অনেকেই বিরক্ত হইবেন, কিন্তু আমাদের অবস্থা এখন অনেকটা এইরূপই কি না বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমাদের জাতীয়ত্ব ও জাতীয় ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার ভিন্ন যে উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এ কথা অল্পে অল্পে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। উন্নতির চেষ্টা অনেক কাল হইতেই চলিতেছে, কিন্তু কোন্ পথে গেলে ঊর্দ্ধে উঠা যাইবে, তাহার সন্ধান ত পাওয়া যায় নাই। সুরাসেবন না করিলে গায়ে বল হয় না, গোমাংস না খাইলে বীরত্ব জন্মে না, যীশু খৃষ্ট না ভজিলে স্বর্গ লাভ হয় না, এ সকল কথাও উন্নতির পরিচায়ক বলিয়া আমাদের দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। কদাচিৎ কোন ভ্রান্ত যুবক, কদাচিৎ কোন দুগ্ধপোষ্য বালক পাদ্রীজীর কুহকে পড়িয়া যীশুখৃষ্ট ভজিয়াছে বটে; কিন্তু ইংরাজী পড়িয়া, নিজের বিদ্যায় অবহেলা করিয়া, স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধাভক্তি একদা প্রায় সকলেই হারাইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রাদুর্ভাবে এইরূপ একটা উৎপাতবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। সে দিন বড় দুর্দ্দিন গিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে দিন আর এখন নাই। সে সময় ইংরাজী বিদ্যায় যাঁহারা পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা করিতে জানিতেন না,

যাঁহারা রাজকার্য্যে উচ্চপদস্থ ছিলেন, তাঁহারাও জাতীয়ভাবে উপেক্ষা করিয়া আপনাদিগকে সম্মানিত বলিয়া মনে করিতেন।

এই বৃথা গৌরব, বৃথা পাণ্ডিত্যের দিন এখন গিয়াছে। স্বধর্ম্মে গৌরব আছে, হিন্দুত্বে গৌরব আছে, স্বজাতি-ভক্তিতে গৌরব আছে, এ কথা এখন আমরা স্বীকার করিতে শিখিয়াছি। আমরা বলিতে শিখিয়াছি যে হিন্দুধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, হিন্দু জাতিই জগতে সভ্যতার নিদর্শন, হিন্দু জাতিই জগতের আদিম সভ্যজাতি। জাতিভক্তি দেশভক্তি ও স্বধর্ম্মানুরাগের কথা এখন গভীর কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বিঘোষিত হইতেছে বটে, কিন্তু কথাগুলা মুখে যেমন বলা হইতেছে, কাজে তেমন ফলিতেছে না। প্রথম প্রথম এইরূপই হইবে। ইহাতে হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই, আশা করিবার পথ আছে। প্রথমে গর্জ্জন তাহার পর বর্ষণ ; প্রথম বাগ্‌যুদ্ধ, তাহার পর হাতাহাতি। কিন্তু গর্জ্জনের অধিক ঘটা হইলে অনেক সময় বর্ষণ বড় ফলে না ; কার্য্যারম্ভে আড়ম্বরের আধিক্য হইলে, আসল কাজে হানি হইয়া থাকে। সংস্কৃতে কথা আছে—

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥

ছাগলের লড়াই কেবল লাফালাফি সার হয়, মেড়ার মত তাল-ঠুকাঠুকি বড় হয় না। ঋষি তপস্বীর শ্রাদ্ধকার্য্যে খোলাকাটার ধূমটা খুব. আহার উৎসবের আয়োজন নাই বলিলেই হয়। আর স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব যখন আরম্ভ হয়—তর্জ্জন গর্জ্জন, রোদন নিঃশ্বাস প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয়, এ দুয়ে এবার চিরবিচ্ছেদ হইল, মিলন বুঝি আর ইহজন্মে হইবে না। রমণী রাগ করিয়া শয়ন করিলেন, স্বামী মুখভার করিয়া প্রতিবেশীর ভবনে গিয়া তাম্রকূট সেবনে মগ্ন হইলেন। ঘণ্টা দুই বাদে উভয়ে মিলিত হইয়া যেন অনিচ্ছায়, যেন কোন বিশিষ্ট প্রয়োজনে মৃদু মৃদু কি কথা হইল কে জানে? পর দিনে আর কোন চিহ্ন নাই, কল্যকার বিবাদ যেন চারি যুগ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, যেন উভয়ে কোন কথান্তর কখনও হয় নাই। আমাদের এখন ভয়, আমাদের উন্নতির গর্জ্জনটা কেবলমাত্র গর্জ্জনেই পর্য্যবসিত না হয়।

কাজ কিন্তু এখন অতি অল্পই হইতেছে। একটা জাতীয় অভ্যুত্থান কেবল কথায় হয় না। কেবল বাজে কথায় যেমন একটা মানুষকে মানুষ বলিয়া ধরা যায় না, তেমনি কেবল বাজে বক্তৃতায় একটা জাতিকে জাতি বলিয়া গণ্য করা যায় না। আমি মুখে বলিতেছি আমি হিন্দু, আমি উন্নত, আমি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তোমার মুখের জাঁকে লোকে মানিবে কেন? তুমি যে হিন্দু—তোমার হিন্দুত্ব সংস্থাপন কর ; তুমি যে উন্নত—তোমার উন্নতির পরীক্ষা দাও; তুমি যে শ্রেষ্ঠ—তোমার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন দেখাও। তুমি হিন্দু—তবে শাস্ত্রবিহিত সদাচারে তোমার নিষ্ঠা নাই কেন? তুমি উন্নত, তবে পেটের দায়ে পরের চরণে তুমি মাথা হেঁট করিয়া রহিয়াছ কেন? তুমি শ্রেষ্ঠ, তবে নীচের সহিত তোমার এত মাখামাখি কেন? তুমি দেশভক্ত,তবে দেশের মায়া কাটাইয়া বিদেশে বাস করিয়াছ কেন? তুমি স্বজাতিভক্ত,

তবে বিজাতীয় বেশে ভূষিত হইয়া আমাদের কাছে পর সাজিয়া রহিয়াছ কেন? তোমার মুখের কথা সব ফাঁকা হইয়া গেল। কাজে ত কৈ কিছুই ফলিল না।

জাতীয় উন্নতি ব্যক্তিগত চেষ্টায় হয় না। এক জনের বুদ্ধিতে হইতে পারে, এক জনের চেষ্টায় হয় না। একজন পথপ্রদর্শক হইতে পারেন, কিন্তু সকলের সে পথে চলা চাই। সমগ্র জাতির সংমিলিত চেষ্টায় জাতীয় উন্নতি হইতে পারে। সে চেষ্টা আমাদের এখনও হয় নাই, কার্য্যারম্ভ এখনও হয় নাই বলিলেই হয়। ঘণ্টা বাজিয়াছে, ট্রেন এখনও চলে নাই; নিশান উড়িয়াছে, বিষাণ এখনও বাজে নাই। সমগ্র জাতি যে এক সঙ্গে মিলিয়া একটা চেষ্টা করিবে, একটা কাজ করিবে, তাহাদের সকলেরই লক্ষ্য একটা থাকা চাই, সকলের স্বার্থ সমান থাকা চাই,সকলের উদ্দেশ্য এক হওয়া চাই। সমগ্র জাতির একপ্রাণতা না হইলে, জাতীয় শক্তি-সমষ্টি সংমিলিত না হইলে, জাতীয় উন্নতি হইবে কেন? একপ্রাণতা কিসে হইবে? এক ধর্ম্ম, এক কর্ম্ম, একভাষা, এক পরিচ্ছদ, এক আচার, এক নীতি এ সকলের একতা না থাকিলে একপ্রাণতা হইবে কেন? ধর্ম্মই এ সকলের মূল, ধর্ম্মের বন্ধন এক হইলেই আর সকল বন্ধনই একসঙ্গে মিলিবে। হিন্দুধর্ম্মের আবার এমনি মহিমা যে, ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই, ধর্ম্মের শাসন মানিলেই,আর সকল দিকেরই পথ নির্ণয় করা যায়। ধর্ম্ম প্রতিপদেই তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। তোমাকে ভাবিতে হইবে না, তোমাকে কষ্ট করিতে হইবে না; তুমি ধর্ম্মের উপদেশ লইয়া সচ্ছন্দে চলিয়া যাও, ইহপরকালের মঙ্গল বিধানে ধর্ম্ম তোমার সমান সহায়। জাতীয় উন্নতির সাধনকল্পে এই ধর্ম্মকেই আমাদের একমাত্র অবলম্বন করা চাই। সনাতন ধর্ম্মের শরণাগত হইলেই সমগ্র জাতি আবার একপ্রাণে সংমিলিত হইবে।

ধর্ম্মের বন্ধনে জনে জনে সংবদ্ধ হইলেই সমাজ আপনা আপনি সুসংবদ্ধ হইবে, সমাজের নষ্টশক্তি পুনরাবির্ভূত হইবে। কিন্তু ধর্ম্মকে প্রাণপণে কায়মনোবাক্যে সেবা করা চাই, মুখে মুখে ভজনা করিলে চলিবে না, ভণ্ডামী করিলে চলিবে না। আর সকলেই স্ব স্ব মতবাদ প্রচার করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্মচ্ছেদ করিলে চলিবে না। আমাদের ধর্ম্ম আমাদের শাস্ত্রেই আছে, ইংলণ্ড বা জর্ম্মানী হইতে তাহার ব্যাখ্যা আনিতে যাইও না। যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে —শাস্ত্র আছে, ভাষ্য আছে, টীকা আছে, ব্যাখ্যা আছে, পণ্ডিত আছেন, গুরু আছেন; সচ্ছন্দে অধ্যয়ন কর, সচ্ছন্দে আলোচনা কর, জ্ঞানলাভ হইবে। কিন্তু হবিষ্যান্নে পলাণ্ডুরস মিশ্রিত করিও না, ক্ষীরের পাত্রে সুরার ধারা ঢালিও না, মিষ্টান্ন কষায়সংযোগে ভক্ষণ করিও না। তাহা হইলে আস্বাদ বুঝিবে না, ভোজনের উদ্দেশ্য বিফল হইবে।

আর এক কথা, অহিন্দু অপণ্ডিত ভণ্ড পাষণ্ডদিগকে সমাজের শিরে বসাইয়া ধর্ম্মের শাসনভার তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিও না। ভণ্ডদিগের জন্যই ধর্ম্ম লোপ

হয়, ভণ্ডদিগের জন্যই সমাজ ধ্বংস হয়, ভণ্ডদিগের জন্যই লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয়। ভণ্ড তোমাকে সদাচারের উপদেশ দিয়া, আপনি গিয়া লুকাইয়া পরের উচ্ছিষ্ট খাইয়া আসে; ভণ্ড তোমার কাছে টীকি নাড়িয়া পরের চরণে উষ্ণীষ ঠেকাইয়া সেলাম করে; ভণ্ড তোমাকে বোধনের বিধান দিয়া অপরের কাছে বলে—ওঠা কোন কাজের কথা নয়; ভণ্ড তোমার কাছে ব্রাহ্মণত্বের গৌরব করিয়া ম্লেচ্ছের দাসত্বে জীবন যাপন করে; ভণ্ড তোমার মাথায় পা দিয়া অপরের পদধূলি আপনার মাথায় মাখে; ভণ্ড তোমাকে নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া, আপনার স্বার্থ সাধন জন্য স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। হিন্দুসমাজ এবম্বিধ ভণ্ড পণ্ডিতের কথায় যেন পরিচালিত না হয়।

স্বার্থপরতা।

স্বার্থপরতাকে আমরা মানবজাতির একটী নীচ প্রবৃত্তির মধ্যে গণনা করিয়া থাকি। অমুক লোক স্বার্থপর বলিলে আমরা এই বুঝি যে সে কেবল নিজের সুখের অন্বেষণ করিতেছে, অন্য কাহারও সুখের অন্বেষণ করিতেছ না; এবং নিজের সুখের জন্য হয়ত অন্যের সুখের হানিও করিতেছে। বাস্তবিক সমাজস্থ সকলেই নিজ নিজ সুখান্বেষণ করিতে সমান অধিকারী। একজন অপরের সুখের হানি করিলে অবশ্যই সমাজের ক্ষতি হয়, কারণ তাহা হইলে আর সমাজে শান্তি থাকিবে না। সুতরাং একজন অপরের সুখের হানি করিতে পারিবে না ইহাই সমাজের একটী প্রধান নিয়ম। সকলেই নিজ নিজ সুখের অন্বেষণ করুক তাহাতে সমাজের শান্তি বৃদ্ধি হইবে বই হ্রাস হইবে না। কিন্তু কেহই নিজের সুখের জন্য অপরের অনিষ্ট করিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি নিজের সুখকে তুচ্ছ করিয়া সমাজস্থ অপরাপর লোকের সুখবর্দ্ধন করিতেছে সমাজ তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিতেছে, সমাজ-বন্ধু বলিয়া তাহার কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের সুখের জন্য সমাজস্থ অপরাপর লোকের সুখের হানি করিতেছে সে সমাজের শত্রু বলিয়া পরিচিত হইতেছে। যে ব্যক্তি কেবল নিজের সুখের অন্বেষণ করিতেছে অপরের সুখের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিতেছে না, সমাজ তাহাকে স্বার্থপর বলিয়া ঘৃণা করিতেছে। বস্তুতঃ একটী লোক যদি স্বার্থপর বলিয়া পরিচিত হয় তাহা হইলে সে সকলেরই ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমেই হউক, সমাজ সকলের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না বলিয়া অনেককে স্বার্থপর হইলেও নিস্বার্থপর বলিয়া প্রশংসা করিতেছে। বাস্তবিক নিস্বার্থপর লোক জগতে নাই। ফলমূলাহারী সংসারত্যাগী তপীস্বই হউন আর পুত্রদারাদিবেষ্টিত গৃহস্থই হউন নব

প্রসূত শিশুই হউক আর ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মৃতপ্রায় বৃদ্ধই হউন, সন্তানবৎসল মাতাই হউন, আর পতিপ্রাণা স্বাধ্বী সতীই হউন, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই স্বার্থপর। মাধ্যাকর্ষণ যন্ত্র যেরূপ যতই বিচালিত হউক না কেন একই নির্দ্ধারিত দিক লক্ষ্য করিয়া থাকে, সেইরূপ সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া আছে। কেহ, এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীয় সুখান্বেষণে বিরত হন না। কেহ শারীরিক, কেহ মানসিক কেহ ঐহিক কেহ বা পারত্রিক সুখের অন্বেষণ করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে সকলেই স্বার্থপর কেহই নিস্বার্থ-পর নয়। যে ব্যক্তি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত তপস্যায় ব্যাপৃত আছেন, ইহ জন্মের সুখের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করেন না, শারীরিক কোন কষ্ট সহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন না, তিনিও স্বার্থপর; কারণ তিনি পালৌকিক সুখের অন্বেষণ করি-তেছেন। তাঁহার বিবেচনায় ধনমান প্রভৃতি কিছুই সুখেরই বস্তু নয়। ক্ষণস্থায়ী ঐহিক সুখ অপেক্ষা অক্ষয় পারলৌকিক সুখ অধিক প্রার্থনীয়। সুতরাং তিনি ঐহিক সুখাভি-লাষী না হইয়া পারলৌকিক সুখান্বেষণ করিতেছেন। যিনি জগতে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ও নিঃস্বার্থপরোপকারী বলিয়া প্রশংসিত, তিনিও ঐহিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া কেবল পারলৌকিক সুখের জন্য ব্যস্ত। বিশ্বাস ও শিক্ষা বশতঃ তিনি মনে করেন যে ইহ জন্মে পরোপকার করিলে পরজন্ম তাহার বিশেষ ফল পাইবেন, অথবা ইহকালে নিজ ক্ষণিক সুখ হইতে বিরত হইয়া পরোপকার করিলে পরকালে স্বর্গলাভ করিয়া অবিচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে পারিবেন। যিনি নিতান্ত ধর্ম্মভীরু তাঁহার বিশ্বাস যে যদি তিনি পরো-পকার না করেন তাহা হইলে ঈশ্বর তাঁহাকে পরলোক বিশেষ শাস্তি দিবেন। নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই অনেকে অতিথিশালা, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন ও দরিদ্রদিগকে ধন বিতরণ করিয়া থাকেন। অতএব যিনি পারলৌকিক সুখের আশয়ে ঐহিক সুখ ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নন অথবা পরোপকার করেন তাঁহাকে নিঃস্বার্থপর বলা যাইতে পারে না। তিনি পরোপকার করি-তেছেন বটে কিন্তু কেবল নিজের পারলৌ-কিক সুখের জন্য। বস্তুতঃ অন্য কাহারও সুখের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন না, নিজেরই সুখের অন্বেষণ করিতেছেন। মানবজীবনের যে কি উদ্দেশ্য তাহা এখনও ঘোর তমসাচ্ছন্ন থাকিবে। ফলতঃ যে দিন ঐ উদ্দেশ্য স্পষ্ট রূপে নির্দ্ধারিত হইবে সেই দিন হইতেই কিন্তু মানবজীবনধারণ সুখের কারণ হইবে না। যাহা হউক এক্ষণে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যে ব্যক্তি ঐহিক সুখ তুচ্ছ করিয়া দিবারাত্র নিজের পালৌকিক সুখ ধ্যান করিতেছেন তিনি কখনই জগতে নিঃস্বার্থপর বলিয়া বিদিত হইতে পারেন না। ভবিষ্যতে অপরের নিকট এবং উপকৃত লোকের নিকটও উপকৃত হইতে পারিব বলিয়াও অনেকে পরোপকার করিয়া থাকেন। অনায়াসে শত্রুর প্রতি বৈরনির্য্যাতন অথবা পাপকার্য্য করিতে পারি-বেন বলিয়াও অনেকে পরোপকার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অনেক পুণ্যকার্য্য করিয়াছেন তিনি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও

কোন অনিষ্ট করেন বা অন্য কোন পাপ-কার্য্য করেন তাহা হইলে লোকে হয় উহা বিশ্বাস করে না, না হয় তাহার জন্য তাঁহার উপর বিশেষ দোষারোপ করে না; অতএব ইহাঁরাও কেহ নিঃস্বার্থপর নন।

পূজনীয়া মাতা যিনি জগতে সাক্ষাৎ নিঃস্বার্থপরতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া বিদিতা, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাঁহা-কেও স্বার্থপরা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। মাতা সন্তানের জন্য অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন সত্য, তিনি সন্তানের হিতের জন্য নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারও একটি গূঢ় অভিসন্ধি আছে। স্বাভাবিক ঘটনাবশতঃ তাঁহার অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে তিনি সন্তানের সুখ না হইলে নিজে সুখ অনুভব করিতে পারেন না। সন্তানের সুখ হইলেই তাঁহার সুখ হয় সুতরাং সন্তানের সুখান্বেষণ করিলেই তাঁহার নিজের সুখান্বেষণ করা হইল। তিনি নিজ শারীরিক সুখ তুচ্ছ করিয়া কেবল মানষিক সুখের চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন। তিনি সন্তানের হিতার্থে নিজ শারীরিক সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে পারেন, কিন্তু নিজ মানসিক সুখকে একবারও মন হইতে অপসারিত করিতে পারেন না। অজ্ঞানতাবশতঃ তিনি অনেক সময়ে সন্তা-নকে তাঁহার নিজসুখ হইতে বিরত করিয়া থাকেন। সন্তান যদি কোন অসমসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে মাতা ভীতা হইয়া অনেক সময়ে তাহাকে নিষেধ করেন। যশঃ অথবা পারলৌকিক সুখের আশয়ে সন্তান যদি স্বীয় জীবনকে তুচ্ছ করিয়া কোন দেশহিত-কর কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে কয়টি মাতা তাহাতে বাধা দেন না? সন্তান যদি জীবনে হতসুখ হইয়া দুঃনিব র্য্য দুঃখের উপশম করিবার জন্য আত্মহত্যা করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে মাতা সন্তানকে নিষেধ করেন। মাতা জানেন যে সন্তানের অবর্ত্তমানে তাঁহার আর কোন সুখের আশা থাকিবে না। অতএব মাতৃ স্নেহ নিঃস্বার্থপর বোধ হইলেও তাহার মূলে স্বার্থ আছে। জগতে এরূপ স্বার্থপরতা না থাকিলে যে জগত মরুভূমে পরিণত হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা যে স্বার্থপরতা তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

দাম্পত্যপ্রণয়কে লোকে নিঃস্বার্থপরতার উদাহরণ দিয়া থাকে। বস্তুতঃ পরিণয়ে দম্পাতির মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় যে আত্মপরভেদ করিলে ঐ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া উভয়েরই অসুখের কারণ হইয়া উঠে। ফলতঃ সুখদুঃখ সংক্রামক রোগের ন্যায় নিকটস্থ লোককে আক্রমণ করে। একজন সুখী হইলেই অপরে সুখী হয়, সুতরাং অপরের সুখের অন্বেষণ করিলেই নিজের সুখের অন্বেষণ করা হইল। স্বামীকে অসন্তুষ্ট করিলে নিজের সুখের ব্যতিক্রম ঘটে বলিয়া স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। পরিচর্য্যা দ্বারা স্বামীকে তুষ্ট করিলে তাহার সুখের আশা হয়। স্বামী সেবা করিলে পরলোকে মঙ্গল হইবে বালিকাবস্থা হইতেই রমণীগণের হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হয়।

ইহজন্মে ব্রতাদি ও স্বামীপরিচর্য্যা দ্বারা পরজন্মে অশেষ গুণালঙ্কৃত স্বামীর কামনা করিয়া থাকে। সুতরাং ইহ জন্মের ও পরজন্মের সুখের আশায় স্বামীসেবা করাকে কখনই নিঃস্বার্থপর বলা যাইতে পারে না। আর সেই পতিপ্রাণা স্বামীচিতায় আত্মহত্যাকরণোদ্যতা যে সাধ্বীসতী তিনিও নিঃস্বার্থপরা নন। স্বামীর অবর্ত্তমানে তাঁহার আর কোন সুখের আশা থাকে না। জীবন ধারণ তখন তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। যাবজ্জীবন অসহ্য কষ্টে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা একেবারে দগ্ধ হইয়া সকল কষ্টের অবসান করা তাঁহার বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াই তিনি স্বামীর সহিত একচিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কাতর হন না। অতএব ঈদৃশী রমণীও নিঃস্বার্থপরা নন।

যিনি দেশহিতৈষী বন্ধু বলিয়া পরিচিত, তিনিও নিঃস্বার্থপর নন। তিনি যশের জন্য আপনার প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত নন। তাঁহার বিবেচনায় যশঃই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান, সুতরাং তিনি তাহারই অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি মনে করেন যে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া যে যশঃ উপার্জ্জন করিবেন, পরিণামে তাহা অক্ষয় হইবে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কীর্ত্তি দেশময় ঘোষিত হইবে, ঐহিক সুখাপেক্ষা ঐ যশঃই তাঁহার বিবেচনায় অধিক প্রার্থনীয়। অতএব তিনি যদি নিজের প্রাণ দিয়াও দেশের উপকার করেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে নিঃস্বার্থপর বলা যাইতে পারে না। সুতরাং এই দেশহিতৈষী বন্ধুও স্বার্থপর।

এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যিনি যে প্রণালীতেই কার্য্য করুন না কেন, কেহই এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হন না। যদিও অনেক স্থলে তিনি অপরের সুখান্বেষণ করিয়া থাকেন তথাপি তাঁহাকে নিঃস্বার্থপর বলা যাইতে পারে না, কারণ অন্যে সুখী না হইলে তিনি সুখী হইতে পরিবেন বলিয়াই পরের সুখান্বেষণ করিয়া থাকেন। সুতরাং জগতে নিঃস্বার্থপর কেহই নাই। বস্তুতঃ আমরা মাতৃগর্ভ্ভ হইতে ভুমিষ্ঠ হইয়া অবধি স্বার্থপর। একটুমাত্র সুখের ব্যতিক্রম হইলেই সদ্যোজাত শিশু ক্রন্দন করিয়া, নিকটবর্ত্তী লোকদিগকে বলিয়া দেয় যে তাহার সুখের ব্যতিক্রম হইতেছে এবং তাহারা নিজনিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাহারই সুখের জন্য নিযুক্ত হউক। ফলতঃ নিজ নিজ সুখান্বেষণ আমাদিগের একটি মানসিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত। আমরা অজ্ঞানাবস্থা হইতে যে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছি, পরিণামে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। কথিত আছে রাজর্ষি জনক তাঁহার একটী হস্ত জলন্ত অগ্নিতে ও অপর হস্ত স্ত্রীর কোমলাঙ্গে রাখিয়া দুই বস্তুর পার্থক্য বিস্মৃত হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক আমাদিগের কতকগুলি শারীরিক কার্য্য ও মানসিক বৃত্তি আছে। ঐ গুলির পরিচালনে আমাদিগের সুখ হয়, অপরিচালনে কষ্ট হয়। অনেক সময়ে ঐ গুলির পরিচালনে অপরেরও সুখ হয় এবং লোকে আমাদিগকে নিঃস্বার্থপর বলে। কিন্তু বাস্তবিক ঐ সময়ে ঐ গুলির পরিচালনা

না করিলে আমাদিগের কষ্ট হইয়া থাকে। শ্রমশীল ব্যক্তি শ্রম করিতে না পাইলে অসুখী হয়। শিশু ক্রীড়া করিতে না পাইলে সদা প্রসন্নচিত্ত থাকে না। নদীতীরস্থ সন্তরণশীল কোন ব্যক্তি একটী নিঃসহায় বালককে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জলে ঝম্পপ্রদান করিয়া বালককে উদ্ধার করিলেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের অন্নকষ্ট দেখিয়া কোন ব্যক্তি দরিদ্রদিগকে ধনবিতরণ করিলেন। এই সন্তরণশীল ব্যক্তি ও ধনবান ব্যক্তির মধ্যে কেহই নিঃস্বার্থপর নন। কারণ তাঁহারা নিজ দয়াবৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিলেন মাত্র। চুম্বক যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করে, পরদুঃখ সেইরূপ দয়ালু ব্যক্তির দয়াকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ঐ বৃত্তি প্রতিরুদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে না পারিলে তাঁহার বিশেষ মানসিক কষ্ট হয়। কষ্টের অপনয়ন জন্যই তিনি পরোপকার করিলেন; সাগরতরঙ্গ নদী ও বায়ুবেগ অবরুদ্ধ হইলেই ভীতিকর হইয়া উঠে। বাস্তবিক ইহাও দেখা গিয়াছে যে যদি কোন প্রকৃত দাতা কোন কারণবশতঃ পরের দুঃখ বিমোচন করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হয়; এমন কি অশ্রু পর্য্যন্তও বিগলিত হয়। অন্যান্য ব্যক্তির কার্য্যও ঐরূপ। যে স্থলে যে বৃত্তির প্রয়োজন সেই স্থলে সেই বৃত্তিরই আবির্ভাব হইয়া থাকে। এক বৃত্তির আবির্ভাব হইলে অন্য বৃত্তি অনুসারে কার্য্য করিলে তাহাতে সুখোদয় হয় না। বরং ঐ বৃত্তির অবরুদ্ধ হইলে কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। ফলতঃ এই জগতে নিঃস্বার্থপর লোক নাই। গ্রহগণ যেরূপ বিভিন্নমার্গ অবলম্বন করিয়া সেই একই সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া উহার চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতেছে, জগতস্থ যাবতীয় জীবও সেইরূপ বিভিন্ন মার্গ অবলম্বন করিয়া নিরন্তর নিজ নিজ স্বার্থের অনুসরণ করিতেছে।

ফলতঃ জগতের অবস্থা এখনও যেরূপ, তাহাতে প্রকৃত নিঃস্বার্থপর লোকের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না; অধিকন্তু তাহার জীবন ধারণই দুরূহ হইয়া উঠে। যদি কোন লোক সকল বিষয়ে নিঃস্বার্থপর হয়, এক বারও নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, তাহা হইলে সে পদে পদে বিপদগ্রস্ত হয়। ফলতঃ অসাধু জগতে কখন সাধুতা স্থান পায় না। যেখানে সকল লোকই মিথ্যা কথা কহে, সকলই শঠ—সেখানে সত্য কথা কহিলে বা সাধু ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই অমঙ্গল হয়। নীতিবিদ্ পণ্ডিতেরা বলিতেছেন "সদা সত্য কথা কহিবে।" কিন্তু এই জগতে অবস্থান করিতে হইলে এমন অনেক সময় আইসে, যখন সত্য কথা কহিলে নিশ্চয়ই বিপদ। চিকিৎসক একটি রোগীকে দেখিয়া তাহার আত্মীয়কে বলিয়া গেলেন যে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য। চিকিৎসক চলিয়া গেলে যদি রোগী চিকিৎসক কি বলিয়া গেলেন জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আত্মীয় কি বলিবেন? তিনি যদি চিকিৎসকের কথা গোপন করেন, তাহা হইলে তাঁহার মিথ্যা কথা কহা হইবে। আর যদি চিকিৎসক যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বলেন, তাহা হইলে চিকিৎসকের ভ্রমবশতঃ রোগী হয়ত এরূপ ভীত হইতে

পারে যে তাহার মৃত্যু বাস্তবিকই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এই অসাধু জগতে যে ব্যক্তি যথার্থ সাধু, আমরা তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকি সত্য; কিন্তু বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, সে ব্যক্তি অতি মূঢ় এবং পদে পদে অপরের নিকট বঞ্চিত হয়। যদি জগতে কোন লোক এরূপ কার্য্য করে যে তাহার সহিত তাহার ঐহিক পারত্রিক শারীরিক বা মানসিক সুখের কোন সংস্রব না থাকে, তাহা হইলেই তাহাকে প্রকৃত নিঃস্বার্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ নিঃস্বার্থ লোক—যে নিজের সুখ আদৌ অন্বেষণ করে না, সে হয় বিবেকহীন বাতুল, না হয় আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত। বাস্তবিক স্বার্থপর লোক হইতেই জগতের যাবতীয় উপকার সাধিত হইয়াছে। স্বার্থ না থাকিলে কার্য্যে আস্থা হয় না। ধন মান, ঐহিক পারত্রিক, শারীরিক মানসিক প্রভৃতি যিনি যে বস্তুরই অভিলাষী হউন না কেন, স্বার্থপর লোকই জগতের উপকার করিতে পারে। আমরা ভ্রমবশতঃ যাঁহাকে নিঃস্বার্থ বলি, বাস্তবিক তিনি ঘোরতর স্বার্থপর।

শ্রীসমতুলচন্দ্র দত্ত।

আধখানা।

শৈশব ফুরাল, আসিছে যৌবন,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে র'য়েছে সে জন,
কত মত হাসি, কত সুধারাশি,
নয়ন-কিরণে উছলে যেন!

ফোটে' ফোটে' রূপ ফোটেনি তখন',
ধরি ধরি ধরা দেয় নি এখন'—
বিমল সে বিভা, বিমল প্রতিভা,
শরম-কলিকা ফুটিছে যেন!

আধ' সে চাহনি, আধ' আধ' ভরা,
আধ'ময় যেন সমস্ত এ ধরা,
এ প্রকৃতি-শোভা সব যেন আধা,
কি গড়নে গড়া সে আঁখি তারা!

দাও বাহুলতা, দাও আলিঙ্গন,
এ পরাণ মন ক'রেছ হরণ,
কবির হৃদয় কবির না রয়,
কি মধু সেথায় ফুটে স্বপন!

দূর—দূর দেশে ভ্রমে আলো ক'রে,
কোথা যে পরাণ, কোথা ফুল ঝরে!
কোথা আকুলতা, কোথা নীরবতা,—
দূর—দূর আশে শুধু বিচরে!

অখিল ব্রহ্মাণ্ডে খুঁজিয়া না পায়,
হেন সুশোভন আছে বা কোথায়!
এ মহা আকাশ, এ মহা বিকাশ,
খুঁজে নাহি পায় সেথাও, হায়!

তুমি আছ ব'সে সকলের মাঝে,
আকাশ হ'তেও কি অনন্ত সাজে,
কত তারা ফুল, কত আশা ভুল,
নীরবে ফুটিছে আকুল-ঝাঁজে!

চল চল্ করি চলিছে লহরী,
থল থল্ করি কাঁপিছে মাধুরী,
গুন্ গুন্ তান, উঠিতেছে গান,—
জগৎ যেন রে বিকাশে ধীরি!

কত রূপময়, কত শোভাময়,
কত না আলোক, কত বিভাময়,
কত না জড়তা, কত ফোটা কথা,—
ফোটে নি বলিয়া সুরভিময়!

এস এস সখি, এস পুন দেখি,
তোমার তরেতে গড়া এ যে আঁখি,
এ আমার প্রাণ, এ আমার গান
উঠিতেছে সুধু তোমারে মাখি!

স্বপন-কারায় রুদ্ধ আছে, হায়!
দেখাবার নয়, দেখাব না তায়!
হৃদয়ের ঘায় সদা প্রাণ ধায়,
তাই বুঝি সে গো এমন গায়!

নহে কি দেখাব, নহে কি শুনাব,
কি কল্পনা-শ্বাসে তাহারে ফুটাব?
আছে কিবা ভাষা, আছে কিবা আশা;
যা দিয়া আমি, তাহারে দেখাব।

শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

শারদীয়া প্রতিমা।

আমরা সূচনায় বলিয়াছি যে প্রতিমা সকলেরই আছে। যোগী ভোগী, গৃহী সন্ন্যাসী, শাক্ত বৈষ্ণব, জ্ঞানী পাপী সকলেরই প্রতিমা আছে। এই সংসার প্রতিমায় ভরা। স্বয়ং প্রকৃতি জীবন্ত প্রতিমারূপিণী। প্রতিমা ছাড়িয়া জীব! তুমি কোথায় যাইবে?

অনেকেই হয় ত বলিবেন যে, যে জ্ঞানী যে ভক্ত, যে ধর্ম্মাত্মা, যে উপাসক তাহারই না হয় প্রতিমা থাকিতে পারে, পাপীর আবার প্রতিমা কি? যে নাস্তিক তাহার আবার প্রতিমা কোথায়? কথাটা বড় ভুল। যে পাপাচারী, তাহার প্রাণ কি প্রতিমার দিকে ধায় না? পাপী কাহাকে বল? তুমি পুণ্যাত্মা, আমি পাপী। তোমার অন্তরে পুণ্যপ্রবৃত্তি প্রবল, আমার চিত্তে পাপ-প্রবৃত্তির আধিক্য। পাপ পুণ্য তোমার আমার উভয়েরই আছে। তোমায় আমায় প্রভেদ কেবল ওজনের কম বেশী।

সত্ত্বরজস্তমঃ—প্রকৃতি এই ত্রিগুণাত্মিকা। প্রকৃতি হইতেই তোমার আমার জন্ম। ত্রিগুণের কোনটাই তুমি আমি কেহই ত্যাগ করিয়া তিষ্ঠিতে পারি না। ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ত্যাগ করিয়া এই

দেহে তিষ্টিতে পারি না। যে দিন ত্যাগ করিব, যে দিন "নিস্ত্রৈগুণ্য" হইব, সেই দিনই তুমি আর "তুমি" থাকিবে না, আমি আর "আমি" থাকিব না। কিন্তু যতদিন তুমি আমি থাকিব, যতকাল এই ভুতময় দেহে আমাদের অবস্থান, ততকাল সত্ত্বরজস্তমঃ লইয়া উভয়কেই ঘর করিতে হইবে। তবে গুণ কয়টার ভাগাভাগি তোমার আমার সমান নহে। তুমি পুণ্যাত্মা—তুমি সত্ত্ববহুল; আমি পাপী—আমি তমঃ-প্রধান। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমার প্রতিমা নাই?

আমার ভিতর যতটুকু সত্ত্বগুণ আছে, ততটুকু পরিমাণেই আমার প্রাণ প্রতিমার দিকে ছুটিবে। আমি তামসিক, তমোগুণের প্রাধান্যেই আমি আমার প্রতিমা পূজা করিব। এই জন্যই পূজার বিধানও ত্রিবিধ। সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসী,—পূজা ত্রিবিধা। আমি পাপী বলিয়া আমার কি পূজা নাই? পূজায় আমারই ত অধিকতর প্রয়োজন। আমার কলুষক্ষয় করিতে, আমার চিত্তশুদ্ধি করিতে উপাসনা ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে? তবে একবারে সাত্ত্বিকী পূজার শক্তি আমার নাই; তামসিকী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমেই সাত্ত্বিকতা লাভের অধিকারী হইতে পারিব।

তুমি বলিবে, পাপীর যেন প্রতিমা রহিল, কিন্তু নাস্তিকের ত প্রতিমা নাই। নাস্তিক দেবতা মানে না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাহার আবার প্রতিমা কি? নাস্তিক কাহাকে বলে আমরা সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। নাস্তিক জগতের অস্তিত্ব মানে, জগৎ-কারণের অস্তিত্ব মানিতে চাহে না। কিন্তু তাহা না মানিয়াও নাস্তিক এই জগৎকার্য্যের একটা শক্তি মানে। নাস্তিক বলে স্বভাবের শক্তিবলে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, স্বভাবের শক্তিবলেই আবার ধ্বংস হইবে। সেই শক্তি কি? সে শক্তির লয় হয় না, ক্ষয় হয় না—সে শক্তি কি? কোথা হইতে আসিল, কে সৃষ্টি করিল? ইহার উত্তর নাস্তিকে দিতে পারে না। মূলে একটা মহতী শক্তির সত্তা নাস্তিক স্বীকার করে। আমরা বলি উহাই আমাদের আদ্যাশক্তি। নাস্তিক বলিবে তাহা নয়, উহা শক্তিমাত্র। ক্ষতি নাই। আস্তিক নাস্তিক সকলকেই সেই শক্তির পায়ে প্রণাম করিতে হয়; সকলেই সেই শক্তির অধীন, সে শক্তি কাহারও অধীন নয়। চেতনাচেতন সকলই সেই শক্তিপ্রসূত, শক্তিশাসিত, শক্তিসঞ্চালিত; সে শক্তি কেহ প্রসব করিতে পারে না, কেহ আয়ত্ত করিতে পারে না, কেহ আপনার ইচ্ছামত চালাইতে ফিরাইতে পারে না। আস্তিক নাস্তিক, সচলাচল নিখিল চরাচরের উপর সেই শক্তি সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বময়ী। তিনি এই সংসারের আদিভূতা—তিনি আদ্যাশক্তি; তিনি যাবতীয় শক্তিসমষ্টির মূলীভূতা কেন্দ্রীভূতা মহাশক্তি।

বঙ্গালয়ে শরতের ঐ মহা প্রতিমা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয়ের কারণীভূতা সেই মহাশক্তি। এমন কোন্ পাষণ্ড আছে, এমন কোন্ নাস্তিক আছে, কোন্ মূর্খ আছে যে সে বলিতে পারে আমি উহার পূজা করিব না, আমি উহার উপাসক নহি, আমি

উঁহার অধীনতা মানি না, উনি আমার জননী নহেন? তোমার নাস্তিকবাদ, তোমার নিরাকারবাদ, কোন বাদই ত এ শক্তির পাশ ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তুমি নাস্তিক—শক্তিমাত্র মান; এস এস তোমার পলাইবার পথ নাই; জোড় করে তুমি তোমার দেবতাকেই প্রণাম কর—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

তুমি নিরাকারবাদী—তোমার দেবতা আছে, দেবতার আকার নাই। পুত্তলের পূজা তুমি করিবে না, কাঠ বাঁশ খড় দড়ীর পায়ে প্রণাম করিতে চাহ না। কেহ ত তোমায় তা বলে নাই। চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তির চরণেই তুমি প্রণাম কর—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

প্রণাম করিতে গিয়া, সম্মুখস্থিতা মৃণ্ময়ী প্রতিমার দিকে চাহিয়া,তোমার নিরাকারোপাসনায় ব্যাঘাত হইতেছে? আচ্ছা ভাই! চক্ষু মুদিয়া প্রণাম কর, প্রতিমা চোখে ঠেকিবে না। আমার এ প্রতিমাকে তোমার প্রণাম করিয়া কাজ কি? তুমি তোমারই প্রতিমাকে প্রণাম কর, তোমারই দেবতার চরণে মস্তক লুটাইয়া বল—

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্না এতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

কিন্তু ভাই নাস্তিক! ভাই নিরাকারাদি! তুমি যাঁহার পায়ে প্রণাম করিলে, তুমি যাঁহার পায়ে নিত্য প্রণাম কর, জগৎ যাহার পায়ে প্রণত হইয়াই আছে, আমারও দেবতা সেই তিনি। তিনি ঘটপটেই থাকুন, মৃৎপাষাণেই থাকুন,—কোথায় তিনি নাই—তিনি সর্ব্বব্যাপিনী, যেখানেই তিনি থাকুন; তিনি আমারও দেবতা, তোমাদেরও দেবতা, সকলেরই দেবতা তিনি। তিনি সর্ব্বত্র আছেন স্বীকার করি, কিন্তু সর্ব্বত্র ত আমার দৃষ্টি যায় না; তাই উপাসনার সময় আমি তাঁহাকে দৃষ্টির আয়ত্ত করিয়া, আমার মনশ্চক্ষু বহিশ্চক্ষুর গোচর করিয়া, আমার প্রাণের ভিতর, আমার চক্ষের সম্মুখে তাঁহাকে বসাইয়া, বলিয়াছি "মা! তুমি সর্ব্বানি! সর্ব্বেশ্বরি! তা জানি। কিন্তু আমি ত মা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী নহি। আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী ক্ষীণদর্শী, আমাকে দেখা দিবার জন্য মা তুমি তোমার সর্ব্বব্যাপ্তি গুটাইয়া আনিয়া, তোমার অনন্তত্ব সংহৃত করিয়া, মূর্ত্তিমতী হইয়া,—আমি যেমন মাটীর পুতুল, তেমনি তুমি মাটীর পুতুলেই আমার জননী সাজিয়া আমার কাছে একবার আসিয়া বসিও। তুমি সর্ব্বব্যাপিনী, একস্থানে তুমি স্থির থাকিতে পারিবে না তা জানি; কিন্তু সন্তানের আবদার,—আমি যতক্ষণ পূজা করিব, ততক্ষণ তোমায় আমার কাছে থাকিতেই হইবে—

যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব।

তুমি নাস্তিক, তুমি ব্রহ্মবাদী, তোমরা সর্ব্বত্রই মহাশক্তির লীলা দেখিতে পাও—পাওনা কেবল আমার ঐ মৃণ্ময়ী প্রতিমার ভিতর। তোমাদের এই ভ্রান্তি নিরসনের জন্য তোমরা এস আমারই এই প্রতিমার পায়ে প্রণাম কর।—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

মহাশক্তির এই মহাপ্রতিমা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাসনীয়া। এমন বিশ্ব-ব্যাপিনী বিশ্বজননী প্রতিমা আর কিছুই হইতে পারে না। মধ্যস্থলে মহাশক্তি,উভয় পার্শ্বে সংসার-শোভনা লক্ষ্মী ও জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, শক্তিসুত সেনাপতি ও বিঘ্নহর গণপতি,—এই পরিবারসমন্বিতা হইয়া মহামায়া স্বয়ং পশুরাজপৃষ্ঠে আরোহণ পুরঃসর অসুর বিনাশনে বিনিযুক্তা, জগতের অশিবনাশে সমুদ্যতা। শিখরদেশে শিবরূপী মহেশ্বর যোগাসনে সমাসীন। জগত্তত্ত্বের এই পূর্ণ প্রতিমার পায়ে কোন্ মর্ত্ত্যপ্রাণী প্রণাম করিতে চায় না? তুমি যে কোন দেবতার উপাসক হও না কেন, ইহাঁর পূজা করিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, ইনিই সকলের মূলাধার। তুমি বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী শক্তির সবা করিয়া তুমি মুক্তিপদের প্রয়াসী; ঐ শুন দেবতারা কি বলিয়া শুম্ভনাশিনীর স্তব করিয়াছিলেন—

> ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য
> বীজং পরমাসি মায়া।
> সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতত্ত্বং বৈ
> প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

তুমি সুররাজ ইন্দ্রের উপাসক, এস প্রণাম কর—

> কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
> বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

মায়ের কাছে তুমি কি চাও? তিনি বুদ্ধি, তিনি শক্তি; তিনি ক্ষান্তি, তিনি শান্তি; তিনি শ্রদ্ধা, তিনি কান্তি; তিনি লক্ষ্মী, তিনি বৃত্তি,তিনি দয়া;তিনি তুষ্টি; এই সকল রূপেই তিনি সর্ব্বভূতে সংস্থিতা। তুমি কামনা করিয়া সকলই তাঁহার কাছে চাহিতে পার। তুমি বলিতে পার—

> দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখং।
> রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

সংসারসেবার জন্য সংসারলক্ষ্মীর কামনা করিয়াও তুমি বলিতে পার—

> ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।

দেবী সর্ব্বস্বরূপা। দেবগণ তাঁহাকে ডাকিয়াছিলেন—

> সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।

তিনি সংসারের সুখদায়িনী, আবার সংসারবন্ধনের মুক্তিদায়িনী। তাঁহাকে ভজিলে—

> ঐশ্বর্য্যং তৎপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ।
> শত্রুহানিঃ পরোমোক্ষঃ স্তূয়তে ন স কিং জনৈঃ॥
> চণ্ডিকাং হৃদয়েনাপি যঃ স্মরেৎ সততং নরঃ।
> হৃদ্যং কামমবাপ্নোতি হৃদি দেবী সদা বসেৎ॥

বাঙ্গালীর মহিমা যে এই মহামহিমাময়ী মহাশক্তির মহতী প্রতিমা শরতের এই মহোৎসবে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজিত ও প্রপূজিত হইয়া থাকে।

মার কাছে রোদন।

(দুর্গাপূজা উপলক্ষে।)

১

কেন রে ভারতে হেন গণ্ডগোল,
কেন বাজে আজ শঙ্খ, ঢাক, ঢোল,
কেন আজ হেন আনন্দের রোল,
নিরানন্দময় শ্মশান মাঝে॥

২

কেন বৃদ্ধ যুবা নাগর নফর,
কেন রে কামিনী কিশোর-নিকর,
প্রবাসী পথিক দরিদ্র কাতর,
ভূষিত সকলে আনন্দ সাজে॥

৩

বিরহ-বিধুরা বিনোদিনী বালা,
সুত শোকাতুরা জননী বিহ্বলা,
মুছি আঁখিবারি ভুলি শোকজ্বালা,
আনন্দ সরসে কেন রে ভাসে?

৪

কেন পূর্ণঘট প্রতি গৃহদ্বারে,
কদলীর তরু শোভিছে দুধারে,
রসালের নব কিশলয় হারে,
প্রতিদ্বার আজ কেন রে হাসে?

৫

কেন ধূপ ধুনা আনন্দ বাদন,
'মাভৈ' 'মাভৈ' শব্দ অনুক্ষণ,
কাঁপায়ে মেদিনী, কাঁপায়ে গগণ,
প্রতিগৃহ হ'তে উঠিছে কেন?

৬

কেন মত্ত হ'য়ে আনন্দ আসবে,
ভক্তগণ ডাকে 'দুর্গা' 'দুর্গা' রবে,
'নিস্তারিণী' নামে নর নারী সবে,
কেন রে উন্মত্ত হয়েছে হেন?

৭

তবে কি তাপিত তনয় নিকরে,
তবে কি দুর্ব্বল ক্ষীণ কলেবরে,
মহা শান্তিময়ী করুণার ভরে,
শক্তি দিতে আজ এলেন ভবে?

৮

তবে কি আবার আনন্দরূপিণী,
সঙ্গে কার্ত্তিকেয়, রমা বীণাপাণি,
দশপ্রহরণ ধরিয়ে তারিণী,
তারিতে এলেন তাপিত সবে?

৯

(তবে) আয় গো, মা, দুর্গে,ডাকি সুকাতরে,
আয় এ শ্মশানে ক্ষণেকের তরে,
দেখ মা চাহিয়ে কি যাতনা ভরে
যেতেছে মোদের যামিনী দিন॥

১০

তুই নিস্তারিণী আসিবি মা ব'লে,
কাতর সন্তানে লইবি মা কোলে—
এই আশাবলে, যাতনায় জ্বলে,
তবুও হইনি জীবন-হীন॥

১১

জননী বিহনে জুড়াবার স্থল,
সন্তানের আর কোথা আছে বল,
বলি তাই তোরে যাতনা সকল,
তাপিত পরাণ জুড়াব আজ ॥

১২

দেখ মা চাহিয়ে ক্ষীণ কলেবর,
স্তিমিত নয়ন, শক্তিহীন কর,
নাহি পাই খেতে পুরিয়া উদর,
পড়েছে মাথে মা দুখের বাজ ॥

১৩

যে ভারত মাগো রত্ন প্রসবিনী,
হীরক, কাঞ্চন রতনের খনি,
যথা কোহিনূর বহুমূল্য মণি,
নদী-নীরে যথা কনক হাসে ॥

১৪

যথা শস্যভরা শ্যামল প্রান্তর,
খর্জ্জুর রসাল ফল বহুতর,
যথা তরঙ্গিণী স্রোতস্বতী কর,
তাপিত পথিক পিপাসা নাশে ॥

১৫

সে ভারতে আজি যেই দিকে চাই,
সে রতনরাজি দেখিতে না পাই,
ভীম মরুভূমি নাহি কিছু নাই।
ভীষণ মুরতি শ্মশান যেন ॥

১৬

যেই দিকে চাই নৈরাশ্যের রেখা,
কঙ্কালের সারি যায় শুধু দেখা,
যেন রে কি-যেন বিভীষিকা মাখা,
নাচিয়া বেড়ায় পিশাচ হেন ॥

১৭

সে দুঃখের কথা কি বলিব বল,
বলিতে হৃদয় হয় মা বিকল,
অবসন্ন মন, নয়ন সজল,
পরাণ যেন মা ফাটিয়া যায় ॥

১৮

কত পরিশ্রমে, যে শস্য জনমে,
অমনি জননী মারিয়া মরমে,
কে যেন আসিয়া ফেলি ঘোর ভ্রমে,
সে সকল কোথা ল'য়ে পলায় ॥

১৯

(তখন) জঠর জ্বালায় কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
মুষ্টি ভিক্ষা করি, লালায়িত হ'য়ে,
যা কিছু পাই মা বহুক্লেশ স'য়ে,
মুখে দিতে তাহা উড়িয়ে যায় ॥

২০

(আজ) নাই মা উৎসাহ, নাহিক মা বল
শুধু মা সম্বল নয়নের জল,
কাঁদি দিন যামী, কাঁদি মা কেবল
বল দেয় প্রাণে আছে মা কেবা

২১

ঘোর শত্রুদল দারুণ পীড়নে,
হরিছে সকল মারিছে পরাণে,
সব সহি মাগো অম্লান বদনে
অবরোধি, দেহে নাই মা বল ॥

২২

পেটে অন্ন নাই, নাই মা বসন,
নাই আশা বুক, বিষণ্ণ বদন,
নাই শক্তি বল কেবল রোদন
করি মা কাতরে রজনী দিন ॥

২৩

গেলাম জননী দেখ্ একবার,
সহিতে এ ক্লেশ পারি না যে আর
যায় ভক্তগণ জননী তোমার,
করুণা কর মা কাতরগণে ॥

২৪

আর কোথা যাব কেবা আছে বল্,
কে মুছাবে আর এ নয়নজল,
কে বুঝিবে বল বেদনা সকল
কে রাখে সন্তান জননী বিনে ॥

২৫

ভক্তি মাখা স্বরে ডাকিতে তোমারে !
পারি না জননী ! তেমন অন্তরে ;
ম্লেচ্ছ নাম কত শ্রবণ কুহরে,
ঢালিয়ে দিয়ে মা পূজিতে বলে ॥

২৬

তাই মাগো তোরে মা, মা, বোলে আর,
ডাকিতে না পারি মানস মাঝার,
গঠি করুণাময়ী প্রতিমা তোমার
লুকায়ে রেখেছি ভকতি জলে ॥

২৭

যদি দয়া ক'রে এসেছ এবার,
দেখ আঁখি মেলি, দেখ একবার,
সহিতে যাতনা পারি যে না আর,
হ'ল কলেবর কঙ্কালে শেষ ॥

২৮

একে রিপুদের দারুণ-পীড়নে,
মরিতেছি ঘোর মরম যাতনে,
তুই মা আবার নিদয় পরাণে,
কেন বল্ আর কাঁদাস্ দেশ ॥

২৯

ভীম উল্কাপাত অশনি ভয়াল,
প্রবল ঝটীকা কালান্তের কাল,
বন্যা, ভূমিকম্প দেখ্ প্রতি সাল,
কতই সন্তান নাশিছে তোর ॥

৩০

বিস্তারিয়ে ভীম করাল বদন,
দুর্ভিক্ষ পিশাচ, করি আগমন,
কত সুত তোর করিছে হরণ,
দিতেছে কতই যাতনা ঘোর ॥

৩১

যদি দয়াময়ী এসেছ এবার,
কোন মতে তোরে ছাড়িব না আর,
নিবারো মা দুখ নয়ন আসার,
কর মা কর মা যাতনা শেষ ॥

৩২

তবে কোন দোষ ক'রে থাকি যদি,
যদি রাঙ্গা পায় এত অপরাধী,
বিস্তারিয়ে তবে ভারত পয়োধি,
পলকে নাশো মা ডুবায়ে দেশ ॥

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য-সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড।] কার্ত্তিক, ১২৯৭। [সপ্তম সংখ্যা।

গান।

"প্রতিমা।"

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা!

কি হেরি চমৎকার!
প্রলয় আকার!
কালরূপে মহাকাল, ভীষণ আঁধার॥
দিগন্ত ব্যাপিয়া কায়, কিসে আবরিবে তায়,
নগনা মুরুতি বুঝি, সংহারে ভূভার॥
উদ্দাম নিবিড় ঘন, ঘন মুক্তকেশ সম,
চুম্বি ধরণী চরণ, বেড়েছে সংসার।
নিশা মেঘজাল, যোজনা হয়েছে ভাল,
রূপ কাল কেশ কাল, কাল-পারাবার॥

চপলা-অসি চঞ্চল, করিতেছে ঝলমল,
হুঙ্কার-জীমূত নাদ, গরজিছে অনিবার।
ধূমকেতু-লোল জিহ্বা, রক্ত জিনি রক্ত আভা,
রুধির-সলিল ধারা, বরষে আসার॥
সমীর-ডাকিনী সঙ্গে, নাচিছে হাসিছে রঙ্গে,
তাণ্ডব-বায়ু তরঙ্গে, ত্রাস সবাকার।
অট্টহাসে সমীরণ, ঘোর রবে করে রণ,
কেবা করে নিবারণ, ঘোর দুর্নিবার॥
পদতলে প'ড়ে ক্ষিতি, নিশ্চল পুরুষাকৃতি,
হেরিছে প্রকৃতি-রীতি শিব শবাকার॥

শ্রীদীননাথ সান্যাল।

ফুল।

আমি আর ফুটিব না। ফুটিয়া আমার সুখ কি? আমি পরের জন্য ফুটি, আপনার জন্য ফুটি না। আমি ফুটি, তাই উদ্যানের শোভা হয়; সমীরণ ধীর সঞ্চারে আমার পরিমল বহন করিয়া তোমাকে উপঢৌকন প্রদান করে। আমি ফুটি, তাই মধুলোলুপ অলিকুল সততই আমার তোষামোদ করে। আমি ফুটিব না। ফুটিয়া আমার লাভ কি? আমার তেমন আদর কোথায়? তেমন সোহাগ কোথায়? তেমন যত্ন কোথায়? আমি পরের জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিই, কিন্তু আমার জন্য কে প্রাণ ঢালিয়া দেয়? যে বলে আমি ঢালি সে কথার কথা—আমার জন্য নহে, তাহার স্বার্থ সিদ্ধির-জন্য। এতকাল ফুটিয়াছি, কিন্তু ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। আজ এই উন্নতিশীল উনবিংশ শতাব্দীতে সেই মনের কথা ফুটিয়া বলিতেছি। যখন অরণ্যে ফুটিতাম তখন ছিলাম ভাল; এমন অবরোধ-যন্ত্রণা ভোগ করি নাই। তখন আপনি ফুটিয়া আপনি হাসিতাম, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া আপনি ঢলিয়া পড়িতাম; সান্ধ্য-সমীরণ মনের সুখে আমার সহিত ক্রীড়া করিত, অলিকুল দলে দলে আসিয়া আমার মহিমা কীর্ত্তন করিত; আমি হেলিয়া দুলিয়া নব কিশলয় গুলির অন্তরালে লুকাইয়া তাহাদের একে একে মন জানিয়া লইতাম; যে আমার জন্য লালায়িত হইত—আমার প্রেমে মুগ্ধ হইত, তাহাকেই কেবল হৃদয়ে ধারণ করিতাম। তখন আরও ফুটিতাম। আমায় ফুটিতে দেখিয়া সুনীল নৈশগগণে একে একে তারা গুলি ফুটিয়া উঠিত। তাহারা আমায় দেখিয়া হাসিত, আমিও তাহাদের দেখিয়া হাসিতাম। এক্ষণেও হাসি বটে, সে মুখের হাসি—প্রাণের হাসি নহে। হাসিতে হয় বলিয়া

হাসি, তোমার মন রক্ষা করিতে হয় বলিয়া হাসি। আর হাসি কালের রঙ্গ দেখিয়া, আর তোমার দলের রঙ্গ দেখিয়া। এই প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যানে নানা প্রকার বৃক্ষের আওতায় তেমন করিয়া কি ফুটা যায়? তোমার সততই আশঙ্কা পাছে নষ্ট হই; পাছে গো বা মেষ সুযোগ পাইয়া আমাকে নষ্ট করে; পাছে অপর কোন লোক তোমার অনভিমতে আমাকে তুলিয়া লইয়া যায়—তাই এই অবরোধের সৃষ্টি। এই একটী তোমার বিষম ভুল। তুমি বাহির রক্ষা করিলে সত্য, কিন্তু আমার অন্তরস্থ কীট-সমূহের কি করিলে? ইহারা আমার অন্তর কলুষিত করিয়া আমায় নষ্ট করে। ইহা-দিগকে দূর করিতে পার, তবেই তোমার অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা।

আমি ফুটিব না। ফুটিলেই তুমি আমায় তুলিয়া লইবে। তুলিয়া লও ক্ষতি নাই; যত্ন করিয়া রাখিতে পার কৈ? হয় পাঁচ ফুলের সহিত মিশাইয়া তোড়া বান্ধিয়া রাখিয়া দাও না হয়, হাত ফেরতা করিয়া ফেলিয়া দাও। কখন দেবতার মস্তকে তুলিয়া দাও, কখনও আপনার বক্ষঃস্থলে রাখ বটে, কিন্তু সে নিজের ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত, আমার ভালবাসার বা যত্নের জন্য নহে। যে ভালবাসা, যে যত্ন ক্ষণস্থায়ী তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বা প্রকৃত যত্ন কি রূপে বলিব? তোমার স্বার্থ-পরতায় ধিক্! তোমার বিদ্যাবত্তায় ততোধিক ধিক্!

আমি ফুটিব না। তুমি বল ফুলে কণ্টক আছে। তুলিবার সময় তোমার হস্তে ফুটিয়া বেদনা দেয়। সে আমার দোষ নহে সে তোমার দোষ—তোমার অনবধান-তাবশতঃই বিদ্ধ হয়!

আমি ফুটিব না। তুমিই আমাকে কণ্টকাবৃত করিয়া রাখিয়াছ। আশে পাশে ফিরিতে যাইলে আমার এই কোমলাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত ও মলিন হইয়া যায়। এও তোমার স্বার্থপরতার আর একটী লক্ষণ। ফুটিব কি? আমি তেজ সহ্য করিতে পারি না, আতপে মলিন হইয়া যাই। যে ভাবুক সেই আমার এই কোমল দেহের সুকোমল প্রাণের মর্ম্মজ্ঞ। তুমি আমার মর্ম্ম বুঝ না, জান না, তোমার জন্য কেন ফুটিব? সময় বুঝিয়া বারি সিঞ্চন করিলে ও সুবাতাসে রাখিলে প্রফুল্লিত হই। তুমি কি তাহা পার যে তোমার জন্য ফুটিব?

কেন ফুটিব? তোমার দলে দুই প্রকা-রের লোক দেখিতে পাই; কতকগুলি ফুল-প্রিয় আর কতকগুলি ফুলের প্রতি বীত-স্পৃহ। যিনি ফুলপ্রিয় তাঁহার প্রেম ক্ষণ-স্থায়ী আর যিনি বীতস্পৃহ তাঁহার ত কথাই নাই। এমন কি তাঁহার বাঙ্গালা বর্ণ সংযুক্ত "ফুল" শব্দও ভাল লাগে না। বোধ হয় ইংরাজি বর্ণ সংযুক্ত "ফুল" শিরে ধারণ করিতে তাঁহার আপত্তি নাই!

আমি ফুটিব না। ফুটিলে বালকেরা—অপারণামদর্শী অবোধ বালকেরা—আমায় লইয়া খেলা করে। যিনি শিশু হস্তে আমায় সমর্পণ করেন তাঁহাকে বালকের অধম বলিয়া মানি। ফুটিব কি? ফুটিতে ভয় করে। অর্থ পিশাচ মালীগণ আকাঙ্ক্ষকর অর্থের লোভে আমাকে হাটে হাটে বাজারে

বাজারে বিক্রয় করে। তাম্রখণ্ডের সহিত কি আমার বিনিময় চলে? কোমলে কোমলে—সুন্দরে সুন্দরে মিলন যে না বুঝিল তাহাকে ধিক্! ফুটিব বৈকি! তবে যেখানে সেখানে নয়; স্থান বিশেষে। বাঙ্গালায় নহে, অন্যত্র। যে স্থানের লোক ফুলের মর্য্যাদা জানে ও রাখে তথায় ফুটিব। অন্ধের নিকট ফুটিয়া লাভ কি? আমি ফুটিব না। চাহিয়া চাহিয়া তোমার চক্ষে জল আসিলেও আমি ফুটিব না। আমার অশ্রুবিন্দু কে অপনীত করে? আমি আপন দুঃখে আপনিই কাঁদি, আমার দুঃখ দেখিয়াত কাহারও প্রাণ কাঁদে না;—বর্ষার দুর্দিনে, হেমন্তের হিম-প্রপাতে আমার অশ্রুবিন্দু সকলেই দেখে, কিন্তু কে তাহা মোচন করিবার জন্য যত্ন পায়?

বঙ্গদেশেও ফুটিব—যদি মহাত্মা বেথুনের বা দয়াসাগর বিদ্যাসাগরের ন্যায় অপর কেহ আমার দিকে ফিরিয়া চান, যদি পদ্মিনীর ন্যায় সমকক্ষ পাই।

শ্রীপ্রঃ।

মুসে গাম্‌বেতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রথম অঙ্ক।

৫।

স্বল্পতোয়ঃ ক্ষুদ্র সরোবর সামান্য বায়ু সঞ্চালনে বিকম্পিত হয়। সামান্য ফুৎকারে তুলা উড়িতে থাকে। বালকের মন কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? তরলমতি, চপল স্বভাব বালক বৃন্দ গাম্‌বেতার বক্তৃতায় নাচিয়া উঠিল। রাজনীতিজ্ঞ পুরুষেরা এটাকে শুভ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আজ কাল সকল দেশে বালকবৃন্দ এ সকল বিষয়ে অগ্রগামী, উদ্যমশীল ও তৎপর। ভাল হউক, মন্দ হউক বলিতে চাহি না; ইহাতে দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইতেছে তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা বলিতে চাই গাম্‌বেতার বক্তৃতায় ফ্রান্সের বালকগণকে মাতাইয়া তুলিল। তাহারা সকলে মিলিয়া গাম্‌বেতাকে এক দিন এক মহাভোজে আমন্ত্রণ করিল। সরল হৃদয় গাম্‌বেতা পরম আহ্লাদে তাহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন ও যথা সময়ে বালক সভায় উপস্থিত হইলেন। পরম পরিতোষ সহকারে ভোজনাদি সমাপন করিয়া গাম্‌বেতা এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বালকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—"তোমরা অদ্য হইতে দৃঢ়পণ কর, আপন মাতৃভূমিকে পরহস্তগত হইতে দিবে না। আজ তোমরা বালক আছ, কাল তোমাদিগকে ঘোর সংসারী দেখিব। অলীক আমোদ প্রমোদে চিরকাল অতিবাহিত করিও না। তোমরাই দেশের আশা ও ভরসা। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবের কথা একবার স্মরণ কর দেখি। তাঁহারা কেমন লোক ছিলেন—তাঁহাদের অমিত তেজ, সাহস, বল, বিক্রম—আজিও

ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহাদের ঘটনা-পূর্ণ জীবনকে তোমরা আদর্শ জ্ঞান করিবে। আমার চক্ষে যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়। সেই পবিত্র জাতির বংশধর হইয়া আপন পৌরুষ ও জাত্যা-ভিমান বিস্মৃতির জলে বিসর্জ্জন দিও না।

তোমরা সকলেই জান যে সাধারণ তন্ত্র প্রণালীতে সুখ, সৌভাগ্য, ও স্বাধীনতা বিরাজ করিতেছে। ফ্রান্স সাম্রাজ্য বলিলে সহসা এই ভাব সকলের মনে উদয় হইবে যে ফরাসি ভূমি দস্যু ও তস্করের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। ফলেও তাহাই। যে রাজ্যে প্রজার সুখ নাই, স্বাধীনতা নাই, যে রাজ্যে প্রজার কষ্টের অবধি নাই, যে রাজ্যে প্রজার স্বত্ব, অধিকার বা ক্ষমতা নাই—সে রাজ্যকে কি বলিব? পীড়ন, অত্যাচার, অবমাননা, রক্তপাত, যে খানে পদে পদে দেখা যায় তাহা প্রেতভূমি না স্বর্গ? নেপোলিয়নের কার্য্য পরম্পরা দেখিয়া তাহাকে রাক্ষস বা দৈত্য ভিন্ন অপর আখ্যা দিতে ইচ্ছা হয় কি? অতএব আইস আজ আমরা সকলে এক হইয়া শুভক্ষণে স্বদেশ উদ্ধার ও সমাজ সংস্করণ-ব্রতে ব্রতী হই। এক মনে দৃঢ় পণে কাজ করিলে সিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ঈশ্বর প্রসন্ন থাকিলে এ ব্রত নিশ্চয়ই উদ্‌যাপন হইবে—ইহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। এখন আমাদিগকে এই কাজ গুলি করিতে হইবে। লোকের মনে আত্মশাসন-বীজ বপন করিতে হইবে। সভা ও সমিতি করিয়া ঐ বিষয়ে অনবরত আন্দোলন করিতে হইবে। দেশোন্নতি কল্পে আত্মশাসন প্রণালীই অমোঘ অস্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আত্মশাসনের প্রধান অঙ্গ নির্ব্বাচন-প্রথা ইন্দ্রের বজ্র সম ক্ষমতাশালী। আর এক কথা ভাবিয়া দেখ। ধন কয়জনার থাকে; পৃথিবীতে কয় জন ধনী? গরীবের সংখ্যাই অধিক। বার আনা রকম গরীব আর চার আনা রকম ধনী। একা ধনীর সুখ দেখিলে চলিবে কেন? গরীবের কষ্ট দেখিয়া চক্ষু মুদিলে চলিবে না। গরীব ও ধনীর মধ্যে সুখ দুঃখের সামঞ্জস্য করিয়া দিতে হইবে। দেশ কাহার? মুষ্টিমেয় ধনীর, না অগণ্য গরীবের? যদি দেশ গরী-বের হয়, তবে গরীবকে তাহা শাসন করিতে দাও—রাজতন্ত্র ছাড়িয়া প্রজাতন্ত্র অবলম্বন কর।"

৬।

শাসনের দিকে গাম্বেতার চিরকাল লক্ষ্য ছিল। তিনি প্রায়ই এই কথা বলি-তেন—"সুনিয়ম, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধাতার প্রধান বিধি। প্রজার মঙ্গলের জন্য প্রজা মণ্ডলীর শাসন প্রজাতন্ত্র প্রণালীতেই হইবে। শান্তির জন্য, দেশ নিরাপদ রাখি-বার জন্য সেনাকুল প্রয়োজন হইলে প্রস্তুত রাখিতে হইবে। সমর প্রাঙ্গন সৌর্য্য বীর্য্য দেখাইবার স্থলও বটে; আবার শান্তি ও সুশাসন প্রদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্রও বটে। এই প্রজা মণ্ডলীর মধ্যে যদি গৃহ বিচ্ছেদ প্রবেশ না করে তাহা হইলে জয়শ্রী নিশ্চয়ই আমাদের দিকে হইবেন। প্রজারা এখন পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে; সদ্ভাব ও একতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। প্রজার হাতে শাসন-

ভার পড়িলে দেশের অমানিশা দূর হইবে ও সুখসূর্য্য অচিরে উদয় হইবে; সকলের কষ্ট নিবারণ হইবে; যথেচ্ছাচার দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। যে সকল লোক এতাবৎকাল ভয়ে নিশ্বাস ফেলিতে পারিত না, এখন তাহারা সাধ মিটাইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে।"

গাম্‌বেতার বাক্যে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহার আদেশ বেদবাক্যের ন্যায় অলঙ্ঘনীয়। সে উদারতাপূর্ণ নীতিগর্ভ বাক্যের সত্যতা বিষয়ে কাহারও অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পাশব বলে বাহ্য জগৎ শাসিত হইতে পারে বটে, কিন্তু অন্তর্জ্জগতের শাসন হয় না। নৈতিক বল ভিন্ন হৃদয়রাজ্য শাসন করে কাহার সাধ্য? মুসে গাম্‌বেতা, তুমি ধন্য! আর তোমার অসীম ক্ষমতাকেও ধন্য! তুমি নিশ্চয়ই কোন মোহিনী বিদ্যা শিখিয়া থাকিবে। তোমার মোহিনী মন্ত্রে সমগ্র ফরাসিভূমিকে মুগ্ধ করিলে—সকলে অবশ, তোমার পাদমূলে বিলুণ্ঠিত।

৭।

উদ্দীপনা বলে গাম্‌বেতা সমগ্র ফরাসি ভূমি মাতাইয়া তুলিয়াছেন। টুইলারির প্রাসাদে গিয়া এ সংবাদ পহুঁছিয়াছে। সেখানে প্রধান প্রধান রাজসচিবগণ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। এ সংবাদ শ্রবণে তাঁহাদের অন্তরে বিষের কলস ঢালিয়া দিল। তাঁহারা পূর্ব্বাবধি গাম্‌বেতাকে বিষনয়নে দেখিতেন; তাহার কারণ গাম্‌বেতা গরীবদিগের পক্ষ সমর্থন করেন। হিংসা ও দ্বেষ পরবশ হইয়া তাঁহারা সকলে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন—সমগ্র ফরাসিভূমিকে শ্মশানে পর্য্যবসিত করিতে হইবে, সমস্ত ফরাসি জাতিকে নির্ম্মূল করিতে হইবে। সকলেই বলিল আমরা কোন ক্রমেই নেপোলিয়ন বা তদীয় আত্মজগণকে রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিব না। প্রুসিয়ার অধিপতি জর্ম্মাণ সম্রাট আমাদের অহিতাচরণ করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা সকলেই অস্ত্রধারণ করিব। দূরদর্শী প্রাজ্ঞ সচিবশ্রেষ্ঠ মুসে ফেয়ার্স এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কত আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। গ্রহ বৈগুণ্য ঘটিলে লোকের মতিভ্রম ঘটে। ফ্রান্সেরও সেই দশা উপস্থিত। দলবল লইয়া ফরাসি সেনাপতি জর্ম্মাণ সীমায় উপনীত হইলেন। শত্রুরা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাহাদের উপর আক্রমণ করিল। ফল,—ফ্রান্সের পরাজয়। যুদ্ধক্ষেত্র সিদান হইতে ফরাসিরা পলাইয়া আসিলেন ও তাঁহাদের নেতা বন্দীকৃত হইলেন।

এতাবৎকাল সংবাদপত্রে যে সমস্ত সামরিক সংবাদ প্রচার হইতেছিল সে সমস্ত অলীক সংবাদ। যুদ্ধের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ হয় নাই। নেপোলিয়ন বন্দী হইলে এ সকল কথা বাহির হইয়া পড়িল। ইহার বাড়া বিপত্তি আর নাই। দেশ গেল, অর্থ গেল, মান মর্য্যাদা গেল, বাকি মৃত্যু,—হইলে তাহাও ভাল ছিল। ঘরে ঘরে দিবারাত্র এই দুঃখের কথা। সভা সমিতি কত বসিল। সে খানে ঐ বিষয়ের কত আন্দোলন হইল। কিন্তু কিছুই স্থির হইল না। সকলেরই মুখ মলিন; সমগ্র ফ্রান্স অতল

শোক-সাগরে নিমগ্ন। এখন উপায় কি? মধুসূদন ভরসা। ধরিত্রী এত পাপ সহিতে পারেন না। গগণস্পর্শী গর্ব্ব খর্ব্ব হয়; অতি বৃদ্ধির গতি ধ্বংসার্ণবে।

সাধারণতন্ত্রীর দল আনন্দে উন্মত্ত; কারণ তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তাহাদের চির শত্রুর পরাজয় হইয়াছে। উল্লাস প্রকাশ করা চাই। সুতরাং কেফি প্রকোপে এক প্রকাণ্ড সভা বসিল। এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া সকলেই বাঙ্‌নিষ্পত্তিরহিত। কেহই নেপোলিয়-নের সংরক্ষণের ভার গ্রহণে অগ্রসর নহে। বরং যাহাতে নেপোলিয়ন কখনও রাজ্যভার না পান তাহার জন্য সকলে ব্যস্ত। সভা-স্থলে জুলে ফেবায় প্রস্তাব করিলেন—নূতন প্রণালীতে ফ্রান্স শাসিত হউক। পাঁচ জন মন্ত্রী লইয়া একটী কার্য্যকরীসমিতি সংগ-ঠিত হউক। অপর সভ্যগণ বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছিল। সে সময় সকলেরই হৃদয় উন্মত্ত। অবশেষে গাম্বেতা উঠিয়া এক বক্তৃতা করিলেন—

"আজ আমাদের সুপ্রভাত। বিধাতা দুর্ব্বলের সহায় বলিয়া আজ এই সুযোগ উপস্থিত। ফ্রান্স হইতে যথেচ্ছাচারিত্ব হেট মুণ্ডে আজ বিদায় লইল। নেপোলি-য়ন ও তদীয় বংশধরগণ আজ হইতে রাজ্যা-ধিকারে বঞ্চিত হইলেন। আজ হইতে দেশ নিষ্কণ্টক হইল। সাধারণ তন্ত্র প্রণালী আজ ফ্রান্সে প্রবর্ত্তিত হইল। আমরা সকলে এতাবৎকাল যে আশামূলে যত্ন বারি সিঞ্চন করিতে ছিলাম, তাহা এত দিনে অঙ্কুরিত হইল। আমাদের চেষ্টা সফল হইল ও জন্ম সার্থক হইল। আজ সুখের তারা সকলের হৃদয়াকাশে দেখা দিল। এখন সুশৃঙ্খলা, সুনীতি, সুশাসন ও শান্তি দেশে বিরাজ করুক।"

এই সময়ে সভাগৃহে এক প্রচণ্ড আনন্দ-রোল উঠিল। সকল শ্রেণীর লোক এই স্থলে মিশিয়া এক হইয়া গেল। আহা! কি সুখের মিলন, সাধের মিলন!! সমস্ত সহরটি যেন হাসির তরঙ্গে প্লাবিত। আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেরই মুখে হাসি। যেন হাসির হাটে, হাসি কেনা বেচা হই-তেছে। সিন নদীর সে দিন ঢল ঢল চল চল ভাব। সে ভাব দেখিলে বলিতে ইচ্ছা হয়—

"বয়ে য ও, নির্ঝরণী, কার রমণী, গান ক'রে
মধুর স্বরে।"

উল্লাসের আর পরিসীমা নাই। হোটে-ল-দি ভিল্লি হইতে গাম্বেতা এক ঘোষণা পত্র পাঠ করিলেন। সমস্ত লোক শুনিয়া জয় ধ্বনি করিতে লাগিল। ক্রমে ঐ সংবাদ ফ্রান্সের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ঘোষণা পত্রে এই রূপ লেখা ছিল—"আজ হইতে ফ্রান্স সাধারণ তন্ত্র প্রণালীতে শাসিত হইবে। শাসন কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত এক সভা সংগঠিত হইবে, আর ঐ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য নিয়োজিত হইবেন—ফেরি, পেজে, বিজন, অর্গো, ক্রিমেও, জুলে ফেবায়, পিকার্ড, রচফোর্ড ও সাইমন। সেনাপতি ক্রুকো সভাপতি, ও গাম্বেতা প্রধান মন্ত্রীর পদে বরিত হই-বেন। সভার নাম—"স্বজাতি সম্মিলনী ও সংরক্ষিণী সভা।"

সিদানের দুর্ব্বিপাকের কথা সকলে ভুলিয়া গেল ও উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া এই সর্ব্বজনীন মঙ্গলানুষ্ঠানে ও বিশাল আন্দোলনে যোগ দিল। রাজকর্ম্মচারীর দল তেজহীন, উৎসাহহীন, বলবীর্য্যহীন, নতশির হইয়া আছে। আর সাধারণ তন্ত্রীরা নবোৎসাহে প্রণোদিত হইয়া ফুল্লমনে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত।

৮।

সুখের পর দুঃখ; দুঃখের পর সুখ। এইরূপে কালচক্র অনবরত ঘুরিতেছে। এত যত্ন, এত কষ্টের পর গাম্বেতার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল বটে. কিন্তু অভিলাষ পূরণ সুখ অতি অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হইয়া ছিল। দিবাবসানে পূর্ণিমার চন্দ্রের যেমন পূর্ণ বিকাশ হইল, আর অমনি রাহু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। সুন্দর সুকোমল জ্যোৎস্নারাশি ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল।

আজ ফ্রান্সের বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত। প্রুসিয়েরা পারিনগর অবরোধ করিয়াছে। গাম্বেতা আপন সাহস ও বুদ্ধিবলে তৎক্ষণাৎ প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এই মর্ম্মে এক ঘোষণা পত্র প্রচার হইল।—

"ফ্রান্স সাধারণ তন্ত্র ভুক্ত হইল বটে, কিন্তু ফ্রান্সের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। অতএব যাঁহারা স্বদেশ প্রিয় তাঁহারা এই বিপদের সময় অগ্রসর হউন। হে দেশ হিতৈষী মহাপুরুষগণ, তোমাদের হস্তে দেশ রক্ষার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। বীরগণ, স্বদেশ উদ্ধার কর। যুবা হও, বৃদ্ধ হও, ধনী হও বা নির্দ্ধন হও, মূর্খ হও বা পণ্ডিত হও, আইস আমরা সকলে মিলিয়া এক হই. এক হইয়া আমাদের শত্রু প্রুসিয়াকে বিনাশ করি—দেশ উদ্ধার হউক।"

স্বাধীনতা প্রিয় ফরাসি জাতি অমনি অসি বন্দুকে সজ্জিত হইয়া সমরাঙ্গনে ছুটিল। বীরবেশে সবে সারি সারি কাতার দিয়া দাঁড়াইল। এখন সেনাপতির আজ্ঞার অপেক্ষা। এমন সময় সমর সচিব সকলকে লক্ষ্য করিয়া হৃদয় উত্তেজক এক বক্তৃতা করিলেন;—

"স্বদেশ বাসিগণ! ঐ শুন, ঐ শুন, দুর্জ্জয় কামানের ভীষণ গর্জ্জন। উহাকে বজ্রনিনাদ বলিয়া ভ্রম হয়। পারি এখনও জীবিত। যতক্ষণ পারি দাঁড়াইয়া আছে ততক্ষণ তোমরা প্রাণপণে পারি উদ্ধারের চেষ্টা কর। আপন পদ বা শ্রেণী বা সম্প্রদায় জনিত গৌরব বা মর্য্যাদা ভুলিও না। শাণিত কৃপাণ হস্তে লইয়া নগর, দেশ ও রাজ্য রক্ষা কর। তোমরা যে বীর ও স্থির প্রতিজ্ঞ তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। তোমরা বিপদের সময় কখনও পশ্চাৎপদ হও নাই। দুর্জ্জয় কামানের মুখে অতুল সাহসে বুক পাতিয়া দিয়াছ। খরধার অসির অগ্রে আপন গ্রীবা বাড়াইয়া দিয়াছ। চারি দিক শত্রুর দলে পরিবৃত, তোমরা ভয়ে বিহ্বল হইও না, উৎসাহেও উন্মত্ত হইও না। স্থিরভাবে ও ধীর ভাবে প্রশান্ত মনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। কার্য্যতঃ আপন বল বিক্রম ও ওজস্বিতা দেখাইবে। দেশের কুলাঙ্গারেরা ফেরুপালের ন্যায় প্রাণ ভয়ে ছুটিয়া পলাইবে। তাহারা তোমাদের স্কন্ধে

কত মিথ্যা বার্ত্তা রটনা করিবে। তাহা শুনিয়া তোমরা ক্ষুভিত বা বিচলিত হইও না। ঈশ্বর সে কাপুরুষ দিগকে দণ্ড দিবেন। তাহারা ঘৃণাগ্রেও তোমাদের বা দেশের অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না।

আইস আমরা সকলে একতা সূত্রে সম্বদ্ধ হই। চতুর্দ্দিকে গোলাবর্ষণ হইতেছে, ভয় কি? আমরা বীরের সন্তান। সিংহ শাবক হইয়া শৃগালের ভয়ে রণে ভঙ্গ দিব না। সমরে মরিবে যেই স্বর্গে তার বাস। পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিকলাপ কখনও লোপ করিব না, বরং যাহাতে বজায় থাকে তাহার চেষ্টা করিব। দেশ উদ্ধার করিব এই দৃঢ় পণ করিলাম, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, কাহার সাধ্য তাহা রোধ করে? ১৭৯২ সালে ফ্রান্সে সাধারণ তন্ত্র প্রণালীর প্রথম সূচনা হয়। তোমরা সেদিন হোতেল দি ভিল্লিতে সাধারণতন্ত্র প্রথা প্রবর্ত্তন মূলক যে ঘোষণা পত্র প্রচার করিলে তাহা দ্বিতীয় সূচনা বলিতে হইবে। এখন এই প্রার্থনা সেই স্বর্গস্থ মহাপুরুষদের প্রেতাত্মা আসিয়া আমাদের মৃতদেহ অনুপ্রাণিত করুক। আমরা আবার পূর্ব্বের ন্যায় সজীব হইয়া দাঁড়াই। নির্ব্বাপিত দীপ আবার জ্বলিয়া উঠুক। অথবা ঘোর অমানিশা কাটিয়া গিয়া প্রভাতের অরুণ আরক্তিম রশ্মিজালে পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করুক। নব উৎসাহ হিল্লোলে সকলের হৃদয় কুসুম প্রস্ফুটিত হউক। চারি দিকে বীর বায়ু বহন করুক, আমরা সেই বায়ু সেবন করিয়া বীরোন্মাদে মত্ত হই। পঞ্চম স্বরে কোকিল স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশ-বাৎসল্য গান করিয়া সকলকে মাতাইয়া তুলুক। হরিণী-কুল আমাদিগকে আত্ম-ত্যাগ ও আত্ম বঞ্চনা শিক্ষা দিউক। বীর-পদ ভরে মেদিনী প্রকম্পিত হউক। শক্তি মন্ত্রে সকলে দীক্ষিত হউক, মুক্তি মিলিবে। ভিখারী হউক ক্ষতি নাই, ভিক্ষার ঝলি কক্ষে ধারণ করুক আপত্তি নাই, কিন্তু কেহ যেন প্রাণ ভিক্ষা না করে। কারণ বীরের সে ধর্ম্ম নহে। অতলস্পর্শী ভূগর্ভে বিধাতার তেজাধার অলক্ষ্য ভাবে রহিয়াছে।—তাহাই সঞ্জীবনী,শক্তি, উৎসাহ, উদ্যম, বলবীর্য্যের আকর। ভিক্ষা করিতে হয়, বসুন্ধরার নিকট সেই সঞ্জীবনী, শক্তি, সেই উৎসাহউদ্যম, সেই বলবীর্য্য ভিক্ষা কর। সহধর্ম্মিণী চাহ ত কার্থেজ রমণীর পাণি গ্রহণ কর। আপন অলকাগুচ্ছে তিনি তোমার কার্ম্মক পাশ সাজাইয়া দিবেন। মাতৃ আশীর্ব্বাদ চাহ, স্পার্টান রমণীর চরণ বন্দনা কর। তিনি তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবেন "যাও বৎস! মরিতে হইলে বীরের ন্যায় মরিবে।" সহোদর চাহ. নিয়োনিদাস্ অনুকরণ কর। নেতা চাহ—গাম্বেতা সম্মুখে। এখন সবে একসুরে গাও—

জয় ফ্রান্সের জয়, জয় ফ্রান্সের জয়,
জয় সাধারণতন্ত্রের জয়।
কি ভয়, কি ভয়॥

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ।

সাধ।

আমি চাহি থাকিতে নির্জ্জনে, দেখা কেহ দিও না আমারে!
আমি চাহি লুকাতে আমায়, নাম মোর বোলো না ধরারে!
বিপুল এ বিশাল জগতে, আমি অতি তুচ্ছ ক্ষীণ প্রাণী,
কাছে কেহ ডেকো না আমায়, শরমে মরিয়া যাই আমি!
তোমাদের বিশাল হৃদয়, ক্ষুদ্র প্রাণে পারি না আসিতে,
তোমাদের মহত্ত্বের কাছে আমি যে গো পারি না দাঁড়াতে!
তোমাদের জ্ঞান জ্যোতি মাঝে আপনারে হারাইয়ে যাই।
বিপুল ও কর্ম্মক্ষেত্রে হায় চলিতে যে পথ নাহি পাই!
অনন্ত এ সাহিত্য সংসার তোমাদের চরণে বিস্তৃত,
আমায় ডেকো না সেথা কেহ, হয়ে যাব নিমিষে দলিত!
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র কীট আমি, তৃণ মাঝে মিশাইয়ে যাই,
তোমাদের যশের সোপানে উঠিবারে শকতি যে নাই!
আমায় দিও না কেহ তবে এত খানি স্নেহ ভালবাসা!
আমায় ডেকো না কেহ আর, ক্ষুদ্র প্রাণে দিওনাক আশা!
তোমাদের অসীম প্রেমের পারিনে যে প্রতিদান দিতে!
ম'রে যাই কৃতজ্ঞতা ভারে, পরিতাপ জেগে উঠে চিতে!
উপদেশে আকুল পরাণ, আপনারে ভুলে যাই হায়!
চরণ চলিতে নাহি পারে, হৃদি তবু মগ্ন দুরাশায়!
তাই বলি তোমাদের কাছে আমায় ডেকো না কভু আর!
তোমাদের উদারতা হেরি, মনে পড়ে প্রাণের আঁধার!
মনে পড়ে জগতের কায আপনার হতভাগ্য হায়!
জীবনের হীনতা আমার ক'রে তোলে কাতর আমায়!
জীবনের সুপ্ত বাসনায় দিওনাক আর জাগাইয়া,
দিও না এ ক্ষুদ্র হৃদয়েরে দুরাশায় পথ দেখাইয়া!
আঁধারেতে লভেছি জনম, আঁধারেতে রব লুকাইয়া,
জানিবে না কেহ কবে প্রাণ ধুলি সনে যাবে মিশাইয়া॥

প্রঃ।

পাণ্ডুয়া বা প্রদ্যুম্ননগর।

বাঙ্গালা দেশে পাণ্ডুয়া নামে দুইটি স্থান আছে, তন্মধ্যে একটি মালদহ বিভাগে এবং অপরটি হুগলী বিভাগের অন্তর্গত। এই দুইটি স্থানই অতীব প্রাচীন, সেই হেতু উভয় নগর লইয়া অনেকে সময়ে সময়ে গোল বাঁধাইয়া থাকেন। স্থান দুইটি বহু প্রাচীন হইলেও প্রথমোক্ত নগরের সম্পর্কে কিছু একটু বিশেষত্বঃ সংস্পর্শ আছে। মালদহ বিভাগান্তর্গত অধুনা ভগ্নাবশিষ্ট গৌড় নগর বহু প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালার স্থায়ী রাজধানীর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও মধ্যে মধ্যে অন্য দুই একটি নগরও অল্পকালের জন্য বঙ্গের রাজধানীর পদাভিষিক্ত হইয়াছিল। যে সকল নগর এইরূপ পদপ্রাপ্তে বঙ্গবাসীর নিকট সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মালদহ বিভাগান্তর্ভূত পাণ্ডুয়ার গৌরবও এক সময়ে জগৎ সমক্ষে বিকাশিত হইয়াছিল। ফলে এবম্প্রকার সম্মান ও গৌরব প্রাপ্তি হেতুই এই নগর পশ্চাদোক্ত পাণ্ডুয়া অপেক্ষা সমধিক প্রসিদ্ধ।

হুগলী বিভাগান্তর্বর্ত্তী পাণ্ডুয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাই আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গ্রাম মাত্রে পরিণত পাণ্ডুয়া নগর পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ষ্টেসনের সন্নিকটে ২৩°৪'৩৫" অক্ষরেখা এবং ৮৮° ১৯' ২৫" দ্রাঘিমায় অবস্থিত।[১] সমুদ্র সন্নিহিত বাঙ্গালার ভাব এস্থানে পরিবর্ত্তিত বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। নারিকেল, পনস ও কদলি কানন ক্রমে বিলুপ্ত প্রায়; মৃত্তিকা ক্রমেই কঠিন ও মসৃণ ভাবাপন্ন। ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে পাণ্ডুয়া কোন হিন্দু রাজবংশের রাজধানী ছিল। ঐ নগর সমুচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাচীর পরিবেষ্টিত ও তদ্বহির্ভাগ সুগভীর পরিখা দ্বারায় পরিরক্ষিত ছিল। এই প্রাচীরের পরিধি সার্দ্ধদ্বিক্রোশ। এখনও দুর্গনগরের কতক কতক ভগ্নাবশেষ পাণ্ডুয়ার পার্শ্বে স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, এবং প্রাকার ভগ্নাবশেষের কিয়দংশের উপর রেলওয়ে ষ্টেসন নির্ম্মিত হইয়াছে। রেলওয়ের কার্য্যের সময় বহুসংখ্যক ভূগর্ভনিহিত নরকপাল ও ও কঙ্কাল উত্তোলিত হইয়াছিল; ইহাতে এইরূপ অনুমিত হয় যে, প্রাচীরের বহির্দ্দেশে একটি প্রকাণ্ড সমাধিভূমি ছিল। প্রাচীনকালে পাণ্ডুয়া প্রদ্যুম্ননগর নামে অভিহিত হইত। কেহ কেহ বলেন যে পাণ্ডু নামে কোন নরপতি ছিলেন, তাঁহার নাম হইতে 'পাণ্ডুয়ার' নামকরণ হইয়াছিল। অধুনা ঐ প্রাচীর ও পরিখা পরিবেষ্টিত প্রাচীন নগরী একটি সামান্য গ্রাম মাত্রে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে উহার চতুর্দ্দিক আম্রকানন, অন্যান্য ফল-বৃক্ষ ও পল্লব-লতা মণ্ডপে পরিবেষ্টিত,—দেখিলেই বোধ হয় যেন ইষ্টকাদি বিনির্ম্মিত গৃহগুলি অবগুণ্ঠিতা কুলকামিনীগণের ন্যায় বৃক্ষ-পল্লব-লতা মণ্ডপ সমূহের অন্তরাল হইতে পথিক

---

১ *Vide* Statistical Account of Bengal. Vol. III. Midnaporo, Hugli and Howrah. p. 312, by W. W. Hunter.

দিগের দিকে সভয় ও সলজ্জ কটাক্ষপাৎ করিতেছে। পথিকবৃন্দের চক্ষে এই গ্রাম্য দৃশ্য অতীব মনোহর ও প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়।

হুগলীর অভিমুখ হইতে পাণ্ডুয়াভিমুখে আসিবার সময় বহুদূরে একটি মন্দির-চূড়া-বৎ উচ্চ সামগ্রী পাদচারী এবং বাষ্পীয়-শকটারোহী পথিকদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইয়া থাকে। এই অশিতি হস্ত (১২০ ফিট) পরিমিত সমুচ্চ মুরচাকে বাঙ্গালায় জন সাধারণে "পেঁড়োর মন্দির" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই বৃহদাকার ইষ্টকস্তম্ভ পাণ্ডুয়ার ষ্টেসন হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইহার উপরে উঠিলে সেই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে হুগলীর ন্যায় দূরবর্ত্তী স্থান সমুহ পর্য্যন্ত যে একটী অতীব বিস্তৃত শ্রেণীবদ্ধ মনোহর গ্রাম্য দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সেই স্বভাবের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বোধ হয় জন্মাবচ্ছিন্নে সহজে ভুলিতে পারিবেন না। প্রথিত আছে, সমগ্র নিম্ন-বঙ্গের মধ্যে ঐটীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ইষ্টকালয়। উষ্ণকটিবন্ধের সীমা-স্তর্গত বাঙ্গালা দেশের ভীষণ ঝটিকা প্রবাহ, প্রবল বাত্যাঘাত, সহ্য করিয়া এবং ভয়াবহ প্রাবৃট বর্ষণ শিরোপরি অবাধে বহন করিয়া এই স্তম্ভ পাঁচ শতাব্দীকাল সগর্ব্বে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই সুদীর্ঘ-কাল এইরূপ অটলভাবে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালায় মুসলমান শাসনকালের মধ্যে মোগলজাতির গৌরব ধ্বজা স্বরূপ তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গে মুসলমান রাজধানী ঢাকা, রাজমহল এবং মুরশিদাবাদ মহানগরীত্রয়ের উত্থান এবং পতন দেখিয়াছে।

১৩৪০ খৃষ্টাব্দে ষ্টেসনের পশ্চিম দিকে একটি বিস্তৃত প্রান্তর ছিল, সেটি হিন্দু মুসলমান জাতির মধ্যে একটি ভীষণ সমরের রঙ্গভূমি। এই যুদ্ধে প্রদ্যুম্ন নগরস্থ হিন্দু রাজবংশের সৌভাগ্য লক্ষ্মী অঙ্কচ্যুত হয় এবং বিজয় লক্ষ্মী মুসলমান জাতিকে আশ্রয় করেন। হিন্দু জাতির পরাজয় হেতু পাণ্ডুয়া প্রথিত। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে ;—

একদা পাণ্ডুয়ার হিন্দু নৃপতির একটি রাজ কুমারের জন্ম হয়। ঐ উপলক্ষে রাজ প্রাসাদে উৎসব সহকারে ভোজ হয়। দিল্লীর সম্রাটকে পারস্য ভাষায় পত্রাদি লিখিবার জন্য পাণ্ডুয়া রাজসভায় জনৈক মুসলমান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনিও ঐ সময়ে একটি ভোজের আয়োজন করিয়া একটি গাভি বধ করেন এবং ঐ বিষয় হিন্দুদিগের নিকট গোপন রাখিবার অভিপ্রায়ে তাহার অস্থি সমুহ গ্রামের বহির্ভাগে প্রোথিত করিয়া রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ রাত্রিকালে শৃগালে ঐ অস্থি গুলি ভূমধ্য হইতে উত্তো-লিত করিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত করে। পর দিবস প্রভাত কালে গবাস্থি সকল নগ-রের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখিয়া হিন্দুগণ অনু-সন্ধানে অবগত হইলেন যে, ঐ মুসলমান কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক এই কার্য্য সম্পাদিত হই-য়াছে। এই ব্যাপারে হিন্দু নাগরিকগণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে বিশেষ রূপে দণ্ডিত করিবার জন্য

নগর মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাজকুমারের ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গোহত্যা হইয়াছে বলিয়া নাগরিকগণ প্রথমে রাজকুমারের প্রাণবধ করিলেন। তৎপরে মুসলমান কর্ম্মচারীকে বধ করিবার জন্য তাহার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুসলমান কর্ম্মচারী তাঁহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক দিল্লীশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। সম্রাট ফেরোজ তোগলক্ ঐ মুসলমান কর্ম্মচারীর সমভিব্যাহারে আপনার ভ্রাতষ্পুত্রের অধীনে পাণ্ডুয়া রাজের বিরুদ্ধে একটি বিরাট সেনা প্রেরণ করিলেন। হিন্দু মুসলমান সৈন্য মধ্যে বহুদিন ব্যাপিয়া ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। অবশেষে হিন্দুসেনার পরাজয় সহকারে যুদ্ধের অবসান হয়। ২

কেহ কেহ বলেন যে,—

এই ব্যাপার দর্শনে হিন্দুগণ অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া উঠেন এবং এই পাপকার্য্যকারীর অনুসন্ধান করিতে থাকেন। পরে তাঁহারা জানিতে পারিলেন, পারস্যভাষার মুন্সীপুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। তখন নগরস্থ যাবতীয় হিন্দু সশস্ত্রে দলে দলে রাজ সন্নিধানে যাইয়া কহিলেন, "মুন্সীর প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা হউক, অন্যথা তাহাকে আমাদিগের হস্তে অর্পণ করা হউক।" নৃপতি ইহাতে সম্মত না হওয়াতে বিদ্রোহীদল রাজপুত্রকে হত্যা করে। ভূপাল উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার মানসে মোগলসরকারে জানাইলেন, কিন্তু কোন ফল প্রাপ্ত হইলেন না; অগত্যা তাঁহাকে প্রজাদিগের সহিত যোগ দিতে হইল। মুন্সী গোলযোগ দেখিয়া পূর্ব্বেই নগর হইতে পলায়ন করিয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পর্য্যটন ও অসংখ্য মুসলমান সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডুয়া নগর আক্রমন করেন। ইত্যাদি। ৩

লংসাহেব এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে যে অংশটুকু আবশ্যক কেবল তাহাই নিম্নে সন্নিবেশিত করা গেল:—

কথিত মুসলমান কর্ম্মচারী আপন সন্তানের জন্মোপলক্ষে একটি ভোজ দেন। ঐ ভোজের আয়োজনে তিনি একটি গাভি হত্যা করেন। এই সংবাদ হিন্দুদিগের কর্ণগোচর হওয়াতে উহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া স্বদলবলে কথিত মুসলমানের বাটীতে উপস্থিত হইয়া উহার সদ্য প্রসূত পুত্রকে বল পূর্ব্বক লইয়া বধ করে। পুত্রের প্রাণ সংহারের প্রতিশোধের জন্য ঐ মুসলমান কর্ম্মচারী দিল্লীনগরে উপস্থিত হইয়া সম্রাটের স্মরণাগত হয়েন। তৎপরে সম্রাট তাঁহাকে সৈন্য সাহায্য করিলে এই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইত্যাদি। ৪

---

২ *Vide Traveles of a Hindu.* Vol I. p. 141 to 145 by Babu Bholanath Chunder.

৩ দেবগণের মর্ত্তে আগমন ২৮৬ পৃঃ দেখুন।

৪ Vide Article Localiti's of the Grand Trank Road. *Calcutta Review* by Rwd J. Long.

এই যুদ্ধ সংক্রান্ত আর একটি বিষয়ের প্রবাদ প্রচলিত আছে, যথাঃ—

হিন্দু এবং মুসলমান দিগের মধ্যে যুদ্ধ অনেক দিন ব্যাপিয়া চলিতে থাকে; কিন্তু মুসলমানগণ কোন প্রকারে যুদ্ধে জয়ী হইতে সমর্থ হইতে ছিলেন না। ইহার কারণ এই যে, উক্ত স্থানে একটি পবিত্র সরোবর জলের মৃতসঞ্জীবনী গুণ ছিল। যুদ্ধে যত হিন্দু সৈন্য হত হইতে ছিলেন, ঐ পুষ্করিণীর বারি সিঞ্চনে তাঁহারা পুনর্জ্জিবিত হইতে লাগিলেন। ফলে মুসলমান সেনাগণের কোন প্রকারে বিজয় লাভে সমর্থ হইতেছেন না এই সংবাদ তাঁহাদিগের সেনা নায়কের নিকট বিজ্ঞাপিত হইল। কথিত আছে যে, তিনি জনৈক কৃতঘ্ন হিন্দুর পরামর্শে এক খণ্ড গোমাংশ ঐ পুষ্করিণীর পুতসলিলে নিক্ষেপ করিয়া তাহার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি একে বারে বিনষ্ট করেন। এইরূপে হিন্দু নৃপতি যে অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া তাঁহার দুর্গনগর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া এত দিন জুঝিতে ছিলেন তাহার অবসান হইল;—অগণন মুসলমান সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিল।

৬১ পুরুষকাল রাজ্যশাসন করিবার পর এই রূপে গো হত্যা হইতে উদ্ভূত হিন্দু এবং মুসলমান জাতিদ্বয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধের অবসানে, হিন্দুদিগের পরাজয় সহকারে ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার একটি প্রাচীন নগরী প্রদ্যুম্ননগরে প্রাচীন হিন্দুরাজ বংশ বিলুপ্ত হইল।

"পেঁড়োর মন্দির" নামে যে মুরচার কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, হণ্টার সাহেব বলেন যে, পাণ্ডুয়ার যুদ্ধে মুসলমানদিগের বিজয়ের স্মরণার্থে ঐ মুরচা নির্ম্মিত হয়। ৫ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ ঘোষাল এ সম্বন্ধেও বলিয়া থাকেন। (৬) ঐ স্তম্ভের কিয়দংশ বসিয়া গিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, প্রদ্যুম্ন নগরের হিন্দুরাজবংশ সম্ভূতা কোন রাজকুমারী প্রত্যহ ভাগীরথী-দর্শন করিবার মানসে পিতাকে বলিয়া ঐ মুরচা নির্ম্মাণ করাইয়া লয়েন। ঐ স্মরণস্তম্ভের শীর্ষোপরি এক খণ্ড লৌহ দণ্ড প্রথিত আছে,—উহা এরূপ নিপুণতা সহকারে সন্নিবেশিত যে, হস্ত দ্বারায় নড়াইলে আন্দোলিত হয় অথচ বাহিরে আইসে না। সকলে ঐ লৌহ সলাকাকে পাণ্ডুয়া যুদ্ধের সেনা নায়ক সাহ শর্ফির যষ্টি বলিয়া থাকে। প্রতি বর্ষের পৌষ মাসে বাঙ্গালার নানাদিক দেশাগত মুসলমান যাত্রীগণের এই স্থানে সমাবেশ হইয়া থাকে। ৭ এই উপলক্ষ এ স্থানে একটী করিয়া মেলা হয়। মুরচাটী মস্‌জিদই হউক বা মন্দিরই হউক অথবা স্মরণার্থস্তম্ভই হউক ইহার গঠন কতক পরিমাণে হিন্দু মন্দির সাদৃশ বলিয়া ইহাকে লোকসাধারণে "পেঁড়োর মন্দির" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

মুরচার অতি সন্নিকটে একটি সমাধি মন্দির আগন্তুকের দৃষ্টি পথে পতিত হইয়া

---

৫ Vide satistical Account Vol. III. p 313 by W. W. Hunter.

৬ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ ঘোষাল প্রণীত "ভারত ভ্রমণ" ৮ পৃষ্ঠা।

৭ Vido the steam engine and the East Indian Railway p 131 by Babu Kalidas Moitra of Seerampore.

থাকে, উহার নিম্নে কথিত যুদ্ধে মুসলমান সেনাদলের সাহ শর্ফি অনন্ত নিদ্রায় শায়িত। এই স্থানটি নিম্ন বঙ্গের মুসলমানদিগের চক্ষে অতীব পবিত্র। স্তম্ভের পার্শ্বে ২০০ ফিট (১৩৩ হস্তের অধিক) লম্বা এবং ষষ্টিটি কলস (গম্বুজ) সংযুক্ত একটি অতীব সুদৃশ্য মস্জিদ্ দাঁড়াইয়া আছে। এই মসজিদটি সাহ শর্ফির ভজনাগার বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে এই মস্জিদের রোয়াকে (platform) সাহ শর্ফি সর্ব্বদা উপবেশন করিতেন। ইহার ভিতরে মৃদুস্বরে কথা-বার্ত্তা কহিলেও খুব সজোরে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে।

সাহ শর্ফি যে মৃতসঞ্জীবনী পুষ্করিণীতে গোমাংশ প্রক্ষেপ করিয়া উহার সঞ্জীবনী-শক্তি বিনষ্ট করিয়াছিলেন অদ্যাপিও তাহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। ঐ অমৃতকুণ্ড ষ্টেসন হইতে ৪০০ হস্ত দূরে। ইহার বিস্তৃতি প্রায় ১৩২ হস্ত পরিমিত। ঐ পুষ্করিণীর পাড় বিলক্ষণ সমুচ্চ। পাড়ের কোন স্থানে একটি সোপান শ্রেণীযুক্ত ঘাটের ভগ্না-বশেষ থাকাতে উহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পরিচয় এবং কোন পাড়ের বা বহুকালের একটি সামান্য গৃহের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান থাকায় পুষ্করিণীর প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচীন সরোবরের অন্যান্য যে সকল আনুসঙ্গিক থাকিতে দেখা যায় ইহাতে সে সকলের ও অসদ্ভাব নাই;—বিস্তৃত জলরাশি বক্ষে মৃণালোপরি অসংখ্য কমলিনী প্রস্ফুটিত হইয়া সরসীর শোভা সম্পাদন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পাণি-ফলের বিজড়িত লতা সমূহও বিরাজ করি-তেছে। সরসীনীর-তীরে কর্দ্দমোপরি তুষার ধবল বর্ণ বকনিচয় নিঃশব্দ পদ বিক্ষেপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ও কীট পতঙ্গাদি ধৃত করিয়া ক্ষুধার শান্তি করিতেছে। তীর ভূমিতে প্রাচীন বিশাল বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষরাজি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বহুকাল হইতে এক ভাবে উন্নত মস্তক দণ্ডায়মান হইয়া যেন বিজ্ঞ দার্শনিকের ন্যায় চতুর্দ্দিকস্থ জগৎবাসীর কার্য্যকলাপ পর্য্য-বেক্ষণ করিতেছে। উহারা দিবসে সহস্র-রশ্মির প্রখর-কর-তাড়িত পথিক বৃন্দকে নিজ শীতল ছায়াতলে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক স্নিগ্ধ করিতেছে। আবার অমানিশার ঘোরান্ধ-কারে ভীষণ মূর্ত্তিধারণ করিয়া পথিকবৃন্দকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। এই সকল বৃক্ষের সমুচ্চ শাখা নিচয়ের ক্ষুদ্রতম প্রশাখা উপরি মাচরাঙ্গা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষিবৃন্দ উপবেশন করিয়া সরসী তোয়াভিমুখে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে নক্ষত্র বেগে উড়িয়া যাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য চঞ্চু দ্বারা ধৃত করিয়া লইয়া যাইয়া শাখা উপরি বসিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতেছে। তীর ভূমিতে অসংখ্য গাভি শস্যাগ্র ভক্ষণে ব্যাপৃত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। মুস-লমান রাখাল বালক বৃন্দ পাচন বাড়ী হস্তে বৃক্ষমূলে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া উচ্চৈস্বরে জংলা সুরে একমনে গীত গাহিতেছে।

যুদ্ধে মুসলমানদিগের বিজয়ের অব্যবহিত পরে দিল্লীর বাদসাহ ফিরোজতোগলক অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সাহ শর্ফিকে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তার (নবাবী) পদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় সাহ

শর্ফি অস্বীকার করিয়া ফকিরী (বৈরাগ্যাশ্রম) লইয়া পাণ্ডুয়ার একটী আস্তানা (মুসলমান) সন্ন্যাসীদিগের মঠ স্থাপন করিলেন।

গ্রামের পশ্চিমদিকে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে, উহা "পীর পুকুর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহার গভীরতা ৪০ ফিট (ষষ্ঠ বিংশ হস্তের অধিক) হইবে। পাঁচ শতাব্দীকাল ঐ ভাবে বিস্তৃত থাকিয়া কত সহস্র তৃষ্ণাতুরা মানবগণকে নিজ স্নিগ্ধতায় প্রদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছে এবং কত পুরুষ মানবজাতি উহার সম্মুখে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ভবের লীলা খেলা করিয়া ইহ জগৎ হইতে অবসৃত হইয়াছে; কিন্তু পীর পুকুর সেই এক ভাবে গা ঢালিয়া পড়িয়া আছে। কখন বা স্থির কখন বা মৃদুমন্দ বায়ু হিল্লোলে বিকম্পিত, কখন বা নিশাকালে জনগণের ভীতিপ্রদ;—এইরূপে কখন কঠোর আবার কখন বা কোমল ভাবে জগজ্জনের মনে বিবিধ ভাবে উদয় হইয়া আসিতেছে। ইহার চতুর্দ্দিকে মস্‌জিদ্‌ এমামবাড়ী এবং সমাধি দণ্ডের ভগ্নাবশেষে পরিবেষ্টিত। কথিত আছে যে, মুসলমান সাধুজনের এবং যে সকল মুসলমান পাণ্ডুয়া সমরে জীবন লীলা সম্বরণ করিয়া ছিলেন ঐ সমাধি মন্দির সমূহ স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ সেই সকলের বিগত-জীবন দেহ যষ্টির উপর বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। এমামবাড়ী ফতে খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি দ্বারায় নির্ম্মিত হয়। ৮ এই পুষ্করিণীতে অনেকগুলি কুম্ভীর বাস করে, তন্মধ্যে ফতে খাঁ নামক কুম্ভীরটী বিখ্যাত। ৯ পুষ্করিণীর তীরে একটি আস্তানা আছে, উক্ত আস্তানা স্বামী ফকীর যখন ঐ নক্রকে ফতে খাঁ বলিয়া আহ্বান করেন, তৎক্ষণাৎ উহা ফকীরের সন্নিকটে ভূমির উপর আগমন করিয়া থাকে। হিন্দুদিগের গঙ্গা স্নানের ন্যায় পীরপুকুরে অবগাহনে মুসলমানদিগের মহা পুণ্য সঞ্চার হইয়া থাকে। তিথি নক্ষত্র বিশেষে অনেক মুসলমান যাত্রী এখানে স্নান করিতে আইসে।

পীর পুষ্করিণীর সন্নিকটে "সিমা-হসন" নামক আর একটি সরোবর আছে। এতদ্দেশীয় অনেক বন্ধ্যা কুলকামিনীগণ পুত্র কামনায় তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া উহার জলে সর্করা নির্ম্মিত পাটালি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে যে, যদ্বারা নিক্ষিপ্ত পাটালি ভাসিতে ভাসিতে হস্তে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই কুললনা পুত্র প্রসবিনী হইবেন বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যে রমণীর নিক্ষিপ্ত পাটালি পুণর্ভাসমান না হয়, তাঁহাকে পুত্রপ্রসবিনীর পদ প্রাপ্তি হইতে বিমুখা হইয়া ব্যথিত অন্তঃকরণে এবং অকৃতকার্য্য জনিত লাজবিজড়িতাননে মর্ম্ম পীড়িতার ন্যায় নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিতে হয়।

সপ্তগ্রামে ট্যাঙ্করোডের যে সেতু আছে উহার সন্নিকটে যে একটি প্রাচীন মস্‌জিদ্‌ ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে তাহার পার্শ্বে কতকগুলি সুদৃশ্য সমাধি দণ্ড দেখিতে পাওয়া

৮ দেবগণের মর্ত্তে আগমন ২৮৭ পৃঃ দেখ।

৯ পীর পুকুর তীরবর্ত্তী ইমাম্‌বাড়ীর নির্ম্মাতা যদ্যপি ফতে খাঁ হয়েন, তাহা হইলে সম্ভবত ইমাম্‌-বাড়ী নির্ম্মাতা নামের কোন প্রকার সংস্রব হইতে উক্ত পুষ্করিণী নিবাসী কুম্ভিরের নামকরণ হইয়া থাকে (?)

যায়; কথিত আছে ঐ গুলি পাণ্ডুয়া যুদ্ধের পতিত সেনাপতিদিগের মৃতদেহের উপর নির্ম্মিত।

পাণ্ডুয়ায় প্রায় তিন সহস্র লোকের বাস হইবে। ইহার মধ্যে এক অংশ হিন্দু এবং তিন অংশ মুসলমান। এখানে পূর্ব্বে ডাকাইতদিগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। এই গ্রামের অধিবাসীদিগের মধ্যে আয়-মাদারগণই বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন। পূর্ব্বে মুসলমানদিগের অত্যাচারে এস্থানে কেহ ঢাক ঢোল বাজাইয়া দেব দেবীর পূজা করিতে সক্ষম হইতেন না। পূজা করিলেই উহারা সকলে একত্রিত হইয়া প্রতিমা ভাঙ্গিয়া দিত। অধুনা এই গ্রামবাসী সঙ্গতিপন্ন পোদ্দারেরা অর্থব্যয়ে রাজসমীপে আবেদন এবং অভিযোগ করিয়া প্রতিমা পূজা করিতেছেন; এবং প্রতি বৎসর দুই একখানি করিয়া পাণ্ডুয়ায় প্রতিমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ১

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

সামাজিক সম্বন্ধ।

সমাজস্থিত প্রত্যেক লোকের সহিত আমাদিগের একটি না একটি সম্বন্ধ আছে। কেহ পিতা কেহ মাতা, কেহ পুত্র কেহ কন্যা, কেহ স্বামী কেহ স্ত্রী, কেহ ভ্রাতা কেহ ভগিনী কেহ বা প্রতিবাসী। আমরা যে কেবল কয়েকটি নিকটস্থ লোকের সহি-তই এইরূপ একটি না একটি সম্বন্ধে আবদ্ধ আছি এমন নহে। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত যতই সমাজের আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে, সমাজ যতই বিভিন্ন দেশীয়, বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে নিজ অধিকার মধ্যে আনিতেছে ততই আমাদের অন্য লোকের সহিত সম্বন্ধ বৃদ্ধি হইতেছে। পশুসমাজে সম্বন্ধ দুইটি বা একটি। অসভ্য জাতির মধ্যে সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত অধিক। সভ্য জাতির মধ্যে সম্বন্ধ অসংখ্য। সভ্য সমাজে লোকে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে, ভিন্ন পরিচ্ছদধারী হইতে পারে, এবং অন্য সকল বিষয়ে বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সমাজে তাহারা সকলেই একটি একটি গূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ আছে। যে সকল দেশের সহিত আমরা ব্যবসা করি এবং ঐ সকল দেশের সহিত আবার যাহারা ব্যবসা করে ইহারা সকলেই আমাদের সহিত এক সমাজভুক্ত অর্থাৎ আমাদিগের সহিত তাহাদিগের সকলের একটি সম্বন্ধ আছে। পিতা মাতা পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের সুখ ও স্বচ্ছন্দের উপরই যে আমাদিগের সুখ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করি-তেছে এমন নহে। সভ্য জাতির সমুদায় লোকের সহিতই সভ্য জাতির সমুদায় লোকেরই সম্বন্ধ থাকায় একজনের সুখের উপর অন্য সকল লোকের সুখ কিয়ৎ পরি-মাণে নির্ভর করিতেছে। মাঞ্চেষ্টার হইতে আমাদের দেশে কাপড় আইসে। এই জন্য মাঞ্চেষ্টরের লোকের সদ্ব্যবহারের উপর আমাদের সুখ অনেকটা নির্ভর করে। মাঞ্চেষ্টারের লোক যদি অলস বা বিলাসী

১ প্রবন্ধ রচয়িতার স্থানান্তর থাকায় মুদ্রাঙ্কনে দুই একটী ভুল হইল, সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহা সংশোধন করতঃ পাঠ করিবেন——প্র, স।

হয়, তাহা হইলে কাপড়ের মূল্য অধিক হইবে। মাঞ্চেষ্টারের লোকের অসাবধানতার জন্য যদি কাপড় উত্তম প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। মাঞ্চেষ্টারের লোক যদি শঠ হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রতারিত হইতে হইবে। মাঞ্চেষ্টারের লোকদিগকে যদি অধিক কর দিতে হয়, তাহারা যদি রাজা কর্ত্তৃক পীড়িত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের বিশেষ ক্ষতি। মাঞ্চেষ্টারের লোকদিগের পরিবারবর্গ মধ্যে যদি শান্তি না থাকে, যদি তাহারা রুগ্ন হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। এই একটি সামান্য দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা যত দূরদেশেই থাকি না কেন সামাজিক সম্বন্ধের নিমিত্ত আমরা অতি সন্নিকটে। এই একটি বিষয় বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা জানিতে পারি যে, এক মাঞ্চেষ্টারের লোকের সহিত সম্বন্ধ থাকার নিমিত্ত আমাদিগের আরও কত লোকের সহিত সম্বন্ধ আছে। যেমন আমাদিগের সুখ অনেকাংশে মাঞ্চেষ্টারের লোকদিগের উপর নির্ভর করিতেছে তেমনি মাঞ্চেষ্টারের লোকদিগের সুখ অন্য অনেক দেশের লোকের সুখের উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং আমাদিগের সুখ শুদ্ধ মাঞ্চেষ্টারের নয়, অন্য অনেক দেশের লোকের সুখের উপর নির্ভর করিতেছে। এইরূপেই যত সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে ততই অনেক অধিক লোকের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ বাড়িতেছে এবং তাহাদিগের সুখের উপর আমাদিগের সুখ কতকাংশে নির্ভর করিতেছে।

এইরূপে একটি একটি বিষয় লইয়া তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, একটি লোক জীবনের একটি মাত্র দিন যাপন করিতে হইলে পৃথিবীস্থ কত জাতীয় ও কত ধর্ম্মাবলম্বী লোকের উপর নির্ভর করে এবং নিজের সুখের জন্য ঐ সকল লোকের সুখ স্বচ্ছন্দের উপর নির্ভর করে। আমেরিকার যদি আমাদিগের ব্যবহারোপযোগী কোন বস্তুর উপর শুল্ক বৃদ্ধি হয় বা নূতন শুল্ক স্থাপিত হয়, তাহা হইলে আমরা তদ্দেশীয় করস্থাপনকর্ত্তাদিগের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হই, এবং যাহাতে ঐ শুল্ক হ্রাস হয় বা উঠিয়া যায় তাহার জন্য মনে মনে কত ব্যস্ত হই।

অতএব ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, আমরা নিজে সুখী ও স্বচ্ছন্দ হইবার জন্য যে কেবল নিজ পরিবারবর্গের সুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব, এমন নয়। সভ্যতার যতই বৃদ্ধি হইবে, সমাজ যতই বিস্তৃত হইবে, আমাদিগের সুখ ততই অপেক্ষাকৃত অধিক লোকের উপর নির্ভর করিবে। পর্ব্বতগুহাস্থিত যে অসভ্য নিজ হস্তে পশু শীকার করিয়া জীবন ধারণ করে, বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া শীত নিবারণ করে এবং অন্য অন্য জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য অন্য কাহারও উপর নির্ভর করে না, তাহাকে অবশ্য নিজ সুখের জন্য নিজ পরিবারবর্গ ব্যতীত কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয় না। অথবা আমরা যদি মনে মনে এরূপ কল্পনা করিতে পারি যে, একটী দ্বীপ যাহার সহিত অন্য কোন দেশস্থিত

কোন লোকের কোন কালে কোন সম্পর্ক নাই, যাহার লোকেরা ঐ দ্বীপোৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করে এবং অন্য দেশস্থ লোকদিগকে তাহাতে প্রবেশ করিতে দেয় না, সেই দ্বীপের লোকেরা তাহাদিগের নিজের সুখের জন্য অন্য দেশীয় লোকের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু সভ্য সমাজে সে নিয়ম চলিতে পারে না। আমরা নিজে অন্য দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার না করিতে পারি, অন্য কোন বিষয়ে তাহাদিগের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিতে পারি, কিন্তু তাহারা যদি আমাদিগের দেশে যাতায়াত করে এবং আমরা যদি তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহি, তাহা হইলেই অনেক বিষয়ে তাহাদিগের নিকট হইতে এমন কতকগুলি ভাব শিক্ষা করি, যাহাতে আমাদিগের জীবনের গতি হয়ত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ফলতঃ ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, যিনি যেরূপ স্থির-চিত্ত লোকই হউন না কেন; যদি তিনি অন্য একটি লোকের সহিত কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কেহই পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন, ঠিক সেইরূপ থাকিতে পারেন না। যেমন একটি উত্তপ্ত বস্তুর নিকট একটি শীতল বস্তু কিয়ৎক্ষণ রাখিলে উভয়ই একাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ উত্তপ্তটি শীতল হয় ও শীতলটি উত্তপ্ত হয়, সেইরূপ দুইটি লোককে একত্র রাখিলে উভয়ে ঠিক একাবস্থা নাই প্রাপ্ত হউক, কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইবেই হইবে। উভয়েই কিয়ৎ পরিমাণে পরস্পরের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। যেমন অসৎ সতের সঙ্গে থাকিলে সৎ হয়, তেমনি সৎ অসতের সঙ্গে থাকিলেও অসৎ হয়।

আমাদিগের পরস্পরের অবয়বাদি বিভিন্ন হইলেও আমাদিগের মানবীয় স্বভাবের কেমন একটা সাদৃশ্য থাকার নিমিত্তই যেন একজনের মানবীয় স্বভাব অপরের স্বভাবকে আকর্ষণ করে এবং বিশেষ সহানুভূতি দেখায়। অন্য কারণ না থাকিলেও ইহাই স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ সপ্রমাণ করিতেছে। স্বামী পণ্ডিত ও স্ত্রী মূর্খ হইলে সতত একত্রাবস্থান জন্য স্বামীর পাণ্ডিত্য ক্রমে হ্রাস হইয়া আসে।

আমরা অবশ্য প্রয়োজনীয় ও বিলাসের জন্য প্রতি দিন যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকি, তৎসমুদায় কিরূপে ও কতদূর দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়; পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোকের সহিত আমরা এই নিমিত্তই এক একটি সম্বন্ধে আবদ্ধ হই। ঐ সম্বন্ধ থাকার নিমিত্ত আমরা তাহাদিগের ভাল মন্দ কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী। যদি ঐ সকল ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে কোন একটি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে কতকগুলি লোক নিহত হয়, তাহা হইলে, যাহারা উহা ব্যবহার করে তাহারা কতক অংশে দায়ী; কারণ তাহারা যদি ঐ দ্রব্য ব্যবহার না করিত, তাহা হইলে ঐ দ্রব্য হয়ত প্রস্তুত হইত না। অতএব আমাদিগের যেমন স্বপরিবারের ও স্বদেশীয় লোকের কার্য্যপ্রণালী দেখিবার ক্ষমতা আছে, তেমনি পৃথিবীস্থ অপরাপর লোকের কার্য্য প্রণালী দেখিবারও ক্ষমতা আছে। ইহাতে কেহ বলিতে পারে না যে, তাহারা যাহাই

করুক না কেন, আমাদিগের তাহাতে কোন ইষ্টানিষ্ট নাই। আমরা আরও বলিতে পারি যে, তাহাদিগের মানবীয় স্বভাব ও আমাদিগের মানবীয় স্বভাব বিভিন্ন নহে; আমরা উভয়ে সন্নিকট না হইতে পারি, আমরা সমধর্ম্মাবলম্বী না হইতে পারি, কিন্তু আমাদিগের স্বভাব এক বলিয়া সেই স্বভাবের পরস্পরের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ধ্বংস করিতে আমাদিগের ক্ষমতা নাই।

যে সকল সম্বন্ধগুলির কথা উল্লিখিত হইল, তাহারা মানবসমাজের গ্রন্থিস্বরূপ—উহাদিগের দ্বারা মানব সমাজ একত্রিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ গুলি কৃত্রিম হইলেও মানব সমাজের উন্নতি উহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, ঐ গুলির ধ্বংস হইলে আর মানব সমাজের অস্তিত্ব থাকিবে না। যে দিন হইতে মানব সমাজ স্থাপিত হইল, সেই দিন হইতেই সমাজনেতারা এরূপ কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন, যাহাতে ঐ সম্বন্ধগুলি না নষ্ট হয়। যদিও ঐ নিয়মগুলি সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তথাপি সমাজের রক্ষা ও উন্নতি ঐ নিয়মগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐ নিয়মগুলি লইয়াই নীতিশাস্ত্র হইয়াছে। রাজনীতি উহার অংশ। যেখানে রাজা নাই সেখানে রাজনীতির প্রয়োজন নাই এবং যেখানে সমাজ নাই সেখানে সমাজনীতিরও প্রয়োজন নাই। যে নীতিশাস্ত্র সমাজের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিতেছে, সেই নীতিশাস্ত্রই আমাদিগের সহিত সমাজস্থ সমুদায় [illegible]কের সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপিত হই[illegible] তাহারই পোষকতা করিতেছে। কিরূপে জীবন যাপন করিলে আমাদিগেরও সমাজস্থ সমস্ত লোকের সুখ বৃদ্ধি হইবে, নীতিশাস্ত্র তাহাই বলিয়া দিতেছে। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নি, রাজা প্রজা প্রভৃতি লোকের কিসে সুখবর্দ্ধন হয়, ও তাহারা কি করিলে আমাদিগের সুখবর্দ্ধন হয়, ইহা শিক্ষা দেওয়াই ঐ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

কোন একটি কার্য্য একজন পণ্ডিতের মতে নীতিশাস্ত্রসম্মত; হয়ত সেইটিই অন্য একটি লোকের মতে শাস্ত্রসম্মত নয়। কিন্তু সমাজের উন্নতি যে নীতিশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য সে বিষয়ে তাঁহারা ভিন্নমত নন। আমরা অতি বাল্যকাল হইতেই ঐ নীতিশাস্ত্র মতে কার্য্য করিতে বাধ্য হই। সমাজ হইতে দূরে থাকিলে এবং সমাজস্থ সম্বন্ধে আবদ্ধ না হইলে আমাদিগকে ঐ নীতিশাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করিতে হয় না। কিন্তু যতক্ষণ সমাজে থাকিব ততক্ষণ ইচ্ছা না করিলেও আমরা তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হই। বস্তুতঃ আমরা ইচ্ছা করিয়া কখন ঐ সকল সম্বন্ধে আবদ্ধ হই না; আমাদিগের ইচ্ছা ঐ সমস্ত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেছে না; আমরা ইচ্ছা করি বা নাই করি সমাজে থাকিতে হইলেই আমাদিগকে উহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। ফলতঃ যতই দম্ভ করি না কেন, আমরা এ বিষয়ে কেহ স্বাধীন নই। আমরা সকলেই সমাজের দাসত্ব শৃঙ্খল পরিধান করিয়া থাকি। আমাদিগের কার্য্যপ্রণালী আমাদিগের ইচ্ছানুসারে হয় না; আমাদিগকে নীতিশাস্ত্রোক্ত নিয়মে কার্য্য করিতে হইবে। আমরা পরাধীন

আমরা সমাজের ক্রীতদাস। সমাজ আমাদিগকে যাহা বলিতেছে, আমরা নীরবে তাহাই করিতেছি। আমারা উহার নিয়ম অতিক্রম করিতে পারি না; যদি আমরা নিয়ম অতিক্রম করি তাহা হইলে আমাদিগের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকে না। আমাদিগের ক্রন্দনে সমাজ কর্ণপাত করে না। আমাদিগের অনুতাপে কোন ফলই হয় না। সমাজের নিয়ম অবহেলা করিলে সমাজস্থ সমুদায় লোক একত্রিত হইয়া আমাদিগকে বিশেষ শাস্তি দেয়। যাহাতে আমরা ঐ নিয়ম অবহেলা না করি, সমাজ তদ্বিষয়ে যত সচেষ্ট হউক বা না হউক আমাদিগের দোষের জন্য শাস্তি দিতে বিশেষ অগ্রসর। আমি দোষ করিতে যাইতেছি তখন সমাজ আমাকে কিছুই বলিবে না, কিন্তু যেমন দোষ করিব অমনি আমাকে শাস্তি দিবে। অধিকাংশস্থানে অপরাধীদিগের নিজের কিছু দোষ না থাকিলেও তাহারা কার্য্যতঃ অপরাধী হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে সমাজ দেখিবে না যে, বাস্তবিক তাহারা অপরাধী কি না। সমাজ তাহাদিগের উপর একটুও দয়া করিবে না। ফলতঃ যাহার যে গুণটি থাকিতে পারে না, সমাজ তাহার নিকট হইতে সেইটিই চাহিতেছে। যে সামাজিক নিয়মানুসারে আজন্ম অসতের সহিত সহবাস করিতেছে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও অগত্যা তাহাদিগের সঙ্গ ছাড়িতে পারে না এবং সমাজ নিজেই যাহাকে সাধু হইতে দেয় নাই, সমাজ অদ্য তাহাকে সাধু হইতে বলিতেছে। যে ব্যক্তি কখন অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা কাহাকে বলে জানে না, এবং এতাবৎ কাল সমাজের প্রিয় ছিল, আজ তাহার দুর্ভাগ্য বশতঃ সমাজ তাহাকে অধ্যবসায়ী ও সহিষ্ণু হইতে বলিতেছে। যে চিরকাল বিলাসী, সমাজ যাহাকে কখনও মিতব্যয়ী হইতে দেয় নাই, অদ্য সমাজ তাহাকে মিতব্যয়ী হইতে বলিতেছে। সমাজ এতাবৎকাল যাহাকে মিথ্যা কথা কহিতে শিখাইয়া আসিয়াছে, অদ্য তাহাকে সত্যবাদী হইতে বলিতেছে। সমাজ যাহাকে কোন কালে বিদ্যা শিক্ষা দেয় নাই, আজ সে মূর্খ বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতেছে। ফলতঃ সমাজের কার্য্যপ্রণালী দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে ব্যক্তি অতি শৈশব কালে পিতৃ-মাতৃ-হীন হইয়া কোন সুপরামর্শ-দাতার সাহায্য না পাইয়া অসৎসঙ্গে পতিত হইয়া অতি বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গের অভাবে মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা ও অত্যন্ত কলুষিত ব্যবহার শিক্ষা করিয়া অবশেষে স্বীয় জীবন ধারণার্থেই হউক, অথবা অন্য কোন অপরিহার্য্য কারণেই হউক, চৌর্য্য অপরাধে দণ্ডিত হইয়া অবশেষে দ্বীপান্তরিত হইল, আমরা তাহার জীবন বৃত্তান্ত শুনিয়া কেবল হাস্য ও কৌতুক করিয়া থাকি। যে রমণী অতি বালিকাবস্থায় পতিহীনা হইয়া স্বীয় ও সন্তানের জীবন ধারণার্থ সামান্য পরিচারিকার বা পাচিকার কার্য্য স্বীকার করিয়া অগত্যা কেবল দাস দাসীর সঙ্গ গ্রহণ করিল এবং অহঙ্কৃতা প্রভুপত্নীর অসহ্য ও অন্যায় তিরস্কারে ও দাসদাসীর ব্যঙ্গের পাত্র হইয়া উঠিল এবং মনে মনে শতবার নিজ প্রাণ হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেও সন্তানস্নেহ

বশতঃ তিরস্কারাদিকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া অবশেষে হয়ত একান্ত অসহ্য হইলে অসৎ সঙ্গের নিমিত্ত নিজ সতীত্ব ত্যাগ করিতেও বাধ্য হইল, আমরা তাহার ইতিহাস শুনিয়া উপহাস করি। যে রমণীর স্বামী অত্যন্ত দুরাচার, দিনান্তেও যে স্বামীকে একবার দেখিতে পায় না; যে সধবা হইয়াও বিধবা, যে জীবিতাবস্থাতেই তাহার নিজের কবর হইয়া উঠিয়াছে, সে রমণী যদি অসহ্য দুঃখ ও ক্ষোভ বশতঃ ব্যাভিচারিণী হয়, অথবা আত্মহত্যা করে, তাহা হইলে আমরা তাহার ইতিহাস শুনিয়া অণুমাত্রও সহানুভূতি প্রদর্শন করি না। বাস্তবিক আমরা একবারও ভাবি না, আমরা ঐ অবস্থায় পতিত হইলে কিরূপ কার্য্য করিতাম, আমরা ঐরূপ দুঃখ অপনয়ন করা দূরে থাকুক তাহাদিগের প্রতি এক তিলমাত্রও সহানুভূতি দেখাই না; তাহাদিগের দুঃখে আমাদিগের চক্ষু হইতে এক বিন্দুও বারি পতিত হয় না। উহা আমাদিগের পাষাণ হৃদয়কে দ্রব করিতে পারে না। হায়! আমরা নিজের সুখের জন্য কত-দূরদেশীয় লোককে ভ্রাতৃভাবে সম্বোধন করিতেছি; কিন্তু প্রতিবেশিদিগের দুঃখ দেখিয়াও তাহাদিগকে ভ্রাতা ভগ্নী বলিয়া বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহাদিগের দুঃখে দুঃখী হইতে পারি না। ফলতঃ সমাজের বন্ধন যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে তেমনি আবার শিথিলও হইতেছে।

শ্রীসমুতুল চন্দ্র দত্ত।

স্বামী সকাশে।

ঘরের বাহিরে যাইও না প্রিয়তম! একটু সুস্থির হইয়া ব'স দেখি, আমি একবার নয়ন ভরিয়া দেখি। দেখি তোমার চাঁদ পানা মুখখানি, ধরি তোমার রাঙ্গা পা'দুখানি। বলি প্রাণেশ্বর! তুমি অমন দণ্ডে দণ্ডে বাহিরে যাও কেন বল দেখি? আমি তোমার কে বল দেখি? তোমার সহিত আমার কি সম্বন্ধ জান কি! এই যে হেমকিরণ জাল ছড়াইতে না ছড়াইতে প্রিয়সখী নিদ্রাদেবীর নিকট বিদায় লইয়া সমস্ত দিন খাটি, কার জন্য বল দেখি? সংসারে আমার এমন আপনার কে, যার জন্য আমার এত মাথাব্যাথা! সজনে বিজনে, সংসারে শ্মশানে, সুখে দুঃখে, সৌভাগ্যে দারিদ্রে, রোগে শোকে; আলোকে আঁধারে, জাগরণে স্বপনে, এত যে ভাবি, এত যে কাঁদি, হৃদয়বান! বুঝিতে পার কি? প্রণয় কাহাকে বলে জান কি? ভালবাসা কি সামগ্রী অনুভব করিতে পার কি? আমার হৃদয় রতন! হৃদয় চাপিয়া বলি, হাসিওনা প্রাণেশ্বর! পাপিনী আজ মুখরা, অনেক কথা বলিবে, অনেক বাসনা জানাইবে, অনেক তৃপ্তি পাইবে।

বলি কি পুরুষ বর! পলকে প্রলয় কথাটা বুঝিতে পার? তোমার তিলেক অদর্শনে আমি যে দিশেহারা হই, তুমি হও কি? প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ের পরতে পরতে আমার চিত্র আঁকিয়াছ কি? দুদণ্ড না দেখিলে অধিনীর জন্য কি প্রাণ কাঁদে? জীবন সর্ব্বস্ব! বল, বল তোমায় আমি যত ভালবাসি, তুমি

ত্ত বাস কি? নির্ম্মল শারদীয় গগণের পূর্ণশশী! সুধাই শশী! অভাগিনীকে কলঙ্ক করিয়া হৃদয়ে ধরিয়াছ কি? চক্ষু মুদিও না হৃদয়েশ্বর! ফিরাও! ফিরাও! আঁখি ফিরাও! তোমার ওই পূর্ণায়ত ঢলঢল লোচন যুগল দেখিতে আমি বড় ভালবাসি। সুন্দর! এত সৌন্দর্য্য কোথায় পাইলে? এ অমূল্য সৌন্দর্য্য-রাশি বিলাইও না. কলঙ্কিনীরা পথপানে চাহিয়া থাকে। মজিও না, স্বামিন্! অধিনী একা ভোগ করিবে। একা দেখিবে, একাই হাসিবে। দেখিতে দেখিতে মরিবে। আহা, এই সুকোমল অঙ্কে মরিতে কত সুখ!

থাক থাক, পলাও কেন নাথ! তোমার সহিত যখন আমার নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে; যখন তুমি স্বামী আমি স্ত্রী, তখন আর লজ্জা কি? কপোত কপোতী দেখিয়াছ কি? তুমি কপোত আমি কপোতী। তুমি যেখানে আমি সেখানে। তবে কেন কুণ্ঠিত হও? বাহিরে যাইতে চাই না, দশজন পুরুষের মুখ দেখিতে অভিলাষী নহি। চাই কেবল তোমায় দেখিতে, সাধ কেবল তোমার সুধামাখা কথা শুনিতে। তোমার মুখ দেখিলে তোমার অমীয়ঢালা কথা শুনিলে দৈনিক পরিশ্রম বিস্মৃত হই, হৃদয়ে সুখের তরঙ্গ ছুটে, আমি আত্মহারা হই। তোমায় মলিন দেখিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, আমিও মলিন হইয়া যাই। তোমায় হাসিতে দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ লহরী ছুটে, লহর মালায় গা ভাসাইয়া বহুদূর বহুদূর চলিয়া যাই।

অত্তুঙ্গ-গিরি-শেখর সন্নিভপ্রদেশে তোল কেবল এক দণ্ড শঠচূড়ামনি! অধীর হও, অস্থির হও, কেবল এক মুহূর্ত্ত, প্রাণেশ্বর! যখন আমায় ভাল করিয়া দেখ, যখন আমায় বড় ভাল লাগে। ছি হৃদয়শ্বর! তুমি বড় অপ্রেমিক। প্রাণে প্রাণ মিশাইতে পার না? এক দণ্ড অধীর হইলে কি হইবে? আমি যে তোমায় দেখিলেই অধীরা হই। প্রাণে যে বেগ মানে না, কোলে ঝাঁপাইতে ইচ্ছা করে।

তুমি বাহিরের কাজ কর্ম্ম সারিয়া গৃহে আসিবে। হাসিতে হাসিতে আমায় ডাকিবে। আমি ছুটিয়া বাহির হইব। তুমি আমার দেখিবে আমি তোমায় দেখিব, পরস্পর হাসিব। আমি তোমার হাত ধরিয়া খট্টাঙ্গের উপর বসাইব। সহস্তে পরিচ্ছদমুক্ত করিব, বীজন করিব। স্বহস্তে পা ধুয়াইব। তুমি আমায় দেখিতে থাকিবে, আর আমি আমার কেশগুচ্ছ দিয়া তোমার এই রাজীব চরণ মুছাইব। তুমি আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইবে, আমি তোমার পার্শ্বে বসিব। কেমন আছ? কেমন ছিলে? জিজ্ঞাসা করিবে তবে ত। সেটি কেমন বল দেখি? মনে ধরে নাকি? সংসারে যদি কিছু সুখ থাকে ত আমায় ভালবাস, সুখ পাইবে। আমায় প্রাণ পুরিয়া ভালবাসিতে দাও, আমিও সুখী হই। সুখময়! তুমি ত প্রেমিক, বল দেখি, যে কথা গুলি বলিলাম মনে ধরে কি না?

কেবলই হাসি? ও হাসি দেখিতে যদিও প্রয়াসী, দুষী তোমায়, তুমি বড় অল্পভাষী। তুমি কাছে থাকিলে আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারি না, সদাই বকি। না কহিলে আমার পেট ফুলিয়া উঠে,

অস্থিরা হই। তাই কই, প্রাণনাথ! তোমার সনে। তুমিও যোগ দাও, তবেত ভালবাসি।

বলি, জীবন ধন! আমি কি কুরূপা? কুরূপা হই আর সুরূপাই হই। তোমার ত আদরের বটে? কুরূপা হইলেও তোমায় সুরূপা করিয়া লইতে হইবে। যে হেতু আমি তোমার পরিণীতা ভার্য্যা। কিন্তু সুন্দর! তুমি আমার যেমনটি আছ অমনিটিই থাক। মরি মরি রসরাজ অমনিভাবে অমনি ঘাড় বেঁকাইয়া বসিয়া থাক, আমি দেখি আর আপনাকে ধন্যা মনে করি।

ইষ্টদেব! তুমিই আমার দেবতা, আমি তোমাকেই ধ্যান করিতে থাকি। এ ধ্যান যেন না ভাঙ্গে। যেন তোমার পায়ে সচন্দন পুষ্প দিতে দিতে আমার অক্ষয় স্বর্গ হয়। আমি শিব জানি না, কালি জানি না। জানি কেবল তোমাকে। অতএব, হে ইষ্টানিষ্টকারী বিধাতা! তোমার পায়ে শত শত বার নমস্কার। তুমি দশ দিক আলো করিয়া আমার হৃদয়ে বিরাজ কর। আমি অতৃপ্ত নয়নে তোমায় দেখি। তোমার সেবা করি।

প্রাণেশ্বর! হৃদয় সর্ব্বস্ব! জীবনালোক ভবজলধিপারের কাণ্ডারি! আমি দাসী তোমার সেবায় নিযুক্তা। তুমি পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাক। আমি প্রফুল্লচিত্তে তোমার সেবা করি। সেবা করিতে করিতে মরি। মরিলেই অব্যর্থ অক্ষয় স্বর্গ।

শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী।

আর্য্য-উপাসনা-তত্ত্ব।

১।

ভারতীয় উপাসনা-তত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ত্তমান ভারতসমাজে অনেক বিরোধ অনেক মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের প্রতিমাপূজাই উক্ত বিরোধের—মতভেদের প্রধান কারণ। ফলতঃ প্রতিমাপূজার বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে উপাসনাপদ্ধতিও পরিস্ফুটভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। কারণ, প্রতিমাপূজা আমাদিগের উপাসনার অধিক স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যে প্রতিমাপূজার জন্য ভারতবাসীর পৌত্তলিক বলিয়া ঘোর কলঙ্ক রটিয়াছে, যে প্রতিমাপূজার নিমিত্ত ভারতবাসী প্রতিপদেই উপহাসাস্পদ হইতেছেন, সেই প্রতিমাপূজা ভারতের সর্ব্ব শাস্ত্রে সকল কালেই প্রচারিত রহিয়াছে। ভারতের প্রতিমাপূজা ভারতের অজ্ঞানাবস্থার বস্তু নহে; উহা ভারতের জ্ঞানালোকে সমুদ্ভাসিত। উপাসনাসাগরে ভাসমান হইয়া তাহার গভীর গর্ব্বস্থ প্রতিমারত্নের অপলাপ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ভোগসুখ পরাঙ্মুখ স্বার্থদৃষ্টিবিবর্জ্জিত পরোপকারনিরত সত্যপরায়ণ ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ যাহা সাধারণের উপকারোদ্দেশে দেশমধ্যে প্রচারিত ও শাস্ত্রমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা

কখনই দর্শনমাত্রেই পরিত্যজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, যে প্রতিমাপূজার প্রবর্ত্তনের জন্য, সভ্য জগতে সুবিজ্ঞ বলিয়া সুপরিচিত আর্য্য ঋষিগণ আমাদিগের স্থূল দৃষ্টিতে অজ্ঞ বলিয়া প্রতীত হইতেছেন, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, সেই প্রতিমাপূজাই তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। ভারতের প্রতিমাপূজা ভারতবাসীর পৌত্তলিকতা নহে। পৃথিবীর অপরাপর অসভ্য জাতি যেরূপ বালকের ন্যায় স্বরচিত পুত্তলিকার বা সৃষ্টবস্তুর পূজা করেন, ভারতবাসী সেরূপ স্বরচিত পুত্তলিকার বা সৃষ্টবস্তুর পূজা করেন না, তাঁহারা তাহাদিগের তপোযোগে তত্তদ্বস্তুতে আবির্ভাবিত দেবতার পূজা করেন। ঐ প্রতিমাও আবার তাঁহাদিগের মনঃকল্পিত মূর্ত্তিবিশেষ নহে; উহা সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরের সৃষ্টিকল্পনার ন্যায় সত্যকল্পনা।

শাস্ত্রবিধি অনুসারে উপাস্য বিষয়কে অন্তঃকরণের বিষয়ীভূত করা বা অবিচ্ছেদে তাঁহাকে চিন্তা করার নামই উপাসনা। চিন্তনীয় বিষয়ের আকার ব্যতিরেকে তাহার চিন্তাই হয় না, সুতরাং নিরাকারের উপাসনাই হইতে পারে না। মানসিক ভাব সকলও নিরাকার নহে; তাহাদিগেরও বিশেষ বিশেষ আকার আছে। ভয় ক্রোধাদি মানসিক ভাব সকল যদি নিরাকার হইত, তবে তাহাদিগের পরস্পর ভেদও অনুভূত হইত না। ফলতঃ, এই কারণেই অর্থাৎ উপাসকের উপাসনা কার্য্যের অমূলকতার পরিহারের জন্যই সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর বিবিধ সত্যমূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছেন। ঈশ্বর চিন্ময়, তাঁহার মূর্ত্তি সকলও চিন্ময়। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার মূর্ত্তি সকল তাঁহার পরিচায়ক। তিনি নির্দ্দোষ, তাঁহার মূর্ত্তি সকলও সর্ব্ব-দোষ-পরিশূন্য। তাঁহার প্রাকৃত শরীর নাই, তাঁহার মূর্ত্তি সকল ত অপ্রাকৃত আনন্দময়। আনন্দময়ের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ মূর্ত্তি সকল উপাসকের উপাসনার জন্য, ভোগের জন্য নহে।

" চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

ঈশ্বর বিশ্বব্যাপক। বিশ্ব সংসারের সর্ব্বত্রই তাঁহার অধিষ্ঠান। সৃষ্ট জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহার অবস্থিতি হইলেও তাহা, ব্যক্ত না থাকায় জীবের অনুভবযোগ্য হয় না। এই নিমিত্তই ঈশ্বরের আবির্ভাবমাত্রই উপাসকের উপাসনাসামর্থ্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। বিনা উপাসনাতে ঐ আবির্ভাব কখনই ব্যক্ত হইতে পারে না।

ঈশ্বর সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিত। অনন্ত আকাশ তাঁহার মহিমার পরিচায়ক এবং সূক্ষ্মতম পরমাণু তাঁহার অণিমার পরিচায়ক; অর্থাৎ তিনি আকাশের ন্যায় ব্যাপক হইয়াও সূক্ষ্মতম পরমাণু মধ্যেও অবস্থান করিতে সমর্থ। তাঁহার ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যও কখন উপাসনা ব্যতিরেকে অনুভূত হইতে পারে না। উপাসক ভিন্ন তাঁহার মহিমা বা অণিমা অবগত হইতে পারেন না।

কার্য্যমাত্রেরই বিশেষ বিশেষ অধিকারী আছে। বিষয়াশক্তিশূন্য বিশ্বমূর্ত্তি বিরাট পুরুষের উপাসক হইতে বিষয়াকৃষ্টচিত্তচঞ্চলস্বভাবসাধক বহুদূরবর্ত্তী। যিনি স্বীয় মনো-

মন্দিরে বিরাট্ পুরুষের বিরাট্-দেহের—বিশ্বব্যাপক বিশ্বপতির চিন্তা করিতে—ধারণা করিতে সমর্থ, তাঁহার জন্য শৈলাদিময়ী প্রতিমার বিধান হয় নাই। তবে যিনি ক্ষণকালের জন্য মনকে আকাশের ন্যায় শূন্য করিতে বিষয়-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত করিতে অভ্যাস করেন নাই, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনোমোহন প্রতিমার উপাসনাই কি সুবিহিত হইবে না? যাঁহার চিত্ত বিষয়াকর্ষণে সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে, তিনি কখন অনন্তের ধারণার জন্য হৃদয়ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে স্বপ্নেও চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার পক্ষে কি প্রতিমাপূজাই বিহিত হইবে না? তবে যিনি বিশ্বপতির আনন্ত্য বিশ্বময় চিন্তা করিতে সমর্থ, এমন নির্ব্বোধ কে আছে যে, তাঁহার জন্য ভৌতিক প্রতিমার ব্যবস্থা করিবে? যিনি বিশ্বরচনার প্রতি পরমাণুতে বিশ্বনিয়ন্তার সৌন্দর্য্য-কৌশল অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নিখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপহার প্রদানে সমর্থ হইয়াছেন, কে তাঁহার জন্য পত্রপুষ্পাদি উপহারের উপদেশ প্রদান করিবে?

যে আর্য্যশাস্ত্র শৈলাদিময়ী অষ্টবিধ প্রতিমার মধ্যে মনোময়ী প্রতিমার উপদেশ করিয়াছেন। যে আর্য্যশাস্ত্র ঈশ্বরে সর্ব্বস্বার্পণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে আর্য্যশাস্ত্র প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠাদির নিয়ম করিয়াছেন সেই আর্য্যশাস্ত্র যে কুসংস্কারের উৎপাদক, এরূপ উক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, আর্য্যের প্রতিমাপূজা জড়ের পূজা নহে; উহা, ঐ প্রতিমা যে চৈতন্যের প্রতিরূপ, তাহাতে আবির্ভূত সেই চৈতন্যেরই পূজা। আর্য্যগণ, জড়ের উপাসনা করা দূরে থাকুক, জড়ের উপাসনাতে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়, বিবেচনা করিতেন। এক সময় একজন মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন,—

"শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিং বা প্রতিমায়াং হরের্ময়া?"

মানব প্রতিমাপ্রিয়। মানব কি বাহ্যিক কি আন্তরিক, কোন কার্য্যই প্রতিমা ব্যতিরেকে ভালবাসেন না বা প্রতিমা ব্যতিরেকে ভালবাসিতে পারেন না। মানবের প্রতিমায়—দেবপ্রতিমায় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশিত রহিয়াছে। যাহা বিশ্বের প্রতিচ্ছবি যাহা বিশ্বপতির প্রতিচ্ছবি, যাহাতে দেবশক্তির বিকাশ, আবির্ভাব ও অভিজ্ঞান হইয়াছে, তাহা অবশ্য পূজনীয়। যে প্রতিমা চিত্তের আকর্ষক, যে প্রতিমা সর্ব্বরসের উদ্দীপক, যে প্রতিমা ভক্তিভাবের প্রকাশক সে প্রতিমা কখনই উপহাসের সামগ্রী হইতে পারে না। যে প্রতিমা চিত্তের একাগ্রতার প্রধান সাধন, যে প্রতিমা চিত্তবিক্ষেপ-রোগের একমাত্র মহৌষধ তাহা কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। কল্পনাকুশল মানব পাছে স্বকপোলকল্পিত প্রতিমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া অধঃপতিত হয়েন, এই জন্যই—তাঁহার অধঃপতন নিবারণের জন্যই—তাঁহার উন্নতির জন্যই—করুণাময় জগদীশ্বর তাঁহাকে প্রতিমাপ্রিয় করিয়া এবং আপনারও উপযুক্ত প্রতিমা কল্পনা করিয়া জীবত্মাকে পরমাত্মার সহিত এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন। শূন্যচিন্তায় কি কখন চিত্তের বিক্ষেপ বিদূরিত হইতে পারে? শূন্যচিন্তায় কি মানবের মনে আন-

ন্দের আবির্ভাব হইতে পারে? যিনি শূন্য-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া স্বকপোলকল্পিত প্রাকৃতিক উপহারে কল্পিত ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছেন, পবিত্র পুষ্পচন্দনাদি উপহারে প্রতিমার পূজায় নিমগ্নচিত্ত ভারতবাসী কি তদপেক্ষা অপকৃষ্ট সাধক? ভারতবাসীর উপাস্য দেবতা, তৎপ্রতিমা অথবা তদীয় উপহার সকল কিছুই তাঁহার কল্পনার সামগ্রী নহে; সে সকলই সেই সত্যসঙ্কল্প পুরুষের সত্যসঙ্কল্পনপ্রাসূত। ইহাতেও যদি ভারতবাসী নিন্দনীয় হয়েন, হউন, তিনি সে নিন্দাভার অবনত মস্তকে বহন করিতে প্রস্তুত।

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। তিনি যেরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনে সমর্থ, তদ্রূপ উপাসকের হিতের নিমিত্ত উপাসনার অনুকূল শরীরধারণে বা তদনুকূল মৃত্তিকাদিনির্ম্মিত প্রতিমাতেও আবির্ভূত হইতে পারেন। তাঁহার ঐ আবির্ভাব জীবের জন্মের ন্যায় অদৃষ্টাধীন নহে, কিন্তু স্বেচ্ছাধীন। ঐ আবির্ভাব যদিও আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করি না বটে, কিন্তু তথাপি উহা অসম্ভব নহে। কারণ বিজ্ঞানশাস্ত্রই প্রমাণ করিয়া দিবে যে, জড়ে চৈতন্যের আবির্ভাব জীবে আবির্ভাবের ন্যায় সম্ভবপর। সম্ভবপর হইলেও ঐ আবির্ভাব সকলের অনুভবযোগ্য হইতে পারে না। জ্ঞানমাত্রই জ্ঞান-সাধন-বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তির অপেক্ষা করে। উলূক যে সূর্য্যকিরণেও বস্তু দর্শন করে না, তাহা সূর্য্যের দোষ নহে, কিন্তু পেচকের চক্ষুর দোষ। প্রতিমাতে দেবতার আবির্ভাবও তাদৃশ শক্তি ব্যতিরেকে অনুভূত হইতে পারে না। আবার ঐ আবির্ভাব সাধকের তপোযোগ ব্যতিরেকেও হয় না। যে কোন ব্যক্তি যে স্বয়ং ইচ্ছানুসারে যে কোন স্থানে দেবতার আবির্ভাব করাইবেন তাহার শক্তি নাই। দেবতার আবির্ভাব করাইতে বিধিবিধানে সাধন চাই। কোন সাধন করিব না, অথচ প্রতিমাতে দেবতার আবির্ভাব হইল না বলিয়া শাস্ত্রবাক্য—আপ্তবাক্য—বিজ্ঞানবাক্যকে অসত্য বলিয়া সাধক ব্যক্তিকে উপহাস করিব, তদপেক্ষা নির্ব্বোধের কার্য্য আর কি আছে?

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

পরমাণুর বিনাশ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, পরমাণুর ধ্বংস নাই। অনবরত পরিবর্ত্তিত হইয়া দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে লীন হইলেও জগতের সমস্ত পরমাণু সমষ্টি সর্ব্বদাই সমান থাকে। আমরা যে সকল ব্যাপার দেখিয়া সহসা মনে করি যে কোন এক পরমাণুপুঞ্জ বা বস্তু বিনষ্ট হইয়া গেল, তাহারা কেবল মাত্র দ্রব্যের রূপ পরিবর্ত্তনে সমর্থ আর কিছুই নহে। যেমন গৃহে প্রদীপ জলিতেছে, তৈল ক্রমে কমিয়া কমিয়া ফুরাইয়া যাইতেছে;—এমন অবস্থায় অবশ্য মনে হইতে পারে যে দ্রব্য নিঃশেষরূপে লোপ পাই-

তেছে ;—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে ; তৈলের রূপান্তর হইতেছে মাত্র ; তৈল আর তৈলাবস্থায় থাকিতেছে না সত্য, কিন্তু তাহার একটিও পরমাণুর বিনাশ হইতেছে না, বায়ুর সহিত মিশাইয়া তৈল, জল ও মনুষ্যের প্রশ্বাস যে পদার্থ, তাহাই হইতেছে।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, পরমাণু এই অর্থে নিত্য যে, আমরা সচরাচর যে সকল প্রক্রিয়া দেখিতে পাই অথবা যে সকল প্রক্রিয়া আমাদের আয়াসসাধ্য তাহাদের এমন সাধ্য নাই যে পরমাণুর বিনাশ করে, তাহারা কেবল দ্রব্যের রূপান্তর সাধনে সমর্থ। এস্থলে ইউরোপের পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহাদের মতভেদ স্বীকার করা যায় না ; কারণ সে পণ্ডিতগণও অবশ্যই কোন অমানুষী ক্রিয়ার কথা বলেন না, কিন্তু ভারতের ধীমানৃগণ এই কথা বলিয়াই নিরস্ত হন না। তাঁহারা আরো বলেন যে, মহাপ্রলয়কালে পরমাণুরও বিনাশ হইবে,—কিছুই থাকিবে না। এই মতভেদও বিবাদের সূত্রপাত। তর্ক বিতর্কে কোন আবশ্যক নাই ; কারণ ভারতের মতে কাহারও বিশেষ আস্থা নাই। এখন পাশ্চাত্যেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক যাহা বলেন তাহাই শিরোধার্য্য। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দুমতের কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইলেও অধিকাংশই বলেন যে, হিন্দুদের সকল কথাই ঐরূপ ; তাঁহারা বড় দেখা শুনার উপর নির্ভর না করিয়া কল্পনা দ্বারাই সতত চালিত হইতেন। পরমাণুর ধ্বংসও তাঁহাদের সেইরূপ কল্পনা। কেবলমাত্র কথাটা বলা আছে. তাহার প্রমাণের নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ নাই। সত্যই কোন প্রমাণ দেওয়া নাই। কিন্তু প্রমাণ দেওয়া না থাকিলেই যে বিনা প্রমাণে কেবল কল্পনায় স্থির হইয়াছে একথা বলা কি কাল্পনিক নহে? হিন্দুর চিকিৎসাশাস্ত্রে কোন ঔষধ আবিষ্কার কেমন করিয়া হইল তাহার কোন কথা নাই এবং বহুদর্শনের ১ কোন্ উল্লেখ নাই ; হিন্দুর অঙ্ক শাস্ত্রে কোন প্রমাণ দেওয়া নাই। তবে কি এ দুইটিও কাল্পনিক? এ দুইটি শাস্ত্র যে অনেকাংশে অভ্রান্ত তাহা সকলেই স্বীকার করেন ; সুতরাং প্রমাণ লেখা না থাকিলেই কল্পনা উদ্ভূত এ কথাটা হিন্দুর পক্ষে খাটে না। আর যদি বা তাহাই হয় যে, হিন্দুরা কেবল কল্পনাদ্বারা শাস্ত্র লিখিতেন তাহাতেই বা কি? যাঁহাদের কল্পনাজাত অঙ্কাদি কয়েক শাস্ত্র নিউটন প্রভৃতির বহু যত্ন ও নানা উপায় নির্দ্ধারিত বিষয়ের সহিত ঐক্য হয়, তাঁহাদের কল্পনার উপর অনায়াসেই ত নির্ভর করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সকল বিরোধ প্রবর্ত্তক কথার আবশ্যক নাই। যখন কেবলমাত্র বাক্যটি আছে প্রমাণ নাই, তখন বাক্যটি সত্য কিনা দেখিলেই যথেষ্ট হইবে। হিন্দুরা কেমন করিয়া জানিয়াছিলেন, সে বিষয় কোন অনুসন্ধান না করিয়া আমরা কেবল এই দেখিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পরমাণুর অবিনশ্বরতার সমর্থনে যে প্রকার প্রমাণ দিয়া থাকেন সে প্রকারের প্রমাণ শেষ বিনশ্বরতার কতদূর পক্ষ। এমন স্থলে ইউরোপীয় পণ্ডিত-

১ Observation.

বর্গের সাধারণ প্রমাণটি দেওয়া বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

আদিম অসভ্য অবস্থায় কিম্বা সভ্যতার প্রথম অবস্থায় যখন লেখা পড়ার বিশেষ চর্চ্চা হয় নাই ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় নাই তখন সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে পরমাণু অতি সহজে বিনষ্ট ও নির্ম্মিত হইতে পারে; কারণ নানা দ্রব্য আমাদের দৃষ্টির ভিতর সর্ব্বদাই দৃশ্যমান হইতে অদৃশ্য ও অদৃশ্য হইতে দৃশ্যমান অবস্থায় পরিণত হইতেছে। অগ্নির উত্তাপে জল শুষ্ক হইয়া যায়, তাঁহারা বোধ করিতেন, জল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কর্পূর অনাবৃত রাখিলে বাষ্পাকারে অদৃশ্য হয়; আজিও অনেকের ধারণা কর্পূরের বিনাশ হয়। কিন্তু সত্য আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেই। ক্রমে লোকে দেখিলেন যে, জল শুখাইলেও বাষ্পাকারে বায়ুতে থাকে। ক্রমে বুঝিলেন, যে ঐরাবত সমুদ্র হইতে শোষণ করিয়া বৃষ্টি আকারে পৃথিবীতে জল নিক্ষেপ করে সে কেবল বাষ্পরাশি। পরে মনুষ্যের বুদ্ধি ও ক্ষমতা বাড়িল ও তাহার সঙ্গে জানিবার ইচ্ছাও বিলক্ষণ বলবতী হইল। রসায়ণ শাস্ত্র এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিল। আমরা দেখি বৃহৎ এক খণ্ড কাষ্ঠ পোড়াইলে অতি অল্প মাত্র ছাই অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু বাস্তবিক তাহার প্রত্যেক অংশই দৃশ্য বা অদৃশ্যাকারে থাকিয়া যায়। আপাততঃ জ্ঞান হয় যে, ক্ষুদ্র এক বীজ হইতে অতি বৃহৎ শাখা প্রশাখা সম্পন্ন বৃক্ষ জন্মায়, কিন্তু তদন্তে জানা গিয়াছে যে, বৃক্ষের প্রত্যেক অংশই মৃত্তিকাস্থ ও বায়ুস্থ পদার্থ বিশেষের সংযোগে গঠিত। এই রূপ এক একটি করিয়া যত লোকে যত বিষয় দর্শন করিয়াছেন তাহার কোনটিতেই পরমাণুর ধ্বংস প্রমাণ নাই। সুতরাং পরমাণু নিত্য এই সিদ্ধান্ত ক্রমে নিশ্চয়াকার ধারণ করিয়াছে।

এখন আমাদের দেখা উচিত যে, উপরি-উক্ত ধরণের প্রমাণ পরমাণু সমষ্টির শেষ বিনাশের কতদূর সমর্থন করে। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে দার্শনিক পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সারের এই বিষয়ের দ্বিতীয় প্রমাণটি কি এবং সেটি আমরা প্রয়োগ না করিতেছি কেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

তিনি বলেন, মনে কর, একটি স্থানে একটি মাত্র বস্তু আছে এবং ক্রমে সেই বস্তুটি ছোট হইয়া হইয়া একবারে নিঃশেষ হইয়া গেল, এমন কথা কখনই ভাবা যায় না। চিন্তা সম্বন্ধনির্দ্ধারণ মাত্র. ধারনা হয় না এরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। প্রথমতঃ চিন্তনীয়তার সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ধ কতদূর দৃঢ় তাহা বলা দুষ্কর। চিন্তা শক্তি শিক্ষা দ্বারা বিশেষ মার্জ্জিত না হইলে এরূপ হইবার নিতান্ত অসম্ভাবনা। এটা—হুয়াল্লা, কথা না কহিয়া যে এক জন অন্যের সহিত মনের ভাব বিনিময় করিতে পারে, এ কথা বুঝিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তিনি এক জন রক্ষককে তাঁহার নিজের নখে একটি কথা লিখিতে বলিলেন ও রক্ষক—পরিবর্ত্তন কালে বিশেষ সাবধান থাকিয়া তাহাদের পরস্পরের আলাপ নিবারণ করিলেন, এবং লেখকের গমনের কিয়ৎকাল পরে দ্বিতীয় রক্ষককে তাঁহার নখর দেখাইলেন। এবং সেই কথা যখন প্রহরী উচ্চারণ করিল

তিনি বিষম বিস্ময়ের সহিত এই অমানুষিক ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ ব্যক্তির পক্ষে লিপি এক অদ্ভুত অচিন্তনীয় ব্যাপার হইয়াছিল। সুতরাং চিন্তনীয়তা হইতে আমরা দ্রব্যের অস্তিত্বের বিষয় অল্পই বলিতে পারি। আর সাধারণ জড় শক্তির অধীনে পরমাণুর নিত্যানিত্যতার বিষয় চিন্তায় যদি আমরা নিতান্ত পটুই হইয়া থাকি, তথাপি শেষ বিনাশের বিষয় যে এটহুয়াম্নার অবস্থাপন্ন, সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। তবে এ ব্যাপারে সামান্য চিন্তনীয় বিষয়গুলি হইতে তর্ক ও বিচার দ্বারা যে ফল উপলব্ধি করা যায়, তাহাই সম্ভব ও প্রমাণাধিক্য অনুসারে নিশ্চয় হইবে। অর্থাৎ এ সম্বন্ধে পরমাণুর সাধারণ নিত্যতার প্রথম প্রমাণটি অথবা সেই জাতীয় কোন প্রমাণ যদি প্রযোজ্য হয়, তবে তাহাই প্রয়োগ করিয়া ফল নিষ্কাশন যুক্তিসঙ্গত।

আমরা কোন বস্তুকে শীঘ্র অন্তহীন অসীম ইত্যাদি নাম দিয়া থাকি। তাহার কারণ বোধ হয় যে, মনুষ্য অপেক্ষা বহু দ্রব্য এত অধিক পরিমাণে বৃহৎ যে সামান্য দৃষ্টিতে অনন্ত বলিয়া জ্ঞান জন্মে। কিন্তু এই অনন্তের ইতিহাস কি রূপ এক বার দেখা যাক্। অতি প্রাচীন কালে অসভ্য মনুষ্য যত চলুক্ না কেন ভূমি কখনই শেষ করিতে পারিত না, সুতরাং সে ধরাকে অনন্ত বিস্তৃত বলিয়া জানিত। কিন্তু সে ভুল বহুদিন অপনয়ন হইয়াছে। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্র অতলস্পর্শ অথবা গভীরতায় অসীম বলিয়া বিখ্যাত ছিল. কিন্তু এখন কোন্ সাগরের গভীরতা বালকেও না জানে? পর্ব্বত অনন্ত-স্থায়ী বলিয়া এখনো অনেকেরই বিশ্বাস—পর্ব্বত মেঘের মত ভঙ্গুর বলিয়া কয় জন জানে? জলকণা অনন্ত—বিভাজ্য নহে। ক্ষুদ্র-তম কণা, মাপা যাইতে পারে, এ কথাও সে দিনে জানা গেল। পৃথিবী অনন্তকাল সূর্য্যকে বেষ্টন করিবে না, তাহার পথে পরমাণু আছে এবং তদ্দ্বারা বিনষ্টগতি হইয়া ক্রমে সূর্য্যে মিলিত হইবে, এ কথা এখনও বিস্ময়ের কারণ। তবেই দেখা গেল যে, অনন্ত, ক্রমে ক্রমে আপনার এক একটি অধিকার ছাড়িয়া দিতেছে। যাহাকেই আমরা অনন্ত বোধ করি, সেই ক্রমে আপনার সসীম ভাব ব্যক্ত করে। সুতরাং পরমাণু আপাততঃ অনন্ত বোধ হইলেও অবশেষে সান্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

শ্রীননীলাল ঘোষ।

স্বার্থপরতা।

(প্রতিবাদ।)

কতকগুলি শব্দের স্মরণার্থ হইতে অর্থ বিস্তৃতি—অর্থ সংক্ষিপ্তি বা অর্থ বিকৃতি জন্য সময়ে সময়ে বড়ই গোল বাধে। অনেক তর্ক এই জন্য মিছামিছি উপস্থিত হয়—অনেক বাদানুবাদ এই জন্য সুন্দর রূপে মীমাংসিত হইতে পারে না। এক

বিষয় লইয়া দুই জনে তর্ক করিতেছেন—ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছেন—এমন কি হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে;—অথচ দুই জনে যাহা বলিতেছেন—তাহা যদি দুই জনেই ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন, তবে বুঝিতে পাবেন তাঁহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ বড় একটা নাই, মতদ্বৈধ মাত্র কথার অর্থ লইয়া, প্রকৃত মত লইয়া নহে। এরূপ ঘটনা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম—শব্দের কোন নির্দ্ধারিত অর্থ না থাকিলে সময়ে সময়ে বড়ই গোলে পড়িতে হয়। বিগত সংখ্যার প্রতিমায় "স্বার্থপরতা" নামক প্রবন্ধ লেখক ঐরূপেই একটি কথার গোলে পড়িয়া দুই একটি ভ্রান্তিসঙ্কুল মত প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন "স্বার্থপরতা" সম্বন্ধে—পর্য্যালোচনা করিয়াছেন ইহার ভাল মন্দ দুই দিক—কিন্তু কথাটির অর্থ ধরিয়াছেন—নূতন রূপ, অর্থাৎ আমরা যেরূপ অর্থ করি, সাধারণে ইহার যেরূপ অর্থ প্রকাশিত সেরূপ নহে। ইহাতে ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে আমাদের "স্বার্থপরতা" প্রতি তাঁহার মন্তব্য প্রয়োগ করিলে, একটি অতি ভয়ানক দুর্নীতি পরিবর্দ্ধক কথা হইয়া পড়ে। কথাটি ক্রমে পরিষ্কার করিতেছি। আর পরিষ্কারই বা করিতে হইবে কেন—কথাটি এত সহজ যে অনেকেই ইহা বুঝেন, তবু দুই এক কথা না লিখিয়া কিছু এই খানে প্রবন্ধ শেষ করা যায় না।

অভিধান ঘটিত "স্বার্থপরতা" অর্থ—স্বকীয় প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি জন্য (মনের ঐকান্তিক) আনুরক্তি। এই অর্থ ধরিয়া স্বার্থপরতা সম্বন্ধে লেখক যাহা লিখিয়াছেন,তাহার অধিকাংশই সত্য। আর যদি ইহা "স্বার্থপরতার" একমাত্র অর্থ হয়, তবে নিঃস্বার্থপরতা জগতের একটি দোষ বই গুণ না হইতেও পারে। উদ্দেশ্যবিহীন বা লক্ষ্যহীন কার্য্য যদি নিঃস্বার্থপরতা হয়, তবে তাহা নিন্দনীয় বটে। তবে কথা হইতেছে এই যে, শব্দটির যে লোকবিদিত অর্থ আছে তাহাকে ত্যাগ করিয়া—তৎ সম্বন্ধে লোকবিদিত যে সংস্কার আছে, তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা বড়ই অন্যায়। কথার অর্থ আমরা ভুল বুঝিয়াছি, দেখাইতে পার, ক্ষতি নাই—কিন্তু আমরা যাহাকে 'স্বার্থপরতা' বলি, তাহার প্রশংসা কর কেন? আর এরূপ অর্থবোধে কোন ক্ষতিই কি দেখান যায়? আমরা ভাষাবিদ্ পণ্ডিত নহি—সকল কথা ভাল বুঝি না—এ তত্ত্বের মীমাংসা কিরূপে করিব? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এরূপ অর্থবিকৃতি সমাজে অনিবার্য্য। সর্ব্বত্রই এরূপ ঘটিয়া থাকে। দুই একটি উদাহরণও দিতে পারি।

"সুরেশ স্থূলকায় ব্যক্তি"—এই বাক্যের যদি অভিধান ঘটিত অর্থ গ্রহণ কর, তবে কথাটা মাঠেই মারা যায়। শরীর মাত্রই স্থূল। সুতরাং অভিধানে ইহার অর্থ করিতে পারিবে না। ব্যাকরণ ইহার জন্য মারামারি করিয়া অলঙ্কার ইত্যাদি জোটাইয়া অর্থ করিয়া দিবেন—অর্থাৎ লোক সমাজে প্রচলিত এই কথাটির যে তাৎপর্য্য আছে—তাহাই সূত্রাদিতে নিবদ্ধ করিয়া দেখাইলেন। আমরা বুঝিলাম—"সুরেশ স্থূল-

কায়” অর্থ—সুরেশ অধিকাংশ ব্যক্তি অপেক্ষা স্থূল। শরীরের স্বাভাবিক স্থূলতা যদি কিছু থাকে, তবে সুরেশ তদপেক্ষা অতিরিক্ত স্থূল। “স্বার্থপরতা” সম্বন্ধে সেইরূপ অর্থ আছে। ‘স্বার্থপরতা” অর্থ স্বীয় অর্থ সিদ্ধি জন্য একান্ত অনুরাগ নহে, আপনার ধর্ম্ম নগ হ্নে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একান্ত আনুরক্তি। যেরূপ শরীর মাত্রই স্থূল—কিন্তু স্থূলকায় বলিলে একরকম স্থূল া উপলব্ধি হয়—তেমন যোগী, ভোগী সকলেই স্বার্থপর, কিন্তু “স্বার্থপর” বলিলে ভোগীকেই বুঝায়। এটা অতি সহজ কথা। লেখক এ কথাটা যে কেন দেখিলেন না, তাহা আমরা বুঝি না। কেবলমাত্র আমাদিগেরলোকের মনেই যে বিকৃত তত্ত্ব (theory) জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এরূপ নহে। নিজেও “স্বার্থপরতা” কথাটির অর্থ শঙ্কটে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়াছেন। তাঁহার একস্থলের স্বাথপরতা—আভিধানিক, অপর স্থলের স্বার্থপরতা লৌকিক। অতি সহজেই ইহা দেখান যায়—কিন্তু আমরা ততদূর দেখাইতে ইচ্ছুক নহি।

আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি—আধুনিক শিক্ষিতগণের মধ্যে কূটবুদ্ধি-কূটতর্ক ও বিস্ময়কর (startling) সত্য এখানেও আবিষ্কার করিতে অনেকেই বিশেষ অনুরাগী। কিন্তু বিধাতা আবার এমনই বিড়ম্বনা প্রদান করেন যে, অনেক স্থলেই এরূপ কূটতত্ত্ব বিশ্লেষিত হইলে অতি ঘোর ভ্রান্তিসঙ্কুল সহজ কথা হইয়া দাঁড়ায়। বিস্ময়কর নূতন কথা সাবধানেই কহিতে হয়। জগতে Newton কয়জন জন্মায়?

এই নূতন সত্য আবিষ্কার জন্য প্রবন্ধ লেখক কি লিখিতেছেন—দেখ;—

“ফলতঃ জগতের অবস্থা এখনও যেরূপ তাহাতে প্রকৃত নিঃস্বার্থপর লোকের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না” অধিকন্তু তাহার জীবন ধারণই দুরূহ হইয়া উঠে। যদি কোন লোক সকল বিষয়ে নিঃস্বার্থপর হয়, একবারও নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, তাহা হইলে পদে পদে সে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। ফলতঃ অসাধু জগতে কখন সাধুতে স্থান পায় না। যেখানে সকল লোকই মিথ্যা কথা কহে, সকলই শঠ—সেখানে সত্য কথা কহিলে বা সাধু ব্যবহার করিলে নিশ্চয় অমঙ্গল হয়। [১] নীতিবিদ্ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, ‘সদা সত্য কথা কহিবে।’ কিন্তু এই জগতে অবস্থান করিতে হইলে এমন অনেক সময় আইসে, যখন সত্য কথা কহিলে নিশ্চয়ই বিপদ্। চিকিৎসক একটি রোগীকে দেখিয়া তাহার আত্মীয়কে বলিয়া গেলেন যে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য। চিকিৎসক বলিয়া গেলে যদি রোগী চিকিৎসক কি বলিয়া গেলেন জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আত্মীয় কি বলিবেন? তিনি যদি চিকিৎকের কথা গোপন করেন, তাহা হইলে তাঁহার মিথ্যা কথা কহা হইবে। আর যদি চিকিৎসক যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বলেন,তাহা হইলে চিকিৎসকের ভ্রমবশতঃ রোগী হয় ত এরূপ ভীত হইতে পারে যে তাহার মৃত্যু বাস্তবিক অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এই অসাধু জগতে

[১] তাহা ত হইবেই। আহার করাও যখন স্বার্থপরতা তখন নিঃস্বার্থপর লোকে বাঁচিবে কিরূপে? যে পর্য্যন্ত অনাহারেও লোক বাঁচিতে পারে, এরূপ জগত না হয়, সে পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিবে।!!

যে ব্যক্তি যথার্থ সাধু, আমরা তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকি সত্য ; কিন্তু বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, সে ব্যক্তি অতি মূঢ় এবং পদে পদে অপরের নিকট বঞ্চিত হয়।"

উদ্ধৃত অংশে প্রবন্ধের যাবদীয় দোষেরই দৃষ্টান্ত আছে। ইহার প্রথমাংশে যেন "স্বার্থপরতা" আমাদের লৌকিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ, তাহা না হইলে প্রবন্ধলেখকের নিঃস্বার্থপরতা কোন জগতেই মঙ্গলজনক অথবা সম্ভাব্যও হইতে পারেনা। প্রবন্ধলেখকের নিঃস্বার্থপরতা অজ্ঞানীর বা নিদ্রিতের কার্য্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তার পরে, তিনি ছলে মিথ্যা কথা বলার আবশ্যকতা দেখাইয়া যে মহাজনবাক্যকে শ্লেষ করিয়াছেন, তাহার ত কথাই নাই। লেখক নীতিসূত্রের আবশ্যকতা ও তত্ত্ব এখনও বুঝিতে পারেন নাই। আর তাহাই বা কিরূপে বলি—তিনি B. L. উপাধিধারী. অন্ততঃ পরীক্ষার জন্যও ব্যবস্থানীতির তত্ত্বও পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষ বা অবস্থাবিশেষের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নীতিগুলি যে অধিকাংশ লোকের অধিক পরিমাণে (অপকার অপেক্ষায়) উপকার সংসাধন জন্য গ্রথিত, তাহা কি তিনি স্বীকার করিবেন না? একেবারেই দোষশূন্য (absolute, not comparative) নীতি থাকিলে, অতি অল্পই আছে। "সদা সত্য কথা কহিবে" এটি সেরূপ নীতি না হইলেও কি পরিত্যজ্য। আর ইহা যে সে-রূপ নীতি নহে—তাহাও তিনি উৎকৃষ্ট রূপে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত কোন কার্য্যকর নহে। চিকিৎসক "রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য" এ কথা সত্য করিয়া বলিতে পারেন না। যদি একান্তই সত্য হয়, তবে সেই সংবাদ শ্রবণ জন্য রোগীর মৃত্যু হওয়ার কথাটি ঠিক নহে। আর সকল সময়েই কি এরূপ মৃত্যু কথা বলা অবৈধ? আমরা যেন মনে করি, যে মরিবে নিশ্চিত, তাহার তাহা আগে জানাই ভাল। যদি সে সংবাদ শুনিয়া তাহার হঠাৎ কোন অপকার হয়, তাহা তাহার বিকৃত শিক্ষা জন্য। সত্য কথা জ্ঞাপন জন্য নহে। কূটতর্ক করিলে এরূপ অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু আমরা প্রবন্ধলেখকের ন্যায় সেরূপ তর্কে নারাজ। তার পর দেখ—উদ্ধৃত অংশের শেষের মন্তব্যটি—কি ভয়ানক ধৃষ্টতার কথা।

অনেক বলিয়াছি, আর বলিব না। লেখক যদি আমাদের সহাধ্যায়ী সেই সমতুলচন্দ্র দত্ত হয়েন, তবে তিনি আমাদের প্রতি রুষ্ট হইবেন না এরূপ ভরসা আছে, যদি অন্য কেহ হন, তবে তাঁহার নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের সহাধ্যায়ী সমতুলচন্দ্র সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, ও শ্রীমান্। বিশেষ তিনি গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। তাঁহার বাল্যকালের, বিন্দুর (point) সংজ্ঞাটির মন্তব্য কি তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। বিস্তৃতিশূন্য অবস্থিতি যদি সম্ভবপর হয়, তবে স্বার্থশূন্য ঘোর উদ্দেশ্যযুক্ত কার্য্যও সম্ভবপর বটে। বিন্দুর যেমন সামান্য অবস্থিতি নগণ্য, —নিঃস্বার্থপরতার তেমনই সামান্য ধর্ম্মযুক্ত অর্থটাও নগণ্য। ইহা লইয়া তাঁহার এত গোল করাটা ভাল হয় নাই। আর একটু ভাবিয়া দেখিলেই সব বুঝিতে পারিবেন।

বোধ হয়, উপরে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—তাহাতে এ টুকু প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আমরা যাহাকে "স্বার্থপরতা" বলি, তাহা বাস্তবিকই নিন্দনীয়। আমাদিগের মধ্যে যাহাকে "নিঃস্বার্থপরতা" বলা হয়, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আর, স্বার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতার ভিন্ন অর্থ করার কোন প্রয়োজনও নাই। নিঃস্বার্থপরতা অখণ্ডিম্ববং কোন অলৌকিক পদার্থ নহে। এই কথাগুলি প্রতিপন্নই আছে, সুতরাং আমরা অনায়াসে তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করি নাই; আমরা কেবল মাত্র সেই প্রতিপন্ন মতের বিরুদ্ধবাদের অযৌক্তিকতাই দেখাইয়াছি। সেই বিরুদ্ধবাদ মূল বিষয় লইয়া নহে—সুতরাং আমাদিগের প্রবন্ধ মূল ধরিয়া লিখিত হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে যেমন মূল প্রবন্ধ তেমনিই এই প্রতিবাদ প্রবন্ধ অসার ও ফাঁকা মাত্র। তবে প্রতিবাদের আবশ্যকতা একটু আছে। সুশিক্ষিত ব্যক্তি লোককে নূতন ভুল শিখাইতে গেলে, একটু বাধা দেওয়া ভাল নয় কি?

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়।

যদুবংশ।

আর্য্যবংশের মধ্যে যদুবংশ অতি বিস্তৃত;—সভ্য জগতের এমন স্থান নাই, যে স্থানে যদুবংশীয়েরা বাস না করেন, যদিও দেশ ও ধর্ম্ম ভেদে এই বিশাল বংশ মধ্যে অধিকাংশ স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি ইতিহাস সমূহের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে সভ্য জগতের প্রায় অর্দ্ধেক রাজবংশ ও রাজ্য এই বিশাল বংশ-তরুর শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত। এই বংশে ভুবন বিখ্যাত বীর ও রাজগণ উদ্ভূত হইয়া সময়ে সময়ে সসাগরা পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এই বিশাল বংশে যে দুই মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা জন সমাজে এক নামে অভিহিত হইয়া অদ্যাবধি লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকেন, আমরা যথাস্থানে এই দুই মহাপুরুষের বিষয় আলোচনা করিব।

পুরাণাদি পাঠে জানা যায় যে নহুষতনয় যযাতির পুত্র যদু হইতে যদুবংশের উদ্ভব। মহারাজ যযাতির দুই স্ত্রী, প্রথমা—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা, নাম দেবযানী; দ্বিতীয়া—দৈত্যপতি বৃষপর্ব্বের কন্যা, নাম শর্ম্মিষ্ঠা। যযাতি, দেবযানীর গর্ভে যদু ও অনু এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও পুরু নামক পাঁচটি পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রগণের মধ্যে যদু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। পুরাণ বলেন, পিতৃআজ্ঞা অবহেলা করায় যদু জ্যেষ্ঠ-সত্বাধিকারে বঞ্চিত হয়েন। পুরাণ যে কেন যদুর প্রতি লোমজত্বের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে মহামুনি ব্যাস যদুকে প্রতিলোমজ

না বলিয়া কেবল পিতৃ-আজ্ঞা অবজ্ঞা-কারী বলিয়া পিতৃরাজ্য হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন, আবার তিনিই বলিয়াছেন যে—"অধমাদুত্তমায়াস্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ।" ১ এ স্থলে দেবযানী উৎকৃষ্টবর্ণ ব্রাহ্মণ, আর যযাতি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট-জাতি ক্ষত্রিয়, সুতরাং দেবযানীর গর্ব্ভজ যদু ও অনু শাস্ত্রানুসারে প্রতিলোমজ, কিন্তু প্রতিলোমজের প্রতি শাস্ত্র যে রূপ ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছেন, যদু ও অনুকে সেরূপ ঘৃণ্য ভাবে পুরাণ গ্রহণ করেন নাই, যদি কেহ বলেন যে যদু ও অনু সেই দোষে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, কিন্তু পুরাণ যদু ও অনুর সে দোষটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, আর তাহা হইলেও জ্যেষ্ঠসত্বানুসারে তুর্ব্বসু রাজা হইতে পারিতেন। সুতরাং এস্থলে এক জনেরই কৃত শাস্ত্র ও পুরাণের অনৈক্যতা দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। ২ যাহা হউক, প্রথম চারিটি পুত্র পিতার বিরাগভাজন হওয়ায় সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরুই পিতৃরাজ্য অধিকার করেন, এই পুরু হইতে পৌরববংশ, এই পৌরববংশে কুরু নামে যে মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারই বংশে ভুবনবিখ্যাত কৌরবগণ জন্মগ্রহণ করেন; সুতরাং পৌরব ও কৌরব একই বংশ। যযাতির পরিত্যক্ত চারিটি পুত্র পিতৃরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া নিজ নিজ অদৃষ্ট পরীক্ষায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, পরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যদু ও তাঁহার বংশধরগণ সিন্ধুনদ হইতে সুদূর কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। এই যদুর রাজধানী অদ্যাপি "যদুকাডাঙ্গা" নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দ্বিতীয় অনু, তৎকালীন বেদরহিত পূর্ব্বদেশে অঙ্গ নামে রাজ্য স্থাপন করেন। তৃতীয় তুর্ব্বসু, হিমালয়ের পরপারের বিশাল ভূখণ্ডে তিব্বত নামক দেশে নিজ বংশতরু রোপণ করেন। চতুর্থ দ্রুহ্য, পৌরাণিক দ্রাবিড় দেশে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং ইঁহারই বংশাবলী ভোজ নামে অভিহিত। ইঁহাদের বংশাবলী কালে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং দেশ ও ভাষা ভেদে তাঁহাদের রীতি, নীতি ও ধর্ম্মের বিভিন্নতা হয়। এই ঘটনার বহুদিন পরে মহর্ষি বেদব্যাস সর্ব্বজন-হিতকর উপদেশ-পূর্ণ "মহাভারত" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তিনি মহারাজ যযাতির বংশকে অন্য ধর্ম্ম স্বইচ্ছায় গ্রহণ করিতে না দিয়া উহা যযাতির অভিশাপ বলিয়া যযাতি-বংশীয় বিধর্ম্মীদিগের দোষ খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। অন্যপক্ষে ইহার মূলে এই উপদেশ নিহিত রহিয়াছে যে, পিতৃ-আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়।

পুরাণ পাঠে আমরা আরও জানিতে পারি যে, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে গান্ধার (ক্যাণ্ডাহার), বাহ্লিক (বাক্‌),তিব্বত (চীন),উত্তর কুরু ও মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি,সাইবেরিয়াদেশ(শাকদ্বীপ),ভারতের সীমা ছিল।৩ ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় উহা মহাজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। যত পার্ব্বতীয় দেশ সমূহে অল্প সংখ্যক লোকে বাস করিত। পুরাণ বলেন যে, ঐ সকল দেশ সাধারণ মনুষ্যের অগম্য এবং উক্ত দেশ সকলের অধিবাসীরা যক্ষ,রক্ষ,

১ ব্যাসসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

২ মহাভারত—যযাত্যুপাখ্যান।

৩ উইলিয়ম কুক টেলার কৃত আদিম ইতিহাস ১০.১১ পৃষ্ঠা।

গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দৈত্য, দানব ও দেবতা। রামায়ণে লিখিত আছে যে, কাস্পিয়ান সাগর ও হিমগিরির মধ্যস্থান সকল শৈলুষ গন্ধর্ব্বগণের আবাস নিলয়, ইহারা সংখ্যায় তিন-লক্ষ। এমন কি, কুমারসম্ভব প্রথম সর্গে কবি যে হিমালয় বর্ণন করিয়াছেন তাহার মধ্যেও অনেকস্থলে হিমালয়বাসিগণ অপ্সর, কিন্নর ও সিদ্ধ প্রভৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় যে, এখন যাহা বহুলোকাকীর্ণ ও মহামহা সাম্রাজ্যে পরিণত, হয়ত সেই সকল স্থান অতি পুরাকালে অল্প লোকের বাসস্থান ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই জন্য বোধ হয় যদুগণের পশ্চিম ভারতে নিজ সমকক্ষ বীরজাতিদিগের মধ্যে অধিকার বিস্তার করা অপেক্ষা পশ্চিম এসিয়া এমন কি ইউরোপ ও আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গল অধিকার পূর্ব্বক অসভ্য বন্য লোকদিগকে জয় করা সহজ হইয়াছিল। তাহা হইলে কি হয়? প্রধান প্রধান যদুগণ পূর্ব্বদিকে ক্রমেই অগ্রসর হইয়া পঞ্চনদ ও নর্ম্মদার কূলে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন; পুরাণোক্ত মাহিষ্মতী পুরী ইঁহাদেরই স্থাপিত। হৈহয়, তালজঙ্ঘ, কার্ত্তবীর্য্য প্রভৃতি বীরগণ এই যদুকুলের শাখা-বংশে সমুদ্ভূত হইয়া বহুকাল সাম্রাজ্য ভোগ করেন। এই যদুকুলের অন্যতম শাখা, সূর্য্য-বংশীয় নৃপতিদিগকে পরাজয় করিয়া মথুরাপুরী হস্তগত করেন, এমন কি ইঁহারা দক্ষিণ পার হইতে গোদাবরী, কাবেরী ও কৃষ্ণানদীর তটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া আপনাদের বল বিক্রম বহুকাল অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা সৌরাষ্ট্র-উপদ্বীপ দ্বারকা হইতে সূর্য্যবংশীয়দিগকে বিতাড়িত করেন, এবং দ্বারকাপুরী ইঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বে ভারতে এই বিশাল বংশ যদু, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি, শিনি, চেদি ও দেবী এই সপ্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরিকুলেশ বলরাম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমোক্ত যদুকুলকে অলঙ্কৃত করেন এবং বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই বংশ হরিবংশ বলিয়া প্রথিত। হৈহয় ও তালজঙ্ঘ যখন সূর্য্যবংশীয় সগর নৃপতি কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন, তাহার বহু পূর্ব্বে সূর্য্য-বংশীয়েরা ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া গণ্য ছিলেন, অযোধ্যানগরী তাঁহাদের রাজধানী। অযোধ্যাভূষণ রামচন্দ্রের পর হইতে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যবংশের তেজ, চন্দ্রবংশীয় পৌরবগণ হইতে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার পূর্ব্বেই পৌরবেরা ভারত-সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ব্বভারতে পৌরবগণের রাজধানী মগধ, মহাবীর জরাসন্ধ তাহার অধিপতি। জরাসন্ধ নিজের দুই কন্যা, যদুপতি উগ্রসেনের পুত্র কংসকে প্রদান করেন। (আমরা "হরিবংশে" কংসের জন্ম বিবরণ লইয়া যে একটী গল্প দেখিতে পাই, তাহা এস্থলে আলোচনা করা অনাবশ্যক, সুতরাং কংসকে আমরা উগ্রসেনের পুত্র বলিতে বাধ্য হইলাম।) দুর্ব্বৃত্ত কংস জরাসন্ধকে সহায় পাইয়া নিজ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া সমস্ত যাদবগণের অধিপতি হইয়া বসিলেন। এদিকে জরাসন্ধও বৃহৎ যদুসৈন্যের সাহায্য পাইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিনার সহকারী রাজগণকে

স্ববশে আনিয়া একেবারে অদম্য হইয়া উঠিলেন। জরাসন্ধ ও কংসের দুষ্কর্ম্মে ভারত অচিরে যেন একটি পাপের নিলয় হইয়া উঠিল। যে সকল নৃপতি কংসের ও জরাসন্ধের দুষ্কর্ম্ম সমূহকে ঘৃণা করতঃ বিপক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, পাপমতি জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করেন। এই কারাবরুদ্ধ হতভাগ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই যাদব। এই সময়ে যদুবংশাবতংস বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র অতি পবিত্র, যাঁহারা তাঁহাকে লাম্পট্যদোষে দূষিত করেন, তাঁহারা বোধ হয় এই মহাত্মার চরিত্র বিষয় কিছুই অবগত নহেন, অথবা পবিত্রচরিত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উক্তরূপ দোষারোপকারিগণ তাঁহাদের কল্পনা-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে হলাহল উৎপন্ন করেন, তাহাই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য দোষ প্রমাণ করে মাত্র,--কিন্তু পুরাণ কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উক্ত দোষারোপ করেন না। প্রত্যুত ইহাঁর চরিত্র আলোচনা করিলে ইহাঁকে এক জন বিশ্বপ্রেমিক বলিয়া প্রতীত হইবে।

রাজ্যাপহারক কংসের পিতৃব্য দেবকের দেবকী নামে এক কন্যা, যদুবংশের অন্যতম শাখা, সামন্ত রাজা বসুদেবকে প্রদত্ত হয়। ভুবনবিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ এই শুভ পরিণয়ের রত্নফল। একদা ভবিষ্যদ্বক্তা নারদ কংসকে বলিয়াছিলেন যে—"তোমার ভাগিনেয় দেবকীপুত্র হইতে পিতৃদ্রোহিতার প্রতিফল পাইবে।" কংস এই বাক্যে ভীত হইয়া বসুদেব ও দেবকীর উপর নজরবন্দী স্বরূপ প্রহরী নিযুক্ত করেন। পরে দেবকীর সাতটী পুত্র নিষ্ঠুর কংস কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে বসুদেবের অন্য স্ত্রী রোহিণীর গর্ব্ভে বলরাম জন্মগ্রহণ করেন। রাম ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পুত্রবৎসল বসুদেব কংসের ভয়ে গোপনে তাঁহাকে ব্রজধামে স্বীয় সখা গোপপতি নন্দঘোষের নিকট প্রেরণ করেন, ইহার পর দেবকীর অষ্টম গর্ব্ভে কৃষ্ণচন্দ্র উদয় হয়েন, তাঁহাকেও ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নন্দালয়ে প্রেরণ করেন; এইরূপে রাম ও কৃষ্ণ গোপগৃহে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। রামের ন্যায় বলবান মনুষ্য দ্বাপর যুগে আর জন্মে নাই, এই জন্য তিনি বলরাম নামে অভিহিত হইলেন। ইহাঁর বলবিক্রমে হরিবংশ তৎকালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য যাদবগণ ও আধুনিক গ্রীকগণ ইহাঁকেই বোধ হয় Herculese * বলিয়াছেন। রাম ও কৃষ্ণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদুকুলের আশা ভরসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শৈশবে যখন যদুকুলতিলকদ্বয় শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছিলেন, তখন মূঢ়মতি কংস ইহাঁদের বিনাশ সাধনের জন্য নানারূপ কূট পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু নন্দমহিষী যশোদার অকৃত্রিম স্নেহ, ও রাম কৃষ্ণের বল বিক্রম দ্বারা নৃশংস অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে তাঁহাদের নিধনের জন্য এমন একটি ষড়যন্ত্র করিলেন যে যাহাতে রাম, কৃষ্ণ মথুরায় আগমন মাত্র বিনষ্ট হয়েন, এইরূপ স্থির করিয়া রাম, কৃষ্ণ-প্রমুখ ব্রজের গোপবৃন্দকে একটি যজ্ঞব্যপ-

* রাজস্থানের প্রথম খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা।

দেশে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। রাম, কৃষ্ণ পূর্ব্বেই যদুগণ কর্ত্তৃক এ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, এখন নন্দ ও যশোদার নিষেধ সত্বেও মথুরায় গমন পূর্ব্বক কংসকে সহসা আক্রমণ করিয়া নিধন করিলেন। কংসের নিধনে যাদবগণ বলরামকে সিংহাসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু রাম, কৃষ্ণ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া কারারুদ্ধ উগ্রসেনকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অপহৃত সিংহাসন তাঁহাকেই প্রদান করিয়া যদুকুলের এক মাত্র রাজা বলিয়া প্রণাম ও রাজসম্মান প্রদর্শন করিলেন। রাম, কৃষ্ণের বল, বিক্রমে এবং কংসকে বধ করিয়া উগ্রসেনকে পুনঃ সিংহাসনে স্থাপন করায়, মথুরাবাসিগণ তাঁহাদের বশীভূত ও আজ্ঞাধীন হইলেন, তাঁহাদের গুণগ্রামে শুধু মথুরাবাসীগণ নয়, যদুবংশীয় সকলেই মোহিত হইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসবধের পরে উগ্রসেনকে রাজা করিয়াই যদুকুলের সপ্ত শাখা একত্র করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই মহদভিপ্রায় সাধিত হইবার পূর্ব্বেই, দুর্জ্জয় মগধাধিপ মথরা আক্রমণ করেন। যদিও রাম, কৃষ্ণ কতিপয় যদুগণের অধিনায়ক হইয়া পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধের বিপুল বল ক্ষয় করিতে লাগিলেন, তথাপি রাজনীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় রাজসিংহাসন রাখিতে আর সাহসী হইলেন না; তিনি মথুরার রাজপাট দ্বারকা উপদ্বীপে লইয়া গেলেন এবং তদবধি শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাল পর্য্যন্ত দ্বারকা যদুকুলের প্রধান রাজধানী ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বলবিক্রম, আত্মত্যাগ, রাজনীতিজ্ঞতা ও বুদ্ধিকৌশল দর্শনে অবিলম্বে যদুবংশের সপ্তশাখা-কুল এক সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহাতে যাদবগণের রাজ্য নিরাপদ হইল মাত্র, কিন্তু জরাসন্ধের দুষ্কর্ম্ম সমূহের কিছু মাত্র হ্রাস হইল না; কারণ দ্বারকা হইতে সুদূর মগধরাজ্যে যাইয়া জরাসন্ধকে পরাজয় করা যদুগণের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, যেহেতু তখন সভ্য জগতের প্রধান প্রধান বিক্রমশালী নৃপতিগণ জরাসন্ধের সহায় ও আজ্ঞাধীন ছিলেন, এবং যদুবংশের ও অন্যান্য রাজবংশের রাজগণ, যাঁহারা জরাসন্ধের দুষ্কর্ম্ম সমূহের প্রতিকূল ছিলেন, তাঁহারা সকলেই জরাসন্ধের কারাগৃহ পূর্ণ করিয়া আবদ্ধ ছিলেন; কেবল এক মাত্র হস্তিনা, ভীষ্ম ও পাণ্ডুর বাহুবলে, জরাসন্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াও নিরাপদে ছিল। যদুপতি কৃষ্ণ এই জন্য প্রথমে কৌরবগণের সহিত মিলিত হয়েন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁহার বীরেন্দ্র পুত্রগণ ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্র দুর্য্যোধনের দুরাচরণে নির্ব্বাসিত হয়েন, পাণ্ডবদিগের এই নির্ব্বাসন কালে কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মানুরাগ দর্শনে তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ্যের রাজা করিতে কৃতসংকল্প হয়েন। নির্ব্বাসনের পর তাঁহারা যখন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হইয়া ক্রতুরাজ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন তখন কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির, জরাসন্ধের নিকট কারারুদ্ধ রাজগণের উদ্ধার প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু বলগর্ব্বিত জরাসন্ধ তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিলেন না। সুতরাং অচিরে যুধিষ্ঠিরানুজ ভীমসেনের সহিত

জরাসন্ধের একটি দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সংঘটন হয়, এবং এই যুদ্ধে বীরবর জরাসন্ধ নিহত হয়েন। জরাসন্ধের নিধনান্তর কারাবরুদ্ধ নৃপতিগণ অবিলম্বে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েন। পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ও রাজনীতিজ্ঞ, দ্বিতীয়—ভীম বলরামের ন্যায় শারীরিক বলের জন্য প্রসিদ্ধ, তৃতীয়—অর্জ্জুন অস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যায় অদ্বিতীয়, চতুর্থ—নকুল রথ ও অসিযুদ্ধে আদর্শ যোদ্ধা, পঞ্চম—সহদেব বুদ্ধিমান ও তৎকালীন সচিবশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর তনয়, সুতরাং কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন—পাণ্ডবদিগকে তিনি প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের বিপদে সম্পদে প্রধান মন্ত্রী ও বন্ধু ছিলেন। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য পাপীদিগের দমন ও ধার্ম্মিকাদিগকে সম্মানিত করা। জরাসন্ধের বধের পর যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ্যের একমাত্র রাজা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। পাণ্ডবগণের যশঃসৌরভ ক্রমে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, ইহাতে দুর্য্যোধনের আর ঈর্ষার সীমা পরিসীমা রহিল না; জরাসন্ধের মৃত্যুর পর যে সকল নৃপকুল জরাসন্ধের সহায় ছিল, সেই দুষ্টমতি রাজগণ অচিরে দুর্য্যোধনপ্রমুখ হইয়া কৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। এইরূপে কৌরবগণের মধ্যে গৃহবিবাদ এমন গুরুতর হইয়া উঠিল যে, সেই বিবাদে পৃথিবী প্রায় বীরশূন্য হইয়াছিল, কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে এই সর্ব্বনাশক মহাসমর সংঘটিত হয়, সেই সমরে যদিও কৃষ্ণ কতিপয় যাদবগণের সহিত লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ যাদব এই যুদ্ধের সহিত নিঃসংস্রব ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু দিন পরে শ্রীকৃষ্ণের তনয়গণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় প্রভাস মহাতীর্থে প্রায় সমুদয় যদুবীরগণ হত হয়েন। যুধিষ্ঠির যদিও বহু আয়াসের পর বিধবা-সদৃশ শ্রীহীনা বসুমতীকে লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরম মিত্র শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত করিয়াছিল। তিনি সংসার অসার বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তিনি আর জীবনভার বহন করিতে না পারিয়া চারি ভাই দ্রৌপদীর সহিত মহাপ্রস্থান করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে মথুরায় ও অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান কালে তাঁহার অনুগত যাদবগণ স্বস্ব পরিবারে কৌরবনাথের অনুগমন করেন। ইহাঁরা পৃথিবীর অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে কোন স্থানে যুধিষ্ঠিরের চারি ভাই দ্রৌপদীর সহিত প্রাণত্যাগও করেন। মহামুনি ব্যাস তাঁহার কুহকিনী-কবিতাজালের ভিতর যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগামী যাদবগণের অস্থিরত্ব পরিণামে জড়িত করিয়া রাখিয়াছেন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই সেই জাল উদ্ঘাটন করিলে দেখিতে পাইবেন যে, সেই যাদবগণ সংখ্যায় নিতান্ত কম নহেন, এবং ইহাঁরা অধিকাংশ রাম ও কৃষ্ণের বংশ। যখন পাণ্ডবগণ আত্মনাশের জন্য পৃথিবীর অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া দুরারোহ হিমপ্রধান হিমালয়ের অত্যুচ্চ

শৃঙ্গে আরোহণ করেন, তখন এই যদুগণ আর তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারিলেন না; সম্ভবতঃ ইহাঁরা বহুদিন হিমালয়ের উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া কিছু দিন তক্ষক স্থানে বাস করেন * এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সনাতন ধর্ম্মের প্রচারক হইয়া আপনাদের ঈশ্বরের মনোনীত জাতি বলিয়া পরিচয় দেন। দেশ ও ভাষা ভেদে ইহাঁদের যদুর অপভ্রংশ য়িহুদি বলা হইয়া থাকে এবং ইহাঁদের অধিকৃত দেশ যুদা (Judah) নামে অভিহিত। ইহাঁরা কিরূপে আফ্রিকা, গ্রীক ও ইটালী প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হয়েন, তাহা বাইব্‌ল ও পাশ্চাত্য ইতিহাস সমূহে বিবৃত আছে। ইহাঁরা ভারত হইতে যে রীতি নীতি ও ধর্ম্ম লইয়া যান,তাহা যদিও দেশ ও ভাষা ভেদে বিভিন্ন দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত য়িহুদিদিগের মধ্যে এই যদুদিগের ধর্ম্মের কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে। ইহাঁদের মধ্যে বেদোক্ত ব্রাহ্মণ কেহই ছিল না সত্য, কিন্তু তথাপি ইহাঁরা পূর্ব্বপুরুষদিগের রীতি, নীতি একেবারে ভুলিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যীশুখৃষ্টের নাম, জন্ম, চরিত্র, উদ্দেশ্য ও মৃত্যু ইত্যাদির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মিবার প্রায় ২০০০ হাজার বৎসর পরে মহাত্মা যীশুখৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাঁর জন্ম ও জীবন শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও জীবনের ন্যায় বিপদ পূর্ণ। ইহাঁরা বিশ্বপ্রেমিক, ভারতীয় কৃষ্ণের বিশ্বপ্রেমিকতা বীররস-মিশ্রিত, আর পাশ্চাত্য কৃষ্ণের বিশ্বপ্রেমিকতা শান্তিরস-পূর্ণ,—কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য বিশ্বের হিত সাধন করা। কাল ও পাত্র ভেদে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক জনের প্রেম ও অস্ত্রের আবশ্যক হইয়াছিল, অপরের শুধু প্রেমেই কার্য্য সাধন হয়। ইহাঁরা একজন স্বয়ং ঈশ্বর ও অপর ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আপনাদিগকে লোকদিগের উদ্ধার কর্ত্তা বলিয়াছেন। ভারতীয় কৃষ্ণ স্বীয় সখা অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

> যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
> অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
> তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
> ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং ॥
> ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
> নিবসিষ্যাসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয় ॥
> অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোসি ময়ি স্থিরং।
> অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥
>
> ভাগবদ্গীতা, ১২শ অধ্যায়।

পাশ্চাত্য কৃষ্ণ বলিতেছেন—Jesus saith unto him, I am the way, and the truth and the life, no man cometh unto the Father but by me. Bible. Chap. XIV. New Testament. এ স্থলে ইহা বলিতে হইবে যে যীশু দেশ ও কাল ভেদে স্বয়ং ঈশ্বরত্বে স্থান না পাইয়া আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়াছেন। বারান্তরে এই মহাত্মাদ্বয়ের বিষয় সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যদিও সর্ব্বসংহারক প্রভাস ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যদু ও কুরুকুল ধ্বংস-প্রায়

---

* Vide Colonel Tod Vol. I. p. 1085 and Mr. Elphinstone's History of India. p. 227.

হইয়াছিল তথাপি বজ্র, পরীক্ষিত ও জনমেজয়ের রাজত্ব কালে যদু ও কুরুবংশের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। মহারাজ জন্মেজয়ের রাজত্ব কালে স্কন্দদেশ (স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া), শাকদ্বীপ (শিথিয়া), উত্তর কুরু, গান্ধার ও তক্ষকস্থান প্রভৃতি দেশ সকল স্বাধীনতাপ্রিয় সূর্য্যবংশীয় তক্ষকগণ এবং চন্দ্রবংশীয় যদুগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল এবং যদিও সিন্ধু ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যস্থিত স্থানে অগ্নি এবং অন্যান্য বংশীয়েরা বাস করিত কিন্তু যদু ও তক্ষকগণ সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করেন। ভারতবর্ষে যদু ও তক্ষকগণ ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়েন। পুরাণ বলেন, পরীক্ষিত কোন এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অপমান করায় তদীয় পুত্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তক্ষককরে নিহত হয়েন। পরীক্ষিতের জন্ম ও মৃত্যু লইয়া মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার প্রতিভাশক্তিকে যেরূপ বিকসিত করিয়াছেন তাহা অতীব মনোহর ও উপদেশজনক; কিন্তু এস্থলে তাহা অনালোচ্য। পরীক্ষিততনয় জন্মেজয় পিতার শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে তক্ষককুল প্রায় নিঃশেষ করেন। মহারাজ জন্মেজয় পর্য্যন্ত পাণ্ডু ও শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণের প্রভুত্ব অব্যাহত ছিল। ইহার পর যদুবংশীয়দের শোচনীয় অধঃপতন ঘটে। যে যদুবংশীয়েরা আদি হইতে কত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যপালন করেন—এক দিন যে বংশ সমুদয় সভ্য জগতের আদর্শ হইয়া উঠিয়া ছিল—যে যদুবংশীয়গণ হিব্রু, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের মূল—যাঁহাদের শাখাবংশ নূতন মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সমস্ত জগৎকে কম্পিত করিয়াছিলেন ৬ আজি, কালের কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় রাজপুত রাজস্থানের মরুভূমিতে বৃটিস অধীনে সামান্য সামন্ত রাজা রূপে অবস্থান করিতেছেন।৭ কতিপয় যিহুদি বণিকবেশে দেশে দেশে কাল যাপন করিতেছেন, অধিকাংশ যদুগণ খৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আপনাদের পূর্ব্ববংশ ও গৌরব ভুলিয়া গিয়া এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহারা যদুবংশীয় বলিয়া আদৌ বিশ্বাস হয় না।

শ্রীমতী কুমুদিনী রায়।

৬ রাজস্থান দ্বিতীয় খণ্ড ৫১৪।১৫র পৃষ্ঠা (যশলমীর) কথিত আছে, ইসলাম ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদ নিজে তক্ষক বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণ ও খলিফাগণ যদুবংশীয়। মহাত্মা টডের রাজস্থান ও পণ্ডিতবর এলফিনষ্টনের ভারতেতিহাস পাঠে বুঝা যায় যে, খোরাসান, বেহ্‌টিবাক, সমরখণ্ড প্রভৃতি দেশের মুসলমান অধিপতিগণ যদুবংশ ও তাতার, পারসিয়া, টর্কি মিশর প্রভৃতি দেশের মুসলমানগণ তক্ষকবংশ,—ভট্টি, বচাজা, মোহিল, জারিজা প্রভৃতি।

মোহ-ঘোর।

পাবে জীব মোহ-ঘোরে কেমনে এড়ান?
কোমল আবর্ত্ততার, মনতরী ঘূর্ণাকার,
সংসার পাথার।
আঁধার আধার হেন ভাবে ভাসমান॥

কূল কোথা ভবপারে কে তারে নে যায়?
ঢলে টলে বেগে ধায়, কভু নাচে ধীর বায়,
মাতিয়া বেড়ায়;
স্বেচ্ছায় চায়না তবু কে যেন ফিরায়॥

না জানি কি মাদক মোহিনী আছে তায়?
মজে যায় এলে পরে, পরমেশ পরতরে
অন্তরে বিস্মরে।
বিষয় দুস্তরে পড়ে হাবু ডুবু খায়॥

কখন সে ছিন্ন-পক্ষ-বিহঙ্গ যেমন।
ঊর্দ্ধে শূন্য শূন্যাকার, অধঃ-জলধি-বিস্তার,
সন্ধ্যার সঞ্চার!
বায়ুর হিল্লোল বদ্ধ তৃষার মতন।
কে রাখে বিপাকে সেই পাখিরে তখন?

তেমতি অনন্য গতি সম্প্রতি সে মন।
অই দূরে নেহারিছে, ধায়, পুন চায় পিছে,
ঘুরে পাকে মিছে;
আঁধারে খুঁজিছে পথ না পায় সন্ধানে॥

হেন ভাব যথায় কে বাঁচায় সে দীনে।
যোগ' পরে বল নাই, ভক্তি দাঁড়ে ভর পাই,
প্রেমে ডাক ভাই,
অকূলের কাণ্ডারী অচ্যুত ভগবানে।
মোহ-বন্ধে কে তারিবে দীনবন্ধু বিনে॥

শ্রীকেদারনাথ চৌধুরী।

সাহিত্য-সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড।] অগ্রহায়ণ, ১২৯৭। [অষ্টম সংখ্যা।

বেদান্ত-দর্শন-বিবৃতি।

এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার কর্ম্ম-ক্ষেত্র। ইহার যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দেখিতে পাওয়া যায়, কার্য্য। ঊর্দ্ধে অসীম আকাশের প্রতি দৃষ্টি-পাত কর, দেখিবে কার্য্য। কি প্রখর-কর-শালী সূর্য্যাদি গ্রহগণ, কি সুধাকর শশধর, কি অপরাপর অসংখ্য নক্ষত্রনিকর, সকলেই নিজ নিজ নিয়মিত পথে অনন্যলক্ষ্যে কেন্দ্রা-ভিমুখাকর্ষণে কার্য্যক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করি-তেছে। অধোদিকে দৃষ্টি কর, নিখিল ভূমণ্ডল" জলনিধি-শৈল-কানন-গ্রাম-নগর-মরুভূমি-প্রান্তর-জীবনিকরের সহিত নিরা-ন্তরালভাবে অবিচ্ছেদে স্বীয় প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। চরাচরে কাহারও লক্ষ্যচ্যুতি নাই; কাহারও বিরাম নাই। কি জড়জগৎ, কি চেতন জীবনিচয় সকলেই স্ব স্ব গন্তব্য পথে নির-ন্তর বিচরণ করিতেছে। অপরিমেয় অম্বু-রাশিও কার্য্য করিতেছে; সামান্য নদ-নদী-নির্ঝরিণীও কার্য্য করিতেছে; গিরি-মরু প্রভৃতি স্থাবরজন্তও কার্য্য করিতেছে; তরুলতাদি উদ্ভিদ সমূহও কার্য্য করিতেছে; কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জঙ্গম প্রাণিগণও কার্য্য করিতেছে; উৎকৃষ্ট

জীব মানবমণ্ডলীও কার্য্য করিতেছে। সকলেই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতেছে, সত্য; কিন্তু কোন দুইটির কার্য্য পরস্পর একরূপ নহে। প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্য অপর শ্রেণীর কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যদিও সকলেই একই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ এবং একই প্রকৃতি সকলেরই কেন্দ্রস্বরূপ—যদিও একই ধর্ম্মরূপ মহাকর্ষণ শক্তি সকলকেই স্ব স্ব কক্ষাতে অবস্থাপিত করিয়া রহিয়াছে—যদিও একই উন্নতির আকাঙ্ক্ষা—উদ্দেশ্য সকলেরই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তথাপি ঐ প্রকৃতি—ঐ বিচিত্রস্বভাবা মহীয়সী প্রকৃতির গুণবিভেদে চরাচরের কার্য্যবিভাগ হইয়াছে। ঐ কার্য্যবিভাগ বা গুণবিভাগই তাহাদিগের শ্রেণীবিভাগের কারণ। জড়জগতের কার্য্য জড়রূপে প্রতিভাত; চেতন জগতের কার্য্য চেতনাত্মক স্বরূপে প্রকাশিত। জড়ের কার্য্যে কেবল সত্য ও উন্নতির ভাব কিঞ্চিৎ স্ফুরিত হইলেও তাহাতে জ্ঞান বা সুখের ছায়ামাত্র পরিদৃষ্ট হয় না; কিন্তু চেতন জগতের কার্য্যে প্রতিপদেই সত্য ও উন্নতির সহিত জ্ঞান ও সুখের পূর্ণ আভাস প্রতীত হইয়া থাকে। জীবের নিখিল কার্য্যই উন্নতিলক্ষ্যে সুখোদ্দেশে সুখময়ী প্রকৃতিকে কেন্দ্র করিয়া সমাহিত হইতেছে। জীবের কার্য্যসমূহের প্রতিস্তরেই উন্নতি ও সুখের আকাঙ্ক্ষার মিশ্রণ সংলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহই নিজের সম্পূর্ণ উন্নতি ও সুখ দেখিতে পান না। সকলেই আপনাপন অভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অসুখী। এ দিকে জিজ্ঞাসা করিলেও ঐ অভাব ব্যক্ত হয় না। ব্যক্ত না হইবার কারণ, তদ্বিষয়িণী অজ্ঞতা। ফলতঃ ঐ অজ্ঞতাতেও লাভ আছে। কারণ, স্বরূপতঃ অভাব জ্ঞাত না হইলেও ব্যতিরেকতঃ অর্থাৎ 'অভাবের পূরণ হইল না, অতএব আমার অভাব আছে,' এই প্রকারে অংশতঃ অভাব অবগত হওয়া যায়। এবং ঐ আংশিক জ্ঞানেই উক্ত অভাবের পূরণার্থ জড়জগৎ হইতে আধ্যাত্মিক জগতের সাহায্য অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রকৃত অভাবের নিবারণের প্রকৃত উপায়—যাহা করতলগত হইলেও পূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই, তাহা এক্ষণে দেখিতে পাই। আমরা ক্রমে দেখিতে পাই, আমাদিগের অন্তরাত্মার অভাব নিরাকরণের উপায় বাহ্যজগতে নাই; তাহা অন্তর্জগতে। বাহ্য জ্ঞান, বাহ্য ক্রিয়া, বাহ্য বিভূতি, বাহ্য সিদ্ধি, আমাদিগের ঐ অভাব দূর করিতে পারে না। বিশেষতঃ, বাহ্য জগতের কোন কার্য্যের, কোন যোগেরই ফল প্রকৃত সুখ নহে। আমরা সুখলাভ প্রত্যাশায়—আমাদিগের সুখাভাবপূরণাশায় যে কোন কর্ম্ম করিয়া থাকি, এবং তাহার সমাপ্তিতে যে কোন ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা প্রকৃত কর্ম্ম বা প্রকৃত সুখ নহে; ঐ সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য কর্ম্মের আভাস ও ঐ সকল সুখ সুখের আভাস বা দুঃখের পূর্ব্বাবস্থামাত্র। তত্তাবৎই কিছুকাল পরে বা কিছুকাল ভোগেই দুঃখের সাধন রূপে বা অসুখাকারে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব উহাদিগের কোনটিকেই প্রকৃত সুখ বা উক্ত-ফল-সাধক কোন কর্ম্মকেই প্রকৃত সুখসাধক কর্ম্ম বলা যায় না। চিন্তাশীল প্রকৃত উন্নতিলিপ্সু প্রকৃত সুখাভিলাষী মানবমাত্রই

এই প্রকার পরীক্ষা ও চিন্তা করিতে করিতে গভীর সংশয়সাগরে নিবিড় ভ্রমান্ধকারে নিপতিত হইয়া থাকেন,এই পৃথিবীর বহুশত শতাব্দীর সঞ্চিত দর্শনশাস্ত্র সকলই তাহার প্রমাণ। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যাবজ্জীবন চিন্তামগ্ন হইয়া জ্ঞানরত্নের আকরস্বরূপ দুষ্প্রবেশ্য দর্শনশাস্ত্র সকল প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল দার্শনিক যে যুক্তিমালা রচনা করিয়া গিয়াছেন—সেই সকল জ্ঞানধন মধুকর যে জ্ঞানচক্র নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে, সকলকেই বিমোহিত হইতে হয়।

জ্ঞানখনি ভারতভূমি অনেকগুলি দর্শন শাস্ত্রের জন্মক্ষেত্র। ঐ সকল দর্শনশাস্ত্র অতীব প্রাচীন। ঐ সকল দর্শনশাস্ত্র যে সময়ে বিরচিত হইয়াছে, তৎকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক সকল বন্য জীবনও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। পৃথিবীর অপরাপর স্থানের প্রচলিত দর্শনশাস্ত্র সকলের মূল উহাদিগের হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্র সকলকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে একভাগ, বিজ্ঞান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহাদিগকে আন্বীক্ষিক শাস্ত্র ও অপর ভাগ তর্ক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহাদিগকে বিজ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। চার্ব্বাকাদি কয়েকটি দর্শন প্রথম-বিভাগের ও বেদান্তাদি কয়েকটি দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্গত। যাহাই হউক, শক্তিই ঐ সকল দর্শনের একমাত্র আশ্রয়। জড়শক্তি বা চেতন শক্তিই উহাদিগের অমূল-মূল। উহারাই ঐ সকল দর্শনশাস্ত্রের সকল তত্ত্বের সার তত্ত্ব। ফলতঃ শক্তির বহির্ভাগে মানবের যাইবার সামর্থ্যই নাই। শক্তিই মানবের মানসিক অনুধাবনার উচ্চতম শিখর। শক্তিব্যতিরিক্ত মানবের মনে কোন ধারণাই নাই। মানবের বিশ্ববিজয়িনী বুদ্ধিবৃত্তির উহাই শেষ কীর্ত্তি ও মানবকল্পনার উহাই বিরামস্থল। উহাই বিশ্বের সীমান্ত স্থল বা অন্তস্তমতল। আমরা শক্তির অতিরিক্ত বিশ্বসংসারের কিছুই জানি না বা জানিতেও পারি না। মনুষ্যের সুবিস্তৃত ও চিরবর্দ্ধিত জ্ঞানরাজ্যের উহাই চরমসীমা। আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় কখনই ঐ সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। মানব যতকাল মানব থাকিবেন তত কালই তাঁহাকে ঐ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইবে—তাহার অন্যথা করিবার সাধ্যও নাই। তবে যদি কোন অলোকসম্ভবা শক্তি সহসা তাঁহাতে উচ্ছ্বসিত হয়, তবে যদি কোন অভাবনীয় অলোকসামান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় তাঁহাতে অভ্যুদিত হয়, তাহা হইলে তিনি কি করেন, তাহা বলা যায় না। নতুবা আবহমান কাল যেরূপ হইয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও সেইরূপই হইবে; তদতিরিক্ত আশা করিবারও কোন কারণ নাই। জ্যামিতির কোণের ভুজদ্বয় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত করিলেও যেমন তাহার কোণের কোন ব্যত্যয় হয় না, মানবের জ্ঞানোন্নতিরও অনেকটা সেই ভাব। কিন্তু

তাদৃশ অলৌকিক-জ্ঞানেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট মনুষ্য আর মনুষ্য নামে অভিহিত হইতে পারেন না। তাঁহার পদ উচ্চ। অবস্থাভেদে পদ-ভেদ এবং পদভেদে সংজ্ঞারও ভেদ হইয়া থাকে। তখন সে মানুষ—অলৌকিক-শক্তি-সমন্বিত সেই মানুষ আর এ মানুষ রহিল না। এতদুভয়ে চন্দ্র-সূর্য্য আকাশ-পাতাল স্বর্গ-মর্ত্ত্য প্রভেদ হইয়া দাঁড়াইল। সে দেব-স্বরূপ মানবের কথা স্বতন্ত্র। নতুবা মনুষ্যের জ্ঞানকাণ্ড চিরন্তনী শক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকিবে। সমুদ্র যেরূপ বেলাভূমি উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, অগাধবুদ্ধি মনুষ্যও তদ্রূপ কোনক্রমেই শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারেন না। দণ্ডবায়ুসন্তাড়িত হইয়া যদি কখন তিনি সেই শক্তিবেলা উল্লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পান, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত কে যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই পাতালমধ্যে নিক্ষেপ করে। চিন্তাস্রোত নদীস্রোতের ন্যায় অনন্তকাল ছুটিতেছে—দিন দিন ক্রমান্বয়ে গভীর ও প্রসারিত হইয়া আসি-তেছে এবং কালসহকারে তাহার স্ফটি-কের তুল্য নির্ম্মলতা ও সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি হই-তেছে; কিন্তু তাহা কিছুতেই সেই তীর অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছে না; মহাবেগে কূলে কূলে প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাত করিয়া ফিরিতেছে, ইচ্ছা যে, কূল ভাঙ্গিয়া বহির্গমন করে; স্তূপে স্তূপে মৃত্তিকারাশি সেই ভীষণ আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; তথাপি যে অবরোধ সেই অবরোধই পূর্ব্ব-বৎ অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কোনক্রমেই অপহৃত হইতেছে না। আশা-ময়ী মায়াময়ী ছায়াময়ী কল্পনা চিরদিনই সেই অচ্ছেদ্য বন্ধন ছেদন করিবার প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু কোন মতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এ বিষয়ে তাঁহার যত্নের লেশমাত্র ত্রুটি নাই; কখন মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি আলস্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করেন না। প্রতিনিয়তই তিনি নিজ কল্পনা-বলে সংসারকে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের অনন্ত রহস্য ভেদ করিয়া দেখাইতেছেন, কিন্তু প্রকৃতির অধীন জীব প্রকৃতি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না; বিশ্বব্রহ্মা-ণ্ডকে স্বেচ্ছামত ভাঙ্গিতেছেন ও পুনর্গঠিত করিতেছেন, অদূরদর্শী জীব প্রকৃতিরই অবস্থান্তর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই-তেছেন না—তাঁহার স্থূল দৃষ্টি প্রকৃতির অভেদ্য আবরণ ভেদ করিয়া আর স্তরান্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না—উপরি-ভাগেই ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। কল্পনা তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে লৌকিক হইতে অলৌকিকে প্রাকৃত, হইতে অপ্রাকৃতে,সগুণ হইতে নির্গুণে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছে, প্রাকৃত মনুষ্য কিয়-দ্দূর গমন করিতেছে—স্থাবর হইতে জঙ্গমে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, প্রস্তর হইতে মৃত্তিকায়, মৃত্তিকা হইতে জলে, জল হইতে তেজে, তেজ হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে আকাশে, আকাশ হইতে তন্মাত্রে, তন্মাত্র হইতে ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় হইতে মনে, মন হইতে দেবতা ও অহঙ্কারে; তিনি আর উঠিতে পারিতেছেন না; পরন্তু তিনি যতই উঠি-বার চেষ্টা করিতেছেন, ততই উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের ন্যায় প্রকৃতিতেই পুনরাগমন করিতেছেন। কল্পনা তাহাতেও ক্ষান্ত

নহেন। তিনি প্রাকৃত মনুষ্যকে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া আলোক অপেক্ষা বেগবান্ পক্ষ সঞ্চালন করিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে বায়ুরাশি ভেদ করিয়া দ্রুতবেগে আকাশপথে উঠিতে লাগিলেন; ক্রমে সাগর গোষ্পদ এবং উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ ধরাপৃষ্ঠে ক্ষুদ্রতম ত্রণের সদৃশ অনুভূত হইতে লাগিল, ক্রমে সমস্ত পৃথিবী ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুর ন্যায় কোথায় মিলাইয়া গেল, কল্পনা তখনও দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ছায়াপথে উপনীত হইয়া আকাশগঙ্গায় গাত্র ভাসাইয়া সৌরজগৎ হইতে সৌরজগদন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলেন; এই রূপে অসংখ্য চক্রবৎপরিক্রমণশীল সৌরজগৎসমূহ পার হইবার প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু মনুষ্য তাহার সীমান্ত পাইলেন না; এতাবৎকাল প্রকৃতির অনন্ত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। করুণাময়ী প্রকৃতি তদ্দর্শনে ব্যথিত হইয়া দুর্দ্দান্ত পুত্রকে পুনর্ব্বার শূন্য হইতে অবতরণ করাইয়া ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। মানব তখন জননীর ক্রোড়ে নিদ্রিত—স্বপ্নে বিশ্বসংসারের আবরণ পলাণ্ডুর কোষের তুল্য আবরণ—উন্মোচন করিতে লাগিলেন, কোষের পর কোষ, আবরণের পর আবরণ, এইরূপে ক্রমশই চলিল; আবরণেরও শেষ নাই, প্রকৃতিরও শেষ নাই; সুতরাং মনুষ্য তাহার সেই অনন্ত কোষরহস্যও উচ্ছেদ করিয়া অনন্যাপেক্ষি উপাদান অনুধাবন করিতে পারিলেন না। কল্পনা স্থূল জগৎকে কোটি কোটি ভাগে বিভক্ত করিয়া অসংখ্য অণুতে পরিণত করিলেন, স্থূলদৃষ্টি মানব প্রকৃতিরই সূক্ষ্মতম পরিণাম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। জগৎকে অনন্তকাল ভাগ করিলেন, ভাগেরও শেষ হইল না, অণুরও নির্গুণ সত্তা—শূন্যত্বে পর্য্যবসান দেখিতে পাইলেন না। পরিশেষে ভ্রান্ত, আক্রান্ত ও হতাশ হইয়া প্রকৃতির চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরমাণুতেই তাঁহার চিন্তার পর্য্যবসান হইল। কল্পনা স্বীয় অধিকারমধ্যে যতই কেন ইন্দ্রজাল বিস্তার করুন না, প্রাকৃতিক মানব সেই ছায়াবাজিতে প্রকৃতির ছায়া ভিন্ন আর কিছুই দেখিবেন না। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ কল্পনার ক্রীড়াভূমি নহে; ইহা কল্পনাময়ী প্রকৃতির অনন্তমূর্ত্তি—অনন্তস্ফূর্ত্তি—অনন্তবিকাশমাত্র—কলায় কলায়, পিণ্ডে পিণ্ডে, স্তূপে স্তূপে, গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে, চন্দ্রে চন্দ্রে, সূর্য্যে সূর্য্যে, লোকে লোকে, জগতে জগতে, প্রকৃতির—কল্পনাশক্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। সুক্ষুদ্র পুষ্পরেণুও যেরূপ কল্পনাশক্তির অবয়বী মূর্ত্তি—প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডও তদ্রূপ। বহির্জগতেও যে শক্তি, যে কথা—অন্তর্জগতেও সেই শক্তি, সেই কথা। কল্পনাময়ী প্রকৃতি অনাদি অনন্ত কাল অনন্ত শূন্য ব্যাপিয়া অনন্তলীলা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার আদিও নাই—অন্তও নাই; ব্যাপ্তি আছে—ক্রম আছে—বিকাশ আছে, তিনি পরিণামিণী। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বহুকালাবধি সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপার স্তরে স্তরে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছে, এবং প্রকৃতির অতিরিক্ত কোন স্বরূপ না পাইয়া প্রকৃতিতেই বিশ্রাম করিয়াছে। দর্শন, অনুমানের সাহায্যে

কৃতকার্য্য হইবার প্রত্যাশায় কার্য্যকারণের মহা আড়ম্বর লইয়া ধীরে ধীরে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সগুণ হইতে নির্গুণে প্রবেশ করিবার জন্য আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছে এবং একে একে ক্ষিতি-জল-তেজ-মরুদ্‌-ব্যোম ও গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ উন্মোচন করিয়া প্রকৃতিকে দিগম্বরী করিয়া তাহার অনাবৃত—অনাহার্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইয়াছে, কিন্তু পরিশেষে তাহাতে অসমর্থ হইয়া আধার ও কালের ভাবে বিভোর হইয়া কিছুকাল অন্ধের ন্যায় হস্তামর্ষণে ইতঃস্ততঃ ভ্রমণ করিল। মানবের জীবন প্রকৃতিগত—তাঁহার মনও তন্ময়। প্রকৃতিই তাঁহার ভাবনা—প্রকৃতিই তাঁহার কল্পনা। তাঁহার জ্ঞানে ধ্যানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, তপে জপে, চিন্তায় কল্পনায়, ভাবে ভক্তিতে, প্রত্যক্ষে অনুমানে, সর্ব্বত্রই সেই প্রকৃতিরই মূর্ত্তি। যখন আকাশের চিন্তা বা ধ্যান করিতে গেলে সুনীল তারকারাজিসুশোভিত গগনমণ্ডল মনে উদিত হইবে, তখন মানব প্রকৃতির বহির্ভাগে কল্পনাতীত স্থলে স্বকীয় সামর্থ্যে কিরূপে গমন করিবে?

মনুষ্যের জ্ঞানকাণ্ড অনুশীলন করিলে, পর পর তিনটি বিভিন্ন অবস্থা প্রতীয়মান হয়। সেই অবস্থাত্রয়ে নিখিল বিশ্বব্যাপারের তিন প্রকার ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, এই তিনটি অবস্থা আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে পর পর স্ফূর্ত্তি লাভ করে। এই তিনটিই আমাদিগের জ্ঞানোন্নতির সোপান। এই তিনটিই বিজ্ঞানের অনুমোদিত হইলেও প্রথম ও দ্বিতীয়টি অধিক পরিমাণে প্রকৃত ও তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মানবের শিক্ষাগুরু ও শেষটি একমাত্র বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মানবের দীক্ষাগুরু স্বরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কালে এই তিনেরই শাসন প্রবল ভাবে চলিয়া আসিতেছে। নিতান্ত তমোগুণপ্রবল চিত্তে প্রাকৃতিক বলের, রজোগুণপ্রবল চিত্তে দার্শনিক বলের এবং সত্ত্বসংশোধিত চিত্তে তত্ত্ববিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত অধিকার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কখন বা এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে তিনেরই সমান প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ঐ তিনটি দ্বারাই পরিমার্জ্জিত হইতেছে। আমাদিগের চিন্তাস্রোত ঐ তিনটি প্রণালীতেই পর পর চলিয়া আসিতেছে। ফলতঃ, মানবের উন্নতির সহিত এই তিনটি অবস্থা পর পর অলক্ষিত ভাবে কেমন পরিস্ফুট হইয়া আসিতেছে, তাহা আলোচনা করিলে হৃদয়ে যে কিরূপ আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহা বর্ণনাতীত। আমাদিগের জীবনে আমাদিগের জ্ঞানরাজ্যে তাহারা পর পর যে কিপ্রকারে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে, তাহা একবার চিন্তা করিলেও শরীর পুলকিত ও মন বিস্ময়সাগরে আপ্লুত হয়।

যখন হৃদয়রাজ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অদ্বিতীয় আধিপত্য বিস্তার হয়; তখন মানব জড়বৎ বিচরণ করিতে থাকে। যখন উহা আপন শাসন প্রচার করিতে থাকে, তখন কার সাধ্য যে তাহার প্রতিবাদ করে। তখন চিন্তাজগতে সেই সর্ব্বেসর্ব্বা। হৃৎপ্রতাপ

হইয়া বন্দীভাবে থাকিয়াও সে মধ্যে মধ্যে ভীষণ বিপ্লব ঘটাইতে ক্রটি করে না। যখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রবল প্রতাপ থাকে, তখন দর্শন কোথায় নিরালয়ে এক প্রান্তে দীনভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে আত্মবলে বলীয়ান্ হইয়া অবসর-সুযোগে স্বীয় স্বাধীনতার ধ্বজা উঠাইয়া দেয়। তখন চতুর্দ্দিকে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। উভয়ে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। যে দর্শন এককালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, আজ সে স্বাধীন হইল দেখিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্রোধ ও মনস্তাপের সীমা থাকে না। সে তখন তাহার উচ্ছেদব্রতে ব্রতী হয়; কিন্তু সেই উত্থিত শক্তি কোনরূপেই নির্ব্বাপিত হয় না। নববলে বলীয়ান্ দর্শন একে একে তাহার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতে থাকে। তখন বিজ্ঞান আপনার হীনদশায় দুঃখিত হইয়া মলিন ভাবে সাহায্য প্রার্থনায় ইতঃস্তত ভ্রমণ করে। অবশেষে দৈবশক্তিলাভে সবল হইয়া—তত্ত্ববিজ্ঞানের সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়া রণক্ষেত্রে পুনর্ব্বার প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয়। তখন দর্শন নিজ শত্রুকে প্রবল দেখিয়া তাহার সহিত বিরোধ না করিয়া বরং সন্ধিস্থাপনে সমুদ্যোগী হয়। ফলতঃ অনাদি কাল হইতেই মানবরাজ্যে এইরূপই চলিয়া আসিতেছে। তিনেরই অধিকার তিনেই ভোগ করিতেছে। তত্ত্ববিজ্ঞান আগত হইলেই দর্শন, বিজ্ঞানের অধিকার তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং তত্ত্ববিজ্ঞানের অনুগত হইয়া অবস্থান করে।

তত্ত্ববিজ্ঞান আত্মা ও পরমাত্মার দ্বারের প্রহরী। আত্মদর্শনের প্রয়োজন হইলে, বিজ্ঞান ভিন্ন আর কেহই সে পথ প্রদর্শন করিতে পারে না বা সাহসও করে না। তত্ত্ববিজ্ঞানই প্রকৃত পক্ষে জগদ্গুরু। ঐহিক ও পারত্রিক উভয় বিষয়েই তাহার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। যাহাতে বিজ্ঞান নাই তাহা হেয় ও অপদার্থ। যথায় বিজ্ঞান নাই তথায় প্রেতের বাস, নির্ব্বোধের রাজ্য। বিজ্ঞানই চতুর্ব্বর্গফলদাতা। বিজ্ঞানের যদি কোন অধিকার থাকে, তাহা মনুষ্যের ভাবমার্গে, চিন্তামার্গে নহে। ধর্ম্মের নিয়মগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করাই বিজ্ঞানের কার্য্য।

পদার্থের প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদিগের কোন জ্ঞানই নাই। পদার্থ যেরূপে আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়, আমাদিগের তদ্বিষয়ে সেই রূপই জ্ঞান। তাহার অতিরিক্ত অস্তিত্বে আমাদিগের কিছুমাত্র অধিকার নাই, এবং তাদৃশ জ্ঞানও আর এক দ্বিতীয় বস্তুর সম্বন্ধে। সংসারে দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলে আমাদিগের কোন জ্ঞানই হইত না। বস্তুর স্বরূপ বা নির্গুণ সত্তা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য। আমার রসালের জ্ঞান আছে; অর্থাৎ রসাল আমার ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু। ইহার আকার প্রকার, বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ ও স্পর্শ আমার যেরূপ অনুভব হইয়াছে, তাহা অন্য ফল হইতে পৃথক্ বা অন্যের সহিত তাহার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে; আমাদিগের জ্ঞানই এই প্রকার। এতদ্ভিন্ন রসালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব

আমরা বলিতে পারি না। নির্গুণ অস্তিত্ব আমাদিগের উপলব্ধি হয় না এবং কোন বস্তুর প্রকৃত কারণও আমরা জানিতে পারি না। বস্তুসমূহের পরস্পর সাদৃশ্য, সামানাধিকরণ্য ও পারম্পর্য্য সম্বন্ধ ব্যতীত আর আমাদিগের কিছুই জানিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু সম্বন্ধ নিত্য; অর্থাৎ অবস্থার প্রতিম্নতা না হইলে সে সম্বন্ধেরও প্রভেদ ঘটে না—চিরকালই সমভাবে থাকে। অগ্নিতে কাষ্ঠ দগ্ধ হয়, অর্থাৎ অগ্নি ও কাষ্ঠ সমানাধিকরণ, এবং দহন পরবর্ত্তী ঘটনা। অগ্নি ও কাষ্ঠের সামানাধিকরণ্য বিশেষে দহন রূপ পরবর্ত্তী বিষয় উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধ নিত্য; তবে অবস্থান্তরে সম্বন্ধেরও ভেদ হয়—তাহা নিত্য। অর্থাৎ আর্দ্র কাষ্ঠ অগ্নিসংযোগে দহনের পরিবর্ত্তে অপর একটি পরবর্ত্তী ঘটনা সংসাধিত হইবে। যে নিত্য সাদৃশ্য সম্বন্ধ সূত্রে বস্তু সকল পরস্পর গ্রথিত, এবং যে নিত্য প্রাণালীতে তাহাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তিতা এবং পারম্পর্য্য সম্বন্ধে দেখা যায়, তাহাকেই নিয়ম বলে। আমরা একখানি কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলাম, কাষ্ঠ জ্বলিতে লাগিল, বারংবার পরীক্ষায় লাক্ষত হইল যে, সকল সময়েই সেই এক ভাব। ক্রমে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, এইরূপ সঙ্ঘটন দর্শনে আমাদিগের প্রতীতি হইল যে, এইরূপ যে কোন কাষ্ঠ এইরূপ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেই এইরূপ দহন নির্ব্বাহ করিবে। এইরূপে আমরা জ্ঞাত অবস্থা হইতে অজ্ঞাত অবস্থায় গমন করিলাম, ফলতঃ অগ্নিসংযোগে কাষ্ঠ দহন ক্রিয়া সম্পাদন করে, ইহারই নাম নিয়ম। পদার্থসম্বন্ধে আমরা ঐ নিয়মমাত্র জানি। তাহাদের সূক্ষ্ম প্রকৃতি বা নিগূঢ় কারণ প্রভৃতি জানিবার আমাদিগের কোন শক্তি নাই। জ্ঞাত অবস্থা হইতে নিয়ম সংগ্রহ করাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। উহার বহির্ভাগে গমন করা বিজ্ঞানের অনধিকার চর্চ্চামাত্র। বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আছে। ঐ বিভাগ ও বিষয় অনুসারেই বিজ্ঞানের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হয়। গণিত বিজ্ঞান সংখ্যা, জ্যামিতি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ, জ্যোতিষ জ্যোতিষ্কগণের আকৃতি, গতি ও পরিমাণাদি, রসায়ণ জড়বস্তুর পরিবর্ত্তনাদি, শারীরবিজ্ঞান শারীরিক প্রক্রিয়াদি লইয়া আলোচনা করে। দর্শনশাস্ত্রের কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় নাই। কিন্তু উহা পূর্ব্বোক্ত সকল গুলিকে লইয়া আলোচনা করে। তত্ত্ববিজ্ঞান সমস্ত চিন্তাজগতের অধিকারী। মনুষ্য যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, ইহাই তাহার প্রাণের প্রাণ। তত্ত্ববিজ্ঞানই জীবের জীবনের একমাত্র সুখদাতা। বিজ্ঞান ইহারই সেবার জন্য সুদূরপরাহত তত্ত্বনির্ণয়ে তন্ময় হইয়া থাকে। দর্শন ইহার অনুগত ভৃত্য। বিজ্ঞানের প্রণালী প্রমেয়গত; দর্শনের প্রণালী প্রমাতৃগত; তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রণালী উভয় গত। তত্ত্ববিজ্ঞানের অভ্যুদয়েই বিজ্ঞান ও দর্শনের বিরোধ ভঞ্জন হইয়াছে।

বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের মিলন করাই সকল অনুসন্ধানের মুখ্য কল্প। প্রমাতৃগত প্রণালীটি সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং মনঃকল্পিত; প্রমেয়গত প্রণালীটিও সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ বস্তুর উপর

প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সীমাবদ্ধ; কিন্তু তৃতীয়টি বিজ্ঞান ও অনুমানের উপর সংস্থাপিত, তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী কাল্পনিক হইয়াও বাস্তবিক। প্রমাতৃগত প্রণালীটি মানসিক কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া চিন্তাস্রোতে প্রধাবিত হয়। মানসিক ধারণার পারম্পর্য্যের প্রতিরূপের সহিত বাস্তবিক ঘটনার ঐক্য থাকুক বা না থাকুক, সে তাহার অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়াই চিন্তামার্গে বিচরণ করিয়া থাকে। প্রমেয়গত প্রণালীটি ঠিক উহার বিপরীত। সে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয় চিন্তা করিতেই অসম্মত। কল্পনার রাজ্যে গমন করিতেও পরাঙ্মুখ। কিন্তু তৃতীয় প্রণালীটি সেরূপ নহে। এ প্রণালীতে চিন্তাতরঙ্গ ঘটনা-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সমান ভাবে তালে তালে চলিতে থাকে। মানবের যে পূর্ব্ব ধারণা থাকে, তাহাকে প্রতিপদে বাস্তবিক ঘটনার সহিত বিধিমত তুলনা করিয়া মিলন করিয়া দেখায়। ইহাতেও দর্শনের ন্যায় অনুমান আছে বটে, কিন্তু তত্ত্ববিজ্ঞানের অনুমান মিথ্যা নহে, একটা যা তা ধরিয়া লওয়া নহে। ইহারও বন্ধন আছে—সঙ্কেত আছে। তৃণদর্শনে দুগ্ধের অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত। সকল অনুমানের মূলেই উপমিতি আছে, নতুবা অন্ধের হস্তিদর্শন হইয়া পড়ে। প্রত্যেক দৃষ্ট জ্ঞানের সঙ্গেই কতকটা অনুলব্ধি থাকে। সকল গুণই সকল সময় একেবারে উপলব্ধ হয় না, সুতরাং সর্ব্বত্রই আংশিক অনুলব্ধি থাকে। বস্তুর দৃষ্ট লক্ষণ দ্বারা অদৃষ্ট লক্ষণ অনুমান করিতে হয়। উপলব্ধি হইতে অনুলব্ধি ও অনুলব্ধি হইতে জ্ঞান—প্রমাণ। উপলব্ধির প্রামাণ্য নাই; অনুলব্ধির প্রামাণ্য অপরিহার্য্য। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়েই অনুমানের সাহায্য লইয়া থাকেন বটে; কিন্তু দার্শনিক অনুমানে ও বৈজ্ঞানিকের অনুমানে বিস্তর প্রভেদ। বৈজ্ঞানিক নিজ অনুমানকে ঘটনার সহিত পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করেন, কিন্তু দার্শনিক সেরূপ পরীক্ষার প্রয়াস বা অবসর পান না। কাল্পনিক অনুমানের প্রামাণ্য নাই, বাস্তবিক অনুমানেরই প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। দার্শনিকের অনুমান স্বপ্নবৎ; তাহার সহিত বাস্তবিকের পারম্পর্য্য থাকে না। বৈজ্ঞানিকের অনুমান জাগ্রতের ন্যায় বাস্তবিকের পারম্পর্য্য বিশিষ্ট। স্বপ্নের ন্যায় কাল্পনিক কোন কোন স্থলে সত্য ও অভ্রান্ত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু সেই নিমিত্ত তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। কাল্পনিক অনুমানে স্বভাবের নিয়ম আয়ত্ত হয় না, সুতরাং উহা স্বভাবের অধীন; যেখানে স্বভাবের সহিত ঐক্য হইল, সেই খানেই কাকতালীয় ন্যায়ে কাল্পনিক অনুমান সত্য হইল; তদ্ভিন্ন স্থলে উহার ভ্রম অপরিহার্য্য। কাল্পনিক অনুমান প্রমাতৃগত, সুতরাং উহাতে প্রমাতৃগত ভ্রমাদি দোষ অপরিহার্য্য। কিন্তু বাস্তবিক অনুমানে স্বভাবের নিয়ম আয়ত্ত হয়, সুতরাং স্বভাব উহার অধীন; সর্ব্বত্রই স্বভাবের সহিত ঐক্য রহিল, সর্ব্বত্রই বাস্তবিক অনুমান সত্য হইল; কোন স্থলেই উহার ভ্রমের সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক নিয়ম প্রমাতৃ ও প্রমেয় এতদুভয় গত, সুতরাং উহাতে প্রমাতৃগত ভ্রমাদিদোষের সম্ভাবনা থাকে না। তত্ত্ব-বিজ্ঞানই বিজ্ঞানের চূড়ান্ত গৌরব, মনুষ্য-

মুক্তির উহাই শেষ সোপান। উহাই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। উহাই মানবের জ্ঞানপিপাসার বিরামসরোবর। মনুষ্য যে ভাবে যথায় থাকুক না কেন, সংসারে অরণ্যে, সভ্যতার উচ্চতম সমুজ্জ্বল শিখরে বা অসভ্যতার প্রগাঢ় অন্ধকারময় কন্দরের অভ্যন্তরে, বিলাসের কমনীয় নিকুঞ্জ কাননে বা উৎকট বৈরাগ্য মরুতে তত্ত্ববিজ্ঞান সর্ব্বত্রই তাহার পিপাসা নিবারণ করিয়া তাহাকে অগাধ আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিবেই করিবে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

চাতক।

(বাউলের সুর।)

কও পাখী এ কোন্ পাপের ফল।
কেন পাওনা খেতে তৃষার জল॥
কত নদ নদী সরোবর, দিতে বারি অকাতর,

বুঝি দেখে তার খেলা;
দিয়ে প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি,
তার প্রেমে কি হও পাগল॥
নিদাঘ-বলে, ধরায় দাবানল জ্বলে,

তুমি সে সব ছেড়ে, শূন্যে উড়ে,
কেন কেঁদে চাও ফটিক জল॥
যখন মেঘের কোলে থেকে থেকে হাসে চপলা,

আতপ-তাপে বসি ডালে সাধ বিরলে;
তুলি প্রাণ ভরে ঐ করুণ-স্বরে
একই বোল—"দে ফটিক জল"॥

শ্রীপ্রঃ—

বঙ্কিম বাবুর শেষ তিনখানি উপন্যাসের স্ত্রীচরিত্র।

প্রস্তাবনা।

ভগবানের সৃষ্টি-রহস্যের মধ্যে জীবগণের পুং-স্ত্রীবিভাগ অতি অদ্ভুত রহস্য। ভাবিয়া দেখিলে এই অপূর্ব্ব রহস্য মধ্যেই সমস্ত জীবসৃষ্টি রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। জীব-সৃষ্টির মধ্যে আবার মানব সৃষ্টিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রহস্যময়। সেই মানব সৃষ্টির মধ্যে রমণী পুরুষের সম্বন্ধ বুঝি জগতের রহস্যের মধ্যেও রহস্য। মানব রাজ্যটিই যেন এই অপূর্ব্ব রহস্যের কেন্দ্রীভূত। ঐ যে দিগন্তব্যাপী সংসার-চক্র মহান্ কোলাহল করিয়া দিবানিশি অবিশ্রান্ত বিঘূর্ণিত হইতেছে—স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধই ইহার প্রধান কারণ। যে বিবাহ হইতে এই সংসার—সেই বিবাহই এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধের একটি অপূর্ব্ব সংযোজনা মাত্র। তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ স্ত্রীপুরুষের এই-রূপ নৈসর্গিক প্রবল আকর্ষণ দৃষ্টি করিয়া, ইহা হইতে ভগবানের অভিপ্রেত শুভফল উৎপাদন মানসে, বিবাহ-প্রথার প্রচলন করিলেন। ক্রমে মানব সমাজে এই শুভ প্রথা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সমস্ত সভ্য জাতিই ইহার শুভফল ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে একমত হইয়া পরিণয়-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন, স্বাভাবিক রহস্য সামাজিক রহস্যে পরিবৃত হইয়া আরও সুন্দর হইয়া দাঁড়াইল।

বিবাহ সম্বন্ধে স্থূলতঃ সকল জাতিই একমত হইল বটে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ বিচারে—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য বিচারে ইহার ঐহিক পারত্রিক ফল বিচারে, জাতিগত বিষম বৈষম্যের সৃষ্টি হইল। একটু ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মতই এই বৈষম্যের মূল কারণ। যাঁহারা মানব-জীবনের কর্ত্তব্য সামান্য ইন্দ্রিয়াদি সুখ লাভের চেষ্টাতেই পর্য্যাপ্ত করিলেন—স্ত্রী তাঁহাদিগের নিকট হইল ইন্দ্রিয়সুখের উপকরণ, বিলাসের সামগ্রী। তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ ঐহিক সুখকর বলিয়া ঐহিক হইয়াই পড়িল। তাঁহারা যত্ন করিয়া তাঁহাদের রমণীবৃন্দকে এই ঐহিক সুখবর্দ্ধনের ক্ষমতা পরিবৃদ্ধি করিতেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আর যাঁহারা মানবের প্রকৃত সুখ অর্থাৎ ধর্ম্মানুগত সুখলাভের চেষ্টায় ধর্ম্মাচরণই জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন—স্ত্রী হইল তাঁহাদের নিকট সহধর্ম্মিণী। তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীকে স্বামীর ধর্ম্মচর্য্যায় সহায়তা করিতেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপ বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন প্রকার স্ত্রী পুরুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়া পড়িল।

বলা বাহুল্য যে, হিন্দুজাতি স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী ভাবেই গ্রহণ করিলেন। হিন্দুপত্নীর সহিত হিন্দুপতির সম্বন্ধ ঐহিক হইতে পারত্রিকে উঠিল। হিন্দুরা হিন্দুপত্নীকে স্বামীর ধর্ম্মে সহায়তা করিতেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ফলে এই হইল যে, হিন্দুপত্নী হিন্দুপতির ঐহিক, পারত্রিক, সামান্য ও বিশেষ উভয়বিধ সুখেরই উপাদান হইয়া পড়িলেন। হিন্দুপত্নী হিন্দুপতির যেমন প্রণয়িনী সুখাধিকারিণী,—তেমনি আবার সহধর্ম্মিণী ও ধর্ম্মশক্তিবিধায়িনী। অন্য জাতির পত্নী কি এরূপ নহে? তাহা নহে। মানব ইচ্ছা করিয়া স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ যাহাই নির্দ্দিষ্ট করুক না কেন—ভগবানের অভিপ্রেত নৈসর্গিক সম্বন্ধ কোথায় যাইবে? হিন্দুজাতির ন্যায় অন্যান্য জাতিরও ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সংসারে, বৈরাগ্যে স্ত্রী পুরুষের অপূর্ব্ব সম্বন্ধ অতি অদ্ভুত ক্ষমতাই প্রকাশ করে। তবে প্রভেদ এই যে, হিন্দুগণ ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া স্ত্রীগণের শিক্ষা প্রণালীটি অতি সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন—অন্য জাতি ইহা না বুঝিয়া তাহাদের রমণীবৃন্দের শিক্ষা প্রণালী কিছু বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দু পতি-পত্নীর ধর্ম্মই মূল লক্ষ্য—প্রণয়, সুখ,তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম; অন্যজাতির স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়-সুখই মূল লক্ষ্য সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মটা যতটুকু আসিয়া পড়ে। অপক্ষপাত চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে—মূলতঃ অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও ফলতঃ হিন্দুরাই কিছু ভাল বুঝিয়াছেন।

হিন্দুগণের স্ত্রী-পুরুষের এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধই হিন্দুকবি বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যের একটি প্রধান বিষয়। সুতরাং তাঁহার স্ত্রীচরিত্র গুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে হিন্দু-পতি-পত্নীর সম্বন্ধটা ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। এই জন্য কয়েকটি বাজে কথা না লিখিয়া প্রস্তাবারম্ভ করা যায় না। পাঠকগণ ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না—এরূপ ভরসা করা যায়।

হিন্দুপত্নী হিন্দুপতির যেরূপ আনন্দদায়িনী প্রণয়িনী, সেইরূপই আবার কর্ম্মশক্তিবিধায়িনী সহধর্ম্মিণী। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে হিন্দুপত্নীর এই দ্বিবিধ ভাবই সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ এই ভাব অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র স্ত্রীচরিত্র দ্বারাও তাঁহার উপন্যাসের স্তরবিভাগ প্রদর্শন করা যায়।[১] তাঁহার প্রথম দুই স্তরের উপন্যাসে স্ত্রীর প্রণয়িনী ভাবই মুখ্যরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর এইরূপ প্রণয় কেমন সুন্দর, কেমন সুখদ, তাহা তিনি প্রথমে দেখাইয়া, সেই প্রণয়ের নানারূপ বিঘ্ন বিপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিরূপে সামান্য কথায়—সামান্য কার্য্যে—সামান্য আত্মসংযমের অভাবে—সামান্য সতর্কতা অভাবে, সে প্রণয়-সুখ ভাঙ্গিয়া যায়—তাহা তিনি প্রথম স্তরের উপন্যাসে অতি জ্বলন্ত ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তদ্দ্বারা মানবমনের প্রণয়বৃত্তির রহস্যটি অতি সুন্দর রূপেই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার শেষের স্তরের উপন্যাসে স্ত্রীচরিত্রের মুখ্যভাব প্রণয়িনীভাব নহে—সহধর্ম্মিণী ভাব। পূর্ব্বেই বলি-

---

১ কাব্যের মূল বিষয় ভেদে কিরূপে তাঁহার উপন্যাসের স্তরবিভাগ দেখান যায়, তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ করিয়াছি। সাহিত্যকল্পদ্রুম ১ম সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

য়াছি—এই শেষের ভাবের সঙ্গে প্রথম ভাব অবশ্যই জড়িত থাকিবে। তাই আনন্দমঠ—দেবীচৌধুরাণী—সীতারাম—এর প্রধান প্রধান স্ত্রীচরিত্রগুলি যেরূপ প্রণয়িনী সেই-রূপই সহধর্ম্মিণী। এই উপন্যাসত্রয়ের স্থূল বিষয়ও যেরূপ উচ্চ, স্ত্রীচরিত্রের ভাবগুলিও তেমনি উচ্চ। এই স্তরের উপন্যাসে তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন—হিন্দুপত্নী কিরূপে হিন্দু পতির ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিতে পারে, কিরূপে সেই সহায়তা প্রাপ্ত হইলে হিন্দু পতি বিবিধ প্রলোভনে পড়িয়াও স্বীয় ধর্ম্ম অক্ষুণ্ন ও বজায় রাখিতে পারে। আবার ইহাতেই তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন—প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর সাহায্য অভাবে লোকে কিরূপে ধর্ম্মপথস্খলিত ও লক্ষ্মীছাড়া হইয়া যায়—কিরূপে জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী ব্যক্তিরও স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ—প্রকৃত সহধর্ম্মিণী অভাবে—সামান্য কামজ প্রেমে পরিণত হইয়া যায়। তাঁহার এই শেষের স্তরের উপন্যাসের স্ত্রীচরিত্রের পাপগুলি অতি সূক্ষ্ম-সামান্য বুদ্ধিতে তাহা ধরিতে পারা যায় না। কিন্তু তবু সেই রকম সূক্ষ্ম পাপে কিরূপ স্থূল পতন আনয়ন করিতে পারে তাহা তিনি এই শেষের স্তরের উপন্যাসগুলিতে অতি সুন্দ-রই দেখাইয়া দিয়াছেন। অনেকে কিন্তু কি বুঝিয়া যেন এই শেষের উপন্যাসগুলিকে কাব্য বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন। পূর্ব্বের উপ-ন্যাসের চরিত্রগুলি—প্রধানতঃ প্রণয়ভাবেই ব্যতিব্যস্ত, সুতরাং প্রথম দৃষ্টিতেই মনো-রঞ্জনকর, তাই কি ইহারা এইরূপ বুঝিয়া থাকেন? তাই বা কিরূপে বলিতে পারি? শেষের উপন্যাসগুলিতেও ত সেই প্রণয়-ভাব বিদ্যমান। তবে তাহা একটু উচ্চ অঙ্গের—সাধারণ দৃষ্টিতে তত চিত্তাকর্ষী নহে। আর কাব্যের বিচার কি শুদ্ধ এই মনোরঞ্জন লইয়া? কাব্য কি কেবলমাত্র মনোরঞ্জন লক্ষ্যেই রচিত হয়? তাহা ত নহে। কাব্যের লক্ষ্য লোকশিক্ষা। মনো-রঞ্জন তাহার উপায় মাত্র। মনোরঞ্জনই যদি কাব্যের এক মাত্র লক্ষ্য হইত—তবে আরব্য-উপন্যাসই কাব্যের আদর্শ হইয়া পড়িত। বাস্তবিক মনোরঞ্জন কাব্যের উদ্দেশ্য নহে—উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। লোকশিক্ষাই কাব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য, কবি ইহা জানিয়া শুনিয়া কাব্য লিখুন আর নাই লিখুন—যে কাব্যে লোকশিক্ষা হয় না, তাহা কাব্যই নহে। সাধারণ বিষয়ের শিক্ষাও কাব্যের বিষয় নহে—সকল বিষয়ের শিক্ষাও কাব্যের উদ্দেশ্য নহে। মানবচরি-ত্রই কাব্য শিক্ষার বিষয়—তবে অবশ্য চরিত্রের সাধারণ ভাগ, যাহা সকলেই দেখিয়া থাকে বা সহজেই বুঝিতে পারে, তাহা কাব্যের তত প্রকৃষ্ট বিষয় নহে। মানব-চরিত্রের যাহা কিছু জটিল, দুর্ব্বোধ্য বা রহ-স্যময় তাহাই কাব্যের উপাদান। কাব্য লোকশিক্ষার্থ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া মানবজীব-নের রহস্যগুলি বিবৃত করে। মানবজীবনের রহস্যের অন্ত নাই—কাব্য এই অনন্ত রহস্য অবলম্বনে লিখিত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বঙ্কিমবাবুর প্রথম স্তরের উপন্যাসে লোকশিক্ষা হয়—শেষের স্তরের উপন্যাসে কি লোকশিক্ষা হয় না? প্রথম স্তরের উপন্যাসেও যেরূপ ঘটনা সৃষ্টি করিয়া মানব মনের অতি প্রচ্ছন্নভাবও ঘটনাধীন বাহিরে

আসিয়া তিনি আমাদিগকে দেখাইয়াছেন—এই শেষের স্তরের উপন্যাসগুলিতেও কি সেইরূপ করেন নাই? তবে ইহাই বা ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইল কি জন্য আর প্রথম স্তরের উপন্যাসই বা দর্শনশাস্ত্র বা মনোবিজ্ঞান না হইল কেন? তাঁহার প্রথম স্তরের উপন্যাস অপেক্ষা তাঁহার শেষের স্তরের উপন্যাস কি স্ত্রীচরিত্র চিত্রণে কম নিপুণতা দেখিতে পাওয়া যায়? নিশ্চয়ই নহে। তবে কথা এই—পূর্ব্বের ভাবটি আমাদের সহজে আয়ত্ত হয়—শেষের ভাবটি তাহা হয় না। তা গ্রন্থকার কি করিবেন? তিনি ঠিক সময় বুঝিয়া তাঁহার শেষের উপন্যাসত্রয়ের স্ত্রীচরিত্রগুলি (পুং চরিত্রের কথা এখন বলিব না) সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সামান্য প্রণয় ইত্যাদি কথা কিছুকাল ভুলিয়া গিয়া একবার হিন্দুর ন্যায় জীবনের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও দেখি—দেখিবে এ উপন্যাস গুলির আবশ্যকতা কি? সে ভাবের নিকটেও যাইবে না—এ উপন্যাস বুঝিবে কিরূপে? সে ভাবের নিকটে যাইতে—তবে দেখিতে এই উপন্যাসত্রয়ে কিরূপ সুন্দর সুন্দর রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছে। যে কোন দিন ভ্রমেও ভাবে নাই—যে, এই যে সংসারে আবদ্ধ হইয়াছি, ইহাই কি ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্য—না ঐ যে শত সহস্র সাধু সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসধর্ম্মে ব্রতী দেখিতে পাই, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত—সে এ উপন্যাস বুঝিবে কিরূপ? যে কখনও নিষ্কাম কর্ম্ম কি—সাংখ্য জ্ঞান কি বুঝিতে চেষ্টা করে নাই—নিষ্কাম কর্ম্মের বাধা কিম্বা সন্ন্যাসের বিঘ্ন বাধা ভাববারও অবসর পায় নাই—সে এ উপন্যাসত্রয়ের আবশ্যকতা মর্ম্ম সহজে কেন বুঝিবে? বড় দুঃখে, এ কথা লিখিলাম। পাঠকগণের নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

এই যে তাঁহার শেষের উপন্যাসগুলির স্ত্রীচরিত্র—ইহাতে কি শিক্ষার বিষয়ের অভাব দেখিতে পাও? এমন উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা আর কি কখন দেখিয়াছ? যে হিন্দুতে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্ত্রীকে শুদ্ধ প্রণয়িনী না করিয়া সহধর্ম্মিণী করিয়াছিল এ শিক্ষা সেই হিন্দুর বংশধর কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়াছে। স্ত্রীর প্রণয়িনী ভাব ত জগতের সর্ব্বত্রের কাব্য গ্রন্থে পাওয়া যায় এমন সহধর্ম্মিণীভাব আর কোথাও দেখিতে পাও কি? বঙ্কিম বাবুর স্ত্রীচরিত্রগুলি হিন্দুজগতে অতুলনীয় শিক্ষা গ্রন্থ। ধর্ম্মে কর্ম্মে, সংসারে বৈরাগ্যে—পতির প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্যের এরূপ শিক্ষা জগতে আর কোনও কাব্য গ্রন্থে দেখিতে পাইবে না। কেন যে ঘরে ঘরে বাঙ্গালী হিন্দু ইহা ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় পাঠ করে না, তাহা বুঝি না।

গৌরচন্দ্রিকা এইখানেই ইতি দিয়া আমরা এখন উক্ত উপন্যাসত্রয়ের স্ত্রীচরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আনন্দমঠের স্ত্রীচরিত্রগুলি এইঃ—শান্তি, কল্যাণী, নিমাই এবং গৌরী।

দেবীচৌধুরাণীর স্ত্রীচরিত্রগুলি এইঃ—প্রফুল্ল, দিবা, নিশা, সাগর, নয়ান, ব্রজেশ্বরের মাতা, প্রফুল্লের মাতা, ব্রহ্ম ঠাকুরাণী, ফুলমণি, ইত্যাদি।

সীতারামের স্ত্রীচরিত্রগুলি এইঃ—নন্দা, শ্রী, রমা, জয়ন্তী, মুরলা, ইত্যাদি।

ইহার মধ্যে আমরা শান্তি, প্রফুল্ল, শ্রী এই তিনটি চরিত্র বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিব। দিবা, নিশা, জয়ন্তী, কল্যাণী, নন্দা, রমা, সাগর, এই কয়েকটি চরিত্র স্থূলভাবে প্রদর্শন করিব। অন্যগুলির দুই একটি কথা বলিবার থাকিলেও প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে তাহা বলিতে পারিব না।

এই চরিত্রগুলি মধ্যে অতি অদ্ভুত সাদৃশ্য ও পার্থক্য পরিদৃশ্য হয়। ফলতঃ কোন কোন সম্বন্ধে গ্রন্থত্রয়ই যেন একখানি মহাকাব্যেরই তিনটি ভাগ বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই চরিত্রগুলিকে তুলনায় সমালোচনা না করিলে—গ্রন্থকারের বর্ণিত রহস্যটি পরিস্ফুট হয় না—তাই আমরা এক প্রস্তাবেই এই স্ত্রীচরিত্রগুলি পরিসমাপ্ত করিতে চাহি।

এই চরিত্রগুলি মধ্যে কতকগুলি গৃহিণী কতকগুলি সন্ন্যাসিনী। কতকগুলি পতিযুক্তা—কতকগুলি পতিবিযুক্তা। প্রথমতঃ এই পতির বিদ্যমানতাকে পার্থক্যের অবলম্বন বলিয়া ভাগ করিলে চরিত্রগুলির এক-পার্শ্বে—শান্তি, কল্যাণী, প্রফুল্ল, সাগর, শ্রী নন্দা, রমা; অপরপার্শ্বে—জয়ন্তী, দিবা, নিশা এইরূপ স্থাপন করিতে হয়। গ্রন্থকার এই দুই শ্রেণীর রমণীর দুই প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এক শ্রেণীর ধর্ম্ম অপরের গ্রহণীয় নহে। সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠধর্ম্ম হইলেও তাহাতে অধিকারীভেদ আছে, সেই যে শাস্ত্রে অধিকারীভেদের কথা উক্ত আছে, তাহা বাতুলের প্রলাপ নহে, অতি সুন্দর সারবান্ উপদেশ। ইহা দেখাইবার জন্যই তিনি প্রফুল্ল ও শ্রী উভয়ের দ্বারা সন্ন্যাস আয়ত্ত করাইয়া তাহার ফলাফল দেখাইয়াছেন—একজনকে সন্ন্যাস হইতে ফিরাইয়া আনিয়া নিষ্কাম গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করাইয়া চরিত্রের সাফল্য প্রদর্শন করিলেন—আমরা প্রফুল্ল চিত্তে প্রফুল্ল চিত্রে শিক্ষার সুফলই দেখিলাম। অন্যদিকে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে চ্যুত করাইয়া অর্দ্ধেক গৃহস্থভাবে আনাইয়া সেই অবলম্বিত পথের অপকর্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন—আমরা দুঃখিত চিত্তে শ্রীচরিত্রে সীতারামের অধঃপতনেরই কারণ দেখিলাম। এসকল কথা পরে বিস্তৃত করিয়া বলা যাইবে, এখন উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। এইখানেই গ্রন্থত্রয়ের স্ত্রী-চরিত্রের সম্বন্ধ শেষ হইল না, চরিত্রগুলি আরও কত সুন্দরভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। পত্নীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ভাবটি কি? তাহা দেখাইবার জন্য একদিকে শান্তি—নন্দা অপরদিকে রমা ও শ্রী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পত্নীর প্রণয়িনী ভাব ইহাদের সকলেরই আছে—তুলনায় তুল্য রূপেই বুঝি আছে। তবু একদলের সহধর্ম্মিণী ভাবের বিদ্যমানতা ও অন্যদলের সেই ভাবের অভাবে তাহাদের পতিচরিত্র কিরূপ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গ অতি সুন্দর রূপেই দেখিতে পাইবেন। আবার ইহাদের মধ্যে শ্রী, প্রফুল্ল, শান্তি—উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা—নন্দা, রমা, কল্যাণী অশিক্ষিতা বা সামান্য রূপে শিক্ষিতা। সেই অশিক্ষিতা নন্দার সহধর্ম্মিণী ভাবের সহিত অশিক্ষিতা রমার সহধর্ম্মিণী ভাব তুলনীয়। আবার শিক্ষিতা শান্তির সহিত শিক্ষিতা শ্রীর ভাব

তুলনীয়া। আর একবল পত্নী ও প্রণয়িনী ভাবেই উজ্জীবিতা—কল্যাণী ও সাগর। সাগর একেবারে শুভ্র পূর্ব্ব উপন্যাসগুলির চরিত্রের ন্যায়ই চিত্রিত—কল্যাণীতে নূতন স্তরের ছায়ামাত্র পড়িয়াছে। ফলতঃ এই স্ত্রীচরিত্রগুলি এমনই সুন্দরভাবে কল্পিত যে একটিকে ছাড়িয়া দিলে, অন্যটির সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয়। যাহাকে duplicate চরিত্র বলে—গ্রন্থত্রয় তাহাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ক্রমে আমরা এইগুলি পাঠকবর্গের সহিত একত্র হইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহি। যেরূপ বিষয়ের বিচারে তেমনই স্ত্রীচরিত্রের তুলনায়—গ্রন্থত্রয় যেন একখানি মহাগ্রন্থেরই অংশ বিশেষ বলিয়া অনুভূত হয়।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়।

ধর্ম্মবিজ্ঞান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরুষকার।

পৃথিবীতে সকল মনুষ্যই কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু সকলে সমানরূপে ফললাভ করিতে পারে না। কেহ কৃতকার্য্য ও কেহ অকৃতকার্য্য হয় এবং কেহ কেহ মধ্যবিধ ফললাভ করে। কেহ রাজা, কেহ পণ্ডিত, কেহ ধনী, কেহ বীর, কেহ সুখী হয়; এবং কেহ প্রজা, কেহ মূর্খ, কেহ নির্ধন, কেহ নির্বীর্য্য, কেহ দুঃখী হয়। কেহ বা মধ্যবিধ অবস্থায় থাকে। কিন্তু কেন এ রূপ হয়? ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতে মানবের চেষ্টার ইতর বিশেষই উহার একমাত্র কারণ। তাঁহাদের মতে চেষ্টাই কার্য্যের প্রধান কারণ;—যে যেমন চেষ্টা করে সে সেইরূপ ফললাভ করে; পুরুষকারই কার্য্যের মূল কারণ।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি চেষ্টা করিলেই কার্য্য হয় তবে হয় না কেন? সকলেই ত চেষ্টা করিতেছে, তবে সকলে ধনী, পণ্ডিত বীর ও সুখী হয় না কেন? ইহার উত্তরে পুরুষকারবাদী বলিলেন, যেরূপ চেষ্টা করিলে, ঐ সকল ফল লাভ হইতে পারে, সেরূপ চেষ্টা হয় না বলিয়াই ঐ সকল ফল লাভ হয় না। যদি তাঁহাদিগকে এমন সহস্র উদাহরণ দেখাইয়া দেওয়া যায় যে, কেহ সামান্য চেষ্টা করিয়া ঐ সকল ফল লাভ করিয়াছে ও কেহ বহুতর চেষ্টা করিয়াও সামান্য ফল লাভ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে তাঁহারা বলিবেন, যাহারা বহু চেষ্টা করিয়াও ফল পায় নাই, তাহাদের চেষ্টার পরিণাম অধিক বটে, কিন্তু বুঝিতে না পারায় তাহাদের চেষ্টা ভ্রান্তি-সঙ্কুল হইয়াছে, এবং যাহারা সামান্য বা বিনা চেষ্টায় ফল লাভ করিয়াছে বোধ হইতেছে, তাহাদের চেষ্টার গভীরতা বুঝিতে পারা যায় নাই বলিয়া অল্প বা নিশ্চেষ্টা বোধ হইতেছে, বাস্তবিক

তাহারা প্রকৃতরূপে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি উত্তরাধিকারক্রমে বা পোষ্য পুত্র স্বরূপে অতুল ধন পাইয়া যে ধনী হইয়াছে, তাহার ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা কোথায়? সুরূপ ও সুকণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া যে লোকের প্রিয় হইয়াছে, তাহার প্রিয় হইবার চেষ্টা কোথায়? ইংলণ্ডে জন্মিয়া যে স্বাধীন ও ভারতে জন্মিয়া যে পরাধীন হইয়াছে, তাহার স্বাধীন ও পরাধীন হইবার চেষ্টা কোথায়? এবং হঠাৎ বজ্রাঘাতে যাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মৃত্যুর কারণ দুশ্চেষ্টা কোথায়? এরূপ শত সহস্র উদাহরণ দেখান যাইতে পারে, পুরুষকারবাদীদিগের সে সকলের উত্তরে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার যো নাই। কিন্তু না থাকিলে কি হয়, মানুষ এরূপ সংস্কারান্ধ যে, কিছুতেই সংস্কার ছাড়িতে চায় না। অন্ততঃ মনে মনেও বলিবে ঐ সকলের কারণ আজিও বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু ক্রমে বিজ্ঞানের আলোচনা করিলে আমরা উহা বুঝিতে পারিব।

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস যে, চেষ্টাই কার্য্যের ফলাফলের একমাত্র বা মূল কারণ। তর্ক করিলে তাঁহারা অনেক সময়ে এদিক ওদিক হেলেন বটে, কিন্তু কাহারও উন্নতি কি অবনতি দেখিলে বলিয়া থাকেন, তাহার চেষ্টা হইতেই উহা হইয়াছে, অর্থাৎ যে সুচেষ্টা করিয়াছে তাহারই উন্নতি হইয়াছে, আর যে সুচেষ্টা করে নাই, অর্থাৎ হয় আদৌ চেষ্টা করে নাই, অথবা যে চেষ্টা করিয়াছে তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে বা বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহারই অবনতি হইয়াছে। তাঁহারা ঐ সংস্কার বশতঃ ইয়ুরোপীয়দিকগে উন্নত ও ভারতীয়দিগকে অবনত দেখিয়া, ইয়ুরোপীয়দিগের পুরুষকার ও কার্য্য প্রণালীর প্রশংসা এবং ভারতীয়দিগের পুরুষকার ও কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা করেন। কিন্তু হে পুরুষকার-বাদিন্! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কালিদাস ও সেক্ষপীয়র কবিতা লিখিতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভীষ্ম অর্জ্জুন, বোনাপার্ট, সেকন্দর বীর হইতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, কোপারনিকস্ ও নিউটন যেরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্ট যেরূপ ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে আর কি কেহ সেরূপ করে নাই? কেন করে নাই? যখন সকলেরই সুখী ও যশস্বী হইবার ইচ্ছা ও যখন তদুদ্দেশ্য সাধন জন্য মানবগণ নিয়ত সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিতেছে, তখন কেন সুচেষ্টা করে নাই? কেন সকলে ঈপ্সিত ফললাভ করে না? বৃটন্ আজি বড় উন্নত, কিন্তু দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উহারা পশুবৎ ছিল, এবং এক্ষণে ভারতীয়গণ একান্ত পতিত, কিন্তু দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নিতান্ত উন্নত ছিল। ইহার কারণ কি? ইহারও উত্তরে কি আপনি বলিবেন, বৃটন্ জাতি পূর্ব্বে চেষ্টা করে নাই, এক্ষণে চেষ্টা করিতেছে, এবং ভারতীয়গণ পূর্ব্বে চেষ্টা করিত, এক্ষণে করে না। কিন্তু যাহারা পূর্ব্বে চেষ্টা করিত তাহারা এক্ষণে চেষ্টা করে না কেন? এবং যাহারা পূর্ব্বে চেষ্টা করিত না, তাহারা এক্ষণে চেষ্টা করে কেন?

মনুষ্য চেষ্টা, মনুষ্যকৃত কার্য্যের একটি কারণ সত্য, কিন্তু উহা কি সম্পূর্ণ কারণ? না উহাকে মূল কারণ বলা যায়? আমরা বোধ করি, উহার কিছুই উহাকে বলা যায় না। কেন-না আমাদের কার্য্য সকল যদি কেবল মাত্র আমাদের চেষ্টা দ্বারায় সম্পন্ন হইত, তাহা হইলেই মানব চেষ্টাকে মানবকৃত কার্য্যের এক মাত্র কারণ বলা যাইত। কিন্তু তাহা কি হয়? কখনই না। কেন-না তাহা হইলে মানব যাহা চেষ্টা করিত, তাহাই করিতে পারিত; এবং প্রত্যেক মনুষ্যই, অন্ততঃ অধিকাংশই, সমান ফল লাভ করিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তাহা হইতেছে না। মানব ইচ্ছা করিয়া বা বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃ চেষ্টা করে না বলিলে প্রকৃত উত্তর হয় না। কারণ চেষ্টাই যখন সিদ্ধির একমাত্র কারণ, তখন ঐ চেষ্টা দ্বারা ভ্রান্তি ও অনিচ্ছা দূর হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না, তখন মানব-চেষ্টাকে একমাত্র কারণ কি প্রকারে বলিব? উহাকে মূল কারণও বলা যাইতে পারে না। কেন-না; মূল কারণ কাহাকে বলে? যে কারণের অভাবে কার্য্য অদৌ হয় না, তাহাকে মূল কারণ বলিব? অথবা কেবল মাত্র যে কারণ বলে কার্য্য সম্পন্ন হয়, শুদ্ধ সহকারী কারণাভাবে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্য হয় না, তাহাকে মূল কারণ বলিব। যদি মূল কারণের প্রথমোক্ত লক্ষণ ঠিক্ হয় এবং সেই জন্য মানব-চেষ্টাকে যদি মূল কারণ বলিতে হয়, তবে অন্যান্য কারণ সকলকেও মূলকারণ বলিতে হইবে। কেন না কেবল মাত্র মানবচেষ্টায় কার্য্য হয় না, ইহা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে যে সকল সহকারী কারণের অভাবে কার্য্য সম্পন্ন হয় না স্বীকার করা যায়, তাহাদিগকেও মূলকারণ বলিতে হইবে। সুতরাং কারণের মূল ও সহকারী ভেদ থাকে না—কারণ মাত্রেই মূল কারণ হইয়া পড়ে। যদি দ্বিতীয় লক্ষণকে মূল কারণের প্রকৃত লক্ষণ বলা যায়, তাহা হইলে মূল কারণও একমাত্র কারণের মধ্যে কিছুই প্রভেদ থাকে না। উদাহরণ লইয়া এই সকলের সত্যতা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। বৃক্ষের কারণ বীজ। কিন্তু তাহা বলিয়া কি বীজকে বৃক্ষের একমাত্র কারণ বলা যাইতে পারে? যদি মৃত্তিকা, রস, তাপ, আলোক প্রভৃতির সহিত বীজ মিলিত না হয়, তাহা হইলে কি একমাত্র বীজ বৃক্ষ উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়? তাহা যদি না হয়, তবে বীজকে বৃক্ষের একমাত্র কারণ কি প্রকারে বলিব? ঐ রূপে বীজকে বৃক্ষের মূল কারণ বলা যাইতে পারে না। কেন-না যদি বীজকে বৃক্ষের মূল কারণ বলিতে হয়, তবে মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি যে সকল পদার্থের অভাবে বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, তাহাদিগকেও মূল কারণ বলা উচিত। কিন্তু তাহা হইলে আর মূল কারণের প্রাধান্য থাকিল কৈ? তুমি অক্সিজনকে জলের মূল কারণ বলিবে, না হাইড্রোজনকে জলের মূল কারণ বলিবে? পীতবর্ণকে হরিৎবর্ণের মূল কারণ বলিবে, না নীলবর্ণকে উহার মূল কারণ বলিবে? হিঙ্গুলের মূল কারণ পারদ না গন্ধক? পুত্রের মূল কারণ পুরুষ না স্ত্রী? অবশ্য তুমি ঐ সকল পদার্থের উৎপাদক কোন

একটি পদার্থকে মূল কারণ বলিতে পারিবে না। হয় উহাদের প্রত্যেক উপাদানকে মূল কারণ বলিবে, নয় উহাদের একটিকেও মূল কারণ বলিবে না। কেন-না ঐ সকল উপাদানাবলীর সংযোগ না হইলে পদার্থসকল উৎপন্ন হয় না। কিন্তু যেমন তেমন ভাবে সংযুক্ত হইলেই পদার্থ সকল উৎপন্ন হয় না। অক্সিজন ও হাইড্রোজন মিলিত হইলেই জল হয় না, পারদ ও গন্ধক মিলিত হইলেই হিঙ্গুল জন্মে না। উপাদান পদার্থের পরিমাণ যথানিয়মিত হওয়া চাই এবং সংযোগ ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট মত হওয়া চাই, তবে যুক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইবে। সুতরাং কোন পদার্থের কারণ বলিতে হইলে ঐ পদার্থের উপাদান পদার্থ সকল, তাহাদের যথাযোগ্য পরিমাণ, আবশ্যকমত মিশ্রণ ক্রিয়া ও মিশ্রণ কার্য্যের কাল, এই সমস্তের সমবায়কে কারণ বলিতে হইবে। ঐ সকলেই ঐ পদার্থের একমাত্র কারণ ও মূল কারণ। উহাদের কয়েকটীকে, কি একটী ভিন্ন সমস্তকে, একমাত্র কারণ বা মূল কারণ বলিলে যে ভ্রান্তি হয় তাহাতে আর কথা কি? একগাছি সূত্রকে বস্ত্র বলিলে যেরূপ ভ্রান্তি হয়, তাহাতে তদপেক্ষাও অধিক ভ্রান্তি হয়। তবে কি মূল কারণ শব্দের প্রয়োগ স্থল নাই? অবশ্য আছে। মনে কর এক মুষ্টি ধান্য, মুদ্গ, সর্ষপ ও তীল প্রভৃতির বীজ এক স্থানে বপন করা হইল; মৃত্তিকা, জল, তাপাদি পদার্থ সকল বীজ সমানরূপ প্রাপ্ত হইল; তথাপি বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ বা তৃণ উৎপন্ন হইল। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এরূপ ভিন্নতার কারণ কি? তাহা হইলে বলিতে হইবে, বীজ বিভিন্নতাই ইহার একমাত্র কারণ বা মূল কারণ। সর্ষপবৃক্ষ ও ধান্য বৃক্ষের যে প্রভেদ, তাহার মূল কারণ বীজের বিভিন্নতা।

বীজকে বৃক্ষের একমাত্র কারণ বলা যে কত অসঙ্গত, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। বট বীজের পরিমাণ কত অল্প এবং সুবৃহৎ বট বৃক্ষের পরিমাণই বা কত অধিক? এক রতির কম পদার্থ কিরূপে সহস্রাধিক মণ পদার্থে পরিণত হইল? তিন্তিড়ী বীজে অম্লত্ব ও খর্জ্জুর বীজে স্বাদুতা কোথায় এবং আম্র বীজেই বা নানাবিধ আস্বাদন কোথায় রহিয়াছে? সেগুন কাষ্ঠের শ্বেতবর্ণ ও দৃঢ়তা এবং শিশুকাষ্ঠের কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিনত্ব কি বীজেই নিহিত আছে? অতি ক্ষুদ্র বীজ যখন অতি বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট নানা প্রকার আকার ও বর্ণবলে বহুবিধ আস্বাদন সম্পন্ন এবং কঠিন, কোমল ও মসৃণ প্রভৃতি বহু গুণযুক্ত হইতে দেখা যাইতেছে,—তখন কি প্রকারে বলিব, ঐ বীজই ঐ সকলের কারণ? অবশ্যই বলিতে হইবে যে, পৃথিবীস্থ বহুতর পদার্থ বীজসহ মিলিত হইয়াই ঐরূপ বহুগুণসম্পন্ন হইতেছে। তাহাতে বীজের প্রাধান্য কোথায়? যখন হিঙ্গুল উৎপাদক পারদ ও গন্ধকের মধ্যে কাহারও প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে না, তখন কি প্রকারে বীজ ও অন্য উপকরণ সকলের মধ্যে বীজের প্রাধান্য কল্পিত হইবে? তবে এক কথা এই যে, যখন দেখা যাইতেছে রসাদি একরূপ পদার্থ সর্ষপ ও বট বীজরূপ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যগত হওয়াতেই, সর্ষপ ও বট

বৃক্ষ রূপ ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে, তখন বীজের প্রাধান্য নাই, বলা যায় কি প্রকারে? কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ যুক্তিকে সারবান বোধ হইবে না। কেন-না যাহার সহিত যাহার যেরূপ রাসায়নিক সম্বন্ধ, সেই পদার্থের যোগে সেইরূপ শক্তি বা কার্য্য প্রকাশ হইয়া থাকে। তাহা বলিয়া উপাদান পদার্থ মধ্যে একের প্রাধান্য হইতে পারে না। দেখা যাইতেছে নীল পীতের সহিত সংযোগে হরিৎ এবং রক্ত বর্ণের সংযোগে পাটল বর্ণ হয়। হরিৎ ও পাটল বর্ণ উৎপন্ন হইবার কারণ নীল উভয়েতেই আছে, অপর উপকরণের মিল নাই। তাই বলিয়াই কি পীতকে হরিতের ও রক্তকে পাটলের মূল কারণ বলিব? তাহা যদি বলা না যায়, তবে সর্ষপ ও বট বীজকে ও সর্ষপ ও বট বৃক্ষের মূল কারণ বলা যাইতে পারে না। কেন-না ঐ উভয়বিধ পদার্থেরই উৎপাদক স্বরূপে রসাদি নিয়ত বর্ত্তমান আছে, কেবল অপর উপকরণ বা বীজের প্রভেদ মাত্র। নীলের এমত শক্তি আছে যে, পীত যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন তাহারা এরূপ ভাবে মিলিত হইবে যে, তাহাতে হরিত হইতেই হইবে, এবং রক্ত তাহাতে মিলিত হইবে, তখন সে সংযোগে পাটল হইতেই হইবে! অথবা পীতের এরূপ শক্তি আছে যে, নীল যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন হরিৎ বর্ণ হইবে, এবং রক্ত বর্ণের এরূপ শক্তি আছে যে, নীল যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন পাটল বর্ণ হইবে। ঐরূপ রসাদির এরূপ শক্তি আছে যে, সর্ষপ বীজ যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন সর্ষপ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, এবং বট বীজে যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন তাহাকে বট বৃক্ষ হইতে হইবে। অথবা সর্ষপ বীজের এমন শক্তি আছে যে, রসাদি যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন তাহাতে সর্ষপ বৃক্ষ জন্মিবে এবং বট বীজের এমন শক্তি আছে যে, যখন রসাদি তাহাতে মিলিত হইবে, তখন বট বৃক্ষ জন্মিবে। সুতরাং বীজ বা রসাদি কিছুরই প্রাধান্য নাই। যদি কাহারও প্রাধান্য কল্পনা করিতে হয়, তবে সংযোগেরই প্রাধান্য বলিতে হয়। কিন্তু সংযোগেরও বাস্তবিক প্রাধান্য নাই। কেন-না আমরা দেখিতেছি সংযোগের প্রকার ভেদে যুক্ত পদার্থের সম্পূর্ণ ভিন্নতা হইতেছে। দুগ্ধের সহিত অম্ল সম্মিলনে দধি ও ছানারূপ দ্বিবিধ পদার্থ জন্মিতেছে। দধি ও ছানা আকার, আস্বাদন ও উপকারিতা বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এত বিভিন্ন যে, উহারা একই উপাদানে প্রস্তুত বলিয়া সহসা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক উহাদের উপাদান সম্পূর্ণ এক। উভয় পদার্থই দুগ্ধ ও অম্ল সংযোগে উৎপন্ন। ঐরূপ আম্র বীজ হইতে সুবৃহৎ ও সুস্বাদু ফজলী ও নাংড়া প্রভৃতি আম্র জন্মিতেছে, আবার অতি ক্ষুদ্র ও ভয়ানক টক্ আম্রও জন্মিতেছে। কি প্রকারে বলিব যে, বীজই ফজলীর উৎকৃষ্টতার হেতু ও বীজই আবার মন্দ আম্রের অপকৃষ্টতার কারণ? অথবা সংযোগেই উহাদের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতার কারণ? এক স্থানে একবিধ বীজ একই প্রকারে যত্ন সহকারে রোপিত ও

পালিত হইয়া যখন উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট আম্র ফল উৎপাদন করিতেছে এবং একবিধ দুগ্ধ একবিধ অম্লসংযোগে যখন দধি ও ছানারূপ ভিন্ন পদার্থে পরিণত হইতেছে, তখন কি প্রকারে বলিব যে উপাদান পদার্থের সংযোগ মাত্রই কার্য্যের কারণ। আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, যে পদার্থ, যে পদার্থের সহিত যে পরিমাণে যেরূপ ভাবে সংযুক্ত হইলে যেরূপ পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে পদার্থের সেইরূপ হওয়াই সেই পদার্থ উৎপত্তির একমাত্র কারণ। উহার একটী বা একটী ভিন্ন সমস্তকে কারণ বলিলে সম্পূর্ণ ভ্রম হইবে। তবে তুমি বলিতে পার যে, রসাদি পদার্থের সহিত যোগে আম্রত্বের কারণ আম্র-বীজ, বটত্বের কারণ বটবীজ ও সর্ষপত্বের কারণ সর্ষপবীজ। ইহা যখন বলিতে পার না যে, সর্ষপত্বের কারণ বা মূল কারণ সর্ষপ-বীজ ও বটত্বের কারণ বা মূল কারণ বটবীজ।

যাহা আলোচনা করা গেল তাহাতে বুঝা গেল যে, যাহা উৎপন্ন হইতে যে যে পদার্থের যেরূপ সম্মিলন আবশ্যক, তাহার সংঘটনই তাহার কারণ, তাহার অসত্বে তাহা হইতে পারে না। কি ভৌতিক পদার্থ, কি উদ্ভিদ, কি কীট, কি পতঙ্গ, কি পশু, কি পক্ষী, কি মনুষ্য সকলেরই এক নিয়ম। মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির কারণ কেবল উহাদের বীজ বা শুক্র নহে। রসাদি অর্থাৎ শোনিতের যথা নির্দ্দিষ্ট প্রকার মিলনই ঐ সকলের একমাত্র কারণ। সুতরাং যে বীজ যেরূপ ভাবে যে কার্য্য সাধনক্ষম হইয়া উৎপন্ন, তাহা দ্বারা তদিতর কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্য গুটি-পোকা যেরূপ সুত্র ও লাক্ষাকীট যেরূপ লাক্ষা প্রস্তুত করিতে পারে অন্য কীট তাহা পারে না। সিংহ, ব্যাঘ্র যেরূপ পশুসংহার করিতে পারে মেষ, ছাগ সেরূপ পারে না। মানব যেরূপ বুদ্ধির কার্য্য করিতে পারে অন্য জীবে তেমন পারে না। মেহগণীর যেরূপ সুদৃঢ় কাষ্ঠ সেগুণের সেরূপ হইতে পারে না, এবং সেগুণ-কাষ্ঠের দ্বারা যেরূপ পোতাদি নির্ম্মিত হইতে পারে, আম্র কাষ্ঠে সেরূপ হইতে পারে না। যে গাভী যে পরিমাণ দুগ্ধবতী হইয়া জন্মিয়াছে, তাহার অধিক দুগ্ধ দিবে না; যে মানব যেরূপ বুদ্ধি বল দৃঢ়তা প্রভৃতি লইয়া জন্মিয়াছে, সে তাহার অতিরিক্ত কার্য্য করিতে পারে না।

পুরুষকারবাদী এক কথায় হয়ত এই সকল কথা উড়াইয়া দিবেন। তিনি বলিবেন, মানুষের সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না—কেন-না মানুষের চেষ্টা আছে, অপরের তাহা নাই। এ কথা যদি বলা হয়, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। কেন-না চেষ্টা সকল জীবের ও সকল পদার্থেরই আছে। চেষ্টা ব্যতিরেকে কাহারও কোন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এ জগতে কেবল জীব চেষ্টা-শূন্য? সকল জন্তুই জীবিকা অর্জ্জন, বংশ-রক্ষা, জীবনরক্ষা ও বিশ্রাম লাভ জন্য নিয়ত সচেষ্ট। সিংহ, ব্যাঘ্র যেরূপ প্রাণ হিংসা জন্য কৌশলাবলম্বন করে ছাগ, মেষ সেই-রূপ উদ্যানস্থ বৃক্ষ, লতাদি ভক্ষণ করিবার জন্যে চতুরতা প্রকাশ করে। জীবিকা অর্জ্জন আত্মরক্ষার জন্য সামান্য কীটগণ

কৌশল অবলম্বন করে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মশক ও ছারপোকা মনুষ্যকে কষ্ট দিয়া যেরূপ কৌশলে মনুষ্য-শোনিত পান করে, তাহা কি আশ্চর্য্যজনক নহে? মক্ষিকাগণ নিয়ত মনুষ্যকে বিরক্ত করিতেছে, অথচ মনুষ্য অশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছু করিতে পারিতেছে না। এতদ্ভিন্ন বিবর, বাবুই, মধুমক্ষিকা, পুত্তিকা প্রভৃতি জীবগণের চেষ্টায় কতপ্রকার আশ্চর্য্য সুকৌশল সম্পন্ন শিল্প সমুদ্ভূত হইতেছে। এই সমস্তকে যদি চেষ্টা না বলিতে হয়, তবে মানব-চেষ্টাকে কিরূপে চেষ্টা বলিতে পারা যায়? মানবের চেষ্টা কি ঐসকল হইতে ভিন্ন প্রকৃতির? কখনই নহে, অপর জীবগণের ন্যায় মানবও জীবিকা অর্জ্জন, বংশরক্ষা, বিশ্রাম, সুখসম্ভোগ ও প্রাণরক্ষার জন্য নিয়ত চেষ্টান্বিত। সন্তান পালন, দরিদ্রে দয়া, স্বজাতি বৎসলতা ও ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি কতকগুলি চেষ্টা, স্থূল দৃষ্টিতে মানবের অতিরিক্ত বোধ হয় বটে, কিন্তু উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সে সকল অতিরিক্ত নহে। আমরা প্রবন্ধান্তরে সে বিষয় আলোচনা করিব। এক্ষণে আমরা তর্কের জন্য স্বীকার করিলাম, মানবের ঐ সকল চেষ্টা অন্য জীবাতিরিক্ত; কিন্তু তাহাতে সাধারণ নিয়মে ব্যত্যয় হইবার কারণ কিছুই নাই। কেন-না যে জীবের যেরূপ চেষ্টা প্রাকৃতিক, সে জীব সেইরূপই চেষ্টা করিবে। সকল জীব সকল প্রকার চেষ্টা করে না। আহার জন্য ব্যাঘ্র যেরূপ চেষ্টা করে, মেষও সেইরূপ চেষ্টা করে। কিন্তু মেষ কি ব্যাঘ্রের অনুবর্ত্তন করিতে পারে, না ব্যাঘ্র মেষের অনুবর্ত্তন করিতে পারে? কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না, প্রভৃতি পক্ষী যেরূপ মনুষ্যের ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, কাক, কোকিল কি তাহা পারে? হস্তী, অশ্ব, গো ও কুকুর প্রভৃতি প্রাণিগণ যেরূপ মনুষ্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রভূত উপকার সাধন করে, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতিরা কি সেরূপ করে? কখনই না; সকলেরই চেষ্টা প্রকৃতির অনুযায়িনী। মানবও ঐরূপ যে প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রকৃতি অনুসারে চেষ্টা করে। কি মানব কি অন্যান্য প্রাণী প্রকৃতি বা শক্তির অতিরিক্ত চেষ্টা করিয়া কেহই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং কেবল মানবের চেষ্টা আছে, অন্য জীবের নাই, একথা নিতান্ত অসঙ্গত। তাহা যদি হইল, তবে কেবল মানবের চেষ্টা দ্বারা বিশ্বনিয়মের ব্যভিচার হইবে কেন? যদি হয়, তবে সকল জীবের চেষ্টা দ্বারাই হইবে; তাহা হইলে, মেষের চেষ্টায় সিংহের কার্য্য হইবে, সিংহের চেষ্টায় বানরের কার্য্য হইবে এবং বানরের চেষ্টায় মানবের কার্য্য হইবে। তাহা না হইয়া, যদি কেবল মানবের চেষ্টাতেই দেবতার কার্য্য হয় বলা যায়, তাহা হইলে মানবচেষ্টাকে কুহকিনী সর্ব্বসাধনী শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, এবং তাহা হইলে মানবের কিছুই অসাধ্য থাকে না। কিন্তু তাহা হইলে মানব চেষ্টা করিলে মৃত্তিকাকে স্বর্ণ করিতে পারিত, অগ্নিকে জল ও জলকে অগ্নি করিতে পারিত, এবং জীবকে অজীব ও অজীবকে জীব করিতে পারিত। বাস্তবিক মানব কি তাহা পারে? কখনই না।

যখন মানব বুদ্ধিবলে নানাবিধ অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন অর্থাৎ যখন মানব এক দিনের পথ এক ঘণ্টায় যাইতেছেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে এক মাসের পথ হইতে সংবাদ আনিতেছেন, এক দিনে সহস্র বস্ত্র বয়ন ও অযুত পুস্তক মুদ্রণ করিতেছেন, শত যোজন ব্যবধানে থাকিয়াও পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, বিহঙ্গমগণসহ সুখে আকাশমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন এবং জলকে বাষ্প, ও বাষ্পকে জল করিতেছেন, তখন মানব চেষ্টা করিলে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন না কেন, একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কেন-না মানব শিক্ষাবলেই ঐ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, আপনার সর্ব্বসাধিনী শক্তির বলে নহে, অর্থাৎ যে যে পদার্থের যেরূপ সংযোগে যে কার্য্য সম্পন্ন করা মানবের সাধ্যায়ত্ত, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াই মানব তদনুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করে; চেষ্টা দ্বারা কোন পদার্থের কোন নূতন শক্তি সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহা যদি পারিত, তাহা হইলে পারদের সহিত গন্ধকের সম্মিলনে যেমন হিঙ্গুল প্রস্তুত করিয়া থাকে সীসক সংযোগেও সেইরূপ করিতে পারিত, অম্লজানের সহিত জলজান সংযোগ না করিয়া যবক্ষারজান সংযোগ করিয়া জল প্রস্তুত করিতে পারিত; তাড়িত সংযোগ না করিয়া জল বা অগ্নি সংযোগে তাড়িতবার্ত্তাবহ প্রস্তুত করিতে পারিত। কিন্তু তাহা কি কেহ পারে? অবশ্য কখনই না।

ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করা দূরে থাকুক, সকল সময়ে মানব শক্তি ও চেষ্টার মিলন করিতেই সমর্থ হয়না। কেন-না কার্য্য সম্পাদনের কারণ অনেক। কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে কারণ সমুদয়ের মিলন আবশ্যক। সকল কারণ বা সকল উপাদানের সম্মিলন ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। মনে কর, তোমার এমন বুদ্ধি আছে যে, সেই বুদ্ধিবলে তুমি একজন জগন্মান্য পণ্ডিত হইতে পার। কিন্তু তোমার ধন নাই, কিংবা তুমি চিররোগী অথবা তুমি এমন স্থানে বাস করিতেছ, যেখানে বিদ্যার কিছুমাত্র আদর নাই—শিখিবারও কোন উপায় নাই; তুমি কিরূপে পণ্ডিত হইবে? তোমার যন্ত্রনির্ম্মাণের বুদ্ধি কৌশল বিলক্ষণ আছে, কিন্তু তন্নির্ম্মাণে যে সকল উপাদানের আবশ্যক, তৎসংগ্রহের সামর্থ্য তোমার কিছুমাত্র নাই; তুমি কিরূপে আত্ম-শক্তি প্রকাশ করিবে? তুমি সচ্চরিত্র সাধু, কিন্তু তুমি এমন জঘন্য প্রতিবেশিগণের দ্বারা বেষ্টিত, যে তোমার সদানুষ্ঠানসকল নিয়ত বিপরীত ফল প্রসব করিতেছে; তুমি কিরূপে সাধু হইবে? তুমি বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন,—চেষ্টা করিলে তুমি বিলক্ষণ সুখী হইতে পার; কিন্তু তোমার পরিবারবর্গ, তোমার আত্মীয় স্বজন, স্বতঃ পরতঃ তোমার প্রতিকূল হওয়ায় তোমার সকল চেষ্টাই বিফল হইতেছে। তুমি দূরদেশে উপার্জ্জনের জন্য যাইবে—কিন্তু তোমার বৃদ্ধা মাতার পীড়া হইল, যাওয়া হইল না; যেমন তাহা আরাম হইল, অমনি তোমার ভ্রাতা দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন, বাটীতে অন্য কেহ অভিভাবক নাই দেখিয়া তুমি যাইতে পারিলে না; যেমন তাহার কোন সুযোগ করিলে,

অমনি একজন প্রতিবেশী তোমার নামে একটী মিথ্যা মকদ্দমা করিল। এই প্রকারে ঘটনাবলী প্রতিপদে তোমার কার্য্যের বিঘ্ন জন্মাইয়া দিয়া তোমাকে নিরাশ ও অবশেষে বিপদগ্রস্থ করিল।

আবার দেখ, মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামীর পূর্ব্বপুরুষ, একজন ইংরেজ গবর্ণরকে আশ্রয় দিয়া কত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যদি মুসলমানরাজ ঐ গবর্ণরকে বিপদ্‌গ্রস্থ না করিতেন এবং যদি গবর্ণর তাঁহারই গৃহে উপস্থিত না হইয়া অন্য কাহারও গৃহে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে ত রামকান্ত আশ্রয়দানের অবসর পাইতেন না, এরূপ সৌভাগ্যশালীও হইতে পারিতেন না। এ প্রকার অবসর অন্যের ঘটিলে সেও কি এইরূপ লাভবান্ হইত না? অবশ্য হইত। ইতিহাস পাঠে জানা যায় কত কাপুরুষ রাজা নির্ব্বিবাদে ভারতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পৃথ্বিরাজের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত বীর, রাজ্যচ্যুত ও হত হইলেন। সে সময়ে ছলনাতৎপর, বিশ্বাসঘাতক যবন যদি ভারতে আসিয়া প্রবেশ না করিত, তাহা হইলে তাঁহার কি সে দশা ঘটিত? প্রতাপ সিংহ যেরূপ পরাক্রমশালী, তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার সময়ে যদি আকবরের ন্যায় সম্রাট্ ভারতে না থাকিতেন, তাহা হইলে কি তিনি ভারতেশ্বর হইতে পারিতেন না? কিন্তু ভারতেশ্বর হওয়া দূরে থাকুক, তিনি আপনার রাজ্যেরও উদ্ধার সাধন করিতে পারিলেন না; অথচ অনেক দেশে ও অনেক সময়ে তাঁহা অপেক্ষা হীনতেজা ব্যক্তিগণ দিগ্বিজয়ী হইয়াছেন। নিউটন, আর্য্যভট্ট, কালিদাস, সেক্সপীয়র, বুদ্ধ, ঈশা, অর্জ্জুন, বোনাপার্ট প্রভৃতির ন্যায় শক্তি লইয়া যে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহা নহে। বোধ হয় অনেক লোক তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু শক্তির সহিত যে সকল কারণপরম্পরার সমবায় আবশ্যক, তাহা না হওয়াতেই তদ্রূপ বা তদধিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মনে কর, আর্য্যভট্ট যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে তদপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আর্য্যভট্ট যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক, তাহা তখন আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া, তাঁহারা কিছু করিতে পারেন নাই। ঐ আর্য্যভট্ট কিম্বা ভাস্করাচার্য্য যদি এখন জন্ম পরিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা আধুনিক যন্ত্র সমূহ ও নবাবিষ্কৃত জ্যোতিস্তত্ত্ব সকলের সহায়ে যে কত উন্নতি করিতে পারিতেন, তাহার ইয়ত্তা কি? এইরূপে অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, যে উপযোগী অবস্থা, অনুকূল ঘটনা ও যথাযোগ্য কাল কার্য্যসাধনের অতি আবশ্যক উপাদান। সচরাচর এই গুলি অদৃষ্ট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শস্য উৎপন্ন করিবার জন্য যেমন ভূমির উর্ব্বরতা, কর্ষণের আধিক্য, পরিমিত বর্ষণ, আলোকাদির প্রাচুর্য্য, পুষ্ট বীজ ও বপন যোগ্য কাল প্রভৃতি বহুতর উপাদানের আবশ্যক, কার্য্য মাত্রেরই সেইরূপ; অর্থাৎ যে কার্য্যসাধন করিতে হইলে যে যে উপাদান আবশ্যক, তৎসমস্তের যথাযোগ্য পরিমাণের উপর কার্য্যের সফলতা নির্ভর করে।

যদি তৎসমস্তের সম্মিলন না হয়, তবে সহস্র চেষ্টা করিলেও কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। কিন্তু উপযোগী কাল ও অবস্থা এবং অনুকূল ঘটনার সমাবেশ যখন চেষ্টার অতীত তখন মানবের চেষ্টায় কিছুই হয় না বলিতে হইবে অর্থাৎ মানব কেবল মাত্র স্বচেষ্টায় অতি সামান্য কার্য্যও সম্পাদন করিতে পারে না।

তার্কিক হয়ত বলিবেন, তবে কি মানবের কিছুই করিতে হইবে না? বিনা চেষ্টাতে আপনা হইতেই ফল লাভ হইবে? আপনিই ভাত মুখে উঠিবে? না-পড়িয়া লোকে পণ্ডিত হইবে? না, তাহা কখনই হইবে না। কেন-না চেষ্টা চেষ্টিত কার্য্যের কারণ বা উপকরণ মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং অন্য উপকরণ বিশেষের অভাবে যেমন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, চেষ্টার অভাবেও সেইরূপ চেষ্টিত কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তাই কবিবর মাঘ বলিয়াছেন ঃ—

"নালম্বতে দৈষ্টিকতাং
ন নিষীদতি পৌরুষে।
শব্দার্থৌ সৎকবিরিব
দ্বয়ং বিদ্বানপেক্ষতে॥"

শিশুপাল বধ ২য় সর্গ ৮৬।

সৎ কবি যেমন শব্দ ও অর্থ উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, পণ্ডিত সেইরূপ দৈব ও পুরুষকার উভয়ই অবলম্বন করেন। অর্থাৎ অর্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল শব্দাড়ম্বর করিলে অথবা শব্দসৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে যেমন উত্তম রচনা হয় না— ফলতঃ উত্তম শ্লোক রচনা করিতে হইলে শব্দ ও অর্থ উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, সেইরূপ কার্য্য সম্পাদন সময়ে কেবল মাত্র দৈব বা কেবল মাত্র পুরুষাকারের উপর নির্ভর করিলে সুসম্পন্ন হইবে না। ঐ উভয়ের প্রতি নির্ভর করিতে পারিলেই চেষ্টিত কার্য্যের ফললাভ হইতে পারে।

তাই বলিয়া কেহ যেন মনে করেন না যে, চেষ্টা মানবের ইচ্ছায়ত্ত বা স্বযত্নোৎপাদিত। কেন-না যদি মানবের ঐ সকল চেষ্টাকে মানবের নিজস্ব বলিতে হয় তাহা হইলে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃষ, ছাগ প্রভৃতির বৃদ্ধি, ভোজন, গমন প্রভৃতি চেষ্টাকেও তাহাদের নিজস্ব বলিতে হইবে। তাহা হইলে জলের স্রোত, বায়ুর বেগ, অগ্নির দাহন, চুম্বকের লৌহাকর্ষণ প্রভৃতিকেও তাহাদের স্বোপার্জ্জিত শক্তি বলিতে হইবে। সেকন্দর সাহেবের বীরত্ব যদি সেকন্দরেরই স্বচেষ্টাসম্ভূত বল, তবে ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবল বাত্যা, এট্না পর্ব্বতের প্রবল অগ্ন্যুৎপাত, হিমালয়ের উচ্চতা, সিংহের পশুরাজত্ব প্রভৃতিকে কেন তাহাদের স্বচেষ্টাসম্ভূত না বলিবে? মানব! যখন তোমার জন্মলাভ হয় নাই, তখন তুমি কি আপনার জন্মলাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছ? তোমার জন্মলাভ কি সেই চেষ্টার ফল সম্ভূত? না তোমার উচ্চ কূলে উৎকৃষ্ট প্রদেশে ও ধনিগৃহে উদ্ভব এবং প্রবল বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি স্বাভাবিক গুণাবলী তোমার সেই চেষ্টার ফলসম্ভূত? এ প্রশ্ন আমরা হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না, কেন-না হিন্দু পূর্ব্বজন্ম ও আপনার অকিঞ্চিৎকারিতা স্বীকার করেন।

যাঁহারা পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদের প্রতিই আমাদের এই প্রশ্ন। বাস্তবিক কাহারও চেষ্টা সোপার্জ্জিত নহে। যাহার যে চেষ্টা অপ্রাকৃতিক সে সেরূপ চেষ্টা করিতে পারে না। যাহা স্বচেষ্টালব্ধ বলিয়া আমরা গর্ব্ব করি তাহা বাস্তবিক স্বচেষ্টালব্ধ হইলে আমি যেমন কবি বা বুদ্ধিমান বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি, নেংড়া আঁবও সেইরূপ সুস্বাদুতার জন্য আপনার ক্ষমতার গর্ব্ব করিতে পারে। অতএব জন্ম, মৃত্যু, স্থিতি, চেষ্টা কিছুই মানবের স্বচেষ্টালব্ধ নহে।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

শুভদিনে।

শুভদিনে শুভক্ষণে এস আজ এস, সখা!
শূন্য এই হৃদয় আসনে,
ও তোমার আঁখিতারা আঁধারে আলোক ধারা—
চিরদিন ঢালে যেন প্রাণে!
যেন, উজলিয়া হৃদিসর ফুটে থাকে নিরন্তর
ও চরণ কমল তোমার!
তোমারি আননে, সখা! পূরে যেন জীবনের
সৌন্দর্য্যের পিপাসা আমার!
ফুটিলে প্রভাত রবি কুসুমের চারুছবি
দেখি যেন তোমারি নয়নে
ঊষার তরুণালোকে সৌন্দর্য্য তৃষিত বুকে
যেন, নাহি হয় ছুটিতে কাননে!
যখন, দেখিয়া সন্ধ্যার তারা হৃদয় উদাস পারা
চেয়ে রব গোধূলী আকাশে,
তুলি ঐ আঁখি তারা ঢালিয়া প্রণয় ধারা
তুমি এসে দাঁড়াইও পাশে!
যখন তৃষিত বুকে ভ্রমিব মলিন মুখে
মরুময় নিঠুর সংসারে,
ও প্রণয় সিন্ধু হ'তে বারি বিন্দু দিও, নাথ!
শীতলিয়া তাপিত অন্তরে,
জীবনের সব সাধ প্রাণের বাসনা, নাথ!
ঘুমাক্ ও চরণে তোমার,

তোমারি স্নেহের স্বরে মেটে যেন চিরদিন
প্রণয়ের আকাঙ্খা আমার,
জানিনা হৃদয় তব, দেখি নাই এ জীবনে,
হাতে বেঁধে দিতেছে সংসার;
আমি সুধু এই জানি,— দেবতাও অদৃশ্য ত
পুজি তবু চরণ তাঁহার,
তোমায় (ও) দেবতা ভাবি দিতেছি এ পুষ্পাঞ্জলী,
দিতেছি এ হৃদি উপহার!
পেতেছি হৃদয়াসন এস তবে এস, সখা!
লও প্রেম অঞ্জলী আমার;
অদৃশ্যে জগতপিতা, শান্তিময় করে তুমি
বেঁধে দাও যুগল হৃদয়,
পবিত্র বন্ধন এই কভু যেন নাহি ক্ষয়
আশীর্ব্বাদ কর দয়াময়!

শ্রীপ্রমীলানাগ (বসু)।

স্বার্থপরতা।

(প্রতিবাদের প্রতিবাদ।)

বিগত মাসের প্রতিমায় গিরিজা বাবু আমাদিগের "স্বার্থপরতা" নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। গিরিজা বাবু একজন সুলেখক, তিনি যে আমাদিগের এই সামান্য প্রবন্ধের সমালোচন করিবেন ইহা আমাদিগের আশাতীত ও বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। আমরা তাঁহার প্রতিবাদে আপনাদিগকে বিশেষ সম্মানিত জ্ঞান করি। এবং গিরিজা বাবুর ন্যায় সুলেখকের প্রতিবাদের প্রতিবাদ না করিলে তাঁহাকে অবহেলা করা হয় বলিয়াই আমরা বাধ্য হইয়া অগত্যা দুই একটি মাত্র কথা বলিতে প্রবর্ত্ত হইলাম।

গিরিজা বাবু স্বার্থপরতার দুইটি অর্থ ধরিয়াছেন—একটি আভিধানিক অন্যটি লৌকিক। তিনি "স্বকীয় প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি জন্য (মনের ঐকান্তিক) অনুরক্তি"কে আভিধানিক এবং "আপনার ধর্ম্মবিগর্হিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একান্ত অনুরক্তি"কে লৌকিক অর্থ বলেন। তাঁহার এইরূপ অর্থবিভিন্নতার মর্ম্ম আমরা বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি "স্বকীয়

উদ্দেশ্য” ও “ধর্ম্মবিগর্হিত উদ্দেশ্য” এই দুইটির প্রভেদ স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় “স্বকীয় উদ্দেশ্য” মাত্রেই “ধর্ম্মবিগর্হিত” উদ্দেশ্য নহে; আমাদিগের মূলপ্রবন্ধে ইহার অনেক দৃষ্টান্তও দেওয়া হইয়াছে। গিরিজা বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে “যোগী ভোগী সকলেই স্বার্থপর, কিন্তু “স্বার্থপর বলিলে ভোগীকেই বুঝায়”। যোগী ও ভোগী স্ব স্ব জীবনের উদ্দেশ্য সাধন জন্য বিভিন্নমার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন মাত্র এবং কেবল ঐ বিভিন্ন মার্গাবলম্বনের জন্যই যশঃ বা অযশঃ লাভ মুল করিয়া থাকেন। মূলপ্রবন্ধে ইহার যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। যদি গিরিজা বাবুর অর্থই ঠিক হয় তাহা হইলে কোনটি “স্বকীয় উদ্দেশ্য” এবং কোনটি “ধর্ম্মবিগর্হিত উদ্দেশ্য” ইহা নির্দ্ধারণ করা অতি সহজ কথা নয়। গিরিজা বাবু নিশ্চয়ই অবগত আছেন এ বিষয়ে দুইটি লোক এক মত হইতে পারে না। একজন লোকের নিকট যাহা ধর্ম্মবিগর্হিত, অন্যের নিকট তাহা ধর্ম্মসম্মত আমরা এ বিষয়ে অধিক তর্ক করিতে চাহি না। গিরিজা বাবু বিদ্বান ও বিচক্ষণ এ বিষয় তিনি আমাদিগের অপেক্ষা অধিক জানেন।

আকবর ও আওরঙ্গজেব উভয়ই দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। কিন্তু নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। একজন কৌশলে, অন্যজন বলপ্রয়োগে অধীনস্থ রাজগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। অধিকাংশ লোকেই আকবরের সুখ্যাতি ও আওরঙ্গজেবের অখ্যাতি করিয়া থাকে। কারণ তাহাদিগের বিবেচনায় একজন সুমার্গ, অপরজন কুমার্গ, অবলম্বন করিয়াছেন। আবার হয় ত কেহ কেহ আকবরের অখ্যাতি ও আওরঙ্গজেবের সুখ্যাতি করিয়া থাকে। আমরা প্রবন্ধে এরূপ বলি নাই যে, যে কোন উপায়েই হউক স্ব স্ব স্বার্থ সিদ্ধি করিতে হইবে। অধিকন্তু এরূপ বলিয়াছি যে, যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট করিয়া স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি করে সে সমাজের শত্রু। আমাদিগের ধারণা এই যে, যদি সকলেই অপরের ক্ষতি না করিয়া স্ব স্ব সুখের অন্বেষণ করে তাহা হইলে পৃথিবীর সুখ বৃদ্ধি হইবে।

আমরা নীতিশাস্ত্রের আবশ্যকতা কিছু কিছু বুঝিতে পারি। আমরা কোথায় বলিয়াছি যে “সদা সত্য কথা কহিবে” এই নীতিটি পরিত্যজ্য। আমরা কেবল এই মাত্র বলিয়াছি যে সময়ে সময়ে সত্য কথা কহিলেও দোষ ঘটে। আমাদিগের দৃষ্টান্ত গিরিজা বাবুর মনোমত হয় নাই। তিনি কি জানেন না ওরূপ কত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। একজন নিঃসহায় ভীত ব্যক্তি আমার আশ্রয় গ্রহণ করিল; ক্ষণেক পরে একজন বলিষ্ঠ দস্যু আমাকে ঐ ভীত ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি কি সেই ভীত ব্যক্তিকে দস্যুর হস্তে সমর্পণ করিব? না বলিব যে, সে অনেকক্ষণ অন্যদিকে গিয়াছে?

গিরিজা বাবু বলিয়াছেন যে, “চিকিৎসক রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য এ কথা সত্য করিয়া বলিতে পারেন না”। একথা ঠিক, আমরা

ইহা অস্বীকার করি না। চিকিৎসক তাঁহার বিশ্বাসমতে একথা বলিলেন, তাহা মিথ্যা হইবারই সম্ভাবনা অধিক এবং তজ্জন্যই ঐ বিষয় রোগীকে বলা উচিৎ নহে। কারণ রোগী যদি জীবনে হতাশ হয় তাহা হইলে রোগের বৃদ্ধি পাওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। আমরা জিজ্ঞাসা করি ইহা কি রোগীর বিকৃত শিক্ষার ফল? না, মনুষ্য স্বভাবসুলভ মৃত্যু-ভয় এবং পীড়ীতাবস্থাজনিত মানসিক বিকৃত ভাব?

কোন নূতন তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য আমরা প্রবন্ধ লিখি নাই। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, নীতিশাস্ত্রে অতি অল্পই নূতন তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত আছে। আমাদিগের আরও বিশ্বাস যে, যাহা কিছু নূতন সত্য আছে তাহা আবিষ্কৃত হইলে আমরা আবিষ্কর্ত্তাকে দেশচ্যুত করিব বা বন্দীকৃত করিয়া রাখিব। সক্রেটিস ও গালিলিওর পরিণাম আমরা বিস্মৃত হই নাই, প্রবন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহা আমাদিগের বিশ্বাস ও ধারণামত। গিরিজা বাবু নিজেও স্বীকার করিয়াছেন উহার অধিকাংশই সত্য। যদি সত্যই হয় তবে বলিতে দোষ কি? তিনিই ত বলিতেছেন "সদা সত্য কথা কহিবে" এই নীতিটি পরিত্যজ্য নহে। তবে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা কি প্রকারে "কুনীতি পরিবর্দ্ধক কথা হইয়া পড়ে"? তবেই ত তিনি স্বীকার করিলেন যে, সত্য কথাও সময়ে কুনীতি পরিবর্দ্ধক হইয়া উঠে।

গিরিজা বাবু মনে করেন যে গণিতশাস্ত্রের "বিন্দুটি" বুঝি একটি অলৌকিক বস্তু। তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া CLIFFORD'S *Common sense of Exact Scieences* নামক পুস্তকখানি একবার পড়েন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে গণিতশাস্ত্র একটি অসম্ভাব্য বস্তু লইয়া স্থাপিত হয় নাই। এবয়সে বিন্দুর সংজ্ঞা পাঠ করা তিনি হয় ত লজ্জাকর মনে করিতে পারেন;—আমরা কিন্তু সেই সংজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে লজ্জা দিতে বা বাহাদুরী লইতে, চাহি না। তবে তিনি যদি একবার চুপি চুপি পড়িয়া লয়েন তাহা হইলে সকল দিকই রক্ষা পায়।

গিরিজা বাবু আমাদিগকে সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও শ্রীমান্ বলিয়া কি অধিকতর উপহাসাস্পদ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? শ্রীমান্ হওয়ার সঙ্গে যে প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ আছে তাহা আমরা জানিতাম না। আর আমাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি হইবে তাহাও আমাদিগের বিশ্বাস নহে। ডিউক অব ওয়েলিংটন নিজের সুখ্যাতি না করিয়া নেপোলিয়ানেরই সমর-চাতুর্য্যের সুখ্যাতি করিতেন। লোকে বুঝিত যে ব্যক্তি এতাদৃশ সমর কুশল যোদ্ধাকে পরাজয় করিয়াছেন তিনি অবশ্যই তদপেক্ষা অধিক রণপণ্ডিত হইবেন। তজ্জন্যই আমরা বলি লোকের মনের উদ্দেশ্য বুঝা সহজ নহে।

শ্রীসমতুলচন্দ্র দত্ত।

সরোজা।

এ পুস্তক খানি নাটক। গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই; কিন্তু তিনি যিনিই হউন, তিনি আমাদের সাদর অভিবাদন গ্রহণ করুন। সকল সময়ে সকল লেখা ভাল হয় না —আর আজকাল সাহিত্য ভাণ্ডারে অসার জীবন্মৃত গ্রন্থের অংশই অধিক—কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সরোজা আদরের জিনিষ। নাটকখানির বিষয়ে, ভাষায়, ও রচনানৈপুণ্যে এমন বিশেষ নূতনত্ব দৃষ্ট হয় না; কিন্তু সমগ্র পুস্তকখানির ফল সুন্দর, মধুর ও প্রীতিকর। বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষের নূতনত্ব ও লালিত্য অবশ্য ইহাতে নাই; কিন্তু বিষয়ের গুণে, ভাবের গুণে ও ঘটনা-বিন্যাসের গুণে ইহার ফলও কতক পরিমাণে সমদেশীয় বলিয়া অনুভূত হয়। সকল গ্রন্থে, সকল সময় নূতন জিনিষ থাকে না, আর নূতন কথার সহিত গ্রন্থের আদরের ন্যূনাধিক্য হইলে বোধ করি বেশী গ্রন্থই বিদূরিত হইবার যোগ্য হয়। গ্রন্থের আদর অনেকটা সাজের (form) গুণে। সমালোচ্য নাটকখানিতে ঘটনার সন্নিবেশ নিতান্ত মন্দ বোধ হয় না, আর চরিত্রের বৈচিত্র্যও লক্ষিত হয়।

সরোজা পুস্তকের সরোজাই আদরণীয়া, অন্যান্য নায়ক নায়িকার সমাবেশ তাঁহার চরিত্রের স্ফূর্ত্তির জন্য। শান্তহৃদয়া, স্নেহময়ী, সরলা সরোজার স্বামীসুখেই সুখ, স্বামীদুঃখেই দুঃখ। তিনি কখন বিবাদ করিতে জানেন না, দুঃসহনীয় যন্ত্রণার বিষয় মুখে বলিতেও জানেন না। নিঃশব্দে, নির্ব্বিবাদে অন্ধকারময় অন্তঃপুরমধ্যে স্বামী সেবায় ও স্বামী সোহাগে বাস করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র উদ্দেশ্য। ঘটনাক্রমে স্বার্থপরতার জীবন্ত মূর্ত্তিমান সর্পের প্ররোচনায়, সারল্য ও গভীরস্নেহজনিত অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি জীবনের অনভ্যস্ত পথে গিয়া পড়িলেন, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না। অবশেষে সেই লক্ষ্যের অনুসরণেই সাধ্বী পুনরায় আপন পথে আসিলেন। সপত্নীর সোহাগে, স্নেহে, প্রেমে, যত্নে স্বামীকে শয়ান দেখিয়া সরোজা মরমে মরমে শুধু ক্লেশ পাইলেন, কিন্তু জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না। তুমি "মর্‌বে কেন সরো"— "আমি চল্লেম। আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মান্তরে তোমাকে স্বামী পাই।"

ভবসুন্দরী স্বামী সোহাগে সোহাগিনী; কিন্তু তাঁহার সোহাগে, তাঁহার প্রেমে "আত্মহারা" ভালবাসা দৃষ্ট হয় না। স্বামীর নিকট স্নেহ পান বা নাই পান, আপন প্রেমের ও যত্নের প্রতিদান পান বা নাই পান, তাঁহাকে ভালবাসিয়াই সুখ, তাঁহাকে ভালবাসাই জীবনের সার ধর্ম্ম; এরূপ কোন গভীর, "আপন-হারা" প্রেম ভবসুন্দরীর চিত্তকে অধিকার করে নাই। এক কথায় গৃহপরিত্যাগ করার পূর্ব্বে সরোজার চিত্তের যেরূপ ভাব ছিল ভবসুন্দরীর শেষ পর্য্যন্ত তাহাই ছিল, কেবল তাঁহার পক্ষে শৈলগৃহত্যাগিনী সাগরগামিনী নদীর ন্যায় সেই নির্ম্মল, স্বচ্ছ প্রেম কিঞ্চিৎ কলুষভাব প্রাপ্ত ও সমল

হইয়াছিল। "ভালবাসিবে ব'লে, ভালবাসিবে"—উভয়ের প্রেমের মন্ত্র, তবে অবস্থা ভেদে ঐ প্রেম কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবাপন্ন। বিস্তর ক্লেশেও সরোজা কখন আপন কষ্ট স্বামীকে জানিতে দেন নাই,—আপনাকেও জানিতে দিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। দুঃখের বিষয় ঘটনাক্রমে উভয়েই আপন আপন জীবনে এই মন্ত্রের চরমোৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন নাই। যখন জয়তারা ও তাঁহার আতর, ঝটিকা ও বৃষ্টি, উভয়ে মিলিত হইয়া সরোজার ন্যায় একটি লজ্জাবতী, আধফুটা পুষ্পকোরককে নিষ্পেষিত করিতে প্রয়াস পাইলেন, তখন সরোজা আপনার কষ্ট অনুভব না করিয়া সত্রাসে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"বিন্দু ঠাকুরঝি, ওঁরা হয়ত আমার উপর বড় রাগ করেচেন ; কি হবে ?

বিন্দি। তোমার আর দেখে বাঁচিনি। এমন অন্যায় রাগ হলো তো কি। আর রোজ রোজ যদি এমন করে কাঁদবে ত বাঁচবে কদিন ? এত কষ্ট কি সহ্য হয় !

সরোজা। আমি কি করবো বলো। আমি যে কাষ কর্ম্ম কিছুই শিখিনি, তাইত আমার ঠাকুরঝি তিরস্কার করেন। কি হবে ঝি ?

বিন্দি। কি আর হবে। বাবুকে বলতে পার না। না হয়, আমিই বল্‌বো। নিত্যি নিত্যি বউটাকে এমন করে ব্যাংখোচা কল্লে বউটা কদিন বাঁচবে। এ যে আর চক্ষে দেখা যায় না।

সরোজা। বিন্দু ঠাকুরঝি তোমার পায়ে পড়ি তুমি ওঁর কাছে বলো না। বল বল্‌বে না। আমার মাথা খাও বল বল্‌বে না।

বিন্দি। সেকি বউঠাকুরুন্ পায়ে হাত দিতে আছে ? তোমার দুঃখু দেখেই বলা, নইলে আমার ওসব কথায় কাজ কি ?"

অপরপক্ষে, ভবসুন্দরীর চরিত্র নিম্নোদ্ধৃত দৃশ্যে বেশ স্পষ্ট অনুভূত হয়।

"ভব। আচ্ছা, তোমাকে ছেড়ে সরোজা গেল কেন ? তুমি বুঝি তাকে ভালবাস্‌তে না ?

যোগেন। না ভব, আমি সরোজাকে বড়ই ভাল বাস্‌তুম। এখনও তার কথা শুনতে ভাল লাগে।

ভব। তবে সে এমন সুখের সংসার ছেড়ে গেল কেন !

যোগেন। কেন ছেড়ে গেল তা আজও আমি বুঝতে পারি নি।

ভব। তবে যে শুনেছিলাম ঠাকুরঝির জ্বালায় সে চলে গেছে তা কি সত্য ?

যোগেন। অনেকে তাই মনে করে বটে, কিন্তু আমার মনে সে কথা লাগে না। দিদি তাকে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সে সকল কষ্ট সরো এক দিনের জন্য কষ্ট বলে মনে করে নি। তার অনেক গুণ ছিল।

ভব। গুণত কত, তাই এমন স্বামী ছেড়ে, এমন ঘরকন্না ফেলে চলে গেছে !

যোগেন। তুমি জান না, তাই তাকে বৃথা তিরস্কার কচ্চ ; মেয়েমানুষ বুঝতে না পেরে একটা কাজ করে ফেলেচে, আমি ত তার দোষ তত দেখি না।

ভব। হবে ! তোমরা পুরুষ মানুষ, অনেক বুঝতে পার।

যোগেন। আমার ত মনে হয় যত দোষ সুরেশের ; সে তখন এখানে থাক্‌ত, সেই সরোজার সর্ব্বনাশ করেছে ; আমি ছেলে বেলা থেকে তাকে ভালবাস্‌তুম।

ভব। সুরেশকেও তুমি ভালবাস্‌তে ? তুমি যাকে ভালবাস্‌তে সেই দেখ্‌চি তোমার পর হয়েছে।

যোগেন। সেই জন্যই ত ভয় হয়, পাছে তুমিও পর হয়ে যাও।

ভব। তুমি কি আমায় ভালবাস ?

যোগেন। (সস্নেহে) কি বোধ হয় ?

ভব। তুমি আমাকে ভালবেসো না। আমি তোমার পর হ'তে ইচ্ছা করি না ; আমি তোমায় অমি ভালবাস্‌বো।

যোগেন। এই গুণেই ত তোমায় ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

ভব। কিন্তু যাই বল, এমন ছেলে ফেলে যাওয়া সরোজার ভাল হয় নি।

যোগেন। ঐ কথাটী মনে হলে সরোজার উপর অভক্তি হয়।"

ভবসুন্দরী যে স্বামীকে ভালবাসেন না তাহা নহে ; কিন্তু তিনি মুখে যাহাই বলুন তিনি স্বামীর হৃদয়টুকু মুষ্টির ভিতর রক্ষা করিতে চান। All to herself—এই স্বার্থ কলুষিত প্রেমভাব তাঁহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন। অপরের অনিষ্ট সাধন করিয়া তিনি স্বামীর একমাত্র হৃদয়েশ্বরী হইতে চান—একজনের নির্ম্মিত অট্টালিকা ভগ্ন করিয়া সেই উৎপাটিত ভিত্তির উপর আপন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে চান। সরোজার স্মৃতি পর্য্যন্ত স্বামীর হৃদয় হইতে দূর করা চাই। এ স্থলে ভবসুন্দরীর প্রেম কিঞ্চিৎ স্বার্থভাবাপন্ন প্রতিপাদিত হইতেছে ; কিন্তু তিনিও প্রেমময়ী, এবং তাঁহাকে লইয়া সংসার করিলেও কষ্ট পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

সরোজার গৃহপরিত্যাগ তাঁহার জীবনের একমাত্র কালিমা ও শুভাশুভফলগর্ভ ভয়ানক ঘটনা—awful crisis। পূর্ব্ব সমালোচনায় প্রেম, স্বামীপ্রেমই এই সরলমতি বালিকার চিত্তের কেন্দ্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ; কিন্তু এক্ষণে বিচার্য্য বিষয়, যদি সরল, গভীর প্রেম সরোজার পক্ষে একমাত্র স্থিতিশীল কেন্দ্র হয়, তাহা হইলে তাঁহার স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কিরূপে স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভবপর হইতে পারে ? যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তিনিও তাঁহার সপত্নীর ন্যায় স্বার্থে নিমগ্না এবং স্বামীর চরিত্রে সন্দেহজনিত ক্লেশের জন্যই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া একজন নীচমনা চক্রীর অনুগমন করিলেন, তখন তাঁহার প্রেম "আত্মহারা" প্রেম বলিয়া কিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে ?

এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় দেওয়া যায়। দর্শনশাস্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতিতে একটী বিষয় পরিস্ফুট হইয়াছে। মানবাত্মা দুইটী বিশেষ, পৃথক্‌, বিপরীত ভাবে গঠিত। দেবভাব ও পশুভাব এই দুইটী ভাবের সংঘর্ষণে মানবাত্মার জীবন। অবস্থাগুণে, শিক্ষাগুণে, কঠোরশ্রমগুণে সাধু আপন পৈশাচিক ও পাশবিক প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করিয়া স্বর্গীয়ভাবে বলীয়ান্ হয়েন। কিন্তু এমন কোন মানব এতাবৎকাল পর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ যাঁহার চিত্তে এই পশুবৃত্তি কখনও

না কখন প্রবল হয় নাই। যে সময় এই রূপ দুষ্প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তখন নরচিত্ত এক ভয়ানক সন্ধিস্থলে (turning point) উপস্থিত হয়। যিনি সাধু তিনি আপন বিবেকের প্রসাদে আত্মরক্ষা করেন; আর যে চিন্তাহীন ও তরলমতি সে ক্ষণমুহূর্ত্তের প্ররোচনায় সারধন, অমূল্যধন হারাইয়া পথের ভিখারী হইয়া পড়ে। মানবজীবনের প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্ত্তে এই দুইটী ভাবের দ্বন্দ্ব চলিতেছে, এবং এই সময়ের জয়সাধনই প্রকৃত শিক্ষা। সাধু, ধনী একদিনে হওয়া যায় না। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ চলিয়া যাইবে তবে আত্মার প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে। যিনি এ কঠোর যোগসাধন বিষয়ে উদাস তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

নরনারী রিপুচয়ের দাস—Man is after all the slave of passions! এ বিষয়ে বোধ করি কোন তর্কের আশঙ্কা নাই। ক্ষণমাত্রের তাড়নায় মানব বিকল হইয়া পড়ে ও বহুআয়াসসঞ্চিত ধন একমুহূর্ত্তে হারাইয়া ফেলে। পাপের প্ররোচনায় পশুবৃত্তি সবল ও পরিপুষ্ট হয়, এবং অধিকাংশ সময়ে ইহা ঋষিবৃত্তির উপর জয়লাভ করে। অনেক সময় মানব আপন চিত্তবৃত্তির অবস্থা অনুভব না করিয়া দুর্দ্দম রিপুর পীড়নে একটী কায করিয়া ফেলে। ইহার কারণ সাধনার অভাব, যোগের অভাব। এই রূপ একটী সময় সরোজার জীবনে উপস্থিত। স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ হইল, তাহার ভ্রান্ত প্রমাণও পাওয়া গেল, আর সরোজার হৃদয়ের গূঢ় প্রদেশ হইতে পশু লম্ফ দিয়া উঠিল। আর ভাবিবার সময় নাই, আর বিবেকের সাধুপরামর্শে মনোযোগ দিবার সময় নাই; পশু ছুটিল, সরোজাও তাহার সহিত কলের পুত্তলীর ন্যায় ছুটিলেন। এরূপ কালে লোকে এক প্রকার বাতুল হয়। ক্ষণিক উন্মত্ততায় লোক আত্মবিস্মৃত হইয়া গর্হিত কার্য্য করে। ইহাতে তাহার স্বভাবের মৌলিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় না। বাতুলতায় সরোজা যে কাজ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার স্বামীর প্রতি গভীর প্রেমের বিপর্য্যয় ঘটে নাই। তাঁহার মর্ম্মান্তিক, হৃদয়ভেদী ক্লেশেও তাঁহার মন আপন ভুলিয়া স্বামীর দিকে ধাবিত হইয়াছিল। তাহার পর ব্রাহ্মণীবেশে স্বামীগৃহে প্রত্যাগতা হইয়া যখন তিনি স্বার্থ ভুলিয়া কেবল ভালবাসিয়াই সুখ অনুভব করিলেন, তখনও যদি তাঁহার প্রেমকে "আত্ম-হারা" প্রেম বলা না যায়, তাহা হইলে "আত্ম-হারা" প্রেম নন্দনকাননের পারিজাতের ন্যায় এক কাল্পনিক বস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার পর মৃত্যুশয্যায়!— আমরা যেন ডেসডেমোনা (Desdemona) র চিত্তোন্মাদী বীণাসঙ্গীত শুনিলাম :—

Emelia. O, who hath done this deed!
Des. Nobody; I myself; farewell;
Commend me to my kind lord;
O, farewell.

জয়তারা বোধ হয় হিন্দু গার্হস্থ্য জীবনের অবশ্য দ্রষ্টব্যা নারী ও জগতের এক অদ্ভুত জীব। হিন্দু মাত্রেই এরূপ ননন্দার বিষয়

জাত আছেন ; কিন্তু জগতের অন্য কোন স্থানে তাঁহার সমকক্ষ কোন জীব আছে কি না ইতিহাস দৃষ্টে বলা যায় না। অন্তঃপুররক্ষিতা, অবগুণ্ঠণবতী, অসূর্য্যম্পর্শারূপা, ব্রীড়াসঙ্কুচিতা, নিঃসহায়া, কম্পমানকলেবরা হিন্দুবধূর উৎপীড়ন ও নিষ্পেষণার্থই যেন ভগবান প্রতি হিন্দুগৃহে ওরূপ এক এক ননন্দার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ মন্দ কি না বলিতে পারি না ; কিন্তু—ঘটনাক্রমেই হউন বা স্বভাবতঃই হউন—তাঁহারা যে নিষ্ঠুর, নির্ম্মম ও মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা তাহা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। জয়তারা অবশ্যই তাঁহার সমজাতীয়াদিগের প্রকৃতি কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তিনি সময়ে হউক বা অসময়ে হউক, দোষ থাক্ আর নাই থাক্, স্বরাজ্যভুক্তা, ত্রাসশুষ্কা সরোজার উপর তাঁহার লৌহশাসন স্থাপন করিতে কাতর নহেন।

"জয়তারা। ও আতর—বলি দেখ্‌লি দিদি? বড় ননদের খাতির দেখ্‌লি? একবার জড়সড় হলো না ; উঠে দাঁড়াল না! যেমন কৌচের উপর বসে ছিল তেমনি রইল।

আতর। তাইত বউ, ও তোমার কি আক্কেল! বড় ননদ শাশুড়ি সমান ; তাকে দেখে তোমার একটু সমিহ হল না! চুপ করে রইলে যে! মুখে কথা নেই কেন?

জয়। ও কি কম হারামজাদা ঘরের মেয়ে। উনি তোমার সঙ্গে কথা কইলে ওঁর যে অপমান হবে!

আতর। তাইত দেখ্‌চি। আমরা বুড়ো হতে গেলুম, কৈ আজ অবধি ত দিনের বেলা সোয়ামির সঙ্গে কথা কইনি। এ সব হলো কি? বলেছিলুম বোন এ বিবি বউ তোমাকে হাড়ে নাড়ে জ্বালাবে!

জয়। (সরোজার প্রতি) কেন কি হ'লো? আতর তোমাকে কি বল্লে যে রাঙা চোকে পানি পড়ল। দেখো! হিত শিখাবার যো নাই। আমার মরবার জায়গা ছিল না, তাই তোমার কাছে আতরকে এ অপমান খাওয়াবার জন্যে এনেছিলুম। (আতরের প্রতি) কিছু মনে কর না দিদি, যা'হক নিজের চকে দেখলে এখন প্রত্যয় যাবে। নইলে বল্‌তে জয়তারা হয়ত বাড়িয়ে বলে।

আতর। এমন বউ ত বাপের বয়সে দেখিনি—এখন চল বোন কি হতে কি হবে।"

জয়তারা কিন্তু পাষাণহৃদয়া নহেন ; কালে পাষাণও গলিয়া যায়, তাঁহার ত কথাই নাই। সরোজা যখন ব্রাহ্মণীবেশে স্বামীগৃহে প্রত্যাগতা এবং প্রাণের সন্তানের রুগ্নশয্যায় আসীনা, তখন জয়তারার স্ত্রীচরিত্র প্রকাশ পাইল। স্ত্রীলোক যতই কঠিনহৃদয়া হউন না কেন, একটি বিষয়ে তাঁহারা সকলেই সমভাবাপন্না ও সমব্যথায় ব্যথিতা। সপত্নী, আপনপক্ষে কোন স্ত্রীলোক সহ্য করিতে পারেন না, অপরের পক্ষেও তাহাকে কোন বালা সহ্য করিতে পারেন না।

"সতীন্, সতীন্, সতীন্,
পরী হলেও পেত্নি!"

সেই "পেত্নি" কোন গৃহেই সহনীয়া নহে। যবনী ও শক্রপত্নীকেও হিন্দুরমণী ভগ্নিভাবে আদর করিতে পারেন, কিন্তু সপত্নীকে?—উঃ! ভয়ানক কথা!—নরকা-

মিই তাহার যোগ্য আধার! এই ভয়ঙ্করী, বীভৎসা মূর্ত্তি সরোজার স্বামীগৃহে প্রকাশমানা; সুতরাং জয়তারার হৃদয়ের গূঢ়প্রদেশ হইতে প্রেম-উৎস উচ্ছলিত হইল।

"না জানি কেন রে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
(ওরে) উথলি উঠেছে বারি,
(ওরে) প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ,
রুধিয়া রাখিতে নারি।"

"সরোজা। (ব্যস্তভাবে উঠিয়া) তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরঝি, আমায় আজকের দিনটে থাকতে দাও; কাল সকালে এখান থেকে চলে যাব।

জয়তারা। (সবিস্ময়ে) কে বউ! বউ না; ও বোন আর আমি তোমায় কিছু বলব না। তুমি এখান থেকে যাওয়া অবধি আমি আর এ মুখো হইনি—এক দিনের জন্যেও সোয়াস্তি পাইনি, রাত দিন মনে হ'ত, আমার জন্যেই বুঝি ঘরঠা ছারখার হয়ে গেল। তুমি যে মরনি, এই আমার ভাগ্গি—আমার উপর কি রাগ করে গিয়াছিলে বোন্?

সরোজা। না ঠাকুরঝি, আমি তোমার উপর রাগ করে যাই নি। আমার বরাতে দুঃখ ছিল তুমি কি কর্‌বে।

জয়তারা। চুপ কর বউ,—বউ তোর কপালেও এত ছিল? তোর নিজের বাড়ীতে তুই আজ দাসী?

সরোজা। ঠাকুরঝি আমার সব সহ্য হয়—আমি যে প্রাণ পুরে কাঁদতে পাইনি এ দুঃখ আমার রাখবার জায়গা নেই।"

আবার—সরোজা যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ানা তখন জয়তারাই তাঁহার একমাত্র সখী ও সেবিকা।

"ভব। ঠাকুরঝি কি আমাদের কাউকে কিছু কত্তে দেন? বলেন, আমি রয়েচি তোরা আবার কি কত্তে এলি। যতদিন বামুন ঠাক্‌রুণ না ভাল হ'বে আমি এখানে থাকবো—তোদের কিছু কত্তে হবে না।"

পতিগতপ্রাণা, সাধ্বী সরোজার আসন্নকালে এক জয়তারাই তাঁহার দুঃখে দুঃখিনী ও যন্ত্রণায় ক্লিষ্টা এবং ব্যথিতা।

"বউ তোর কি কষ্ট হচ্চে আমায় বল্ না?

সরোজা। আমি যেতে বসেচি ঠাকুরঝি আমার আবার কষ্ট কি? আমায় আশীর্ব্বাদ কর, পরকালে যেন আমার সদ্গতি হয়।

জয়তারা। বউ তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছিলুম, আমা হতেই তোর এ দশা। আমার যদি সদ্গতি হয়,তোরও হবে। আমি মনের সঙ্গে তোকে আশীর্ব্বাদ কচ্চি।"

যোগেন্দ্রর চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা বাহুল্য। তিনি সুধীর, সৎ, শান্ত-স্বভাব, সরল, বুদ্ধিমান্, ও বিদ্বান্; তাঁহার প্রকৃতি উন্নত, চরিত্র উদার, ও হৃদয় প্রেমময়। কিন্তু তিনি কিছু বেশী পরিমাণে বিশ্বাসী। সুরেশকে তিনি চিনিতে পারেন নাই, তাই তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন,—তিনি জানিতেন না যে কালে সে যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার অনিষ্টসাধন করিবে। তিনি সর্পের বাহ্যিক আকারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শিশুর ন্যায় তিনি মহাভুজঙ্গের সহিত ক্রীড়া করিতে ছিলেন, এমন সময়

সেই ভুজঙ্গ তাঁহাকে দংশন করিল। তখন আর কি? সুখের—অথবা দুঃখের—বিষয় যোগেন রোমিও (Romeo) নহেন, জুলিয়েটের (Juliet's) অভাব বা অনুপস্থিতি তাঁহার পক্ষে কালান্তক নহে। তিনি সরোজাকে হৃদয়ে রাখিতে চান, কিন্তু যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন ভবসুন্দরীর পত্নিত্ব আবশ্যক। তিনি কাল্পনিক প্রতিদানবিহীন প্রেম অনুভব করিতে পারেন না। ভবসুন্দরী আসিলেন এবং সময়ে তিনিও স্বামীর হৃদয়েশ্বরী হইলেন। যোগেনের প্রেমে ও সরোজার প্রেমে প্রভেদ এই যে প্রথমটি স্বার্থপরতায় কলুষিত, হৃদয়ের খণ্ডপ্রেম মাত্র; শেষটী জীবনের গ্রন্থি, ক্ষুদ্র নারীহৃদয়ের মন্ত্র ও সঞ্জীবনীশক্তি। সরোজা যোগেনকে খণ্ডপ্রেম দেন নাই। তাঁহার হৃদয় যতটুকু তাঁহার প্রেমও ততটুকু; কিন্তু যোগেনের হৃদয়ে ভবসুন্দরীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার মত একটু বেশ পরিসর স্থান ছিল। সরোজা গৃহত্যাগ করিয়াও সতী, যোগেন সৎপথে থাকিয়া, সরোজার স্মৃতি হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াও ব্যভিচারী।

সুরেশের কথা কি বলিব! সে কালক্রমে ও অবস্থাক্রমে নরকের কীট হইয়াছিল, কিন্তু ইয়াগোর (Iago's) বিস্ময়কর, নারকীয় প্রকৃতি তাহাতে ছিল না। সে সামান্য কীট, কীটের মত কার্য্য করিয়া ছিল। গলরজ্জুই তাহার কার্য্যের ফল ও ভূষণ!

ইয়াগো (Iago) কেন যে ডেস্‌ডেমনা (Desdemona)র অনিষ্টসাধন করিল তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে সকলে অক্ষম। পুষ্পের যেমন ফুটিয়াই সুখ, সর্পের যেমন দংশন করিয়াই সুখ, শয়তানের যেমন মানবের পতনেই সুখ, ইয়াগোরও তেমনি অবলার মৃত্যুতে ও সুখের অবসানেই সুখ।

Demand me nothing : what you know
you know :
From this time forth I never will
speak word.

ইয়াগোর অনিষ্টকরণেচ্ছা প্রকৃতিগত। অপরের মন্দ করিতে পারিলেই তাহার সুখ। সুরেশ অবস্থার পারম্পর্য্যে, গ্রহ বৈগুণ্যে, দুর্দ্দমনীয় রিপুর বশবর্ত্তী হইয়াই জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অসৎপথে গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার দোষ প্রকৃতিগত নহে, চিত্তদমনের ও রিপুসংযমের শিক্ষাভাবজনিত। ইয়াগো স্বভাবের দুর্ব্বোধ্য গূঢ় রহস্য (profound mystery), সুরেশ রিপুতাড়নায় ক্যালিবান (Caliban)।

উপসংহারে ইহাই বলিলে হইবে যে সরোজার ন্যায় সুন্দর, নীতিগর্ভ, প্রীতিকর, নাটক অতি বিরল। এরূপ দৃশ্যকাব্যে সংসারের অশেষ উপকার সাধিত হয় ও তজ্জন্য আদরণীয়। গ্রন্থকারের নাম জানি না অতএব তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া আমাদের অভিবাদন দিতেছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র সোম।

সাহিত্য-সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড।] পৌষ, ১২৯৭। [নবম সংখ্যা।

আর্য্য-ধর্ম্ম।

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত করিয়া দিন, মাস, বৎসর, যুগ সকল অতীত হয়, কিন্তু অতীতের স্মৃতি থাকে। কালের প্রবল প্রবাহে কত শত বিষয় ভাসিয়া গিয়াছে; কিন্তু সে সকল বিষয় আমরা এখনও বিস্মৃত হইতে পারি নাই, কখনও যে পারিব, তাহা বোধ হয় না। আমাদিগের জীবনক্ষেত্রের এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে দেখিতে পাই, দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে আমরা অনেকানেক বস্তু হারাইতেছি। অন্তরে বাহিরে, দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাদ্দেশে, উর্দ্ধে ও অধোভাগে যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই, অনেক বস্তুই নাই। সে দেশ নাই সে দেশীয় নাই; সে মানুষ নাই সে প্রকৃতি নাই; সে আচার নাই সে সংস্কার নাই; সে স্বাধীনতা নাই সে সাম্য নাই; সে অনুরাগ নাই সে সকল কিছুই নাই; কেবল সেই সকল অতীতের স্মৃতি আছে মাত্র। চিরদিন অবশ্য কিছুই থাকে না—পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম; মন কিন্তু সে প্রবোধ মানে না, সে চিরদিনই তাহাদিগকে নিকটে রাখিতে চায়। জানি, যাহা যায়, তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না; তবু যেন কেন মনে হয়, সে সকল কোথায়

গেল, আবার কেন আসে না ? আর ফিরো- হইয়া পড়ি। জানি, কালে সকলেই পায়, কিন্তু তবু কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, কেন গেল ?

কি ছিল, আর কি হইল, ভাবিয়া দেখিতে গেলেই সর্ব্বাগ্রে আপনাদেরই কথা —আপনাদেরই দেশের কথা মনে হয়। প্রাচীনে ও নবীনে তুলনা করিলে হৃদয় বিষাদভারে ভরিয়া যায়, প্রাণ নৈরাশ্যে হইয়া পড়ে। এই আর্য্যভূমি রত্ন- ভারতমাতা আছেন, কিন্তু সে ভিও নাই, সে সকল রত্নও নাই ; সকল গ্রাম-নগর-তপোবনও নাই ; ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি নাই, সে ব্রহ্মচর্য্য- হস্থ্যাদি আশ্রমও নাই। চাহিয়া দেখি, ভাবিয়া দেখি, সে সকল স্থানও নাই, সে কল মানবও নাই ; যে সকল স্থান ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্যে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিল, হারা সমাজসেবানিরত ছিলেন, যাহারা কে অন্নদান করিতেন, তৃষ্ণার্ত্তকে য় দিতেন, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা করি- সে রাজাও নাই, আর সে প্রজাও যাহাদের ধর্ম্মে নিষ্ঠা ছিল, কর্ত্তব্যে ছিল, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি ছিল, থ অভ্যাগতের সেবা ছিল, সংসার- আত্মা ছিল, আত্মাতে মনুষ্যত্ব ছিল হারা আর নাই। এখনও সেই ভারত ছে, এবং আমরাও সেই ভারতবাসী াছি, কিন্তু কত প্রভেদ! পাটলও পুষ্প ং কিংশুকও পুষ্প—কিন্তু কত অন্তর !!

িও এইরূপে কালস্রোতে কত শত ভাসিয়া গিয়াছে ও এখনও যাইতেছে সত্য, কিন্তু ঐ স্রোত এতাদৃশ ধীরগতি যে উহা নিরন্তর ধাবিত হইলেও তাহা সহজে লক্ষ্য হয় না। আমরাও সেই একই নিয়- মের অধীনে এরূপ ধীর ও নিস্তব্ধভাবে প্রবা- হিত হইতেছি যে, গভীরতিমিরাবৃত অনন্ত- গর্ভে দ্রুতগতি উপস্থিত হইতে আরম্ভ করি- য়াও অনেকেই অনুভব করিতে পারিতেছি না, কেবল কোন সাধু পুরুষ সময়ে সময়ে চমকিত লইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বুঝিতে পারিতেছেন যে, আর দিন নাই। তাঁহারা নিজে বুঝিয়াই যে ক্ষান্ত হইতেছেন, তাহাও নহে। তাঁহারা স্বয়ং জাগরিত হইয়া পার্শ্ব- বর্ত্তী লোক সকলকে জাগাইবার জন্য যে ভেরী ঘোষণা করিতেছেন, সেই ভেরীরব নির্জ্জন অরণ্য প্রদেশ, গিরিগহ্বর, নদনদী- নির্ঝরিণী দিগ্‌দিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া অনন্ত আকাশ পথে অনন্তলক্ষ্যে প্রধাবিত হইয়া অনন্তগর্ভে বিলীন হইতেছে, জীব যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া মোহনিদ্রাগত হইয়া সংসারস্রোতে গতায়াত করিতেছেন ; কিছু দিন পরে কাহারও কাহারও পক্ষে ঐ মোহ- নিদ্রা হইতে জাগরণ ও যথাকালে চিরবিশ্রাম বা চিরশান্তির সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তাঁহারা তৎকালে যে গভীর ভেরীঘোষণা করিতেছেন, তদনুসারে আমরা প্রত্যেকেই বলিতে পারি যে, এত দিন পরে অন্ততঃ আমার পক্ষে সেই বিশ্রাম বা শান্তির সময় ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে চলিল বা হওয়া উচিত। কিন্তু এই সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, যে দিন এই সংসারে আমাকে আর কেহই দেখিতে পাইবেন না, সেই মোহের বা শান্তির দিনের পূর্ব্বে ;—যে

কাল রজনীর ঘোরতর অন্ধকারে কেহই কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন না, সেই কালরাত্রির নিবিড় তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বে অথবা যে উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে জীব-মাত্রের দৃষ্টিশক্তি অনন্ত লক্ষে বিধ্বস্ত হয়, সেই অনন্ত অভিমুখে চক্ষু নিমীলিত করিবার পূর্ব্বে আমার সহযোগিবর্গকে—যদিও তাঁহারা আমার কথাগুলি শুনিবেন এরূপ আশা করাও দুরাশা বটে, কিন্তু মনের আবেগে যেন কোন একটি অলক্ষ্য শক্তির প্রবর্ত্তনায়—আনন্দের সহিত কয়েকটিমাত্র কথা বলিব, যে জাতিকে তাঁহারা এত ভাল-বাসেন এবং আমি যথেষ্ট ভালবাসি—সেই ভারতবাসীকে আমার সেই বহুকালের মহতী আশার কথাগুলি শুনাইব; সেই আশাটি পূর্ণ হইতে—কথঞ্চিৎ ফলবতী হইতে দেখিলে, আমার সম্মুখে যেন মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হইল বোধ করিব; এবং আমার পূর্ব্বপুরুষের ও আমার প্রিয় দেশে—ভারতে—পুনর্ব্বার সুখসূর্য্য সমুদিত হইবে, এই সুখকরী আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারিব।

এই সুবিশাল ভারতসম্রাজ্যের একমাত্র কর্ম্মভূমি ভারতের প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে ভ্রমণ করিলে অতীব শোচনীয় ব্যাপার সকল দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল ব্যাপার দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ভারতীয় জীবনের একটি অবস্থা, যাহা উক্ত ব্যাপার সকলের মূলীভূত, যেন সদা কাল বলপূর্ব্বক দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তখন উহার প্রভাবে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে হয়—আর অন্য চিন্তা অন্য ভাবনা সকল প্রায় তিরোহিত হইয়া যায়। বহুকাল ধরিয়া তন্নিবারার্থ তদ্বিরুদ্ধে অনেকে অনেক চেষ্টা করিতেছেন ও করিবেন, কিন্তু যতই করুক না কেন, এক তমোময়ী ছায়া এই জাগ্রদবস্থাতেই আমাদিগের সমস্ত জীবনকে মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, স্বপ্নেও ঐ ঘৃণাকরী ছায়াময়ী মূর্ত্তি আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না; ছায়ার ন্যায় আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, আমরা যেখানে যাই, যে কোন কার্য্য করি, সেই বিষাদময়ী মূর্ত্তিটি যেন আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগকে মুখভঙ্গী দ্বারা উপহাস করিতে থাকে, আর আমাদিগের হৃদয়স্থ মঙ্গল-মুকুলগুলিকে উত্থানমাত্রই শুষ্ক করিয়া ফেলে। উহা আমাদিগের মানস মুকুরকে মোহমালিন্যে মলিন করিতেছে, উহাই আমাদিগের সুখের সংসার ছারখার করিতেছে;—উহাই আমাদিগের বিদ্যাবধূকে অবিদ্যারূপে পরিণত করিতেছে, উহাই আমাদিগের আনন্দামৃত আশা সমুদ্রকে লবণময় করিতেছে, উহাই আমাদিগের অধ্যাত্ম জীবনকে জড়ীভূত করিতেছে। ঐ বিষাদময়ী মূর্ত্তিটি ধর্ম্ম ভাবের মূর্ত্তি।

সংসার—সুখের সুদৃশ্য আবরণে ঐ দুঃখময়ী মূর্ত্তিকে আবরণ করিবার নিমিত্ত প্রভূত যত্নও করিয়াছি, কিন্তু সর্ব্বোত্তম দৃষ্টান্তগুলি—স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, স্বজাতীয়ের প্রতি অনুরাগ, সংসারের প্রতি অনুরাগ, নিজের প্রতি অনুরাগ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, পরিবারিক স্বাধীনতা, বল, বীর্য্য, বাণিজ্য, ঐশ্বর্য্য, এবং সর্ব্বত্র সাম্য প্রভৃতি বিষয় সমূহ স্মরণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

কতিপয় তৃণ দ্বারা উত্তুঙ্গ গিরিশিখর আচ্ছাদনের বা কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র দ্বারা অসীম আকাশ আচ্ছাদনের প্রয়াসের ন্যায় আমাদিগের সকল যত্নই বিফল হয়। ঐ বিষাদময়ী মূর্ত্তিকে উপেক্ষা করিবার নিমিত্ত ও প্রয়াস পাইয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, সংসারের সকল বিষয় উপর উপর দেখিয়া জীবন অতিবাহিত করিব, অভ্যন্তরে কি আছে, দেখিতে বিশেষ চেষ্টা করিব না, কিন্তু সে সকলই বৃথা হইল। দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে চারিদিকের উৎপীড়নে, উত্তেজনায় আমাদিগের অন্তরের বেদনা বর্দ্ধিত হইয়া বাহিরেও প্রকাশ হইয়াছে। অবশেষে এতদিনে আমাদিগের নিজের ইচ্ছা অপেক্ষা যেন এক প্রবলতর শক্তির আদেশে তাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। অন্তরের বেদনা বাহ্যে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে অনেকবার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলাম;—কারণ, এ পর্য্যন্ত গন্তব্য বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় নাই, উদ্দেশ্য বা কার্য্যপ্রণালীর স্থির ছিল না; কিন্তু এখন সংশয়ময় সময় অতিবাহিত হইয়াছে, গন্তব্যপথ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, লক্ষ্য নিরূপিত হইয়াছে এবং কার্য্যপ্রণালীও বিধিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এখন আমাদিগের সংসারযাত্রা সংবরণের পূর্ব্বে আমাদিগের স্বদেশীয়গণকে—কি উচ্চ, কি নীচ সকলকে—সেই লক্ষ্যপথ স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতে পারিলেও সেই সঙ্গে 'সফল মনোরথ' হইব, এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করাইয়া ঐ পথ সকলকে গ্রহণ করাইতে পারিলে, আমাদিগের এই চেষ্টা বৃথা হইল না, জ্ঞান করিব।

সৌভাগ্যক্রমে বহুকালের পর ভারতবাসী স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক অনুরাগের সহিত সাম্যনীতির অনুসরণে ধর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তদ্দর্শনে আমরাও যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতেছি। দেখিতেছি,—ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ধর্ম্মের আন্দোলন হইতেছে; যে ধর্ম্ম সমাজের একমাত্র বন্ধন, যে সাম্য ও স্বাতন্ত্র্য জীবসমাজের উন্নতির অদ্বিতীয় সাধন সেই ধর্ম্ম, সাম্য ও স্বাতন্ত্র্য আজি আর্য্যসমাজে পুনর্ব্বার সানুরাগে সাদরে অবলম্বিত হইতেছে; যে সাম্য, স্বাধীনতা ও ধর্ম্মানুরাগ জীবের জীবন, তাহাই আজি ভারতে অনুসৃত হইতেছে, এতদপেক্ষা সৌভাগ্যের বা আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? ধর্ম্মানুমোদিত সাম্য ও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে সমাজ পরিচালন ঘটিলে দেশের জাতির ও ব্যক্তির মঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ধর্ম্মনীতি মানবহিতের সম্পূর্ণ অনুকূল ও অধর্ম্ম তদ্বিপরীত হইলেও ভারতবাসীকে এখন পর্য্যন্ত অধর্ম্মের পক্ষপাতী দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় না ব্যথিত ও দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়? আশ্রিত ধর্ম্মনীতি মানবের মঙ্গলের মূলীভূত হইলেও ভারতবাসী সাধারণ এখনও তাহার উপযুক্ত সমাদর করিতেছে না কেন, এবং ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও তাঁহারা এখনও তাহাকে ঘৃণা করিতেছেন না কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা জ্ঞানিগণ অনেকে অনেক প্রকারে করিবেন অথবা তদ্বৈপরীত্য

প্রদর্শন করিয়া অর্থাৎ যাহা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস নহে, এই প্রকার উক্তি করিয়া বিপরীত তর্ক করিবেন সত্য, কিন্তু আমরা বলি, ভারতে পুনর্ব্বার ধর্ম্মানুশীলন আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা প্রকৃত ধর্ম্মনীতির বা বৈদিক আচারের অনুমোদিত ভাবে নহে। তাহার কারণ, ধর্ম্ম অপেক্ষা, সদাচার অপেক্ষা, ধর্ম্মাভাসের—অনাচারের মোহিনী শক্তি আপাততঃ প্রবল বলিয়া বোধ হয়। যদি ধর্ম্মের—সদাচারের প্রথম সোপানে মধুরতা থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যগণকে ধর্ম্মপরায়ণ, সদাচারপরায়ণ করিতে কিছুমাত্র ক্লেশ পাইতে হইত না। অধর্ম্মবৃক্ষ, অসদাচারবৃক্ষ পরিণামে বিষময় ফল প্রসব করে, অধর্ম্মপরায়ণ, অসদাচারনিষ্ঠ ব্যক্তির অধর্ম্মানুষ্ঠানকালে,—অসদাচরণকালে যদি এই জ্ঞানের উদয় হইত, তাহা হইলে তিনি কখনই অধর্ম্মপথের—অসদাচারপথের পথিক হইতেন না।

সম্প্রতি আর্য্যসমাজে দুইটি পরস্পর বিরোধী বিভিন্নমুখী প্রবল সম্প্রদায়স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এক সম্প্রদায় শাস্ত্রদর্শন ও তদর্থের সম্যক্ পর্য্যালোচনা প্রভৃতি তত্ত্বনির্ণায়ক গবেষণা ব্যতিরেকেই "আর্য্যশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম কুসংস্কারাপন্ন এবং উহার ভিত্তিস্বরূপ সাম্য, স্বাধীনতা ও অনুরাগের আদর নাই," অতএব ঐ ধর্ম্ম অশ্রদ্ধেয় বলিয়া ঘোর বিতণ্ডা করিতেছেন। অপর সম্প্রদায় বলিতেছেন, "কালের গতি কে রোধ করিবে? প্রকৃতির নিয়ম কে লঙ্ঘন করিবে? এই ভীষণ কলিকালে যুগধর্ম্মে লোক সকল অসার বিষয় লইয়া বাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইবে বলিয়াই এই কালের নাম কলিকাল বা কলহকাল হইয়াছে। দেখ, মনুষ্যসংসারে ইতিমধ্যেই কলির মাহাত্ম্য ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। লোকের আর ধর্ম্মের প্রতি তাদৃশ আস্থা নাই। শালগ্রাম শিলা মানপিণ্ড হইবার উপক্রম হইতেছে। কুতার্কিক নাস্তিকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পিতৃমাতৃ-ভক্তি যেন পৃথিবী হইতে দূরদেশে পলায়নের উপক্রম করিতেছে। পাণ্ডিত্যাভিমানী ধর্ম্মধ্বজী লোকের সংখ্যা অধিক হইয়াছে। ফলতঃ যাঁহারা পণ্ডিত বা ধার্ম্মিক বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তাঁহারা যেরূপ কুকর্ম্মী সেরূপ অন্যে নহে। ধর্ম্ম বরং চণ্ডালগৃহে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, তথাপি ব্রাহ্মণগৃহে তাঁহার আদর নাই, যজ্ঞোপবীতই ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র চিহ্ন হইয়া উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ্য আচার প্রায়ই দেখা যায় না। প্রায় লোকমাত্রই শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। পুরুষ সকল স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগ; স্ত্রীগণ পুরুষের অধিনেত্রী। দেবসম্পত্তি দ্বারা বিলাস সম্পাদনেও লোক সকল কুণ্ঠিত নহেন। বালক বালিকাগণ প্রবীণের ন্যায় আচরণ করিতেছে; যুবকগণের ত কথাই নাই; গুরুর শাসনবাক্য গ্রহণ করিতে কেহই সম্মত নহে। বিদ্যা অর্থকরী হওয়াতে প্রকৃত জ্ঞানের ব্যবহার প্রায় স্থগিত হইয়া উঠিয়াছে। ভগবদ্বার্ত্তা—প্রসঙ্গ সুদূরবর্ত্তী হইয়াছে, যিনি যে বিষয়ে অধিক কল্পনাকুশলী তিনি সেই বিষয়ে অধিক বিদ্বান্। সদাচারের অভাবে, বর্ণা-

ব্রহ্মাচারের অভাবে লক্ষ্মীও পলায়নের উপক্রম করিতেছেন। রাজা সকল প্রজাপালনব্রত পরিত্যাগ করিয়া প্রজাশাসনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ধর্ম্ম অনাথ, জ্ঞান নিরাশ্রয়, সত্য স্থানভ্রষ্ট, বর্ণ ও আশ্রম সকলও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। দিন দিন অধর্ম্মের সহিত রোগ শোকাদির আতিশয্য হওয়াতে মনুষ্য সকল সর্ব্ব বিষয়ে হীনবল হইয়া পড়িতেছেন। বসুমতী পাপভার পরিপূর্ণ হইয়া সমুদ্র মধ্যে বাতাহতা তরণীর ন্যায় মগ্ন প্রায় হইয়াছেন। এক দুঃখের অবসান না হইতেই দুঃখান্তর উপস্থিত হইয়া লোক সকলকে পরিপীড়িত করিয়া তুলিতেছে। চেষ্টা পাপের সহিত মিশ্রিত হইয়া সহজ সিদ্ধি ফল উৎপাদনে অসমর্থা হইতেছেন। পুরুষকারে শ্রদ্ধা দূর হইতেছে, সুতরাং দৈবনির্ভরতা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে আলস্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া লোক সকলকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছে। স্ত্রী উপদেষ্ট্রী হওয়াতে তাঁহার আত্মীয়বর্গই গৃহদেবতা স্বরূপে পূজিত হইতেছেন। প্রভু ভৃত্যপীড়ক ও ভৃত্য প্রভুপরায়ণতাবিহীন হইতেছেন। সকলেই স্বার্থপর, সুতরাং অকৃত্রিম প্রণয় দূরে পলায়ন করিতেছে। সর্ব্বত্রই কাপট্য, সরলতার নামগন্ধও দেখা যায় না; ধর্ম্মোপদেশ পর্য্যন্ত বণিক্ বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মের সহিত শাস্ত্রাদির প্রাধান্যও তিরোহিত হইতেছে। কলির প্রারম্ভেই যখন এতদূর ঘটিল, তখন ভবিষ্যতে যে কি ঘটিবে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, তাহার বিরুদ্ধে চেষ্টা করাও বৃথা।”

আমরা বলি, উভয় সম্প্রদায়ের মতই যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রথম সম্প্রদায় যে বলেন, “আর্য্যশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম কুসংস্কারাবৃত এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত। যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও শাস্ত্র সমূহের উৎপত্তি এই আর্য্যপ্রণালী অনুসারে এবং আর্য্যশাস্ত্রগিরি হইতে, সেই পাশ্চাত্য শিক্ষা বা শাস্ত্রের অনুরোধে এই আর্য্যশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম কুসংস্কারাবৃত, এই কথা বলা কি অসঙ্গত প্রলাপ নহে? যে আর্য্যশাস্ত্রের প্রতি গ্রন্থের প্রতি পত্রে অক্ষরে অক্ষরে সাম্য, স্বাধীনতা ও অনুরাগ সমুজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হইতেছে, সেই আর্য্যশাস্ত্র অসাম্যবাদী, স্বাধীনতা ও অনুরাগের বিরোধী? আর্য্যশাস্ত্র হইতে পাওয়া যায় না, এরূপ কোন বিষয় যে এই পৃথিবীর প্রচলিত অপর কোন শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ বিশ্বাসই করা যায় না। প্রত্যুত আর্য্যশাস্ত্রে এ প্রকার অনেক বিষয় আছে, ভূমণ্ডলের অন্য কোন শাস্ত্রে এখনও যাহার অঙ্কুর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ ইহাও স্বীকার্য্য যে, আর্য্যশাস্ত্রের বিলুপ্তপ্রায় ও অঙ্কুরিত বৈজ্ঞানিক বিষয় সকল ইয়ুরোপখণ্ডে নব উৎসাহে নব আন্দোলনে ও নব অনুসন্ধানে নূতন কলেবর এবং সুফল প্রদানোপযোগী আকার ধারণ করিতেছে। এইরূপ বিজ্ঞানের উন্নতি দর্শনেই পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুরোধে ঋষীগণকে মহামান্য প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বার্থপর বলিতে সাহস করাও অসঙ্গত। যাঁহাদিগের

অদ্ভুত বিদ্যাপ্রভাবে, বুদ্ধিকৌশলে, পুণ্যে ও তপোবলে ভারত এখন পর্য্যন্তও শত শত বৎসরের বৈদেশিক উৎপীড়নে, অত্যাচারে ও পরাধীনতাতেও মানবশূন্য হয় নাই,অসভ্য মানবগণের আবাসমধ্যে পরিগণিত হয় নাই, সেই স্বার্থশূন্য পরহিতৈকব্রত মহর্ষিগণের নামে বৃথা অপবাদ ঘোষণা করা কি সুশিক্ষার বা সভ্যতার ফল ? যাঁহাদিগের জ্ঞানপ্রভাবে এখনও সমগ্র মেদিনীমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইতেছে, তাঁহারা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রকার ধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন ? ধিক্ ধিক্ তাহাদিগের শিক্ষাকে,—যাঁহারা এই প্রকার অর্থশূন্য বাক্য প্রয়োগ করেন। তাঁহারা কি দেখিতে পান না, সুদূরদর্শী ঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে—যখন এই পৃথিবীর সকল স্থানই ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে সমাবৃত ছিল, সেই সময়ে—আপনাদিগের জ্ঞানবলে যে সকল বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকেও সেই সকল বিষয় অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ সত্ত্বেও যে শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় আর্য্যধর্ম্মের ও আর্য্যশাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন, সে কেবল তাঁহাদিগের দৃষ্টির বা সম্যক আলোচনার অভাব বশতই বলিতে হইবে। তাঁহাদিগের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা বা অজ্ঞতা ঋষিগণের প্রতি অগৌরব সূচক উক্তির কারণ। অথবা প্রকৃত ধর্ম্মের বা প্রকৃত সাম্য, স্বাধীনতা ও অনুরাগের তাৎপর্য্যাববোধের অভাবই শাস্ত্রের প্রতি অনাদর প্রকাশের হেতু। সাম্যনীতির অনুসরণ করিতে হইবে বলিয়া কি প্রকৃতি যে বিষয়ের সহিত যাহার সাম্য সংস্থাপন করেন নাই, তদুভয়ের উপর অথবা সাম্যনীতি ভাবের প্রয়োগ করিতে হইবে ? ছাগ ও ব্যাঘ্র অথবা বানর ও মানবে কি কখন সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে বা হইতে পারে ? যাঁহারা এই প্রকার সাম্যপ্রার্থী, যাঁহারা এবম্প্রকার সাম্যনামধারী অসাম্যের পক্ষপাতী, আমরা কখনই তাঁহাদিগের সহিত একমত হইয়া ঋষিগণের উপর বৃথা দোষারোপ করিতে ইচ্ছা বা সাহসও করি না। আমরা স্বীকার করি যে, ঋষিগণ এরূপ নীতিকে কখনই সাম্যনীতি বলিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, সমান অধিকারীকে সমান অধিকার প্রদান করাই সাম্যনীতির অনুমোদিত আচরণ। বোধ হয়, জ্ঞানিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, ইহাই প্রকৃত সাম্যনীতি, এবং পাশ্চাত্য সাম্যনীতিরও এই মত। আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক বেদশাস্ত্র ও তদর্থনির্ণায়ক ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাস পুরাণাদি বেদাঙ্গসকল ঐ সাম্যনীতিরই উপর সংস্থাপিত। সাম্য, স্বাধীনতা ও অনুরাগের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের আলোক দ্বারা অধর্ম্মান্ধকারের বিনাশ সম্পাদনার্থই পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র সকলের প্রবৃত্তি। স্বাধীনতা ও অনুরাগ সম্বন্ধেও ঐকথা বলা যাইবে। আর্য্যঋষিগণ যথেচ্ছাচারিত্বকে স্বাধীনতা বা কেবল পার্থিব অনুরাগকে অনুরাগ বলিতেন না। এক কথায় বলা যায় যে, আর্য্যের ধর্ম্ম অন্তর্মুখ এবং পাশ্চাত্যধর্ম্ম (অনেকাংশে) বহির্মুখ। পাশ্চত্যগণের প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য লইয়া উন্নতি এবং আর্য্যগণের অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্য

লইয়াই উন্নতির গণনা। সাধারণ পাশ্চাত্যের মধ্যে যে মহাপুরুষ জন্মে নাই তাহাও নহে; আবার সাধারণ আর্য্যের ধর্ম্ম অন্তর্ম্মুখ হইলেও আর্য্যের মধ্যে যে কুপুরুষের অসদ্ভাব আছে তাহাও নহে। কিন্তু অনুপাতে পাশ্চাত্যগণ অপেক্ষা আর্য্যগণের ধর্ম্মগৌরব অনেক পরিমাণে অধিক ও উৎকৃষ্ট। আর্য্যের ধর্ম্ম ইতরসাধারণ জ্ঞানী নিখিল আর্য্যসমাজের ধর্ম্ম: পাশ্চাত্যের ধর্ম্ম জ্ঞানীর ধর্ম্ম। পাশ্চাত্য শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোকের সহিত তুলনায় অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকের ধর্ম্মভাব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু আর্য্যসমাজে সেরূপ নহে, আর্য্যসমাজের নিকৃষ্ট চণ্ডালাদি জাতির মধ্যেও ধর্ম্মভাবের অসদ্ভাব নাই। ইহার কারণ, পাশ্চাত্যগণের সম্বন্ধ পার্থিবভাবের সহিত যত, আধ্যাত্মিকতার সহিত তত নহে; কিন্তু আর্য্যগণের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিকতার সহিতই অপেক্ষাকৃত অধিক। "লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা।" ইত্যাদি প্রমাণ অনুসারে দেখা যায় যে আর্য্যগণ মনে করেন, পার্থিবভাবের সহিত মানবের সম্বন্ধ স্বভাবতঃ প্রাপ্ত, সুতরাং তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত শিক্ষাদির প্রয়োজন নাই; কিন্তু পাশ্চাত্যগণ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা পার্থিব ভোগসৌকর্য্যের নিমিত্ত। আর্য্যগণের ন্যায় তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক চর্চ্চা যাহা কিছু আছে, তাহা কয়েকটি মহাপুরুষের নিকট; আর্য্যগণের ন্যায় লোকসাধারণী নহে। পাশ্চাত্য সমাজে এমত নিকৃষ্ট লোক অনেক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থের নাম পর্য্যন্তও জানেন না; কিন্তু আর্য্যদিগের নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যেও পুরাণশ্রবণাদি প্রচলিত। যদিও আপাততঃ দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য সমাজে বর্ণাশ্রম ভেদ না থাকার নিমিত্ত সর্ব্বত্রই সাম্য ও স্বাধীনতা বিরাজিত, কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সে সকলই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর্য্যসমাজে আপাততঃ ঐ ভেদ থাকার নিমিত্ত অসাম্যাদি প্রতীত হয় বটে, কিন্তু অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই সাম্য ও স্বাধীনতা বিরাজিত রহিয়াছে। আর্য্য সমাজের উচ্চ নীচ ভেদ কেবল সমাজ শাসনের নিমিত্ত। শাসন ভিন্ন সমাজ রক্ষাই হইতে পারে না। শাসনের অপেক্ষা করেন না এরূপ লোক সমাজে অতি অল্প, কেবল উচ্চ লোক লইয়া সমাজ হয় না; প্রধানতঃ সামান্য লোক লইয়াই সমাজ। অধিকন্তু উক্ত শাস্ত্রশাসন কিছু সামান্য লোক সকলকে আধ্যাত্মিকরাজ্যের অধিকার হইতে একেবারে বিচ্যুত করেন নাই, গুণ অনুসারেই বর্ণ, কার্য্য অনুসারেই আশ্রম। যথাযোগ্য গুণ জন্মিলে নীচও উচ্চ হইতে পারেন এবং গুণভ্রষ্ট হইলে উচ্চও নীচ হইয়া থাকেন। যাঁহার যেরূপ কার্য্যে অধিকার তিনি সেইরূপ আশ্রমই অবলম্বন করিতে পারেন, তাহার কিছুমাত্র বাধা নাই। যে সমাজে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত সে সমাজে অসাম্য কোথায়, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। তবে যদি উচ্চ নীচ ভেদ উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত সমস্ত ভাঙ্গিয়া সমান না করিলে সাম্য না হয়, আমরা সেরূপ সাম্য প্রার্থনীয় বলি না। তাহাতে সমাজের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গলের সম্ভাবনা

অতি অল্প। অধিকন্তু কোন সমাজেই সেরূপ সাম্য প্রার্থনীয় হইতে পারে না। এই আর্য্য-সমাজে সেইরূপ সাম্য আনয়নের নিমিত্ত "আরও" কয়েকবার চেষ্টা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোনটিই ফলবতী হয় নাই। যাঁহাদিগের আত্মা উন্নত না হইলেও বংশমর্য্যাদার অভিমানী তাঁহাদিগের সেই অভিমান যদি নিতান্ত চক্ষুঃশূল হইয়া থাকে তবে তাঁহাদিগের সেই অভিমানটি বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতে গেলে চেষ্টা বিফল হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক; কিন্তু কৌশলে চেষ্টা সুসিদ্ধ হইবে। যাঁহারা বংশমর্য্যাদার অভিমানে অভিমানী তাঁহারা নিজের অভিমান লইয়াই থাকুন, আমরা তাঁহাদিগকে সে মর্য্যাদা প্রদান করিব না, বরং যাঁহারা তাদৃশ মর্য্যাদা পাইবার উপযুক্ত তাঁহাদিগকে সেই মর্য্যাদা প্রদান করা হউক, এইরূপ করিলে পুর্ব্বোক্তগণ আপনাদিগের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আপনারাই চেষ্টিত হইবেন। ফলতঃ এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে সমাজের সুমঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ সমাজ ক্রমে সেইরূপই হইয়াছে, বিশেষ চেষ্টাও করিতে হইবে না। কালবশে সকলই কালোপযোগিভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে মহাপুরুষগণ স্বকীয় চেষ্টা দ্বারা সেই পরিবর্ত্তন-স্রোত কিছু বর্দ্ধিত করিয়া দেন মাত্র। আর্য্যধর্ম্মে সাম্যের ন্যায় স্বাধীনতা ও অনুরাগেরও কিছুমাত্র খর্ব্বতা দৃষ্ট হয় না। যে ধর্ম্মে প্রকৃতির অধীনতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগের উপদেশ এবং যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র সর্ব্বভূতে আপনাকে ও আপনাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিবার উপদেশ, সে ধর্ম্মে যে স্বাধীনতা বা অনুরাগের আদর নাই, এ কথা নিতান্ত অযুক্ত। তবে যে সকল কারণে উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল কণ্টক উন্মূলন করার সম্বন্ধে বোধ হয় কোন সহৃদয় ব্যক্তিরই আপত্তি হইতে পারে না। এই ত গেল, এক সম্প্রদায়ের উত্তর। আবার অপর সম্প্রদায় যে বলেন, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, কালের স্রোত—প্রকৃতির গতি—অপ্রতিরোধ্য, অতএব উহার বিরুদ্ধে যত্ন করাও নিষ্ফল। এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে,—কোন একটি ফলে কীট দৃষ্ট হইলে কি বৃক্ষকে সমূলে ছেদন করিতে হইবে? বালক অশান্ত হইলে তাহার শাসন না করিয়া ধ্বংসের নিমিত্ত উপেক্ষা করিতে হইবে? বিশেষতঃ যে শাস্ত্রে কালের স্রোত অনিবার্য্য বলিতেছে, সেই শাস্ত্রই কি আবার উহার গতির প্রতিরোধের উপায় অবধারণ করিয়া দেন নাই?

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥"

এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে সর্ব্বদোষের আকরস্বরূপ কলিকালে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনেই জীব মুক্ত হয়েন বলিয়া দিয়া কি পূর্ব্বোক্ত অনিবার্য্য শব্দের দুর্নিবার্য্যত্ব অর্থ করিতেছে না?

যাহা হউক, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আজি ভারতরবি অস্তমিতপ্রায় এবং পাশ্চাত্যগগনে বিমল জ্ঞানশশধরের উজ্জ্বল করজাল দৃষ্ট হইতেছে। ভারতমাতা মলিনা ও খৃষ্টীয় জননী প্রফুল্লা। যে ভারতরবির

তেজে পাশ্চাত্য চন্দ্র তেজোময়; সেই ভারতের আকাশ আজি তিমিরাচ্ছন্ন। পাশ্চাত্য-গগনসমুদিত সুধাকর সুশীতল করনিকর বিতরণ করিয়া পৃথিবীকে শান্তি-দান করিতে উদ্যত। কি ভয়ঙ্কর দশা-বিপর্য্যয়!

সমুদ্রমেখলা ধরিত্রীর মধ্যে ভারতবর্ষ প্রকৃতির লীলাভূমি। উত্তরে হিমগিরি তুষারধবল অভ্রভেদী শৃঙ্গ সমুন্নত করিয়া মেদিনীমণ্ডলের মানদণ্ডের মত বিরাজমান; দক্ষিণে জলনিধি উত্তালতরঙ্গমালা প্রসারিত করিয়া স্মরণাতীত সময় হইতে নৃত্য করিতেছে; পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুনদ কলকল নাদে লহরীলীলা করিতে করিতে বারিধিবক্ষে অঙ্গ বিস্তার করিতেছে। ভারত প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি। প্রকৃতিতে যে কিছু সৌন্দর্য্য আছে, ভারতে তাহার কিছুরই অসদ্ভাব নাই। প্রকৃতি সমগ্র পৃথিবীর যে প্রদেশে যে ভাবে বিরাজিত, এই ভারতে প্রকৃতির সেই রূপ, সেই দৃশ্য, সেই চিত্র, সেই ভাবসমষ্টি বিরাজমান্। বিশ্বকর্ত্তা যেন স্বভাবের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ভাগে যথাযোগ্যভাবে অর্পণ করিয়া পরে ঐ সকল ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশে কি প্রকার শোভা হয়, দেখিবার জন্যই সমস্ত পৃথিবীর আদর্শস্বরূপে এই আর্য্যজাতির লীলাক্ষেত্র ভারতভূমিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতিতে এমত কোন বস্তু নাই, যাহা ভারতে দৃষ্ট হয় না। মৃদুলনাদিনী তরঙ্গিনী, হিমানীবিমণ্ডিত শৈলশিখরশ্রেণী, নন্দনকাননবিনিন্দিত বিকচকুসুমরাজিপরিশোভিত কুঞ্জকানন, বিস্তৃত হ্রদ, নয়নরঞ্জন নির্ঝরনিচয়, তপনতাপিত পবনপ্রবাহ, পান্থজনভীতিপ্রদ বিশাল মরুভূমি, শান্তিরসময় তপোবন, অত্যুচ্চপাদপপুঞ্জপরিবেষ্টিত অসংখ্যহিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ গহন কানন, ছয় ঋতুর ক্রমিক সমপরিবর্ত্তনজনিত প্রকৃতির মোহনভাব, এই সকল দৃশ্য একত্র ভারত ভিন্ন আর কোন স্থানেই নয়নপথে পতিত হয় না। ভারতভূমি বীরপ্রসবিনী, অষ্টাদশবিদ্যাবিলাসিনী, সভ্যতার খনি, জ্ঞানধর্ম্মবিজ্ঞানজননী, সর্ব্বরসপ্রবাহিনী এবং জীবহৃদয়বিনোদিনী। কিন্তু আজি ভারতের দশাবিপর্য্যয় উপস্থিত। কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে ভারতের অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির বাহ্য সৌন্দর্য্য সকলই রহিয়াছে, কিন্তু সে আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য আর নাই। সমতল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, তরঙ্গাহত পার্ব্বত্যপ্রান্তভূমি অস্রাকার পর্ব্বতসঙ্কীর্ণ প্রদেশ, পূর্ব্বাপরসাগরাবগাহী শৈলরাজি, বহুদূরপতনধ্বনিবিস্তারী জলপ্রপাত, ভীষণতরঙ্গান্দোলিতা কমলিনী, প্রশান্তসলিলা খরবেগা নদী, সুবর্ণকণিকাবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী, সুগন্ধনির্য্যাসনিঃসারি বিটপপূর্ণ মনোহর কানন, হিংস্রশ্বাপদাদিসঙ্কুল ভীষণ অরণ্য, নানাবিধ রত্নবিশিষ্ট ভূগর্ভ প্রভৃতি বাহ্য সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য সকলই রহিয়াছে, কিন্তু ভারতের আর সে পূর্ব্ব গুণগৌরব নাই। এই দশাবিপর্য্যয়ের একমাত্র কারণ, ধর্ম্মানুমোদিতভাবে সাম্য, স্বাধীনতা ও অনুরাগ বৃত্তির অপরিচালনা। ইহার একমাত্র কারণ, স্থূল প্রাকৃতিক ধর্ম্মকে এককালে পরিত্যাগ করিয়া কেবল এক সূক্ষ্ম

আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের অনুশীলন। স্থূল ধর্ম্ম সূক্ষ্ম ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। অঙ্গহীন কর্ম্ম যেরূপ ফলহীন হইয়া শোভমান হয় না, স্থূল প্রাকৃতিক ধর্ম্মকে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের বশীভূত বিবেচনা না করিয়া তাহাকে তুচ্ছ বোধে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের অনুশীলনে আর্য্যসমাজেরও সেই দশা ঘটিয়াছে। সত্য বটে, আধ্যাত্মিক ধর্ম্মই উন্নতির প্রধান কারণ, এবং প্রাকৃতিক ধর্ম্মই অবনতির সূত্রপাত করে। সত্য বটে, আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের বলেই ভারত এককালে উন্নত হইয়াছিল। সত্য বটে, কেবল প্রাকৃতিক ধর্ম্মের অনুশীলন পাশ্চাত্যগণকে এখনও সর্ব্বাঙ্গীন সুখশান্তি প্রদান করিতে পারিতেছে না। কিন্তু কেবল ঐ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মের অনুশীলনই কি ভারতকে পদদলিত করে নাই, এবং কেবল উক্ত অনুশীলন বশতঃই কি ভারতের ঐ অবনতি হয় নাই? সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্মকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া স্থূল প্রাকৃতিক ধর্ম্মের অনুশীলন বশতঃই কি পাশ্চাত্যগণ এখন পর্য্যন্ত সুখশান্তিলাভে বঞ্চিত নহেন? যদি তাহাই হয়, তবে উন্নতির জন্য মানবকে অবশ্য উভয়বিধ ধর্ম্মই অবলম্বন করিতে হইবে।

সত্য বটে, আর্য্যসমাজ অচলবৎ অটল; ইহা সহজে পতিত হইবার নহে। সত্য বটে, কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে ইহার উপর শত শত দুরন্ত প্রভঞ্জন ও সুকঠিন বজ্রের আঘাত লইয়া গিয়াছে, তথাপি ইহার ধ্বংস হয় নাই। সত্য বটে, কত শত প্লাবন ইহার বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত মগ্ন করিয়াও ইহাকে ভূমিস্যাৎ করিতে সমর্থ হয় নাই; ইহা যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া নিজের দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সত্য বটে, যে সকল উৎপাত অপর কত শত শত সমাজের বিলোপ সাধন করিয়াছে; তদ্রূপ উৎপাতে ইহার সহজে কিছুই হইবার নহে। সত্য বটে, ভারতমাতা নিজ পুত্র কবিগণের অপূর্ব্ব প্রতিভাপ্রসূত কাব্যনিচয় দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিত্বের জননী হইয়াছিলেন, মহামহা বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিৎ, ধনুর্ব্বিদ্যাবিৎ, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, অঙ্কশাস্ত্রসুনিপুণ আয়ুর্ব্বেদকুশল, সর্ব্ববিদ্যাবিচক্ষণ, জনগণের জননী হইয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। সত্য বটে, ভারতের বিচারকুশল দার্শনিকগণ সমস্ত পৃথিবীর দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষক হইয়াছিলেন। সত্য বটে, ভারত একদিন স্বীয় উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে সমস্ত জগৎ সমুদ্ভাসিত করিয়াছিল। কিন্তু কেবল সেই নষ্ট গৌরবের স্মৃতি কি ভারতকে উন্নত করিবে বা অবনতি হইতে রক্ষা করিতেছে? এক্ষণে যে যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে যে উপায়ে ভারতসন্তানগণ উন্নতি উপলের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই উপায় অধ্যাত্ম ও প্রাকৃত উভয়বিধ ধর্ম্মের অনুমোদিত ভাবে সাম্য, স্বাধীনতা ও অনুরাগবৃত্তির পরিচালন পুনর্ব্বার অবলম্বন ব্যতিরেকে ভারতের রক্ষা নাই। ভারত অচিরপতনোন্মুখ!!!

এই ভারত পূর্ব্বেও কয়েকবার এই প্রকার পতনোন্মুখ হইয়াছিল এবং ভগবানের অনুকম্পায় রক্ষিতও হইয়াছিল। যখন এই পৃথিবী অধর্ম্মের ভারে পরিপীড়িতা অত্যা-

চারিগণের অত্যাচারে রসাতল গমনোদ্যতা হয়, তখনই ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ইহার রক্ষাবিধান করিয়া থাকেন। কতিপয় শতাব্দী অতীত হইল, যখন এই ভারত যবন ও তান্ত্রিকগণের ঘোর অত্যাচারে প্রলয়োন্মুখ হইয়াছিল, তখন ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া উপদেশামৃত প্রদানে ইহার সঞ্জীবতা সম্পাদন করেন। এক্ষণে সেই সকল উপদেশ অবিকৃত ভাবে অনুশীলিত হইলেই ভারত পুনরুন্নত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্ত অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছিলেন,

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

আমি সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। লীলাময় পরমেশ্বরের অভিপ্রায় নিগূঢ় হইলেও, তিনি যে অবতারমাত্রেই পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাত্রয়ের কোন না কোনটি অবশ্যই প্রতিপালন করেন, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। ভগবান্ শ্রীমন্নরসিংহ অবতারে যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত সাধু প্রহ্লাদকে উদ্ধার করেন, অথবা বরাহ অবতারে যেরূপ দুষ্কৃত হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতারে সেরূপ কিছুই করেন নাই। সকল অবতারেই যে সকল প্রতিজ্ঞাই পালন করিতে হয়, এরূপ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপনরূপ তৃতীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ধর্ম্মসংস্থাপনরূপ অপৌরুষেয় কার্য্যই ভগবানের ভগবত্তার প্রধান পরিচায়ক। অসুরবধাদি অলৌকিক কার্য্য সকল পৌরুষেয় দৈহিক শক্তির বলে ও যোগাদির বলে পুরুষেও সাধন করিতে পারে, তবে সাধারণ মনুষ্য করিতে পারে না বলিয়াই উহা অলৌকিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্মসংস্থাপন অপৌরুষেয় কার্য্য; উহা মনুষ্যের শক্তিসাধ্য নহে। মনুষ্য ভ্রমাদিদোষদুষ্ট; সুতরাং তাঁহা দ্বারা অভ্রান্ত ধর্ম্মের সংস্থাপন হইতে পারে না। ধর্ম্ম স্বভাবতই ভ্রমাদিবহির্ভূত। ঐ ধর্ম্ম যদি মনুষ্য শক্তিতে সংস্থাপনীয় হইত, তাহা হইলে ভগবান্ স্বয়ংই বিশেষ করিয়া বলিতেন না যে,

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥"

যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই সময়ে আমি আমার স্বরূপকে আবির্ভূত করিয়া থাকি। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম কেবল আমা কর্ত্তৃক সংস্থাপনীয় এবং অধর্ম্ম কেবল আমা কর্ত্তৃক অপনেয়। এক্ষণে বিচার্য্য হইয়াছে, ঐ ধর্ম্মই বা কি এবং অধর্ম্মই বা কাহাকে বলে।

ধৃ ধাতু হইবে ধর্ম্ম শব্দের উৎপত্তি। ধৃ ধারণে বা পোষণে, এই নিরুক্ত হইতে এই পর্য্যন্ত অবগত হওয়া যায় যে, যে গুণ যে বস্তুর সত্তাকে পোষণ করে, সেই গুণই সেই বস্তুর ধর্ম্ম। ইহাই ধর্ম্ম শব্দের বৈজ্ঞানিক অর্থ। বস্তু অসংখ্য এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে। পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বের কোন বস্তুই ধর্ম্মবিহীন

নহে, কিন্তু বিশ্ব সংসারের নিখিল বস্তুর ধর্ম্ম আমাদিগের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। বিশ্বান্তর্গত মানবের ধর্ম্মই আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। বিশেষ করিয়া ধরিলে মানবের ধর্ম্মও অগণ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং বিচারসৌকর্য্যার্থ আমরা উক্ত মানব ধর্ম্ম-তত্ত্বকে চারি ভাগে বিভক্ত করিতেছি। ঐ চারিটি ধর্ম্ম এই,—জড়শরীরধর্ম্ম লিঙ্গশরীর-ধর্ম্ম, সমাজশরীরধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম। এই-রূপ বিভাগে ন্যূনতা হইতেছে না। কারণ, অপর সকল মানবধর্ম্মই উহাদের অবান্তর ধর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মচতুষ্টয়ের যথাবিধি পালনই ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং তাহাদিগের যথা-বিধি অপালনই অধর্ম্মাচরণ। শাস্ত্রও এই কথাই বলিতেছেন—

"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্ম অধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।"

বেদ শাস্ত্রে যে আশ্রমবিধি উক্ত হই-য়াছে তাহার পালনই ধর্ম্ম, এবং তদ্বিপর্য্যয় অর্থাৎ অপালনে অধর্ম্ম। বস্তুতঃ উক্ত ধর্ম্মের পালন হইলেই মানবের উন্নতি এবং তাহার অপালনেই অধোগতি হয়। অজ্ঞ মানব যাহাতে ধর্ম্ম আচরণ করেন ও ভ্রষ্ট না হন, এই নিমিত্ত করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহাদিগের করে অপৌরুষেয় আম্নায় শাস্ত্র প্রদান করিয়া-ছেন। উহাতে যাহা অনুষ্ঠেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম এবং তদ্বিপর্য্যয়ই অধর্ম্ম। ঐ বেদ শাস্ত্র জড়শরীর সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আয়ুর্ব্বেদ, লিঙ্গশরীর ধর্ম্মের উপকারার্থ সাংখ্যযোগাদি, সামাজিক ধর্ম্মের সুশৃঙ্খলার জন্য স্মৃতিশাস্ত্র ও আত্মার ধর্ম্মসমৃদ্ধির জন্য তন্ত্রশাস্ত্র বা ভক্তিবিজ্ঞান এবং উক্ত সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের সদাচরণের নিমিত্ত বেদার্থনির্ণায়ক বেদাঙ্গ প্রদান করিয়াছেন। শরীর সুরক্ষিত না হইলে, মনের শান্তি বা উন্নতি হয় না; শরীর ও মন স্বচ্ছন্দ ও পবিত্র না হইলে সমাজ রক্ষা হয় না; এবং শরীর, মন ও সমাজের সুরক্ষা না হইলে অধ্যাত্ম ধর্ম্মেরও রক্ষা হয় না; তদভাবে আত্মার উন্নতিও সংসাধিত হইতে পারে না। আত্মা অবিনশ্বর বলিয়া তাহার ধর্ম্মও নিত্য, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইলেও জড়রূপা মায়া কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়া জীবের যে অস্বরূপ আবেশ ঘটে, প্রাগুক্ত ধর্ম্মচতুষ্টয় সুষ্ঠু প্রতিপালিত না হইলে, তাহার নিবৃত্তি হয় না। ইহাও স্থির জানিতে হইবে। যদি তাহাই স্থির হইল, তবে ঐ অবস্থাতে ধর্ম্মের ফল নিত্য সুখও তাদৃশ জীবের পক্ষে সুলভ নহে, ইহাও অস্বীকার্য্য নহে। ফলতঃ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-বলে ইহাও জানিতে হইবে যে, যতদিন জড়শরীরধর্ম্ম লিঙ্গশরীরধর্ম্মের, জড়শরীর-ধর্ম্ম ও লিঙ্গশরীরধর্ম্ম সমাজশরীরধর্ম্মের এবং জড়-লিঙ্গ-সমাজ-শরীর-ধর্ম্ম আত্মার সহজ ভক্তিধর্ম্মের অনুগত না হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ঐ সকল পৃথকভাবে সুষ্ঠু আচ-রিত হইলেও তাহারা অধর্ম্ম মধ্যে পরি-গণিত হইবে। কালমাহাত্ম্যে তাহাই ঘটিয়া থাকে এবং ঘটিতেছে। মনুষ্য সকল জড়শরীরধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া অন্নপানাদি দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধনেই ব্যস্ত; পরমে-শ্বরকে ভুলিয়া যাইতেছেন। আয়ুর্ব্বেদই একমাত্র বেদ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে; অপরাপর উচ্চ তত্ত্বের অনুসন্ধান বিলুপ্ত প্রায়। কেহ বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে উচ্চ হইয়া মানসতত্ত্বের উন্নতি সাধনার্থ

সাঙ্খ্যন্যায়াদি আলোচনা করিতে করিতে ভগবদ্ভক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। কেহ বা সমাজধর্ম্মের অনুগত হইয়া আশ্রমসুখ-সাধনার্থ ব্যতিব্যস্ত। তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইতেছেন। কেহ বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া আত্মাকে আশ্রয় করিলেন, কিন্তু আত্মার স্বভাবসিদ্ধ অর্থাৎ সহজ ধর্ম্ম ভক্তিকে অবহেলা করিয়া দুরন্ত মায়াবাদ-মহান্ধকারে বা নাস্তিকতারই অন্যতম আকার স্বরূপ অদ্বৈতগর্ত্তে নিপতিত হইতে চলিলেন। ইহারই নাম ধর্ম্ম বিপর্য্যয়। এবং ঐ সকল ধর্ম্মের পরস্পরবিরোধি বেদাদি-শাস্ত্রবচন অনুসারে আচরণ করার নামই অধর্ম্মাচরণ। বস্তুতঃ উক্ত ধর্ম্ম চতুষ্টয়ের পরস্পর অবিরোধে সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তিই ধর্ম্মের লক্ষণ এবং উহাদিগের পরস্পর উপমর্দ্দন জন্য দশাবিপর্য্যয় অধর্ম্মের সূচক। পাছে উহারা একে অন্যের বিরোধে সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে, এই কারণে ভগবান্ বেদাদিশাস্ত্রে সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে আত্মোন্নতি সাধক দুইটি মার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধিকারীভেদে অবলম্বনীয় উক্ত মার্গদ্বয়ই মনুষ্যের ধর্ম্মের সাধক। উক্ত মার্গদ্বয়ের একটির নাম প্রবৃত্তি মার্গ এবং অপরটির নাম নিবৃত্তিমার্গ। উক্ত মার্গদ্বয়ের একটি অপরটির বাধক নহে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে এবং নিবৃত্তি প্রবৃত্তিকে বাধা দেন না। প্রবৃত্তিমার্গের অধিকারী প্রবৃত্তিমার্গকে অবলম্বন করিলে নিবৃত্তি-মার্গ তাহার উত্তরসাধক হয় এবং নিবৃত্তি মার্গের অধিকারী নিবৃত্তিমার্গকে আশ্রয় করিবার পুর্ব্বে প্রবৃত্তি তাহার পূর্ব্ব-সাধক হয়। এইরূপ বরং একটি অপরটির সহায়তা করিয়া থাকে। কিন্তু লক্ষণ যদি স্থির না থাকে, তবে লক্ষ্য স্থির হয় না। এবং একটি অপরটির উপমর্দ্দক হইয়া উঠে। শাস্ত্রে বলিয়াছেন, যিনি যেরূপ অধিকারী হন না কেন, উদ্দেশ্য স্থির থাকা চাই। উদ্দেশ্য স্থির থাকিলে যে কোন বর্ণ যে কোন আশ্রম হউক না কেন, আমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতে পারে না।

বেদশাস্ত্রে যদিও নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনই মানব জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য উক্ত হইয়াছে, তথাপি নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনের অধিকার না জন্মিলে তন্মার্গ আশ্রয় সম্বন্ধে শাস্ত্র কিছুমাত্র উপদেশ করেন না। বস্তুতঃ নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী হইতে হইলে প্রথমতঃ প্রবৃত্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রবৃত্তিমার্গবিহিত কর্ম্ম সকল আচরণ করিতে করিতেই নিবৃত্তি মার্গ প্রয়ানের অধিকারী হওয়া যায়। যদিও কোন মহাত্মাকে প্রবৃত্তিমার্গের বিচরণ না করিয়াই নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী হইতে দেখা যায়; কিন্তু ঐরূপ মহাপুরুষের সংখ্যা এত অল্প যে, তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করা যায় না। ফলতঃ শাস্ত্রতাৎপর্য্যও অধিকারী বিবেচনা-তেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব প্রবৃত্তি-মার্গ হইতে নিবৃত্তিমার্গে আরোহণ করিবার সোপান স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ই মানবের আশ্রয়ণীয় হইতেছে। আশ্রম সমূ-হের ধর্ম্মও বেদাদিশাস্ত্রে এরূপ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, তদবলম্বনে ও তদনুরূপ

আচরণে নিবৃত্তিমার্গারোহণের পক্ষে বিশেষ সুযোগ ঘটিয়া থাকে। কেহ কেহ যে তদারোহণকালে স্খলিতপদ হইয়া অধঃপতিত বা অপমার্গে নীত হন, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্মের যথাবিধি অপালনই তাহার কারণ। যে ব্যক্তি যথাবিধি বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে কোন ব্যাঘাতই উপস্থিত হয় না। তিনি নিখিল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক যথাকালে অবলম্বনীয় পথ প্রাপ্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। গন্তব্য পথ তাঁহার পক্ষে আর কণ্টকাকীর্ণ স্বরূপে অনুভূত না হইয়া বরং সুপথরূপে প্রতীত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শশি-প্রভা।

(১)

সুবিমল চন্দ্রের কিরণ।
সুনীল গগণ গায়, তারকা হীরক প্রায়,
নীলাম্বু মাঝারে শোভে মুকুতা যেমন,
কিবা রূপ অপরূপ ধাতার সৃজন॥

(২)

সুবিমল চন্দ্রের কিরণ।
শিশুর বিশদ হাস, বিমল শশির ভাস,
কোমল জননী কোলে, সুলভ যখন,
"চাঁদ আয় চাঁদ আয়"—স্নেহ-সম্ভাষণ॥

(৩)

সুবিমল চন্দ্রের কিরণ।
প্রণয়ের সম্মিলন, প্রণয়ের আলিঙ্গন,
প্রণয়ের সম্ভাষণ, সুখদ যেমন—
প্রেমিকের প্রেম-চক্ষে সোণার স্বপন॥

(৪)

সুবিমল চন্দ্রের কিরণ।
বিয়োগ-বিধুরা বালা, নেহারি চকোর-খেলা,
শশি-সনে সঙ্গোপনে করে আলাপন;
দগ্ধ-প্রাণ যায় যবে শীত প্রলেপন॥

(৫)

সুবিমল চন্দ্রের কিরণ।
বসিয়া তমাল-তলে, কল্পনা-কুহক-বলে,
একে একে পূর্ব্ব-কথা দেয় দরশন,
স্মৃতি-দ্বার খুলে যবে প্রবাসীর মন॥

(৬)

সুবিমল চন্দ্রের কিরণ।
রণ-রঙ্গ অবসান, সেনানী গাইছে গান,
শিবির কান্তারে উঠে মধুর নিক্কণ,
জ্ঞান হয় প্রেত-ভূমে মায়ার সৃজন॥

(৭)

সুবিমল চন্দ্রের কিরণ।
সমর-প্রাঙ্গণ-কায়, লোহিত সমুদ্র প্রায়,
ভাসমান শ্বেত-দ্বীপ শিবির গঠন,
আভায় আভায় মিল—নয়ন-মোহন॥

(৮)

সুবিমল চন্দ্রের কিরণ।
'তুঙ্গ শৃঙ্গ গিরি'পর, যোগাসনে যোগীবর,
ধ্যানে মগ্ন—জ্ঞান-চক্ষু করি উন্মীলন,
হেরে কিবা অপরূপ সুধাংশু-কিরণ॥

শ্রীপ্রঃ।—

তাম্রলিপ্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তাম্রলিপ্তি রাজ্য এবং উহার অভ্যন্তরস্থিত তন্নাম্নী সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী মহানগরী উভয়ই অতীব প্রাচীন,— ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের সাহায্যে তাহা প্রমাণ করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; এবং তমোলুক যে, প্রাচীন কালের সাগর-তীরস্থিত সমৃদ্ধিশালী মহানগরী তাম্রলিপ্তির আধুনিক হীন-পরিণতি, তাহাও প্রতিপন্ন করিতে বোধ হয় আমরা অকৃতকার্য্য হই নাই। বরনগরী তাম্রলিপ্তি বহু পুরাকাল হইতে একটি প্রথিত নামা তীর্থস্থান বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত স্থান যে একটি সিদ্ধপীঠ বলিয়া পরিগণিত,তৎসম্বন্ধে পুরাণাদি হইতে আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, নিম্নে তাহা সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণ, শাস্ত্রীয় অন্যান্য গ্রন্থ এবং অপরাপর পুস্তকাদিতে স্থানে স্থানে তাম্রলিপ্তি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ব্রহ্মপুরাণেই উক্ত স্থানের বিষয় বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই হেতু পাঠকদিগের জ্ঞাতার্থ আমরা উক্ত পুরাণ হইতে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

দেবাদিদেব মহাদেব ব্রহ্মার তনয় দক্ষ প্রজাপতিকে নিহত করেন। ব্রহ্ম হত্যা বশতঃ দক্ষ-শরীর-বিশ্লিষ্ট মস্তক মহাদেবের পাণিসংস্পৃষ্ট হইয়া যায়,—যোগীশ্বর উহা কোন প্রকারেই স্বীয় করপল্লব হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর কি উপায়ে ঐ শিরঃ হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, এই বিষয়ের পরামর্শ লইবার অভিপ্রায়ে শূলপাণি অমরবৃন্দের সমীপে উপনীত হইলেন। দেবতাগণ তাঁহাকে পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থ পরিদর্শন করিতে যুক্তি প্রদান করেন। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণ হইতে শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

> "পুরা দক্ষ বধে যস্মাৎ তৎশিরঃ স্বকরে শিব।
> দদর্শ তত্তয়াম্মোক্তুং তীর্থযাত্রাঞ্চকারবৈ॥"

অর্থাৎ—পূর্ব্বকালে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের পর দক্ষের মস্তক মহাদেবের হস্তে ছিল, সেই মস্তক দেখিয়া তিনি তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তীর্থ যাত্রা করিয়া ছিলেন।

এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া দেবাদিদেব মহাদেব সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিলেন, কিন্তু হায়! তথাপিও ঐ শিরঃ তাঁহার হস্তচ্যুত হইল না। অবশেষে শূলপাণি হিমাদ্রির অত্যুচ্চ শিখরদেশে উপবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ব্রহ্মপুরাণ এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

> "ভূতলে সর্ব্বতীর্থানি পর্য্যটন্ন বিনির্গতং।
> তস্মাত্তীর্থা হরোগত্বা স্থিতবান্ গিরিগহ্বরে॥"

অর্থাৎ—পৃথিবীস্থ সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়াও হস্ত হইতে শিরঃ বিমোচন হয় নাই, সেই ভয়ে মহাদেব গিরিগহ্বরে শয়ন করিয়া ছিলেন।

তদনন্তর বিষ্ণু মহাদেবের সম্মুখে

উপস্থিত হইলে শূলপাণি বিষ্ণুকে বলিয়া ছিলেন :—

"ত্বয়া জ্যপ্তং পুরা যস্মাৎ কর্ত্তুং তীর্থাটনং ময়া।
কৃতং তীর্থাটনং তস্মাৎ কস্মাৎ পাপান হ্রয়তে॥"

আপনি (বিষ্ণু) পূর্ব্বে আমাকে সকল তীর্থ ভ্রমণ করিতে বলিলে আমি সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু ঐ পাপ হইতে কেনই বা বিমুক্ত হইলাম না?

ভগবান্ বলিলেন :—

"অহং তে কথয়িষ্যামি যত্র নশ্যতি পাতকং।
তত্র গত্বা ক্ষণান্মুক্তঃ পাপাত্তর্গ ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ—যেখানে গমন করিলে জীব ক্ষণকাল মধ্যে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং সকল পাপ বিনষ্ট হয়, তোমায় সে স্থানের মাহাত্ম্য বলিব।

এই বলিয়া ভগবান সেই স্থানের মাহাত্ম্য এই রূপে বর্ণনা করিতেছেন :—

"অস্তি ভারতবর্ষস্য দক্ষিণস্যা মহাপুরী,
তমোলিপ্তা সমাখ্যাতং গূঢ় তীর্থ বরং বসেৎ।
তত্র স্নাত্বা চিরাদেব সম্যগেষ্যসি মৎপুরীং
জগাম তীর্থরাজস্য দর্শনার্থং মহাশয়ঃ॥"

অর্থাৎ—ভারতবর্ষের দক্ষিণে তমোলিপ্ত নামে মহাতীর্থ আছে, তাহাতে গূঢ় তীর্থ বাস করে। সেখানে স্নান করিলে লোক বৈকুণ্ঠ গমন করে। অতএব মহাশয় আপনি তীর্থরাজের দর্শনের নিমিত্ত গমন করুন।

দেবাদিদেব ইহা শ্রবণ মাত্রেই তাম্রলিপ্তাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বর্গভীমা এবং জিষ্ণু-নারায়ণের [illegible] মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র সরসী নীরে [illegible] [illegible]লেন। স্নানান্তে দক্ষ-শিরঃ তাঁহার পাণি হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল।

এই সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা :—

"পুরীং প্রবিশ্যাথ বিলোকনাশ্রয়ং জলাশয় স্যান্ত-
জগাম সন্নিধিং।
সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণতিং বিধায়ম্পর্শাৎ শিরোভূমিতলং
জগাম॥
ভ্রষ্টং শিরঃ সমালোক্য সর্ব্বঃ সর্ব্বগতিং হরিং।
প্রণম্য মনসা স্নাত্বা বিষ্ণু মূর্ত্তিম লোকয়ৎ॥"

অর্থাৎ—অনন্তর ভর্গপুরী প্রবেশ পূর্ব্বক শীঘ্র জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে হস্ত হইতে শিরঃ পতিত হইল। কর কমল হইতে মস্তক বিমুক্ত হইলে তিনি সকলের উদ্ধারকারক যে বিষ্ণু তাঁহার দর্শন করিয়া ছিলেন।

সেই অবধি এই স্থান—কথিত ক্ষুদ্র সরোবর—"কপাল মোচন" নামে অভিহিত হইতে থাকে, এবং তাম্রলিপ্তি একটি প্রধান তীর্থ স্থান মধ্যে পরিগণিত হয়।

পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—

"পাপাদ্ যস্মাৎ বিমুক্তোঽস্মি যস্মান্মুক্তং করাৎ শিরঃ।
কপাল মোচনং নাম তস্মাদেব ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ—এখানে পাপ হইতে এবং হস্ত হইতে শিরঃ মুক্ত হইল, অতএব ইহার নাম "কপাল মোচন" হইবে। মহাদেব এইরূপ বলিয়া ছিলেন ;—

"কপাল মোচনে স্নাত্বা মুখং দৃষ্টা জগৎপতেঃ।
বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।'

অর্থাৎ—কপাল মোচনে (তমোলিপ্তের জলাশয়ে) স্নান করিয়া জগৎ পতির ও বর্গভীমার মুখ দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

তাম্রলিপ্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নারায়ণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"ইতি সর্ব্বেষু কালেষু যুগেষু সবিশেষতঃ।
তমোলিপ্তাৎ পরং স্থানং হরেরক্তং নবিদ্যতে॥"

অর্থাৎ—নারায়ণ বলিয়াছিলেন যে, তমোলিপ্ত অপেক্ষা, সকল কালে (বিশেষ কোন কোন যুগে) কোন তীর্থই শ্রেষ্ঠ নহে।

কাল সহকারে রূপনারায়ণ নদের স্রোতঃ প্রবাহে উপর্য্যুক্ত স্থলটি (কপাল মোচন নামক সরোবর) বিলুপ্ত হইয়াছে। পুরাকালে যে স্থানে প্রাচীন জিষ্ণু-নারায়ণের মন্দির দণ্ডায়মান ছিল,—যে স্থল এক্ষণে নদীগর্ভে নিহিত—তথায় অদ্যাপিও বারুণী উৎসবে পুণ্য সঞ্চয়াভিলাষে জনগণ অবগাহন করিয়া থাকে। তমোলুকে প্রতি-বৎসর মাঘীপূর্ণিমা, পৌষ সংক্রান্তি, অক্ষয় তৃতীয়া এবং বৈশাখী সংক্রান্তি, এই চারি বার মেলা হইয়া থাকে।

"কপাল মোচন" সম্বন্ধে অনেকটা গোল-যোগ ঘটিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; যে-হেতু ভারতভূমে এতন্নামক অনেকগুলি তীর্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তান্তর্গত "কপালমোচনের" বিষয় যাহা উপরে কথিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ আমরা ব্রহ্মপুরাণে দেখিতে পাই। ইহা ব্যতীত স্কন্দপুরাণান্তর্গত উপ-পুরাণ গুলিতে,—কুরুক্ষেত্র মাহাত্মের মতে কুরুক্ষেত্র-মধ্যে একটি, প্রভাস খণ্ডের মতে গুজ্রাটের মধ্যবর্ত্তী প্রভাস তীর্থের মধ্যে একটি, রেবাখণ্ডোক্ত রেবাতীরে একটি এবং উৎকল-খণ্ডের মতে উৎকল দেশে একটি উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়।[১৯] উৎকল দেশান্ত-র্গত সাতটি বিশেষ পবিত্র স্থানের বর্ণনা কপিলসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাতটির মধ্যে পঞ্চমটি "কপাল মোচন" নামক একটি দেবালয়। উক্ত সম্বন্ধে কপিল-সংহিতায় এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"কপাল মোচনো নাম লিঙ্গঃ সন্নিহিতঃ প্রভো।
তং দৃষ্ট্বা বিধিবদ্ভক্ত্যা ব্রহ্মহত্যা বিমুচ্যতে॥"

উপরোক্ত কয়েকটির মধ্যে যে কোন্ স্থানের "কপাল মোচন" প্রকৃত তাহা নির্ণয় করা অতীব সুকঠিন। এবং এইরূপ গোল-যোগ ঘটিবার কারণ অনুসন্ধান করিতেও আমাদিগকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। আমাদের দেশে অষ্টাদশখানি মহাপুরাণ আছে, এই মহাপুরাণগুলি আমা-দিগের অতীব ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সামগ্রী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই গুলির মধ্যে শ্রীমদ্ভা-গবত ও বিষ্ণুপুরাণ ব্যতীত কোনটি অবি-কৃত অবস্থায় নাই,—সকল গুলিই ন্যূনাধিক পরিমাণে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ এই দুই খানি মহাপুরাণের টীকা থাকা বশতঃ উহারা বিকৃত হইতে পারে নাই। অপরাপর পুরাণসকল টীকার অভাবে ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থসাধনের জন্য সময়ে সময়ে কল্পিত বচন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত বা সম্প্রদায় বিশেষের ইচ্ছানুসারে অংশ বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইবার বিষয়ে আমাদিগের সংশয়ের অনেক কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে এসিয়া-টিক সোসাইটি হইতে যে মার্কণ্ডেয় পুরাণ-খানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এমত কয়েকটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না যাহা গোস্বামিপাদগণকর্ত্তৃক মার্কণ্ডেয় পুরা-

[১৯] Vide CUNNINGHAM'S *Archeological Survey Reports*. Vols. xiv. & xv.

পোদ্ধৃত শ্লোকের সহিত ঐক্য আছে। পুরাণ যদি বিকৃত না হইত, তাহা হইলে এরূপ ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। অধিকন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ সংগ্রহ করিয়া পরস্পর মিলাইয়া দেখিলেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক নামের দুই খানি পুরাণ দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ব্রহ্মপুরাণে তাম্রলিপ্তি 'তমোলিপ্ত' নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহা উক্ত পুরাণ হইতে এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মপুরাণের অন্যান্য স্থলে এবং অপরাপর গ্রন্থেও ঐরূপ লিখিত হইয়াছে। বৈয়াকরণিকগণ তমোলিপ্তের এই রূপ সন্ধি করিয়া থাকেন :—তমসঃ+লিপ্ত=তমোলিপ্ত,—"তমস" শব্দে অন্ধকার অথবা পাপ এবং "লিপ্ত" শব্দার্থে জড়িত বা কলুষিত বুঝায়। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ তাঁহাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাম্রলিপ্তিকে "তাম্মোলিতি" নামে অভিহিত করিয়াছেন।[২০] সেণ্টজুলিয়ান (St. Julien) এবং জেনারেল কনিংহাম (General Cunningham) সাহেবদ্বয় বলেন যে, "তাম্মোলিতি" সংস্কৃত তাম্রলিপ্তির পালিভাষাস্থ পরিণতি মাত্র।

তাম্রলিপ্তির পবিত্রতা সম্বন্ধে হনূটার সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"প্রাচীন কাল হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের একটি কেন্দ্র ছিল বলিয়াই ভারতের স্থাপিত মতাবলম্বীদিগের—হিন্দুদিগের—চক্ষে এই স্থানটি অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। এইরূপ হইবার কারণানুসন্ধানে আমাদিগকে বিশেষ যত্ন স্বীকার করিতে হয় না; যেহেতু তমোলিপ্ত নামই তাহার বিশেষ পরিচায়ক। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে হিন্দুগণ তাঁহাদিগের চির ঘৃণ্য ও অপবিত্র নামের প্রকৃত অর্থকে সুবিধামত বিকৃত করিয়া উহাকে একটি সম্মানকর নামে পরিণত করিয়াছেন।"[২১]

হণ্টার সাহেবের পুস্তকদ্বয় হইতে উপরে যে অংশ অনুবাদাকারে উদ্ধৃত হইল, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য নিম্নে সন্নিবেশিত করা হইল :—

তাম্রলিপ্তি নগরী যে অতীব প্রাচীন স্থান ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; আর বোধ হয়, এই সিদ্ধান্ত কোন পক্ষই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যদিও এই মহানগরীর জন্মকাল নির্ণয় করা সুকঠিন, তথাচ স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতভূমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রচার হইবার পূর্ব্বেও এই স্থানের অস্তিত্ব—কেবল অস্তিত্ব নহে, মহত্বও ছিল বলিলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। যেহেতু মহাভারতেও তাম্রলিপ্তি হিন্দুভূপতিগণ-শাসিত একটি ক্ষমতাশালী হিন্দুরাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহার প্রমাণ দেখাইতে আমরা পূর্ব্বেই সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। অতএব

---

২০ Vide St. JULIEN's *Hiouen Thsang*.

২১ Vide *Statistical Account of Hugli, Midnapore & Howrah; & Orissa.* by W. W. HUNTER. Vol. II.

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেও এই স্থান প্রথিত ছিল। কিন্তু উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার সহকারে তাম্রলিপ্তি উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের করকবলিত ও ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। তৎপরে ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সহকারে তাম্রলিপ্তি পুনর্ব্বার হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাসনের অধীনে আনীত হয়। এক্ষণে তাম্রলিপ্তির পবিত্রতা সম্বন্ধে আমরা এইরূপ স্থির করিয়া থাকি :—পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞপোলক্ষে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরাট সেনাদল সমভিব্যাহারে তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হয়েন। তাৎকালিক হিন্দু নৃপতি শিখিধ্বজ তনয় তাম্রধ্বজ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়েন ইত্যাদি। তৎপরে যে যে ঘটনা হয় তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে সুতরাং এ স্থলে উহার পুনরুল্লেখ আবশ্যক নাই। পরে এই ঘটনার পর যখন ভক্তপ্রবর ভূপাল শিখিধ্বজ নরনারায়ণ-রূপী কৃষ্ণার্জ্জুনের সহবাসে থাকিবার অভিলাষে একটি সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া জিষ্ণু-নারায়ণরূপে উভয়ের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করেন। সম্ভবত এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মূর্ত্তিদ্বয়ের খ্যাতির ব্যাপ্তিসহকারে একটি প্রধান সিদ্ধস্থান বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জিষ্ণুনারায়ণের মূর্ত্তি অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং দেশ মধ্যে উহার খ্যাতি বিস্তৃত আছে। পরে যখন তাম্রলিপ্তি হিন্দুদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া বৌদ্ধদিগের আয়ত্তাধীনে আইসে, সেই সময়ে হিন্দুগণ "তাম্রলিপ্তি" শব্দকে বিকৃত করিয়া ঘৃণাসূচক নাম "তমোলিপ্তে"পরিণত করিয়া থাকিবেন। তাহার পর ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাজয় করিয়া উক্ত ধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেন। এইরূপ যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমশঃ পতন ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতে থাকে ব্রাহ্মণগণ ও শনৈঃ শনৈঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধান স্থানগুলিকে নিজ ধর্ম্ম-শাসনাধীন করিয়া আপনাদিগের প্রধান তীর্থ স্থানে পরিণত করিতে থাকেন। এই কৌশলে ব্রাহ্মণগণ কতকগুলি বৌদ্ধধর্ম্মকেন্দ্র স্বকীয় ধর্ম্মকেন্দ্র করিয়া সনায়াসে ও অল্পকাল মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণের মন বৌদ্ধমত হইতে ফিরাইয়া তাহাদিগের হৃদয়ে উক্ত ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাতে আমরা বলিতেছি না যে, এই একমাত্র উপায়ে ভারতবাসীগণের মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, অশিক্ষিত এবং সমাজের নিম্নস্তরান্তর্গত লোকসাধারণের মনের গতি-স্রোত এই উপায়ে প্রতি-প্রবাহিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"Looking, moreover, to the history of Buddhism in other parts of India, the way in which the Buddhist doctrine of the identity of the human soul with the divinity was appropriated by some of the Vedantists ; the Buddhist

belief of the sanctity of the *Bo* tree made a part of the Hindu religion; the repugnance to animal sacrifices taken up by the Vaishnavas; and Buddhist emblems, Buddhist temples, Buddhist sacred places, and Buddhist practices appropriated to Hindu usages; it is impossible to resist the conclusion that *Puri* was like *Gaya*, a place of Buddhist sanctity, and gradually converted into Hinduism."

যখন তাম্রলিপ্তি ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রান্তর্গত হইল, তখন তাঁহারা আপনাদিগের প্রদত্ত অপবিত্র-অর্থসূচক নাম "তমোলিপ্তের" ও পবিত্র অর্থ প্রদানে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে ক্রীড়ার সামগ্রীর ন্যায় অনেক সময়ে ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগের স্বার্থ সাধনের জন্য পুরাণগুলিকে স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সেইরূপ তমোলিপ্তকে পবিত্র অর্থে পরিণত করিবার জন্য শাস্ত্রমধ্যে কল্পিত বচন সংযোগ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাহাতেই এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"বিষ্ণু যখন কালীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অসুরাদি ধ্বংস করিতে করিতে অত্যন্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়াছিলেন, তাঁহার শরীর-বিনির্গত ঘর্ম্মবিন্দু এই স্থানে পতিত হয়। দেব-শরীর-নির্গত-ক্লেদ সংস্পর্শে তাম্রলিপ্তের পবিত্রতা সম্পাদিত হইয়াছে।"

তাম্রলিপ্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা আমরা অবিচ্ছিন্নরূপে একের পর একটি সংযোজন করিয়া আসিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সমূহের মধ্যে আরও দুই একটি বিষয় সংযোগ করিবার ইচ্ছা হয়; কিন্তু এক্ষণে ঐ গুলিকে উহাদিগের যথা স্থানে সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর নহে বলিয়াই ধারাবাহিকরূপে না হইলেও ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

সিদ্ধস্থান সমূহের বর্ণনা করিতে করিতে ব্রহ্মখণ্ড নামক প্রাচীন গ্রন্থ তাম্রলিপ্তি এবং বর্গভীমাদেবির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

'তাম্রলিপ্ত প্রদেশেচ বর্গভীমা বিরাজতে।' ২৩

তমোলুক অপেক্ষা উড়িষ্যা প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের আধিপত্য অধিক দিবস পর্য্যন্ত বিস্তার ছিল। চীনদেশীয় পরিব্রাজক তাঁহার পরিভ্রমণ কালে (৬২৯-৬৪৫) ও ঐরূপ অবস্থা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে হন্‌টার সাহেব যাহা বলিয়াছেন নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"Hiuen Tsiang when travelling, he saw in the south-west, Orissa was a stronghold of the Buddhist faith. But in the seaport of Tamluk, at the mouth of the Hugli the temples of the Brahman Gods were five times more numerous than the monasteries of the faithful." ২৪

ইতিহাস পাঠকদিগের অবিদিত নাই যে, পূর্ব্বকালে বাঙ্গালীজাতি নৌবিদ্যায়

২২ Vide *Antiquities of Orissa* Vol. II. p. 107. by Dr. Rajendralala Mitra.

২৩ ব্রহ্ম খণ্ড ২২ অধ্যায় ৯ম শ্লোক দেখ।

২৪ Vide *Imperial Gazetter of India*, p. 157. by Dr. W. W. Hunter.

বিশেষ পারদর্শী ছিলেন,—বাণিজ্যোপলক্ষে তাঁহারা নির্ভীক অন্তরে সমুদ্রহৃদয়ে বিচরণ করিতেন। প্রাচীন বাঙ্গালায় বাণিজ্য দ্বারা যে সকল নগরী খ্যাতিলাভ করে তন্মধ্যে তাম্রলিপ্তি, সুবর্ণগ্রাম এবং সপ্তগ্রাম সর্ব্বাগ্রগণ্যছিল। সিংহল, ভারত মহাসাগরের প্লাবমান দ্বীপপুঞ্জে এবং চীন প্রভৃতি অন্যান্য সুদূর-ব্যাপী জলনিধি দ্বারা ভারতভূমি হইতে বিশ্লিষ্ট দেশসমূহে যে সকল বঙ্গীয় নাবিকগণের অর্ণবতরী যাতায়াত করিত সেই সকল তাম্রলিপ্তি হইতেই কূল পরিত্যাগ করিত। এই স্থান হইতেই বৌদ্ধদিগের আধিপত্য সময়ে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য প্রদেশ নিচয়ে রণতরীর বহর (fleet) প্রেরিত হইত। ইহা ব্যতীত লোক সকল ভারত-সাগরান্তর্গত দ্বীপসমূহে যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে হন্‌টার সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"In the Buddhist era they sent warlike fleets to the east and west and colonized the Islands of Archipelago"[২৫]

অশোক নৃপতি সিংহলাধিপতির নিকট দূত প্রেরণ কালীন তাঁহার অর্ণবপোত এই স্থল হইতে সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিল।[২৬] কথাসরিৎসাগর বা বৃহৎকথা গ্রন্থে যে সমস্ত আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে একের ঘটনা স্থল তমোলুকে বলিয়া উল্লিখিত আছে।[২৭]

"পুরাণ বিশেষে বর্ণিত আছে, সত্যযুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভের ন্যায় দুর্গাসুর নামে এক মহাবল পরাক্রমশালী দৈত্যরাজ ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিয়া দেবগণকেও অনেকবার সমরে পরাজিত ও নানাপ্রকারে উৎপীড়িত করিয়াছিল। দেবগণ অনন্যোপায় ভাবিয়া ভগবতী কাত্যায়নীকে আরাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে, তিনি দৈত্যরাজের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সসৈন্যে তাহাকে বিনষ্ট করেন। সেই যুদ্ধে ভগবতী নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দৈত্যগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ যে দৈত্যকে বিনষ্ট করেন, সেই নামানুসারে সেই মূর্ত্তির নাম করণ করিয়া দেবতাবর্গ তাঁহাদিগের পূজা করিয়াছিলেন। যেরূপে দুর্দ্দান্ত দুর্গকে বিনষ্ট করাতে দুর্গানাম হইয়াছে, ভীম নামে জনৈক ভীমপরাক্রমশালী দিতিসুতের বিনাশ সাধন করিয়া ভগবতীর সেই প্রকার ভীমানাম হইয়াছিল। ভীমাদেবীর পূজাদির ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত প্রাচীন আর্য্যকুল সম্ভূত নৃপতিগণ যথেষ্ট পরিমাণে ভূসম্পত্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত এখনও অখণ্ডিতরূপে দেবীর অধিকারে রহিয়াছে।"[২৮]

"দেবীর উপাসক মহাশয়দিগের নিকট একখণ্ড পারস্যভাষায় লিখিত দলীল রহিয়াছে। ইহাকে তাঁহারা 'বাদসাহী পঞ্জ' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যখন দুরন্ত কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় বাসনায় এই দেশে

---

২৫ Vide HUNTER'S *Orissa* Vol. I.

২৬ Vide LETHBRIDGE'S *History of India*.

২৭ Vide *Education Gazette* of 20th May 1859,

২৮ শ্রীযুক্ত উমাচরণ অধিকারী প্রণীত "তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ" ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠা দেখ

আগমন করিয়াছিলেন, তিনি দেবীকে সন্দর্শনান্তে প্রীত হইয়া এই দলীল লিখিয়া দিয়াছিলেন।"[২৯]

নদী তীরে কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কূপশ্রেণী ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি স্তরে স্তরে শোভা পাইতেছে; কোন স্থানে বা মানবদেহের কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট মূর্ত্তি এরূপ ভাবে বসিয়া রহিয়াছে, যেন কোন যোগী পদ্মাসনে আসীন হইয়া মুদ্রিত নেত্রে ধ্যাননিমগ্ন হইয়া আপনার আত্মা পরমাত্মাতে লীন করিয়াছেন। তমলুকের প্রাচীন মনুষ্য মাত্রেরই এইরূপ বিশ্বাস যে, পূর্ব্বকালে এই নগরে সপ্ত শত ধনাঢ্য বণিকদিগের বাস ছিল। তাঁহারা ব্যবসায় ও বাণিজ্য দ্বারায় এতাদৃশ উন্নতাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন যে, সেই সময়ে এই নগরটি অট্টালিকাময় ও কূপাদিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নগরটি সমুদ্রের উপকূলে ছিল বলিয়া তাঁহারা সকলেই বিশুদ্ধ তোয়াভিলাষে কূপ খনন করিয়া রাখিতেন। নদীর ভাঙ্গনে এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি খননকালে যে অসংখ্য কূপ ও অট্টালিকার ভগ্নাবশিষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সেই সকলেই উপরোক্ত বিষয়ের যথেষ্ট পরিচায়ক। ইহা ব্যতীত এই স্থানের অনতিদূরে সরোবরাদি খনন করিলে, অর্ণবপোত ও তরণী সমূহের জীর্ণকাষ্ঠ প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

নগরের উত্তর সীমায় "খাটপুকুর" নামে একটি অতীব প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। এই রূপ কিম্বদন্তী যে, নরপতি তাম্রধ্বজ এই সুন্দর সরোবরটি খাত করিয়া উহার মধ্যে একটি ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নৃপতি পরিবার বর্গ সমভিব্যাহারে উহা প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, সহসা বারিরাশি সমুদ্গত হইয়া তাঁহাদিগকে নিমজ্জন করিয়া ফেলে। সরোবরের মধ্যস্থ অদ্যাপিও পরিদৃশ্যমান ইষ্টকবিনির্ম্মিত গৃহচূড়াবৎ সন্দর্শনে সাধারণ জনগণের অন্তরে উপরোক্ত সংস্কার বদ্ধমূল হয়। বিশেষতঃ জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী বিশেষ যত্নেও ঐ পুষ্করিণীর জল শোষিত করিতে সমর্থ না হওয়া প্রযুক্ত ঐ সংস্কার অধিকতর দৃঢ়ীভূত করিয়া তুলিয়াছে।

তমলুকের রজকগণ বহুকাল হইতে এক খানি প্রস্তর ফলককে নেতা রজকির প্রতিমূর্ত্তি মনে করিয়া অদ্যাপিও পূজা করিয়া থাকে। সেই জন্য অনেকের মনে বিশ্বাস যে, চম্পাই-নিবাসী চাঁদ সওদাগরের নব-বিবাহিতা পুত্র-বধূ বেহুলা বিবাহ রজনীতে সর্পদংশনে মৃত পতির শবকে কদলি-বৃক্ষ-বিনির্ম্মিত মান্দার (ভেলা) যোগে অসংখ্য গ্রাম ও নদী উত্তীর্ণ হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সংস্কারটি সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক, যে হেতু মনসার ভাসান নামক পুস্তক পাঠে এবং লোক পরম্পরাগত বাক্য শ্রবণে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয় যে, এই ঘটনা ত্রিবেণীতে সংঘটিত হইয়াছিল; এবং নেতার বাটী উক্ত স্থানেই ছিল।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

---

[২৯] "তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ ১৭ পৃঃ দেখ।

শান্তি।

বঙ্কিম বাবুর শেষ তিন খানি উপন্যাসের স্ত্রী-চরিত্র।

আমরা সর্ব্বপ্রথমে শান্তি-চরিত্রেরই ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শান্তির পূর্ব্ব পরিচয় বিশেষ একটা কিছুই আমরা প্রাপ্ত হই নাই। তবে স্থানে স্থানে যে দুই একটি কথা প্রাপ্ত হইয়াছি—তাহা জোড়াইয়া লইলে—শান্তির সামান্য পরিচয়টি এইরূপ হয়;—

শান্তি জীবানন্দের যুবতী সহধর্ম্মিণী—বয়স পঁচিশ বৎসর। তাহার রূপ অতুলনীয়া—গ্রন্থকারের কথাই বলি—যেমন মেঘ মধ্যে বিদ্যুৎ—যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দ মধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল। অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয় উন্নতভাব, অনির্ব্বচনীয় প্রেম, অনির্ব্বচনীয় ভক্তি। শান্তি জীবানন্দের কোন ব্রত বশতঃ স্বামী সহবাস বঞ্চিতা—ব্রহ্মচারিণী। ঘর বাড়ী ছাড়িয়া স্বামীর আবাস স্থল সন্নিকটে একখানি পর্ণকুটীরে শান্তি বাস করিত। অর্থ স্বত্বেও শান্তি ভাল কাপড়খানি পরিত না—মাথায় তেলটুকু মাখিত না। আর একটি কথা বলিয়া লইলেই শান্তির পূর্ব্ব পরিচয় শেষ হয়। শান্তি যত্ন করিয়া কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিল—আধুনিক বঙ্গনারীর ন্যায় আধুনিক নবেল নাটকের লেখা পড়া নহে—পুরাতন তুলটে পুঁথির কাব্য, সাহিত্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদির। বোধ হয় সে রূপরাশিতে যে অনির্ব্বচনীয় উন্নতভাব—প্রেম ভক্তি আমরা দেখিতে পাইয়াছি—তাহা এই তুলটে পুঁথিরই প্রসাদাৎ। হায় এ বিদ্যা কি এ দেশে আর উজ্জীবিতা হইবে না? পরে যখন গ্রন্থকার শান্তিকে আমাদিগের সম্মুখীন করিলেন—আমরা শান্তি চরিত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেরূপ দেখিতে লাগিলাম, এখন আমরা তাহাই বলিব।

আমরা প্রথমে দেখিলাম, জীবানন্দের ভগিনী শ্রীমতী নিমাইমণি জীবানন্দের নিকট শান্তিকে লইয়া যাইবার জন্য শান্তির মস্তকে অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল (অনেক দিনের রুক্ষ কেশ কি না) লইয়া মাখাইয়া দিতেছে। শান্তি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিতচিত্তে নিমাইয়ের চরিত্র সমালোচনা করিতেছে। কিন্তু বড় একটা আপত্তিও করিতেছে না—যেন রঙ্গ দেখিবার জন্যই চুপ করিয়া আছে। তার পরে যখন নিমাই আসল কথা খুলিয়া বলিল—শান্তির আর রঙ্গপিপাসা রহিল না—সে আর নিমাইর কথা মতে চলিতে রাজি হইল না। সেই শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন বসনেই শান্তি স্বামী সন্নিধানে উপস্থিত হইল। গিয়া দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষকাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। দেখিয়া শান্তি কাঁদিল না—জীবানন্দের হাত হাতে লইয়া বলিল;—

"ছি, কাঁদিও না, আমি জানি, তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, আমার জন্য তুমি কাঁদিও না—তুমি যে প্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।"

জীবানন্দ অনেক দুঃখ করিলেন—বলিলেন;—

"ব্রত ভঙ্গ হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জন্য ডাকি না, কিন্তু তোমায় দেখিয়া ত আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। * * * একদিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎ সংসার, এক দিকে ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ,সবই এক দিকে—আর এক দিকে তুমি। একা তুমি। আমি সকল সময়ে বুঝিতে পারি না যে, কোন দিক্ ভারি হয়। দেশ ত শান্তি, দেশ লইয়া আমি কি করিব? দেশের এক কাঠা ভুঁই পেলে তোমায় লইয়া আমি স্বর্গ প্রস্তুত করিতে পারি, আমার দেশে কাজ কি? * * * পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হইবে কি না, জানি না; কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবীর অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ। চল গৃহে যাই—আর আমি ফিরিব না।"

শান্তি কথা শুনিয়া কিছুকাল নীরব রহিলেন, পরে বলিলেন, "ছি—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভাল বাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম্ম কখন ত্যাগ করিও না। দেখ, আমাকে একটা কথা বলিয়া যাও—এ ব্রত ভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

শান্তি জীবানন্দের প্রায়শ্চিত্ত কি তাহা জানিতেন না তখন বুঝিলেন। পরে বলিলেন, "এক ভিক্ষা আছে। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।"

ইহাতে আমরা কি দেখিলাম? দেখিলাম যে শান্তির ধৈর্য্য, সংযম বা সহিষ্ণুতা রমণীজগতে অতুলনীয়া। সংযমী জীবানন্দ আজি শান্তির সম্মুখে বসিয়া তাঁহারই জন্য বালকের ন্যায় কাঁদিতেছেন—শান্তি তাহা দেখিয়া এক ফোঁটা চক্ষের জলও জীবানন্দকে দেখিতে দিলেন না। চক্ষের জল কি আসে নাই—কে বলিবে—ঐ নয়নপ্রান্তে পর্ব্বতনিঃসৃত, বহুদিনপ্রতিরুদ্ধ নির্ঝরিণী স্রোতের ন্যায় প্রবল বেগে যে বারিস্রোত নিঃসৃত হইবার জন্য বল প্রকাশ করিতেছিল—সে স্রোতের বল কে বুঝিবে? কিন্তু শান্তি তাহা ত বহিতে দিল না। অনুপমেয় সহিষ্ণুতা বলে শান্তি তাহা নয়নপ্রান্তেই অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। কারণ শান্তি জানিত—প্রেমিকা পত্নী মাত্রই ইহা জানে—যে সে স্রোতঃ বহিলে পর্ব্বতের ন্যায় পুরুষেরও ধৈর্য্য, প্রতিজ্ঞা সব ভাসিয়া যায়। যেখানে সেরূপ ভাসাইলে জীবানন্দের পক্ষে ধর্ম্মচ্যুতির সম্ভাবনা সেখানে শান্তি ত তাহা করিবেই না। দেখিলাম, শান্তি তাৎকালিক সুখ অপেক্ষা ভবিষ্যতের অনিষ্ট গুরু জ্ঞান করিল। কাঁদিতে পারিলে—ঐ ক্রন্দনশীল জীবানন্দের ক্রোড়োপরি মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে পারিলে—শান্তির যে স্বর্গ সুখ অপেক্ষাও অধিক সুখ হইত! সুখ হয় বলিয়াই ত ক্রন্দনের এত প্রলোভন। কিন্তু শান্তি দেখিল যে, সে সুখ অসার ও পরিণামে দুঃখজনক। তাই সামান্য প্রেমিকার ন্যায় শান্তি কাঁদিল না অথবা তাহার চক্ষের জল জীবানন্দকে দেখিতে দিল না। জ্ঞান প্রেমে যুক্ত হইয়া সামান্য প্রেম হইতে কত উচ্চে দাঁড়াইল।

দেখিলাম, শান্তি সামান্য কষ্টকে কষ্ট

বলিয়া গ্রাহ্য করে না। জীবানন্দ তাহাকে কত কষ্ট দিতেছেন - কিন্তু তবু শান্তি বলিল যে, "তুমি আমাকে যে প্রকারে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।" একি মিথ্যা কথা তাহা নহে। শান্তি জীবানন্দের ব্রত কথা জানিত—জীবানন্দের ঐরূপ কার্য্য যে ধর্ম্ম-সঙ্গত তাহা সে বিশ্বাস করিত, তাই সে ধর্ম্মনিরত স্বামীর ধর্ম্মজন্য আবশ্যকীয় কার্য্যে কষ্ট বোধ করিল না। তাহার নিকট স্বামীর প্রণয়-প্রাপ্তি অপেক্ষা স্বামীর ধর্ম্ম-চর্য্যায় সহায়তা অধিকতর সুখের বোধ হইল। দেখিলাম, শান্তি অপূর্ব্ব শিক্ষা বলে প্রলোভন জয় করিতে শিখিয়াছে। সে কি সামান্য প্রলোভন? রমণীর পক্ষে—পতি-প্রেমানুরতা রমণীর পক্ষে—সে যে দুর্জ্জয় অপরিহার্য্য প্রলোভন! বহুদিন স্বামীর সহিত দেখা নাই, বহুদিন স্বামী গৃহত্যাগী, সেই স্বামী ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে লইয়া ঘরকন্না করিতে চাহিতেছে—'একি সাধারণ প্রলোভন? সেই স্বামী আবার তাহাতেই একানুরতা—মৃত পতিকে ফিরাইয়া দিতে চাহিলে কোন্ সাধ্বী প্রেমিকা তাহাতে ইতস্ততঃ করিতে পারে? কিন্তু শান্তি এ প্রলোভনও দিব্য জ্ঞান বলে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন—"ছি—তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার বীর-ধর্ম্ম কখন ত্যাগ করিও না।" শান্তি স্বামীর প্রণয়সুখও চাহেন না—জীবানন্দ বরং শান্তিকে নাই ভালবাসিবে—হায় কোন্ রমণী অক্ষত হৃদয়ে ইহা মনেও স্থান দিতে পারে?—তবু তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করুন। ধন্য শান্তি—ধন্য জীবানন্দের সহধর্ম্মিণী। ধন্য তোমার অপূর্ব্ব শিক্ষা। মনুষ্য ত ইহাকেই সহধর্ম্মিণী বলে। পাঠক এখন, একবার রমাকে মনে কর দেখি—রমার সেই প্যান প্যান ভ্যান ভ্যান ভাব কল্পনা কর দেখি—শিক্ষার পার্থক্য বুঝিতে পারিবে। অথবা অতদূরই বা যাইতে হইবে কেন—তুমি যদি অল্প বেতনের কোন চাকুরে হও বা উচ্চ শ্রেণীস্থ কোন স্কুলের ছাত্র হও—স্বামী সহ-বাস সুখের জন্য সাধ্বী পত্নীও কিরূপে স্বামীর কর্ত্তব্যপথে বাধা জন্মাইতে পারে, তাহা সহজেই ভাবিয়া দেখিতে পারিবে। আবার ইহাতে বড় একটা সুন্দর রহস্যও আছে। সেই যে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে স্ত্রীর বাধা প্রদান—তা আবার বড়ই সুন্দর একটী মোহকর আবরণে আবৃত। সব সময়ে তাহা ভেদ করিয়া আসল বুঝা যায় না। রমার সেইরূপ ভাবে কি আমাদিগের মনে আনন্দ বই আর কিছু উদিত হয়? সে সময়ে আমরা রমণীগণের প্রেমপ্রাবল্য দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া পড়ি—তাহাই জগতের শ্রেষ্ঠ জিনিস বলিয়া বিবেচনা করি। বস্তুতঃও তাহা যে মন্দ, এরূপ নহে। তবে তাহারও উৎকর্ষ আছে। অকৃত্রিম প্রণয় ত আদরের জিনিস—কিন্তু জ্ঞানদ্বারা যদি তাহা মার্জ্জিত না হয়, তবে তাহা বিশ্লেষণ করিলে স্বার্থ প্রভৃতি কতকগুলি নিন্দিত ভাবের সূক্ষ্ম চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। শান্তির প্রণয়ে ইহা ছিল না। একেবারে ছিল না বলিলে শান্তিকে প্রশংসাই করা হয় না। ছিল—নতুবা শান্তি জীবানন্দের কথাগুলি শুনিয়া কিছু

কাল কথা কহিতে পারিলেন না কেন? তাহাতেই যেন তাহার মনের ইতস্ততঃ ভাবটা দেখিতে কবি আমাদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। তাহা ত থাকিবেই—নতুবা শান্তির জ্ঞানের পরিচয় অপূর্ব্ব জ্ঞান বলে সেই অকৃত্রিম কিন্তু অমার্জ্জিত প্রণয়ের শোধিত ভাব আমরা কিসে পাইতাম? প্রলোভন যদি অন্য রমণীর ন্যায় শান্তি অনুভব করিতে না পারিত, তবে তাহার বাক্যে আমরা এত প্রশংসা করিব কেন?

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়।

সরযূ।

১

কে তুমি লো পাগলিনি! এ মহা শ্মশান পরে
একাকিনী চলেছ গাহিয়া?
আন মনে বল বল, অবিরল কার তরে,
দিবানিশি বেড়াও কাঁদিয়া?

২

অনন্ত সমাধি পরে বিংশতি কোটী চিতা—
কারে তুমি কর অন্বেষণ?
কার ভস্মরাশি পরে অশ্রু বরষিতে হেথা
আসিয়াছ করিয়া মনন?

৩

শত শত যুগান্তের গলিত এ শবরাশি
ধূলিসার শ্মশানে পতিত?
শকুনি গৃধিনী কুল, দূর দূরান্তর বাসী,
চর্ম্ম-অস্থি রুধির শোষিত।

৪

কোথা হতে পাগলিনি! হেন সুমধুর গাথা
শিখিলি তা' আজিও স্মরণ
আছেরে কেমনে তোর, আর্য্যের গৌরব কথা—
অতীতের সুখের স্বপন!

৫

রঘুকুল পুরবধূ　　　　চরণ নুপুর রব
আজ (ও) কিলো বাজে তোর কাণে?
ডাকিস্ আদরে তাই　　　　পূর্ব্ব সহচরী সব
অবিরাম আকুল পরাণে!

৬

অথবা যে পুরাকালে　　　　শুনাইল মহামুনি
মহাদেব সঙ্গীতের তান,
দিবানিশি পড়ে মনে,　　　　তাই তোর মুখে শুনি
মোহময় স্বপ্নময় গান!

৭

অথবা গো কবি গুরু　　　　বীণার ঝঙ্কার তোর
আধ আছে লাগিয়া শ্রবণে?
পাগলিনি! তাই বুঝি আজ (ও) সেই ভাবে ভোর—
গেয়ে যাস্ আপনার মনে!

৮

অরণ্যে রোদন হায়!　　　　ভস্ম বিনা নাহি আর
কিছু এই শ্মশান মাঝারে;
হারানো রতন রাশি　　　　ভস্মমাত্র আজি সার
পড়ি দেখ ওই স্তূপাকারে।

৯

কি ফল কাঁদিয়া তবে　　　　বহিয়া এ ভগ্নশেষ
মুছে ফেল শ্মশান অঙ্গার—
অতল জলধি জলে　　　　লুকাও চিহ্নের লেশ—
এ ভারতে আসিও না আর।

শ্রীমন্মথনাথ দে।

কেনারাম সরকার।

[কোন ঠগী গোয়েন্দার নিজ মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, অবিকল তাহাই বিবৃত করিব।]

মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রতীমা সম্পাদক মহাশয়।

মহাশয়!

এইক্ষণ প্রাচীন হইয়াছি, এখন কোন প্রকার দুষ্কার্য্য করিতে হৃদয় স্তম্ভিত, হস্ত কম্পিত হয়। কিন্তু যৌবনাবস্থায় কত কল কৌশলে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, কত লোকের জীবন বিনাশের কারণ হইয়াছি, কত লোককে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করাইয়াছি, আপনারা সেই বিবরণ শুনিলে কি সুখী হইবেন?

আমার পিতা মেদিনীপুর জেলার ঠগী কমিসনার আপিসে আমলাগিরি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। চোর ডাকাত বদমায়েস লইয়াই যে তাঁহার কারবার ছিল তাহা ত বুঝিতেই পারিতেছেন। গোয়েন্দাগুলোতো পুরা বদমায়েস, ডাকাত;—ডাকাতের সাহায্য ভিন্ন কি ডাকাত ধরা যায়?

আমি বাল্যাবস্থায় পিতার নিকটেই অবস্থিতি করিতাম, সর্ব্বদা যে সকল লোকের সংসর্গে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলাম, তাহার বিশেষ পরিচয় কি দিব? দুষ্ট লোকের সংসর্গে আমার বুদ্ধি দিন দিন বলবতী হইতে লাগিল। যখন আমার বয়ঃক্রম ৭।৮ বৎসর তৎকালীন একটী সামান্য ঘটনা বলিলেই আপনারা আমার বুদ্ধি বিদ্যার যৎসামান্য পরিচয় পাইবেন। আমার প্রথম শিক্ষা মেদিনীপুরেই আরম্ভ হয়, আমি গুরুমহাশয়ের পাঠশালেই প্রথম শিক্ষার জন্য প্রেরিত হই। পিতা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, সুতরাং সর্ব্বদা আমার তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিতেন না। গুরুমহাশয়ের নিকটেই কিছুকাল লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

আমাদিগের বাসার নিকটে এক ঘর ময়রা ছিল, তাহাদিগের মিঠাই সন্দেশের দোকান ছিল, পিতা দোকানদারকে বলিয়া দিলেন, আমাকে যেন প্রতিদিন ৴১০ দুই পয়সার জলখাবার দেয়, তিনি মাস্কাবারে একবারে দাম চুকাইয়া দিবেন স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু দু পয়সার অধিক দিতে নিষেধ করিলেন। আমি দেখিলাম দু পয়সায় কিছুই হয় না।

ময়রার নিকটে অধিক চাহিলেই বা সে দিবে কেন? আমি এক দিন মনে মনে এইরূপ স্থির করিলাম, উহারা ত সমস্ত দিনের মধ্যে ২।৩ জন লোকে বিক্রয় করে। আমি ২।৩ টার সময় একটা বুড়ীর নিকটে ৴১০ দুই পয়সার, তৎপরে দুই ঘণ্টার পরে আর এক লোকের নিকটে, কিছুক্ষণ পরে তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে, আর দু পয়সার জলখাবার লইয়া ভক্ষণ করিলাম। আমি প্রতিদিন অতি সতর্কতার সহিত ময়রাদিগের নিকটে এই রূপে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করি, কিন্তু হিসাবে যে দুই পয়সা সেই দুই পয়সা লেখা হইতে লাগিল। এইরূপে প্রায় দুই

মাস ঠকাইয়া শেষে এক দিন ধরা পড়িলাম। পিতা সমস্ত বিবরণ ক্রমশঃ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমার পুত্র হয় একজন ভাল ডিটেক্‌টিব হইবে, না হয় একজন বড় ডাকাত হইবে।"

ফলতঃ আমার বিদ্যা বুদ্ধি এই রূপেই দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ আমি যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলাম। পিতার যত্নে ও পিতৃবন্ধুদিগের আনুকূল্যে পুলিশে ১৫৲ টাকা বেতনে আমার একটি চাকুরি হইল। পুলিশের কার্য্য করিতে যে সকলগুণের আবশ্যক আমাতে তাহার বড় অভাব ছিল না। আমি দৌড়িতে পারি, হাঁটিতে পারি, ঘোড়ায় চড়িতে পারি, একটি মিথ্যা ঘটনা ঠিক সত্যের আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া লোকের মনে ধাঁধাঁ লাগাইতে পারি। যে যেমত লোক তাহার সহিত তদ্রূপ কথা কহিতে পারি। নিরীহ ভদ্র লোককে সহসা চড়া ও কড়া কথায় অপমান করিতে পারি। দুষ্ট লোককে মিষ্ট কথায় মোহিত করিতে পারি, চোরের সহিত চোর ও মাতালের সহিত মাতাল সাজিতে পারি।

মিথ্যা কথা মিথ্যা ব্যবহার করিয়া আমার মনে অণুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না। ভাবি এক-রকম, করি অন্য রকম, আর বলি ভিন্ন প্রকার। এই গুণ আমাতে যথেষ্ট পরিমাণেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ আমার ইংরেজ প্রভু কর্ণেল বড় সাহেবের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলাম। আমি যে কার্য্যে যাই, কোন রূপেই তাহার একটা না একটা উপায় না করিয়া আমি কখনই পরাঙ্মুখ হইতাম না। ফলতঃ দুষ্কার্য্য করিয়া কিংবা মিথ্যা কথা বলিয়া মনে যে একট অনুতাপ কি আত্মগ্লানি তাহা তৎকালে উপস্থিতই হইত না। ফলতঃ দিন দিন আমার পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পুলিশ মহালে আমি একটা বড়-লোক বলিয়া গণ্য মান্য হইলাম।

একবৎসর আমি জাহানাবাদ থানায় দারগা হইয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। তৎকালে শ্রীরামপুর থানার অধীন কোন সম্ভ্রান্ত পল্লীতে একটা ভয়ঙ্কর ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা প্রায় ৩০। ৪০ হাজার টাকার অলঙ্কার, শাল রুমাল আদি মূল্যবান দ্রব্য সকল লইয়া প্রস্থান করে। বিশেষতঃ গৃহস্বামীর একজন দ্বারবানকে মারিয়া ফেলে। একে বড়লোকের বাড়িতে ডাকাতি, দ্বিতীয়তঃ অনেক দ্রব্য সামগ্রী অপহৃত হইয়াছে। এই ডাকাতি লইয়া পুলিশ মহালে একটা হুল স্থূল পড়িয়া গেল। দারগা, জমাদার, চৌকিদার প্রভৃতি দলে দলে আসিয়া একেবারে গ্রাম ঘেরিয়া ফেলিল। যাহাকে একটু দুষ্ট ও বদমায়েস বলিয়া সন্দেহ হইতে লাগিল, তাহাকে বহুবিধ পীড়ন আরম্ভ হইল। ২।৫ ক্রোশ মধ্যে চারিদিকে যত পল্লীগ্রাম ছিল, সমস্ত গ্রামের লোকে একে বারেই সশঙ্কিত হইয়া পড়িল। প্রায় ১০০ শত লোককে পীড়ন করা হইল, কত শত লোকের ঘর তল্লাসী হইল। স্বয়ং পুলিশ সাহেব সরেজামিনে আসিয়া প্রায় একমাস তদন্ত করিলেন। কিছুতেই একবিন্দু কোন দ্রব্য পাওয়া গেল না। আজ জমাদার, কাল দারগা, কিছু দিন পরে পুলিশ সাহেব, এই রূপে ঘন ঘন তদন্ত হইতে

লাগিল। দুই মাস, তিন মাস তদন্ত হইল, গৃহস্বামী একেবারে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। একেত ডাকাতেরা সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ পুলিশের মহা-প্রভুদিগের ফরমাইস খাটিতে খাটিতে গৃহস্থ একেবারেই জ্বালাতন হইয়া পড়িলেন। ইহার উপর কিছু যে অর্থ ব্যয়ও হইল না এ কথাও আমি বলিতে পারি না। ইহাকেই না বলে "মড়ার উপরি খাঁড়ার ঘা?"

যাহা হউক, পুলিশ তদন্তে ত কোন ফলই হইল না। পুলিশের বড় সাহেব আদেশ দিলেন, যে ব্যক্তি এই ডাকাত ধরিয়া দিবে তাহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিব।

একদিন আমি পুলিশ সাহেবের একখানি চিঠি পাইলাম, উক্ত চিঠিতে লেখা আছে তুমি অবিলম্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। আমি প্রথমতঃ শ্রীরামপুর তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। সাহেব বলিলেন—বাবু, আপনি অমুক স্থানের ডাকাতির বিষয় শুনিয়াছেন কি? আমি বলিলাম—গতকল্য এবিষয় শুনিয়াছি।

সাহেব বলিলেন—এই ডাকাতির ত কিছুতেই কিনারা হইতেছে না। স্থানীয় পুলিশ অনেক অনুসন্ধান করিয়াছে, অনেক যত্ন করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারে নাই। এই ডাকাতি সম্বন্ধে বড় সাহেবের বিশেষ জিদ্ পড়িয়াছে। ফলতঃ আমি অনেক যত্ন করিয়াছি, কিন্তু কোন উপায়ই করিতে পারিলাম না। আমার সম্পূর্ণই বিশ্বাস আপনি অবশ্যই এই ডাকাত গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

আমি বলিলাম—হুজুর, স্থানীয় পুলিশ এত যত্ন করিয়া যখন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, তখন কি আমি কিছু করিতে পারিব?

সাহেব বলিলেন—আপনি পুলিশের মধ্যে একজন বিখ্যাত লোক, অনেক অসাধ্য কার্য্য আপনি সম্পন্ন করিয়াছেন, এই ডাকাতি ধরিতে আপনি বিশেষ মনোযোগী হউন।

আমি সাহেবকে একটী লম্বা সেলাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। বিদায় কালে সাহেব বলিলেন—আপনি এই ডাকাতি তদন্ত জন্য যে কিছু সাহায্য চাহিবেন, পুলিশের মধ্যে যে ব্যক্তিকে আপনার সাহায্য জন্য বলিবেন, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য করিবে। আপনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিলে পুরস্কার ত পাইবেনই, বিশেষতঃ আপনার পদোন্নতি করিতে আমি সাধ্যানুসারে যত্ন করিব।

সাহেবের নিকটে ত বিদায় গ্রহণ করিলাম, এইক্ষণ কোথায় যাই? কি করিব? কিরূপে অনুসন্ধান করিব? এতদিনের খ্যাতি প্রতিপত্তি বোধ হয় এইবারই লোপ হইবে।

আমি প্রথমেই স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মচারিগণের নিকটে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা এক বাক্যে বলিলেন—আমরা ত তদন্ত করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। আমি একজন পুলিশ জমাদারকে সঙ্গে লইয়া, যে গ্রামে ডাকাতি হইয়াছে, তথায় উপস্থিত হইলাম। গৃহ-

স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তিনি শুনিলেন আমি একজন পুলিশ কর্ম্মচারী, এই তদন্ত জন্য আসিয়াছি।

গৃহস্বামী আমাকে বলিলেন,—মহাশয়! আপনি ভদ্রলোক, আপনাকে একটী কথা বলিতেছি, ডাকাতেরা আমার সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়াছে, এখন আমি সেই কষ্ট একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছি, কিন্তু আপনাদের যন্ত্রণা যে একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। আজ সাহেব আসিলেন, কল্য দারোগা আসিলেন, পরশ্বঃ জমাদার বাবু আসিলেন, এইরূপে ২।৩ মাস আমাকে যে একেবারেই জ্বালাতন হইতে হইয়াছে। আমার অপর কর্ম্ম কার্য্য সমস্তই বিনষ্ট হইল। এই দীর্ঘকাল কেবল পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছি, আমার সংসার ধর্ম্মতো মাটী হইয়া গেল। এইক্ষণ আপনাকে বিনয়ের সহিত নিবেদন করিতেছি, আমার যে সর্ব্বনাশ হইবার হইয়াছে, অপহৃত সম্পত্তির উপর আমার কোন দাবি দাওয়া নাই, কোন ব্যক্তি বিশেষের উপরও আমার কোন সন্দেহ নাই। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রস্থান করুন, আর তদন্ত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে যদি আমাকে ধনে প্রাণে নষ্ট করিতে আপনার ইচ্ছা থাকে তবে যে তদন্ত করিতে ইচ্ছা হয় করুন।

ভদ্রলোকটীর কথা শুনিয়া আমার মনে মনে বড়ই কষ্ট হইল, পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যকলাপের উপর শত শত ধিক্কার প্রদান করিলাম। সেই ভদ্রলোকটীকে বলিলাম, মহাশয়! আমি আপনার কোন কার্য্যক্ষতি করিব না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ডাকাতির অবস্থাটী ব্যক্ত করুন, আমি একবার শুনিয়াই প্রস্থান করিব। আমি উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইবার পরে গ্রামস্থ অনেক ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেকে বিদ্রূপচ্ছলে অনেক কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল—এইবার বাবু আসিয়াছেন, এবার ডাকাতির একটা কিনারা অবশ্যই হইবে। একটা বুড়া লোক বলিল—"ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেলেন শল্য হলেন রথী" আর একটা লোকে বলিল—"চন্দ্র সূর্য্য অস্তে গেলেন জোনাকের পোঁদে বাতি" কত লোকে কত কথাই বলিল, আমি কিন্তু কোন কথার কোন উত্তর দিলাম না।

আমি গৃহস্থ ভবন পরিত্যাগ করিলাম, উঁহার বাটীর পার্শ্বেই একটা বড় পুষ্করিণী, সেই পুষ্করিণীর তীরে দেখিলাম, কতকগুলি অর্দ্ধ দগ্ধ বস্ত্র খণ্ড, আর কয়েকটা মশালের কিয়দংশ পতিত রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়! পুকুর ধারে ওগুলি কি পড়িয়া আছে?" একটা লোকে উত্তর দিল—"মহাশয়! ঐ গুলি কি দেখিয়াছেন? ডাকাতেরা যে রাত্রে ডাকাতি করিয়াছিল, উহারা যে মশাল জ্বালিয়াছিল, সেই অর্দ্ধ দগ্ধ মশাল পড়িয়া আছে। আমি বলিলাম, উহা দেখিয়া আর কি করিব? কিছুক্ষণ পরেই সেই লোকগুলা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আমি মনে মনে ভাবিলাম, দেখি না মশালগুলার অবস্থা কি রূপ?

আমি পুনরায় সেই পুষ্করিণী তটে উপস্থিত হইলাম। সেই দগ্ধ মশাল খণ্ডের জড়িত ছিন্ন বস্ত্রগুলি খুলিতে আরম্ভ করি-

লাম। দুই তিনটি খুলিলাম, একটী মশাল জ্বলিয়া দেখিলাম, একটা জামার ছিন্ন পকেটের মধ্যে একখণ্ড কাগজ, সেই কাগজখানির কিয়দংশ পুড়িয়া গিয়াছে। কয়েকটী অক্ষর পড়া যায় মাত্র, এইরূপ লেখা আছে——"কেনা প্রভৃতিকে পাঠা-ইতে"

আমি এই কয়েকটি কথা পাঠ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলাম। পুনরায় গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই গৃহস্থ ভবনে উপ-স্থিত হইলাম। আমি একটি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, এই গ্রামে কোন কার্য্যকর্ম্মোপলক্ষে কোন বিদেশের লোক আসিয়াছিল কি?" তিনি বলিলেন—"ঐ মিত্র বাবুদিগের বাড়িতে কতকগুলি কুলি খাটিতে আসিয়াছিল, উহাদের বাটী কোথায় তাহা আমি জানি না।" আমি সেই বাটীতে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি-লাম—"মহাশয়, আপনার বাটীতে কি বিদেশ হইতে কোন লোক কোন কার্য্যোপ-লক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল? আর এই হস্তা-ক্ষর কি আপনি চিনিতে পারেন?

তিনি বলিলেন—রাণীগঞ্জে আমাদের কুলির এজেন্ট আছেন, এই লেখা তাঁহার হস্তের আর রাণীগঞ্জ হইতে কতকগুলি কুলি তিনি প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমাদের নূতন ঘর প্রস্তুত উপলক্ষে এই সকল কুলিরা এখানে কর্ম্ম করিয়াছিল, কুলিদিগের বাস স্থান কোথায় তাহা আমি অবগত নহি।

আমি বলিলাম, আপনাদের এজেন্ট বাবুকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে হইবে। তদনুসারে তিনি একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। আমি সেই ছিন্ন দগ্ধ কাগজ খণ্ড এবং পত্রখানি লইয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সাহেবকে সমস্ত অবস্থা বলিলাম, এবং রাণীগঞ্জ পুলিশের উপরি একখানি হুকুমনামা গ্রহণ করিলাম।

পরদিন আমি যথা সময়ে রাণীগঞ্জে উপ-স্থিত হইলাম, সেই এজেন্ট বাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, এই লেখা কি আপনার?" এজেন্ট বাবু মিত্র বাবুর পত্রখানি পাঠ করিয়া উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা হাঁ" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি যে কুলিদিগকে পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের বাড়ী কোথায়?"

তিনি বলিলেন—কুলিদিগকে আমি পাঠাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু উহাদের বাড়ী কোথায় তাহা ত আমি জানি না। তবে কেনার বাটী শুনিয়াছিলাম বাঁকুড়া জেলায়, কিন্তু কোন্ গ্রামে তাহা আমার স্মরণ নাই। উহারা বৎসরের মধ্যে ৫।৬ মাস এখানে আসিয়া কার্য্য করে, অবশিষ্ট সময় বাটীতেই থাকে।

আমি এজেন্ট বাবুর নিকটে এই সকল কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলাম, ইহার নিকটে এই কথা ভিন্ন অতিরিক্ত কোন সন্ধানই পাইবার আশা নাই। এইক্ষণ কি করি, কোথায় যাই? বাঁকুড়া জেলায় বাটী অনুসন্ধান করা সহজ কথা নহে।

যাহা হউক, আমি বাঁকুড়া যাওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া আমাদিগের বড় সাহেবকে এই সকল বিবরণ সংযুক্ত একখানি পত্র লিখি-

লাম। আর বাঁকুড়ার পুলিশ সাহেবকে একখানি পত্র লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। পুলিশ সাহেব আমার প্রার্থনা-স্বরূপ সাহায্য প্রদান করেন, উক্ত পত্রে ইহাই প্রার্থনা থাকিল।

২।৩ দিনের মধ্যেই আমি বাঁকুড়ায় উপস্থিত হইলাম। পুলিশ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সাহেবটি দেখিলাম অতি ভদ্রলোক, অতি অমায়িক লোক। তিনি আমাকে বলিলেন—"বাবু, আমি তোমাকে প্রার্থনানুরূপ সাহায্য প্রদান করিব, কিন্তু বাঁকুড়া-জেলার বহুতর স্থান হইতে রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে কুলিরা গমন করে, কোন্ গ্রামে এই দস্যুদিগের আবাস স্থান ইহা নির্ণয় করা কি সহজ?

আমি সাহেবকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিলাম। এইক্ষণ আমি কুলি সংগ্রহ কারী বলিয়া লোকের নিকটে পরিচয় দিলাম। গ্রামে গ্রামে কুলির অন্বেষণার্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এই রূপ ভাবে ২।৩ সপ্তাহ অতীত হইল। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি উক্ত জেলায় গঙ্গাজল ঘাটের নিকট কোন পল্লিগ্রামে উপস্থিত হইলাম। পথিমধ্যে শুনিয়াছিলাম, এই গ্রাম হইতে বহুতর কুলি সকল ভিন্ন দেশে সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে গমন করিয়া থাকে। সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয় এমন সময়ে আমি উক্ত গ্রামে প্রবিষ্ট হইলাম। গ্রামে প্রবেশ করিয়া শুনিলাম, এখানে বাগ্‌দী ও হাড়ি জাতীয় বহুতর লোকের বসতি আছে, তদ্ভিন্ন এই গ্রামে কেবল ১ ঘর মাত্র ব্রাহ্মণের বসতি আছে। এই গ্রামে রাত্রিযাপন করিবার অন্য স্থান নাই, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সেই ব্রাহ্মণ ভবনে উপস্থিত হইয়া রাত্রি যাপন জন্য প্রার্থনা করিলাম। অতিথি নাম শুনিয়া সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। "কে তুমি, এখানে থাকিতে পারিবে না, অন্যত্র চলিয়া যাও" ইত্যাদি নানা প্রকার বাক্য কর্কশ স্বরে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, মহাশয়! আমরা কেবল আপনার আশ্রয়ে রাত্রি যাপন করিব, একটু স্থান মাত্র চাহিতেছি, আপনিতো জানেন, এই গ্রামে আর কোন স্থানে আশ্রয় পাইবার উপায় নাই। বৃদ্ধ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটীর মধ্যে প্রস্থান করিলেন। আমরা চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। একজন ভৃত্য কিছুক্ষণ পরেই পা ধুইবার জল ও তামাক আনিয়া উপস্থিত করিল, আমি পদ প্রক্ষালন করিয়া শয়ন করিলাম।

রাত্রি প্রায় ১০টা বাজে, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল, মহাশয়! চলুন, আহার প্রস্তুত। আমি বলিলাম, আমি আহার করিব না। বৃদ্ধ বলিলেন—মহাশয়! তাহা কি হয়, আপনারা অতিথি, অনাহারে আমার আশ্রমে থাকিবেন, ইহা কি সম্ভব? ইহাতে যে আমাদের ধর্ম্ম-হানি হইবে। আমি প্রথমে আহার করিতে কিছুতেই সম্মত হইলাম না। বৃদ্ধ পরিশেষে বলিলেন—যদি আহার না করেন, তবে এখানে থাকিতে পারিবেন না, অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে।

পরিশেষে আমি আহার করিতে সম্মত হইয়া বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম

আহার করিতে বসিলাম, দেখিলাম, শাল-পত্রে অন্ন এবং উহার চতুষ্পার্শে স্থলপত্রের প্রস্তুত বাটীতে ২০।২৫ রকম তরকারী। উত্তম সরু তণ্ডুলের গরম অন্ন, নানা প্রকার সুখাদ্য ব্যঞ্জন, কিন্তু মাটীর ভাণ্ডে পানীয় জল। আমি আহার করিতে করিতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম; দেখিতেছি, ইঁহারা দরিদ্রলোক নহেন, আর খাদ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন, ব্যঞ্জনাদি অতি উপাদেয়, কিন্তু এইতো ৩।৪ জনা লোক আমরা আহার করিতেছি, গৃহস্থের ঘরে কি একটী পিত্তল কাঁসার ঘটী পর্য্যন্ত নাই। এই বিষয়টী চিন্তা করিয়া আমার মনে বড়ই কৌতূহল উপস্থিত হইল।' বৃদ্ধকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন, —মহাশয়! সে দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন। আমরা পৈতৃক স্থান জন্মভূমির মমতায় এখানে বসতি করি-তেছি, পৈতৃক কিছু সম্পত্তি আছে এজন্য দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে মমতা উপস্থিত হয়, নচেৎ এখানে আর ভদ্রলোকের বাস করিবার উপায় নাই। আমি বলিলাম—মহাশয়! কেন ব্যাপার কি? এখানে কিরূপ অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে?

ব্রাহ্মণ বলিলেন—মহাশয়! এই গ্রামে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি অপর কয়েক ঘর লোক ছিলেন, কিন্তু কেনা বেটার অত্যাচারে সমস্ত লোকই দেশত্যাগী হইয়াছে, আমার পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই, এজন্য পড়িয়া আছি।

আমি বলিলাম—মহাশয়! কেনা কে? সেব্যক্তি কিরূপ অত্যাচার করে? ব্রাহ্মণ বলিলেন—এই গ্রামে অন্য যত লোকের বসতি দেখিয়াছেন, ইহারা জাতিতে হাড়ি ও বাগ্দী, উহার মধ্যে সকল লোকেই চোর ডাকাত, বিশেষতঃ কেনা বাগদী বেটা ডাকাতের সরদার,—ইহার অত্যাচারে এই দেশে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ঘটী বাটী থালা গহনা প্রস্তুত করিলেই কেনা বেটা অথবা উহার দলস্থ লোকেরা অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। উহাদিগের শাসন করিবার কোন উপায় নাই। আমার কত দ্রব্য সামগ্রী যে অপহরণ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না, এজন্য মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর কোন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিব না।

আমি বলিলাম—কেনার ঘর কোন স্থানে? সে কি বাটী থাকিয়াই দস্যুবৃত্তি করে, না অপর কোন স্থানে গমন করে?

ব্রাহ্মণ—না মহাশয়, ওবেটা সর্ব্বত্র গমন করে, এ বৎসর যে কত ভাল ভাল গহনা, শাল রুমাল প্রভৃতি দ্রব্য আনিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আমার বাটীর অতি সন্নিকটেই উহার বাসস্থান, কল্য প্রাতঃকালেই দেখাতে পারি।

পরদিন অতি প্রত্যূষে ব্রাহ্মণের সহিত বাহির হইলাম, ব্রাহ্মণ দূর হইতে কেনারাম সরকারের বাটী দেখাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

আমি উহার বাটীতে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেনারাম কি বাটীতে আছে? "কে তুমি" আমি বলিলাম, আমি ব্রাহ্মণ কতকগুলি লোকের প্রয়োজন আছে। একটি লোক আমার সন্নিকটে উপস্থিত

হইল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম কি কেনারাম সরকার? "হাঁ" আমার নামই কেনারাম।

কেনারামের বয়ঃ ক্রম ৩৫।৩৬ বৎসর, কালি মূর্ত্তি জোয়ান, লম্বে আমার হস্তের তিন হাতের বেশী নহে। বেশ মোটা সোটা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কোমর সরু, বুক খুব প্রশস্ত, হস্ত পদ যেন বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়, চক্ষু দুইটি খুব বড় নহে, চক্ষু রক্তবর্ণ, হস্তে খুব মোটা মোটা রৌপ্য বলয়, কেনারাম তামাক টানিতে টানিতে আমার নিকটে উপস্থিত হইল। সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল, আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি একটু চিন্তা করিল। তৎপরে মোটা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কোথা হইতে আসিলেন, আপনার কি প্রয়োজন, কি জন্য লোক সংগ্রহ করিতেছেন?"

আমি বলিলাম—বাসস্থান কলিকাতায়, রাণীগঞ্জে কয়লার কারবার খুব বিস্তৃত রূপে করিবার ইচ্ছা আছে, সেই জন্য ৪।৫ শত লোকের প্রয়োজন।

কেনারাম বলিল—আপনি কি ব্রাহ্মণ, আপনি নিজে মহাজন না মহাজনের পক্ষের কর্ম্মচারী? আমি ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া কেনারাম একটী প্রণাম করিল। তৎপরে ব্যবসা সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিল।

কেনারাম পরিশেষে বলিল—আমার অধীনেই ৪।৫ শত লোক আছে, অপাততঃ আমি ১০০ শত লোক লইয়া নিজেই রাণী-গঞ্জে উপনীত হইয়া কার্য্যারম্ভ করিব। তৎপরে বেশী লোকের আবশ্যক হয়, পরে লইয়া যাইব। অপাততঃ যে এক শত লোক যাইবে উহার প্রত্যেক ব্যক্তিকে ১০৲ টাকা দাদন দিতে হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

গান।

নিশা শেষ।

বিভাস—একতালা।

চন্দ্রমা চরমাচলে চলিল নিরখি যামিনী,
বিষাদিত মনে, তিমির বসনে, বদন ঢাকিল মানিনী।
বিধুরা বিধুর বিরহ দহনে, উহুরবে কুহু বলিছে সঘনে,
তুহিন-নয়ন-সলিলে ভাসালে ধরণী পতি সোহাগিনী।
পাপিয়া কলরব কৈতব, "কি হল কি হল প্রাণ গেল রব,"
বলে কৈ তব নাথ! সে ভাব কিসে আমি অপরাধিণী।

প্রভাত।

ভৈরব—একতালা।

তরুণারুণ কিরণ রাগ-রঞ্জিত নব পল্লবে।
কিবা মনোহর ,সুষমা সুন্দর, ধরিল ধরণী গৌরবে।
বিমল সরসী-সলিলে নলিনী;
শিহরি শীতল সমীরে অমনি,
সুখের সাগরে ভাসিল হাসিল মধুকর মধুরারবে।
মরালাদি জল বিহগ নিনাদে
নয়ন মুদিয়া কুমদিনী কাঁদে
সেফালি ফেলিল ফুলভূষা নিশা,
শিশিরে কাঁদিল নীরবে—।
পিক বলে "উহু" পাপিয়া "কি হল"
দয়িলা বুলবুল শ্যামা ঝঙ্কারিল,
কেহ বা কাঁদিল কেহ বা হাসিল,
কেহ বা ডাকিল বল্লভে ॥

সন্ধ্যা।

পূরবী—একতালা।

অভিমানে ভানু ডুবিছে সাগরে।
বুঝি নলিনী বেদনা দিয়েছে অন্তরে ॥
ঐ দেখ অলি করি মধুপান,
নিজ নিজ বাসে করিছে প্রস্থান
দয়িতার এমন হেরে আচরণ
জগতে জীবন বল কে ধরে।
পতি করে ধরি দিবা সতী ধায়
নহে সমীরণ বহে শ্বাস বায়,
বিহঙ্গম কুল হইয়া আকুল
কুলায়ে চলিল রে—।

চকাচকী দুখে হাসিল পেচক
প্রদোষ পরিল জোনাকি হীরক,
কুমুদ কহ্লার পরি অলঙ্কার
নিশা শশী সনে মিলিল অম্বরে।

প্রলয়ে পর্ব্বত শিখরে

দণ্ডায়মান মুমূর্ষু ব্যক্তির উক্তি।

বেহাগ—একতালা।

এ কি হইল!!!
ভীষণ জলধি-জলরাশি আসি
ক্রমশঃ শিখরি-শেখরে গ্রাসিল।
কোথা যাই বল কি করি এখন
থর থর হিয়া কাঁপে অনুক্ষণ,
আসিল করাল, প্রলয়ের কাল,
ভবে লীলা খেলা আজি ফুরাইল!!!
জনক জননী সুতা সুত দারা,
এই ছিল কৈ কোথা গেল তারা
আর কি মানব! কভু মুখ তব
না পাব হেরিতে নয়নে—।
ইরম্মদ নাদে মহাবীর কাঁপে,
তরুদল দোলে ঝঞ্ঝাবাতে দাপে,
দ্বাদশ ভাস্কর খরতর কর
নিশার নিবিড় তিমিরে ঢাকিল।
বৈর পরিহরি কেশরী কুঞ্জর
আকুল অন্তরে ধায় নিরন্তর
জীবনে জীবন দিয়া বিসর্জ্জন
কত জীব ভেসে গেল রে—।

আর আমি কত এরূপে থাকিব
দয়াময়! দুখ কত বা সহিব
দীনে দয়া কর ওহে কৃপাকর!
ঐ দেখ তনু হতেছে শিথিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

জাতীয় সম্মিলনী সঙ্গীত।—শ্রীসাম্বুকুল চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রণীত।—এই পুস্তিকাখানির উদ্দেশ্য মহৎ, ভাব উচ্চ ও বিষয় ভাল; তবে ভাষাটুকু আর একটু সরল হইলে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

পত্নী।—শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রণীত।—ইহা একটি উপকথা মাত্র। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথায় স্ত্রীজাতির কিরূপ অবথা ক্লেশ হয়, তাহাই প্রতিপন্ন করা বোধ হয় পরদুঃখকাতরহৃদয় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় বালস্বভাবসুলভ চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

তত্ত্বমুকুর।— শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর প্রণীত।—এই পুস্তকখানিতে নানা প্রকার দার্শনিক মত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা প্রাচীন দর্শনের এক প্রকার সূচী। গ্রন্থকর্ত্তার মতও স্থানে স্থানে সন্নিবিষ্ট আছে। যদি ইহাতে সকল প্রকার দার্শনিক মতের বিচার থাকিত তাহা হইলে পুস্তকখানি অধিকতর আদরের সামগ্রী হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক সময় সময় এরূপ সূচী দ্বারাও অনেক উপকার সাধিত হয়।

ধর্ম্মপরীক্ষা।—পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্যকাব্য।—শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র দ্বারা প্রণীত।—আজকাল দৃশ্যকাব্যেও কবিতার অভাব নাই। যিনিই গ্রন্থকারের যশোলিপ্সু হয়েন তিনি একেবারে নিরক্ষর সুধী সেক্ষপীয়র হইতে চান। তাঁহাদের লিপিকুশলতা প্রায় প্রেম প্রসঙ্গে, অনেক সময় অশ্লীলতাপূর্ণ প্রেম প্রসঙ্গে, নষ্ট হয়। এরূপ কালে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদিগের শেষ পর্য্যটন ও যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম পরীক্ষা সম্বন্ধীয় দৃশ্যকাব্য লিখিত হওয়ায় অবশ্যই উচিতমত প্রীতিলাভ করিয়াছি। "ধর্ম্ম-পরীক্ষা" মহাভারতের এক অত্যুৎকৃষ্ট অংশ। ইহাতে মহাকাব্য নির্দ্দিশিত প্রায় সকল প্রকার রসই বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে করুণারসই প্রবল। কিন্তু মহাভারতের এই উৎকৃষ্ট অংশটি নাট্যাকারে কিম্বা কাব্যাকারে ভাষান্তরিত হয় নাই ইহাই দুঃখের বিষয় এবং এই দুঃখ বিমোচন করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। অবশ্যই মহাভারতের উৎকৃষ্ট অংশটি ধর্ম্ম-পরীক্ষায় নাট্যাকারে ভাষান্তরিত হইয়াছে, এবং উহা স্থানীয় বীণারঙ্গ ভূমিতে অভিনীতও হইয়াছে।

সাহিত্য-সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড।] মাঘ, ১২৯৭। [দশম সংখ্যা।

নিভৃত চিন্তা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এ আবার কি চিত্র? স্বভাবের এ কি কৈতব? সংসার যুড়িয়া অন্ধকার! যে গিরিচূড়ার তুষারতল্পে রবির নিত্য বিহার, আজ তাহারও যে গতি; আর যে কন্দরগর্ভ দুর্ভেদ্য তমিস্রপুঞ্জেরই লীলাভূমি, তাহারও সেই দশা! নয়নের কবাট দুইটী সম্পুটিত হইলে যে একটী একতান তামস দৃশ্য অন্তরেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়, আজ যেন বিশ্বব্যাপার তাহাতেই লুক্কায়িত। কোথায় আমি, কোথায় সংসার, কিছুরই স্থিরতা নাই। জগৎ প্রকৃতির এ অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যভিচার ঘটিল কেন? এ অঘটন ঘটনার মুল কি?

যেখানে কিছু নাই, সেইখানেই কৃষ্ণিমা। কালী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, যে মহাকাশের প্রতিমা, তাহা কৃষ্ণবর্ণ। পার্থিব উপাদানের অন্ত্যপীঠে পদার্পণ করিয়া চাহিয়া দেখ, কাল বৈ আর কিছুই নাই। চক্ষু মুদিত কর, সেই কাল, সেই অন্ধকার। অভাবের কোন রূপ থাক্ বা না থাক্,

তোমার চর্ম্ম চক্ষুঃ বা মর্ম্ম চক্ষুঃ তাহা কাল বৈ আর দেখে না।

আজ যে ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছি, ইহা কি সেই অসৎ আকাশেরই অবতরণিকা? সৃষ্টি কি অনস্তিত্বে বিলীন হইয়া গিয়াছে? সেইত চাহিয়া আছি, পূর্ব্বে যেরূপে চাহিতাম,সেই রূপেই চাহিয়া আছি; তবে পূর্ব্বে যে বিশ্বরূপ অনুভূত হইত, আজ তাহা হয় না কেন?

ভাল দেখা যাউক,এই অনুভূতি বা দৃষ্টি জ্ঞান কি রূপে জন্মে। চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়; দৃষ্টি চক্ষুর কার্য্য, অন্য ইন্দ্রিয়ের নহে। কিন্তু সেই কার্য্য নিরপেক্ষ নহে। তাহাতে আলোকের সাহায্য চাই। যেখানে আলোক নাই, সেখানে চক্ষুরও প্রতিপত্তি নাই। নিবিড় অন্ধকারে চক্ষুঃ অন্ধ। ফল কথা, দৃশ্য বস্তু আলোক-ফলিত হইয়া যদি আবশ্যক-মত ব্যবধানবর্ত্তী হয় এবং তাহাতে মনঃ-সংযোগ ঘটে, তবে দর্শনজ্ঞান জন্মিবে। কিন্তু এই আলোক, দূরত্ব, চক্ষুঃসত্ত্বা এবং মনঃসমাধানের ইতরবিশেষ ঘটিলে দর্শন-জ্ঞানেরও তারতম্য ঘটিবে। মনে কর, তুমি একখানি পুস্তকপাঠে চিত্তসমাধান করিয়াছ। কিন্তু যদি গ্রন্থখানি আলোক-ফলিত করিয়া বহুদূরে বা নেত্রপ্রান্তে স্থাপিত কর, তবে তাহার এক বর্ণও পাঠ করিতে পারিবে না। আবার যদি ঐ আলোকপ্রভা দ্রষ্টব্যের দ্যুতি অপেক্ষা প্রচণ্ডতর হয়, তাহা হইলেও দৃষ্টিক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিবে। দিন-মানে যে খদ্যোতালোক চন্দ্র তারা অদৃশ্য হয়, ইহাই তাহার কারণ। অতএব মানিতে হইতেছে, দৃষ্টিজ্ঞানের পক্ষে পরিমিত দূরত্ব, পরিমিত আলোক, পরিমিত চক্ষুঃসত্তা এবং মনঃসংযোগের প্রয়োজন।

দর্শনজ্ঞানের নিমিত্তভূত উপায়ন চতু-ষ্টয়ের মধ্যে অবশ্যই কোনটির বা কতকগুলির বৈষম্য না ঘটিলে আজ নেত্রপথ হইতে জগচ্চেষ্টার অপহ্নুতি ঘটিবে কেন? নিদ্রাত আমায় ত্যাগ করিয়াছে, সে মনোমোহিনী মূর্ত্তিত অনেক দিন অন্তর্হ্ণতা হইয়াছে, তবে সংসার আমাকে দেখিয়া লুকায় কেন? বুঝিয়াছি, জগৎ যেখানকার সেখানেই আছে; সেই সমৃদ্ধিশালিনী ধরিত্রী, সেই দ্যুতিমান জ্যোতিশ্চক্র, সেই জীবজন্তু গুল্ম লতা সকলই স্ব স্ব স্বরূপে বিদ্যমান আছে; কেবল নাই আমাতে আমার সেই মনঃ। মনঃ আপন স্থিতিক্রম হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমিও সুতরাং এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছি। আমাতে আমি থাকিলে, মনঃ আপন কোটি না হারাইলে সেই হাস্যময়ী ময়ূখমালা আমার প্রতি বিক্রিয়াবতী হইয়া এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের প্রচার করিত না।

এই ঘনান্ধকারের কেন্দ্রীভূত যে আমি, আমার এ জ্ঞান কোথা হইতে আসিতেছে? আমার সম্মুখে পশ্চাতে,বামে দক্ষিণে, অন্তরে বাহ্যে সকল দিকেই অন্ধকার; অন্ধকারময় আমি; দ্বিতীয় কিছুই নাই। তবে কার অস্তিত্বে নিজ অস্তিত্ব প্রতিপাদন করি-তেছি? কাহাকে দেখিয়া চেতিত হইতেছি, ঐ তুমি, আর এই আমি?

আত্মচৈতন্য সাপেক্ষ সামগ্রী। নির-পেক্ষভাবে নিজ অস্তিত্ব সমর্থিত হইবার নহে। দৃশ্য নাই, দ্রষ্টা আসিবে কোথা

হইতে? তাই একত্বে আত্ম হারাইয়া যায়। তুমি আমি কিছুই থাকে না। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাপ্তি অনন্ত ব্যাপ্তি,আদ্যন্তবিহীন ব্যাপ্তিময় আমিত্বে ভেদ বা দ্বৈতসংস্কার আসে না। তবে এ সাহংকার সিদ্ধান্ত কোথা হইতে আসিল যে, আমি আছি, অন্ধকারে ডুবিয়া আছি।

এ সিদ্ধান্তে মূল আছে। বিন্ধ্যাচলের আরণ্য প্রদেশের অন্তর্ভূত ক্ষুদ্র একটি পর্ণকুটীরে অধ্যাসীনা রমণীকণ্ঠে শিঞ্জিত হইল, এ সিদ্ধান্তের মূল আছে। অদূরে নির্ঝরিণী—জল কুলুকুলু স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শিলায় শিলায় আপতিত হইতেছে। কুঞ্জে কুঞ্জে পতত্রীকুল নৈদাঘ জ্বালায় মুহ্যমান। নর্ম্মদার গাম্ভীর্য্য লোপ পাইয়াছে। বায়ু ক্ষণে ক্ষণে স্পন্দনহীন, বিচেতন। কন্দালুক ও বারাহীকন্দের অনুসন্ধানে গিরিমূলে দলে দলে ঋক্ষ অবতীর্ণ। শাখামৃগেরা শাখায় শাখায় সমাসীন হইয়া শাখাপল্লবের অন্তরালে কোনরূপে শরীর শীতল করিতেছে। দূরে শূন্যে গৌরীশঙ্কর গিরি ধূম্ররেখার ন্যায় আভাসমান। ব্যবসায়ীরা নর্ম্মদানীরে নিমজ্জিত হইয়া কোন কোন স্থানে বাণলিঙ্গের এবং পর্ব্বতের সানুদেশের কোন কোন স্থানে শিলাজতু অনুসন্ধান করিতেছে। মার্ত্তণ্ডদেব জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যবিন্দুতে উপাগত। গিরিগাত্রে যেন বৃশ্চিকজ্বালা পর্ব্বে পর্ব্বে পরিক্রম করিতেছে। সেই প্রচণ্ডতাপে স্বিদ্যমানা হইয়া রমণী কহিলেন, এ সিদ্ধান্তের মূল আছে। কণ্ঠ-কর-বিলম্বিত রুদ্রাক্ষমালা সেই দরবিগলিত ঘর্ম্মধারা নিরোধ করিতে পারিতেছে না। ললাটের ত্রিপুণ্ড্রক, বক্ষের ভস্মলিপী ঘর্ম্মে ঘর্ম্মে অপহৃত-প্রায়। মুখপদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুই হস্তে যেন দুই বাল সূর্য্য স্ফূর্ত্তিমান। মস্তকে কবরী নাই, সূক্ষ্ম তাম্রশলাকার ন্যায় জটাজূটও নাই। অঙ্গযষ্টি আগ্রীবগুল্ফ গৈরিকবাসে আবরিত। চরণ দুইটি পদ্মাসনবদ্ধ হইয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন খানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধিই করিয়াছে। সম্মুখে ভস্মস্তোম; তাহাতে অগ্নিদেব নিতান্ত মৃদুভাবাপন্ন। পার্শ্বে কমণ্ডলু; অদ্যাপি তাহা সন্ন্যাসিনীর করপল্লবে কিণ জন্মাইতে পারে নাই। ইহাতেই বোধ হয়, এই অনাশ্রমধর্ম্মমার্গে বামনয়নার অধিকারস্বত্ব সম্পূর্ণ বর্ত্তে নাই।

নবীনা যোগিনী আবার বলিলেন, এ সিদ্ধান্তের মূল আছে। নিবিড় অন্ধকাররাশিমধ্যে আত্মসত্তা-নিরূপণে আমি কেন-যে সক্ষম হইতেছি, তাহার মূল আছে। জরায়ুকোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া আমি যে দ্বৈতসংস্কারের গণ্ডী স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহা অদ্যাপি আমাকে ত্যাগ করে নাই। সেই চুম্বকের দুষ্পরিহর ভীষণ আকর্ষণে আমার সেই অয়সনির্ম্মিত অন্তঃকরণ স্বপদস্খলিত হইয়া দৃশ্যমান তিমিরদামের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র; কিন্তু স্মৃতিলোপ পায় নাই। সেই পূর্ব্বজ সংস্কার আবার আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে; যাহা ভুলিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যে সংসার দেখিব না বলিয়া অন্তশ্চক্ষুর সহিত চর্ম্মচক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলাম, তাহারই অভিমুখে সবলে আকর্ষণ করিতেছে। তাই আজ এই অন্ধকারে বসিয়া তাহারই অস্তিত্বে

আপন অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি। আবার যখন এ অনুভূতি আসিয়াছে, তখন চিত্ত-প্রসাদের ক্ষণিক অন্তর্ধানবশতঃ যে অন্ধকারের সূচনা হইয়াছিল, তাহাই বা আর থাকিবে কেন? এইত সকল দিক পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সেইত পূর্ব্বের মত দিব্য চক্ষে দেখিতেছি,ঐ সংসার,আর এই আমি।

জগতের উৎপত্তি নিবৃত্তি, অভাব সদ্ভাব, সঙ্কল্প বিকল্পাদির বিষয় আমুলতঃ অনুশীলন করিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম, বন্ধন মানিব না; বন্য কুরঙ্গিণীর মত বনে বনে স্বাধীনভাবে পরিক্রম করিব, বাগুরায় পা দিব না; মায়া, মোহ, বন্ধুত্ব, দাম্পত্য প্রভৃতি যে প্রেমিকতার এক একটি অধ্যায়, সেই গ্রন্থের অনুশীলনে আমি আত্মোৎসর্গ করিব না। ভাবিয়াছিলাম, চিত্তে দৌর্ব্বল্যের প্রশ্রয় দিব না, দুর্ব্বল ভাবের পোষণ করিব না। মায়িকতা দৌর্ব্বল্যরোগের উপসর্গ। জীবের বিষয়াভিমুখী রতি এই দুর্ব্বলতা হইতেই জন্মে। আমার ব্যাধি বা বিপদ্‌জনিত ক্লেশ তুমি দুর্ব্বল বলিয়া সহিতে পার না। তোমার চিত্ত আপনাকে লইয়া অসাড়, দৌর্ব্বল্যজন্য মর্ম্মান্তিক ব্যাধিতে জ্বালাতন; তাই তৃপ্তির জন্য, সেই যাতনা হইতে শান্তিলাভের জন্য তুমি বহির্ম্মুখ; তুমি তাই পরচর্য্যা করিতে, সংসারের উপাসনা করিতে ব্যতিব্যস্ত। এ তোমার স্ত্রী, ও তোমার পুত্র, সে তোমার অসেচনক এই সিদ্ধান্তে তুমি অন্তর্ম্মুখ পথ পরিহার পূর্ব্বক কেবল মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াও। আপন স্থিতিক্রমে তোমার প্রতিপত্তি থাকে না; স্বাধীনতা বাতাসে মিলাইয়া যায়; তুমি হস্ত পদাদি সত্ত্বেও বিকলেন্দ্রিয় স্থবীর হইয়া অন্যের গলগ্রহ হইয়া পড়। আশা করিয়াছিলাম, অন্যের ভার আপন মস্তকে লইব না, আপনাকে ভুলিয়া পর হইয়া থাকিব না। কিন্তু সংকল্প সিদ্ধ হইল না, পৃথিবীর টানে সকলই পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল। তাই চিত্ত-প্রসাদ হারাইয়া অগাধগম্ভীর আঁধার-নীরে ডুবিয়া গিয়াছিলাম।

এইত দেখিতেছি, সেই সংসার—সেই মধুর পরিমলে নাসিকা আকুল, সেই রূপের চমকে নয়ন উদ্ভ্রান্ত। তবে আমার প্রতিজ্ঞা কোথায় থাকিল, স্বাধীনতার কি রহিল? আপনাকে আপনি লইয়া থাকিব, ইহাই পারিলাম না। ধন্য জগৎ! ধন্য তোমার আকর্ষণ! জীব সে আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। জীবের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গুর কাচ, জীবের স্বাতন্ত্র্য বাতাস।

যেখানে জীব, সেইখানেই সাংসারিকতা। সংসার ছাড়িয়া জীবের নিস্তার নাই। এখানে ধর্ম্মের ধূয়া, কার্য্যের গুমান খাটে না। শিশু নাই, বৃদ্ধ নাই; যোগী নাই, ভোগী নাই; স্ত্রী নাই, পুরুষ নাই; এখানে সকলই সমান, ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় নিতান্ত অনায়ত্ত, একান্ত পরাধীন। সিন্ধুবাসী বলুন, আর বঙ্গবাসীই বলুন; মনু বলুন, আর ইন্দ্র, কৃষ্ণ, শশধরই বলুন, যে, "নারীর আত্মা নাই, নারী সর্ব্বতোভাবে পুরুষ-পরতন্ত্র এবং পুরুষ কেবল আত্মবন্ত স্বাধীন মহাপ্রাণী" এ কথা যিনিই বলুন না কেন, এ কথা কথাই নয়। পুরুষ-স্ত্রী নির্ব্বিশেষে পরতন্ত্র—সংসারিক বস্তু ও ঘটনার পরতন্ত্র,—আর অন্যোন্যের পরতন্ত্র।

মনু বলেন, নারী পৌংশ্চল্যাদি দোষে নিষ্ঠাবতী। কৃষ্ণ তাহাতে সায় দিয়া বলেন, ঠিক কথা; নারীর সতীত্ব নাই। সুবেশযুক্ত ভ্রাতা বা পুত্র দর্শনেও নারীর চিত্ত কলুষিত হয়। আবার এই সমস্ত নারী-কুৎসাকারদের সমর্থনকারী মহাপুরুষেরা বলেন, অবলা আর অনুস্বার একই; উভয়ই পরের আশ্রয়ভাগী। নারী পুরুষভাগ্যোপজীবী। তাহার নিজের বলিতে কিছুই নাই। তাহার জরায়ু শিশুর; তাহার স্তন্য শিশুর; আর তাহা ও অবশিষ্ট যাহা থাকিল,সব পুরুষের। পুরুষই কেবল আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন জীব। আর নারী তাহার ভোগ্যা বা সেবাদাসী। নারীর হাতে পুরুষের অনেক কাজ আছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য পুরুষ তাহার বাধ্য নহে।

অপরূপ কথা! নারী পৌংশ্চল্যভাবাপন্না! নারী অসতী! নারীকে পুরুষের কঠোর শাসনে নিগড়িত রাখা উচিত! উচিত হয় রাখ। কিন্তু কে রাখিবে? পুরুষ? অসাধ্বীতার উত্তরসাধক কি পুরুষ নয়? নারী কাহাকে লইয়া অসতী? বলিবে, পুরুষমাত্র অসাধু নয়। নারীমাত্র যে অসতী, তাহার প্রমাণ কি! পুরুষেও যেমন সতের অসদ্ভাব নাই, নারীতেও সেইরূপ সতীর অভাব নাই। অসতীর জন্য যদি সতী অসতী উভয়কেই পুরুষপরতন্ত্র হইতে হয়, তবে অসতের জন্য সদসৎ পুরুষমাত্রকেই নারী-পরতন্ত্র হইতে হইবে না কেন?

নারীর অঙ্গ জরায়ু, সেই অঙ্গের অঙ্গ শিশু। নখ কেশ যেমন অঙ্গীভূত হইয়া পরে পরিত্যক্ত হয়, শিশুও সেইরূপ অঙ্গ হইতে উদ্ভিন্ন হইয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। নখ কেশাদি যদি অনাত্মীয় না হয়, শিশু হইবে কিসে? আবার শিশু যদি অনাত্মীয় হইল না, তখন নারীকে আত্মস্থা বলিব না কেন? শিশু যদি পর নহে, সপ্রমাণীকৃত হইল, তখন শিশুর সম্বন্ধে নারীও পরের নহে। গর্ভে যাহার স্থিতি, রক্তে যাহার পোষণ, তাহাকে পর বলিয়া সিদ্ধান্তিত করা সামান্য পণ্ডিতের কার্য্য নহে। যাহা বত্রিশটি নাড়ীর একটি তন্তু মাত্র, নারীর সম্বন্ধে সেত নিষ্পর নহেই। যাহার সহিত কেবল একটি বিন্দু মাত্রের সংস্রব, সেই পুরুষের পক্ষেও শিশু সেই সমগ্র পুরুষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই শাস্ত্র বলেন, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে; সুতরাং আত্মা আত্মজ সম্বন্ধে দ্বৈতসংস্কার আসিতে পারে না। যে আত্মা, সেই পুত্র এবং যে পুত্র, সেই আত্মা। যখন পিতার অংশভূত বলিয়া পুত্র তাহা হইতে পর নহে, তখন সেই এক হেতুবাদে মাতা হইতে পুত্র পর হইবে কিসে? আর যদি পৃথক পৃথক জীবত্বের অস্তিত্ববাদে জাত ও জনয়িতার পরত্ব অবধারিত হয়, তবে সেই নিষ্পরসম্বন্ধভাব কেবল শিশু ও মাতার, শিশু ও পিতার নহে, এ মীমাংসা কিরূপে আসে?' শিশু জননীর যেমন কয়েক বিন্দু রক্ত, জনকেরও তেমনই কয়েক বিন্দু শুক্র—সম্বন্ধত একই। তবে জননী পর, জনক নহে, এ কোন্ যুক্তি? জননী যদি নিষ্পর হন, পিতাও নিষ্পর, আর জননী যদি আত্মীয়া হয়েন,পিতাও আত্মীয়। ফল কথা, হস্ত পদ নখ কেশাদির সহিত দেহের

যেমন অনাত্মীয়ভাব অপ্রসিদ্ধ, পিতা বা মাতার অনাত্মীয়তা শিশু-সম্বন্ধে সেইরূপ ঘটিতে পারে না। সুতরাং ভ্রূণ বা শিশুর সম্বন্ধে মাতার দেহ বা আত্মোৎসর্গ পারতন্ত্র্য নহে, প্রত্যুত উহা আত্মতন্ত্রতাই বলিতে হইবে।

রমণী দুর্ব্বল, পুরুষ বলীয়ান; ইহা রমণীর পারতন্ত্র্য সমর্থনের অপর একটি হেতুবাদ। কিন্তু প্রণিধানপূর্ব্বক গবেষণা করিয়া দেখিলে এ উক্তিটি যে পক্ষপাতদোষে দূষিত, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। কয়েকটি কঠোর কর্ম্মে অপটু বলিয়াই কি নারীর দুর্ব্বলতা স্থির হইল? যদি এরূপ হইত যে, কর্ম্মক্ষেত্রের সমুদয় ব্যাপারই পুরুষের আয়ত্তাধীন, পুরুষই কেবল সংসারে একমাত্র কৃতী; রমণীর সাহায্য বা যোগ্যতা এককালীন নিষ্প্রয়োজন; তাহা হইলে অবশ্যই অবলার দৌর্ব্বল্য পরিকল্পিত হইতে পারে। কিন্তু ফলে তাহা কই? অনেক কার্য্য যেমন পৌরুষ সাক্ষেপ, অনেক কার্য্য আবার তেমনই যোষিৎযোগ্যতাকে অপেক্ষা করে। অতি কৃচ্ছ্রকর কঠোর কৃত্যে পুরুষ যেমন পটু কোমল ক্রিয়াকলাপে কোমলাঙ্গীও সেই প্রকার প্রবীণা। বীর, বীভৎস, অদ্ভুৎ, ভয়ানক এবং রৌদ্ররসঘটিত ব্যাপারপরম্পরায় পুরুষের প্রায় অবিচ্ছেদ সম্পর্ক। শান্তকরুণাদিরসে নারীত্বেরও পূর্ণোদ্গম। নারীভাবই কোমলতা এবং পুরুষ কঠোরতা। সংসারাশ্রম এই কঠোর কোমল ভাবদ্বন্দ্বেরই লীলাভূমি। ইহাদের একের অভাব অন্যে পূরণ করিতে পারে না। নারীর পতির জন্য আত্মবিস্মৃতি এবং অপত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ পুরুষপ্রকৃতির বিষয়ীভূত নহে। রোগে, বিপদে, ভগ্নোৎসাহে, শোকে, তাপে পুরুষের যখন অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয়, তখন তাহার জ্বালা জুড়াইতে একমাত্র পারগ কেবল নারী। আবার তেজোবীর্য্যগাম্ভীর্য্যাদিব্যঞ্জক কার্য্যে পুরুষের যেরূপ ক্ষিপ্রহস্ততা, নারীর তাহা স্বপ্নেও উদীর্ণ হয় না। ইহা হইতেই সপ্রমাণিত হইতেছে, নারী এবং নর উভয়ই কোন কোন অংশে অঙ্গহীন, দুর্ব্বল। সেই সেই দৌর্ব্বল্য জন্য কেবল নারীকে পুরুষের কেন, উভয়কেই উভয়ের কিঞ্চিন্মাত্রায় পারতন্ত্র্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সেই পারতন্ত্র্য প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহচর্য্যেরই রূপান্তর মাত্র। বস্তুতস্তু রমণী পুরুষের সখী এবং পুরুষ রমণীর সখা; ক্রীতদাস বা কৃতদাসী নহে।

রমণী অনাত্মবন্ত নিকৃষ্টজীব, সুতরাং পুরুষ পরতন্ত্র,—এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদনার্থ একটী অতি অদ্ভুৎ যুক্তির অবতারণা হইয়া থাকে। যুক্তি এই;—রমণী-প্রতিভায় দর্শন-বিজ্ঞানাদির কূট অথচ অতি অপূর্ব্ব তত্ত্বাদির ছায়া কখন পতিত হয় না! তত্ত্বাবতে পুরুষত্বেরই স্বাধিকার! নারীর উদ্ভাবিনী বা আবিষ্করিণী শক্তি নাই!

অন্যান্য যুক্তির ন্যায় এ যুক্তিটিও নিতান্ত ক্ষীণ, অঙ্গহীন। কেন-না উচ্চতন্ত্রের শাস্ত্রকলাদি রমণীমস্তকে অদ্যাপি স্ফূর্ত্তি পায় নাই বলিয়া যে তত্ত্বাবতে রমণীর স্বত্বাধিকার নাই, রমণী মস্তিষ্ক উদ্ভাবিনী বা আবিষ্কারিণী শক্তির অধিষ্ঠানভূমি নহে, এ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। গিরি এবং বৃক্ষাকারের তলবর্ত্তী ক্লিন্ন কর্দ্দম-

রাশিতে যে সমস্ত অমূল্য মহানিধি সৃষ্টির পত্তনাবধি বিলুণ্ঠিত হইতেছে, কোন না কোন দিন তাহাদের চাক্‌চিক্যে সংসার উদ্ভাসিত হইবে না, এ কথা কে বলিল? কে বলিল, নদী যে কূল ভাঙ্গিতেছে, চিরকালই সেই কূল ভাঙ্গিবে; কস্মিন্‌কালে তাহা পূর্ণ হইবে না? পৃথিবীর যে সমস্ত পতিতভূমি অপবৃক্ষে বা বালুকাস্তোমে আকীর্ণ হইয়া অনাদৃত হইতেছে, এক দিন কি তাহা পরম প্রার্থনীয় কল্পবৃক্ষের প্রসূতিস্থানীয় হইতে পারে না?

চিরন্তন কিছুই নহে। আজ যাহা দেখিতেছি, কালে তাহা থাকিবে না। পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন তাহা নাই এবং পরে যাহা হইবে, অদ্যাপি তাহার সূচনা হয় নাই। সৃষ্টির জন্মতিথি হইতে বোধ হয়, লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত গর্ব্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাড়িতবার্ত্তাবহ, বাষ্পীয়জান প্রভৃতি যে সমস্ত মহা বিস্ময়াবহ বৈজ্ঞানিক বীজসন্দোহ আধুনিক মানবমস্তিষ্কে অঙ্কুরিত, পরিবর্দ্ধিত ও ফলপুষ্পিত হইয়া মধুর পরিমলে দিগন্ত আমোদিত করিয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষগণের তত্তৎসম্বন্ধে আদৌ কোন সংস্কার ছিল কি না, তাহার বিশ্বাসজনক কোন প্রমাণই নাই। ইহাতে কি ইহাই স্থির করিলাম যে, পূর্ব্বকালীন পুরুষগণ নিতান্ত উষরমস্তিষ্ক লইয়া ঘরকন্না (গৃহস্থালী) করিতেন? তাঁহাদের উদ্ভাবিনী বা আবিষ্কারিণী শক্তি ছিল না, কালে উহা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ভাল, যদি তাহাই হয়, তবে অনুরূপ অভিনয় রমণীরঙ্গভূমিতে ঘটিবে না কেন? আর যদি মানিতে হয়, আজ পুরুষ যে যে শক্তির অহঙ্কারে নারী জাতিকে দাসীত্বশৃঙ্খলে নিবদ্ধ করিতে চান, তাঁহার ঊর্দ্ধতন পুরুষগণও সেই সেই মহীয়সী শক্তিসমন্বিত ছিলেন, কেবল নৈসর্গিক বা লৌকিক বাধায় তাহা কার্য্যে অবর্থ হইতে পায় নাই। তবে অবশ্য স্বীকার্য্য রমণীমূর্দ্ধায়ও সেই শক্তি পূর্ণায়বে পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে; অদ্যাপি বিকসিত হয় নাই, পরে হইবে, বা হইতে পারে। আর অদ্যাপি বিকাস পায় নাই বলিয়া যদি তাঁহাকে পুরুষপরতন্ত্রা হইতে হয়, তবেত বলিতে পারি, পূর্ব্বতন পুরুষগণ ঐ ত্রুটিজন্য দাসত্বে জীবনক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পুরাণপ্রমুখ ইতিহাসাদি পুরুষের সেরূপ দাস্যভাবের কোন আভাস দেয় না। পক্ষান্তরে সুতরাং বলিতে হইতেছে, নারীর উদ্ভাবনী শক্তির অপরিস্ফুটভাব তদীয়া চিরন্তন দাস্যবৃত্তির নিয়ামক হইতে পারে না।

আর এক কথা, যাহা সমষ্টিতে নাই, তাহা অংশে থাকিতে পারে না; আর যাহা সমষ্টিতে বিদ্যমান, অংশে তাহারই অধিকার বর্ত্তে। কালে সে অধিকারের তামাদি অর্থাৎ স্বত্বলোপ হয় না। তবে ঘটনার সংঘর্ষণে অধিকারের দৃশ্যতঃ ন্যূনাতিরেকে ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু মৌলিক বিপর্য্যয় ঘটেনা। একটি দীপকোষ্ঠী লইয়া পরীক্ষা কর। ইহার সমগ্রে যে আগ্নেয় পদার্থ, একটি অংশেও তাহা বিদ্যমান আছে। ইহার এরূপ একটি খণ্ডই অপ্রসিদ্ধ, যাহাতে তৈজস পদার্থটুকু নাই। যে ভাগটি ঘর্ষণ কর না কেন, সেইটীই অগ্নি উদ্গীরণ করিবে। আবার ঐ ঘর্ষণরূপ ঘটনার সম্পাত

না হইলে অগ্নির অগ্নিত্ব যাইবে না, উহা গন্ধকাষ্টিকার লিঙ্গশরীরস্থ হইয়া থাকিবে, কেবল বাহিরে প্রকাশ পাইবে না।

রমণী একটি সংহতি, মনুষ্যমাত্রেই তাহার অংশ। কেন-না কতিপয় বিন্দু মাতৃ-শোণিত মানব মহাপ্রাণির জৈব চেষ্টার উপাদানভূত। সংহতির গুণ অবশ্যই অংশে বর্ত্তিবে। নারীতে যাহা কিছু থাকিতে পারে, নারীর অংশীভূত অপরা নারী বা পুরুষান্তরে তাহাই পূর্ণমাত্রায় স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকিবে। তাহার অন্যথা এক কালীন অসম্ভব। আর যাহা মূলে নাই, তাহা অংশেও থাকিবে না। পুরুষ জননীজরায়ুর কতিপয় কণিকামাত্র। পুরুষের যাহা কিছু পুঁজি (সঙ্গতি), সকলই সেই জরায়ু হইতেই প্রাপ্ত। উদ্ভাবনী শক্তিই বল, আর আবিষ্ক্রিয়া শক্তিই বল, সকল শক্তিই সেই মহাশক্তি হইতে উৎসারিত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত শক্তির আবেশ বশতঃ স্পর্দ্ধা প্রকাশ পুরুষের পক্ষে ঔদ্ধত্য মাত্র। চন্দ্র-তারার স্নিগ্ধ কৌমুদী গৌরবের সামগ্রী বটে, কিন্তু স্পর্দ্ধার সামগ্রী নহে। কেন-না, সে দ্যুতি উহাদের নিজস্ব নহে; উহা সূর্য্যচ্ছটার প্রতিবিম্বমাত্র। পৌরুষ সেইরূপ নারী-শক্তির প্রতিফলা। উহাতে যদি স্পর্দ্ধার কিছু থাকে, তাহা নারীর, পুরুষের নহে। নারীত্বের কণমাত্রের সংক্রমণে পুরুষত্বের যদি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের শক্তি হয়, তবে পূর্ণত্বের অধিষ্ঠান-ভূমি সেই নারীত্বের সে শক্তি জন্মিবে না কেন? নারী কিসে পর-তন্ত্র?

এখন কথা হইতেছে, নারীকে সংহতি বা পূর্ণশক্তি এবং পুরুষকে তাহার অংশ বলিয়া স্বীকার করি কেন? নারী আধার, পুরুষ আধেয় বলিয়াই কি এই পরিকল্পনা? ভ্রূণের সংস্থানপক্ষে আর্ত্তব ভিন্ন অন্য কোন উপাদানের প্রয়োজন নাই? যদি সিদ্ধ হয়, আর্ত্তবই শিশুৎপত্তির মূলীভূত, তবে অবশ্যই রমণীকেই মানবজীবস্রোতের মূল প্রস্রবণ বলিয়া মানিতে হইবে। এখন দেখা যাউক, বিচারে কিরূপ দাঁড়ায়।

জরায়ুজ জীবোৎপত্তির মূলমন্ত্র প্রসঙ্গ ক্রিয়া; জননেচ্ছা সে মৈথুনচেষ্টার পূর্ব্ব-রূপ। অন্তঃকরণে উৎপাদনেচ্ছা বলবতী না হইলে ইন্দ্রিয়ের উন্মেষ বা সুরতচেষ্টা হয় না। জীব সেই সুরতচেষ্টার পরিণাম-ভূত। স্থির হইল, অগ্রে জননেচ্ছা, পশ্চাৎ প্রসঙ্গতি, অতঃপর জীবোৎপত্তি। জরায়ুজ জীবের জন্য-কারণ, যেমন গর্ভাধান, গর্ভাধা-নের জন্য-কারণ জননেচ্ছা, তেমনি জননে-চ্ছার স্থিতিক্রম কোথায়? মূলে অপত্যোৎ-পাদনের প্রবৃত্তি কার? মনুষ্য একটি জরা-যুজ জীব। মনুষ্যের উৎপত্তিগত মৌলিক বীজ কি? পুরুষ, না স্ত্রী? না উভয়? মনু-ষ্যোৎপত্তির আদিতে পুরুষ নহে, স্ত্রী। কেন-না, পুরুষে সঙ্গতীচ্ছা হইলে পাত্রী অভাবে শুক্র উচ্ছসিত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি কোনরূপে সেই শুক্রকে স্খলিত হইতে না দিয়া স্তম্ভন করিয়া রাখা যায়, তথাপি জরায়ু এবং আর্ত্তবাভাবে ভ্রূণের সংস্থান এবং শুন্যাভাবে তাহার পোষণক্রিয়া চলিতে পারে না। সুতরাং পুরুষ নিজ স্তম্ভিত শুক্রদ্বারা জীবস্রোতঃ রক্ষা করিতে

অসমর্থ। আদিমানব পুরুষ হইলে সেই পুরুষেই তাহার প্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইত, এত দিন মনুষ্যত্বের চিহ্ন থাকিত না। অতএব অবশ্য স্বীকার্য্য, রমণীই মনুষ্যের বীজভূত। নরনারী-প্রবাহ সেই উৎস হইতেই উৎসারিত হইয়া চলিয়াছে। যৌবন সংক্রমণে জননেচ্ছার উচ্ছ্বাসনিবন্ধন সুরতপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় আদিপ্রকৃতির আর্ত্তবস্তম্ভিত হইয়া গর্ভকোষে নীত হইয়া থাকিবে। তাহাতেই পুত্রকন্যাদির উৎপত্তি এবং স্তন্যে পোষণক্রিয়া নিষ্পাদিত হইয়াছিল। পরে সেই সমস্ত বীজ হইতে কালে জননচেষ্টার প্রকৃত চর্চ্চা আরম্ভ হইয়া অসংখ্য নরনারীর অভ্যুত্থান হইয়াছে। নারীর স্বয়ংগ্রাহ গর্ভ অপ্রসিদ্ধ নহে। কৃষ্ণ, ভগীরথ প্রভৃতি মনীষীগণের জন্ম সংবাদে প্রসূতির পুরুষপ্রসক্তির আভাস পাওয়া যায় না। অপরন্তু ঋষিপ্রণীত মূল চিকিৎসাগ্রন্থেও পুরুষসংস্রব ব্যতীত নারীর গর্ভ ধারণের ভূরিশঃ উল্লেখ আছে। "ঋতুস্নাতাতু যা নারী স্বপ্নে মৈথুনমাচরেৎ। আর্ত্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি।" ঋতুস্নাতা নারী স্বপ্নাবস্থায় স্বগত সুরতক্রিয়াবতী হইলে আর্ত্তবশোণিত বায়ুকর্তৃক জরায়ুতে নীত হইয়া গর্ভোৎপত্তি হয়। সেই গর্ভে পুরুষও জন্মিতে পারে, স্ত্রীও জন্মিতে পারে। সুতরাং মীমাংসা হইতেছে, মনুষ্যজীবের উৎপাদনজন্য মূলে একটি পুরুষের, কিংবা একবারে একটী পুরুষ এবং একটী স্ত্রীর সৃজন হয় নাই। একমাত্র স্ত্রীই যখন সেই প্রয়োজন সাধনে পর্য্যাপ্ত, তখন একটি মাত্র রমণীই মানবজাতির আদি সৃষ্টি, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। সেই আদ্যা প্রসূতি সামান্যা নহেন। সমগ্র মানবজাতির সমগ্রসীভূত শক্তিও সেই ভূমার মহীয়সী শক্তির নিকটে বিদ্যুৎ—সন্নিকৃষ্ট খদ্যোতালোকের ন্যায় তুচ্ছ। সে শক্তির ইয়ত্তা করা যায় না। মানব নিজের যে কোন শক্তির গৌরব করুক না কেন, উদ্ভাবনীশক্তিই বল, আর আবিষ্ক্রিয়া শক্তিই বল, সকল শক্তির মূলপ্রস্রবণ সেই আদ্যাপ্রকৃতির মহাশক্তি। তাই শাস্ত্রে তাঁহাকে মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তি বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। নারীমাত্রে সেই শক্তির অনুকৃতি। নারীই জননী, নারীই জায়া; পুরুষের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি স্থান—নারী। কোন্ পাষণ্ড সেই আরাধ্যবস্তু জননীস্থানীয় রমণীকে পারতন্ত্র্যনিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চায়। কার্য্যতঃ সেরূপ করা দূরে থাক, তাদৃশী কল্পনাও মহাপাতক।

একা নারী জীবস্রোতঃ রাখিতে পারেন, এক পুরুষ পারেন না। অথচ প্রভুশক্তি চালনে শেষোক্তেরই অধিক আগ্রহ, ইহাই আশ্চর্য্য!

> হৃদয়ং জায়তে পূর্ব্বং কৃতবীর্য্যোঽহ বদনম্মুনিঃ।
> বুদ্ধেশ্চ মনসশ্চাপি যতস্তাৎ স্থানমীরিতং॥
> পারাশর্য্য ইতি প্রাহ পূর্ব্বং নাভিঃ সমুদ্ভবঃ।
> প্রাণো যত্র স্থিতো দেহং বর্দ্ধয়ত্যাশু সংযুতঃ॥

কৃতবীর্য্য ঋষি বলিয়াছেন, বুদ্ধি এবং মনের অধিষ্ঠানভূমি যে হৃদয়, তাহার উৎপত্তি বা গঠনক্রিয়া গর্ভমধ্যে অগ্রে সম্পন্ন হয়। ব্যাস বলেন, নাভিই অঙ্গসমূহের আদিভূত। প্রাণ তাহাতে অবস্থিত হইয়া তেজোদ্বারা দেহ বর্দ্ধন করে। হৃদয়ই অগ্রজ হউক, আর

নাভিদেশই অগ্রজ হউক, এই হৃদয় বা নাভি মাতৃসম্পত্তি, ইহাতে পিতৃঔরসের কার্য্যকারিতা নাই। চিকিৎসাশাস্ত্র বলেন ;—

মাংসাসৃঙ্ মজ্জ মেদাংসি যকৃৎপ্লীহান্ত্রনাভয়ঃ
হৃদয়ঞ্চ গুদঞ্চাপি ভবন্ত্যেতাণি মাতৃজঃ।

অর্থাৎ হৃদয় নাভীত্যাদি মাতৃজাত। পুরুষ যে বুদ্ধি কৌশলের স্পর্দ্ধাক্রমে নারীকে চরণতলে রাখিতে চাহেন, সেই মনোবুদ্ধির কেন্দ্রীভূত হৃদয় এবং শারীরিক তেজের আধারস্বরূপ যে নাভিদেশ, তাহা জননীজরায়ুর অভ্যন্তরস্থ কতিপয় বিন্দু আর্ত্তবমাত্র। অথচ (নারীরূপ) সংহতির উপরে প্রভুত্ব স্থাপন জন্য অংশের (পুরুষের) আব্দার খুবই।

এক্ষণে কথা হইতেছে,যদি পুরুষ—শক্তি, নারীশক্তির অংশমাত্র হইল, তবে অংশে যে শক্তির এতাদৃশ উন্মেষ, সংহতিতে সেরূপ নহে কেন? কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিকী গবেষণায় নারীর প্রতিভা প্রস্ফুটিত হয় নাই কি জন্য? নারী কেন সে জন্য পুরুষের অধমর্ণত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছেন? কালে শক্তির স্ফূর্ত্তি হইবে ; নদীর একূল ভাঙ্গিয়াছে,কালে ওকূল ভাঙ্গিবে ; কেবল এই আশ্বাসই কি সেই অধমর্ণত্বের নিষ্ক্রয়? না শুধু তাহা নহে। পুরুষের পশুবল বহুলাংশে নারীপ্রকৃতি স্তিমিত করিয়া ফেলিয়াছে। শরীরিক দৌর্ব্বল্য জন্য নারী হঠকারিতায় পশ্চাৎপদ। তাই তিনি দাম্ভিক পুরুষের মুষ্টিগত। গৃহের তৈজস পত্রাদির ন্যায় পুরুষ তাঁহাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। তাঁহার যে সুকোমল গুণগ্রামের জন্য পুরুষ ঋণী, পারতন্ত্র্য তাহার প্রতিদান।

পৃথিবীর যে অংশে যাও, মনুষ্য যে খানে আছে,সেই খানেই এই রহস্য—নারী ক্রীতদাসী! নারীর সাধ্য কি, বিপথগামী ভর্ত্তার অসৎ চিকীর্ষায় আপত্তি করেন। 'পুরুষ যাহা বলিবেন, নারী তাহা অবিচারে পালন করিতে বাধ্য। দুশ্চেষ্টিতই হউক, আর সুচেষ্টিতই হউক, পুরুষের কোন কার্য্যে নারী হস্তার্পণ করিলে দণ্ডপারুষ্যপ্রভৃতি অশেষ বিড়ম্বনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হয়। বাস্তবিক তিনি হস্তপদাদিসত্ত্বে পঙ্গু, তাঁহার স্বাধীনতা নাই। স্বামী সুশীল অনকূল হইলেও তাঁহার বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পরকীয়া বা প্রতিকূলারতো কথাই নাই, অশেষ গুণালঙ্কৃতা অনুকূলা পত্নীও সমর্থা হয়েন না। সঙ্ক্ষেপতঃ নারীকে বিলাসপুত্তলী ও ক্রীতদাসী করিয়া রাখাই পুরুষমাত্রের প্রতিজ্ঞা। পুত্তলী অঙ্গবিক্ষেপ বা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে না, যেখানে রাখ, সেই খানেই থাকে। পুরুষের ইচ্ছা, নারী সেইভাবে থাকিয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করে। তাঁহার সে ইচ্ছা তদীয় পাশবশক্তির অনুবলে সর্ব্বাংশে সিদ্ধ হইয়াছে। স্বার্থপর পুরুষের এই হঠকারিতা দোষেই, নারীর এই স্বাতন্ত্র্যলুপ্তি জন্যই তাঁহার সেই মহতী শক্তির অধোগতি হইয়াছে। শাস্ত্রকলা দর্শন বিজ্ঞানাদির কূটসমস্যা পূরণে, নূতন কোন তত্ত্বের আবিষ্করণে বা উদ্ভাবনে তাঁহাকে যে অগ্রগামিনী হইতে দেখা যায় না, পরতন্ত্রতা তাহার প্রধানতম কারণ।

স্বাধীনতা স্বর্গীয় সম্পত্তি। দুর্ব্বলই বল, সবলই বল, জীব-জগতের অতি নিকৃষ্ট সৃষ্টি হইতে চরমোৎকর্ষ পর্য্যন্ত সকলেই প্রচুর পরিমাণে সেই ধনে ধনী। সে ধন পশুর আছে, কীট পতঙ্গ পক্ষীর আছে; জীবমাত্রেরই সে ধন আছে; নাই কেবল হতভাগিনী রমণীর। পারতন্ত্র্য প্রবণা প্রকৃতি বলিয়া যে অবলা সেই মহাধনে দরিদ্র, তাহা নহে। জগন্ময় ঢালিয়া দিতে দিতে বিশ্বময়ী প্রকৃতির ভাণ্ডার শূন্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া যে রমণী সেই অমূল্য মহারত্ন স্বাধীনতাধনে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহাও নহে। সকলে যেমন স্ব স্ব অংশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনিও সেইরূপ আপনার প্রাপ্যাংশভাগিনী হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা তিনি পাইয়াছিলেন, প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দগ্ধ পাশব বলের অত্যাচারে, মানবের জুগুপ্সিত স্বার্থপরতার প্রবলতাড়নায় তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছেন; শুদ্ধ কেবল তাহাই কেন, তাহার সহিত আত্ম হারাইয়াও ফেলিয়াছেন। তাই তাঁহার এত দুর্গতি, আর তাঁহার দুর্গতিতে অর্দ্ধসমাজের কেন, সমগ্র লোকমণ্ডলীর এত অবনতি।

রমণীর সংসারলীলার নিয়মপত্র পুরুষের হাতে। পুরুষ তাঁহার জীবনচর্য্যার বিধাতা। সেই বিধাতার রুচিতে তাঁহাকে আহার করিতে হইবে; সেই বিধাতার প্রদর্শিত পন্থায় তাঁহাকে পরিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু এত করিয়া মনঃ যোগাইয়া তিনি কি পাইবেন? স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে, সকল বিষয়ে নিজ সুখশান্তি-ত্যাগস্বীকারের বিনিময়ে তাঁহাকে কি দিয়া সেই কূটবিধাতাপুরুষ পরম বিধাতার নিকটে নিকাশ দিবেন? প্রতিদান অপরূপ—স্ত্রী অবিশ্বাসী, স্ত্রী অসতী, "স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী"! পশুবলদৃপ্ত নির্ব্বোধ পুরুষের সংস্কার, নারী সাপিনী; পুরুষ সসর্প গৃহে প্রাণটি হাতে করিয়া বাস করেন। যাহার প্রতি এত অনাস্থা, "যাহার নামে উপবাস, তাহার সঙ্গে বাস" করিয়া পুরুষ যেমন অসুখী, আর পরার্থপরতার যূপকাষ্ঠে স্বাধীনতার সহিত আত্ম বলি দিয়া নারীও সেইরূপ অসুখী। নারীর দুঃখ —নারীত্ব হারাইয়া; পুরুষের কষ্ট—নারীর প্রতি বিক্রিয়াশীল হইয়া। এই কষ্টের জন্যই পুরুষ স্বাধীনতা স্বত্বেও যাহা করিতে পারিতেন, তাহার শতাংশের একাংশও পারেন নাই। কল কৌশল প্রভৃতি যাহা কিছু আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হইয়াছে, পুরুষ যদি নারীনির্য্যাতনে ব্যাপৃত না হইয়া কেবল নিজ পুরুষত্ব লইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহা দ্বারা না জানি, আরও কত কার্য্য সাধন হইত। সমাজের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিনী নারীও নিশ্চিন্তা থাকিতেন না। তিনিও স্বাধীনভাবে অনেক তত্ত্ব উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করিতে পারিতেন। আবার নরনারী পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া অন্যোন্যের উপদেশ এবং সাহায্যক্রমে মনুষ্য সমাজকে অপূর্ব্ব দৈব সজ্জায় বিচ্ছুরিত করিতে পারিতেন। নারীকে স্বায়ত্ত রাখিবার জন্য অবগুণ্ঠনের পর অবগুণ্ঠন, প্রাচীরের পর প্রাচীর, গোলা গুলি বন্দুক কামান অসি কোদণ্ডাদির রক্ষাবন্ধ প্রস্তুত করিতে গিয়া অনর্থক পুরুষের যে সময় ব্যয়িত হইয়া যায়, স্ত্রী পুরুষ অক্ষুন্ন

অথচ পবিত্র স্বাতন্ত্র্যে থাকিলে সেই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত শত অপৌরুষেয় ব্যাপারই না সাধিত হইতে পারিত। কিন্তু হায়! স্বার্থপরতা সব মাটি (পণ্ড) করিয়া দিয়াছে; সঙ্কীর্ণচিত্ততার সহিত অপবিত্রতার উদ্বাহ-সংস্কার ঘটাইয়া সংসারটাকে একবারে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিয়াছে!

বিন্ধ্যাচলবাসিনী নবীনা তাপসী এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়াই কি সংসার প্রশ্নে এ যাবৎ পদার্পণ করেন নাই? হইতে পারে; তাঁহার বর্ত্তমান উদাসভাব দৃষ্টে তাহাই হৃদয়ঙ্গম হয়। বামনয়নার সুগঠিতাঙ্গে যৌবনস্ফূর্ত্তি পূর্ণভাবে দেদীপ্যমান। ভস্মের পরাগ, অক্ষমালা, গৈরিক চেলবস্ত্র বা তপশ্চর্য্যার কঠোরতা তাহা সম্পূর্ণরূপে বিচেষ্টিত করিতে পারে নাই। সেই দুইটী বিকসিত নেত্রে দুইটী স্ফুটন্ত ইন্দীবর; তাহাদের মধ্যবিন্দু হইতে দুইটী ক্ষণপ্রভা মধ্যে মধ্যে চমকিত হইতেছে, আর সেই তীব্র বিদ্যুচ্চমকে স্তম্ভিত হইয়া যেন দুইটী সুকৃষ্ণ ভ্রমরপংক্তি ললাট ও নেত্রসীমার সন্ধিস্থলে পদ্মমধুর আশায় আসীন হইয়া আছে। সেই পূর্ণায়তন মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণবিকাস; লালিত্যে চন্দ্রিকা নির্গলিত হইতেছে। কি সুন্দর কণ্ঠদেশ, তাহাতে অক্ষমালার কি মধুময় সমাবেশ! বক্ষঃসঞ্চারিত সুবঙ্কিম বর্ত্তুলযুগলের মধ্যলীন মাতৃযোনীরই বা কি মধুর বেপন! তাপসীর সকলই সুমধুর; বাক্যে মধুরতা; রূপে মধুরতা; গঠনে মধুরতা। যৌবন যেন ললনার সকল অঙ্গে মধু ঢালিয়া দিয়া মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছে। বড় দুঃখ, সে মধু বিজ্যের একান্ত প্রদেশেই ক্ষরিত হইয়া যাইতেছে; বন, আর বনের পশু পক্ষী ভিন্ন সে মধুর স্বাদগ্রহ করিবার কেহ নাই। যুবত্বের সেই রুচিকর অম্লমধুর রসে তাপসীর অন্তরের রসনা চেতিত হইয়াছে কি না, জানি না। তবে তাঁহার কথার আভাসে বুঝা গিয়াছে, তাঁহার চিত্ত সংসারের স্রোতোহভিমুখে চলিয়াছে। সংসার মাখিব না বলিয়া তাঁহার যে পণ ছিল, তাহার গ্রন্থি খুলিয়া গিয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন, সংসারের আকর্ষণ দুশ্ছেদ্য। আশ্রমী হও, আর অনাশ্রমীই হও, তুমি যতক্ষণ তোমার তুমিত্বে জাগরুক, ততক্ষণ তুমি তোমার নহ; তুমি সংসারের। যখন তোমার তুমিত্ব গেল, যাহার অস্তিত্বে সেই তুমিত্বের সংস্থান, তখন সেই বিশ্বপ্রকৃতিও তোমার গেল। ভাবে বুঝা গিয়াছে, তপস্বিনী এখন আত্মস্থা নহেন, সংসার তাঁহার আত্মসংস্থিতি কাড়িয়া লইয়াছে। তাহা না হইলে তাঁহার চিত্তব্যসঙ্গ জন্মিবে কেন? তিনি এখন আর তাঁহার নাই, সংসারের হইয়াছেন।

জাগতিক জীবের এই দশা। সংসারের কুচক্রে ভয় পাইয়া জীব অগ্রে ব্যাবৃত্ত হয়, কিন্তু শেষে আর থাকিতে পারে না; শলভের ন্যায় সেই অগ্নিতেই ঝাঁপ দেয়। সন্ন্যাসিনী সংসারে ঝাঁপ দিলেন; স্বর্ম্মের সহিত বিভূতিলেপ কমণ্ডলুর জলে ধুইয়া ফেলিলেন; অক্ষমালা অঙ্গ হইতে অপসারিত করিলেন। উর্দ্ধমুখী হইয়া তারস্বরে কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন;—

দুর্ব্বলের হরি! দরিদ্রের হরি! দুঃখতাপীর দুরিতহারি হরি! দাসীর এখন পরাগতি

কি? সংসারপ্রকৃতির দুর্নিবার আকর্ষণে আমি যে আত্ম হারাইতে বসিয়াছি। নাথ! আমার গতি কি হইবে? আমি যে কোথায় আসিয়াছি, আবার কোথায় যাইব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি অবলা, আমার বল নাই; দয়াময়! আমি কিরূপে সংসারের কূটচক্রের সংঘর্ষণে আত্মরক্ষা করিব? এতদিন আমি সংসারে ছিলাম না, ভাবনাও ছিল না; কেবল তোমাকে লইয়াই নিশ্চিন্ত ছিলাম। এখনও সেই তুমি আছ, কিন্তু আমি নাই; সংসারে আমি হারাইয়া গিয়াছি। সুতরাং সকল সময়ে তোমাতে চেতিত থাকিতে পারিব কি না, জানি না। দীনবন্ধু! তাই বলিয়া আমাকে ভুলিবে কি? না, তা হবে না। তোমার চিহ্নিত দাসীকে নিদ্রিতে জাগ্রতে দেখিতে হইবে।

"এস জগৎ, এস; তোমাকে আলিঙ্গন করি। আমি আর আপনাকে লইয়া থাকিতে পারি না। যখন পরের জন্য প্রাণ পাগল, উদয়ন অঞ্জলিকার দুঃখে মর্ম্মান্তিক কাতর, তখন আর আমি আমাতে কই? আর আমাতে যখন আমি রহিতে পারিলাম না, হে সংসার! তখন তোমার আশ্রয় ছাড়িয়া কোথায় যাই? দাও, তোমার বাধা মাথায় তুলিয়া দাও, বহিতে বহিতে জীবন কাটাইয়া দিই। তোমারই ভয়ে তোমা হইতে দূরে লুকাইয়া মনের সুখে স্বাধীনভাবে ছিলাম, তোমার তাহা সহিল না। লও, হৃদয়ের সুখশান্তি হরণ করিয়া লও, পারতন্ত্র্যের লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখ, আর আমা হইতে আজ পর্য্যন্ত তোমার যে কিছু ক্ষতি হইয়াছে, মনের সাধে তাহার প্রতিক্রিয়া কর। দূরস্থ ছিলাম, দ্বারস্থ হইলাম; তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, কর। আমি অকাতরে সব সহিব; আর তোমাকে ছাড়িব না।

শ্রীকেদারনাথ মিত্র।

কেনারাম সরকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমি বলিলাম, কলিকাতা হইতে শীঘ্র আমার টাকা বাঁকুড়ায় পৌঁছিবে, তৎপরেই আমি এখানে আসিয়া দাদনের টাকা দিব। কেনারাম বলিল—আপনি যখন বাঁকুড়া হইতে এখানে আসিবেন, তাহার পূর্ব্বেই আমাকে সংবাদ দিবেন, তাহা হইলে আমি নিজে গিয়াই আপনাকে সঙ্গে করিয়া আনিব। নচেৎ টাকা কড়ি লইয়া আসিবেন, এ পথে বড়ই দস্যুভয়। আমি বলিলাম—টাকা পৌঁছিবামাত্রেই তোমাকে সংবাদ দিব।

এতদিন পরে আমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল, পরিশ্রম যে সফল হইবে, একথা ও বিশ্বাস জন্মিল, মনে মনে বড়ই আনন্দ উপস্থিত হইল। কিন্তু সে লোকটার দলে শুনিলাম ৪।৫ শত লোক, তাহাকে গ্রেপ্তার করাতো সহজ নহে।

এই ক্ষণতো আমার সঙ্গে, ৩। ৪ জন মাত্র লোক আছে, এই সময়ে যদি ঘুণাক্ষরে কোন কথা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে প্রাণ রক্ষা করিয়া যে দেশে ফিরিয়া যাইব, এ আশা নাই। সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ-ভবনে উপনীত হইলাম। কেনারামের সহিত যে কথোপকথন হইল, ব্রাহ্মণকে সমস্তই বলিলাম। টাকা আসিলে কেনারামকে সংবাদ দিব, একথাও বলিলাম। সমস্ত কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—যদি আপনার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেনা-রামের সহিত "কারবার আরম্ভ করিবেন। দুধের চৌকি বিড়াল, আর টাকার চৌকি কেনারাম!" আপনি ভদ্র সন্তান; কেন বিদেশে বিপন্ন হইয়া প্রাণ হারাইবেন?" যাহা হউক, আমি উক্ত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাঁকুড়া আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পুলিশ সাহেবকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলাম। আরও বলিলাম, এক খানি গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই দস্যু বৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে, সমস্ত লোকের ঘর খানাতল্লাসী করিতে হইবে, সুতরাং লোকবল অধিক থাকা নিতান্তই আবশ্যক। সাহেব আমার কথা শুনিয়া ২০০ শত পুলিশ প্রহরী চৌকিদারকে আমার সমভিব্যাহারে দিতে স্বীকৃত হইলেন। আরও বলিলেন, আমি নিজে তোমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি। আমি সাহেবকে সেলাম করিয়া বলিলাম—আপনি গেলে অবশ্যই আমার সুবিধা হইবে, সাহায্য হইবে, কিন্তু আপাততঃ গোপনভাবে যাইতে হইবে, যদি দস্যুদল পূর্ব্বে কোন সংবাদ পায়, তাহা হইলে সমস্তই বিফল হইবে। আমি এই সকল লোকদিগকে লইয়া ছদ্মবেশে পথিমধ্যে গমন করিব। আপনি আগামী কল্য সন্ধ্যার সময়ে গঙ্গাজলঘাটী উপস্থিত হইবেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কিরূপ ছদ্মবেশে যাইতে চাহেন? এই সকল লোক পৃথক পৃথক দলে কার্য্যো-পলক্ষে স্থানান্তরে যাইতেছে, এই ভাবেই গমন করা আমি স্থির করিয়াছি।

আমরা ৪। ৫ দলে বিভক্ত হইয়া এবং পুলিশ-পরিচ্ছদ গোপন করিয়া সমস্ত পথ অতিক্রম করিলাম। পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কতক, কতক সন্ধ্যার পরে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে সম্মিলিত হইলাম। রাত্রি ১০টার সময়ে ঘোড়ার ডাকে পুলিশ সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদিগের এই স্থান হইতে দস্যুদিগের আবাসভূমি ১ ক্রোশ অন্তর। রাত্রি ৪ টার সময়ে আমি দল বল সহ সেই গ্রামের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত করিলাম। সাহেবকে বলিলাম, আপনি অতি প্রত্যূষেই উপস্থিত হইবেন। পুলিশ প্রহরীগণ সেই ক্ষুদ্র গ্রামের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অতি প্রত্যূষেই সাহেব আসিলেন, আমি একদল লোক লইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। কেনারামের বাটীতে ৪ জনা এবং অপর প্রতি বাড়িতে বাড়িতে দুই দুইজন লোক নিযুক্ত করিলাম। আমার সহিত ২০০ শত হাত কড়ি ছিল, এই রূপ হুকুম দিলাম, বয়ঃপ্রাপ্ত লোক দেখিবা মাত্রেই হাত কড়ি লাগাইবে।

অতি প্রত্যূষে কেনারাম বাটী হইতে বাহির হইবা মাত্রই প্রথমেই উহার হস্তে হাতকড়ি লাগান গেল। ১ ঘণ্টার মধ্যে সেই গ্রামের প্রায় ৮০ জন লোক ধৃত করা হইল। কেনারাম সরকার প্রথম আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমাদের অপরাধ কি? কি জন্য আমাদের প্রতি এই অত্যাচার করিতেছেন? সাহেব সদম্ভে বলিলেন—"চুপরও"—

আমি বলিলাম—কেনারাম তোমার যে কি অপরাধ, তাহা মুহূর্ত্তমধ্যেই বুঝিতে পারিবে।

অদ্যকার প্রাতঃকাল কি অশুভ ক্ষণেই প্রভাত হইয়াছিল। গ্রামস্থ সমস্ত লোকই বাদী। সরকার কেনারামের হস্তে ডবল হাতকড়ি লাগান হইল। কেনারামের দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, সে এক এক বার আমার দিকে চাহিতে লাগিল, আর কালসর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। গ্রামের বয়ঃস্থ লোকদিগকে বন্দী করিয়া সকল বাটীতেই পাহারা বসান হইল, প্রথমেই কেনারামের বাটীতে খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল।

কেনারামের গৃহ হইতে ভাল ভাল শাল রুমাল বেণারসী ও বালুচরী সাটী বস্ত্র, স্বর্ণ রৌপ্যের ভাল গহনা, রূপার বাসন ইত্যাদিতে প্রায় ১০ হাজার টাকার সম্পত্তি বাহির হইল।

এই রূপ প্রত্যেক লোকের বাটী হইতে উহাদের অবস্থার অতিরিক্ত দ্রব্যাদি বাহির হইতে লাগিল।

গহনা সাল রুমাল ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী দেখিয়া সাহেব একেবারেই বিস্ময়াপন্ন ও স্তম্ভিত হইলেন। প্রায় ৭০।৮০ জন লোকের হস্তে হাতকড়ি দিয়া সহর ষ্টেসনে চালান দিলেন।

অদ্য এই গ্রামে শোকোচ্ছ্বাস উচ্চ রবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গ্রামস্থ স্ত্রীলোকদিগের করুণ রোদনে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইতে লাগিল। আমি যে এত নিষ্ঠুর, তথাপি অলক্ষিত ভাবে আমারও নয়নপ্রান্তে দুই এক বিন্দু অশ্রু বিগলিত হইল।

অদ্যকার প্রাতঃসূর্য্য গ্রামবাসীগণের পক্ষে কি অশুভ ক্ষণেই উদয় হইয়াছিল?

গ্রামের পুরনারীগণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিল, উহাদিগের স্বামী, সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত এই দেখাই শেষ দেখা।

দস্যুগণ যখন গ্রেপ্তার হইল, হাতে হাতকড়ি লাগান হইল, তখন আমার সেই পূর্ব্বপরিচিত ব্রাহ্মণ সাহেবের প্রশ্নমতে কতকগুলি কথার প্রকৃত উত্তর প্রদান করেন। দস্যুদিগের সেই কথায় বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা। কেনারামের দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, ঘন ঘন সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই ব্রাহ্মণের দিকে চাহিতে লাগিল। একবার সিংহ গর্জ্জনে কেনারাম বলিয়াছিল, ঠাকুর! এবার যদি পরিত্রাণ পাই, একথা আমার বিলক্ষণ স্মরণ থাকিবে।

ব্রাহ্মণ কাতরভাবে আমাকে বলিলেন, এ প্রযত্ন যদি বিফল হয়, দস্যুগণ যদি পরিত্রাণ পায়, তবে আমার সপরিবার সেই মুহূর্ত্তে বিনাশ করিবে।

এই ঘটনার ২।৩ মাস পরে দস্যুদিগের বিচার হইয়া, অবস্থানুসারে ৪।৫।৮ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাসের আদেশ হইল।

কিছু দিন পরে আমি শুনিয়াছিলাম, গ্রামস্থ দস্যুগণের যে দিন কারাবাসের আদেশ হইল, সেই দিন হইতে উক্ত দস্যুগণের আত্মীয় স্বজন নিতান্তই নিরাশ হইয়া পড়িল।

দস্যুবৃত্তিই গ্রামবাসীগণের জীবিকা নির্ব্বাহের অবলম্বন ছিল। সেই পথতো অবরুদ্ধ হইল, এইক্ষণ দস্যুদিগের সহায়-বিহীন পরিবারবর্গ নিতান্ত বিপন্ন হইয়া গ্রামবাসী পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইল। ব্রাহ্মণ সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। পরিশেষে দস্যু-দিগের আত্মীয় স্বজনেরা কৃষিবৃত্তি ও সামান্য ব্যবসায়াবলম্বনে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

দস্যুদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিয়মিত মিয়াদ কাল অন্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সেই ব্রাহ্মণের সদ্ব্যবহার শ্রবণ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল। ব্রাহ্মণের পরামর্শমতে অব-স্থানুরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

কত কাল।

কত কাল—কত কাল, বল, আর কত কাল,
নিরাশ ঝটিকাবাতে তরী যাবি বহিয়া।
জীবন মরুর কূলে, কত কাল রবি আর,
অনন্ত আকাশ পানে ঘুম্-ঘোরে চাহিয়া।
নিরাশ ঝটিকা বাতে তরী যাবি বহিয়া।
লক্ষ্যহীন, আশাহীন, জ্ঞানহীন শ্বাসহীন,
তরুমূলে কত কাল রহিবিরে পড়িয়া।
জীবন উদ্দেশ্য মেলে ; মৃগ তৃষ্ণিকায়ভুলে,
কত কাল যাবে বল মরুভূমে ঘুরিয়া।
কত কাল আর বল তরী যাবি বহিয়া।
ভক্তি প্রেমহীন প্রাণ, ঈর্ষাদ্বেষ ধাবমান,
স্নেহ মায়া পদতলে নত শিরে পড়িয়া।
জানাইত ভূমণ্ডল, বিষম পরীক্ষা স্থল,
প্রবীণতা লভে নর বরকিতে ঘুরিয়া।
যাও তবে মূঢ় নর তরী যাও বহিয়া।
স্বার্থ নাই—গর্ব্ব নাই, মান অভিমান নাই,
কত কাল কাটাইবি ওই গান গাইয়া।
প্রকৃতির স্নিগ্ধ কোলে, ঘুম্-ঘোরে থাক ভুলে,
নীলাম্বুর শেষ নাই তরী যাও বহিয়া।
অদৃষ্টঝটিকা বাতে তরী যাও বহিয়া।

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক।

পঞ্চপুষ্প।*

আজকাল বঙ্গ সাহিত্যের ফুলবাসর: চারিদিকেই ফুল,—পদ্যে ফুল, গদ্যে ফুল; বর্ণনায় ফুল, বিচারে ফুল; কবিতায় ফুল, প্রবন্ধে ফুল! এ ফুলবাসরে অবশ্যই সকল ফুল একজাতীয় নহে, সকল গুলিই সুশোভন নহে, সকল গুলিই সুগন্ধ নহে। বেলা, মল্লিকা, জাঁতি, যুথি, চামেলী, গোলাপের ভাগ অল্প; কুঁদ, সিউলি, গাঁদা, বন-ফুলই অধিক। আবার কখন কখন ঘেঁটু-ফুলও আসিয়া পড়ে। এখন এ পুষ্প-স্তূপের ভিতর কোন্‌টী সুগন্ধ, কোন্‌টী রমণীয় হঠাৎ বলা সুকঠিন। দেখা যাউক আমাদের সম্মুখস্থ "পঞ্চপুষ্প" স্তবকটী কি প্রকার।

"পঞ্চপুষ্প" মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ চয়ন করিয়াছেন। পুষ্পগুলি সদ্‌জাতীয় বটে, কিন্তু রম্য ও নিখুত হইলে সুখের বিষয় হইত। "ইহাতে সামাজিক, সাহিত্য এবং শিক্ষাদিবিষয়ে কতকগুলি স্থূল কথার অতি সংক্ষেপ উল্লেখ হইয়াছে মাত্র।" গ্রন্থকার প্রবন্ধে যে সকল প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন তাহাদের সত্যাসত্য বিচার ও তথ্যনির্ণয় সময়সাপেক্ষ, উপস্থিত সমালোচনায় অসম্ভব। যাহা হউক, উহা সম্বন্ধে গুটীকতক কথা বলিব। প্রবন্ধ কয়টীর ভিতর "স্ত্রীজাতির মানসিক উৎকর্ষতা" অবশ্যই বিষয়ের গুণে হৃদয়গ্রাহী (interesting); অতএব ঐটীই একটু বিস্তারিতরূপে দেখা যাউক।

"স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, ইহাদিগের প্রকৃতি ও স্বভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতমণ্ডলী যাহা চিন্তা করেন, তাহা দেখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।" এ প্রস্তাবে বোধ করি কাহারও আপত্তি নাই; তবে পণ্ডিতমণ্ডলীর মতই যে এবিষয়ের একমাত্র ভিত্তি ও পন্থা, আমরা স্বীকার করি না। পণ্ডিতের মত সকল বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ (authority), এবং এবিষয়েও authority; কিন্তু তাহাই বলিয়া উহা বেদবাক্য (only বা highest authority) নহে। স্ত্রীজাতির শারীরিক ও মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল এবং পুরুষের শারীরিক ও মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল, এই উভয়ের মধ্যে কোন প্রকৃতিগত বৈসদৃশ্য আছে কি না হঠাৎ বলা অসম্ভব। ইতিহাসের সৃষ্টি হইতে পুরুষ ও রমণীর সামাজিক অবস্থার এমত প্রভেদ ও বৈষম্য চলিয়া আসিতেছে যে উহাদের প্রকৃত স্বভাবের উপর একটা ভয়ানক অভ্যাসের আবরণ পড়িয়াছে, একটা ভয়ঙ্কর crust পড়িয়াছে; এবং সে আবরণ ভেদ করিতে না পারিলে কথিত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বিচার (scientific discussion) অসম্ভব। যদি কেহ একটী সদ্যোজাত বালক ও একটী সদ্যোজাতা বালিকাকে লইয়া লোকচক্ষুর অগোচর কোন গিরিগুহার ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া তাহাদের একই প্রকারের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া পরে তাহারা

* পঞ্চপুষ্প, মহারাজকুমার শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব প্রণীত ও সভাবাজার রাজবাটী হইতে শ্রীবঙ্কুবিহারী বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আট আনা।

পূর্ণবয়স্ক হইলে তাহাদিগকে সমাজে আনয়ন করিয়া তাহাদের উভয়ের চরিত্রের ও মানসিক স্ফূর্ত্তির উপর লক্ষ্য রাখেন,তাহা হইলে কতক পরিমাণে সত্য অবগত হইতে পারা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও গোলযোগ; পূর্ব্বপুরুষের দোষগুণ সন্তানে বর্ত্তনের আধুনিক বিজ্ঞানাবিষ্কৃত স্বাভাবিক নিয়ম (law of heredity) যদি সত্য হয়—আর আমাদের বিশ্বাস উহা অনেকটা সত্য,অন্ততঃ উহা এতাবৎ অসত্য প্রমাণিত হয় নাই—তাহা হইলে ইহা স্থির যে সহস্রাধিক বর্ষের অবস্থার বৈষম্যে,শিক্ষার বৈসদৃশ্যে,অভ্যাসের দোষে ও ঘটনার পারম্পর্য্যে পুরুষ এবং রমণীর মধ্যে এক্ষণে অনেকটা প্রকৃতিগত বৈসদৃশ্য ঘটিয়াছে। অতএব কথিত প্রস্তাবেও হঠাৎ সত্য স্থিরীকৃত হইতে পারে না ; ঐরূপ যদি বংশ পরম্পরায় করা যায় তাহা হইলে আশা করা যাইতে পারে, সত্য পাওয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় যিনি—তিনি মনীষীই হউন আর মূর্খই হউন—যিনি এ বিষয়ে যাহা বলেন সমস্ত কাল্পনিক(conjectural); এবং কাল্পনিক বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত বড় বেশী গুরু (important)মনে হয় না ; বিশেষ,যে সকল পণ্ডিতেরা স্ত্রীজাতিকে সকল বিষয়ে নিম্নস্থানীয় করিতে চাহেন, তাঁহাদের authority কখনই অধিক নহে। এস্থলে স্ত্রীলোকেরা আমাদের নিকট benefit of doubt পাইতে পারেন। আমাদের বিশ্বাস, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনও প্রকার প্রকৃতিগত প্রভেদ নাই।

এক্ষণে যদি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোন প্রকার প্রকৃতিগত বৈসদৃশ্য না থাকে, তাহা হইলে শিক্ষা বিষয়ে প্রভেদ রাখা উচিত বোধ হয় না। মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়েত কখনই পুরুষের পক্ষে এক নিয়ম ও রমণীর পক্ষে অন্য নিয়ম হওয়া উচিত নহে; শারীরিক বিষয়েও কেন শিক্ষার প্রভেদ থাকিবে বুঝিতে পারি না। মনে করুন সভ্যজগতের পূর্ব্ব ইতিবৃত্তেত বীররমণী দেখা গিয়াছে, ভবিষ্যতেই বা কেন না ঐরূপ বীররমণী দেখা যাইবে বুঝিতে পারি না। একবার জোয়ান অব্ আর্ক (Joan of Arc),ডেবোরা (Deborah),পদ্মিনী প্রভৃতির কার্য্যকলাপের জ্বলন্ত চিত্র লিখিয়া যদি ইতিহাসবেত্তার লেখনী সার্থক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেনই বা পুনরায় ঐরূপ, বা উহা অপেক্ষাও উজ্জ্বল দৃশ্য চিত্রিত করিবার সুখ হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন? এ বিষয়েরত কোন *prima-facie* কারণ দেখিতে পাই না। হইতে পারে সমাজের আধুনিক অবস্থায় উভয়কে (স্ত্রী ও পুরুষকে) একই প্রকার শিক্ষা দিলে গার্হস্থ্য জীবনের কোন অসুবিধা ঘটিবে। সে জন্য স্ত্রীলোককে যে চিরকাল নিম্নস্থানীয় হইয়া থাকিতে হইবে তাহার কারণ কি? ইহার কি যুক্তি আছে? আমরা স্বার্থপর বলিয়া এরূপ তর্ক উপস্থিত করি।

অধিকন্তু স্ত্রীজাতির আমাদের নিকট সমভাবের শিক্ষা পাইবার স্বাভাবিক স্বত্ব (natural right) আছে। আমার একটু অসুবিধা হইবে বলিয়া কি আমি অপরকে একটী স্বত্ব (right) হইতে বঞ্চিত করিতে পারি? এরূপ প্রস্তাবেত আমি দাসব্যবসা (slave-trade)'র কোন অপকারিতা

দেখি না। আমার একটী ক্রীত, নিজস্ব ভৃত্য না থাকিলে সাংসারিক কার্য্যের বড় গোলমাল হয়; তাহাই বলিয়া কি আমি ভগবান সমক্ষে উচিতমত অপরের স্বাধীনতা হরণ করিতে পারি? পূর্ব্বে এসিয়ার নরপতিরা (অনেকেই) আফ্রিকা হইতে অন্তঃপুররক্ষা জন্য নপুংসক আনাইতেন। এই জন্য আফ্রিকায় 'ফালাও' রকম (extensive scale)'এ emasculation চলিয়াছিল। স্ত্রীস্বাধীনতার বিপক্ষীয়েরা তাঁহাদের মন্তব্যের সমর্থন জন্য যে যুক্তির অবতারণা করেন তাহাতেত ঐ emasculation ব্যবসায় ঘৃণ্য হইতে পারে না। কারণ, এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের একটা সামান্য অঙ্গ—যে অঙ্গ হইতে এই পাপের বিভীষিকার উৎপত্তি ও যাহা মহর্ষি ঈশার মতে বরং নষ্ট করা শ্রেয়ঃ তথাপি পাপের দুর্নিবার যাতনা ভোগ করা উচিত নহে—সেই একটী সামান্য অঙ্গ যদি স্বার্থের জন্য নষ্ট করা অন্যায় ও ঘৃণ্য হয়, অধ্যাত্মজগতের অবিনশ্বর বৃত্তিসকলের—যে বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পুষ্টির উপর পরলোকের, অনন্তকালের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে—সেই অনন্তোন্নতিসম্পন্ন বৃত্তিসকলের সামান্য দু'দিনের হাসিখেলার সম্মোহন কুহকের জন্য শিক্ষাভাবজনিত নাশ কোন্ যুক্তিতে সৎ ও অনুমোদনীয় হইতে পারে?

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, "পুরাকালে মহিলাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা ছিল।" "সকল সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেণীর মহিলা অদ্যাবধি পুরুষদিগের ন্যায় স্বাধীনভাবে তীর্থ পর্য্যটন করিতেছেন ও বিশেষ বিশেষ স্থানে গঙ্গাস্নান করিতেছেন।" যদি স্বাধীনভাবে গঙ্গাস্নান ও তীর্থ পর্য্যটনের সহিত স্ত্রীস্বাধীনতার কোন অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে লেখকের ধারণা হয়, আমার বোধে তাহা হইলে তিনি স্বাধীনতার প্রকৃত তথ্য সম্যক্ উপলব্ধি করেন নাই। কাশীর মত স্থানে যাওয়ার যথেচ্ছাচারিতার পরিতৃপ্তিতে যদি স্ত্রীজীবন সার্থক হয়, আমার মতে সে জীবনের মূল্য নাই, সে জীবন না থাকিলেও পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয় না। আমি যে রমণীকে ভালবাসি, তাঁহাকে আমি চিরজীবন "গঙ্গাহীন" ও তীর্থস্থান হইতে শত যোজন দূরে স্থিত দেশে রাখিতে পারি, ও তাঁহার রত্নাদি সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেও পারি, কিন্তু তাঁহাকে পুরুষের শিক্ষার সমান শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিতে পারি না। এ বিষয়ে তাঁহার স্বত্ব (right) অক্ষুন্ন রাখিতে, respect করিতে কেমন আপনাআপনিই ইচ্ছা হয়।

আমার একটী স্বত্ব (right) আছে, উহা কি? উহার প্রধান চিহ্ন (differentiating property) কি? "স্বত্ব" (right) এবং "নিজস্ব" (exclusive), এই দুইটী কথা complementary,—এক অপরের অঙ্গ। স্বত্ব থাকিলেই সেটী নিজস্ব (exclusive) হইতেই হইবে, এবং উহা হইতে স্বামী(owner)'কে বঞ্চিত করা ন্যায়সঙ্গত নহে;—এক পশুবলে(brute force)'এ হইতে পারে। অতএব যদি আমরা ন্যায়ের, যুক্তির ভান না করিয়া আমাদের শারীরিক বলের আধিক্য হেতু স্ত্রীজাতিকে তাঁহাদের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করি, তাহা করিতে পারি; কিন্তু যদি ন্যায় ও যুক্তির মতে কার্য্য করি-

তেছি প্রকাশ করিয়া স্ত্রীলোককে আমাদের শিক্ষার সমান শিক্ষা দিতে বিরত হই, তাহা হইলে তাঁহার অনিষ্টের উপর তাঁহাকে অপমান করা হয়।

তাহার পর আর একটী কথা,—সমুন্নত স্ত্রীশিক্ষা হইতে সংসারে অশেষ অনিষ্ট সাধিত হইবে, অনেকের মত।

প্রথমতঃ,আমি একথাটী স্বীকার করি না। শিক্ষা হইতে অনিষ্ট ঘটে, আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তবে এরূপ হইতে পারে ও হওয়াই স্বাভাবিক, যে আমরা অশিক্ষিতা রমণীর উপর এক্ষণে যেরূপ প্রভুত্ব করিতেছি, সেরূপ শিক্ষিতা রমণীর উপর করিতে পারিব না। রমণীরাও এক্ষণে যে রূপ আমাদের সকল দৌরাত্ম্য "লাজের হাসি" হাসিয়া নীরবে সহ্য করেন, তাহা আর হইবে না। আরও হইতে পারে, দুই এক পরিবারের রমণীরা আদর্শচরিত্রা হইবেন না, কিন্তু তাহা হইতে কোন সাধারণ মত প্রকাশ করিতে পারা যায় না। এক্ষণেওত অশিক্ষিতাদের মধ্যে অনেকে দুষ্টা আছে। দুষ্ট হওয়া,"বিগড়াইয়া" যাওয়া স্ত্রীশিক্ষার অবশ্যদ্রষ্টব্য ও অবশ্যম্ভাবী ফল নহে। চরিত্রদোষ, শিক্ষার অভাব হইতেই হইয়া থাকে, শিক্ষার প্রাচুর্য্য বা আধিক্য হেতু নহে।

দ্বিতীয়তঃ, আমার বিশ্বাস আত্মা অনন্তোন্নতিশীল। পূর্ব্বজন্ম বলিয়া কোন জন্ম আমাদের ছিল কি না বলিতে পারি না; তবে ইহা স্থির যে আমাদের এই মানব জীবনের আত্মার উন্নতির উপর পরজন্মের বা পরলোকের সুখাসুখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আমার আরও বিশ্বাস ঘোর পাপীও চিরকাল আত্মার চরমোৎকর্ষ, ভগবানের পূর্ণসত্তার সহিত সাক্ষাৎ ও অবিচ্ছিন্ন যোগ (communion), হইতে বঞ্চিত হইবে না; যদি এরূপ বিশ্বাস না থাকিত, ঈশ্বর করুণায় অবিচলিত বিশ্বাস অসম্ভব হইত। ঈশ্বর করুণাময়, তাঁহার করুণায় তিনি পাপীর উদ্ধারের বিধান করিয়াছেন; কিন্তু তিনি পরম ন্যায়বান, তাঁহার ন্যায়বিধানে উদ্ধারের জন্য তাঁহার কৃপার সাহায্যে পতিত আত্মার উন্নতিসাধন আবশ্যক। নচেৎ পাপী পুণ্যবানের ন্যায় ভগবানের সহিত যোগে (communion)'র পরম সুখ লাভ করিতে পারে না। অতএব আমাদের জ্ঞানের অঙ্কুর হইতেই এই যোগসাধনা আবশ্যক। এ বিষয়ে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে সমান, রমণীর আধ্যাত্মিকতা ও মানসিক উন্নতিসাধন পুরুষের আধ্যাত্মিকতা ও মানসিক উন্নতিসাধন অপেক্ষা কোনও অংশে নিম্নশ্রেণীর বা লঘু (less important)নহে। এবং এই আধ্যাত্মিকতা ও মানসিক উন্নতিসাধন উচ্চশিক্ষা ব্যতীত কি প্রকারে হইতে পারে? অবশ্যই ইহার জন্য নৃত্য(dancing) প্রভৃতি গুণ (accomplishment) আবশ্যক নহে; কিন্তু তাহাই বলিয়া গুণসমূহে (accomplishments)'র উচ্ছেদ বাঞ্ছনীয় নহে। উপরি কথিত আধ্যাত্মিকতা ও মানসিক উন্নতিসাধন জন্য যে উচ্চশিক্ষা আবশ্যক তাহা হইতে, সমগ্র স্ত্রীজাতির কথা বলিতেছি না, একটী রমণীকেও বঞ্চিত করা আমাদের পক্ষে কি পাপ নহে?

তৃতীয়তঃ,আমাদের জীবনের সার ধর্ম্ম কি?

কেবল কি বিলাসিতার চরমোৎকর্ষসাধন?—তাহার একশেষ করা? স্ত্রীরত্নের সহিত বৃথা আমোদপ্রমোদে ও হাস্যকৌতুকে অমূল্য কাল হরণ করা? আঘাতের আশঙ্কায় বন্যপশুর ন্যায় গলায় 'ফাঁস' দিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করা? কখনই নহে! মানবজীবনের সারধর্ম্ম,কর্ত্তব্য পালন—লাভালাভ গণনা না করিয়া কর্ত্তব্য সাধন। আমার একটু সাংসারিক ক্ষতি হইবে বলিয়া আমি আমার কর্ত্তব্যপালন হইতে কোনও ধর্ম্মনীতিতে অব্যাহতি পাইতে পারি না। যাহা আমার কর্ত্তব্য তাহা আমার করা উচিত, সে বিষয়ে লাভালাভের গণনা (calculation) বৃথা ও অনাবশ্যক। 'কর্ত্তব্য' (duty) ও 'ঔচিত্য' (*oughtness*),এই দুইটী সমবিস্তারসম্পন্ন (co-extensive); এবং যাহা করা উচিত,তাহা করা সহস্র ক্ষতিসত্ত্বেও উচিত। অধ্যাত্মজগতে (spiritual world)'রও এই নিয়ম, ধর্ম্মবিশ্বাসেরও এই শিক্ষা। ইহাতে চাতুরী (shuffling) চলে না। যদি স্বার্থের প্ররোচনায় দুর্দ্দম বিবেককে স্তোক দিয়া আমার যাহা করা উচিত না করি, আমার কর্ত্তব্যপালন হইল না, আমার ধর্ম্ম জীবন লাভ করা হইল না; এবং আমাকে আমার এই কর্ত্তব্যপালনের অভাবজনিত পাপের অবশ্যই ফলভোগ করিতে হইবে। বিবেকের সহিত 'চালাকি' (paltering) করা মুক্তির পথে কণ্টক রোপন করা। অতএব যখন 'কর্ত্তব্য' (*duty*) হইলেই উহা 'অবশ্য কর্ত্তব্য' (imperative) এবং উহা অবশ্য পালন করিতে হইবে (it must be done), তখন স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদের যাহা 'কর্ত্তব্য' তাহা পালন করিতেই হইবে, এবং তাহা পালন না করিবার নীতিজগতে (moral world)'এ কোন উপায় নাই।

স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কি?—তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্বাভাবিক স্বত্ব (natural right) গুলি দেওয়া ও সে গুলি বজায় রাখিয়া চলা উচিত—respect করা উচিত। উপরে সপ্রমাণিত হইয়াছে শিক্ষাদিবিষয়ে তাঁহাদের স্বাভাবিক স্বত্ব (natural right)আধ্যাত্মিক ও মানসিক বৃত্তিসকলের সম্যক পরিচালনার সম্পূর্ণ, অক্ষুন্ন ও অসংযত স্বাধীনতা (unrestrained liberty) পাওয়া। অতএব তাঁহাদিগকে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের সম্যক পরিচালনার সম্পূর্ণ, অক্ষুন্ন ও অসংযত স্বাধীনতা দেওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, এবং এই কর্ত্তব্য পালন না করিলে আমাদের আধ্যাত্মিক পতন অবশ্যম্ভাবী।

চতুর্থতঃ, আমরা কথিত কর্ত্তব্যপালন বিষয়ে উদাস হইলে আমাদের কেবল আধ্যাত্মিক পতন কেন, আমাদের জাতীয় পতনও অবশ্যম্ভাবী। আমাদের উপস্থিত জাতীয় পতন যে কি পরিমাণে আমাদের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক স্বার্থপ্ররোচিত দুর্ব্বুদ্ধি হইতে হইয়াছে, ভাবুক মাত্রেই তাহা অল্পাধিক উপলব্ধি করিতে পারেন। শতাব্দীর পর শতাব্দীর বিজাতীয় দাসত্বের দুর্ব্বহ ভারে আমাদের মনোবৃত্তি সকল যত না নিস্তেজ ও জড়ভাবাপন্ন (inert) হইয়াছে আমাদের পরিবারস্থ রমণীদের অশিক্ষিতাবস্থা হইতে উহা অপেক্ষা অধিক নিস্তেজ ও জড় ভাবাপন্ন হইয়াছে। আমাদের প্রকৃত ও অভ্রান্তশিক্ষা মাতৃক্রোড়ে, এবং যে মাতাকে

আমরা কখন' জ্ঞানশিক্ষা দিই নাই, যিনি অন্তঃপুরবাসিনী হইয়া পাষাণময়ী গৃহ-লক্ষ্মী হইয়া আছেন, যাঁহার মন কখন পরিবারবর্গের, কুটুম্ববর্গের অথবা প্রতিবেশি-বর্গের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বার্থ ভুলিতে শিখে নাই, জাতির জন্য ভাবিতে শিখে নাই, কূপমণ্ডুকের ভাব দূরে রাখিতে শিখে নাই, ও যিনি স্বদেশের জন্য চোখের জল ফেলিতে শিখেন নাই, তাঁহার নিকট কিরূপ শিক্ষা আশা করা যায়?—স্বার্থকলুষিত, অপ্রকৃত, নির্ম্মল-পবিত্র-ধর্ম্ম-পিযূষ-বর্জ্জিত, স্বদেশহিতবর্জ্জিত শিক্ষা নয় ত আর কি শিক্ষা? যে বালক মাতার নিকট কখন' পবিত্র-ধর্ম্ম-সুধা পান করে নাই, নীতির পুণ্য কথা শ্রবণ করে নাই, প্রকৃত জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃকণা পায় নাই, স্বার্থত্যাগ করিতে ও বিশ্বকে প্রেম-চক্ষে দেখিতে শিখে নাই, স্বদেশবাসীকে আলিঙ্গন করিবার স্বর্গীয়সুখ উপভোগ করার দীক্ষা পায় নাই; অধিকন্তু যে আত্মোৎসর্গের অমিয়মাখা মন্ত্রে উন্মত্ত হয় নাই, তাহার প্রকৃত শিক্ষা কোথায়? যে দেশে এরূপ মাতা[১] ও এরূপ বালক সেখানে জাতীয় মনোবৃত্তিসমষ্টি (national mind) নিস্তেজ ও বলহীন হইবে না ত আর কি হইবে? আমরা স্বার্থের জীবন্ত মূর্ত্তি হইব না ত কি হইব? মিথ্যাকথা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, ভীরুতা ও কাপুরুষতা শিখিব না ত কি শিখিব? আমা-

[১] এ স্থলে বলা আবশ্যক সাধারণতঃ যেরূপ মাতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই কথা বলা হইতেছে। অবশ্যই পরিবার বিশেষে আদর্শমাতা থাকা অসম্ভব নহে। আর একটী কথা; অনেকে শুনিয়া ক্রুদ্ধ হই-বেন হিন্দুবালকেরা মাতার নিকট নীতিশিক্ষা পায় না। এরূপ অপবাদে তাঁহাদের হয়ত স্বদেশহিতৈষিতা ও স্বজাতিপ্রিয়তা জাগরূক হইয়া উঠিবে এবং এই সমালোচনা কর্ম্মনাশায় নিক্ষেপ করিবার সদুপদেশ বন্ধু-বর্গকে দিবেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস হিন্দু বালক হিন্দুমাতার নিকট বিশেষ নীতি বা ধর্ম্ম বা জ্ঞানশিক্ষা পায় না। উন্নতির জন্য আপন আপন দোষগুণ বিচার করা (self-examination) আবশ্যক। আমাদের জাতির অথবা আমাদের পূজ্য পিতৃপুরু-ষদের অযথা প্রশংসায় বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া যদি প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের দোষগুলি নির্ণয় করিতে ও উচ্ছেদ করিতে সচেষ্টিত হই, তাহা হইলে আমার মতে আমরা আমাদের পিতৃদেবগণের আত্মার বিশেষ প্রীতিকর কার্য্য করিব। হিন্দুবালক হিন্দুমাতার নিকট অবশ্যই কতকটা 'ঝুটো' ধর্ম্মভাব (pseudo-religiousness) পায়। ব্রতাদির অনুষ্ঠানে যে একটা ধর্ম্মভাব প্রচ্ছন্ন থাকে তাহা স্বতঃই হিন্দুবালককে অন্তরস্থ (imbibe) করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভাবে হিন্দুগার্হস্থ্য জীবন আজকাল কেবল কতকগুলি অনুষ্ঠানের সমষ্টি হইয়াছে; অতএব বাল্যকাল হইতে হিন্দু কেবল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার (ritualism) শিক্ষা করে, এবং এই ritua-lism বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার হাড়ে হাড়ে প্রবিষ্ট হইয়া অশেষ অনর্থসাধন করে। পরে ঐ ritualism প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস (faith) ও ধর্ম্মভাব (religiousness)'কে হিন্দুর মনোজগত হইতে বিদূরিত করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করে। কোন পণ্ডিতের ভাব-পূর্ণ কথায়, পরিশেষে হিন্দু ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই অধর্ম্মী হইয়া পড়ে—"he becomes irre-ligious *religiously*"।

দের ন্যায় ক্ষীণপ্রাণের উহা ব্যতীত আর কি অস্ত্র থাকিবে? যে দেশে গার্হস্থ্য জীবনের শুভ ফল (salutary home influence) নাই সেখানে কি উন্নতি হইবে? বীর নেল্‌সনের মাতা বালকনেলসন্ (Nelson) কে সানন্দচিত্তে বিদায় দিলেন। প্রকৃত শিক্ষা না থাকিলে কি মাতা ওরূপ পারে? আমাদের দেশেও উন্নতস্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইলে ঐরূপ হইতে পারে। মহামতি জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট পুস্তকরচনা সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। এটী কি সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতিমধ্যে বাঞ্ছনীয় নহে? এক উচ্চস্ত্রীশিক্ষা হইতে এরূপ ফললাভ আশা করা যায়। ইংলণ্ডে শুধু জন ষ্টুয়ার্ট মিল কেন প্রতি গৃহে ঐরূপ পুরুষ রমণীর নিকট সাধু কল্পনায় উত্তেজিত ও সাধু উদ্দেশ্যে চালিত হইতেছে। বলিতে গেলে ইংলণ্ড ও তৎসংশ্লিষ্ট রাজ্য পার্লামেণ্ট মহাসভার দ্বারা প্রকাশ্যভাবে শাসিত হইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্বেতাঙ্গিনীরাই এই মহাসাম্রাজ্যের প্রাণ ও কার্য্যোৎপাদনী শক্তি (life and inspiration)। যে দেশে সকল সাধু চেষ্টাই ও সকল সাধু কার্য্যই প্রায় স্ত্রীলোক হইতেই হইয়া থাকে সে দেশের মত অভ্যুদয় আর কোন্ দেশে সম্ভবে? উন্নতস্ত্রীশিক্ষার প্রসাদে আমরাও ঐরূপ ফল এ দেশে পাইতে পারি এবং পুনরায় নব অভ্যুদয়ে শোভিত হইয়া সভ্যজগতের সম্মানভাজন হইতে পারি।

পঞ্চমতঃ, স্ত্রীজাতিকে সমুন্নতশিক্ষা না দেওয়ায় জগতের এক ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার বা গণনা না করিয়া মোটামুটী একটা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, জগতে পুরুষ ও রমণীর ভাগ সমান। এরূপ গণনায় জগতের সমস্ত রমণীরা জগতের অর্দ্ধেক জ্ঞানবিদ্যা (intellectuality)'র মালিক। অতএব স্ত্রীজাতিকে সমুন্নতশিক্ষা না দেওয়ায় জগতের অর্দ্ধেক জ্ঞানবিদ্যা (intellectuality) লোকসান হইতেছে এবং মনোজগতের অর্দ্ধেক উর্ব্বরভূমি অকর্ষিত (fallow) হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অবশ্যই দেশ বিশেষে (যথা, ইয়ুরোপে ও আমেরিকায়) কয়েকজন স্ত্রীলোক বেশ শিক্ষিতা ও প্রতিভাশালিনী হইয়া বিরাজ করিতেছেন; কিন্তু সে ক্ষীণালোক স্ত্রীজগতের ঘনতমসাচ্ছন্ন আকাশপটে কি? খৃষ্টিয়দের জলপ্লাবনে (Deluge)'র পর ভগবানের সৌম্যভাবব্যঞ্জক জ্যোতিঃবিভাসিত ধনুষ্‌ছায়া! ঐ শিক্ষিতা রমণীদিগকে দেখিয়া এখন কেবল হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছে, আর কিছুই নহে! যদি নারীরা আমাদের মত উচ্চশিক্ষা বরাবর পাইয়া আসিতেন, কে বলিতে পারে তাঁহাদের ভিতরও প্লেটো, গেটে, দাঁতে, সেক্ষপীয়র পাওয়া যাইত না? এই ত বর্ষকয়েকের জ্ঞানালোচনার পর জর্জ এলিয়টের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে নারীরা এত উন্নতি করিয়াছেন যে আজি জর্জ এলিয়ট সভ্যজগতের এক অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য চিত্র (literary character) হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদের যেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতি (presence of mind), সূক্ষ্মদৃষ্টি (keen

observation), কার্য্যবিষয়ক সুন্দর বিচার জ্ঞান (practical goodsense) ও মতিস্থৈর্য্য (tenacity of purpose) দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে আমার বোধ হয় তাঁহারা প্রকৃতরূপে শিক্ষিতা হইলে সুন্দর রাজতন্ত্রবিদ্ পণ্ডিত (admirable statesmen) হইতে পারেন। সংসারে যখন এত আঁধার ও জানিবার জিনিষ এত রহিয়াছে,তখন কেন এত জ্ঞান বিদ্যা (intellectuality) নষ্ট করা হয়? সংসারের এই গভীর রত্নখনির ভিতর কত যে অগণ্য জ্ঞানরত্ন নিহিত রহিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? ইহাতে পুরুষ 'জনের' উপর রমণী 'জন' খাটাইলে কি কোন ক্ষতি হয়? পুরুষদের আলোকের উপর রমণীদের হাতে হাতে আলোক দিলে কি আর দুই একটী জ্ঞানরত্নলাভের আশা করা যাইতে পারে না? তবে কেন এই অন্তর্নিহিত জ্ঞানবিদ্যা (dormant intellectuality) রাশি নষ্ট করা হয়? আমরা যথার্থই—

"আপন পায়েতে মারি আপনি কুঠার!"

ষষ্ঠতঃ, স্ত্রীলোকদের বর্ত্তমান অবস্থায় মানসিক ও শারীরিক গঠন প্রায় একই প্রকার। চলিত ভাষায় রমণীর দেহকে "দেহলতা" এবং পুরুষের দেহকে "দেহযষ্টি" বলে। এই দুইটী কথারই বিশেষ সার্থকতা আছে। রমণীর দেহ যথার্থই 'লতা' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য; কারণ, লতার যেমন বাহ্যিক শোভা মুগ্ধকরী, রমণীর দেহের বাহ্যিক শোভাও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক মুগ্ধকরী। লতার আকার যেমন দৌর্ব্বল্যব্যঞ্জক, রমণীরও তাহাই। লতা যেমন কোন বৃক্ষের আশ্রিত না হইলে সম্যক শোভাময়ী হয় না, রমণীও পুরুষের পার্শ্বে জড়িতা না হইলে যেন ভগবানের পদ্যময় জগতের নারীদেহপদ্যের অপূর্ব্ব শোভা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। লতা যেমন দেখিলেই মনে হয় যেন খসিয়া খসিয়া নুইয়া নুইয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, যেন একটু আতপতাপেই সেটী শুষ্ক হইয়া যাইবে, যেন একটু আঁচড় লাগিলে প্রাণে ব্যথা লাগিবে, রমণীর দেহও ঠিক সেইমত—দেখিলেই যেন মনে হয় খসিয়া খসিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, যেন নিজের ভার সামলাইতে পারিতেছে না, যেন সেটী একটু আঁচড় সহ্য করিতে পারে না, শারদীয় কৌমুদীর সুখের পীড়নও যেন তাহার সহ্য হয় না। আবার, লতা যেমন ভাবময়ী, পদ্যময়ী, স্বপ্নময়ী (dreamy), রমণীর দেহ হইতেও যেন সেইমত ভাব, পদ্য উচ্ছ্বসিত হয়—কমনীয়তা যেন ঠিকরাইয়া পড়ে, সৌকুমার্য্য যেন উথলিয়া পড়ে ও দেহ যেন অতীতস্মৃতির কমকুহক ফুরমনে উপভোগ করে। বর্ত্তমান অবস্থায় রমণীর মানসিক বৃত্তিসমষ্টিও ঠিক ঐ দেহলতার অনুরূপ। মনেরও যেন একটা দার্ঢ্যভাব নাই—মনটা যেন ঠেকো না পাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। মনটার ভিতর যেন কেবল কাব্যের তরঙ্গ উঠিতেছে, ভাবের উৎস বিদ্যুৎগতিতে ছুটিতেছে। তাহার ভিতর যেন সমস্তই কোমল, সমস্তই যেন বসন্তময়;

সর্ব্বদাই যেন প্রমোদউদ্যানের কোকিল-কাকলী শুনিতে পাই।

কিন্তু "স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য-কল্পনাশক্তি এবং স্মরণশক্তি অতীব প্রবল এবং সমালোচন, বিশ্লেষণ এবং সংমিশ্রণ শক্তির অভাব লক্ষিত হয়"। এ কথাটি স্বীকার করি। রমণী বর্ত্তমান অবস্থায় ভয়ানক ভাবোচ্ছ্বাসময়ী(emotional) এবং, তাঁহার ভাবুকতা (imaginative faculty) ও বিশেষ লক্ষিত হয়; এবং এই কারণেই তাঁহার সমালোচন,বিশ্লেষণ প্রভৃতি purely intellectual বৃত্তিসকল ক্ষীণভাবাপন্ন। ভাবাদি (emotions) বিশেষ পরিপুষ্ট হইলে যুক্তি, অনুসন্ধান প্রভৃতি intellectual বৃত্তি দুর্ব্বল হইবেই হইবে;—দর্শনশাস্ত্রের ইহা একটী গভীর সত্য। শিক্ষাবিষয়ে আমাদের সর্ব্বদা চেষ্টা করা উচিত যাহাতে এই emotional এবং intellectual বৃত্তিসমূহের সম্যক ও সমরূপ (equal) পুষ্টিসাধন (development) হয়। Intellectual বৃত্তির ক্ষতিসাধন করিয়া emotional বৃত্তির পরিপুষ্টি সর্ব্বথা অননুমোদনীয় ও সঙ্কটাপন্ন (dangerous)। ভাবের পরিপুষ্টি (emotional devolopment)'র কারণ মানুষ একপ্রকার উন্মত্ত হয় ও সেই পুষ্টির আনুষঙ্গিক ফল intellectuality'র অভাবের জন্য তাহার মানসিক বল, যুক্তির বল এরূপ থাকে না যাহাতে করিয়া সে আপনার উদ্বেলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস সংযত করিতে পারে। একদিকে শিক্ষাজনিত, অভ্যাসজনিত, বাহ্যিকঘটনা সম্ভূত মানসিক বলের অভাব, অপরদিকে ভাবের প্রাচুর্য্য, উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য—ইহা অপেক্ষা মানবের আশঙ্কা কারণ আর কি হইতে পারে?—ইহা অপেক্ষা ভয়ানক অবস্থা মানবের আর কি হইতে পারে?—এবং ইহা হইতে মানবের কি না বিপত্তি ঘটিতে পারে? কিন্তু ঠিক এইরূপ অবস্থা স্ত্রীজাতির অভ্যাসদোষে ও আমাদের স্বার্থ-প্ররোচিত শিক্ষাভাব হইতে হইয়াছে।আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ভয়ানক অবস্থাপন্না রমণী লইয়াই আমাদের সংসার, আমাদের পারিবারিক জীবন, আর আমরা একবার আসন্ন বিপদের কথা স্বপ্নেও ভাবি না! উপস্থিত স্ত্রীজাতির অশিক্ষিতাবস্থায়, অজ্ঞানতায় এরূপ বিপদের বীজ (elements of danger) নিহিত রহিয়াছে যে কে জানে কোন্ সময়, কোন্ মুহূর্ত্তে আমাদের এই ভীমায়াসরক্ষিত সোণার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে, আমাদের সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে, আমাদের জীবনের প্রহেলিকার অবসান হইবে! একটী চলিত কথায় বলে, "বজ্র আটনি ফস্কা গেরো"—আমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে। যে পারিবারিক সুখ, নির্ম্মলতা প্রভৃতি ধূর্ত্ত, চতুর, "ফন্দিবাজ", প্রকৃত সংস্করণের শত্রু লোকের কপোলকল্পিত, বাহ্যিকশোভাবিশিষ্ট গুণ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমরা স্ত্রীজাতিকে অন্তঃপুররক্ষিতা করিবার জন্য, মানসিক ভাবের উচ্ছ্বাস তরঙ্গের বিপক্ষে "বালির-বাঁধ" বাঁধিবার জন্য সতত উদ্যোগী, কে বলিতে পারে কোন্ দিন, কোন্ সময় সে সুখ, সে নির্ম্মলতা, সে পবিত্রতা কোথায় আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের চিত্তপ্লাবনে ভাসিয়া

যাইবে! আমরা যে বিপদের আশঙ্কায় সতত বিব্রত, আমরা আপন দোষে সেই বিপদের বীজ আপনারাই রোপণ করিতেছি। এইত আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, এইত আমাদের দূরদৃষ্টি! এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় কি? এই সর্ব্বনাশের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে,উপায় এক inllectuality'র বৃদ্ধি, শিক্ষা বিষয়ে সম্যক, সম্পূর্ণ ও অসংযত স্ত্রীস্বাধীনতা। স্ত্রীজাতিকে উচ্চশিক্ষা পূর্ণভাবে দান করিলে আমার স্থির বিশ্বাস, আমাদের অশেষ উপকার সাধিত হইবে ও অনিষ্টের ভাগ কমিয়া যাইবে। এ বিষয়ে অন্যমত অবলম্বন করিলে মনোবিজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হয়;—psychological truth ও psychological teaching'এ অবিশ্বাস করিতে হয়।

সপ্তমতঃ, আমরা কিসের জন্য এতগুলি অনিষ্ট ঘটাই? আমাদের স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক কর্ত্তব্য কেন না পালন করি? কেন আমাদের আধ্যাত্মিক ও জাতীয় পতন হইতে দিই? কেন পাপে ডুবি? কেন জাতীয়ত্বের শীর্ষস্থানীয় হওয়ার পথে কণ্টক রোপণ করি? অনর্থসাধনে এত উদ্যোগ কেন, এত আয়াস কেন, এত যত্ন কেন? জগতে আলোকের বিস্তার হইতে দিই না কেন? আর কেনই বা মূর্খের ন্যায় আমাদের বিহারাবাস তরল, চঞ্চল সৈকতভূমির উপর নির্ম্মাণ করিবার জন্য এত সচেষ্টিত হই? এ মায়াপ্রপঞ্চের মোহঘোর দেখিয়া দেখি না কেন, জানিয়া জানি না কেন? কেন মায়াপাশে আপনা হইতে, সাধ করিয়া জড়িত হই? গৃহ-সুখের জন্য এত উদ্বেগ কেন? রমণীকে বন্য, হিংস্র পশুর মত সর্ব্বদা "আগ্‌লাইয়া" বেড়াই কেন? স্বাধীনতা না পাইলে চরিত্রের, মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয় না—একথা মনে করিয়া রাখি না কেন? স্বাধীনতা ব্যতীত নৈতিক উন্নতি অসম্ভব—এ গভীর সত্য উপেক্ষা করি কেন, সম্যক উপলব্ধি করি না কেন, কার্য্যে ভাবি না কেন?

(ক) মানুষ অনেক দিন ধরিয়া প্রভুত্ব করিয়া আপনার প্রকৃতির স্বাভাবিক ভাব ভুলিয়া যায়,—সেই প্রভুস্বত্ব রক্ষা বিষয়েই কেবল তাহার মন ধাবিত হয়। পরিশেষে অভ্যাস দোষে সংসারের মোহকুহকে সে আপন ঘটনাক্রমে অর্জ্জিত বা প্রাপ্ত ও বহুকাল ধরিয়া ভুক্ত স্বত্ব (prescriptive right)'কে তাহার স্বাভাবিক স্বত্ব (natural right) বলিয়া জ্ঞান করে। এবং একবার যখন তাহার ধারণা হইল যে স্ত্রীলোকের উপর প্রভুত্ব করা পুরুষের স্বাভাবিক স্বত্বের অংশ, তখন আর সে ন্যায়ের যুক্তি স্থিরভাবে শুনিতে পারে না, এই প্রভুত্বের জঘন্য মূ[illegible]কথা শুনিতে পারে না। এরূপ ভাব হওয়া খুব স্বাভাবিক, এবং এই কারণে পুরুষ স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা-বিষয়ক পূর্ণ ও স্বাভাবিক স্বত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না এবং পারিলেও সে স্বত্ব স্ত্রীজাতিকে দান করিতে প্রস্তুত হয় না।

(খ) আমাদের স্বত্বের উপর আমাদের কেমন একটা মায়া জন্মায়, কেমন মমতা হয়। পুরুষ তাহার স্ত্রী'র উপর প্রভুত্ব

করিবার স্বত্ব সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ স্নেহ-পাশে আবদ্ধ হয়। প্রভুত্ব করাটা কেমন অভ্যাসগত (habit) হইয়া যায়, আর ছাড়িতে পারা যায় না।

(গ) যেখানে আমাদের মায়া ব'সে, সেখানে ও সে বিষয়ে ন্যায়ের তর্ক, ন্যায়ের যুক্তি চলে না। যে বিষয়ে ভাবে(feelings)'র কাণ্ড জড়িত, সে স্থলে তর্ক করিলে কেবল সেই যুক্তিগুলি আমাদের বদ্ধমূল, চিরাগত ধারণার সমর্থন জন্য প্রযুক্ত হয়।*

(ঘ) নির্দ্ধন হইলে মানব ধনী নামে আখ্যাত হইবার কল্পনা-সুখের জন্য সর্ব্বদা বিব্রত হয়, ও যাহার এ জগতে প্রকৃত মান্য নাই সেই কেবল সংসারিক মান্য পাইবার জন্য পাগল হইয়া বেড়ায়। সেইরূপ যাহার পারিবারিক নির্ম্মলতা, পবিত্রতা নাই, সেই তাহার ইপ্সিত, অতএব কল্পিত পারিবারিক নির্ম্মলতা, পারিবারিক পবিত্রতা অটুট রাখিবার জন্য ব্যস্ত।

(ঙ) মানবের প্রভুশক্তি চালনার ইচ্ছা প্রকৃতিগত, ও উহা আমাদের আত্মম্ভরিতা (vanity) হইতে হইয়া থাকে। এই প্রভুশক্তি চালনা সামাজিক জীবের পক্ষে সুকঠিন। কারণ, এই individual প্রভুশক্তির নাশের উপরই সমাজ গঠিত। পাত্রাভাবে সেজন্য প্রত্যেক ও সামাজিক পশুবল (individual and social brute force) স্ত্রীলোকদের উপরই চালিত হয়।

(চ) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান অবস্থা আমাদের অদূরদর্শিতার ফলমাত্র। আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না কোনটী ভাল, কোনটী মন্দ; কোনটী আমাদের পক্ষে শুভকর,কোনটী অপকারী। এস্থলে সকল কারণ একত্রিত হইয়া আমাদিগকে কেমন অপ্রকৃতিস্থ করে ও আমরা কেবল গৃহ-সুখের মায়ামরীচিকার কুহকে পড়িয়া বিনষ্ট হই।

(ছ) এই অদূরদর্শিতার ও ধর্ম্মাভাবের কারণ আমাদের গুরুলঘু জ্ঞান থাকে না। আমরা সাংসারিক সুখ বলিয়া যাহাকে মনে ভাবি তাহা প্রকৃতপক্ষে সুখ কি না,এ বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। আমরা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জিনিষকে আমাদের জীবন-মরণের "কলকাঠি" মনে করি, কাজেই আমাদের প্রকৃত সুখ নাই।

প্রকৃত কথা আমারা যে সাংসারিক সুখের জন্য এত অনর্থ ঘটাই তাহা লাভের প্রকৃষ্ট উপায় অপরের উপর কঠোর শাসন নহে। প্রকৃত সুখ কি,—হঠাৎ বলা যায় না; এ বিষয়ে বিশেষ অনুশীলন আবশ্যক। যাহা হউক উপস্থিত বিষয়ে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে উহা ভোগবিলাস নহে। এ জীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, আর সেই উদ্দেশ্যসাধনের পারিবারিক ব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা ও উদ্বাহের ব্যবস্থা উপায় মাত্র, এবং কোন বিশেষ দেশের কোন বিশেষ পারিবারিক আচার ঐ মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের প্রকৃষ্ট উপায় কি না দেখা আবশ্যক। জগতের কল্যাণসাধন ও ভগবানের প্রীতিসাধন দ্বারা ধর্ম্মজীবন লাভ করা যদি এ মানব জীবনের উদ্দেশ্য হয়,তাহা হইলে স্ত্রীলোকের উপর কঠোর শাসন ও

* See John Stuart Mill's *Subjection of Women.*

উৎপীড়ন ও তাঁহাদিগকে শুধু খেলার সামগ্রীর মত ব্যবহার করিলে সেই মহৎ উদ্দেশ্য কি সংসাধিত হয়? অনেক ধনবান লোক তাঁহাদের এই অমূল্য জীবন কেবল আহার বিহারের ব্যবস্থা নির্ণয়ে ব্যয়িত করেন;—সকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া কেবল কি কি ভোজন করিবেন, কি কি আমোদে দিবাভাগ কাটাইবেন, অপরাহ্ণে কোথায় কোথায় বিহার করিবেন, শেষে কিরূপে রাত্রিযাপন করিবেন এই সকল অসার ভাবনায় ব্যস্ত। আমাদেরও অনেকটা সেইরূপ। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া আমরা কেবল স্ত্রীরত্নকে কোন্ দুর্গের কোন্ লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়া রাখিব, কোথায় কে রত্নের প্রভা দেখিতে পাইবে,এই ভাবনায়ই সর্ব্বদা ব্যস্ত। স্ত্রীলোক আমাদের আনন্দদায়িনী, আমাদের বিরামদায়িনী না হইয়া আমাদের অশেষ অসুখের কারণ হইয়া উঠেন। কৃপণের নিকট যেরূপ ধনরত্নের আদর হইয়া থাকে আমাদের নিকট স্ত্রীরত্নেরও সেইরূপ বা ততোধিক আদর হইয়া থাকে, এবং স্বভাবতঃই আমাদের মনেরও কৃপণের মনের মত অতি শোচনীয় অবস্থা (miserable state) আসিয়া পড়ে। মনটা যদি সর্ব্বদাই একটা কাল্পনিক "জুজুর" ভয়ে ভীত হইয়া থাকে, স্ফূর্ত্তি, সুখ কোথা হইতে আসিবে। ভগবান তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় করিয়া দিয়াছেন; স্ত্রীলোকের মন কত সৎগুণবিশিষ্ট করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আমরা এরূপ অভাগা যে এই খনিজ হীরক একটা চোরের ভয়ে পরিষ্কার করি না, পাছে তাহার জ্যোতি প্রভার জন্যই তাহাকে হারাই। ভগবান রম্য উপবনের উপযোগী বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দিয়াছেন, আমরা সে ভূমিখণ্ড অকর্ষিত রাখিয়াছি ও তাহাতে আগাছা জন্মিতে দিয়াছি; এখন সে বনে হিংস্র জন্তু থাকিবে না ত কি থাকিবে!—এস্থলে গোলাপের স্নিগ্ধ আঘ্রান কোথা হইতে পাইব!

বলিতে গেলে অনেক কথা, সমালোচনা বাড়িয়া যায়; অতএব এস্থলে স্ত্রীশিক্ষার কথা শেষ করা যাউক। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে প্রবন্ধলেখকের সহিত আমি একমত হইতে পারি না, এবং ইহাও বলা বাহুল্য যে "বর্ত্তমান সমাজের অভাব ও সময়োপযোগী শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষসাধন মহিলাদিগের মধ্যে প্রচলিত হয়; এরূপ অনুষ্ঠান করা" বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে স্ত্রীজাতিকে সম্যক, সম্পূর্ণ, অসংযত স্বাধীনতা দেওয়া বোধ হয় ইহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক বাঞ্ছনীয়। যাহা ঠিক বলিয়া বিশ্বাস করি তাহা করিব,তাহাতে অত বাঁধাবাঁধি বোধ হয় উচিত নহে। আমার বিশ্বাসমত কার্য্য করিব, তাহাতে সমাজে কোন অদ্ভুত সৃষ্টি (innovation) করিতে হয় কি করিব, নাচার। "কোন অদ্ভুত সৃষ্টি না করিয়া সমাজের বিধিগুলিকে পুষ্ট করিতে উদ্যোগী হইলে, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়"—একথাটী চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি এবং প্রায় নিশ্চেষ্ট, স্থবির, জড়ভাবাপন্ন লোকের মুখে শুনিয়া আসিতেছি। ইহার ভিতর কিঞ্চিৎ সত্য থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ যুক্তি

জড়ভাবে বসিয়া থাকিবার একটী প্রধান ও সুন্দর উপায়। এ মতে যদি সকল লোক চলিত তাহা হইলে আজি জগতের ইতিহাসের একটী প্রধান ঘটনা ঘটিতে পাইত না, আর আজি সভ্যজগতের এত উন্নতিও হইত না! ফরাসিস বিপ্লব (French Revolution), যাহা সভ্যজগতের জীবনের স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছে ও যাহা আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র বলিতে হইবে, আমাদের ভাগ্যে ঘটিত না! স্বাধীনতা (Liberty), ভ্রাতৃত্ব (Fraternity),সাম্য (Equality)'র মধুর রব আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিত না! ফরাসিস বিপ্লব দূরে থাকৃ, ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্মসংস্কার (16th Century Reformation)ও অসম্ভব হইত! জগতে কখন ও কোন সংস্কার হইতে পাইত না!

"দেখা যায়, কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সকল ধর্ম্ম প্রচারকগণ মহিলাদিগকে সাংসারিক বিষয়ে মনোযোগী হইতে বিশেষরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সংসারই স্ত্রীলোকদের রাজ্য, অতএব এই রাজ্যশাসন গ্রহণ করিতে হইলে, তদুপযোগী শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা প্রদানে উপেক্ষা করেন ও এরূপ মতবাদ প্রকাশ করেন যে, উহা নীচ কার্য্য, তাঁহারা বোধ হয় এক বিষয়ে প্রকৃত অন্ধ হইয়া সেরূপ কহিয়া থাকেন।"

এ বিষয়েও প্রবন্ধ লেখক একটী মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রের ইহা একটী গভীর সত্য যে, কোন একটা বিষয়ে মানব একবার অভ্যস্ত(habituated) হইলে সে সেই চিরাগত অভ্যাসটার প্রয়োজনীয়তা সাব্যস্ত করিবার জন্য সকল প্রকার যুক্তির অবতারণা করে। একটা বিশেষ আচার, সম্ভবতঃ যাহা কেবল মানবের অপকৃষ্ট বৃত্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল, আমাদের অভ্যাসগত হইয়াছে বলিয়াই তাহার ভিতর কত প্রকার মানবচরিত্র সম্বন্ধীয় গভীর সত্য জড়িত দেখিতে পাই ও তাহাতে পূর্ব্বপুরুষদের কত দূরদর্শিতার পরিচয় পাই! ইংরাজেরা ইহাকেই শসার বিচি হইতে সূর্য্যরশ্মি বাহির করা বলে (drawing Sun's rays from the seeds of the cucumber)! অর্থবিৎ পণ্ডিতদের কাযের ভাগে (division of labour)'র সূত্রের দোহাই দিয়া কেমন জাতিভেদ সমর্থন করি ও আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য তাহার নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা সাব্যস্ত করি। জনসাধারণের মত প্রবন্ধলেখক ও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এইরূপ মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি কাযের ভাগে(division of labour)'র মূলসূত্রের দোহাই দিয়া স্ত্রীজাতিকে চিরকালের জন্য নিম্নস্থানীয় করিয়া রাখিতে চাহেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আমার মত গ্রন্থকারের মত হইতে এবিষয়ে সম্যক বিভিন্ন। আমি এরূপ কাযের ভাগ সমর্থন করি না; স্ত্রীজাতির গৃহকার্য্য সংসাধনের জন্যই পৃথিবীতে জন্ম, আমি স্বীকার করি না, এবং স্বভাবতঃই আমি স্বীকার করি না যে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করাই তাঁহাদের সারধর্ম্ম। গৃহকার্য্য শিক্ষা করায় আপত্তি নাই, বরং উহা সুখের বিষয়; কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা যে উহাতেই আবদ্ধ (limited) থাকিবে তাহার

কারণ কি? পুরুষ ও রমণী সকলকার পক্ষেই গৃহকার্য্য শিক্ষা পারিবারিক স্বাচ্ছন্দতা ও সচ্ছলতা (domestic comfort and domestic economy)'র জন্য আবশ্যক। কিন্তু মানবের জন্ম কি কেবল আহার বিহারের জন্য? গৃহ-কার্য্য শিক্ষা স্ত্রীশিক্ষার অংশ বটে, কিন্তু অতি অপকৃষ্ট ও সামান্য অংশ। "সংসারেরই স্ত্রীলোকদের রাজ্য"—এ কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। "সংসার স্ত্রীলোকদেরই রাজ্য,' বলিলে আপত্তি ছিল না, কারণ স্ত্রীজাতির রাজ্যসীমা পুরুষের রাজ্যসীমার সমান, কোন অংশে কম নহে। আমার বিবেচনায় তাঁহাদের রাজ্যসীমা বরং দুই এক স্থলে ও বিষয়ে আমাদের রাজ্যসীমা অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। যেমন এই সাংসারিক বিষয়,—ইহাতে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব স্ত্রীজাতিকে সাংসারিক কার্য্যকরণোপযোগী শিক্ষা দেওয়ায় আপত্তি নাই, কিন্তু ঐ শিক্ষাই তাঁহাদের সমগ্র শিক্ষা নহে।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইহাতে তাঁহার মানসিক উন্নতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে তাঁহার কথার ভিতর ভাবিবার বিষয় আছে। যদি স্থির-ভাবে অনুশীলন করা যায় তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে আমাদের চিন্তাবৃত্তি, ভাবুকতা প্রবন্ধ পাঠে কিরূপ উত্তেজিত হয়। শিক্ষা বিষয়টী ভয়ানক কূট ও জটিল, তাহার উপর আবার স্ত্রীশিক্ষা শিক্ষা সাধারণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জটিল। ইহা সম্বন্ধে হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে, কিন্তু চেষ্টা আবশ্যক। প্রবন্ধ লেখক তাঁহার এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টার জন্য যথোচিত অভিবাদন পাইতে পারেন, কিন্তু সত্যের খাতিরে সেই সঙ্গে তাঁহার দোষগুলি প্রদর্শিত হওয়া উচিত; আশা করি সেজন্য তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। সত্যনির্ণয়ই সমালোচকের কার্য্য, ইহাতে অসন্তোষের কারণ নাই।

পূর্ব্ব সমালোচনায় গ্রন্থকারের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ভাবের সঙ্কীর্ণতার কথা বলা হইয়াছে; সে সম্বন্ধে আর অধিক বলা অনাবশ্যক। সুধী বেকন্ যে কূপমণ্ডুকের ভ্রমে (Idol of the Cave)'র কথা বলিয়াছেন সেই ভ্রমের কারণই প্রবন্ধগুলির ভিতর এরূপ সঙ্কীর্ণভাব দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক তাঁহার ভ্রান্ত স্বদেশহিতৈষিতার জন্য, গবেষণা সত্বেও, স্ত্রীশিক্ষা ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে একটা ঠিক সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। "আমাদের দেশ" ও তাহার আনুষঙ্গিক সমস্তই বিশুদ্ধ ও উত্তম, এ ভাবটা যেন প্রবন্ধসকলের ভিতর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দেখা যায়; ইহার উপর আর একটি ভাব লেখকের মনে জাগরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এতাবৎ মানব যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছে তাহাই উত্তম, স্বাভাবিক ও ধর্ম্মসঙ্গত; এ বিষয়ে অন্যমত অবলম্বন করা একটা অদ্ভুত সৃষ্টি করা মাত্র! "আর্য্য" ও "ঋষি", এই দুইটী পদই শ্রুতিমধুর; অতএব কথায় কথায়, সময়ে হউক বা অসময়ে হউক, ঐ শব্দ দুইটী ব্যবহার করিতে পারিলে গ্রন্থের একটা কেমন অস্বাভাবিক গুরুত্ব (factitious import-

ance) হয়। ঐ দুইটীর দোহাইয়ে অনেকে অনেক অসার কথা চালাইয়া দিয়াছেন এবং জগতে অনেক প্রকার জঘন্য অনুষ্ঠানের সৃষ্টিও হইয়াছে। আজকাল "আর্য্যঋষি" নামাঙ্কিত জিনিষগুলো বাচ বিচার না করিয়া সাপ্টা (wholesale) না লইতে পারিলে ও তাহার অযথা প্রশংসা না করিতে পারিলে সুলেখক, বক্তা, ধীমান লোক ও খাঁটি হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতে পারা যায় না। যুক্তি না বুঝিয়া অন্ধের মত "আর্য্যঋষি" টিকিট (sign-post) দেওয়া রাস্তায় না চলিতে পারিলে সমাজে বড়লোক হইতে পারা যায় না। আজকাল এক শ্রেণীর লোক (তাঁহাদের সংখ্যাও কম নহে) দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা "আর্য্যঋষি" নামাঙ্কিত অসৎ প্রথা গুলো কোন কথা না শুনিয়া জীবন্ত রাখাই তাঁহাদের অসার জীবনের সারধর্ম্ম ও শ্লাঘার বিষয় মনে করেন। এ দলের লোকের মুখে অশেষ গম্ভীরভাবে উচ্চারিত সদুপদেশ পাওয়া যায়; না চাহিলেও কেন, না চাহিলেই বেশী পাওয়া যায়। "আমরা বাপু মূর্খ লোক, আমরা অতশত বুঝি না; যা চিরকাল বাপ্ পিতামহ করে গিয়েছেন তাই করিব।" "দু' পাত ইংরেজী পড়েই অম্নি আজকালকার ছেলেগুলো বাপ্ পিতামহর উপর যেতে চায়; তাঁরা তাদের কাছে ভীমরতিগ্রস্থ কতকগুলো বুড়ো হয়েন।" "আরে বাপু শাস্ত্র পড়, শাস্ত্র বুঝ, বলিলেই হয় না," ইত্যাদি, ইত্যাদি। এরূপ যুক্তির ভিতর কি পদার্থ আছে বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই একটা "আর্য্যঋষি', "আর্য্য-ধর্ম্ম," "আর্য্য-শাস্ত্রে"র দোহাইয়ে হিন্দু সকল প্রকার কথা বলেন ও সকল প্রকার জঘন্য আচরণ করেন;—সংসারের জটিলতায় অনভিজ্ঞা বালবিধবাকে চিরজীবন কষ্টে রাখিতে ও পাপে ডুবাইতে পারেন, জীবন্ত সতীকে দাহ করিতে পারেন, ধর্ম্মের ভান করিয়া জীবকে বলি দিতে পারেন ও সুবিধা হইলে মহামায়ার নিকট নরবলি পর্য্যন্ত দিতে পারেন! এটাতে একটা বিশেষ সুবিধাও হয়, আর ভাবিবার, চিন্তা করিবার, মাথা নামাইবার আবশ্যক থাকে না, আমাদের 'গোঁফ-খেজুরে" প্রবৃত্তি (lotus-eating propensity)'র বেশ পরিচালনা হয়। এরূপ লোকের সূত্র হইতেছে এক কথায়—

"Where ignorance is bliss,
'Tis folly to be wise"!

অথবা—

"Death is the end of life; ah, why
Should life all labour be?—
* * * *
——What pleasure can we have
To war with evil?——
* * * *
How sweet it were hearing the downward stream,
With half-shut eyes ever to seem
Falling asleep in a half-dream!"

গ্রন্থকার ঠিক এই দলের লোক না হউন, তাঁহার মনটার ভিতরও যেন কতকটা সমরূপভাব রহিয়াছে। এ ভাব কেন হয়,—অনেক কথা; তবে ভাবটা প্রবন্ধের ভিতর যেখানে সেখানে উঁকি মারে। "ভাবি আশা" প্রস্তাব শুনিয়া মনে করিলাম উহার ভিতর অনেক জানিবার কথা থাকিবে, লেখক আমাদের জাতীয় নবজীবনের বীজগুলি (germs of the new national life)

বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়া না জানি কত নূতন কথা বলিবেন; কিন্তু প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শুধু নিরাশ হইলাম না, লেখকের ব্রাহ্মণদের হইয়া অসাময়িক ওকালতী (irrelevant advocacy) দেখিয়া কেমন একটা হাসি আসিল। বড়লোকের কথায় হাস্য করা উচিত নহে, তাহাতে সমূহ বিপদ; কিন্তু কি করি, না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি মহারাজকুমার নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন।

এইত গেল ভাবের বিষয়, এক্ষণে কিঞ্চিৎ ভাষা সম্বন্ধে বলা আবশ্যক। পুস্তকে লেখার ভিতর দুই প্রকার দোষ আছে; একটি মুদ্রাঙ্কনের ভুল, অপরটি ভাষার দোষ। মুদ্রাঙ্কনের দোষ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তাহার সংখ্যা উপস্থিত গ্রন্থে অত্যন্ত অধিক। সেগুলো দূর করা নিতান্ত আবশ্যক। অপর দোষ, ভাষার দোষ সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ ইহাই বলা আবশ্যক যে সে দোষ সুলেখকের পক্ষে অমার্জ্জনীয়। লেখকের ভাষা কেমন যেন ঠেকো দেওয়া, যেন তাহার গতি সহজ ও স্বাভাবিক নহে। ভাষার ভিতর একটা বিদেশীয় ভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার চলিত বিশেষ ধরণগুলি (idioms) দেখিতে পাই না। সন্ধি ও সমাসের ছটায় ভাষাটা সময় সময় কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার বাহ্যিক আবরণ বাঙ্গালায় সুন্দর দেখায় না; ওরূপ দেখিলেই মনে হয়,

"স্নিগ্ধ মর্ম্মে তুমি যেন ক্ষুদ্র প্রাণ!'

"হর্ম্ম্যাবলীবাসিনী" পদটা বাঙ্গালা গ্রন্থে যত কম থাকে ততই মঙ্গল। তাহার পর "ভারতেতিহাস" কথাটা বড় ভয়ানক। "নবজলধরপটলসংযোগে"র মত পদ কোন বিশেষ বিশেষ স্থানে ও বিশেষ বিশেষ কারণে ব্যবহৃত হইতে পারে। "কাদম্বরী"র বাঙ্গলা সচরাচর গ্রন্থে থাকা উচিত নহে। সুখের বিষয় উপস্থিত গ্রন্থে "হর্ম্ম্যাবলীবাসিনী"র ভাগ অল্প; কেবল সময় সময় লেখক অলঙ্কারের জন্য ইচ্ছা করিয়াই যেন ওরূপ সন্ধি ও সমাসের অবতারণা করিয়াছেন।

এই সন্ধির ছটার উপর আবার গ্রন্থের ভাষার একটী বিশেষ দোষ লক্ষিত হয়। সে দোষ বোধ হয় লেখকের বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকায় ও লেখার অনভ্যাসের কারণ ঘটিয়াছে। "সবিশেষ পরিমাণে," "চূড়ান্ত পরিচায়ক," "নৈতিক ও কর্ত্তব্য পালন," "মনুষ্যকে সংসারের প্রতি মমতা আকর্ষণ করাইতেছে," "কারণ পণ্ডিতগণ যথার্থই কহিয়াছেন যে, কোন প্রকার কর্ম্মই হেয় নহে যদি না উহা হইতে কোন সমাজের ও ব্যক্তি বিশেষের অমঙ্গল সাধিত হয়," "আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম ভাবিয়া দেখা উচিত", "কোন্ পথ ছাড়িয়াছি, কোন্ পথ মধ্যে অবস্থান করিতেছি ও কোথায় উপনীত হইব, ধীরভাবে চিন্তার সহিত অনুধাবন ব্যতীত তাহা নিরাকরণ করিতে পারা যায় না," ইত্যাদি। এ সকল দোষের বিস্তৃত সমালোচনা অনাবশ্যক, পাঠক মাত্রেই উহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। "সবিশেষ পরিমাণে" কোন সুলেখক লিখিতেন না। "কাথর

পণ্ডিতগণ যথার্থই কহিয়াছেন, ইত্যাদি,” —এ সমস্তটা ঠিক যেন ইংরাজী ছাঁচে ঢালা। পাঠ করিয়াই মনে হইল লেখক বুঝি কোন ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উহা আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিয়াছেন, অথবা তিনি ইংরাজী ভাষায় এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন যে তিনি স্বপ্ন পর্য্যন্ত ইংরাজী-তেই দেখেন;—লেখার প্রণালী (construction)টা পর্য্যন্ত ইংরাজী হইয়া গিয়াছে। এরূপ হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু মহারাজকুমারের ন্যায় সুলেখকের ওরূপ দোষ থাকা উচিত নহে। “কোন্ পথ ছাড়িয়াছি ইত্যাদির” ভিতর “নিরাকরণ” অর্থে “নির্ণয়করণ” বুঝায় না, উহার শব্দার্থ দূরীকরণ”। সাধারণতঃ লোকে “নিরাকরণ” কথাটা “নির্ণয়করণ” অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু লেখার ভিতর কখনও ওরূপ ঘটে না, ঘটিলেও উহা অমার্জ্জনীয়। শব্দ প্রয়োগে একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক সকল দোষ সত্বেও গ্রন্থকার তাঁহার সদুদ্দেশ্য, গবেষণা,ও সুচেষ্টার জন্য প্রশংসা পাইতে পারেন। পুস্তকে যে ভাল লেখা হয় নাই এমত নহে, তবে দোষ দেখা-ইলে উপকার হইয়া থাকে এই বিবেচনায় কেবল দোষগুলিই নির্দ্দিষ্ট হইল। আশা করা যায় কুমার বাহাদুর তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে যত্নের সহিত ভ্রমসংশোধন করিবেন এবং স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক যুক্তিগুলি বিচার করিবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র সোম।

বিশুদ্ধ হিন্দু আচার।

ঘৃত।

ঘৃত হিন্দুদিগের নিকট অত্যন্ত পবিত্র। ঘৃত ব্যতীত হিন্দুদিগের যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোম, কিছুই হয় না। পূজার অর্ঘ তণ্ডুলে, নৈবেদ্য দ্রব্যে, পূজান্ত হোমে ও দেবস্নানে সর্ব্বত্রই ঘৃতের প্রয়োজন। অন্নে ঘৃতের ছিটা না দিলে সে অন্ন দেবদেয় নহে; ভক্ষ্যও নহে। ভোজ্যে ঘৃত না থাকিলে সে ভোজ্য দেবদেয় নহে; ব্রাহ্মণদেয়ও নহে। সর্ব্বত্রই ঘৃতের প্রয়োজন; ঘৃত হিন্দুদিগের পরম পবিত্র। শ্রুতি ‘আয়ুর্বৈ ঘৃতম্” বলিয়া ঘৃতের প্রশংসা করিয়াছেন, অগ্নিরেতঃ বলিয়া ঘৃতকে প্রকারান্তরে ভাবা-ন্তরে দেবাংশ বলিয়াছেন, পুরাণাদি শাস্ত্রেও ঘৃতের পবিত্রতা অনুবাদিত হইয়াছে,সুতরাং ঘৃত হিন্দুদিগের নিকট পরম পবিত্র। পরম পবিত্র বলিয়াই ঘৃত বিশুদ্ধ হিন্দু আচারের অন্তর্গত ও আশ্রয় দ্রব্য হইয়াছে এবং ঐ কারণে হিন্দুদিগের মধ্যে উহার ব্যবহার-প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়।

বস্তুতঃ ঘৃত অতি পুষ্টিকর ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক

পদার্থ। প্রাচীন ঋষিরা যজ্ঞাদিতে ঘৃতাহুতি দিয়া তদাঘ্রাণে দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন। ঘৃতে দ্রব্য বিশেষ সংযোগ করিয়া তাহা কাষ্ঠ বিশেষের অগ্নিতে প্রক্ষেপ করতঃ গৃহদোষ শান্তি করিতেন (ইহা বাস্তুযাগ নামে প্রসিদ্ধ)। দ্রব্য বিশেষ সংযোগ করিয়া তদাহুতি ধূমের দ্বারা রোগীর রোগশান্তি করিতেন। (ইহাকে বলে শান্তিহোম।) দ্রব্যবিশেষ মিশ্রিত করিয়া ঘৃতাহুতির দ্বারা শরীরের কান্তি আনয়ন ও পুষ্টিসাধন করিতেন। (ইহার নাম পৌষ্টিক হোম।) অধিক কি বলিব, পুর্ব্বে এতদ্দেশে দেশবিস্তারী মারীভয় ও বিশেষ বিশেষ ঔৎপাতিক উপসর্গও হোম বিশেষ দ্বারা উপশান্ত হইত।

সদ্যোজাত গব্য ঘৃত হৈয়ঙ্গবীন নামে প্রসিদ্ধ। এই সদ্যোজাত গব্য ঘৃতের আঘ্রাণ যে ইন্দ্রিয়পোষক তাহা কাহার অবিদিত নাই। যে কারণে হউক, ঘৃত ঋষিদিগের ও দেবতাদিগের পরম পবিত্র ও প্রিয় বস্তু। এমন কি উহা অমৃত স্থলে উপনায়িত হইতে দেখা যায়। একটী শাস্ত্রবাক্য আছে, গৃহস্থ নিত্য প্রাতঃকালে ঘৃতে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিবেন। নিকটস্থ ঘৃতে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে গেলে অবশ্যই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা উহার গন্ধ সূক্ষ্ম পরমাণু সহ নাসাপথে দেহপ্রবিষ্ট হইয়া দেহের পুষ্টি ও প্রচুর হিত করিবেক, অনুমান হয়, এই অভিপ্রায়েই পুর্ব্বোক্ত বিধান প্রচলিত। পুরোহিত হোম শেষে যজমানের ভ্রূমধ্য, ললাট, কণ্ঠ ও বাহুমূলদ্বয়ে যথাক্রমে যজ্ঞভস্মযুক্ত যজ্ঞীয় ঘৃতশেষ সংলগ্ন করিয়া আয়ুষ্য মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করেন, আর বলেন, তোমার কশ্যপের, জমদগ্নির ও দেবগণের আয়ুলাভ হউক।

ঘৃত যে অমৃত তুল্য উপকারী তাহা তাহার বিষনাশকতা শক্তি থাকায় প্রমাণিত হয়। ঘৃত বিষনাশক। মাদক দ্রব্য সেবনে শরীরে বিষক্রিয়া উপস্থিত হইলে ঘৃত ভোজন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার শান্তি হয়। ঘৃত ভোজন শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতির দংশন জাত বিষ নাশ করিতে বিশেষরূপে সক্ষম। বোল্‌তা ভিমরুল দংশন করিলে মলদ্বার প্রভৃতি স্থানে ঘৃত প্রাসক করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার জ্বালা নিবারিত হয়। অন্নে ঘৃত ম্রক্ষণ করিলে কেশ কীটাদি সংশ্রব জনিত অন্নদোষ নিবারিত হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি, কাশ্যাদি দেশে মক্ষিকার অত্যন্ত আধিক্য। এমন কি সে সকল দেশে অন্ন প্রস্তুত করিয়া তাহা ১ মিনিট কালও বিশুদ্ধ রাখিবার উপায় নাই। দেখিতে দেখিতে সমুদায় অন্ন মক্ষিকাচ্ছাদিত হইয়া যায়। কিন্তু যদি অন্ন ঘৃতম্রক্ষিত করা হয়, তবে তাহার নিকটে একটী মক্ষিকাও যাইবে না। পদে ঘৃত ম্রক্ষণ করিলে মশক দংশনজ জ্বালা অনুভূত হয় না, ইহা সর্ব্বপ্রত্যক্ষ। এই সকল গুণে অলঙ্কৃত বলিয়া ঘৃতের আয়ুর্ব্বর্দ্ধকতা গুণ অবিসম্বাদী রূপে অনুমেয়। চার্ব্বাকমতাবলম্বীরা বলিয়া থাকে—

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

ঘৃতভক্ষণে পাপনাশ ও অলক্ষ্মী নাশ হয়; ইহা কাহারও অস্বীকার্য্য হইতে পারে না। ঘৃতভোজী নর কামক্রোধাদির বেগ ধারণ করিতে সমর্থ সুতরাং তাহার পাপও অল্প। ঘৃত

ভোজীর কান্তি ও মনঃশুদ্ধি বৰ্দ্ধিত হয়; সুতরাং তাহার নিকট অলক্ষ্মী পরাভূতা।

ঘৃত ভোজন সম্বন্ধে হিন্দুদিগের মধ্যে একটী সদাচার প্রচলিত আছে। সেটী এই—মধ্যভোজনে ঘৃত ভক্ষণ না করা। উচ্ছিষ্ট ঘৃত ভোজন অত্যন্ত নিন্দনীয়। বস্তুতঃ মধ্যভোজনে ঘৃত ভক্ষণ অপেক্ষা প্রথম ভোজনে ঘৃতম্রক্ষিত অন্নভক্ষণ রসনেন্দ্রিয়ের বিশেষ তৃপ্তিকারক। মধ্যভোজনে ঘৃত ভক্ষণ করিলে স্বাদগ্রহের ক্রটী ও অগ্নিমান্দ্য হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং "তাম্রপাত্রে পয়ঃ পানং উৎসৃষ্টে ঘৃতভোজনম্" এই নিষেধ শাস্ত্র সার্থক। অনেকে বলেন, ঘৃত চাহিয়া লইলে দোষ হয় না। আমাদের বিবেচনায় তাহা মিথ্যা কথা। ঐ ব্যবহার বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রানুমোদিত নহে। ঘৃতে লবণ সংযোগ করিয়া ভক্ষণ করা বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রানুমোদিত নহে। লবণ সংযোগে ঘৃত গুরুপাকী ও বিষ্টম্ভী হয়। যাঁহারা বলেন, কাঁচা ঘি সহ্য হয় না, তাঁহারা বিনা লবণে কেবল ঘৃতান্ন ভক্ষণ করিয়া দেখিবেন, ঘৃত ভোজন জন্য কোনও উদ্বেগ হইবেক না। ঘৃত যে গুরুপাকী ও বিষ্টম্ভী হয় তাহার কারণ লবণসংযোগ। আরও অনেক কথা বলিবার রহিল।

শ্রীকালীবর শর্ম্মা।

বঙ্গে আর্য্যসমাগম।

বৈদিক কাল ভারতে প্রাচীন আর্য্যগণের প্রথমাবস্থা। ঐ কালে বঙ্গভূমির অস্তিত্বের কোন প্রমাণ লক্ষিত হয় না। অনুমান হয়, বঙ্গদেশ তখন বনরাজিপরিবেষ্টিত, পশু পক্ষীদের আবাসভূমি অথবা সাগরগর্ভে নিহিত ছিল। কারণ, আধুনিক "বাঙ্গলার"[১] অধিকাংশ যে সাগরপ্রসূত, ইহা ভৌগোলিকগণ কর্ত্তৃক প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সময়ক্রমে অনার্য্যগণ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক ভারতের উর্ব্বর প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া এই নববনরাজি মধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। অনার্য্যগণ বহুকাল এই প্রদেশে বাস করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিল।

আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ভগবান মনুর সময়ে বঙ্গভূমি অনার্য্যগণকর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। তৎকালে আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত আর্য্যগণের অধিকৃত হইয়াছিল। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, দক্ষিণপূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে আরবসাগর এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ "আর্য্যাবর্ত্ত" নামে কথিত হইত। আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত অতিক্রম করিলে সমাজচ্যুত হইতেন। কিন্তু মনুর অব্যবহিত পরেই রামায়ণের সময়ে বঙ্গে আর্য্যগণ রাজত্ব করিতেন। রামায়ণে বঙ্গের নামোল্লেখ আছে; ঐ সময়ে বঙ্গ

---

[১] মুসলমানগণ প্রাচীনবঙ্গকে বাঙ্গালা আখ্যা প্রদান করেন।

একটী সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। ইহার দ্বারা বোধ হয় ক্রমে সময় বৃদ্ধির সহিত বংশবৃদ্ধি হইলে পূজনীয় আর্য্যগণ সকল বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া ভারতের অন্যান্য উর্ব্বরা প্রদেশ সকল অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় শস্য-শ্যামলা স্বর্ণক্ষেত্র উর্ব্বরা বঙ্গভূমি যে প্রথমেই তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে ইহা বিচিত্র নহে। অতএব এক্ষণে স্থির হইতেছে যে, মনুর অব্যবহিত পরে ও রামায়ণের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে পূজনীয় আর্য্যগণের সমাবেশ হইয়াছিল।

প্রাচীন আর্য্যগণ দেবতার পুত্র বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। বঙ্গের আদিম রাজবংশ চন্দ্রবংশসম্ভূত। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পুত্র, অত্রি, তৎপুত্র সোম বা চন্দ্রের বংশ ভারতবিখ্যাত। এই চন্দ্রবংশের পরাক্রান্ত নৃপতিগণ ভারতের প্রায় সকল স্থানেই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সূর্য্যবংশীয় প্রথম রাজা ইক্ষাকুর ভগিনী ইলা চন্দ্রতনয় বুধকে পাণিদান করেন। বুধের ঔরসে ও ইলার গর্ব্ভে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। এই পুরূরবা চন্দ্রবংশীয় প্রথম নৃপতি বলিয়া পরিচিত। প্রয়াগের নিকট প্রতিষ্ঠানপুর নামক নগরী (আধুনিক ঝুসি) ইঁহার রাজধানী ছিল। পুরূরবার প্রপৌত্র রাজা যযাতির পঞ্চপুত্র ছিল—যদু,তুর্ব্বসু,দ্রুহ্য,অনু ও পুরু। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার অপরাপর ভ্রাতাগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে অনার্য্যদিগকে দূরীভূত করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য অধিকার করেন। মহারাজ অনুর অধস্তন দ্বাদশ সংখ্যক নৃপতি বলির অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ শুম্ভ প্রভৃতি কয়েকটী পুত্র জন্মিয়াছিল। ইঁহারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এক একটী রাজ্য স্থাপন করিয়া স্ব স্ব নাম হইতে রাজ্যের নামকরণ করিয়াছিলেন,২ তন্মধ্যে মহারাজ বঙ্গ আনার্য্যদিগকে পরাজয় করিয়া "বঙ্গ রাজ্য" সংস্থাপিত করেন। প্রাচীনকালে বঙ্গ যে একটি পরাক্রান্ত ধনশালী রাজ্য ছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। রামায়ণ দ্বিতীয়কাণ্ডে মহারাজ দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের সময়ে রাজগণের নিমন্ত্রণ প্রসঙ্গে বঙ্গরাজকে সমৃদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস স্বপ্রণীত রঘুবংশে মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বঙ্গবাসীদিগকে রণতরী আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বঙ্গরাজ্যের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—"ভীম মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছবাসী

২মহারাজ অঙ্গ আধুনিক ভাগলপুর প্রদেশ অধিকার করিয়া "অঙ্গরাজ্য" স্থাপন করেন,চম্পানগর ইঁহার রাজধানী ছিল। মহারাজ কলিঙ্গ সমুদ্রোপকূলে "কলিঙ্গরাজ্য" স্থাপন করেন। সমুদ্রোপকূলে বর্ত্তমান "কলিঙ্গপত্তন"নামক নগরী অদ্যাপি ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। "শুম্ভরাজ্য" ঠিক কোন স্থানে ছিল ইহার নির্ণয় করা সুকঠিন। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত নামধেয় কোন প্রদেশ বা নগরী দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়ে বঙ্গদেশের অব্যবহিত পরেই শুম্ভরাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় বঙ্গদেশের নিকটস্থ কোন প্রদেশে শুম্ভরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিশেষতঃ ভ্রাতাগণ পরস্পর সন্নিহিত রাজ্য যে স্থাপন করিবেন, ইহাই সম্ভব।

মনৌজা রাজা এই দুই মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্তি, কক্কটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে ও শুম্ভদিগের অধীশ্বর ও মহাসাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে পরাজয় করিলেন।"৩

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীত হয় যে, মহাভারতের সময়ে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্তি ও কক্কটাধিপতি প্রভৃতি কতিপয় নৃপতি বঙ্গদেশমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যশাসন করিতেন এবং তাঁহারা "বঙ্গদেশাধীশ্বর" নামে পরিচিত ছিলেন। বঙ্গরাজ্যের নামোল্লেখ করিয়া তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন প্রভৃতি নরপতিগণকে "বঙ্গদেশাধীশ্বর' নামে অভিহিত করায়, বোধ হইতেছে, উক্ত রাজগণ বঙ্গরাজ্যের অধীনে থাকিয়া স্ব স্ব রাজ্য শাসন করিতেন।

প্রাচীন বঙ্গরাজ্যের উত্তরসীমা প্রাগ্জ্যোতিষপুর (কামরূপ), দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরকূলে কলিঙ্গরাজ্য, পূর্ব্বে ভাগীরথী এবং পশ্চিমসীমায় মিথিলা ও অঙ্গরাজ্য নির্ণীত ছিল। ক্রমে আর্য্যগণ বঙ্গের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সিংহলপুর রাজ্য তন্মধ্যে অন্যতম। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় সার্দ্ধপঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ সিংহবাহু সিংহপুর (বর্ত্তমান সিংহভূম) নগরে রাজ্যশাসন করিতেন। কথিত আছে, মহারাজ সিংহবাহু স্বহস্তে একটী সিংহবধ করিয়াছিলেন। মহারাজ সিংহবাহু স্বীয় জেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বিজয়সিংহ প্রজাপীড়ন দোষে পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হন। মহারাজ সিংহবাহু যে কিরূপ প্রজারঞ্জক নৃপতি ছিলেন, ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে। এক সময়ে অযোধ্যাধিপতি মহারাজ রামচন্দ্র প্রজার মনোরঞ্জনার্থে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গিনী প্রাণপ্রতিমা সীতা দেবীকে বাল্মীকির তপোবনে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, অপর একসময়ে বঙ্গবাসী মহারাজ সিংহবাহু প্রজাগণের দুঃখ মোচন করিবার জন্য স্বীয় আত্মজকেও রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া যুবরাজ বিজয়সিংহ অর্ণবযান আরোহণ পূর্ব্বক স্বীয় অষ্টশত অনুচর সহিত লঙ্কাদ্বীপে যাত্রা করেন। তৎকালে লঙ্কাদ্বীপ অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। তিনি লঙ্কাপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তথায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। বিজয়সিংহের বংশোপাধি "সিংহ" হইতে লঙ্কা "সিংহল" নামে অভিহিত হইয়াছে।

খৃষ্ট জন্মিবার তিনবৎসর পূর্ব্বে যে সময়ে ভুবনবিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডার পঞ্চনদ প্রদেশে যুনান জয়পতাকা প্রতিষ্ঠিত করেন, তখনও পরাক্রান্ত আর্য্যভূপতিগণ বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। প্রতাপশালী গঙ্গারাঢ়ী রাজবংশ তাঁহার সমসাময়ীক। মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার উক্তরাজবংশের বিভবের বিষয় অবগত হইয়া বঙ্গরাজ্য জয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু

৩৮কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাভারত, সভাপর্ব্ব।

তাঁহার সৈন্যগণ গঙ্গা নদী অতিক্রম করিতে অসম্মত হওয়ায় অগত্যা তিনি বিজয়াশা ত্যাগ করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পালরাজগণ ও তৎপরে সেনরাজগণ কর্ত্তৃক বঙ্গরাজ্য শাসিত হইয়াছিল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ বাঙ্গলার ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। প্রাচীনকালে বঙ্গভূমি ধনে, মানে ও পরাক্রমে যে সভ্যতার চরমসীমায় পদার্পণ করিয়াছিল। সে বিষয়ে সংশয় নাই। প্রাচীন বঙ্গবাসিগণ রণে পরাঙ্মুখ হইতেন না, তাঁহারা অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন। প্রাচীন বঙ্গে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না। প্রাচীন বঙ্গবাসিগণ পোতারূঢ় হইয়া যবদ্বীপ, সিংহলদ্বীপ প্রভৃতি মহাসাগরবক্ষস্থিত দ্বীপসমূহে বাণিজ্য করিতে নির্গত হইতেন। সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে সময়ে চীন পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙ্গ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসেন, ঐ সময়েও তাম্রলিপ্তি (বর্ত্তমান তমোলুক) একটী সমৃদ্ধিশালী প্রধান বন্দর ছিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

শ্রীশ্রীসারদাসঙ্গীত।

রাগিনী আড়না বাহার, তাল—ধামার

আস্থায়ী
গাওরে আনন্দে নমি শ্রীবাণী চরণে
বসন্ত পঞ্চমী রঙ্গে বঙ্গের গগণে॥

অন্তরা
পাত চিত শতদল, অতি সীত সুবিমল,
পূতগঙ্গাজলে, ভাব-ভরে ঢলে,—
সানন্দে ধররে ভকতজন

যুগল
শ্রীবিদ্যাপদ সম্পদকারণ,
কিবা ভোগী, রোগী, কবি, ত্যাগী, যোগী
জনে, ভবনে বা বনে॥

———ওঁ———

আভোগ
মানসে স্মর সে শ্বেতবরণা,
শত শশধরে ধরে না তুলনা,
শোভে করে বেদ, বীণা যার মধুরিমা

সঞ্চারী
হরে হরির মন, বিধি সাধি সিদ্ধ হন
যারে ধ্যানে শূন্যেতে হেরেন ত্রিলোচন,
সে ভারতী পূজা আজি ভারতভবনে॥

শ্রীকেদারনাথ চৌধুরী।

সাহিত্য-সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড।] ফাল্গুন, ১২৯৭। [একাদশ সংখ্যা।

সমাজ-সংস্কার।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। যদিও সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, কিন্তু প্রকৃতির গুণ সকল বিষম। একটি গুণের সহিত অপর গুণের সাম্য নাই। গুণের সাম্য নাই বলিয়া গুণজন্য প্রাকৃতিক বস্তুমাত্রই বিষম হইয়াছে। অধিক কি, বৈষম্যই জগতের মূল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈষম্য হইতেই বিরোধের উৎপত্তি। ঐ বিরোধ জড়জগতের সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে স্থূলতম গ্রহনক্ষত্রাদিতেও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একটি পরমাণু অপরটিকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সে তাহা হইতে বিশ্লিষ্ট হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছে। একটি গ্রহ অপর গ্রহকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সে তাহা হইতে বিশ্লিষ্ট হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছে। প্রকৃতি স্বয়ং অবিষমা। তিনি বৈষম্যের জননী হইয়াও মধ্যস্থ হইয়া প্রতিনিয়তই ঐ বৈষম্য নিবারণ করিতেছেন। জড় জগতের ন্যায় চেতন জগতেও বৈষম্যের অপ্রতুল নাই। চেতন জীবমাত্রই স্বার্থ সাধনের জন্য যে কেহ তাঁহার ঐ স্বার্থের বিরোধী, তিনি তাঁহার সহিত রণরঙ্গে উন্মত্ত। প্রকৃতি উহাদেরও মধ্যস্থ হইয়া

সকল বৈষম্যই নিবারণ করিতেছেন। কিন্তু চেতন জগতের বৈষম্য কেবল প্রকৃতির মধ্যস্থতায় নিবারিত হয় না। চেতন জীব অনেক সময়ে বিরোধে সমর্থ হউন বা না হউন প্রকৃতির সহিত বিরোধ সাধনেও প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহারা মনে করেন, আমরা চেতন জীব, প্রকৃতিকে আমাদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে দিব না। এই ভাবিয়া তাঁহারা যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা বস্তুতঃ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ নহে, প্রকৃতির নিয়মের সহিত সমর। তাঁহারা প্রকৃতির একটি নিয়মেয় সাহায্যে প্রকৃতির অপর নিয়মের সহিত যুদ্ধ করেন। যাহা হউক, তদ্বিষয়ে জীবের সামর্থ আছে। জীব নিজের বিবেক বলে অনেক সময়ে যুদ্ধে জয়লাভও করিয়া থাকেন। জীব স্বভাবতঃ হীনবল হইয়াও কেন্দ্রীভূত বল দ্বারা অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। জীব আত্মরক্ষার জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। ঐ দুর্গ সুরক্ষিত হইলে তাঁহার সর্ব্বস্বই সুরক্ষিত হয়। দুর্গ-রক্ষিত হওয়াতে কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার ধন অপহরণ করিতে পারেন না। জীবের সমাজই জীবের দুর্ভেদ্য দুর্গ। সমাজদুর্গে সুরক্ষিত হইয়া জীব সুখে কাল-যাপন করেন। মানবের সমাজদুর্গে মান-বীয় শান্তিসুখ সুরক্ষিত হয়। ঐ দুর্গের রক্ষক সাম্য, স্বাধীনতা ও অনুরাগ। কাল-শত্রু মানবের সুখধন অপহরণ করিবার জন্য নিয়ত ছিদ্রানুসন্ধান করিতেছেন। যদি কোন সময়ে কোন রক্ষকের কোন ছিদ্র প্রাপ্ত হন, তবে সেই পথে প্রবৃষ্ট হইয়া মানবের সুখশান্তি বিলোড়ন ও অপহরণ করেন। ছিদ্রেরও অসম্ভাবনা নাই। বস্তু মাত্রই পরিণামী। পরিণত দুর্গে কাল স্বয়ংই প্রবেশোপযোগী ছিদ্র করিয়া লন। সুতরাং সময়ে সময়ে কালকৃত ছিদ্রের সংস্কারেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সংসারের কোন বস্তুর কোন অবস্থাই চিরস্থায়ী নহে। পরিণামী পদার্থমাত্রই পরিবর্ত্তন নিয়মের অধীন। মানবসমাজও প্রকৃতির ঐ পরিবর্ত্তন নিয়মের বহির্ভূত নহে। পৃথিবীর সকল দেশের লোকসমা-জেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ঐ পরিবর্ত্তনের প্রভাবে তত্তদ্দেশের লোকসমাজের আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ই ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। দেশ, কাল ও পাত্রের গুণে পৃথিবীর সকল দেশের লোকসমাজেরই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিলেই সংস্কারেরও প্রয়োজন হয়। অনেকেই বলিতেছেন, আজ আর্য্যসমাজের সেই অব-স্থাই ঘটিয়াছে, আর্য্যসমাজের ঈদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, আজ যদি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণ পুনর্জ্জীবিত হইয়া ভারতে আগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বর্ত্তমান আর্য্যসমাজের আকৃতি প্রকৃতি সন্দ-র্শন করিয়া যে অতীব বিস্ময়াপন্ন হয়েন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা দেখিবেন, তাঁহাদিগের সময়ের ন্যায় উপ-নয়নের পর গুরুকুলে বাসাদিরূপ ব্রহ্ম-চর্য্যের অনুষ্ঠান আর নাই; পূর্ব্ববৎ পঞ্চ-যজ্ঞাদিরূপ গার্হস্থ্যের অনুষ্ঠান এখন নাই; সে বাণপ্রস্থ আচার আর নাই; সে ভৈক্ষ্য প্রথাও আর প্রচলিত নাই। তাঁহারা দেখি-বেন, প্রাচীন আর্য্যগণ যে আচারকে ম্লেচ্ছা-

চার বলিয়া ঘৃণা করিতেন, আধুনিক আর্য্যগণ সেই ম্লেচ্ছাচারেরই পক্ষপাতী। বর্ত্তমান আর্য্যসমাজে আর সে তপশ্চর্য্যা নাই। বর্ত্তমান আর্য্যসমাজের রাজাও ম্লেচ্ছ, এবং প্রজারাও ম্লেচ্ছভাবাপন্ন; যথেচ্ছাচারই এখন রাজনীতি; প্রজাগণ আহার, বিহার, রীতি, নীতি, সকল বিষয়েই যথেচ্ছাচারী। এখন সর্ব্ববিষয়েই "যে যত্রাধিক কল্পনা-কুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমঃ।" কি ধর্ম্মনীতি, কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি সকলেই যিনি যে বিষয়েই অধিক কল্পনাকুশলী তিনি তদ্বিষয়ে বিদ্বত্তম।

লোকসমাজের রীতি নীতি পরিবর্ত্তনের মূল কারণ তিনটি দেশ, কাল ও পাত্র। কালপ্রভাবে দেশের সহিত দেশবাসীরও অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই আর্য্যসমাজে বহুতর পরিবর্ত্তন হইয়া-গিয়াছে। ঐ পরিবর্ত্তন যে সকল সময়েই লোকের অজ্ঞাতসারে বা ইচ্ছানুসারেই ঘটিয়া থাকে তাহা নহে; অনেকগুলি আমাদিগের জ্ঞাতসারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘটি-য়াছে। আবার কতকগুলি পরিবর্ত্তন এত মন্দগতিতে উপস্থিত হয় যে, পরিবর্ত্তনকালে আমরা তাহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাই না। পরে যখন উহা শনৈঃ শনৈঃ বৃহদা-কার ধারণ করে, তখন উহা আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। দৃষ্ট হইলেও তাদৃশ পরিবর্ত্তনকে পুনর্ব্বার এককালে পূর্ব্বাবস্থায় লইয়া যাওয়া আমাদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ঐ সকল পরিবর্ত্তন আমা-দিগের ঈপ্সিত না হইলেও বিশেষ বিশেষ কারণ বশতঃ আমরা তাহা বারণ করিতেও পারি না; পরিবর্ত্তন নিজ গতিতেই হইতে থাকে। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে বর্ত্ত-মান ইংরাজী-রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত আর্য্য-সমাজে আমাদিগের অজ্ঞাতসারে তাদৃশ অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এবং ঐ পরিবর্ত্তন অবনতির দিকেই হইতেছে বলিয়া উহার নিবারণের চেষ্টাও হইয়া আসিতেছে কিন্তু কোন চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত ফলবতী হইল না। কোন চেষ্টাই আর্য্যসমাজকে প্রার্থনীয় অবস্থা প্রাপ্ত করাইতে পারিল না।

মনুষ্যমাত্রই স্বভাবতঃ প্রাচীনপ্রিয় হয়েন। ঐ প্রাচীনপ্রিয়তাও নিন্দনীয় নহে; কারণ, প্রাচীনপ্রিয়তা ভিন্ন—অতীত গৌরবের স্মরণ ভিন্ন—অবনতি নিবারণের বা উন্নতির সহজ উপায়ান্তর নাই। এরূপ প্রভূত নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, এই পৃথিবীর যে যে সমাজ যখনই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন অবগত হইয়া আপনাদিগের পূর্ব্বগৌরবের স্মরণে তাদৃশ অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য তদুপযোগী আচার অব-লম্বন করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা উন্নত হইয়াছেন। কালবশে লোকসমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, প্রাচীনপ্রিয় লোক সকল তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তন্নিবারণে পূর্ব্ব-দৃষ্টান্ত অনুসারে আবির্ভূত কুরীতির উন্মূলন ও সন্নীতির সংস্থাপনে যত্নবান হয়েন। যদিও সমাজের অবনতিও চিরস্থায়িনী নহে, উহা আবার ক্রমে উন্নত হইবেই হইবে। কিন্তু সাধুলোক সকল কালকৃত পরিবর্ত্তনের মৃদু গতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া

যাহাতে ঐ বেগ প্রবল হইয়া লোকসমাজে সত্বর অনুকরণীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য উদ্যম প্রয়োগ করেন। ঐ উদ্যম যদি যথাযোগ্যভাবে প্রযুক্ত হয়, তবেই মঙ্গল, নতুবা বিপরীত ফল উৎপাদন করে।

সমাজমাত্রই, লক্ষিত ভাবেই হউক আর অলক্ষিত ভাবেই হউক, ধর্ম্মভিত্তির উপর সংস্থাপিত। কারণ, ধর্ম্মই সমাজের বন্ধন; ধর্ম্ম ভিন্ন সমাজই হইতে পারে না। সম-গতি-বিশিষ্ট লোক সমূহের নামই সমাজ। প্রত্যেক লোকেরই গতি বিভিন্ন-মুখী; সুতরাং সমগতিই আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তবে যে কতকগুলি লোক কোন একটি সাধারণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহাদিগকে সম-গতি-বিশিষ্ট সমাজ বলা যায়। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ লক্ষ্যের অনুধাবনে কেহ কাহারও স্বার্থের হানি হইতে না দেখেন, ততদিন পর্য্যন্ত সেই সমাজ স্থির ও দৃঢ় থাকে। যখনই যে সমাজে স্বার্থহানি দেখা দেয়,তখনই সেই সমাজের বন্ধন বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম ভিন্ন কোন লক্ষ্যের অনুধাবনেই ঐ স্বার্থ রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্মশূন্য কোন সমাজই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদিও কোন কোন সাধারণ লক্ষ্যের অনুধাবনে সমাজের দৃঢ় বন্ধন দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাও চির-স্থায়ী নহে; নিশ্চয় জানিতে হইবে। ধর্ম্ম ভিন্ন তাদৃশ যে লক্ষ্য সমাজবন্ধন করে তাহাকে প্রায়ই সাধারণের ক্ষতিনিবারক-রূপে দেখা যায়। যদি কোন কারণ বশত ঐ অনুধাবন তাদৃশ ক্ষতির নিবারক না হয়, বা যন্নিবারণের জন্য উদ্যম, সেই কার্য্যের সমাধা হইয়া যায়, তখন আর ঐ সমাজ থাকে না।

ধর্ম্মই যদি সমাজের মূল হইল তবে সমাজসংস্কারও ধর্ম্মমূলক হওয়া চাই। যে সমাজে ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য অপেক্ষাকৃত অল্প, সে সমাজে ধর্ম্মকে স্পষ্ট লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল ব্যবহারিক উন্নতের অনুকরণে উন্নতি লাভ হইতে পারে; কিন্তু যে সমাজে ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য—যে সমাজের শিরায় শিরায় ধর্ম্মশোণিত প্রবাহিত; সে সমাজে ধর্ম্মের প্রতি স্পষ্ট লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল ব্যবহারিক উন্নতের অনুকরণের উপদেশও অসঙ্গত। আর্য্যসমাজের সম্পূর্ণ বন্ধন ধর্ম্মের সহিত, সুতরাং আর্য্যসমাজের সংস্কার চেষ্টা সকলও ধর্ম্মবল প্রয়োগ ভিন্ন কোন কালেই আর্য্যসমাজকে আকর্ষণ বা উন্নত করিতে পারে নাই, পারিবেও না।

এখন দেখিতে হইবে, ঐ সংস্কার কোন নবোদ্ভাবিত ধর্ম্মানুসারে অথবা প্রাচীন ধর্ম্মানুসারেই করিতে হইবে। এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, সংস্করণীয় সমা-জের সংস্কৃত অবস্থাই—নীরোগ অবস্থাই, প্রথম আলোচনীয় হয়। ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি করা উচিত। স্বাস্থ্যের অবস্থা জ্ঞাত না হইলে, কি রোগ-নির্ণয় কি রোগ-পরিমাণ-নির্ণয়, বা ঔষধ-ব্যবস্থা কিছুই হইতে পারে না।

প্রকৃতি মানবজাতির উপর নিজের যে প্রভাব বিস্তার করেন, সেই প্রভাব হইতে সমুৎপন্ন ভাবই সামাজিক ভাব। অতএব মানবীয় বৃত্তি সকল যদি প্রকৃতির কোন

নিয়মের অধীন হয়, তবে মানবসমাজও উক্ত নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন হইবে। যদিও অপরাপর প্রাকৃতিক নিয়মের অবধারণ সামর্থ্যের ন্যায় সামাজিক নিয়মের অবধারণ সামর্থ্যও অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কতশত বৎসরে যে আমরা উহার অবধারণে সমর্থ হইব, তাহার নিশ্চয়তা নাই। নিশ্চয়তা না থাকিবার কারণ, সামাজিক নিয়ম সমূহের জটিলতা নহে, কিন্তু সমাজের নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীলতা। যদিও প্রকৃতির সকল পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু সমাজ যেরূপ পরিবর্ত্তনশীল তাদৃশ পরিবর্ত্তনশীল বস্তু প্রকৃতিতে নাই। ঐ পরিবর্ত্তন যদিও বিনা কারণে ঘটে না, কিন্তু কারণের বহুত্ব বশতঃ কোন্‌টি প্রকৃত কারণ, তাহা অবধারণ করা আমাদিগের পরিমিত শক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য। আবার কেবল কারণবহুত্বই যে আমাদিগের বুদ্ধিকে বিমোহিত করে, তাহাও নহে; কিন্তু ঐ পরিবর্ত্তন যে ভবিষ্যতে কতশত প্রকারে হইবে, তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ।

সামাজিকতাপন্ন মানবের নিয়ম ভিন্ন সামাজিক নিয়ম আর কিছুই নহে। সামাজিকতাপন্ন মানবও মানবই, সুতরাং মানবের বৃত্তি সকলও প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন থাকে। মানব সামাজিকত্বাপন্ন হইলেও তাঁহার মানবত্ব যায় না, সুতরাং তদবস্থ মানবের গুণ সকলও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না।

এইরূপে মানবসমাজ যদিও সাধারণ নিয়মের অধীন, কিন্তু পরীক্ষার অসুযোগ প্রযুক্ত ঐ সকল নিয়মের পরীক্ষাই হয় না। এইরূপ দুইটি মানবসমাজ দৃষ্ট হয় না, যাহাদিগের প্রকৃতিগত সাম্যসত্ত্বেও অবস্থার প্রভেদ আছে। যেখানে প্রকৃতিগত সাম্য আছে, সেখানে অবস্থাগত সাম্যও আছে। আর যেখানে প্রকৃতিগত অসাম্য সেখানে অবস্থাগত বৈষম্যও অবশ্যম্ভাবী। ফলতঃ তাদৃশ স্থলে প্রকৃতিগত বৈষম্যেরও নিশ্চয়তাপ্রযুক্ত এক সমাজের নিয়ম অন্য সমাজে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। একের যাহাতে উন্নতি হইয়াছে, অপরের তাহাতে অবনতি হইতে পারে এবং একের যাহাতে অবনতি হইয়াছে, অপরের তাহাতে উন্নতিও হইতে পারে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার উন্নতির পক্ষে যে নিয়ম যতদূর অনুকূল, কার্য্যকারণ অনুসন্ধানে যতদূর সাধ্য নির্ণয় করিয়া সেই নিয়ম উন্নতির নিমিত্ত ততদূর পর্য্যন্ত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু কারণবহুত্ব প্রযুক্ত কার্য্যকারণ অনুসন্ধান করাও দুর্ঘট। সুতরাং প্রাচীন নিয়ম সকল যুক্ত কি অযুক্ত এবং তাহাদিগের প্রয়োগ বর্ত্তমান সমাজের অনুকূল কি প্রতিকূল, ইহাই প্রথম বিচার্য্য। বিচারে যদি প্রাচীন নিয়ম সম্ভবত অযুক্ত বলিয়া স্থির হয় এবং তদপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়া থাকে তবে তাহাই অবলম্বনীয় হইবে। অনেকেই বলিবেন কুসংস্কারপূর্ণ ঐ সকল প্রাচীন নিয়ম যদি সমাজের উন্নতির অনুকূলই হইবে, তবে তাহা সমাজকে পতিত করিল কেন? আমরা বলি, তাহাদিগের পালন পতনের কারণ হয় নাই, কিন্তু যথাবিধি অপালনই পতনের কারণ হইয়াছে। আমা-

দিগের সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতে যে দশবিধ সংস্কার আচরিত হইয়া আসিতেছে ঐ গুলির একে একে সমালোচনা করিলেই সকল সন্দেহের নিরসন হইবে। বস্তুতঃ যদি সমাজের কোনরূপ সংস্কারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা ঐ দশবিধ সংস্কারের। যে সমাজে কোন সংস্কার নাই, সেই সমাজেই নূতন সংস্কারের প্রয়োজন, যে সমাজে নিষেকাদিশ্মশানান্ত সংস্কার প্রচলিত সে সমাজে আবার কি নূতন সংস্কার হইবে তাহা বুঝিতে পারি না। তবে ঐ সকল সংস্কার কেবল শাস্ত্রনিহিত কি সমাজে যথাবিধি প্রচলিত তাহা অবশ্য দ্রষ্টব্য। যদি সমাজে উহার আংশিক প্রচলিত হয়, সর্ব্বতোভাবে উহার প্রচলন না থাকে, তবে তাহা যাহাতে সুপ্রচলিত হয় তাহা আমাদিগের কায়মনোবাক্যে অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

দ্বাদশ শতাব্দীতে সিংহলে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জনৈক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সিংহলদ্বীপান্তর্গত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম্য-শাসনতন্ত্র মধ্যে একটি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির কোন একটি অধিবেশনে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রকটিত করিতেছি [১] এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এফ, গুরে (F. Gooray) কর্ত্তৃক "ভক্তি শতক" নামক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ সিংহল দ্বীপে প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের জনৈক বন্ধু, কলম্বোনগরান্তর্গত দ্বীপদত্তম্ বিহারের প্রধান পুরোহিত (High Priest) শ্রীযুক্ত মহৎতিব্বতিগুণানন্দ কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থখানি তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ১০৭টী শ্লোকে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। যে যে কারণ সমূহের বর্ত্তমানে ঐ পুস্তকখানি শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক অতীব সুখপাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই কারণগুলি নিম্নে সন্নিবেশিত হইল, যথাঃ—

প্রথমতঃ—"গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় হইলেও উহা সিংহলীয় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।"

দ্বিতীয়তঃ— ঐ খানি বৌদ্ধগ্রন্থ।"

তৃতীয়তঃ—উহা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বৌদ্ধ-সংস্কৃত নামে যে বাক্যবাহুল্যপূর্ণ কঠিন অস্পষ্ট এবং অব্যাকরণিক (Idiom) ভাষা প্রচলিত আছে, গ্রন্থখানি আদৌ সে ভাষায় বিরচিত নহে।"

[১] *Vide.* Proceedings of The Asiatic Society of Bengal for February, 1890. The account of a Bengali Brahman who obtained a high position in the Singhalese Buddhist Hierarchy in the 12 Century A. D.—By Pandit Haraprasad Sastri, M. A.

চতুর্থতঃ—"জনৈক ব্রাহ্মণ, যিনি দৃঢ় সংস্কার বশতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা তাঁহারই রচিত।"

পঞ্চমতঃ—"পুস্তকখানি একাদশ শতাব্দীতে জনৈক বঙ্গবাসী কর্ত্তৃক রচিত হয়।"

ষষ্ঠতঃ—"গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা প্রযুক্তই ঐ ব্রাহ্মণ স্বদেশে অত্যন্ত উৎপীড়িত, স্বধর্ম্মমণ্ডলী ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বইচ্ছায় স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া সিংহলে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। উক্ত দ্বীপের সংস্কাররত বৌদ্ধ-নৃপতি তাঁহার সারবত্তা বুঝিতে পারিয়াই তাঁহাকে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম্য-শাসন-তন্ত্র মধ্যে একটি উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই হেতুই ভূপাল, ব্রাহ্মণকে "বৌদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী" উপাধি দ্বারা সমালঙ্কৃত করিয়াছিলেন।"

শাস্ত্রী মহাশয় উপরোক্ত পুস্তক প্রণেতা সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

"গ্রন্থকার ১০৭ম শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, তিনি একজন প্রকৃত বৌদ্ধ, তাঁহার উপাধি 'কবিভারতী,' জাতিতে ক্ষিতিসুর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, এবং তাঁহার নাম রামচন্দ্র। ধুয়া বা গ্রন্থ সমাপ্তি সূচক বাক্যে—যাহা সচরাচর অনেকটা বিশ্বাস যোগ্য—তিনি শাক্যমুনি অথবা বুদ্ধদেবের একজন ভক্ত, উপাসক, 'বৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী' অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন; তিনি 'ভূসুর' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, শিক্ষক এবং এক জন জনৈক উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি একজন গৌড়দেশনিবাসীও ছিলেন।"

"রাহুলার শিষ্য সুমঙ্গল এই গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত সিংহল দেশীয় সাধুভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ব্যাখ্যা করিবার সময় 'গৌড়দেশ' শব্দের উপর টীকা করিয়া লিখিয়াছেন যে, গৌড়নগর একটি সুমহান্ শিক্ষা-কেন্দ্র,—যথায় কাব্য, ব্যাকরণ, তর্ক এবং অন্যান্য শাস্ত্র সমূহের বিস্তৃতরূপে আলোচনা হইয়া থাকে। গৌড়দেশে রাঢ় বলিয়া একটি মণ্ডল আছে এবং ঐ মণ্ডলান্তর্গত বরেন্দ্র বলিয়া একটি জনপদ আছে, সেই স্থানে রামচন্দ্রের (বৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তীর) জন্ম হয়। ইহা দ্বারা অনেকেই সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন যে, রামচন্দ্র বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমপ্রদ। যেহেতু রাঢ়ি এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পাঁচটি ভিন্ন গোত্র নাই, যথাঃ—শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বাৎস্য এবং সাবর্ণ। কিন্তু কথিত হইয়াছে যে, রামচন্দ্রের কাত্যায়ন গোত্র। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, এই গোত্রান্তর্গত (কাত্যায়ন গোত্র) লোক বাঙ্গালার কোন্ স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়? এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করা নিতান্ত আয়াসসাধ্য নহে। বাঙ্গালা দেশে রাঢ়ি এবং বারেন্দ্র এই দুই সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণই বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী, ইহা বোধ হয়, কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু ইহা ব্যতীত বঙ্গদেশে আর দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণও দেখিতে পাওয়া যায়, যথাঃ—পাশ্চাত্য এবং দাক্ষি-

ণাত্য। লক্ষ্মণ সেনের প্রধান বিচারপতি কৃত 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে ইহাঁরা পাশ্চাত্য এবং উৎকল ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশে অন্ততঃ যে সেন-রাজবংশীয়দিগের সমকালিক প্রাচীন সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না।" শাস্ত্রী মহাশয় এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত বঙ্গীয় উৎকল ব্রাহ্মণদিগের বিষয়ের উল্লেখ আদৌ করেন নাই, যেহেতু, তিনি বলেন যে, "উৎকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাত্যায়ন গোত্র মূলেই নাই।" এক্ষণে পাশ্চাত্যদিগের কথা হইতেছে; শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেনঃ—"যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় আগমন করেন, এবং রাঢ়ি ও বারেন্দ্রগণ, যাঁহাদের উত্তর পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, ইহাঁরা ঐ পঞ্চজন ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণদিগের হয় পূর্ব্বে কিম্বা পশ্চাতে পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণদিগকে রাঢ়িদের ন্যায় একত্র সম্মিলিত হইয়া বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না; যেহেতু উহারা স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়া বিভিন্ন স্থানে বাস করিতে থাকেন। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে সকল প্রকার গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ উহাদিগের শ্রেণীর মধ্যে সকলের সঙ্গে আদান প্রদান হয় না।" শাস্ত্রী মহাশয় এ অঞ্চলের অনেক পাশ্চাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছেন যে, কাত্যায়ন গোত্র কাহারও নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উক্ত গোত্রীয় ব্রাহ্মণ উত্তর-বঙ্গে অর্থাৎ বরেন্দ্র জনপদে আছে। শাস্ত্রী মহাশয় ইহা অনেকটা সম্ভবপর বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। তিনি এ সম্বন্ধে এইরূপ বলেনঃ—"যেহেতু উক্ত প্রদেশে যে সকল পাশ্চাত্যগণ আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাত্যায়ন গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত প্রদেশীয় অনেক মৈথিলী পাশ্চাত্যদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ রামচন্দ্র এই শ্রেণীর অর্থাৎ মৈথিলীপাশ্চাত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। বোধ হয়, বাঙ্গালার অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বরেন্দ্র জনপদ মিথিলার নিকটবর্ত্তী ছিল বলিয়া উপরোক্ত ব্রাহ্মণগণ বহু প্রাচীন কালে এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বঙ্গদেশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের দ্বারা পূর্ণ ছিল বলিয়াই রামচন্দ্রের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আস্থা জন্মিয়াছিল।"

টিপ্পনিকারক একটি সংস্কৃত শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র কবিভারতী সিংহলরাজ পরাক্রমবাহু কর্ত্তৃক "বৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। গ্রন্থরচয়িতাও লিখিয়াছেন যে, "তিনি ঐ গ্রন্থ উক্ত নরপতির রাজত্বকালে প্রণয়ন করেন।"

প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে বলা আবশ্যক যে, ভূপাল পরাক্রমবাহু যে, একজন বিলক্ষণ বিক্রমশালী নরপতি ছিলেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহার খ্যাতি বিস্তার এবং পরাক্রম সম্বন্ধীয় প্রমাণ খোদিতলিপি এবং বিশ্বাস্য ইতিহাসাদিতে

প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাহুবলে তাঁহার বিজয় পতাকা দাক্ষিণাত্যেও উড্ডীন হইয়াছিল। ১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজাসনে অধিরোহণ পূর্ব্বক তিনি যশঃগৌরব সহকারে ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।[২]

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "লক্ষ্মণ-সেন বাঙ্গালায় পরাক্রমবাহুর সমসাময়িক ভূপতি ছিলেন।[৩] কয়েক বৎসর বিগত হইল প্রকাশিত হইয়াছে যে, লক্ষ্মণ সেনের অব্দ মিথিলায় অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। কথিত আছে, আধুনিক প্রচলিত বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ লক্ষ্মণ সেনের পিতা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক সংগঠিত হয়। বারেন্দ্র এবং রাঢ়ি শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তিনিই কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত করেন। কতকগুলি অনার্য্য এবং অর্দ্ধ আর্য্যজাতি নিচয়ের পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রবৃত্ত করাইয়া উক্ত জাতিদিগকে হিন্দুসমাজের মধ্যে উচ্চপদে উত্তোলিত করিয়াছিলেন। তিনি আঢ্য-সুবর্ণবর্ণিক এবং ক্ষমতাশালী যোগীদিগকে সমাজের নিম্নস্তরে প্রক্ষিপ্ত করেন; এমন কি উহাদিগকে এক প্রকার হিন্দুজাতির বহির্ভূত করিয়া দেন। যে দেশে বৌদ্ধ-রাজগণ বহুকাল ব্যাপিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং যে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল, বল্লাল সেন সেই দেশেরই রাজা ছিলেন; সুতরাং এরূপ অবস্থায় স্বভাবতই বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তাঁহার সদ্ভাব না থাকা সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।"

উপরোক্ত কারণ নিচয়ের বর্ত্তমানে শাস্ত্রী মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, রামচন্দ্র জাতিচ্যুত এবং নিপীড়িত হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে, শাস্ত্রীমহাশয় বলেন যে, তিনি সিংহল হইতে এরূপ কেন লিখিবেন, যথাঃ—

"রাজগণকে দণ্ডদিতে দেও, পণ্ডিতদিগকে উপহাস করিতে দেও, তথাচ হে জিন! পিতঃ জিন!! আমি তোমা ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিব না।"

তাহা না হইলে তিনি আবার কেন বলিবেন যে,—

"আমি স্বর্গে অথবা নিরয়ে, পক্ষী অথবা পশুগণের মধ্যে, প্রেতাত্মা অথবা মানবজাতির নগরে, যেখানেই থাকি না কেন, আমার মন যেন তোমাতেই স্থিত থাকে, যেহেতু ইহা ব্যতীত আমার আর অন্য সুখ নাই।"

---

২ Vide Turnours 'Mahawansa' Vol. I. p. IXVI.

৩ বিগত শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় "আদিশুর ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ শীর্ষক প্রবন্ধে পরাক্রমবাহুর রাজত্বকাল নির্ণয় সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের যে ভ্রমটী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পুস্তিকার ছাপা অনুসারে প্রকৃত ভ্রম বটে। কিন্তু আমরা বিনীতভাবে স্বীকার করিতেছি যে, শাস্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে যে একখানি উক্ত পুস্তিকা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ ভ্রমটী সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। উপরে আমাদের সেই স্থলের অনুবাদাংশ দৃষ্টি করিলেই তাহাঁর সত্যতা প্রতীয়মান হইবে, যেহেতু আমরা সংশোধিত অনুসারেই অনুবাদ করিয়াছি। অতএব উহা আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের ভ্রম বলিতে পারিলাম না। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, কৈলাশ বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা ঐ সংশোধিত পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

"তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার ভ্রাতা ও তুমিই আমার ভগ্নী। বিপদে তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু, হে প্রিয় জন, তুমিই আমার প্রভু, তুমিই আমার শিক্ষাগুরু,—যেহেতু আমি তোমা কর্ত্তৃকই সুমিষ্ট অমৃতময় জ্ঞান-লাভ করি। তুমিই আমার ঐশ্বর্য্য, তুমিই আমার সুখভোগ, তুমিই আমার আনন্দ, তুমিই আমার ধন, তুমিই আমার মহত্ত্ব, তুমিই আমার খ্যাতি, তুমিই আমার জ্ঞান, এবং তুমিই আমার জীবন। হে সর্ব্বজ্ঞান-ময় বুদ্ধ! তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।"

শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থখানির চতুর্ব্বিংশ হইতে ত্রিংশ শ্লোক পাঠ করিলে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, উহার প্রত্যেক পংক্তি, প্রত্যেক কথা, এমন কি উহার প্রত্যেক অক্ষরে এরূপ জীবন্তভাব প্রকাশ পাইতেছে যে, লেখক বিশেষ ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াই অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অদৃষ্টের উপরই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মের জন্য তিনি যেরূপ হউক না কেন, সমস্ত প্রকার বিপদ আপদ সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

শাস্ত্রীমহাশয়ের শেষোক্ত কয়েক ছত্র প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বোধ হয়, তিনি অনবধানতা বশতঃ এরূপ লিখিয়া থাকিবেন।

বল্লাল সেন সম্বন্ধে উপরোক্ত যেটুকু বিবরণ পাইতেছি, তাহা বল্লাল চরিত নামক আধুনিক অপ্রামাণিক গ্রন্থেই লিখিত হই-য়াছে। এই বল্লাল চরিত নামক গ্রন্থের মতে কুল-মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠাতা বাঙ্গালা দেশের স্বাধীন রাজা বল্লাল সেন ১৩০০ শকে বিদ্য-মান ছিলেন, এই সময়েই বল্লাল-চরিত রচিত হয়। কিন্তু আমরা বাঙ্গালার দেশীয় ও বিদেশীয় সকল ইতিহাস পাঠেই অবগত হই যে, ঐ সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশ যবনকবলিত হইয়াছিল। তবা-কত-ই-নসিরিনামক প্রাচীন মুসলমান ইতি-হাসের মতে লাক্ষণেয়র রাজত্বকালে ৫৯০ হিজিরায় (১০৯৭শকে) বখ্‌তিয়ার খিলিজি লক্ষণাবতী জয় করেন। লাক্ষণেয় ৮০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার সিংহাসনারোহণ কাল ১০১৭ শক হই-তেছে। এদিকে আই-ইন্‌-আকবরীর মতে বল্লাল সেন ৯৮৮ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। বল্লাল সেন রায় লক্ষণেয়র পিতামহ, সুতরাং উক্ত উভয় গ্রন্থের মত ধরিয়া সময় স্থির করিলে অনৈক্য বলিয়া বোধ হয় না, বরং সম্ভবপর বলিয়াই স্বীকার করা যায়। তাহা হইলে আমরা কুলমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠাতা বল্লাল সেনের সময় ৯৮৮ শকই অধিক প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু নব প্রকাশিত অভিনব বল্লালচরিত নামক গ্রন্থে ১৩০০ শক নির্দ্ধারিত হইয়াছে; আবার ঐ সময়ে বল্লালচরিত-রচয়িতা বিদ্যমান ছিলেন, তাহাও ঐ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং পাঠক মহাশয়! বিচার করিয়া দেখিবেন, বল্লাল চরিত গ্রন্থে যে সমস্ত লিখিত হইয়াছে তাহা অপ্রামাণিক কি না? আমাদের মতে ঐ গ্রন্থখানি নিতান্ত আধু-নিক সময়ে লিখিত হইয়াছে। উহার লিখিত বর্ণনাগুলি এক কালে বিশ্বাসের

অযোগ্য। এরূপ অভিনব গ্রন্থ দূরে নিক্ষেপ করাই উচিত। বস্তুতঃ সুবর্ণবণিক ও মুণী-জাতি বল্লাল সেন কর্ত্তৃক অবনত হয় নাই। তাহারা বল্লালের পূর্ব্ব হইতেই বর্ণশঙ্কর ও জাতিচ্যুত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বল্লালচরিত ও বল্লাল সেনের জীবনী সম্বন্ধে দুই এক কথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

"মা"।

১

কি মধুর কথা মোর কর্ণে প্রবেশিল ?
কে কহিল হেন বাণী
কোথা হতে নাহি জানি
পুলকে পূরিল মন, সুধা বরষিল ?

২

বল বল আর বার শুনিয়ে যুড়াই
পুনঃ বল সেই কথা
যাবে রে মনের ব্যথা
কাতরে পরাণ ভরি তোমারে সুধাই।

৩

"মা" বলে ডাকরে যদি উদার অন্তরে
দূরে যাবে শোক তাপ
নাহি রবে হৃদে পাপ
স্বর্গ সুখ পাবে তুমি চিরকাল তরে।

৪

পূজা যেই করে নিত্য জননী চরণ
নির্ম্মল আনন্দ পায়
গরব ভুলিয়া যায়
পবিত্র হৃদয় তার ধন্য সেই জন।

৫

তারে বলি সুখী আমি সংসার মাঝারে
যাহার উন্নত মন
মাতৃধ্যান অনুক্ষণ
হেলা নাহি করে কভু তুষিতে তাঁহারে।

৬

কত গুণ আছে তাঁর কে পারে বর্ণিতে
চির সম ভালবাসা
পুত্রের মঙ্গল আশা
মাতৃঋণ কে কোথায় পারে রে শোধিতে।

৭

নয়নের অন্তরাল হইলে তনয়
যতেক ভাবনা আসি
নাশে তাঁর সুখরাশি
পুত্র মুখ হেরি পুনঃ আনন্দ উদয়।

৮

এই যে করিছ তুমি জীবন ধারণ
কাহার যতন বলে
কাহার কৌশল ছলে
সে কথা কি আছে ভাই তোমার স্মরণ?

৯

যখন তোমায় রোগে করে আক্রমণ
কে আর আদর করে
কোমল বাৎসল্য ভরে
নাশিতে সে দুষ্ট ব্যাধি করয়ে যতন?

১০

চিন্তায় আকুল প্রাণ হয় রে যখন
কেবা মৃদু মৃদু আসি
তোমার নিকটে বসি
আদরে যতনে করে জিজ্ঞাসা কারণ?

১১

নয়নের বারি বিন্দু করি দরশন
কে বল মরমে মরি
তোমার সে দুঃখ স্মরি
প্রয়োগ সদাই করে সান্ত্বনা বচন ?

১২

পুত্রের অশুভ বার্ত্তা করিলে শ্রবণ
শেল বাজে কার বক্ষে
অশ্রু বহে কার চক্ষে
ধূলায় লুটায় কেবা হয়ে ক্ষুণ্ন মন ?

১৩

কে আছে এমন বল এই অবনীতে
হৃদয় টলে না যার
নাহি তায় ভক্তি ভার
এ হেন জননী দেবী পাইয়া পূজিতে ?

১৪

যে অভাগা হইয়াছে অধীনে বিমুখ
মনে তার নাহি শান্তি
কখন না যায় ভ্রান্তি
কভু তার কোন কাযে নাহি হয় সুখ।

১৫

তাই বলি "মা" কথাটী এতই সুন্দর
উচ্চারিলে প্রাণভরে
মন উত্তেজিত করে
আনন্দ লহরী বহে হৃদে নিরন্তর॥

শ্রীরঘুনাথ মুখোপাধ্যায়।

ক'নে বউ।*

পল্লীগ্রামের একটী গৃহস্থ-পরিবারের সুখদুঃখময় গৃহস্থ-জীবন অবলম্বন করিয়া এই আখ্যায়িকাটী লিখিত হইয়াছে। আখ্যায়িকাটীর সারাংশ ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার কথঞ্চিৎ বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা ও সমালোচনা আমরা যথাক্রমে বিবৃত করিব।

রামকুমার ও শ্যামকুমার দুই সহোদর। সংসারে তাঁহাদের বৃদ্ধা জননী বর্ত্তমান। জননী বৃদ্ধাজনসুলভ একটু রুক্ষপ্রকৃতি, অসহিষ্ণু; তাহার উপর কিছু মুখরা, এবং কলহপ্রিয়ও বটে। কিন্তু হৃদয়খানি অতি সরল, অতি স্নেহপূর্ণ। এক কথায় ক্রোধের উদ্রেক হয়, আবার পর মুহূর্ত্তেই তাহা বিলীন হইয়া কোমলপ্রাণা নারীজনোচিত স্নেহ-ধর্ম্মে আর্দ্র হইয়া থাকে। রামকুমার ও শ্যামকুমার বিবাহিত। সংসারের অন্যতম গৃহিনী—রামকুমারের স্ত্রী—যামিনী। কনিষ্ঠ শ্যামকুমারের স্ত্রী এখন পিত্রালয়ে থাকে,—প্রথম অবস্থায় স্বামী-গৃহে বাস, তাহার অদৃষ্টে বড় একটা ঘটিয়া উঠে নাই। তাহার কারণ ছিল। শ্যামকুমার বড় অকর্ম্মণ্য—'জড়-ভরত' সদৃশ। তাহার উপর একটু রোগও ছিল,—নেশাটা ভাংটা চলিত মন্দ নয়। পল্লীগ্রামের নিষ্কর্ম্মা লোকগুলা স্বভাবতঃ যেরূপ কাজের বাহির হইয়া থাকে, শ্যামকুমারও সেই শ্রেণীভুক্ত। একে তেমন সচ্ছল সংসার নহে, তাহার উপর সম্প্রতি রামকুমারের চাকরি গিয়াছে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় শ্যামকুমারের স্ত্রী—'ক'নে বউ'কে পিত্রালয় হইতে আনিতে কেহ বড় একটা গা দিত না। আর, শ্যামকুমারও তাহার জন্য কোন একটা অভাব অনুভব করিত না,—গাঁজা, গুলির 'মৌতাতে' তাহাকে 'নিঝুম' করিয়া তুলিয়াছিল।

বড়-বউ যামিনী বড় কুটীল-প্রকৃতি, হিংস্রক ও নীচমনা। স্নেহ, ভক্তি, দয়া বা ভালবাসা তাহার জীবনে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সে, বৃদ্ধা শাশুড়ীকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিত, প্রায়ই খুটী-নাটী লইয়া কলহ করিত। আত্মাভিমান ও হিংস্রকতা যামিনীর হৃদয়ের অলঙ্কার। ভাল জিনিস মন্দ হইলে, বড়ই মন্দ হয়। এই জন্য চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার 'শকুন্তলা-তত্ত্বের' একস্থানে বলিয়াছেন,—"পুরুষ যত মন্দ হউক না কেন, মন্দ স্ত্রী অপেক্ষা মন্দ নয়।" কথাটা বড় সত্য। বস্তুতঃ, ভাল হইলে, "স্বর্গে বুঝি এমন দেবতা নাই, যে, ভাল স্ত্রী হইতে ভাল"; আর, তদ্বিপরীতে, মন্দ হইলে, "নরকে বুঝি এমন প্রেতও নাই, যে, মন্দ স্ত্রী হইতে মন্দ।" কবি চন্দ্রশেখরের "স্ত্রী-চরিত্র"—আরও ভাল কথা—জগতের স্ত্রী-চরিত্র যিনি একটু অধিক সূক্ষ্মরূপে দেখিয়াছেন, বুঝিয়াছেন,

---

*ক'নে বউ। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১ একটাকা॥

ভাবিয়াছেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে এ কথার পোষকতা করিবেন।

রামকুমার এই পিশাচী স্ত্রীর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ; এই যাদুকরীর যন্ত্র-পুত্তলি। তাহার কথায় তিনি 'উঠ্-ব'স্' করেন; সেই পিশাচীর মোহ-মন্ত্রে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ন্যায় ধর্ম্ম, বিবেক-বুদ্ধি একে একে সমস্তই অপহৃত হইতেছে। সময়ে সময়ে এক আধ্‌বার যে স্বাভাবিক সরল অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, যে কর্ত্তব্যপরায়ণতার ঈষৎ আব্‌ছায়া ছবি তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয়, তাহা আবির্ভাব মাত্র,—ডাকিনীর সহবাসে আসিলেই তাঁহার সে মনুষ্য-বৃত্তির এককালে বিলোপ হইয়া যাইত। তবে মোটের উপর, সময় বিশেষে, সংসারের চলিত-লোকের মধ্যে রামকুমার মন্দ লোক ছিলেন না। মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃ-স্নেহ তাঁহার আন্তরিক ছিল, স্থানে স্থানে সে পরিচয় পাওয়া যায়। তবে দেশ-কাল-পাত্র দোষে তাঁহার এই সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই না।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে শাশুড়ী-বউ-এ কলহ হইল; গুণধরী বউ (যামিনী) পুত্র দুইটিকে লইয়া পিত্রালয়ে উঠিলেন। রাম-কুমারও তিক্ত-বিরক্ত হইলেন। একদিকে স্ত্রী—অন্যদিকে জননী। কি করেন, শেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরিবারকে আনিবার জন্য শ্বশুর-গৃহে উপনীত হইলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া, তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি বাহির হইয়া পড়িল, তাঁহার গুণধরীর গুণ ধরিল। তিনি 'ঘরজামায়ে' হইয়া তথায় 'আদরে-গোবরে' অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর, তাঁর মা-ভাই ভিটেয় পড়িয়া অর্দ্ধাশনে—অন-শনে অতি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিল। শ্যামকুমার মাতার অনুরোধে, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে আনিতে গেল; কিন্তু রাম-কুমার শ্যালক-প্রদত্ত একটি চাকরির প্রলোভনে বাটী আসিতে নিরস্ত হইলেন। অগত্যা শ্যামকুমার ক্ষুণ্নমনে গৃহে প্রত্যা-গত হইয়া জননীকে আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল।

কোমল-প্রাণা জননী পুত্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহতা হইলেন। অমনি কোথা হইতে অজ্ঞাতসারে কয়েক বিন্দু অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ডস্থল সিক্ত করিতে লাগিল। মর্ম্মান্তিক দুঃখ-অভিমানে শেষে তিনি মুক্তকণ্ঠে কাঁদিলেন। জননীর ক্রন্দনে আজ শ্যাম-কুমারও কাঁদিয়া আকুল হইল। প্রেমে বাসনার সংযোগ, কারণে কার্য্যে অপূর্ব্ব সম্মিলন! এই ক্রন্দনই, সেই দরিদ্র গৃহস্থ-পরিবারের বিমল সুখ আনয়ন করিল,—দারিদ্র্য-দুঃখ-ক্লিষ্ট অশান্তিময়সংসারে স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল।

কথাপ্রসঙ্গে স্থির হইল, 'ক'নে বউ'কে পিত্রালয় হইতে আনা হইবে। মাতৃবৎসল শ্যামকুমার জননীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শ্বশুর গৃহে গমন করিল। শ্যামকুমারের চরিত্রে গ্রন্থকার অতি সুন্দর একটি স্বাভা-বিক সরল বৃত্তি সংযুক্ত করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে তাহার একটু আভাস দিতেছি। শ্যামকুমার গণ্ডমূর্খ ও নেশাখোর হইলেও, তাহার জীবনে অতি সুন্দর একটি দেব-বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যে বৃত্তিতে মানুষ 'মানুষ' বলিয়া পরিচিত, যে বৃত্তির

বিকাশে ধরায় স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও যাহার অভাবে ধরা কারাগার বোধ হয়, ইহা সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মানুষের একান্ত কল্যাণীয় পরম হিতকরী পরোপকার-বৃত্তি। এই পরোপকার-বৃত্তি শ্যামকুমারের জীবনে এত অধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়," যে, পড়িতে পড়িতে আমরা বারবার মুক্ত-অন্তরে গ্রন্থকারকে সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারি নাই। গ্রন্থের মধ্যে এই চরিত্রটী সম্পূর্ণ মৌলিক; গ্রন্থকারের সর্ব্বাধিক কৃতিত্বও এই চরিত্রের অবতারণায়। ইহা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সরল ও সুন্দর। শ্যামকুমার সামাজিক আচার ব্যবহারের কোন ধার ধারে না; কিরূপে উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে,কথা কহিতে হয়, তাহা জানে না; কোন্ কাজ অগ্রে, কোন্ কাজ পরে, তাহা কিছুই বুঝে না, অথচ পরোপকার-বৃত্তি এতই বলবতী যে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যেখানে শবদাহ, সেইখানেই শ্যামকুমার উপস্থিত। মান নাই, অপমান নাই,—যাচিতভাবে অযাচিতভাবে, সর্ব্বত্রই শ্যামকুমার। নিজের ক্ষতিলাভ বিবেচনা নাই,—মানুষ মরিলেই সেখানে উপস্থিত হয়, তাপিতের অশ্রুমোচন করে, ব্যথিতের ব্যথার অংশ লয়, বুক দিয়া পরের উপকার করে। নীতিকার বলেন,—"রাজদ্বারে শ্মশানে" যিনি সহায় হন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। আমরাও বলি, আদব-কায়দা-সভ্যতা-বিবর্জ্জিত, সামাজিক রীতি-নীতি-অনভিজ্ঞ, গণ্ডমূর্খ শ্যামকুমারই যথার্থই মানুষ—মানুষের বন্ধু। খাঁটী হিন্দু-বৃত্তি এইরূপই বটে। পাশ্চাত্য-সভ্যতার এই ঘোর দুর্দ্দিনে, এই দেব-বৃত্তির পর্য্যালোচনায়,আমরা অনেক স্থলে,আনন্দে চক্ষের জল ফেলিয়াছি। শ্যামকুমারের কথোপকথন, ভাব-ভঙ্গী, কার্য্যকলাপ বড়ই স্বাভাবিক, বড়ই সুন্দর। এই চরিত্রের অঙ্কনে চিত্রকরের মুন্সীআনার বাহাদুরী আছে বটে।

শ্যামকুমার শ্বশুর-গৃহে যাইয়া জননীর অভিমত প্রকাশ করিল। তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীও হৃষ্টমনে কন্যাকে স্বামীগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। এই চরিত্রটিই যোগেন্দ্র বাবুর 'ক'নে বউ'। ক'নে বউ—সুশীলা স্বামীগৃহে আসিয়া হিন্দুস্ত্রীর কর্ত্তব্য সাধন করিলেন। কাপড়পুরের মুখুয্যে-পরিবার শান্তি-লক্ষ্মীর আশ্রিত হইল। দেবী-প্রতিমা ক'নে বউ-এর আবির্ভাবে সেই অবসাদগ্রস্ত নিঃস্ব-পরিবার যেন নবজীবন লাভ করিল। ক'নে বউ সুশীলার অমানুষী চরিত্রগুণে শ্যামকুমারের চরিত্র সংশোধিত হইতে লাগিল। তিনি এখন দশের মধ্যে একজন হইলেন। ক'নে বউ হিন্দু-স্ত্রীর আদর্শ-স্থানীয়া। বৃদ্ধা শাশুড়ী তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় মোহিত হইলেন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-জ্ঞানে স্নেহ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িল। রামকুমার ঘটনাচক্রে পড়িয়া,অসৎ-সংসর্গের ফলভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি গুরুতর এক অপরাধের মধ্যে জড়িত হইয়া আইনের মারপেচে ফৌজদারী সোপরদ্দ হইলেন। শেষে সুশীলারই যত্ন-কৌশলে তাহা হইতে অব্যাহতি পান। এবং এক্ষণে অনন্যোপায় হইয়া,সস্ত্রীক কনিষ্ঠের সংসারে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইসূত্রে শান্তিময় সংসার-সাগরের নভোদেশে আবার একখানি করাল মেঘের আবির্ভাব হইল; প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটিল। আবার সেই সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইল। কিছুদিন গেল; আবার ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হইল। সত্য প্রকটিত হইল, মিথ্যা জলবুদ্বুদের ন্যায় কালের জলে মিশিয়া গেল। কিন্তু সে সব কথা অনেক; তাহার বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। বিশেষ সব কথা খুলিয়া বলিলে গ্রন্থকারের প্রতি অবিচারও করা হয়,—তাঁহার বহি আর বিকায় না। ফল কথা, আমরা কাব্যামোদী ব্যক্তিমাত্রকেই এই অভিনব উপন্যাসখানি—নির্দ্দোষ না হইলেও, পড়িতে অনুরোধ করি। 'ক'নে বউ'এর সংক্ষিপ্ত গল্পাংশ আমরা এক প্রকার দেখাইলাম। এক্ষণে গ্রন্থোক্ত চরিত্রবৃন্দের দোষ গুণের দুই চারিটী কথা উল্লেখ করিয়া, আমরা উপস্থিত প্রস্তাব শেষ করিব।

গ্রন্থকারের লিপি-কৌশল ও রচনা-নৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। আমরা যে গল্পটুকু দেখাইলাম, সেই টুকুই গ্রন্থের মেরুদণ্ড; গ্রন্থকারের লক্ষ্য ছিলও সেই দিকে। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাবে—ততোধিক অসাবধানতায়, তাঁহার গল্পটী দাঁড়াইয়াছে অন্যরূপ। তাহার ফল অবশ্য ভালই হইয়াছে; এবং গ্রন্থের সারবত্তা ও গুণবত্তা যদি কিছু থাকে, ত, তাহাতেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তথাপি এ কথাটাও ঠিক যে, 'ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত' গাওয়া ভাল নহে। ফল কথা,—"ক'নে বউ" খানি দুইটী গল্পে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারের অসাবধানতাই ইহার কারণ।

কোন একটী বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ঘটনা বা উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস লিখিতে যাওয়া ভাল নয় স্বীকার করি; কিন্তু প্রস্তাবিত চরিত্র ও ঘটনার পূর্ণ বিকাশ করিতে না করিতে অন্য চরিত্র ও অন্য ঘটনার অবতারণা করিলে প্রথমগুলি নিষ্প্রভ ও স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া যায়। অবশ্য ভালর কোলে মন্দ ও মন্দের কোলে ভাল না রাখিলে প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের বিকাশ হয় না—তাই একটি চরিত্র ও ঘটনা আঁকিতে আঁকিতে অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা করিতে হয়; কিন্তু তাহার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি আছে; প্রকৃত পন্থার অনুসরণ করিলে এ গোলযোগ অনায়াসে মিটিয়া যায়। এখানে অতি সতর্কতার সহিত গ্রন্থকারকে লেখনী ধরিতে হয়। তদ্বিপরীতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না—একটা যেমন-তেমন গল্প—বড় জোর একটা মজাদার কৌতূহলোদ্দীপক আখ্যায়িকা মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু উপন্যাস(novel)ও গল্পে (tale) কত প্রভেদ, তাহা বুদ্ধিমান-পাঠকের অবিদিত নাই। বিশেষ, "ক'নে বউ"এর গল্প দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা ভাল নহে—মন্দ।

যোগেন্দ্র বাবুর উপন্যাসের কিয়দংশ এই গল্পের (tale)অন্তর্গত। এস্থলে গ্রন্থকার নিজে ব্যাখ্যাকারক হইয়া আমাদিগকে তাঁহার গ্রন্থোক্ত চরিত্রবৃন্দকে প্রদর্শন করিয়া দিতেছেন। যে সুশীলা বা ক'নে বউ এই গ্রন্থের নায়িকা, যাহাকে আমরা আদর্শ স্ত্রী-রত্ন

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি,তাহা যোগেন্দ্র বাবুর মুখে গল্প শুনিয়া। বস্তুতঃ,তাহার বিশেষ কোন কার্য্য বা ঘটনার অবতারণা গ্রন্থকার আদৌ করেন নাই বলিলেও হয়। সুতরাং তাঁহার প্রধান নায়িকার পরিবর্ত্তে অন্যান্য চরিত্র-বৃন্দ বরং অনেকাংশে ফুটিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থে আরও কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষের চরিত্র আছে, প্রকারান্তরে তাহারাই গ্রন্থের নায়ক নায়িকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কামিনী, শরৎকুমারী, তারাসুন্দরী, রসিকমোহন, নবকুমার, নফর,গদার মা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ চরিত্রের অবতারণায় গ্রন্থের কলেবর পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমরা যে গল্পাংশটুকু উপরে উল্লিখিত করিয়াছি, তাহার তুলনায় এটি আবার স্বতন্ত্র সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ অংশের প্রধান চরিত্র রসিকমোহন, শরৎকুমারী ও কামিনী। রসিকমোহন, ধর্ম্মভেকধারী কৃপণ ধনী-সন্তানের গুণধর পুত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিকারগ্রস্ত শিক্ষিতনামের কলঙ্ক। সুরা ও বারাঙ্গনার ক্রীতদাস। সরলা প্রেমময়ী ভার্য্যা শরৎকুমারীর জীবনহন্তা-স্বরূপ। আর কামিনী —রসিকমোহনের জ্যেষ্ঠা ভগিনী,—বাল-বিধবা, পিতার অযথা আদরের কন্যা; সুতরাং তাহার পরিণাম যাহা হইবার তাহা হইয়াছে,—কামিনী মুখরা, কলহ-প্রিয়া, কোপন-স্বভাবা, নিঠুরা, হৃদয়বিহীনা, স্নেহ-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতা, পিশাচী, চণ্ডালিনী। আর, শরৎকুমারী কণ্টকাবৃত গৃহারণ্যে একটী স্ফুটনোন্মুখ কুন্দ-কুসুম। এই কুন্দ-কুসুমের কথা পড়িতে পড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের অপূর্ব্বসৃষ্টি—কুন্দনন্দিনীর কথা আমাদের মনে পড়ে। যোগেন্দ্র বাবু সেই কুন্দ-কুসুমের আদর্শে এই শরৎ-কুসুম সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এ কুসুমের সৌরভ তেমন প্রাণারাম ও সুমধুর নহে। মোহান্ধ রসিকমোহন কাঞ্চন ভ্রমে কাচে আসক্ত হইল,সুধাভ্রমে হলাহল সেবন করিল। গৃহে অমূল্য-রত্ন দেবীপ্রতিমা সহধর্ম্মিনী শরৎকুমারী,—কিন্তু ইন্দ্রিয়পরায়ণের পাশব-বৃত্তি তাহাতে মিটিল না,—হতভাগ্য শুক্তিকা তুলিতে সমুদ্রে ডুব দিল, প্রেমময়ী ভার্য্যা ত্যাগ করিয়া পাপের মূর্ত্তিমতী পিশাচী বেশ্যার নিকট প্রেমশিক্ষা ও ভালবাসার আশায় আত্মজীবন বিকাইল। অনতি-বিলম্বে পাপের প্রায়শ্চিত্তও আরম্ভ হইল। হতভাগিনী কামিনী ও হতভাগ্য রসিক-মোহনের জীবন-নাটক লইয়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। ফল কথা, শেষোক্ত গল্পটি প্রথমোক্ত গল্পটির সহিত ঠিক মিস্ খায় নাই, তেমন খাপে-খাপে মিলে নাই ; যেন কেমন এলো-মেলো। তাই বলিতেছিলাম, গল্পের শিথিল বন্ধন ও লিপি-চাতুর্য্যের অভাব হইলে উপন্যাসের সম্যক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সুতরাং এ গ্রন্থের নায়ক উপনায়ক বা নায়িকা উপনায়িকা যে কে, তাহা স্থির করা কঠিন। এই স্থলেই গ্রন্থকর্ত্তার দূরদর্শিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে, চরিত্রবৃন্দের কথোপকথনে স্থানে স্থানে তাঁহার লিপিকৌশল পরিদৃষ্ট হয় বটে। অতি অল্প কথায়, তিনি ঘটনা-পরম্পরার বেশ সুন্দর মর্ম্মব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে পারেন। নাট্যাংশে গ্রন্থকারের কতক

বাহাদুরী আছে। তবে তিনি যেখানে প্রধান দর্শক হইয়া পাঠককে তাঁহার চরিত্র-বৃন্দের গুণাগুণ বিবৃত করিতেছেন, প্রায় সেই সেই স্থলেই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং সেই সেই স্থল পাঠেই বিরক্তির উৎপাদন করে। বর্ণনার গুরুভারে এবং অনাবশ্য-কীয় ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণায় গ্রন্থের মধ্যে অল্প-বিস্তর কতকগুলি ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। নচেৎ "ক'নে বউ" একখানি নির্দ্দোষ প্রথমশ্রেণীর স্ত্রী-পাঠ্য—শুধু স্ত্রী-পাঠ্য কেন—সর্ব্বশ্রেণীরই পাঠ্য একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ হইতে পারিত।

পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে শ্যামকুমার ও স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে রামকুমার-জননী ও কামিনীর চরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফুটি-য়াছে। এই তিনটি চরিত্র বড় স্বাভাবিক ও আদর্শভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। রাম-কুমার-জননীর সেই সরল ও স্নেহপূর্ণ হৃদয়-খানি এবং একটু-কিছুতেই-অভিমান ও কান্নার সুরটুকু বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর। আর কামিনীর মহাপাপের ভীষণ পরিণাম দেখিয়া আমরা ভীত, চকিত, স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়াছি। এই প্রায়শ্চিত্তটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ও উদ্দামভাবপূর্ণ। তবে শ্যামকুমারের প্রথম অবস্থাটি যেমন স্বাভাবিকভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল, শেষ ভাগটি তেমন হয় নাই,—যেন তাড়াতাড়ি-হুড়োহুড়ী করিয়া গ্রন্থকার কোন রকমে ক'নেবউ সুশীলার দ্বারা তাহার জীবনের ঘাত-প্রতি-ঘাত দেখাইলেন। নচেৎ, এই চরিত্রটি বাঙ্গালা উপন্যাসের প্রধান গৌরব স্থান অধি-কার করিত সন্দেহ নাই। যামিনী-চরিত্রের বিশেষত্ব কিছুই নাই। যাহা আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য গ্রন্থকারের দুই একখানি গ্রন্থে ইহাপেক্ষা বরং অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। রামকুমার সংসারের চলিত লোক, এ চরিত্রে কিছু বিশেষত্ব নাই, সুতরাং আমাদেরও কিছু বলিবার নাই। শরৎ-কুমারী ও সুশীলার চরিত্র অঙ্কনেও নক্সা-কার তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নফর-চরিত্রের অবতারণার কোন আব-শ্যকই ছিল না। রসিকমোহনের পাপের প্রায়শ্চিত্তটী ভাল ফুটে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা—এবং সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক গিরিজা-প্রসন্নও পুনঃ পুনঃ তাহাই দেখাইয়াছেন যে, "মানব-জীবনের কঠোর সমস্যার বিশ্লে-ষণ"ই উপন্যাসের প্রাণ। সুতরাং অত তাড়াতাড়ি-হুড়োহুড়িতে তাহা সুসিদ্ধ হয় না—ঘটনা স্রোতে তাহার সম্যক ঘাত-প্রতিঘাত প্রদর্শন করা চাই। অতি অল্প কথায়—অল্প ঘটনায়—অল্প স্থানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তারাসুন্দরীর চরিত্রটী বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। সুশীলার সহিত ইঁহার শেষ কথোপকথনগুলি অতি সুন্দর—অতি স্বাভা-বিক—অতি প্রাণারাম। আমাদের স্থানা-ভাব, নচেৎ সে টুকু উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে উপহার দিতাম। এইস্থান পাঠ করিয়া, পুস্তকের সহস্র ত্রুটী থাকিলেও ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়,—মুক্ত-অন্তরে, আনন্দভরে গ্রন্থকারকে আলিঙ্গন করিতে মন ব্যাকুল হয়। হিন্দু বিধবার এ উচ্চভাব, ব্রহ্মচর্য্যের এ উদার-কল্পনা, সতীর এ অকৃ-ত্রিম পরার্থপরতা পড়িতে পড়িতে বোধ হয়, যেন প্রাণ এছার মাটীর সংসার পরিত্যাগ

করিয়া, কোন্ অদৃশ্য, অপরিজ্ঞেয়, পবিত্র-পুণ্যধামে অবস্থান করিতেছে! এই ত কবিত্ব—এই ত কল্পনা! এই ত প্রেম—এই ত প্রতিভা! তারাসুন্দরী মোহিনী-প্রতিমা—হিন্দু-রমণী। হিন্দু-বিধবার এ মোহিনী-মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে, "সুশীলার উপাখ্যান" নামক একখানি গ্রন্থে, আমরা ইতিপূর্ব্বে, এ ছবি একবার দেখিয়াছি।

"ক'নে বউ" পড়িয়া, আমরা যতদূর বুঝিয়াছি,—তাহাতে বলিতে পারি যে, সংসারের চলিত ঘটনা ও স্থূল বিষয় লইয়া যোগেন্দ্র বাবু সুন্দর আখ্যায়িকা লিখিতে পারেন। কিন্তু যেখানে একটু বিশেষত্বের অবতারণা দরকার, একটু সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন, একটু মূলানুকরণ আবশ্যক, সেইখানেই তিনি অকৃতকার্য্য হন। এ স্থূলানুকরণ ও মূলানুকরণ (real ও ideal) কি, সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন "নবজীবন"এ কোন গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে, তাহা অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। উপন্যাস-প্রিয় পাঠককে সেই প্রবন্ধটি পড়িতে অনুরোধ করি। সংসারের চলিত ঘটনায়, স্থূল বিষয়ে এবং 'শাদা-মাটা' গল্পে যোগেন্দ্র বাবু বেশ কৃতীত্ব দেখাইতে পারেন। কিন্তু মানব-জীবনের কঠোর-সমস্যা বিশ্লেষণ করিতে, যথাসময়ের যথাপ্রকৃতি দেখাইতে তাঁহার ক্ষমতা বড় কম। যেখানে পাপ ও পাপীর ভীষণ পরিণাম, আধি-ব্যাধি-শোক-তাপপূর্ণ ছার সংসার-আশ্রম যেখানে নরক হইতেও ভয়াবহ, পাপের প্রতি পুণ্যের লীলা-খেলা, অধর্ম্মের উপর ধর্ম্মের অভিসম্পাৎ যেখানে ত্রাহি ত্রাহি রবে জীব-জগৎ হইতে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড অবধি মাতাইয়া তুলে, সেই সেই স্থান যথা-চিত্রিত করা সুদক্ষ চিত্রকরের কাজ। যোগেন্দ্র বাবুর এ ক্ষমতা আদৌ নাই—এমন কথা বলি না; কিন্তু এরূপ স্থলে তাঁহার কলম কাঁপিয়া যায়, এরূপ নিদর্শন পাইয়াছি। তাই,তাঁহার একমাত্র কামিনী ভিন্ন অন্যান্য সকল চরিত্রেই এই অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এখানে আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া, আমরা উপস্থিত প্রস্তাব শেষ করিব। ভাষার বিষয়ে যোগেন্দ্র বাবুর দৃষ্টি বড় কম। এ বিষয়ে, তাঁহাকে বিশেষ যত্ন লইতে অনুরোধ করি। তিনি একজন খ্যাতনামা উপন্যাসলেখক; সাহিত্য-জগতে তাঁহার প্রতিপত্তিও দিনদিন বাড়িতেছে এ বিধায়,তাঁহার দায়িত্ব বড় গুরুতর। দায়িত্বের যথোচিত সম্মান রক্ষা করিলে যতটা প্রশংসা না হৌক, তদভাবে ঘোর প্রত্যবায় আছে। যোগেন্দ্র বাবুর ভাষা সরল হইলেও প্রাঞ্জল বা বেগবতী নহে। তাহাতে সুর বা কবিতা কিছুই নাই। উপন্যাসের যোগ্য ভাষায় অধিকার লাভ করা তাঁহার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। নত্ব-সত্ব ভুল ছাড়াও স্থানে স্থানে অনেক এলো-মেলো বাজে বর্ণনায় ও কথার বাঁধুনির অভাবে উপস্থিত গ্রন্থের সৌন্দর্য্য অনেক নষ্ট হইয়াছে।

চরিত্র গঠন ও গল্পের বন্ধন যেমন উপন্যাসের জান-স্বরূপ, ভাষার উৎকর্ষ সাধনও সেইরূপ আবশ্যক। শুধু আবশ্যক নহে

—এতদ্‌ভাবে গ্রন্থের সকল সৌন্দর্য্যই পণ্ড হয়। ভাব ও ভাষায় মাখামাখি হইয়া চিত্রের চমৎকারিত্ব দেখাইতে না পারিলে আর কবির বাহাদুরী কি? মূলানুকরণে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন যেমন উপন্যাসের প্রাণ, অন্যপক্ষে, ভাষাও সেইরূপ তাহার জীবনী-শক্তি। স্থল বিশেষে একটী মাত্র কথায়, বৃহৎ একটীচরিত্র—যাহা গ্রন্থকার দশ বিশ পাতায়ও ফুটাইতে পারেন নাই—অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়া থাকে। সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রই ইহার আদর্শ-স্থল। তৎপ্রণীত "মৃণালিনী" হইতে একটি মাত্র কথা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন, এই একটি মাত্র কথায় প্রতিভাবান্ কবি সমগ্র মৃণালিনী-চরিত্র কেমন সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন। গিরিজায়া, হেমচন্দ্রের ব্যবহারে নিতান্ত রুষ্ট হইয়া তাঁহার উদ্দেশে তাঁহাকে 'পাষণ্ড' প্রভৃতি বলিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। শুনিয়া, হিন্দু-পত্নী মৃণালিনী কহিলেন,** "আমি গুছাইয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই, কি বলিতে কি বলিলাম।" মৃণালিনী-পাঠক বুঝিয়াছেন, এই একটী মাত্র কথায় কবির কতটা ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।

কোন একখানি পার্শী গ্রন্থে লিখিত আছে যে,—কোন কবি যেন বলিতেছেন,— "যখন আমি লিখিতে বসি, তখন যেন, বহু কারুকার্য্যখচিত, নয়নাভিরাম, মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিয়া, পরীবেশে ভাষারাণীর সহচরীগণ আমার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং আগ্রহসহকারে কহিতে থাকে,—'আমাকে গ্রহণ কর, আমাকে গ্রহণ কর';—ভাষা যেন তখন কিঙ্করীর ন্যায় আমার অনুসরণ করে।" কথাটায় এই বুঝা যায়, যে, যে কোন বিষয়ই হৌক,—লিখিতে হইলে, ভাষাটাকে এমনই আয়ত্ব করা চাই,—কেবলই শাদার পিঠে কালি দিয়া ছাপার আখরে তাহা প্রকাশ করিতে নাই। বিশেষ, ঔপন্যাসিকের ত কথাই নাই। যেহেতু, স্থল বিশেষে একমাত্র ভাষাই—একটীমাত্র কথাই তাঁহার বর্ণিত চরিত্র বিকশিত করিয়া থাকে।

"ক'নে বউ"এর অনেক গুণ আছে বলিয়াই যোগেন্দ্র বাবুর ভাষার উপর আমরা এরূপ তীব্র সমালোচনা করিলাম। ভরসা করি, তাঁহার ভাবী-উপন্যাসে, এ বিষয়ের অনেক সার্থকতা দেখিতে পাইব। উপসংহারে আমরা "ক'নে বউ" এর প্রশংসাই করি।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

বেদান্তদর্শন-বিবৃতি।

(৩)

মনোবিজ্ঞান নিঃশব্দে অপরিস্ফুটভাবে আত্মার অস্তিত্ব অবধারণ পূর্ব্বক নিরস্ত হইলে—তৎকৃত প্রমাণ আত্মবস্তুর তত্ত্বনির্ণয়ে অসমর্থ হইলে, চিন্তাশীল মানব আত্মতত্ত্ব-নিরূপণার্থ অপৌরুষেয় তত্ত্ববিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদিগের দেশে আত্মতত্ত্বনির্ণয়কারিগণের মধ্যে নানাবিধ মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তত্ত্ব-বিজ্ঞান-ইতিহাসের প্রথম পথপ্রদর্শক নাস্তিকগণ।

দেহাত্মবাদী নাস্তিকগণ বলেন, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরস্পর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সন্দর্শনেই দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবধারিত হইতে পারে না। বৃত্তিদ্বয়বিশিষ্ট দেহের স্বভাবই এই যে, দেহ এক বৃত্তি দ্বারা জড়বৎ কার্য্য করে ও অপর বৃত্তি দ্বারা চেতনবৎ কার্য্য করে। বস্তুতঃ একমাত্র অনাদি অনন্ত অপরিমেয় শক্তির—বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রমবিকাশেই পরমাণু সমূহ পরিণত হইয়া ক্রমান্বয়ে পৃথিবী হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জীবের উৎপত্তি সাধন করিয়াছে। আস্তিকের কোন তর্কযুক্তি দ্বারাই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। ভৌতিক জগৎ, উদ্ভিজ্ জগৎ ও প্রাণিজগৎ সর্ব্বতোভাবে বিসদৃশ হইলেও উহাদের অভ্যন্তরে এক অতি আশ্চর্য্য অপরিবর্ত্তনীয় ক্রমোন্নতির নিয়ম বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত ক্রমোন্নতিই ঐ বৈসাদৃশ্যের কারণ। ভূতসমূহের রাসায়নিক সংযোগজনিত গতি, উদ্ভিদ সমূহের প্রাণ এবং প্রাণিসমূহের মধ্যে নিকৃষ্ট প্রাণিগণের ঐন্দ্রিয়িক শক্তি ও উৎকৃষ্ট প্রাণিগণের চেতনাই ধর্ম্ম। অত্যুৎকৃষ্ট প্রাণী মানবের বিবেকই ধর্ম্ম। শক্তির সমস্ত ক্রিয়ার মুল কারণ কখনই জড় হইতে পারে না। নানাবিধ কারণ সকল মুলশক্তিরূপে একত্বে পর্য্যবসিত হইয়া অখণ্ড ও অদৃশ্যভাবে সমস্ত কার্য্যই সাধন করিতেছে। উহাই বিশ্বের অদৃষ্ট; ঐ অদৃষ্ট শক্তির বশেই বিশ্বসংসার বারংবার উৎপত্তি-স্থিতি-লয় ও পুনরুৎপত্তি প্রভৃতি ভজনা করিতেছে। ঐ অদৃষ্টকারণরূপিণী মহীয়সী শক্তি হইতেই দেহের ক্রমবিকাশে ক্রমোন্নতিতে চৈতন্যের ক্রমবিকাশ। উহা হইতেই বিবেকের উৎপত্তি। ঐ অদৃষ্ট কারণ হইতেই ক্ষিতি, ক্ষিতি হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে পত্র-পুষ্প-ফলের উৎপত্তি। আবার তাহার ক্রমাবনতিতে ক্ষিতিরূপে পরিণতি। প্রকৃতিতে সকলই নিত্যনূতন —নিত্যলয়! উৎপত্তির পর শৈশব, শৈশবের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য; আবার বার্দ্ধক্যের পর বাল্য। এইরূপ নিত্যই প্রলয়, নিত্য উৎপত্তি, নিত্য নবভাব। কাহারও এককালে লয় নাই, শূন্যত্ব নাই; কেবল অবস্থান্তর। কাহারও আকস্মিকী উৎপত্তি নাই, কাহারও শূন্য হইতে অবির্ভাব নাই।

যাহা ছিল, তাহাই আসিতেছে, আবার যাইতেছে, আবার আসিতেছে। কেহই শূন্য ছিল না বা শূন্য হইবে না; কেবল পরিবর্ত্তন, কেবল নবভাবের আবির্ভাব মাত্র। এই নিয়মেই সমুদ্র, এই নিয়মেই পর্ব্বত, এই নিয়মেই ক্ষিতি, এই নিয়মেই আকাশ, এই নিয়মেই অঙ্কুর, এই নিয়মেই বৃক্ষ, এই নিয়মেই কীট, এই নিয়মেই মানব, এই নিয়মেই অজ্ঞ, এই নিয়মেই বিজ্ঞ, এই নিয়মেই জাতি, এই নিয়মেই সমাজ। সকলই সেই প্রকৃতির—অজ্ঞেয়া প্রকৃতির নিয়ম। এই প্রকৃতি বিরুদ্ধস্বভাবা; কখন মনোহারিণী কখন ভয়ঙ্করী কখন ঐশ্বর্য্যময়ী কখন মাধুর্য্যময়ী। অধিক কি, এই সত্যস্বরূপা বৈচিত্রময়ী প্রকৃতির কারণত্বে আত্মার স্বতন্ত্র অনস্তিত্বে আর অধিক প্রমাণ প্রয়োগের বাক্যব্যয়ের আবশ্যকতা নাই। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাণী অর্থাৎ উন্নতির প্রায় চরমসীমাপ্রাপ্ত মানব জাতিরই বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, ও সভ্যতা, অসভ্যতা ভেদে ঐ চৈতন্যধর্ম্মেরই যেরূপ বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয়, তাহা হইতেই ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে চৈতন্যের ক্রমবিকাশ বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, মানবজাতির মধ্যে যে কয়েকটি শ্রেণী দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে একটিকে বিবেকশক্তির আধারস্বরূপ আত্মবিশিষ্ট বলিলে অপরটিকে তদভাববিশিষ্ট বলা অযুক্ত হয় না। এক জন বিবেকশালী যুবাকে আত্মবিশিষ্ট বলিলে একটি সদ্যজাত কিম্বা পর্ব্বতগুহাবাসী অসভ্য মানবকে কি ঐ আত্মবিশিষ্ট বলিতে সাহস হয়? বিশেষতঃ এই সূক্ষ্ম ক্রমোন্নতির নিয়মের প্রতি দৃষ্টিবিহীন হইয়া স্বতন্ত্র চৈতন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসাপন্ন ব্যক্তিরা যে, জড়শরীর হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া অপর একটি কূট তর্কের অবতারণা করেন, দেহাত্মবাদিগণ কি তৎপরিবর্ত্তে চেতন আত্মা হইতে জড়শরীরের উৎপত্তিও তাদৃশ অসম্ভব বলিয়া প্রতিকূল তর্কের উত্থাপন করিয়া বিপক্ষমতের উপর অপরিহার্য্য দোষের আরোপ করিতে পারেন না? অধিকন্তু দেহাত্মবাদিগণ বলেন যে, তাঁহাদের মতের যৌক্তিকতার প্রতি প্রত্যক্ষই প্রমাণ; কিন্তু প্রতিপক্ষীয়গণকে স্বমত সংস্থাপনে অজ্ঞেয় অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ফলতঃ আস্তিকের মতে অসম্ভবে সম্ভবের কল্পনা ভ্রান্তবিশ্বাসের অনুরোধে। আত্মজ্ঞান জীবের সংস্কারজ এবং অদ্ভুতসংযোগের ফল। দেহের স্বভাবই অধ্যাত্ম—দেহই আত্মা। সহজ জ্ঞান কিছুই নাই, সকল জ্ঞানই সংস্কারজ। ক্রমোন্নতিই জ্ঞানের সাধন। চেতন কর্ত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে নিশ্চয়তা ও সম্ভাবনাও নাই, বিশেষতঃ আমাদিগের জ্ঞান যখন সীমাবদ্ধ, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে যখন কোন জ্ঞানই হয় না, তখন ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুর অস্তিত্বে কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? সমস্ত মানবজাতি যে বিষয় প্রত্যক্ষ করেন নাই, সে বিষয়ের প্রামাণ্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। ঈশ্বর, পরলোক ও ধর্ম্মাদি অতিপ্রকৃত বিষয় সকল সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মানবগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে। ঐ কল্পনা কালক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া ভয়ঙ্কর

কুসংস্কার-জালে সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে।

মানবজাতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের মনঃকল্পিত ঈশ্বরেরও ক্রমোন্নতি হইয়াছে। মানবের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, অবগত হওয়া যায় যে, অতি প্রাচীনকালে মানবজাতি যখন প্রথম বন্যজীবন হইতে সভ্যজীবনে পদার্পণ করেন, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমাজে আধুনিক উপাসনা প্রণালী প্রচলিত ছিল না। তৎকালে তাঁহারা পদার্থসমূহের আদিকারণ অনুসন্ধানে রত ও সময়ে সময়ে সৃষ্টি-কৌশলে বিমোহিত হইয়া নদী, পর্ব্বত, ভূমি, জল, আকাশ, অগ্নি, উদ্ভিদ, বজ্র, তড়িৎ, চন্দ্র, ও সূর্য্যাদির পূজা ঈশ্বরজ্ঞানেই সম্পাদন করিতেন। সঙ্কীর্ণবুদ্ধি মানবগণ প্রকৃতিকে তাঁহাদের জ্ঞানের অগোচরে কার্য্যসাধন করিতে ও তাঁহাদিগের অভাবনীয় সুখ দুঃখ বিধান করিতে দেখিয়া অজ্ঞেয় প্রাকৃতিক শক্তিকে ঈশ্বরভাবে পূজা করিতেন।

সুদূরদর্শী আর্য্যঋষিগণ ঐ সকল প্রাকৃতিক শক্তির যথাযোগ্য কল্পিত মূর্ত্তি সকল রচনা করিয়া কখন ভয়ঙ্কর ঐশ্বর্য্যের ভাবে কখন মনোহর মাধুর্য্যের ভাবে কাব্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া সমাজিক নিয়ম সকলের ও মানসিক বৃত্তি সকলের সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। বর্ষাসাকর্য্যের অবসানে শারদীয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতা পার্শ্বদ্বয়ে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী ও ধনাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী ও লক্ষ্মীদেবী পরিবেষ্টিতা বীরত্ব ও গাম্ভীর্য্যের আদর্শস্বরূপ কার্ত্তিকেয় গজানন-পরিসেবিতা দুষ্টরিপুমহিষাসুরবিমর্দ্দিনী দশদিগ্ব্যাপিনী দশভুজা মহাশক্তি মহামায়ার মহীয়সী মূর্ত্তি। তৎপরেই মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা। ভগবান নন্দনন্দন নন্দনকানন অপেক্ষাও আনন্দধাম বৃন্দাবনে ত্রিজগন্মানসাকর্ষক মুরলীধর রাসরসাকর্ষী মনোহর নটবরবেশে মুগ্ধা গোপকন্যাগণের পরম পরিতৃপ্তি বিধান করিতেছেন। তৎপরেই শ্বেতশতদল-হৃৎপঙ্কজ-বিরাজিতা বিদ্যাদেবী শুভ্রবর্ণে শুভ্রবসনে সমাবৃতা হইয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীত-সুধাবর্ষণে জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছেন। তৎপরেই ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাবে প্রীতি রতি দ্বারা কন্দর্পরূপী শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসব। পরেই ঐশ্বর্য্যময়ী বাসন্তী। তাহারই পর ভগবৎ কৃপায় ভক্তহৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাবস্বরূপ জন্মাষ্টমী। এই রূপে শক্তির পর ঈশ্বর, তৎপরে শক্তি; সুতরাং অভিনব ভাব, ঐশ্বর্য্যের সহিত মাধুর্য্য, শক্তিরই রূপান্তর।

যাহা হউক, ঐ প্রণালীতে আর্য্য ঋষিগণের অপূর্ব্ব কৌশল সত্ত্বেও তাঁহারা যে ঐ শক্তিকে মানবীয় সাজে ও গুণে ভূষিত করিয়া অদ্ভুত দেবদেবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য। কালক্রমে ঐ শক্তি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় ও ভিন্ন ভিন্ন আকারে আশ্চর্য্যভাবে পূজিত হইতে লাগিল। এই রূপেই সপুত্রপরিজন-পরিবৃত মহাভোগবিলাসী যুদ্ধ-বিগ্রহাদিরত কামাদিপরিপীড়িত মানবধর্ম্মী দেবগণের উৎপত্তি হইল। কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নাগাদিনিবাস পাতালাদি পুরী ও দেবাদিনিবাস স্বর্গাদি পুরীরও আবির্ভাব হইল এবং ঐ সকল পুরী নানাবিধ অল-

ক্কারে সমালঙ্কৃতও হইতে লাগিল। পরে যৌক্তিক ও তার্কিক লোক সকল আবির্ভূত হইলে, দর্শনশাস্ত্রানুমোদিত কল্পিত ঈশ্বর ও তাঁহার উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত হইতে লাগিল। ফলতঃ, ঈশ্বর যে মানবের মনঃকল্পিত ও ধর্ম্মাদি যে তাঁহাদিগের সমাজ-শাসনার্থ উদ্ভাবিত উপায়, তাহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রতীত হয়। মানবের প্রকৃতি ও তদ্গত বৈষম্য এবং বিশ্বপ্রকৃতির পর্য্যালোচনাই মানব মনে ঐ সকলের অসারত্ব ও কল্পিতত্ব প্রতিপন্ন করিয়া দেয়।

জ্ঞানিমাত্রই স্বীকার করেন যে, জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাহায্য ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় না। যে কোন জ্ঞান লাভ হয়, তাহাতেই ইন্দ্রিয় অনুস্যূত রহিয়াছে। যাহাকে সহজ জ্ঞান বলা হয়, তাহাও ইন্দ্রিয়ব্যতিরেকে প্রকাশ পায় না এবং ধারণা করাও যায় না; সুতরাং মানবের মনঃকল্পিত ঈশ্বর মানবীয় গুণে বিভূষিত হইয়াছে। ঐসকল গুণ আবার ঐ কল্পিত ঈশ্বরে এত অধিক পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে যে, তাহাদের সামানাধিকরণ্য বা সামঞ্জস্য সম্ভবই হয় না। ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া প্রকৃতিকে জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত করেন, বলা নিতান্ত অসঙ্গত। করুণা শব্দের অর্থ পরদুঃখনিবারণেচ্ছা। সুতরাং ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া প্রকৃতিকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন, বলিতে, ঈশ্বর জীবের দুঃখনিবারণেচ্ছায় সৃষ্টি করেন,ইহাই বুঝা গেল। সৃষ্টির পূর্ব্বে দুঃখাদি কিছুই ছিল না; দুঃখাদিও ঈশ্বরসৃষ্ট। যদি তাহাই হইল, তবে ঈশ্বর কাহার নিবারণের আশায় সৃষ্টি করিলেন? কি নিমিত্তই বা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের ঐরূপ অসৎ দুঃখ নিবারণে ইচ্ছা হইল? সুস্থশরীর ব্যক্তিকে কোন্ বুদ্ধিমান্ ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবেন? এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত জীবে দুঃখ-সঞ্চারের পর সৃষ্টিতে প্রবৃত্তিও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে, দুঃখ সৃষ্টিসাপেক্ষ ও সৃষ্টি দুঃখসাপেক্ষ হওয়াতে পরস্পরসাপেক্ষতারূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। বিশেষতঃ চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড়ের কার্য্য হয় না ভাবিয়া প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তৃত্ব অস্বীকার করাই অসঙ্গত। কারণ, চেতনাধিষ্ঠান ব্যতিরেকেও অনেক জড়বস্তুর কার্য্যকরণে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে। অভিনব জাত সন্তানের বৃদ্ধি ও জীবন ধারণার্থ জড়াত্মক দুগ্ধ প্রবৃত্ত হইতেছে এবং জনগণের উপকারার্থ সময়ে সময়ে জড় মেঘ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছে। অতএব জড়াত্মক প্রকৃতিও জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইবে, তন্নিমিত্ত ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজনই নাই। অধিকন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব স্বীকারে পূর্ব্বোক্ত দোষ ভিন্ন আরও অনেক দোষ দেখা যায়। ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা; ইহা কি সম্ভবপর কথা? বিশ্ব অনাদি ও অনন্ত। এক অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইলেও যখন শূন্য হয় না এবং অসংখ্য শূন্য একত্র করিলেও যখন এক হয় না, তখন বিশ্বকে অবশ্যই অনাদি ও অনন্ত স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্ব অনাদি হইলে, উহার সৃষ্টিকর্ত্তাও অসম্ভব হইল। যদি শক্তির উদ্বোধনকেই সৃষ্টি বলা হয়, তাহা হইলে, কথঞ্চিৎ সৃষ্টিকর্তৃত্ব সঙ্গত হইলেও শান্তি নাই। ইচ্ছাময়ত্বাদি গুণের সামঞ্জস্য কোথায়? ঈশ্বরকে ইচ্ছাময় বলি-

তেছ, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, উদ্দেশ্য বিনা ইচ্ছা থাকে না, তখন ঈশ্বরের কোন না কোন উদ্দেশ্য স্বীকার না করিলে, তাঁহাকে ইচ্ছাময় বলা যাইতে পারে না। উদ্দেশ্য স্বীকার করিলে, পূর্ণকামত্ব থাকে না। আমাদের উদ্দেশ্যই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার কারণ হয়, তবে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়; যেহেতু, আমাদের উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ নহে। আমাদের পরিমিত শক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকার করিলে, তাঁহার করুণাময়ত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ও সার্ব্বজ্ঞ্যাদি ধর্ম্মের অসামঞ্জস্য হয়। বিশেষতঃ যিনি স্বয়ং এই অমঙ্গলময় বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে স্বেচ্ছানুরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ ভোগের অনধিকারী করিয়াছেন, তিনি তাঁহার উক্ত অসম্পূর্ণ কার্য্যের নিমিত্ত ভক্তির পাত্র হইতে পারেন না। অধিকন্তু তাঁহাকে উপাসনাপ্রিয় বলিলে তাঁহার নির্ব্বিকারত্বও সম্ভব হয় না। এইরূপ বিচার করিলে ঐ ঈশ্বরকে মানবের মনঃকল্পিতই বলিতে হয়। ঐ সকল দোষের পরিহার কামনায় পরলোক স্বীকার করাও অন্য দোষের উৎপাদক। দেহাবসানে তদুপন্ন আত্মার ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং পরলোক অঙ্গীকার্য্য। তর্কবিভ্রান্তির জন্য পরলোক স্বীকৃত হইলেও যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও করুণাময়, তিনি কি কারণে অসম্পূর্ণ শক্তি ও অসৎ প্রবৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক জীবকে এই অসীম যন্ত্রণাভোগের পাত্র করিয়াছেন, এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? যে কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত অদৃষ্টাক্রান্তাচিন্ত্য ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহা দ্বারা সে উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হয়, কি প্রকারে? লোক যে সুখের জন্য কল্পিত ঈশ্বরের সেবা করিবেন, প্রকৃতি কি তাঁহাকে সে সুখ প্রদান করিতে অক্ষম? প্রকৃতিতে কি সে সুখের অসদ্ভাব আছে? প্রকৃতির সুখ, দুঃখসংশ্লিষ্ট হইলেও অবর্জ্জনীয় ভাবে প্রাপ্ত দুঃখের পরিহার পূর্ব্বক সুখমাত্র ভোগ করিলেই হইল। দুঃখের দিকে দৃষ্টি না করিলেই প্রকৃতি সুখের আগার হইয়া উঠিবে।

বিশেষতঃ ঈশ্বরের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির বিভিন্ন প্রণালী হইল কেন, এই দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা কে করিবে? একাল পর্য্যন্ত যে বিষয়ের সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত আবিষ্কৃত হইল না, তখন কেনই বা লোকে ধর্ম্ম ধর্ম্ম, ঈশ্বর ঈশ্বর, বলিয়া চীৎকার করেন? মানবের অসম্পূর্ণতা ও আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ হইতে পারে না। ক্রমবিকাশি জগৎ যখন ক্রমশই উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, তখন এমত সময় আসিতে পারে, যখন মানব স্বতই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া অভিলষিত সুখস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিবে। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বিচিত্রকৌশলময়ী প্রকৃতির নিয়মানুসারেই অন্তর্হিত হইবে।

বস্তুতঃ দেহাত্মবাদিগণের মতে প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত প্রমাণ নাই, অনুমান সম্ভাবনা মাত্র। বিশ্বাতিরিক্ত ঈশ্বর নাই; বিশ্ব স্বতঃসিদ্ধ অনাদি অনন্ত। জড়ের পরিণতিই চেতন জীব। দেহাতিরিক্ত আত্মা, স্বর্গ, মুক্তি ও পরলোকের প্রমাণ নাই। বুদ্ধিপৌরুষবিহীন ব্রাহ্মণবর্গ আপনাদিগের জীবিকা

নির্ব্বাহার্থ বেদ ও তল্লিখিত আচার ব্যবহারের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব মনুষ্য-সৃষ্ট অনৃতব্যাঘাতাদিদোষদুষ্ট বেদাদি-শাস্ত্রসমূহের পরোক্ষবাদ প্রামাণ্য নহে। মনুষ্য প্রকৃতির নিয়মের অনুরোধে স্বীয় বিবেকশক্তির পরিচালনে যে কার্য্য করিবেন তাহাই তাঁহাকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে। তাহাই তাঁহার অভিলষিত সুখের সাধন হইবে। এইরূপ করিতে করিতে তিনি স্বয়ংই অলক্ষিত ভাবে এক দিন না এক দিন স্বকপোলকল্পিত ঈশ্বরের অনুরূপ হইবেন; ইহাই সত্য।

সাঙ্খ্যদর্শন-প্রণেতা কপিল বলেন, প্রকৃতিপুরুষের অবিবেক হেতু অর্থাৎ পুরুষ, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, পুষ্কর-পলাশবন্নির্লেপ ও অকর্ত্তা, এইরূপ জ্ঞানের অনুৎপত্তি পর্য্যন্ত জীবকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পরে প্রকৃতিপুরুষের বিবেক অর্থাৎ প্রকৃতিই কর্ত্রী, পুরুষের কর্ত্তৃত্ব অধ্যাসমাত্র, এইরূপ জ্ঞানের উদয়ে অনাদি অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে, পুরুষের প্রতি প্রকৃতির অধিকার ত্যাগ হয়। তদনন্তর পুরুষের অর্থাৎ জীবের ত্রিবিধ দুঃখের ধ্বংস হয়। ইহাকেই আনন্দপ্রাপ্তি কহে। যেরূপ ভারবাহক পুরুষের মস্তক হইতে ভার অপনীত হইলে, ভারজনিত দুঃখের অবসানরূপ সুখের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই সুখ। পূর্ব্বোক্ত দুঃখত্রয়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধঃ—শারীর ও মানস। বাতপিত্তাদি-জনিত বৈষম্য হেতুক দুঃখই শারীর দুঃখ এবং কামক্রোধাদিজন্য দুঃখই মানস দুঃখ। এই দুঃখদ্বয় আন্তরোপায়নাশ্য বলিয়াই ইহাদিগকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলা যায়। মনুষ্যপশ্বাদি হেতুক দুঃখই আধিভৌতিক দুঃখ। এবং যক্ষরাক্ষসভূতাদ্যাবেশ হেতুক দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে। উক্ত ত্রিবিধ দুঃখই প্রকৃতিমূলক; সুতরাং প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকে প্রকৃতির অধিকারের অবসান হইলেই দুঃখত্রয়ের ধ্বংস হয়। যদিও ঔষধ-বনিতাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ নাশ, দুর্গাদি সাধন দ্বারা আধিভৌতিকাদি দুঃখের নাশ হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা উক্ত দুঃখের সমূলে নাশ হয় না, পরন্তু রোগবিশেষের ন্যায় পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়। অতএব প্রত্যক্ষমাত্রবিশ্বাসী নাস্তিকের মতানুসারে সাংসারিক ক্ষণিক সুখের উৎপত্তিতে যে দুঃখনাশ হয়, তাহাকে আত্যন্তিক দুঃখনাশ বলা যায় না; প্রকৃতির নিবৃত্তি হইলেই আত্যন্তিক নাশ হয়। অতএব তাদৃশ আত্যন্তিক নাশকেই আনন্দ-প্রাপ্তিরূপা মুক্তি বলা হয়। ঐ ধ্বংসরূপা মুক্তি কার্য্য হইলেও উহা ঘটাদি কার্য্যের ন্যায় অনিত্য নহে। কারণ, ধ্বংসরূপ অভাবের নিত্যত্বই স্বীকার্য্য। এইরূপে পুরুষের নিত্যত্ব স্বীকারে শূন্যবাদী বৌদ্ধেরও মত নিরাকৃত হইল। ফলতঃ সাঙ্খ্যদর্শন-প্রণেতা প্রকারান্তরে নিরীশ্বর অগ্নিবংশজ কপিল ঋষির এই মত।

যোগদর্শন-প্রণেতা পতঞ্জলি বলেন, প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকাভ্যাস দ্বারা বিষয়-বৈরাগ্য জন্মে। ঐ বৈরাগ্যের পক্কতা জন্মিলে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ

হয়। এবং তদ্দ্বারা পরমেশ্বরপ্রসাদ হয়: তাহা হইলে, দুঃখপরিহার ও সুখপ্রাপ্তি হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই পাঁচটিকে যম কহে। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানের নাম নিয়ম। স্বস্তিক-পদ্মাদি যোগাভ্যাসকালীন অঙ্গসংস্থান বিশেষের নাম আসন। এবং রেচন-পূরণ-কুম্ভনরূপ বায়ুসংযমন কার্য্যবিশেষের নাম প্রাণায়াম। বিষয় সকল হইতে ইন্দ্রিয়গণের বিয়োজনরূপ কার্য্যবিশেষের নাম প্রত্যাহার। নাভিচক্র ও নাসাগ্রাদিতে নির্ব্বিষয় চিত্তের স্থিরীকরণের নাম ধারণা। যাহাতে বিষয়ান্তরের স্ফূর্ত্তি হয় সেই চিত্ত দ্বারা যে সমাধি লাভ হয়, তাহার নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং প্রমাণ, বিপর্য্যয়, সঙ্কল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে যে সমাধি লাভ হয়, তাহারই নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হইলেই জীবের দুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দাবাপ্তি হয়। এই মতে সাঙ্খ্যের ন্যায় কেবল প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকেই মুক্তি স্বীকৃত হয় না, পরন্তু মুক্তিলাভে ঐ বিবেকের পরও সমাধির নিমিত্ত যোগাভ্যাসের প্রয়োজন। এই দর্শনে পদার্থনির্ণয়াংশে সাঙ্খ্যদর্শনের সহিত ঐকমত্য থাকিলেও ইহাতে ঈশ্বরসত্তা প্রতিপাদিত হওয়াতে ইহার নাম নিরীশ্বর সাঙ্খ্যদর্শন না হইয়া সেশ্বর সাঙ্খ্যদর্শন হইয়াছে। এবং ইহাতে যোগের বিষয় সবিস্তারে আলোচিত হওয়াতেই ইহাকে যোগদর্শনও বলা যায়।

চিত্তবৃত্তির নিরোধের নামই যোগ। নিরোধ শব্দের অর্থ সংযম; অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি সকল নিয়ত যে সকল বিষয়ে আসক্ত হইতেছে, তাহাদিগকে সেই সকল বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক বিষয়ান্তরে সংযত বা নিবিষ্ট করার নামই চিত্তবৃত্তির নিরোধ। ঐ নিরোধ দ্বিবিধ :—প্রথম, বিভূতি লাভের নিমিত্ত কোন একটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া তাহারই বারংবার চিন্তা দ্বারা চিত্তের বিষয়ান্তর হইতে বিনিবর্ত্তন; এবং দ্বিতীয়, মুক্তি লাভের জন্য ধ্যেয় বস্তুতে সংস্থাপিত চিত্তকে তন্মাত্রের নিয়ত ধ্যান দ্বারা বিষয়-সুখ হইতে বিনিবর্ত্তন। যোগবলে অণিমাদি যে সকল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তাহারই নাম বিভূতি। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতার নাম মুক্তি। ঐ পরমাত্মা, আকাশ যেরূপ নিরতিশয় বৃহত্ত্বের আশ্রয়, পরমাণু যেরূপ নিরতিশয় ক্ষুদ্রত্বের আশ্রয়, তদ্রূপ নিরতিশয় জ্ঞান ও সুখের আশ্রয়। জীবের বুদ্ধিবৃত্তি রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা কলুষিত থাকায় তাঁহার দৃক্‌শক্তি পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন-দৃক্‌শক্তি-সমন্বিত জীবের সর্ব্বগোচর জ্ঞানের অসম্ভাবনা প্রযুক্ত জীব পরমাত্মপদবাচ্য হইতে পারেন না। পরমেশ্বর ক্লেশকর্ম্মাদিরহিত, জগন্নির্ম্মাণার্থ স্বেচ্ছানুসারে শরীর ধারণ পূর্ব্বক সংসারপ্রবর্ত্তক, সংসারানল-সন্তপ্যমান ব্যক্তিগণের অনুগ্রাহক, অসীম-করুণা নিধান এবং অন্তর্য্যামিরূপে সদা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। যথানিয়মে যোগানুষ্ঠান করিলেই তিনি জীবের অবিদ্যার উন্মূলনে প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ-জন্য সংসারের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক তাঁহাকে

অভীষ্ট ফল প্রদান করেন এবং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়েন।

ন্যায়দর্শন-কর্ত্তা গৌতমের মতে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ-লক্ষণ-পরীক্ষা দ্বারা আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, ও অপবর্গ, এই দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের জ্ঞান লাভের অনন্তর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মদ্বয়-সাক্ষাৎকার হয়। তন্মধ্যে মনন অনুমানাধীন, অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানাধীন ও ব্যাপ্তিজ্ঞান পদার্থতত্ত্বজ্ঞানসাপেক্ষ। পরমাত্মা ও জীবাত্মার সাক্ষাৎকারের অনন্তর বাসনার সহিত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। তদনন্তর তৎকার্য্যভূত সপ্রবৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের নিবৃত্তি হয়। অবশেষে পূর্ব্বার্জ্জিত দেহারম্ভক কার্য্যের কায়ব্যূহ দ্বারা ভোগে ক্ষয় হইলে, দেহান্তরের অনুৎপত্তি প্রযুক্ত বাধাদায়ক শরীর, ষড়িন্দ্রিয়, ষড় বিষয়, ষড় বুদ্ধি, সুখ ও দুঃখ এই একবিংশতি প্রকার দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়। এই দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি।

বৈশেষিকদর্শনকার কণাদের মতে আত্মা বিভু ও দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ এবং বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন অদৃষ্ট ও ভাবনাখ্য সংস্কার এই নববিধ গুণের আশ্রয়। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই সপ্তপদার্থান্তর্গত ঘট পদার্থের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আত্মার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। পরে উপাসনা দ্বারা তৎসাক্ষাৎকার লাভ হইলে, উক্ত বৈশেষিক প্রাগভাবের সহিত সমস্ত বৃত্তিরও ধ্বংস হয়; অর্থাৎ বৃত্তিসকলের পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্তও বিনষ্ট হয়। ঐরূপ বৃত্তিনাশই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি।

পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনকার জৈমিনির মতে ঈশ্বরার্চ্চনরূপ বৈদিক কর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্যাদৃষ্ট দ্বারা দুরদৃষ্টের ক্ষয় ও স্বর্গাদিপ্রাপ্তি বা মুক্তি লাভ হয়।

এই সংসারে দুঃখপরিহার ও সুখপ্রাপ্তির জন্যই লোকের প্রবৃত্তি দেখা যায়। ঐ সুখলাভ ও দুঃখহানিও আবার উপায় ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না। এই কারণে সারাসারবিচারজ্ঞ কপিলাদি মহর্ষিগণ প্রথমতঃ অসঙ্গতবোধে পূর্ব্বপক্ষ স্বরূপে ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসশূন্য চার্ব্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন এবং তদনুগত জৈনদর্শন বা আর্হতদর্শনাদির মত সকল খণ্ডন করতঃ তদ্বিষয়ে স্ব স্ব বুদ্ধিবিপরিণাম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপায় সকল কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল উপায় আত্যন্তিক দুঃখপরিহার ও সুখলাভে অঙ্গীকার্য্য নহে। কারণ, ঐ সকল ঋষির প্রদর্শিত মুক্তি ও তাহার উপায় প্রকৃত মুক্তি ও প্রকৃত উপায় নহে। ফলতঃ ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য সর্ব্বদর্শন-শিরোমণিস্বরূপ বেদান্ত বা উত্তরমীমাংসাদর্শনের আবির্ভাব। ভগবান্ বাদরায়ণ এই দর্শনের রচয়িতা। তিনি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রের অনুগুণ তর্কযুক্তি দ্বারা সেই সেই মতের নিরাকরণ পূর্ব্বক তদুপায়াবধারণে যে স্বমত সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা অতি বিশুদ্ধ। এই দর্শনের মতে সর্ব্বেশ্বরাখ্য পুরুষোত্তমের স্বরূপের ও গুণের জ্ঞান

পূর্ব্বক পরিজ্ঞান হইলেই আত্যন্তিক দুঃখ-হানি ও সুখলাভ হইয়া থাকে।

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥
যং ন পশ্যন্তি যোগীন্দ্রাঃ সাংখ্যা অপি মহেশ্বরম্।
অনাদিনিধনং ব্রহ্ম ত্বমেব শরণং ব্রজ॥"

কূর্ম্মপুরাণম্॥

"এতে ভিন্নদৃশাং দৈত্য বিকল্পাঃ কথিতা ময়া।
কৃত্বাভ্যুপগমং তত্র সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম॥
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥
প্রথম হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্।
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্বিপ্রৈঃ সংপ্রোক্তানি ততঃ পরম্॥
কণাদেন তু সংপ্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন বৈ॥
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদমথার্থতঃ।
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতম্।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা॥
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ॥
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্॥
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে।
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে॥
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে।
ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া॥
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে।
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥"

বিষ্ণুপুরাণম্॥

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ঘটোৎকচবধ কাব্য।*

গদ্য অপেক্ষা পদ্য রচনায় সাধারণ লোকের টান বেশী, আর এরূপ প্রবৃত্তির কারণ, প্রধানতঃ, কাব্যের সম্মোহন কুহক ও চিত্তোন্মাদিনী শক্তি। কিন্তু সেই সঙ্গে লোকে আরও একটী বিশেষ কারণে কবিতা প্রণয়ন বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। হঠাৎ দেখিতে কবিতা যথেচ্ছাচারিতার বিহারাবাস। ইহাতে যেমন ছন্দে ছন্দে মিল করিতে পারিলেই, অথবা মহামতি মাইকেল মধুসূদনের আশীর্ব্বাদে কষ্টোচ্চারিত গুটীকতক কথা সাজাইলেই, কাব্য রচনা করা হয় ও কবি হওয়া যায়, গদ্যে সেরূপ অসম্ভব। বঙ্গসাহিত্য আজি তাহাই অসার কাব্যে প্লাবিত। দেবী সরস্বতীরও দুর্ভাগ্য,—"ব্যাসজিহ্বা পদ্মাসনে বসি" আবার যে তাঁহাকে কবি-যশ-লিপ্সু প্রত্যেক নগণ্য লেখকে(sribbler)'র জিহ্বারূপ কণ্টকাসনে বসিবার জন্য আহূত হইতে হয়, ইহা অপেক্ষা কষ্টের বিষয় আর কি? বোধ হয় এতটা কথা সমালোচ্য গ্রন্থসম্বন্ধে খাটে না। কবি বলিয়াছেন তিনি অনেক কষ্টে পুষ্পচয়ন করিয়াছেন :—

"বহুল যতনে ক্রমে ব্যাধির বিরামে
তুলেছি যে ফুলচয়; আজি সংগ্রহিয়া
সে পুষ্প-নিকর! গাঁথি কাব্যরত্নহার
সমর্পিনু সমাদরে"—

---

* শ্রীশশিভূষণ মজুমদার বিরচিত, ১ম ও ২য় খণ্ড।

আমরা এমন কথা জোর করিয়া বলি না যে কবি যাহা পুষ্পজ্ঞানে চয়ন করিয়াছেন তাহা পুষ্প নহে,কেবল কণ্টক ; তবে আমাদের বিশ্বাস, "সে পুষ্প-নিকরের" ভিতর বন-পুষ্পের ভাগই অধিক, সে পুষ্পের সৌরভে মন মুগ্ধ হয় না, প্রাণ আকুল হয় না। কবিকুঞ্জের স্নিগ্ধ সমীরণ, নেত্রতৃপ্তিকর দৃশ্য, ও মাতোয়ারা কোকিলের ডাক শশিবাবুর রচিত কাব্যোদ্যানে পাই নাই। সন্ধ্যাবর্ণনটী দেখা যাউক :—

"সহসা বহিল মৃদু শীতল পবন!
উড়িল বায়স, গৃধ্র, রণক্ষেত্র ত্যজি—
পশ্চিম গগন প্রান্তে জলদে রঞ্জিয়া
পাণ্ডবী বিক্রমে, মৃদু হাসিলা তপন!

"বিধির বিচিত্র লীলা! অনন্ত সৃজন!
বর্ণিত অনন্তভাবে অনন্ত নাটকে।
ব্রহ্মাণ্ড-সুরম্য দৈবসিক নাট্যাগারে
অভিনয় করি অভিনায়ক ভাস্কর—

"বিশ্রামার্থ অস্তাচল-মন্দিরে পশিলে ;
পট পরিবর্ত্ত করি—দ্বিতীয় নায়ক
সুধানিধি! প্রিয়তমা রোহিণী সংহতি
"গোধূলি নির্গম"নাম একাঙ্ক নাটক

"অভিনয়ারম্ভ যবে করিলা সুমতি,—
বিচিত্র গগনপটে সুনিল জলদ
শোভিল,"—

সুধীবর ডাক্তার জন্‌সন্ (Johnson) কোন কবির গ্রন্থাবলীর সমালোচনায় বলিয়াছেন যে সেই বিশেষ কাব্যগ্রন্থে কবি যেখানে স্বভাবের বিচিত্র শোভা লইয়া পড়িয়াছেন সেইখানেই রূপকের ও উপমার দ্বারা তাহা জঘন্য করিয়াছেন। এরূপ মনোরম স্বভাবশোভার নাশ অতি নিকৃষ্ট কবির কার্য্য। আমাদের ধারণাও তাহাই। অনন্তশোভাময়ী সন্ধ্যার কি যোগ্য তুলনা নাট্যশালা! দিনে আরও কত হইবে! একবার নিদাঘনিশাবর্ণনটী দেখা যাউক :—

"গভীর নিদাঘ নিশি দ্বিতীয় প্রহর
পূর্ণ শশী বিহারিছে উপর গগনে,—
বিরল নিলীমা সহ ;—কভু জলধর
ঢাকিছে যামিনী কান্তে! যামিনী রূপসী
না হেরিয়া প্রাণনাথে, তিমির বসনে
আবরিছে চারুকান্তি! রোষে নিশামণি
জলদে তাড়াই দূরে,—কৌমুদিবসনে
সাজাইয়া প্রিয় কান্তি, উৎফুল্ল বদনে
চুম্বিছেন ঘন ঘন—সুধাংশু বর্ষণে!
হাসিছে প্রকৃতি দেবী, অন্তরে থাকিয়া
(নবদম্পতির প্রেমে—বঙ্গাঙ্গনা যথা)
শশী-যামিনীর এই কৌতুক নিরখি!
হাসিতেছে অরণ্যানী! মৃদুল হিল্লোলে—
সরঃবারী "থৈ" "থৈ" রবে কল্লোলিছে!
উড়িছে চকোর মালা! মধুর সঙ্গীত
ঝড়িছে সুদূর শূন্যে!—চাতক-চাতকী
ক্ষণে ক্ষণে উড়িতেছে, কখন (ও) বিষাদে
বসিছে বিটপী শাখে বিরস বদনে।"

এস্থলটী নিতান্ত মন্দ নহে। প্রথম দশ পংক্তি পাঠ করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না, কিন্তু যেমন একাদশ পংক্তিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় অমনি কল্পনার নিকৃষ্টভাবের উপলব্ধি হয়। "নবদম্পতির প্রেমে—বঙ্গাঙ্গনা যথা," বোধ করি কোন উচ্চদরের কবি লিখিতেন না। কখন কখন এরূপ

ভাব কবিতায় সহ্য করিতে পারা যায় কেন, উপভোগ করিয়া আনন্দ লাভ করা যায়ঃ—

"বলে,—পদ্মরাণী বদনখানি
রেতে রাখে ঢেকে,
ফুটায় কলি, ছুটায় অলি,
প্রাণপতিকে দেখে ;
আবার,—বনের লতা ছড়িয়ে পাতা
গাছের দিকে ধায়,
নদীর জল, নাম্‌লে ঢল,
সাগরেতে যায় ;
ছি, ছি,—সরম টুটে, কুমুদ ফুটে
চাঁদের আলো পে'লে,"—

আবার,—

"পতি বিরহে, পদ্ম দহে,
পদ্ম বিরহিণী,
ঝরিয়ে নয়ন, তিতিয়ে বসন,
কাটিয়েছে যামিনী ;
গেল রজনী, হাস্‌লো ধনী,
পতির পানে চায়।
মুখ চুমিয়ে, আতর নিয়ে,
যাচ্চে উষার বায়।"

এ কেমন সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী, অথচ সরল ভাবের কবিতা! তাহার পর "সরঃবারী 'থৈ' 'থৈ' রবে কল্লোলিছে"—বারির কখনও "থৈ" "থৈ" কল্লোল হয় না। আবার "মধুর সঙ্গীত ঝড়িছে সুদূর শূন্যে"—"ঝড়িছে" বড় ভয়ানক কথা! যাহা হউক এ বর্ণনাটী অপেক্ষাকৃত ভাল। বাহিক স্বভাবের বর্ণনা সম্বন্ধে ত এই, এক্ষণে দেখা যাউক প্রণয়ের দৃশ্য রচনায় কবি কিরূপ গুণপনা দেখাইয়াছেন। বীর ঘটোৎকচ যখন সুরমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন তখনকার আপ্লুত হৃদয়ের ভাব কিরূপ ?—

" 'অন্তরীক্ষে হেরি নামে সুরমা রূপসী
উন্মাদিনী প্রায় ধে'য়ে,
বাহুযুগে জুড়াইয়ে,
ধরিলা বীরেন্দ্র কণ্ঠ ;—কহিলা মহিষী ;—

" 'বাঁচাইলে অধীনিরে হে প্রাণবল্লভ!
আশু আসি নভঃস্থলে,
হেরি তোমা রণস্থলে,
একাকী ; সখীর সনে,
কত যে ভেবেছি মনে,
কি আর কহিব তার! জগত দুর্ল্লভ—

" 'ও পদ রাজীবকান্ত!' কাঁদিলা মহিষী।
পরিণাম ভাবি বীর,
মুছিয়া নয়ন নীর,
চুম্বি চারু চন্দ্রানন, কহিলা ;—'রূপসি!

" 'বীর কুলে জন্ম, রণে মরণই মঙ্গল!
কিন্তু প্রিয়ে ভাবি যবে,
মরিলে ত্যজিতে হবে,
ও মাধুর্য্য রূপ রাশি,
ও প্রেমজড়িত হাসি,
তখনই হৃদয় বনে,—পশে দাবানল।—

" '—নতুবা মৃত্যুর ভয়, মুহূর্ত্তের তরে,
না হয় অন্তরে সতি!
অতি তুচ্ছ কুরুপতি ;—
কৃতান্তেও নাহি ডরি সম্মুখ সমরে।

" 'নাহি চিন্তা প্রেমাধিনি! ও কম অন্তরে
পোষোণা দুশ্চিন্তানল,
চিন্তা বহ্নি ব্যাধি খল,—

সতত আশ্রয় নাশে,
কিম্বা যথা নিজাবাসে
কাটি কালে তুত কীট যায় স্থানান্তরে।

"যা' হউক প্রেয়সি! চেয়ে দেখ দিনমণি—
প্রায় অস্তাচল গত,
বিষাদ সলিলে স্নাত
হইবে নলিনী আশু; এখন রঙ্গিনি!

"যাও তুমি নিজাবাসে বিজয়ী সমর—
আবার ও চারু কান্তি
দলি বক্ষে, রণ ক্লান্তি
প্রক্ষালিব প্রেম-নীরে;'
বলি বীর ধীরে ধীরে
খুলি কণ্ঠবিজড়িত প্রেমময়ি-কর,
"ভাসিলা নয়ন নীরে, হেরি বিম্বাধর!"

এই চিত্রে প্রেম বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে প্রেম কিঞ্চিৎ পশুভাবাপন্ন। বীর যখন আপনার আগতপ্রায় আসন্নকাল ভাবিতেছেন তখন কবির মতে তাঁহার মনে কি ক্লেশ হইতেছে? তিনি বীর, বীর-কুলে তাঁহার জন্ম, তিনি অবশ্যই চিরাগত প্রথানুসারে মৃত্যুকে ভয় করেন না। কৌরব-পতি ত ক্ষুদ্রপ্রাণী, তিনি সাক্ষাৎ শমনকেও ভয় করেন না। তবে মৃত্যুতে তাঁহার কিসের কষ্ট? তাঁহার প্রণয়িনীর বৈধব্য-দশাজনিত অশেষ দুঃখ ভাবিয়া?—না; কৈ কবি ত তাহা কিছু বলেন না! তবে তাঁহার কিসের কষ্ট? কষ্ট,—তাঁহার সুরমার সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য তিনি ভাল করিয়া উপভোগ করিতে পারেন নাই; তাহাই তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে তিনি প্রস্তুত নহেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি তখনও চরিতার্থ হয় নাই;—তাঁহার রূপলালসা ও সৌন্দর্য্য-পিপাসা তখনও মিটে নাই!

"কিন্তু প্রিয়ে ভাবি যবে,
মরিলে ত্যজিতে হবে,
ও মাধুর্য্য রূপ রাশি,
ও প্রেমজড়িত হাসি,
তখনই হৃদয় বনে,—পশে দাবানল;"—

এ সমস্তটা বীরহৃদয়ের উচ্ছ্বাস বলিয়া প্রতীতি হয় না। ইহার ভিতর কেমন যেন রসচতুর নাগরের প্রেমালাপের ভাব অনুভূত হয়। এই প্রেমচিত্র পাঠ করিয়া সেক্সপীয়ারের ভিনস্ (Venus) ও এডোনিসে(Adonis)'র দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়লালসা মনে পড়িল:—

'With blindfold fury she begins to forage,
Her face doth reek and smoke, her blood doth boil....
And glutton-like she feeds, yet never filleth;
Her lips are conquerors, his lips obey,
Paying what ransom the insulter willeth;
Whose vulture thought doth pitch the price so high,
That she will draw his lips, rich treasure dry.'
"Even as an empty eagle, sharp by fast,
Tries with her beak on feathers, flesh and bone,
Shaking her wings, devouring all in haste,
Till either gorge be stuffed or prey be gone;

Even so she kiss'd his brow, his cheek, his chin,
And where she ends she doth anew begin."

এরূপ কলুষিতভাব সাহিত্যে না থাকিলেই মঙ্গল!

এ ত গেল দুঃখের কথা, দুটো আশ্বাসের কথাও ত চাই। "নাহি চিন্তা প্রেমাধিনি! ইত্যাদি—স্থানান্তরে।"—এটী মন্দ বোধ হয় না, কেবল "প্রেমাধিনির" পরিবর্ত্তে অপর কোন সোহাগের কথা থাকিলে সুখী হইতাম। কিন্তু হঠাৎ "'যা' হউক প্রেয়সি" আনিয়াই কবি একেবারে সকল নষ্ট করিয়াছেন।

আবার— "চিন্তা বহ্নি ব্যাধি খল,—
সতত আশ্রয় নাশে,
কিম্বা যথা নিজাবাসে
কাটি কালে তুত কীট যায় স্থানান্তরে।"—

এ উপমাটা যেন শুধু কবির কবিত্ব প্রদর্শনের ইচ্ছার অবিরাম কণ্ডূয়নের খাতিরেই দেওয়া হইয়াছে—উহা যেন অপদেবতা নিরাকরণের ওঝাসঙ্কলিত একটা মন্ত্র বিশেষ! তাহার পর যখন বীরহৃদয় দগ্ধপ্রায় হইয়াছে তখন "বিষাদ সলিলে স্নাত হইবে নলিনী আশু" তত স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। অনেক সময় মনোভিরামের জন্য উপস্থিত বিষয়ের সহিত অসম্বন্ধ অথচ প্রীতিকরী কথা আবশ্যক। মনে করুন বাত্যাভীতা বল্লরীর ন্যায় কোন সুন্দরী তাঁহার প্রণয়ীকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় কোন বিশেষ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইল; সে সময় প্রণয়ী তাঁহার ক্রোড়াশ্রিতা সঙ্গিনীকে কি সেই আশঙ্কাবিষয়ক সকল কথা বলিবেন, না অন্য পাঁচরকম হাস্যকৌতুক অথবা প্রমোদের কথা বলিয়া তাঁহার কৌতূহল নিবারণ করিবেন? শেষোক্ত পন্থাই ত স্বাভাবিক। ম্যাক্‌বেথ (Macbeth) যখন ব্যাঙ্কো (Banquo)'কে হত্যা করিবার সকল যোগাড় করিয়া তাঁহার লেডি (Lady)'র নিকট সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, তখন লেডি ম্যাকবেথ্ (Lady Macbeth) কিছু বুঝিতে পারিলেন না, বরং অজ্ঞানতাবশতঃ কিঞ্চিৎ ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"What's to be done?"—

উত্তরে ম্যাক্‌বেথ্ ঐ বিষয় সংক্রান্ত সকল কথা না বলিয়া বলিলেন:—

Be innocent of the knowledge,
dearest chuck,—

এই প্রকার dearest chuck প্রভৃতি আদরের কথায় বেশ মনোভিরাম হয়।

কিন্তু এ স্থলে "বিষাদ সলিলে স্নাত হইবে নলিনী আশু," যেন সেরূপ স্বাভাবিক মনোভিরামের কথা বলিয়া বোধ হয় না। ওটী যেন কোন সংস্কৃত গ্রন্থের চলিত শ্লোকের মত ভাবহীন, পদ্যহীন, নিতান্ত সাজান বা মনে করে রাখা কথা। "বিষাদ সলিলে স্নাত হইবে নলিনী আশু,"—এইরূপ নলিনীর বিষাদের কথা আর দুই একবার বলিলেই ত উহা পদ্যবিহীন হইয়া পড়িবে!

"যাও তুমি নিজাবাসে; বিজয়ী সমর"— "বিজয়ী সমর," ভাষার উপর ভয়ানক অত্যাচার! যদি কবি "সমরবিজয়ীকে" এরূপ উল্‌টাইয়া লইয়া থাকেন তাহা হইলে কেবল ছন্দের অনুরোধে কার্য্য হইয়াছে;

আর যদি "বিজয়ীকে" ক্রিয়াপদ করিয়া থাকেন. তাহা হইলে বেশ মানে হয় বটে, কিন্তু কিছু বেশী বাড়াবাড়ি করা হয়।

উপসংহারে এই অঙ্কের সহিত চির-প্রসিদ্ধ এণ্ড্রোমেকি(Andromache)'র নিকট হেকটরের বিদায় গ্রহণ তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় ঘটোৎকচ-সুর-মার প্রেমচিত্র কত মলিন। আমাদের নিকট পোপ সাহেবের অনুবাদিত হোমার আছে। যদিও তাহা হইতে মূল গ্রন্থের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না, তথাপি উহা উপস্থিত কার্য্যের জন্য যথেষ্ট :—

"*Andro.* Yet while my Hector still survives, I see
My father, mother, brethren, all in thee:
Alas! my parents,brothers, kindred, all
Once more will perish, if my Hector fall,
Thy wife, thy infant, in thy danger share:
Oh, prove a husband's and and a father's care.

* * * * *

Let others in the field their arms employ,
But stay my Hector here, and guard his Troy,
Hec. My early youth was bred to martial pains,
My soul impels me to the embattled plains!
Let me be foremost to defend the throne,
And guard my father's glories, and my own.
Yet come it will, the day decreed by fates!
(How my heart trembles while my tongue relates!)
The day when thou, imperial Troy! must bend,
And see thy warriors fall, thy glories end.
And yet no dire presage so wounds my mind,
My mother's death, the ruin of my kind,
Not Priam's hoary hairs defiled with gore,
Not all my brothers gasping on the shore;
As thine, Andromache! Thy griefs I dread:
I see thee trembling, weeping, captive led!

* * * * * *

May I lie cold before that dreadful day,
Pressed with a load of monumental clay!
Thy Hector wrapt in everlasting sleep,
Shall neither hear thee sigh, nor see thee weep.

* * * * *

Andromache! my soul's far better part,
Why with untimely sorrows heaves thy heart?
No hostile hand can antedate my doom,
Till fate condemns me to the silent tomb.

* * * *

No more—but hasten to thy tasks at home,
There guide the spindle, and direct the loom:
Me glory summons to the martial scene,
The field of combat is the sphere of men.
Where heroes war, the foremost place I claim,
The first in danger as the first in fame".

শ্রীগোপাল চন্দ্র ঘোষ।

মুসে গাম্‌বেতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(১)

অহোঃ—কালস্রোত অবিরামগতি! পলে পলে দণ্ড; দণ্ডে দণ্ডে প্রহর; প্রহরে প্রহরে দিন; দিনে দিনে মাস; মাসে মাসে বৎসর; বৎসরে বৎসরে যুগ; যুগে যুগে মন্বন্তর। দেখ, কেমন অনন্তে অনন্ত মিশিতেছে! গাম্‌বেতার জীবনের প্রথম অঙ্ক শেষ হইয়া দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল। প্রথম অঙ্কে বক্তৃতার অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে; দ্বিতীয় অঙ্কে গাম্‌বেতার কার্য্যকলাপ আরম্ভ হইল। ফ্রান্স লীলাচত্বর; গাম্‌বেতা কার্য্যগুরু।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্যারিনগর অবরুদ্ধ। প্যারির চারিদিক প্রসিয়েরা সৈন্যসামন্ত লইয়া বেষ্টন করিয়া আছে। অবরুদ্ধ পুরবাসিদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। এ অবস্থায় সদ্যুক্তি কি? সৎসাহস থাকিলে লোকের মনে চতুর্গুণ বল হয়, বিপদ তুচ্ছজ্ঞান হয়। "যাক্ প্রাণ থাক্ মান" এ কথা যাঁহাদের বীজ মন্ত্র, তাঁহারা ত প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। গাম্‌বেতার সৎসাহস ছিল, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ের বলও চতুর্গুণ ছিল। উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায় এসকল গুণও তাঁহার অঙ্গের ভূষণ। প্রাণের মায়া তিনি কখনও করিতেন না।

গাম্‌বেতা স্থির করিলেন বেলুনযোগে নগরের বাহিরে যাইতে হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সাধারণতন্ত্রভুক্ত মহাবীরদিগকে দেশোদ্ধারব্রতে ব্রতী করিতে হইবে। অতঃপর ৭ই অক্টোবর তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় এক প্রকাণ্ড ব্যোমযানে উঠিয়া গাম্‌বেতা নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবরুদ্ধ নগর হইতে বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় লইয়া বিমানপথে যাত্রা করিলেন। দেখিতে দেখিতে বেলুনটী শূন্যে মিলাইয়া গেল। পরদিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমিয়েঁস নগরে বেলুন আসিয়া উপনীত হইল। তথায় গাম্‌বেতা সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতে রেলগাড়ি করিয়া তিনি রেঁায়ে নগরে উপস্থিত হইলেন। শুনা যায় গাম্‌বেতার শত্রুকুল তাঁহার ও তাঁহার ব্যোমযানের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়া ছিল। তাঁহার বন্ধুবর্গও কৌতূহল পরবশ হইয়া বেলুনের অনুসন্ধান করিয়াছিল। রেঁায়েতে তিনি দুই দিন ছিলেন। নগরবাসীরা তাঁহার সম্বর্দ্ধনার ত্রুটি করে নাই। বক্তৃতাড়ম্বর না করিয়া তাহাদিগের নিকট সরলভাবে, সংক্ষেপে তিনি কেবল আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। নর্ম্মাণ্ডিবাসী সমস্ত লোককে তিনি বুঝাইয়া দেন—"শত্রুর

আক্রমণে প্যারিবাসিরা নিরুদ্যম বা নিরুৎসাহ হইবে না তবে ভিন্নপ্রদেশীয়েরা তাহাদের সহায়তা না করিলে উদ্যম ব্যর্থ হইবার কথা। আত্মপরজ্ঞান রহিত হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। প্রুসিয়েরা রণে ভঙ্গ দিবে, ফ্রান্‌স রক্ষা পাইবে এবং সাধারণতন্ত্রপ্রণালী বদ্ধমূল হইবে। যদি জয়শ্রী আমাদের একান্ত পরিত্যাগ করেন, আমরা নির্ভিক হৃদয়ে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইব।" রোঁয়ে হইতে গাম্‌বেতা তুঁর নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং নির্ব্বিঘ্নে তথায় গিয়া পহুঁছিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে তথাকার লোকসমূহ উৎসাহে ও আনন্দে মাতিয়া উঠিল। তাহার পূর্ব্বদিন ইতালীর স্বদেশবৎসল বীরেন্দ্রকেশরী গ্যারিবল্‌ডী তথায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন। এ স্থানে দুই জনার পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তুঁর পিঠস্থান—প্রয়াগ ক্ষেত্রে যেন গঙ্গাযমুনা সঙ্গম। একদিকে উত্তালতরঙ্গমালায় শোভিতা কলকলনাদিনী কালিন্দী আর অপর দিকে মন্থরগামিনী পুণ্যসলিলা ভাগিরথী! দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতিক বলের একত্রে মিলন—গাম্‌বেতা বুদ্ধিবলের অবতার, গ্যারিবল্‌ডী বাহুবলের আধার। এক বীর অন্তর্জগৎ জয় করিতে ও শাসন করিতে সক্ষম; অপর বাহ্যজগতকে পরাজয় করিয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন। এহেন দুরূহ ব্যাপারে দুই বলেরই আবশ্যক, দুই বীরেরই প্রয়োজন। বিধাতা তাহাই সঙ্ঘটন করিয়াছেন।

ফ্রান্‌স সাম্রাজ্যের অবস্থা সন্দর্শন করিলে চক্ষে জল আসে। চারিদিকে গোলযোগ, গাম্‌বেতা দেখিলেন অকর্ম্মণ্য লোকের উপর শাসনভার ন্যস্ত থাকাতেই এই অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা সঙ্ঘটিত হইয়াছে। এই দোষ অপনোদন করিবার নিমিত্ত তিনি এখন প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ ব্যাপারের জন্য তিনি কিরূপ আয়োজন বা যোগাড়যন্ত্র করিয়াছিলেন তাহার আভাস দিবার নিমিত্ত এই তালিকা দিলাম। ফরাসি সৈন্যসংখ্যা ৫৬,০০০; তন্মধ্যে ৫০,০০০ পদাতিক ও ৬,০০০ অশ্বারোহী। কামান ১০০টী। অপরদিকে জর্ম্মান্‌দের সৈন্যসংখ্যা৮,০০০০০। গাম্‌বেতা দুষ্ট রাজদ্রোহিদের দমন করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দিলেন।

এখন হইতে সকল লোকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবে এ কথাও স্পষ্ট করিয়া বলা হইল।

ইহাতে গাম্‌বেতাকে নিন্দাভাগী হইতে হইয়াছিল কিন্তু তিনি শত্রুর নিন্দাবাদে কখনও কর্ণপাত করিতেন না। লঘুচিত্তজনে সহজেই বিচলিত হয়; কিন্তু যিনি সারবান্ তিনি কখনও সামান্যতঃ মানসিক ধৈর্য্য হারান না। বিশেষতঃ যিনি দুর্ল্লভ বস্তুর কামনা করেন এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহারই অনুসরণ করেন, সহজে তাঁহার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। অগাধ জলধি সরিৎপতি মৃদুমন্দ পবন হিল্লোলে কি কখন বিক্ষোভিত হন? ভ্রমরের কোমল পাদবিক্ষেপে ক্ষুদ্রমতী যুথিকা থর থর কাঁপিয়া উঠিবে বটে, কিন্তু পীযূষগর্ভ সহস্রদল পদ্ম অচল অটল ভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে।

(২)

দেশের সমস্ত গণ্যমান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি-গণকে একত্র সমবেত করিয়া গাম্বেতা তাঁহাদের পরামর্শ মত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক্ষণে তিনি সর্ব্ববাদী সম্মতি-ক্রমে ডিক্টেটরের পদে বরিত হইলেন। পূর্ব্বে সিবিল ও মিলিটরি বিভাগ স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহার অধীনে ঐ দুই বিভাগ এক হইয়া গেল। ছোট বড় সকলকেই তিনি এই উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন,—"গৃহ বিবাদ ও আত্মবিচ্ছেদ না হয়। স্বদেশ উদ্ধার কল্পে সকলে মিলিয়া এক হওয়া চাই।" ইতিপূর্ব্বে মুসে থিয়ার্স বিদেশীয় রাজার সাহায্য প্রার্থনার জন্য বিলাত, পিটারবরো, বিয়ানা ও ফ্লোরেন্স নগরে গমন করেন। সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য জুনে ফেবারের ও কাউণ্ট বিস্মার্কের নিকট পাঠান হয়। ইঁহারা উভয়েই যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, এ ধারণা গাম্বেতার মনে পূর্ব্ব হইতেই জন্মিয়াছিল। যাহাদের সামান্য-রূপ বিষয়বুদ্ধি আছে তাহারাও একথা সহজে বুঝিতে পারে যে, লোকে সহজে আপন লাভের অংশ ছাড়িতে চাহে না। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্যজন্তুগণ কি কখনও আপন শিকারের দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে? কখনও কি শুনিয়াছ, সর্প কবলিত ভেককে উদ্গার করিয়া ফেলিয়াছে? প্রুসী-য়েরা এত অর্থক্ষয় ও রক্তপাত করিয়া যেটুকু সুবিধা করিতে পারিয়াছে তাহা তাহারা কদাপি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা ত স্বার্থশূন্য সন্ন্যাসী নহে যে দুর্জ্জয় বিষয়ভোগের লালসা পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া বাস করিবে।

এসমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া গাম্বেতা সৈনিক বিভাগের সংস্কার ও পুনর্গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নূতন সেনা সংগ্রহ আরম্ভ হইল। নূতন ধরণে তাঁহারা শিক্ষিত হইতে লাগিল। সমরকুশল বীরগণ শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অর্থ চাই। চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। ফ্রান্স ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগের লোকদিগকে সৈন্য, অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করিবার আজ্ঞা হইল। এইরূপে একতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, স্বদেশোদ্ধারের পথ ক্রমে পরিষ্কার হইতে লাগিল।

একদিন মুসে ওরথিয়ার লিখিয়া পাঠাইলেন সেনাপতি কাম্ব্রিল দলবল লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। গাম্বেতা সেই সংবাদে কালবিলম্ব না করিয়া বিসানকনু নগরে যাত্রা করিলেন। কাম্ব্রিলাকে পদচ্যুত করিবার জন্য সকলেই তাঁহাকে পরামর্শ দিল। গাম্বেতা হঠাৎ কোন কার্য্য করিতেন না। সহজে কাহারও অন্ন মারিতেন না। তিনি দোষ সংশোধন করিবার জন্য কাম্ব্রিলাকে প্রথমবার ক্ষমা করিলেন ও এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন পুনরায় ঐরূপ কার্য্য করিলে তাঁহার জবাব হইবে।

এই স্থানে গ্যারিবল্ডীর সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। তিনি এবার গ্যারি-বল্ডীকে সৈন্যসংক্রান্ত কতকগুলি কার্য্যের

ভার দিলেন। তৎপরে গ্যারিবলডী আপন কার্য্যে গমন করিলেন; গাম্‌বেতাও বিসানকন্‌ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পথে শুনিতে পাইলেন চার্টার্স নগর প্রুসিয়ানদের হস্তগত হইয়াছে।

সামরিককৌশল গাম্‌বেতা বিলক্ষণ বুঝিতেন, সুতরাং সকল সেনাপতি তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। প্যারি অবরুদ্ধ—কোনরূপ প্রতিকার না করিলে উহাও শত্রুদের অধিগত হইবে। গাম্‌বেতা স্থিরচিত্তে ইহার সদুপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি একের পর এক করিয়া কতই উপায় স্থির করিলেন কিন্তু তাঁহার সেনাপতিগণের অনভিজ্ঞতা হেতু কোনটিই ফলোপধায়ী হয় নাই, সকলগুলিই ব্যর্থ হইল।

সংবাদ আসিল মেটস্‌বাসীরা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। বেজান নামক কোন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় ইহা সঙ্ঘটন হইয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে গাম্‌বেতা ঘৃতাহুতবহ্নি সম রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তীব্রভাষায় এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন।

"দুরাচার, দুর্বৃত্ত, কুলাঙ্গারগণ সোণার ফ্রান্সকে রসাতলে দিল। ফ্রান্স সিংহিনী; স্বপ্নেও ভাবি নাই, সিংহিনী হইয়া শিবাপদ সেবা করিতে হইবে। আমাদের বড়ই দুঃসময় উপস্থিত, হে স্বজাতিপ্রেমিক, আইস ভাই, দেশ উদ্ধার কর। এ বিপদ কালে সাহস ও বুদ্ধি হারাইলে চলিবে না। আমরা শেষ পর্য্যন্ত দেখিব, ছাড়িব না। প্রতিজ্ঞা করি আইস শত্রুকে কখনও পৃষ্ঠ দেখাইব না। যতক্ষণ আমাদের শরীরে এক বিন্দুও রক্ত থাকিবে ততক্ষণ আমরা যুদ্ধ করিব। আইস ফরাসিবিপ্লবের জয় পতাকা তুলিয়া ধরি।"

এই যুদ্ধকাণ্ডে গাম্‌বেতা আপন বিক্রম ও কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অকাতরে বিপদসাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি মান্‌স, বুর্জে ও বেষ্টায় গমন করিয়াছিলেন। বোঁদো নগরে কার্য্যক্ষেত্র সন্নিবেশিত হইল। হঠাৎ লায়ন্স নগরে এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। গাম্‌বেতা ত্রস্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহানলও তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইল। ফ্রান্সের চারিদিকে দিবারাত্র কামানের বজ্রনাদ হইতেছিল। মৃত নরদেহের স্তূপাকার আকৃতি দেখিয়া সকলের শোণিত শুষ্ক হইয়াছিল। কোথাও বা রক্তের নদী প্রবাহিত হইয়াছিল। এ ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া সহসা ফ্রান্সকে শ্মশান বলিয়া মনে হয়। সমর রাক্ষসের শোণিত পিপাসা সহজে শান্তি হয় না।

এই যুদ্ধ ব্যাপারে গাম্‌বেতা অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেন। তাহাতে তাঁহার কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় কিন্তু মনের সাহস তিলমাত্রও হ্রাস হয় নাই। সকল লোককে তিনি সাধারণত স্ত্রীদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। সমগ্র ফরাসি ভূমি তাঁহার বশ। তিনি তাহাদের উঠিতে বলিলে তাহারা উঠে, বসিতে বলিলে তাহারা বসে। মানব হৃদয়ে এরূপে অধিপত্য বিস্তার করিতে আর কেহ পারে নাই, পারিবেও না।

(৩)

পূর্ব্বদিকে যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল তাহাতে ফরাসিদিগের পরাজয় ঘটে। সেনাপতি বুর্ব্বাকির দোষে সকল উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া গিয়াছিল। এতদিনে গাম্‌বেতার একটী বিষম প্রমাদ লইয়া লোক আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিল। তিনি যে গ্যারিবল্‌ডীকে সেনাপতিত্বে বরণ করেন তাহাতে সকলের মত ছিল না সেই জন্যই তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ। পেঁরো নামক এক ব্যক্তি বলিলেন "গ্যারিবল্‌ডীকে গুরুভার দেওয়াতে ফরাসিজাতির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।"

গাম্‌বেতা ইহা ভাল বিবেচনা করেন নাই। তিনিত জানিতেন গ্যারিবল্‌ডীর দ্বারা কতদূর কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। নিরপেক্ষভাবে বলিতে হইলে ইহা বলা যাইতে পারে যে গ্যারিবল্‌ডী মহৎ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি ৬,০৯০ সেনা লইয়া প্রুসিয়ানদের ৩৫,০০০সেনাকে পরাস্ত করিয়া দিজোঁ উদ্ধার করেন। ছিঃ, ফরাসিরা বড়ই কৃতঘ্ন! পূর্ব্বপ্রদেশে ফরাসিদের পরাজয় হয় বটে, কিন্তু তাহা গ্যারিবল্‌ডীর দোষ নহে। ফরাসিদের কপালের দোষ বলিতে হইবে।

যাহা হউক, ঐ পরাজয়ের পর গাম্‌বেতা অধিকতর সতর্কতার সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। চারিদিক হইতে যে সমস্ত চিঠি পত্র আসিতে লাগিল তাহা প্রায়ই সন্তোষজনক নহে। তাহাতে অশুভ সংবাদই লেখা থাকিত। জুনে ফেবার তাঁহাকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে প্যারি আর অধিক দিন আত্মরক্ষা করিতে অপারগ। কাউণ্ট বিস্‌মার্ক তাঁহাকে যে মর্ম্মভেদী পত্র লেখেন তৎপাঠে তিনি একবারে নিরুদ্যম ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। 'জুনে ফেবার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন," বিলাতি "টাইম্‌স্‌" নামক সংবাদ পত্রে এ কথা প্রকাশিত হয়।

গাম্‌বেতা এক একবার মনে ভাবিতেন জুনে ফেবার এ গর্হিত কর্ম্ম কখনই করিবেন না। ইহা কাউণ্ট বিস্‌মার্কেরই কূট ফন্দি মাত্র। কিন্তু যখনই এই সব কথা মনে পড়িত—প্যারির সঙ্কটাপন্ন অবস্থা,সেনাপতি একুর পদচ্যুতি, নবসেনেট সভার নির্ব্বাচন, সভাসমিতির স্বাধীনতা লোপ, আজা ও হোতেল্-দি-ভিল্লির আক্রমণ—তখনই তিনি নৈরাশ্যসাগরে ডুবিয়া যাইতেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ফরাসি জাতির মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ কীট প্রবেশ করিয়াছে—তাবৎ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন একতা পাশ ছিন্ন হইয়াছে। কাচ ভাঙ্গিয়াছে, আর জোড়া লাগিবে না।

তিনি জুনে ফেবারকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে সকল মিথ্যা রটনা শুনিতে পাই তাহাতে আমার তিলার্দ্ধ বিশ্বাস হয় না। আপনি এ ঘৃণিত কার্য্য করিতে কখনই অগ্রসর হন নাই। যে সকল সেনাপতি অকর্ম্মণ্য ও ভীত, তাহাদের আবশ্যকমত পদচ্যুত করিবেন কিন্তু সাবধান যেন কাহারও প্রতি অবিচার না হয়। প্রাণান্তেও আত্মসমর্পণ করিবেন না। ঘোরতর সংগ্রাম

করিতে ত্রুটি করিবেন না। পরিশেষে যাহা হয়, হইবে।”

হতাশ প্যারিবাসীদের উৎসাহিত করিবার মানসে এই কথা লেখেনঃ——

“এ নিদারুণ সংবাদে আমি বজ্রাহতসম হইয়াছি, এই কি তোমাদের কায? লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইল। এ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত সর্ব্বথা নিষ্প্রয়োজন। হে, স্বদেশহিতৈষিগণ, মাতৃভূমি উদ্ধার কর—নিরুৎসাহ হইও না।”

পরিশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি সমর সচিবের ভার মুসে লিক্রোর স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া আপনি কার্য্য হইতে অপসৃত হইবার চেষ্টা করিলেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

শ্মশান।

মান, গর্ব্ব, অহঙ্কার যেখানে বিলয়
যে স্থানেতে রাজা প্রজা সকলি সমান।
শত শত বরষের স্মৃতির আকর
নিভৃত জীবন্ত সত্য এই সে শ্মশান॥
যেখানে শুকা'য়ে গেছে শত অশ্রুধার
প্রেম, বল ঐশ্বর্য্যের যথা অবসান।
শত শত বরষের গুপ্ত ইতিহাস
যেখানে অঙ্কিত ভস্মে এই সে শ্মশান॥
ধন, বল ঐশ্বর্য্যের অসার গৌরব
হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার পশে না হেথায়।
যত কেন বড় তুমি হও না সংসারে
এখানে প্রভেদ নাই তোমায় আমায়॥
এখানেই জীবনের সত্যের প্রচার
এখানে কঠোর সত্য হয় অভিনয়।
যদিও ফেলেছি অশ্রু হেথা কতবার
তবু ভালবাসি এই স্থান পুণ্যময়॥
জেগে ওঠে এইখানে স্মৃতি অতীতের
প্রেম, ভক্তি, স্নেহ কবে দে'ছি বিসর্জ্জন।
কোন্ দিন্ ফেলিয়াছি অশ্রু কার তরে
ভেঙ্গে গেছে কবে কোন্ জাগ্রত স্বপন॥
যদিও গিয়াছে হেথা স্নেহ, ভক্তি, প্রেম
জ্বালাইয়া চিতা সহ হৃদয়ে অনল।
তবু ভালবাসি এই ভীষণ শ্মশান
—তাদের জীবন্ত স্মৃতি এখানে কেবল॥
ভেঙ্গে যায় মোহ-নিদ্রা আসিলে হেথায়
সংসারের মায়া হেথা ভুলি কিছুক্ষণ।
এখানেই দিব্য চোকে পাই দেখিবারে
এ সংসার বাস্তবিক জীবন স্বপন॥
সহস্র প্রাণীর ভস্ম অঙ্গেতে মাখিয়া
কত কাল হ'তে ধ্যানে আছে নিমগন।
বিন্দু বিন্দু ভস্ম মাঝে, হে শ্মশান! তব
রহিয়াছে অতীতের কত বিবরণ॥
বিস্তার করিয়া অঙ্ক র'হেছ বসিয়া
ধনী কি নির্ধন কভু কর না বিচার!
যে যায় তাহাঁকে তুমি লও সমাদরে
তব কোল সবাকার সম অধিকার॥
ভালবাসি সমদর্শি তাই হে তোমায়
তাই হেথা আসিলেই চায় মোর মন।
না বিসর্জ্জি—আর স্নেহ-ভক্তি ভালবাসা
তব কোলে চিরতরে করিতে শয়ন॥

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।

নিরাশ-সঙ্গীত।

১। ভৈরবী—মধ্যমান।

ভুলে যা ভুলে যা রে মন।
বৃথা আশে, কেন মিছে, ভাব সে বিধুবদন।
সে যে দেবী অমরার, তুমি নর এ ধরার,
শতেক যোজন দূর, কেমনে হ'বে মিলন॥

২। সিন্ধু—মধ্যমান।

ভাবিলে কি আছে বল ফল।
ভাবনা যাতনা আনে সার আঁখি-জল।
তারে যে পা'বার নয়, কেন মিছে ভাব তায়,
সমানে মিলন হয়, অসমানে সুবিরল;—
ভুলে যাও—জনম-শোধ, সে দুটি আঁখি-কমল॥

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মহাযজ্ঞের নিমন্ত্রণ—ভারতী হইতে পুনর্মুদ্রিত।—এই পুস্তকখানি স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই পাঠ করা উচিত। ইহার ভাষা যেমন তেজস্বিনী, ইহার ভাবও তেমন উচ্চ। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা ও ভরশা দুঃখপ্রপীড়িত ভারতের ঘনতমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশের বালসূর্য্য, আমাদের আদরের মহাযজ্ঞে (congress) দুঃখকাতর স্বদেশবাসীর উচ্ছ্বসিত তূর্য্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া কাহার হৃদয় না উৎফুল্ল হয়? আমাদের ইচ্ছা, পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত এই পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া প্রাণের গভীর কামনা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত করি। ইহার যেস্থান পাঠ করিয়াছি তাহাতেই মুগ্ধপ্রায় হইয়াছি। উদাহরণ স্বরূপ একটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া লিপি সার্থক করিলামঃ—

"যিনি স্বদেশের দুরবস্থা একদিনের জন্যও ব্যথিত হৃদয়ে নির্জ্জনে চিন্তা করিয়াছেন, স্বজাতির দুর্গতির বিষয় আলোচনা করিয়া যিনি ক্ষণকালের জন্যও দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে লোকচক্ষুর অগোচর মর্ম্মস্থল হইতে, ধীরে ধীরে জলন্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাশায় চক্ষুজল মোচন করিয়াছেন, তাঁহারা এই সময়ে মাতৃপূজার জন্য

বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন—যে মায়ের এত কোটী সন্তান তাঁহার পূজার কিসের ভাবনা? যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা তিনি তদনুরূপ উপকরণ লইয়া মাতৃ-পূজার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসুন। অর্থ, উপদেশ বা ব্যবস্থা এবং শারীরিক পরিশ্রম যাহা যাঁহার সাধ্যায়ত্ত, তিনি অযাচিতভাবে অকাতরে তাহাই দান করিয়া যোড়শোপ-চারে জননীর পূজার যথাবিধ অনুষ্ঠান করুন। আর বঙ্গদেশের আশা ও গৌরবের স্থল, লক্ষ্মীর বরপুত্র সদৃশ ধনশালী মহা-শয়গণ, আপনারাও কি এ সময় নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম থাকিবেন? এই মহাসুযোগে আপনারাও কি মাতৃপূজায় মুক্ত হস্তে যথা-সাধ্য অর্থ দান করিয়া আপনাদের ধন-গৌরবের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন না? আপনাদের পুঞ্জীকৃত অর্থ কত দিকে অজস্র-ধারে ব্যয়িত হইতেছে—অসার আমোদ প্রমোদ,ভোগবিলাস এবং সাংসারিক ক্রিয়া-কলাপে আপনারা কত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন, আর স্বদেশের অক্ষয় সুখ-শান্তির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাযজ্ঞে আপনার যথাসাধ্য অর্থদান করিতে কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইবেন, একথা মনে হইলেও হৃদয় বড়ই ব্যথিত হয়। স্বদেশের দুর্গতি নিবা-রণ ও স্বজাতির মঙ্গলসাধন জন্য যে অর্থের কিয়দংশ প্রদত্ত না হইল,তাহার প্রকৃত সদ্ব্য-বহার আর কোথায়? কয় দিনের জন্য এ সংসার? কয় দিনের জন্য এই অসার সংসারের ধুলাখেলা? চিরদিন কেহ কখনই জীবিত থাকিয়া পার্থিব ধনমানের সম্মোহন কুহক উপভোগ করিবে না। পৃথিবীতে কত কত ধনকুবের মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া ভোগবিলাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক কে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন, আর তাঁহা-দের চিহ্নমাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না। কত সোণার সংসার নিয়তিচক্রের অমোঘ সংঘ-র্ষণে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে—যাঁহারা সেই সকল সংসারের শোভা ও সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, আজি তাঁহাদেরই বংশধর-গণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দীনবেশে পরের অনু-গ্রহের উপর নির্ভর করিয়া কথঞ্চিৎ স্ব স্ব পরিবারবর্গের উদরান্ন সংস্থান করিতেছে। চিরদিন কাহারও সমান যায় না, এবং ধন, মান, প্রভুতা ও পদমর্য্যাদা কখনই কাহারও চিরস্থায়ী নহে; একমাত্র কীর্ত্তিই এ জগতে অবিনশ্বর। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি;" যিনি এই মৃত্যুর জগতে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া যাইতে পারেন, তিনি মরিয়াও চির-কাল জীবিত থাকেন—অমর ইতিহাস উজ্জ্বল সুবর্ণাক্ষরে চিরদিন তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ ঘোষণ করিতে থাকে। স্বদেশের সেবা ও স্বজাতির কল্যাণ সাধনের ন্যায় পুণ্যকার্য্য ও পুণ্যকীর্ত্তি এ জগতে আর কি আছে।"

উন্মাদিনী।—প্রথম ভাগ। শ্রীপশুপতি মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৸০ বার আনা। ৬০ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট ও ৭০ নং কলেজ ষ্ট্রীটে ন্যাশান্যাল লাইব্রে-রীতে পাওয়া যায়।

উন্মাদিনী সামাজিক উপন্যাস। গ্রন্থ-কারের মতে উন্মাদিনী পুস্তকের নায়িকা—ইনি এক গৃহস্থের বড় বউ—প্রিয়মাধবের স্ত্রী। প্রিয়মাধবেরা তিন ভাই ও এক ভগ্নি।

প্রিয়মাধব তার মার রোজগারে ছেলে; রাধামাধব ও বিন্দুমাধব দুই জনেই বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে যায়। রাধামাধব চাকুরি করিবার উপযুক্ত; বিন্দুমাধব অতি বালক। প্রিয়মাধবের পিতা তারাচরণের মৃত্যুর পর প্রিয়মাধবের মা করুণাময়ী অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। করুণাময়ীর গাত্রের অলঙ্কার ভিন্ন এমন কোন বিষয় ছিল না যাহাতে তিনটী অপোগণ্ড বালককে মনুষ্য করিতে পারেন। তাঁহার একমাত্র ভরসা প্রিয়মাধব; প্রিয়মাধব তখন একটু বড় হইয়াছে। তাহাকে লেখা পড়া ভাল করিয়া শিখাইতে পারিলে তাহার আর সংসারের কষ্ট থাকিবে না। তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইতে করুণাময়ী সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, এমন কি, হাতের বালা দুগাছিও বেচিতে হইয়াছিল। করুণাময়ী বালকদিগের লেখা পড়া শিখাইবার জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহেন, বিশেষ প্রিয়মাধবের জন্য, কারণ,প্রিয়মাধব এখন একটু মাথাধরা হইয়াছে—করুণাময়ীর এখন তিনি আশা ভরসা।

প্রিয়মাধব বেশ লেখা পড়া শিখিল, দশটাকা বেশ আনিতে লাগিল। করুণাময়ীর আনন্দের সীমা নাই। প্রিয়মাধব আবার সংসার বজায় করিবেন। চণ্ডীমণ্ডপের চালে আবার খড় পড়িবে। পাড়ার দশজন আসিয়া তাঁহার বাড়ী সরগরম করিবে। তারাচরণের কীর্ত্তি আবার বজায় হইবে। করুণাময়ীর আবার যে সুখের সংসার আবার সেই সুখের সংসার হইবে, না হইবে বা কেন? রাধামাধবও এখন চাকুরি করিবার উপযুক্ত হইয়াছে। বিন্দুমাধব পড়িতেছে তিন জনে মানুষ হইলে করুণাময়ীর সংসার কি সুখের সংসার হইবে না? কিন্তু তাহা হইল কই, করুণাময়ীর শান্তির সংসারে হঠাৎ এক খণ্ড মেঘ দেখা দিল—উন্মাদিনীর উন্মত্ততায় প্রিয়মাধবের মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইল। উন্মাদিনী বুঝিলেন, আমার স্বামী খাটিয়া খুটিয়া পয়সা আনে আর এরা দুভায়ে বসিয়া খাইবে, বিন্দুমাধব বালক ওর কথা তত ধরা হইতেছে না, কিন্তু রাধামাধবের কি এখনও বসিয়া খাওয়া উচিত! তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, বউ বড় হইয়াছে, এখন তাহার দাদার অন্ন ধ্বংস করা কি কর্ত্তব্য। আর করুণাময়ী,তাহার শাশুড়ীই বা কিরূপ। বড় ছেলে রোজগারে আর বড় বউকে কি অত করে খাটান অত করে বকা উচিত। উন্মাদিনী চতুরতায় বিদুষী, স্বামী সুপণ্ডিত; অমন সুপণ্ডিতকে বুঝাইতে তাহার মস্তিষ্ক বিলোড়িত করিতে উন্মাদিনীর ন্যায় রমণীর কতক্ষণ যায়? দুই এক দিনের ভিতর সমস্ত ঠিক হইল;—প্রিয়মাধবের মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ সমস্তই ঘুরিয়া গেল;—তিনি বেশ বুঝিলেন, একা লইয়া সংসার, কেহই কাহার নহে, আমি কাহারও নহি।

যাহাই হউক এ সকল কথা কিরূপ করিয়া তিনি মার নিকট তুলিবেন, প্রিয়মাধব খাইতে বসিয়াছেন মা কাছে বসিয়া খাইতেছেন, প্রিয়মাধব কথায় কথায় মাকে বলিলেন, "এত বড় সংসার একজনের আয়েত আর কুলায় না, আরাম আছে ব্যায়ারাম আছে" করুণাময়ী বলিলেন,

"আমিত বাবা অনেক দিন থেকে বলে আস্ছি যে আর পড়ে শুনে কি হবে, রাধামাধব রোজগারের চেষ্টা দেখুক।" প্রিয়মাধবের মনস্কামনা সফল হইল, উন্মাদিনীর উন্মত্ততার বেগ আরো বাড়িল। রাধামাধবের চাকুরি হইল,দুটাকা উপায় করিতে লাগিল। কিন্তু রাধামাধবের স্ত্রী করুণাময়ীর সাধের ক'নে বউ কিছু চাপা, কিছু বেশী শেয়ানা, সে তাহার মনের কথা কাহাকেও জানিতে দেয় না। সে উন্মাদিনীর ন্যায় উন্মাদ নহে। শাশুড়ির সহিত বকাবকি হইলেই একটু বাড়াবাড়ি দেখিলেই বাপের বাড়ি কলিকাতায় চলিয়া আসে আবার দুই দিন বাদে গোল চুকিয়া যাইলে শশুর বাড়ী উপস্থিত হয়। ক'নে বউএর বাপ বড় মানুষ। বড় মানুষের যেরূপ হইয়া থাকে ক'নে বউ সেইরূপ অথচ করুণাময়ীর প্রিয় মেজ বউ উন্মাদিনীর চক্ষুঃশূল। করুণাময়ী তাহাকে ভাল বাসেন বলিয়া উন্মাদিনীর তিনি চক্ষুঃশূল। উন্মাদিনী কথায় কথায় প্রায় বলিতেন উনি আমাদের দেখিতে পারেন না, ওঁর প্রাণ মেজ বউ। কিন্তু প্রমোদিনী, করুণাময়ীর ক'নে বউ, কি করুণাময়ীকে ভাল বাসেন? অন্তত করুণাময়ী তাহাই মনে করিতেন— পরে জানিতে পারিলেন সব মিছা—যতদিন ক'নে ছিল ততদিন। মেজ বউ হইয়াই নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। করুণাময়ীর আশা ভরসা সমস্তই নির্ম্মূল হইল—সেই এক খণ্ড মেঘ ক্রমে ঝড়ে পরিণত হইল। করুণাময়ীর আবার যে সংসার সেই সংসার, তাহা অপেক্ষা বরং আরও কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল,তাঁহার সংসারে তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিল, তাঁহার কন্যা প্রফুল্লময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাশী যাত্রা করিবেন স্থির করিলেন। আর বালক বিন্দুমাধব— তাহার কষ্টের ইয়ত্তা নাই। বিদ্যালয়ে যায়, পড়া হয় না—পড়া হইবে কোথা হইতে? দাদার ছেলেকে পড়াইতে, বাজার করিতে আর দাদার ছেলের ঘোড়া হইয়াই পড়িবার সময়টুকু কাটিয়া যায়। ভাল করিয়া খাইতে পায় না—পাইবে কোথা হইতে—মার নিকট আর টাকা নাই এখন তিনি অর্থহীন নিঃসম্বল। করুণাময়ী মনে করিয়াছিলেন, বালক বিন্দুমাধবকে তাহার ভগ্নীর বাড়ীতে রাখিয়া কাশী যাত্রা করিবেন কিন্তু প্রিয়মাধব তাহা করিতে দিলেন না তাহাতে তাঁহাদিগের মাথা হেঁট্ হইবে— ছি, এমন কাজও কি করিতে দিতে আছে! তাহা হইলে বাজার করিবে কে? বিন্দুমাধবের কষ্টের ইয়ত্তা রহিল না। বিন্দুমাধব কিছু দিন পর নিরুদ্দেশ। করুণাময়ী ঘোষেদের বাড়ী কিছুদিন রন্ধন বৃত্তি করিয়া তিনিও নিরুদ্দেশ—পুস্তক এই খানেই সমাপ্ত।

প্রিয়মাধবের সংসার ও বাঙ্গালা শিক্ষা নবীন কালীপ্রসন্নের সংসার পরস্পর এই দুইটীর ভেদাভেদ বেশ সুন্দর হইয়াছে। একটী দুঃখের অপরটী সুখের। চরিত্র গুলিও বেশ আঁকা হইয়াছে। আজ কাল যে অনেক বাঙ্গালির গৃহস্থ পরিবার অশান্তিময় দেখা যায়—উন্মাদিনী তাহারই বা এক পরিচ্ছেদ। "উন্মাদিনী" পাঠে বাস্তবিকই প্রীত হইয়াছি।

ক্ষুদ্র গীতাবলী।—ক্ষুদিরাম রায় বিরচিত। এরূপ গ্রন্থের সমালোচনা করা

বড় কঠিন। সত্য কথা বলিতে গেলে গ্রন্থকারের কোপে পড়িতে হয়, আর অসত্য প্রশংসা করিলে গ্রন্থকারের মস্তিষ্ক খারাপ করা হয় ও বঙ্গসাহিত্যের অশেষ অনিষ্ট সাধন করা হয়। এ সকল ক্ষুদ্র গীতাবলীর সমালোচনা না করাই ভাল। দুটী একটী গীত ভাল থাকিতে পারে,কিন্তু অধিকাংশই সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে। মিষ্টান্নের, বসনের, পয়সার, চাকরীর, কলিকালের ইত্যাদি গীতে পুস্তিকা পূর্ণ।

পদ্য-নীতি। ২য় ভাগ।—শ্রীসানুকূল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।—পুস্তক খানির নামকরণ উত্তম হইয়াছে বলিতে পারি না। গ্রন্থকারের ইচ্ছা; "পদ্যপাঠে নীতিশিক্ষা হইবে এবং সেই সঙ্গে বালক-বালিকাগণ কবিতার রসাস্বাদন করিবে।" জানি না, সে ইচ্ছা কতদূর ফলবতী হইয়াছে। তবে কবিতাগুলি নিতান্ত মন্দ বোধ হয় নাই; রচয়িতার ভাষা আর একটু সরল হইলে ভাল হইত। যাহা হউক "সীতা-নির্ব্বাসন" নামক কবিতাটি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

বিকাশ।—শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু কর্তৃক ২১৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা।

'বিকাশ' একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। ক্ষুদ্র হৌক, কিন্তু ইহা আজি-কালিকার অনেক প্রকাণ্ড"কাব্যি" অপেক্ষা সারবান্ ও প্রীতিকর। ইহার কয়েকটি কবিতা সাময়িক-'ছাঁচে' ঢালা হইলেও, তাহাতে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার ভাবিতে জানেন, ভাবাইতে জানেন। "বিকাশ" এর 'উপহার' শীর্ষক কবিতাটিতে তাঁহার কবিত্বশক্তির বিশিষ্টরূপ বিকাশ দেখা গিয়াছে। প্রায় সকল কবিতাগুলিই সুভাবপূর্ণ ও মনোহর। এই নব-কবি কাব্য-জগতে বিকশিত হইলে আমরা সুখী হইব।

সাহিত্য-সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড।] চৈত্র, ১২৯৭। [দ্বাদশ সংখ্যা।

আর্য্য-ধর্ম্ম।

২

এই জগতে আমরা তিনটি মাত্র পদার্থ লক্ষ্য করি:—একটির নাম ঈশ্বর, অপরটির নাম জীব এবং তৃতীয়টির নাম জড়। ঈশ্বর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। জড়পদার্থের ন্যায় ঈশ্বরের জড়ময় আকার নাই বলিয়া তিনি আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়েন না এবং তন্নিমিত্তই লোকে ও বেদে তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া থাকেন। তিনি নিরাকার হইয়াও পূর্ণ-শুদ্ধ-চৈতন্যানন্দময়-নিত্য-বিগ্রহবান্; তিনি আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা। তাঁহার ইচ্ছাতেই জীবের মঙ্গল ও অমঙ্গল। তিনি নিজ আনন্দময় ধামে নিত্য বিরাজিত। বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি সমন্বিত জড়-শরীরধারী আত্মবস্তুই জীব। ইচ্ছাশক্তি ও বিচারশক্তি বিহীন অপেক্ষাকৃত স্থূল বস্তুর নাম জড়। সংসারসুখ জীবের নিত্য সুখ নহে; উহা ক্ষণস্থায়ী। ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন—প্রিয়কার্য্য দ্বারাই জীব তদীয় নিত্যধাম লাভ করিয়া নিত্যানন্দ অনুভব করেন। জ্ঞানোদয় হইলেই জীবের ঈশ্বরতুষ্টিসাধনের জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত। কারণ, বিষ-

বাহুল্য বশতঃ বৈকল্যের সম্ভাবনাই অধিক। যাহা প্রথম অবস্থা হইতে অভ্যস্ত হয়, তাহাই স্বভাব হইয়া পড়ে। সুতরাং মৃত্যু-কালেও ঈশ্বরস্মৃতি ঘটে না।

ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন বিষয়ে মনুষ্যের মানসিক বৃত্তি অনুসারে চতুর্ব্বিধ চেষ্টা দৃষ্ট হয়; ভয়, আশা, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও অনুরাগ। যাঁহারা ইহলোক-দুঃখভয়ে বা পরলোক-দুঃখভয়ে ঈশ্বরোপাসনা করেন, তাঁহাদিগের যত্নই ভয়প্রযুক্ত। যাঁহারা ইহলোক-সুখের জন্য বা পরলোক-সুখকামনায় ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের প্রবৃত্তিই আশাজন্য। যাঁহারা স্বকীয় সুখভোগের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ ঈশ্বরোপাসনা-পরায়ণ হয়েন, তাঁহাদিগের সেই যত্নই কর্ত্তব্যজ্ঞান-সমুত্থ। আর যাঁহারা ঈশ্বর-চিন্তামাত্র তাঁহাতে অনুরক্ত হয়েন, তাঁহা-দিগের সেই উপাসনাই অনুরাগোত্তেজিত। ভয়, আশা বা কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে যে ঈশ্বরাভিমুখী প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা বিশুদ্ধ নহে, কিন্তু অনুরাগজন্যা প্রবৃত্তিই বিশুদ্ধা। সচরাচর না হইলেও যাঁহার যখন এই শেষোক্ত প্রবৃত্তির উদয় হয়, তিনি তখন সংসারে বিরাগী হয়েন। তিনিই প্রকৃত নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী। কোথাও বা পূর্ব্বোক্ত আচরণত্রয় হইতে এই অধিকার জন্মে, কোথাও বা স্বভাবতই জন্মে। ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট। ইহাদিগের মধ্যে কাম্যকর্ম্মের জনক ভয়, ও আশা অনুরাগের বিরোধী বলিয়া নিতান্ত হেয়; নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের জনক কর্ত্তব্য-জ্ঞান হেয় হইলেও আশ্রয়ণীয়। কর্ত্তব্য-জ্ঞান হইতে বিধির সন্ধান ও অবিধির পরিত্যাগের প্রতি যত্ন হয়। তাদৃশ যত্ন হইতে অনুরাগের উৎপত্তির সম্ভাবনাই অধিক।

পূর্ব্বোক্ত বিধি আবার দ্বিবিধঃ—মুখ্য ও গৌণ। নিবৃত্তিমার্গোক্ত বিধির নাম মুখ্য বিধি এবং প্রবৃত্তিমার্গোক্ত বিধির নাম গৌণ বিধি। যে বিধি ঈশ্বরের প্রিয়সাধনরূপ জীবের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য অব্যবহিত ভাবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লক্ষ্য করে, তাহার নাম মুখ্য বিধি এবং যে বিধি উহাকে অন্য ব্যবধানের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধে লক্ষ্য করে, তাহার নাম গৌণ বিধি। নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোপাসনাতেই মুখ্য বিধির প্রয়োগ এবং সকামভাবে ঈশ্বরোপাসনাতেই গৌণবিধির প্রয়োগ। যে কার্য্যের লক্ষ্য কেবল ঈশ্বর-প্রীতি তাহাই নিষ্কাম এবং যে কার্য্যের লক্ষ্য ঈশ্বরপ্রীতি হইলেও তদভ্যন্তরে ঈশ্বর-প্রীতিসাধনের সহায় স্বরূপ জড়শরীর, লিঙ্গ-শরীর, সমাজ ও আত্মার উন্নতিও অবান্তর ফলস্বরূপে কামনীয় হয়, তাহার নামই সকাম।

নিবৃত্তিমার্গোক্ত অধ্যাত্ম বিধি বা মুখ্য-বিধির কোনরূপ ভেদ নাই। প্রবৃত্তিমার্গোক্ত গৌণবিধি দ্বিবিধ; জননিষ্ঠবিধি ও সমাজ-নিষ্ঠবিধি। জননিষ্ঠবিধিও আবার স্থূল-শরীরনিষ্ঠ ও সূক্ষ্মশরীরনিষ্ঠ ভেদে দ্বিবিধ। স্থূলশরীরনিষ্ঠ বিধি স্থূলশরীর রক্ষার্থ আয়ুর্ব্বেদাদি হইতে আলোচনীয়। সমাজ-নিষ্ঠ বিধিও দ্বিবিধঃ—বর্ণবিধি ও আশ্রম-বিধি। উক্ত বিধিদ্বয় সমাজরক্ষার্থ স্মৃতি-শাস্ত্র হইতে আলোচনীয়। সমাজান্তর্গত

ব্যক্তিগণের স্বভাব অনুসারে বর্ণ বিধি এবং অবস্থান অনুসারে আশ্রমবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মানবের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল অনুশীলন ক্রমে উন্নত হইয়া একটি স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় যে প্রবৃত্তি অন্য সমস্ত প্রবৃত্তির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে, সেই প্রবৃত্তিই মানবের স্বভাব। ঐ স্বভাব চতুর্ব্বিধঃ—ব্রহ্মস্বভাব ক্ষত্রস্বভাব, বৈশ্যস্বভাব ও শূদ্রস্বভাব। মানবের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি হইতে এই চারিটি স্বভাব উদিত হয়। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি হইতে যে স্বভাব উদিত হয়, তাহার নাম অন্ত্যজ স্বভাব। ঐ স্বভাব সত্বর সংশোধনীয় নহে; উহা সংশুদ্ধ হইতে বহু জন্ম অপেক্ষা করে। অধিকার অনুসারে মানবের অবস্থানও চতুর্ব্বিধঃ—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ বিধিই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলসাধনের নিদান। উহাদের পালনই ধর্ম্ম এবং অপালনই অধর্ম্ম। যে সকল কর্ম্ম দ্বারা মঙ্গল হয়, তাহাদের নাম পুণ্য কর্ম্ম বা ধর্ম্ম এবং যদ্দ্বারা অমঙ্গল হয়, তাহাদের নাম পাপ কর্ম্ম বা অধর্ম্ম।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভারতসমাজের উপকারার্থ উৎপন্ন হইয়াও পূর্ণাবস্থায় সংস্থাপিত হইয়াও অবশেষে অস্বাস্থ্য নিবন্ধন একণে দিন দিন প্রভূত অবনতির কারণ হইতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

বিজ্ঞানালোচনার পরিপক অবস্থায় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সংস্থাপিত হয়। তখন মনুষ্য স্বভাব বা যোগ্যতা অনুসারে বর্ণ ও আশ্রম লাভ করিতেন এবং তদনুসারে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তন্নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতেন। তৎকালে একণকার ন্যায় বংশমর্য্যাদাই সর্ব্বস্ব ছিল না। সেই সময়ে যাঁহার পিতার কোন বর্ণ ছিল না তাঁহাকে কেবল স্বভাব দ্বারা বর্ণভুক্ত করা হইত। জাবালি, গৌতম, জানশ্রুতি ও চিত্ররথের বৈদিক ইতিহাস তাহার প্রমাণ। যাঁহার পিতার বর্ণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাঁহার সম্বন্ধে স্বভাব ও বংশ উভয় বিষয়েই দৃষ্টি পূর্ব্বক বর্ণ নিরূপিত হইত। নরিষ্যন্ত বংশে অগ্নিবেশ্য স্বয়ং জাতুকর্ণ নামে মহর্ষি হয়েন এবং তাঁহার বংশে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুলের উৎপত্তি হয়। ঐলবংশে হোত্রক পুত্র জহ্নু ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ভরতবংশে ভরদ্বাজের (যাঁহার নাম বিতথ রাজা) গোত্রে নরাদির সন্তান ক্ষত্রিয় ও গর্গের সন্তান ব্রাহ্মণ হয়েন। ভর্ম্যশ্ব রাজার বংশে মৌদ্গল্যগোত্রীয় শতানন্দ কৃপাচার্য্য প্রভৃতি জন্মলাভ করেন। কিন্তু কালক্রমে সকলই নষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মস্বভাববিহীন ব্রাহ্মণের দোষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বিলুপ্ত হইল। ক্ষত্রস্বভাববিহীন ক্ষত্রিয় সকল যুদ্ধে অপারগ হইয়া রাজ্যচ্যুত ও অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক হইয়া পড়িল। বণিকস্বভাববিহীন বৈশ্যেরা জৈনাদিধর্ম্মের প্রচারে প্রবৃত্ত হইল এবং শূদ্রস্বভাববিহীন শূদ্র সকল যথেচ্ছাচার অবলম্বন করিল। বেদাদিশাস্ত্রের চর্চ্চা ক্রমশঃ রহিত হইল; দেশ ম্লেচ্ছের অধিকারে ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিল।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।

ত্যক্তস্বধর্ম্মাঃ রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজা ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজা শূদ্রতাং গতাঃ ॥

মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্ম।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ ॥

মনুসংহিতা ১০ অধ্যায়।

এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ॥
ব্রাহ্মণো বাপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎসৃজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ ॥
কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনং ॥
স্বভাবং কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রোঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ ॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং ॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি ॥
ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ ॥
এতৎ তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেৎ দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাৎ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে ॥

মহাভারতীয় আনুশাসনিক পর্ব্ব।

উল্লিখিত ও অপরাপর শাস্ত্রীয় বচন সকল পূর্ব্বোক্ত মতেরই পোষকতা করিতেছে; অর্থাৎ আর্য্যসমাজপ্রচলিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অধিকার বিবেচনাতেই প্রবৃত্ত, ইহাই প্রচার করিতেছে। কর্ম্মভেদ ও গুণভেদই বর্ণভেদের কারণ এবং অধিকারভেদই আশ্রমভেদের কারণ। কর্ম্ম ও গুণ অনুসারেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যের বৈশ্যত্ব ও শূদ্রের শূদ্রত্ব। কর্ম্ম ও গুণ ব্রাহ্মণত্বাদির কারণ হইলেও বংশ-মর্য্যাদাও অশ্রদ্ধেয় নহে; কারণ, বংশই কর্ম্ম ও গুণের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়। ফলতঃ এই কারণেই আর্য্য ঋষিগণ বর্ত্তমান মহাপুরুষগণের ন্যায় আর্য্যসমাজকে ভাঙ্গিয়া ব্রাহ্মণত্বাদি বর্ণভেদ বিলুপ্ত করিয়া উচ্চনীচ ভেদ রহিত করিয়া আর্য্যসমাজকে ম্লেচ্ছাদির সহিত সমতল ক্ষেত্রে পরিণত করণের পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মবিহীন ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ্যসম্মান ক্ষাত্রাদিধর্ম্মবিহীন ক্ষত্রিয়াদিকে ক্ষত্রিয়াদিসম্মান প্রদান না করিয়া তদ্বৈপরীত্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাচারী ক্ষত্রিয়াদিকে ব্রাহ্মণ্যসম্মানাদি প্রদান করিলেই কি সমাজের সুরক্ষা হয় না? এইরূপ আচরণই ধর্ম্মনীতির অনুমোদিত এবং ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায়। ফলতঃ এইরূপ আচরণে সমাজের যেরূপ উন্নতি সাধিত হইবে, আর্য্যসমাজকে ভাঙ্গিয়া সমতল করিলে সেরূপ উন্নতি হইতেই পারে না। অধিকন্তু যাহার তুলনায় সমতল করা হইবে, যে পাশ্চাত্য সমাজের সাদৃশ্যে আর্য্য সমাজকে উচ্চনীচ-ভেদ-বিবর্জ্জিত করা হইবে, সেই সমাজেও কি অন্যরূপ উচ্চনীচ ভেদ নাই? তারতম্যই সমাজের মূল; তারতম্যই সংসারের আশ্রয়। তারতম্য ব্যতিরেকে কিছুই স্থায়ী হইতে পারে না।

এক্ষণে বর্ণধর্ম্মবিহিত ও আশ্রমধর্ম্মবিহিত আচার-পালন-সম্বন্ধে আবশ্যক বোধে কতিপয় বচন আর্য্যশাস্ত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং
অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হ্যসৌ॥
চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥
জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে চ রতঃ সদা।
নাসৌ ফলমবাপ্নোতি কুর্ব্বাণোঽপ্যাশ্রমচ্যুতঃ॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥
ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥

মনুসংহিতা॥

ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনু বলিতেছেন যে, মানবজীবনের বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য এই চারি অবস্থার মধ্যে প্রথম অবস্থায় গুরুসন্নিধানে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থাতে বিবাহ এবং পুত্রোৎপাদনাদি সাংসারিক কার্য্য সকল পালন করিয়া শেষ অবস্থায় বনে গমন পুর্ব্বক মুক্তির জন্য চেষ্টিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

অপরাপর শাস্ত্রও ঐ মতেরই পোষকতা করিয়াছেন,—

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥

শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃতগোভিলস্মৃতি।

ত্রয়েষু লোপকো যশ্চ আশ্রমাদ্বিচ্যুতশ্চ যঃ।
সন্দংশযাতনামধ্যে পততস্তাবুভাবপি॥

বিষ্ণুপুরাণ।

ঋণত্রয়াপাকরণমবিধায়াজিতেন্দ্রিয়ঃ।
রাগদ্বেষাবনির্জ্জিত্য মোক্ষমিচ্ছন্ পতত্যধঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

অনুৎপাদ্য সুতান্ দেবানসন্তর্প্য পিতৄংস্তথা।
ভূতাদীংশ্চ কথং মৌঢ্যাৎ স্বর্গতিং গন্তুমিচ্ছসি

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

চত্বার আশ্রমা ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থপরিব্রাজকাস্তেষাং বেদমধীত্য বেদৌ বেদান্ বা অবিশীর্ণব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেত্ তমাবসেৎ॥

শ্রুতিঃ॥

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম্মচতুষ্টয় যথাবিধি পালন না করিয়াই চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে বিষয়াসক্তি সত্ত্বেও যে ব্যক্তি নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবি। অতএব আশ্রমধর্ম্ম সমূহ যথাবিধি পালনীয়। তবে শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে যে কেবল নিবৃত্তিমার্গাবলম্বনের উপদেশ দৃষ্ট হয় তাহাও অধিকারী বিবেচনায় গ্রাহ্য হইবে।

ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ
গৃহাদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ॥

শ্রুতিঃ।

যস্যৈতানি সুগুপ্তানি জিহ্বোপস্থোদরং শিরঃ।
সন্ন্যসেদকৃতোদ্বাহো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যবান্॥

নৃসিংহপুরাণ।

প্রব্রজেদ্বা ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রব্রজেচ্চ গৃহাদপি।
বনাদ্বা প্রব্রজেদ্বিদ্বানাতুরো বাথ দুঃখিতঃ॥

অগ্নিপুরাণ।

যে ব্যক্তি নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী হইবেন তিনি যে কোন আশ্রম পরিত্যাগ পুর্ব্বক তন্মার্গ অবলম্বন করিতে পারেন। ইন্দ্রিয়সমূহ যাঁর বশে থাকে, তিনি যে কোন আশ্রম পরিত্যাগ পুর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়বর্গ যাঁহার বশে নাই, তিনি শাস্ত্রোক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের ও আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম যথাবিধি যাজন পূর্ব্বক অবশেষে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনগমন

পর অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় যোগে মনোনিবেশ করিবেন।

এক্ষণে এই একটি প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত বচন সমূহে দ্বিজাতির পক্ষেই আশ্রমচতুষ্টয় বিহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং স্ত্রী ও শূদ্রের সম্বন্ধে বিধি কোথায়? ইহার উত্তরে শাস্ত্র ও ঋষিগণ এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, সকলে না হইলেও অধিকাংশ স্ত্রী ও শূদ্র একমাত্র গৃহস্থাশ্রমেরই অধিকারী। তাঁহারা ঐ আশ্রমে থাকিয়াই মুক্তিলাভের উপায় অবলম্বন করিবেন। ইতিহাস ও মুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলেও তাহাই সম্যক্ প্রতিপন্ন হয়। কারণ, যে কালে ঋষিগণ শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, দেশকালপাত্র বিবেচনা করিলে তৎকালীন সাধারণ স্ত্রী ও শূদ্রগণ অপর আশ্রমত্রয়ের অনধিকারী ছিলেন বলিয়াই প্রতীত হয়। বিশেষতঃ তদানীন্তন শূদ্রজাতি এতাদৃশ অসভ্য ও তাহাদিগের সংখ্যাও এত অল্প ছিল যে তাহাদিগের জন্য পৃথক্ বিধিরই আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় নাই। কালক্রমে শূদ্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগের নিমিত্ত কতকগুলি বিধিও অধিকারী ভেদে নির্ণীত হইয়াছে। অধিক কি, তাহাদিগের জন্মজন্মান্তরে ব্রাহ্মণত্ব লাভেরও কথা উক্ত হইয়াছে। যে সকল শাস্ত্র ভবিষ্যৎ্কালকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে স্ত্রী ও শূদ্রের পালনীয় ধর্ম্মও পরিব্যক্ত হইয়াছে। ফলতঃ স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার বিবেচনায় পালনীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা অবসরক্রমে ঐ ধর্ম্ম বিবৃত করিয়া যথাসাধ্য পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ করিতে ত্রুটি করিব না।

মানবজাতি আবার স্বীয় স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে দুইভাগে বিভক্ত; যথা, দৈব ও আসুর। যে সকল মানব বিষ্ণুভক্তিপর তাঁহারা দৈব এবং তদ্ভিন্ন সমস্তই আসুর।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

অগ্নিপুরাণ।

যে মার্গে কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি দৃষ্ট হয়, তাহার নাম প্রবৃত্তিমার্গ, এবং যে মার্গে কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি দৃষ্ট হয় না, তাহারই নাম নিবৃত্তিমার্গ। আসুরবৃত্তি মানব সকল প্রবৃত্তিমার্গের অধিকারী এবং দৈববৃত্তি মানব সকল নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী। নিবৃত্তিমার্গের অধিকারীও আবার তিন ভাগে বিভক্ত; স্বনিষ্ঠ পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। যিনি ভক্তির প্রাধান্য স্থির করিয়া নিষ্কামভাবে ফলোদয় পর্য্যন্ত স্বাশ্রমবিহিত অহিংস্র কার্য্য সকল আচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম স্বনিষ্ঠ অধিকারী; যিনি স্বাশ্রমস্থ হইয়া লোকসংগ্রহকামনায় নানাবিধ অহিংস্র কর্ম্ম করেন, অথচ ভক্তির প্রাধান্য অস্বীকার ও তাহার বিপরীত আচরণ করেন না, তাঁহার নাম পরিনিষ্ঠিত অধিকারী; আর যিনি আশ্রম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইয়া হরিনিরত থাকেন ও কেবল ভগবানের মানসিক অর্চ্চনা করেন, তিনিই নিরপেক্ষ অধিকারী বলিয়া উক্ত হয়েন। নিবৃত্তিমার্গের এইরূপ অধিকারী ভেদও অধিকার

ভেদেই স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত অধিকার ভেদও শক্তি বা গুণের তারতম্য হইতেই হইয়া থাকে।

যাঁহারা দৈবশক্তিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞাদি স্বাধ্যায়, তপঃ, আর্জব, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অখলতা, দয়া, অলোভ, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ, ও অনতিমানিতা এই ষড়্‌বিংশতি গুণ লাভ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা আসুর শক্তিতে জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা দম্ভ অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজিত্ব, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, ও অজ্ঞান এই সকল দোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবং॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলং॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহোনতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীং॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

আর্য্যশাস্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে, এই সংসারে প্রকৃতি অনুসারে সৃষ্টিও ত্রিবিধ; সাত্ত্বিকী, রাজসী, ও তামসী। দেবরূপা বা তৎপরা সৃষ্টির নাম সাত্ত্বিকী বা দৈব সৃষ্টি; যক্ষরাক্ষসরূপা বা তৎপরা সৃষ্টির নাম রাজসী বা আসুরী সৃষ্টি; এবং প্রেতভূতরূপা বা তৎপরা সৃষ্টির নাম তামসী বা আসুরী সৃষ্টি। উক্ত সৃষ্টি-ত্রৈবিধ্য হেতুই সৃষ্ট জীবগণের গুণও ত্রিবিধ হইয়াছে। মুক্তসঙ্গত্ব, অনহঙ্কার, ধৃতি, উৎসাহ ও নির্ব্বিকারত্ব সাত্ত্বিক গুণ। রাগ, ফলেপ্সা, লোভ, হিংসা, অশৌচ, হর্ষ, ও শোক রাজসগুণ। অনবধান, অবিবেক, ঔদ্ধত্য, শঠতা, পরাপমান, আলস্য, বিষাদ ও দীর্ঘসূত্রতা তামসগুণ। এবং তদ্‌গুণানুরূপ আচরণই সাত্ত্বিকাদি কর্ম্ম। বস্তুতঃ ঐ গুণত্রয়ের তারতম্য দর্শনেই ভারতীয় আর্য্যসম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ, দম অর্থাৎ বাহেন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপঃ অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, আস্তিক্য অর্থাৎ ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস এই সকল ব্রাহ্মণের লক্ষণ। শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধনৈপুণ্য, ধর্ম্ম, রক্ষকতাদি নিয়মন শক্তি এই সকল ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। কৃষি, গো প্রভৃতি পশুপালন, বাণিজ্য এই সকল বৈশ্যের লক্ষণ। এবং পরিচর্য্যাত্মক গুণই শূদ্রের লক্ষণ। যিনি যেরূপ স্বভাব লইয়া উৎপন্ন, তিনি সেইরূপ কর্ম্মপথ অবলম্বন করিলে অনায়াসে উন্নতিলাভে সমর্থ হইতে পারেন বলিয়াই আর্য্যসমাজে বর্ণবিভাগ ও অধিকারভেদে আশ্রমাদিবিভাগ হইয়াছে। ঐ সকল বিভাগ না থাকিলে সমাজের সুশৃঙ্খলা থাকে না। সকলেই নিজ নিজ অধিকারে অবস্থান করিলে কোন বিশৃঙ্খলাই ঘটে না। ফলতঃ এই সকল বিভাগ জীবের উন্নতির পক্ষে একান্ত অনুকূল বিবেচনা করিয়াই ঋষিগণ শাস্ত্রমধ্যে ইহাদিগের নিবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা দিব্য-

দৃষ্টিতে ভূত ও ভবিষ্যৎ সন্দর্শন করিয়া যাহা বিধেয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আমরা যদি বিচার না করিয়াই সেই সকল শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আরও অধঃপতিত হইতে থাকিব। বিশেষতঃ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদিগের বর্ত্তমান অধঃপতনের মূলই শাস্ত্রের অমর্য্যাদা ও তদুত্থ অসদাচার।

"আচারো ধর্ম্মমূলং হি।" আচারই ধর্ম্মের মূল। ধর্ম্মই ধারণশক্তি। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে আচার ব্যতিরেকে সমাজের উন্নতির কথা দূরে থাকুক, তাহার রক্ষাও অসম্ভব। "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ। হীনাচারপরীতাত্মা প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি॥" ফলতঃ আচারই পরম ধর্ম্ম অর্থাৎ আচারই সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মূলীভূত। আচারহীন ব্যক্তির ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়। "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ। ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥" ষড়ঙ্গের সহিত অধীত বেদও আচারহীন ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে পারে না। অধিকন্তু উদিতপক্ষ পক্ষীর ন্যায় ঐ বেদ মৃত্যুকালে তাহাকে পরিত্যাগ করে। "আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ। আচারাদ্ধনমক্ষয্যং আচারো হন্ত্যলক্ষণং॥" আচার হইতেই মানবের পরমায়ুর বৃদ্ধি, আচার হইতেই অভিলষিত সন্তান লাভ, আচার হইতেই অক্ষয় ঐশ্বর্য্য ও আচার হইতেই সৌভাগ্য হয়। "দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ। দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোহল্পায়ুরেব চ॥" দুরাচার পুরুষ ইহলোক ও পরলোকে নিন্দিত, দুঃখভাগী, ব্যাধিগ্রস্ত ও অল্পায়ু হইয়া থাকেন। "বেদাঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥" বেদ স্মৃতি সদাচার ও স্ব স্ব আত্মতুষ্টি এই চারিটি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণস্বরূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে। ধার্ম্মিক হইতে হইলে, বেদ ও স্মৃতি অনুসারে কার্য্য করা, যে কার্য্যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, সেই সকল কার্য্য করা ও সদাচারপরায়ণ হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আজ কাল, আর্য্যসমাজে প্রায়ই তাহা দেখা যায় না। এক্ষণে সে আচারও নাই, সে চাতুর্ব্বর্ণ্য আর্য্যসমাজও নাই। যে সদাচারবলে ব্রাহ্মণগণ বিভূতিসমন্বিত, ক্ষত্রিয়গণ বলবীর্য্যবিশিষ্ট, বৈশ্যগণ অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন শূদ্রগণ অক্লান্ত পরিশ্রমী হইয়া আর্য্যসমাজের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও পুণ্য স্রোত অব্যাহত রাখিয়াছিলেন এখন সে সদাচার আর দেখা যায় না। যে আর্য্যসমাজে যাগ, যজ্ঞ, দান ও ধ্যানের নিত্যই উৎসব হইত, যে আর্য্য সমাজের নিত্যনৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শন করিলে নাস্তিকের মনেও ঈশ্বরভাবের উদয় হইত, দেবলোক বা পিতৃলোকাদি মনুষ্যলোকের অতি সন্নিহিত বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে আর সে পারমার্থিক আর্য্য সমাজ নাই। ধর্ম্মসংস্থানে বা ধর্ম্মজীবনোদ্দেশে আর এ সমাজের লোক সকল সমবেত হয় না, পরন্ত বিষয়সংস্থানে ও ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করিবার বাসনায় সমাজের উচ্চশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই এক-

ত্রিত হইতেছে। পূর্ব্বকালে এইআর্য্যসমাজ, যে দেশে চাতুর্ব্বণ্য প্রথা প্রচলিত নাই,জ্ঞান, ধর্ম্ম ও আচারের তারতম্যে যে সমাজে উচ্চ-নীচ গণনা হয়না,যে সমাজে মনুষ্যত্বের বীরত্বের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের প্রতিযোগিতা নাই, পরন্তু যে দেশে জাতীয়তার অভাব, বিষয় বিভব অনুসারে যে সমাজে উচ্চনীচ গণনা, যে সমাজে কেবল বিষয়কোলাহল, বিষয়-প্রতিযোগিতা ও কামোপভোগই পুরুষার্থ, সেই সমুদায় দেশকে ও সমাজকে ম্লেচ্ছ সংজ্ঞা প্রদান করিতেন, কিন্তু আজ সেই আর্য্যদেশ ও সনাতন আর্য্যসমাজ স্বয়ং ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইতেছেন। বর্ত্তমান আর্য্য-সমাজে বৃত্তির স্থিরতা নাই ; সকলেই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন। পূর্ব্বকালে দুষ্কর, দুস্তর ও দুরাপ বিষয়মাত্রই তপঃসাধ্য বিবেচনায় আর্য্যক্ষেত্রে কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্ধন, কি কৃষী কি বণিক সকলেই কায়মনোবাক্যে যথাসাধ্য তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন, কিন্তু এক্ষণে সমাজ-সংস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়াতে সমাজ তপঃসাধনের সম্পূর্ণ অননুকূল হওয়াতে তপোবলের নিদর্শনের অভাবে কেহই আর তপস্তত্ত্বে বিশ্বাসও করেন না এবং তদনু-কূল আচরণও করেন না। এইরূপে তপস্যার পথ রুদ্ধ হওয়াতে নব নব তত্ত্বের আবিষ্কারের পথও রুদ্ধ হইয়াছে। যাহা উন্নতির নিদান তাহা যদি নষ্ট হইল তবে আর উন্নতির সম্ভাবনা কোথায় রহিল ?

যে সদাচার হইতে জীবের উন্নতি, সেই সদাচার শিক্ষার স্থান আশ্রম। ঐ আশ্রম যদিও দেশকালপাত্র ভেদে চারিটি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমই অপর আশ্রম সকলের ভিত্তিস্বরূপ। কারণ, গৃহস্থাশ্রম না থাকিলে কোন আশ্রমই থাকিতে পারে না। মহাত্মা মনু বলিয়াছেন, "যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ। তথা গৃহস্থ-মাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥" গৃহস্থাশ্রম অপরাপর আশ্রমের প্রাণস্বরূপ। সমুদায় সমাজের উন্নতি, অবনতি, ভাবাভাব, সুখ, দুঃখ, গৃহস্থাশ্রমেরই উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ এই দুরন্ত কলিকালে গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রম অনেকের আশ্রয়ণীয়ই হইতে পারে না। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "তপঃস্বাধ্যায়হীনানাং নৃণামল্পায়ুষামপি। ক্লেশপ্রয়াসসক্তানাং কুতো দেহপরিশ্রমঃ। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে। গৃহস্থো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ। এতেষাং সর্ব্ববর্ণানাং আশ্রমৌ দ্বৌ প্রকীর্ত্তিতৌ॥" কলিকালের মনুষ্য হীনবল ও অল্পায়ু, সুতরাং তাঁহারা গৃহস্থ ও ভিক্ষু ভিন্ন অন্য আশ্রমের ধর্ম্ম পালনই করিতে পারেন না। অধুনা গৃহস্থাশ্রমই মানবের একমাত্র শ্রেয়ঃসাধনরূপে অবলম্বনীয় হইলেও নানা মিশ্রমতের আবির্ভাবে গৃহস্থাশ্রমও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পূর্ব্বে গৃহিগণ গৃহস্থাশ্রমের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া প্রতিদিন যে দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ সম্পাদন করিতেন, আজ আর যে শাস্ত্রোক্ত পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান নাই। গৃহস্থাশ্রম যে কেবল ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেন, তাহা নহে ; গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সুষ্ঠু পালিত হইলে

গৃহী স্বাশ্রমস্থ হইয়া মুক্তি পর্য্যন্তও লাভ করিতে পারেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, “ন্যায়ার্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে॥” যে ব্যক্তি ন্যায়তঃ ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ অতিথিপ্রিয় শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও সত্যবাদী হইয়া গৃহে বাস করেন, তিনি গৃহস্থ হইলেও মুক্তির অধিকারী। কিন্তু ইহা অতীব দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে, আমরা সেই মঙ্গলের একমাত্র উপায় গার্হস্থ্য ধর্ম্মও যথাবিধি আচরণ করিতেছি না।

যদিও সে সকল শাস্ত্রও আছে, সেই গৃহস্থ আশ্রমও আছে এবং সেই আর্য্যসমাজও আছে; কিন্তু এক আচার হারাইয়া, যোগবল হারাইয়া, আর্য্যসমাজ, আর্য্য গৃহস্থ দিন দিন অবনত হইতেছেন। পূর্ব্বকালীন আর্য্যগৃহীসকলমন্ত্রবলে, যোগবলে নানাবিধ বিভূতি লাভ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত কালযাপন করিতেন, তাহা স্মরণ করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সে সকল কথা আজি স্বপ্নের ন্যায় উপন্যাসের ন্যায় হইয়াছে। পূর্ব্বকালে গৃহস্থজীবন সুখের ছিল, আজ সেই গৃহস্থ জীর্ণদেহ, ভগ্নমনে, জীবনভার বহন করিতেছেন। ফলতঃ আচারভ্রষ্টতাই উহার একমাত্র কারণ। আচারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াই আর্য্যগৃহী ক্রমশই দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিতেছেন। শাস্ত্রসত্ত্বেও শাস্ত্রবাক্যে ও তদুক্ত আচারে আর কাহারও শ্রদ্ধা দেখা যায় না। আর্য্যগৃহীর নিকট শাস্ত্র এখন আর ব্যবহারিক না থাকিয়া মৌখিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল অধ্যয়নে ফল হয় না; তদনুরূপ আচরণই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অনাচরণীয় শাস্ত্র কি ফল প্রদান করিতে পারে?

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

শান্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শান্তির সহিত সাক্ষাত করিয়া জীবানন্দ চলিয়া গেলে, আমরা দেখিলাম—শান্তি বহুক্ষণ ধরিয়া নির্জ্জনে গম্ভীরভাবে কি ভাবনা ভাবিয়া স্ত্রীবেশ পরিবর্ত্তন করিল। বহুযত্নসংরক্ষিত একটি পুস্তকের পেটিকা খুলিয়া কতকগুলি তুলটের পুঁথি বাহির করিল। অগ্নি জ্বালাইয়া একে একে সমস্ত গ্রন্থগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে, শান্তি সন্ন্যাসীবেশে গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিল। যাইতে যাইতে পথে গাহিতে লাগিল—

দড়বড়ি ঘোড় চড়ি কোথা তুমি যাও রে।
সমরে চলিনু আমি,হামে না ফিরাও রে।
ইত্যাদি

শান্তির এরূপ কার্য্য দেখিয়া আমাদিগের বোধ হইল যেন বহুদিন হইতেই এইরূপ একটা সঙ্কল্প শান্তির হৃদয়ে স্থিরীকৃত ছিল।

শান্তি যাহা করে,তাহা সহসা করে না। ঘটনাও প্রকৃত তাহাই। বহুদিন হইতেই শান্তি জীবানন্দের নিকট যাইতে মনস্থ করিতেছিলেন। তবে এত দিন জীবানন্দের ব্রতচ্যুতি-প্রায়শ্চিত্ত ভয়ে যাইতে পারেন নাই। অদ্য সে ভয় অপসারিত হইল—একবার দেখা শুনায়ও যে প্রায়শ্চিত্ত, বহুবারেও তাহাই। তাই শান্তি আজি জীবানন্দ উদ্দেশে সন্ন্যাসীবেশে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। জীবানন্দের সহিত অদ্যকার সন্দর্শন ইহার এক উত্তেজক কারণ।

পাঠকগণ, একবার শান্তির সঙ্গীতটির প্রতি কর্ণপাত করুন। গান যে সুন্দর তাহা নহে, বরং গান অতি সাধারণই বলিতে হইবে। কিন্তুএই গানে আর একটি বড় সুন্দর রহস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই গানটির বিষয় কেমন স্বাভাবিক। শান্তি ইহাতে একবার তাহার কথা বলিতেছে—আবার জীবানন্দের কথা বলিতেছে। একবার শান্তি সামান্যা রমণীর ন্যায় তাহার জীবানন্দকে রণে গমন করিতে বাচনিক নিষেধ করিতেছে—আবার কর্ত্তব্যপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, জীবানন্দের মুখ হইতে তাঁহার অভীপ্সিত সুন্দর উত্তর গাইতেছে। বিরহিণী শান্তির এই অপূর্ব্ব প্রেমভক্তির চিত্র বড়ই স্বাভাবিক ও চিত্তহারী। শান্তির ন্যায় রমণী যারতার কাছে মনের কথা বলিয়া দুঃখ দূর বা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। তাই যারতার কাছে মনের কথা বলা শান্তির অভ্যাসও ছিল না। তাহা সে এইরূপ আপনা আপনিই বলিত।

ইহার পরের দৃশ্যে আমরা দেখিলাম—শান্তি পুরুষবেশে, সত্যানন্দ সন্নিধানে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে উপস্থিত হইয়াছে। সত্যানন্দের নিকট কিন্তু সে পুরুষবেশ গোপন রহিল না। বুঝি তাঁহার নিকটে সে বেশ গোপনে শান্তির ততটা ইচ্ছাও ছিল না। পুরুষবেশ কেবল মাত্র অন্য লোকের চক্ষে ধুলি দিতে। দেখিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বহু তিরস্কার করিলেন। শান্তি মুখরার ন্যায় সত্যানন্দকে কয়েক কথা শুনাইয়া দিল। পরে সত্যানন্দ তাহার বলবিক্রম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি প্রথমে শান্তিকে চিনিতে পারিলেন না। পরে যখন জানিতে পারিলেন শান্তি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী, তখন সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন—

"কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে?" শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নত মুখে বলিল—

'পাপাচরণ কি প্রভু? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ? সন্তানধর্ম্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তানধর্ম্ম অধর্ম্ম। আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, যিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।'

বলিতে বলিতে শান্তির গ্রীবা উন্নত হইল—বক্ষ স্ফীত হইল—অধর কাঁপিতে লাগিল—আবার এদিকে চক্ষেও দুই এক ফোঁটা জল আসিয়া জমিতে লাগিল। সন্তাননায়ক সত্যানন্দ পূর্ব্বেই তাহার বলবিক্রম দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন; মনে ক্ষোভ ছিল, কেবল জীবানন্দের ধর্ম্মচ্যুতির

তব্র জন্য। শান্তির এই কথা শুনিয়া তিনি সাতিশয় প্রীত হইলেন—বলিলেন,

'তুমি সাধ্বী। কিন্তু দেখ মা, পত্নী কেবল গৃহধর্ম্মেই সহধর্ম্মিণী, বীরধর্ম্মে রমণী কি?'

শান্তি ইহার উত্তরে মহাভারতের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। সুভদ্রার কথা বলিলেন; দ্রৌপদীর কথা বলিলেন। সত্যানন্দ শুনিলেন, শুনিয়া বলিলেন—

'তা হউক, সামান্য মনুষ্যদিগের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত এবং কার্য্যবিরত করে। এই জন্য সন্তানের ব্রতই এই যে, রমণী জাতির সঙ্গে, একাসনে উপবেশন করিবে না। জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ?'

শান্তি যেন সদর্পেই বলিলেন—

'আমি আপনার দক্ষিণ হস্তের বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রতচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি; স্বামিসন্দর্শনের জন্য নয়। বিরহযন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামীর ধর্ম্মচ্যুতির ভয়ে আমি কাতরা। বৃষ্টির অভাবে মহান্ মহীরুহও শুষ্ক হয়, আমি মহান্ মহীরুহতলে বৃষ্টি করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'সত্য। সে কি? মহান্ মহীরুহের অনাবৃষ্টির ভয়? জীবানন্দের ধর্ম্মচ্যুতি?'

'শান্তি। যাহা ঘটিয়াছে তাহা আবার ঘটিতে পারে।'

'সত্য। কি ঘটিয়াছে? জীবানন্দের ধর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছে? হিমালয় গহ্বরে ডুবিয়াছে?'

'শান্তি। কেবল সহধর্ম্মিণীর সাহায্যের অভাবে।'

'সত্য। কি বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতেছি না।'

'শান্তি। কাল মধ্যাহ্নে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে।'

শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী কাঁদিতে লাগিল। সত্যানন্দ ইহার পূর্ব্বে কখনও কাঁদে নাই। দেখিয়া শান্তি বলিল,

'প্রভু, আপনার চক্ষে জল কেন?'

'সত্য। প্রায়শ্চিত্ত কি জান?'

'শান্তি। জানি, আত্মহত্যা।'

'সত্য। তাই কাঁদিতেছি। জীবানন্দের শোকে কাঁদিতেছি।'

'শান্তি। আমিও তাই আসিয়াছি; যাহাতে জীবানন্দ না মরে সেই জন্য আসিয়াছি।'

পরে সত্যানন্দ প্রীত হইয়া তাহার নবীনানন্দ নাম করিলেন। আনন্দমঠে তাহার বাস করিবার অনুমতি হইল।

শান্তি চরিত্রের মূল লক্ষ্য এই দৃশ্যে বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃত সহধর্ম্মিণী কাহাকে বলে—পতিপ্রতি পত্নীর কর্ত্তব্য কি—কর্ত্তব্যপরায়ণা সহধর্ম্মিণী কর্তৃক পতির কি কি কার্য্য হইতে পারে, তাহা শান্তি এইখানে যাহা বলিয়া গিয়াছে, পরে কার্য্যেও সে তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। শান্তিকে প্রথম মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিতেও আমরা এইখানেই শুনিলাম। শান্তির শিক্ষা—শান্তির পতিপ্রেম যে কত উন্নত, প্রথমে এই স্থলেই তাহার পরিচয় পাইলাম।

দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। স্ত্রীদ্বেষী ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামীর বীরধর্ম্ম নষ্ট হইবে বলিয়াই কতকগুলি লোককে স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সন্তান সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবানন্দ তাঁহার সেই সম্প্রদায়ের প্রধান নায়ক। সেই সত্যানন্দ একদিকে—অপরদিকে জীবানন্দের সহধর্ম্মিণী শান্তিমণি। স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া পাছে স্বামীর বীরধর্ম্ম নষ্ট হয়, শান্তি এই ভয়ে সেই সন্তানসম্প্রদার মধ্যে স্বামীর ধর্ম্মরক্ষার্থ, সেই জীবানন্দের ধর্ম্মরক্ষার্থ আনন্দমঠে উপস্থিত। দুই জনের মনের দুই প্রকার সাক্ষাত বিরুদ্ধ ভাব, সেই ভাব সম্বন্ধে দুই জনের কথোপকথন বড়ই সুন্দর শুনিলাম। সন্ন্যাসী সত্যানন্দও শান্তির শিক্ষার কাছে হারি মানিলেন—বলিলেন, "বৎসে, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক। তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম। তুমি সন্তান মধ্যে পরিগণিত হইলে। আমি এতক্ষণ তোমার মর্ম্ম বুঝি নাই, তাই তিরস্কার করিতেছিলাম। আমি কি বুঝিব? বনচারী ব্রহ্মচারী বৈত নই। স্ত্রীলোকের তুল্য হইব কি প্রকারে? ইত্যাদি।"

শান্তি-সত্যানন্দের এই কথোপকথনে শান্তির স্থৈর্য্য, প্রতিজ্ঞাবল, সংযম দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঐ শুন, শান্তি কেমন গর্ব্বিতের ন্যায় বলিতেছে—প্রকৃত বীরজায়ার ন্যায় বলিতেছে—"বিরহ যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই, * * * আমি মহান্ মহীরুহতলে বৃষ্টি করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" "পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ? সন্তানধর্ম্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তানধর্ম্ম অধর্ম্ম।"

কত বড় তেজের কথা! সন্ন্যাসী সত্যানন্দ সন্নিকটে গৃহরমণী শান্তিমণির এই মানসিক তেজঃপ্রখরা শিক্ষা ওই হৃদয়খানিকে অতি প্রোজ্জ্বলভাবে দেখাইয়া দিতেছে।

আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ। জীবানন্দ সত্যানন্দের অতিশয় প্রিয় হইলেও শান্তি অপেক্ষা কিছু অধিকতর প্রিয় নহে। সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী—সুতরাং মায়াবর্জ্জিত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সেই সত্যানন্দ জীবানন্দের মৃত্যুর কথা ভাবিয়া চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন (সত্যানন্দকে আর নাকি কেহ কখন কাঁদিতে দেখে নাই), আর তাঁহারই সম্মুখে বসিয়া শান্তিমণি অম্লান বদনে অদমিত তেজে, সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভু আপনার চক্ষে জল কেন?" সত্যানন্দ কেন কাঁদিতেছিলেন, তাহা কিন্তু শান্তির বুঝিতে বাকি ছিল না। সত্যানন্দও তাহা বুঝাইলেন; বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত কি জান?" শান্তি সেই সমানভাবে উত্তর করিল "জানি—আত্মহত্যা।"

কি ভয়ানক কথা, সামান্যা রমণী বা বুঝি কুলটারও যাহা অসম্ভব—পরম সাধ্বী পতিধর্ম্মানুরতা শান্তি আজি তাহাই সম্ভব দেখাইল। তাহা ত দেখাইবেই। শান্তি ত সামান্যা রমণী নহে। শান্তির ঐ একটী কথায় বা ভাবে তাহার হৃদয়ের শিক্ষা, দীক্ষা, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধর্ম্মানুরাগ, পতিপ্রেম, ছটা বুঝাইয়াছে—বুঝি আর কিছুতেই তাহা প্রকাশ হইত না। জীবানন্দ যাহাতে না মরিতে পারেন, সে সম্বন্ধে চেষ্টা করিবেন

বলিয়া শান্তির যে প্রতিশ্রুতি, তাহা কেবল মৌখিক সান্ত্বনা মাত্র। সত্যানন্দও তাহা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিলেও, অনেক সময়ে অসম্ভব ঘটনাও অনুকূল বলিয়া সম্ভব বিবেচনা করিতে বড়ই ইচ্ছা হয়।

পাঠকবর্গ, এখন আর একটি দৃশ্য অবলোকন করুন।

প্রকৃতির নির্জ্জন প্রদেশে—নিবিড় অরণ্য মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীর। শাখা-পত্র-পুঞ্জে কুটীরটি আবৃত—লতা পল্লবে কুটীরটি সমাচ্ছাদিত। সেই কুটীর মধ্যে একটি যুবক আর একটি যুবতী। একটি স্বামী—অপরটি পত্নী। একটি জীবানন্দ—অপরটি শান্তি।

শান্তি কুটীরে বসিয়া গাইতেছে—

"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!"

জীবানন্দ সারঙ্গের মধুর নিক্কনে বাজাইতেছেন—

"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!"

পাঠক একবার এই দৃশ্যটী কল্পনা চক্ষে দেখিয়া লও—সেই স্থান-কাল-পাত্র মনোমধ্যে ভাবিয়া লও। ক্ষণকাল নাটক নবেলের কথা ভুলিয়া গিয়া একবার আপনাদিগের কথা স্মরণ কর—একবার মনুষ্যকে মনুষ্যের ন্যায় ভাবিয়া দেখ। নতুবা আমরা যাহা বলিব, তাহা বুঝিবে না, তাহা কুরুচিকর বলিয়া জ্ঞান করিবে।

এ জগতে যিনিই যতই দম্ভ করুন না কেন—ইন্দ্রিয়শক্তির নিকট কাহারও বড় একটা স্পর্দ্ধা খাটে না। পুঁথি পত্রে অনেক লেখা যায়, উপদেশে অনেক বলা যায়, কিন্তু কার্য্যে এ শক্তিকে পরাভব করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। ইতিহাস খুঁজিয়া দেখ, ইহার প্রতি পত্রে এই শক্তি কিরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে। এই পৃথিবীতে যত বিপ্লব ঘটিয়াছে, যত হত্যা হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এই শক্তিরূপিণী রমণীর জন্য। শুদ্ধ ইতিহাস বলি কেন, ইতিহাসগত মনুষ্য লইয়া, পুরাণ প্রভৃতি দেখ—যেখানে দেব-চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, সেখানেও ইহার প্রভূত ক্ষমতা অবলোকন কর। অথবা দেবতা হইতেও যাঁহারা উচ্চ, সেই সকল সিদ্ধযোগী সাধুজনের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিবে সেখানেও এ শক্তি সকল সময়ে পরাভূত হইতে পারে নাই! পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, মানবসৃষ্টিরহস্য স্ত্রীপুরুষের অপরূপ সম্বন্ধ লইয়া। এখন আমরা বলি, স্ত্রীপুরুষের সেই অপরূপ সম্বন্ধ এই মনোহারিণী শক্তি লইয়া। ইহার রূপ অনন্ত, লাবণ্য অনন্ত—ক্ষমতাও অনন্ত। যে শক্তির বলে ভগবান সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করাইতেছেন, তাহা অপূর্ব্ব হওয়া বিচিত্র নহে। এ শক্তিকে সর্ব্বদা পরাভব করিতে পারে, এরূপ বীর অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কথায় অনেকে হাতি ঘোড়া মারিয়া থাকেন, কিন্তু কাজে আবার তাঁহাদিগকে সামান্য মশার জ্বালায় বিব্রত দেখিতে পাই।

এই শক্তির অপূর্ব্ব ক্রীড়া কুমারসম্ভবে অতি সুন্দর বর্ণিত আছে। কুমারসম্ভবকার অবশ্য মূল বিষয়টি পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু তবু সে ঘটনা মনে করিতে হইলে কুমারসম্ভবই মনে করিতে

হয়। পাঠক, একবার সেই মদনভস্ম মনে কর। যোগেশ্বর পরমযোগী, ভগবদ্ভক্ত, ভবদেব একান্তমনে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন—ঐ দেখ, ঐ দুৰ্জ্জয় শক্তি সহসা তাঁহাকেও আলোড়িত করিয়া তুলিল। যিনি দেবাদিদেব মহেশ্বর, যাঁহার কণ্ঠে হলাহল বিরাজিত, ভালে অনল প্রজ্বলিত—স্কন্ধে ভুজঙ্গ লম্বিত—জটাজুটে মন্দাকিনী শোভিত—শ্মশান যাঁহার বিলাস-ভবন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম যাঁহার পরিধান—ভস্মজাল যাঁহার বিভূতি—প্রেতগণ যাঁহার সঙ্গী, তাঁহারই একদিন এই শক্তির নিকট কিরূপ অপদস্থ হইতে হইল, দেখিলে, তুমি আমি কি ইহার নিকট স্পর্দ্ধা করিতে পারি? এই সুন্দর ঘটনায় ইন্দ্রিয় শক্তির ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে—আমি আর অধিক কি লিখিব? আর ইহা না লিখিলেও চলে—কে না ইহার অপরিসীম প্রভাব অবগত আছেন?

বড়র সহিত যদি ছোটর তুলনা অবৈধ না হয়, তবে আজি সেই মদনভস্মের দৃশ্যের সহিত আমাদিগের এই পূৰ্ব্ববর্ণিত দৃশ্য তুলনা কর।

জীবানন্দ সন্ন্যাসী—জীবানন্দ ব্রহ্মচারী; জীবানন্দ যে ব্রতধারিগণের নায়ক, তাহাদের স্ত্রীপুত্রের মুখদর্শনেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সহজ প্রায়শ্চিত্ত নহে। প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

এ হেন জীবানন্দ তোমার আমার মত লোক নহেন। এখন দেখ, সেই জীবানন্দের সহিত সেই শক্তির অপূৰ্ব্ব সংগ্রাম। ঐ দেখ, ঐ সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে জীবানন্দের শরীর সিহরিয়া উঠিল। মন্মথ ধীরে ধীরে শরীরে প্রবেশ করিল। জীবানন্দ শান্তিকে বলিলেন—

"দেখ শান্তি! একদিন আমার ব্রত ভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণ ত উৎসর্গই হইয়াছে। যে পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। এতদিন এ প্রায়শ্চিত্ত করিতাম, কেবল তোমার অনুরোধেই করি নাই। কিন্তু একটা ঘোরতর যুদ্ধের আর বিলম্ব নাই। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে, আমার সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। আমার মরিবার দিন পর্য্যন্ত কি—"

জীবানন্দ কি বলিতেছিলেন, তাহা শান্তির উত্তরেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। স্বামীর মনোভাব স্ত্রী যেমন বুঝিতে পারে, এমন আর কে পারে?

কি দেখিলাম? দেখিলাম, শিব-মদন সংগ্রাম! দেখিলাম শিবের ধৈর্য্যচ্যুতি। দেখিলাম শিবের পরাজয়। দেখিলাম, ইন্দ্রিয়শক্তির নিকট জীবানন্দের পরাভব। জীবানন্দ কি সহজে পরাজিত হইয়াছিলেন? তাহা নহে। সেই স্থান, কাল, পাত্র মনে কর। সেই সহধর্ম্মিণী শান্তি মনে কর—সেই শান্তির সঙ্গীত মনে কর। সেই প্রায়শ্চিত্তের কথা মনে কর—তবেই জীবানন্দের মানসিক পতন বুঝিতে পারিবে। জীবানন্দ সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় ইচ্ছা করিয়া সে শক্তিকে আহ্বান করেন নাই—ভোগেচ্ছায় জীবানন্দের এ মানসিক পতন ঘটে নাই। এ জন্য জীবানন্দকে কেহ ঘৃণাক্ষরেও কিছু বলিতে পারিবে না।

আরও কি বিশ্লেষণের দরকার। তার পরে দেখ—মদন ভস্ম অধ্যায়। অগ্নি জলি-

য়াছে, সম্মুখে দহমান পদার্থ বিরাজিত। একটু স্ফুলিঙ্গ স্পর্শ হইলেই সব শেষ হয়। একটু আত্মসংযমের অভাবেই সব মিটিয়া যায়। দুইটি বিদ্যুৎগর্ভ তড়িৎ—একটু সামান্য স্পর্শেই ইরম্মদ ছুটিয়া যায়। মহাদেব কামশরে আহত—সম্মুখের পরম রমণীয়া পার্ব্বতী বিরাজিতা। এক মুহূর্ত্তের মিলনে যুগান্তর ঘটিয়া যায়। কিন্তু দেখ কি সুন্দর আত্মসংযম—কি সুন্দর মদন ভস্ম!

দেখ শান্তি কি বলিতেছে—

"আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মের সহায়! তুমি অতিশয় গুরুতর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। সেই ধর্ম্মের সহায়তার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। দুই জনে একত্রে সেই ধর্ম্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিয়াছি। তোমার ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিব। ধর্ম্মপত্নী হইয়া, তোমার ধর্ম্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্য এবং বিবাহ পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। হায় প্রভু! তুমিই আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি কি তোমায় বীরত্ব শিখাইব?"

শিবের কটাক্ষে মদন ভস্মসাৎ হইয়া গেল। শান্তির সামান্য কথায় ইন্দ্রিয়শক্তি শতযোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। ধন্য শান্তি —ধন্য কবি!

এ কি সাধারণ কথা! স্বামী বিরহে কাতর হইয়া স্ত্রীর নিকট মিলন প্রার্থনা করিতেছেন—যেমন তেমন স্বামী নহে—জীবানন্দের ন্যায় স্বামী। কিন্তু তাহাতে আপত্তি করিতেছে যেমন তেমন স্ত্রী নহে—শান্তির ন্যায় পত্নী। যিনি স্বামীর নিকট আসিবার জন্য স্ত্রীলোকের দুস্ত্যজ্য লজ্জা সরম জ্ঞান না করিয়া পুরুষবেশে এই গভীর অরণ্যে আগমন করিয়াছেন, সেই শান্তি। স্বামী সহজভাবে যে মিলন প্রার্থনা করে নাই—মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার সে মিলন প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু তবু শান্তি তাহাতে আপত্তি করিল। শুধু আপত্তি নহে—সে যাহা বলিল, তাহাতে জীবানন্দের মস্তক অবনত হইল—জীবানন্দ বলিলেন, "শিখাইলে ত। আমিও শিখিলাম। তুমিই স্ত্রীকুলে ধন্যা।"

এমন সহধর্ম্মিণী জগতের আর কোন কাব্যে দেখিয়াছ কি? আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি—শান্তি কাব্য জগতে অতুলনীয়।

এখন শান্তির কথাগুলি মনোযোগ করিয়া পাঠ কর। দেখিবে শান্তির শিক্ষা, দেখিবে শান্তির ধর্ম্ম। এখন শান্তির সেই কথা মনে কর।

"বিরহ যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামীর ধর্ম্মচ্যুতির ভয়ে আমি কাতরা। বৃষ্টির অভাবে মহান্ মহীরুহও শুষ্ক হয়, আমি মহান্ মহীরুহতলে বৃষ্টি করিব।"

দেখিলে, শান্তি যাহা বলিয়াছিল, তাহা সে কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। বাস্তবিকই বৃষ্টির অভাবে মহান্ মহীরুহ বিশুষ্ক হইতেছিল, বাস্তবিকই শান্তি বৃষ্টি করিয়া সেই মহান্ মহীরুহ রক্ষা করিল।

শান্তির মনে কি মিলন আকাঙ্ক্ষা ছিল না? শান্তি ত মানুষ,—তাহার অন্তর কি একটুও বিচলিত হয় নাই? শান্তির সঙ্গীতে সে কথার উত্তর আছে। আমরা আর তাহা বলিতে চাহি না। আমরা এখন এই মদনভস্ম ব্যাপারটি পাঠকবর্গকে একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি, ইহা ভাবিয়া আবার শান্তিকে বিচার করিয়া দেখিতে বলি, তুলনা করিয়া দেখিতে বলি।

এই শান্তির মত আদর্শ-চরিত্র কি বঙ্কিম বাবুর অন্য উপন্যাসেও আছে?

আর অধিক লিখিব না। এইখানেই এই দৃশ্য বর্ণনা শেষ করিব। পার্ব্বতী সহায় মদনদেবকে হরকর্ত্তৃক ভস্ম হইতে দেখিয়াছিলাম,—জীবানন্দ সহায় মন্মথকে শান্তির নিকট অপদস্থ হইতে দেখিলাম। শান্তি মন্মথকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, স্বামীর ধর্ম্ম রক্ষা করিল। আমরা একটি সহধর্ম্মিণী দেখিলাম। এ জগতে রমণীর ন্যায় ধৈর্য্য-শালিনী আর কেহ আছে কি?

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়।

রামদাস স্বামী।

খৃঃ ১৬০৮—১৬৮১।

কৃষ্ণানদী তীরে ‘জাম্ব’ নাম্নী এক নগরী ছিল। তথায় রামভক্ত ‘সূর্য্যজিপন্থ’ নামধারী জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তথাকার কুলকরণী ছিলেন। তিনি রামনবমী উপলক্ষে নবরাত্রি পালন করত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন ও দানাদি সদনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার গৃহে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও মারুতীর মূর্ত্তি ছিল। তিনি সেই বিগ্রহদিগকে স্বহস্তে প্রতিদিন পূজা করিতেন। সময়ে তাঁহার সন্তান না হওয়ায় তিনি সাতিশয় চিন্তাযুক্ত হইলেন; তদীয় পত্নী ‘রানুবাই’ও সমুৎসুকা হইলেন। একদা রামচন্দ্র তাঁহাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া, স্বপ্নকালে ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “বৎস! তোমার ঔরসে বৈরাগ্যে মারুতী-তুল্য এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, তুমি অনুশোচনা করিও না।”

কালক্রমে ভগবদ্‌বাক্য ফলবতী হইল। সেই ব্রাহ্মণপত্নী গর্ভবতী হইলেন। দেখিতে দেখিতে দশমাস দশ দিন পূর্ণ হইতে লাগিল। তিনি গর্ভভারে মন্থরগতি-সম্পন্না হইলেন। আলস্য আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিল; বসিলে উঠিতে পারেন না। অনন্তর তিনি মহৎ লক্ষণযুক্ত এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। সেই ব্রাহ্মণের সর্ব্বসম্পত্তি সুখ ছিল। তিনি পুত্রের জন্মোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে ধন বিতরণ করিলেন। অনন্তর দ্বাদশ দিবসে পুত্রকে ‘রামদাস’ নাম প্রদান করিলেন। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, রামদাসের উপনয়ন

সংস্কার সম্পন্ন হইল। তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি যৌবন পদে আরূঢ় হইলে, তাঁহার বিবাহোদ্‌যোগ হইতে লাগিল। সুপাত্রী স্থির হইল। পিতা মাতা,[১] বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সহ রামদাস পাত্রীগৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় পূর্ব্বেই পাত্রীসম্বন্ধীয় আত্মীয় স্বজনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, নানা পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাগমে ধর্ম্মাদি উচ্চ বিষয় সকলের বিচার চলিতেছে। পাত্র ও পাত্রী নিকটস্থ হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। শুভলগ্নের শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, পুরোহিত উহা সকলের জ্ঞাপনার্থ 'সাবধান' বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। সকলেই বুঝিলেন, শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত। কিন্তু সেই 'সাবধান' বাক্য রামদাসের অন্তরে ভিন্ন ভাবের উদ্রেক করিল। তিনি বুঝিলেন যে, সংসারবন্ধন অতি দুঃখজনক, ইহাতে সুখ ও শান্তির লেশ মাত্রও নাই, তাই এই মহা বিপদের কাল উপস্থিত হওয়ায় পুরোহিত তাঁহাকে সাবধান করিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুত বেগে তথা হইতে পলায়ন করিলেন, বিবাহ কার্য্য সমাধা হইল না। সকলই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কন্যার পিতা মাতা সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের সম্ভ্রমের হানি হওয়ায় তথায় হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। তখন রামদাসের পিতা মাতা তাঁহার অনুসরণ করিয়া অনেক সংযুক্তি প্রদান করিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না।

[১] দাক্ষিণাত্যে বিবাহকালে স্ত্রীলোকেরাও বরযাত্রী হইয়া যায়।

যে অন্তরে রামবিরহরূপ মহাদুঃখ সঞ্জাত হইয়াছে, উহা কি কখন ধরাতলে আকর্ষিত হইতে পারে? যে মন মলশূন্য পবিত্র প্রেমে ধাবিত হইয়াছে, উহা কি কখন মলময় মায়িক বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইতে পারে? যে বুদ্ধি নিরন্তর ভগবদ্ধ্যানে নিযুক্ত, তাহার পক্ষে প্রপঞ্চ চিন্তা নিতান্ত অপ্রিয়কর ও অসম্ভব। রামদাস স্বীয় পিতা মাতা ও আত্মীয় পরিজনকে বলিলেন,—"আমি ভোজনে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্তু ভোজ্য দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত জানিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমাকে প্রপঞ্চে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা আপনাদের উচিত হয় না। কামার্থ পূরণ করিবার জন্য লোকে সুন্দর জায়া করিয়া থাকে। সেই জায়াকে পালন করিতে করিতেই তাহাদের সমস্ত জীবনবারি নিঃশেষিত হয়। মূঢ় ব্যক্তিরা এইরূপে ক্রমাগত পতঙ্গের ন্যায় বারম্বার পত্নীরূপ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মজীবন বিসর্জ্জন করে। দিনের পর দিন অতিবাহিত হওয়ায় কাল ক্রমাগত সমীপস্থই হইতে থাকে। কিন্তু মূঢ়ের অন্তরে কদাচ এ ভাবের জাগরণ হয় না। সে, মনরূপ মত্ত মাতঙ্গের দ্বারা প্রেরিত হইয়া দুর্গন্ধময় অতি কদর্য্য বিষয়েই রমণ করিতে থাকে; দুর্দ্দান্ত কাল তাহার শিখা আকর্ষণ করিতেছে, তথাপি সে প্রবুদ্ধ হয় না,—হইলেও সে নিজ প্রীতিজনক পদার্থ ছাড়িয়া যাইতে হইবে এই আশঙ্কায় দ্বিগুণতর আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া উহারই অনুসরণ করিতে থাকে। বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হইয়া পড়িলেও মনের আবেগ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইতে

থাকে। ক্রমে শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য যমদূতগণ তাহার নিকটস্থ হইয়া ভীষণ কোলাহল করিতে থাকে; তখন সেই মূর্খ ভয়বিহ্বল চিত্তে নিরুপায় হইয়া 'হায়! আমার প্রাণসমা প্রিয়া, পুত্রকন্যা, ধনসম্পত্তি সকলই পড়িয়া রহিল' এইরূপ চিন্তায় আকুল হইয়া নয়ননীরে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে ভাসাইতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকেও অতি দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। অতএব পরমার্থহানিজনক এই অকিঞ্চিৎকর বাক্য সকল আমাতে প্রয়োগ আপনাদের উচিত হয় না। আপনারা গৃহে প্রত্যাগমন করুন। আমিও শ্রীরামের উদ্দেশে ধাবিত হই।" রামদাসের এইরূপ বৈরাগ্যসূচক বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহার পিতা মাতা ও অন্যান্য সকলে তাঁহাকে পবননন্দন হনুমানের অবতার বলিয়া জ্ঞাত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিতগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসাবাদ করত বলিতে লাগিলেন, "রামদাস ব্রহ্মচারী, তাঁহার মন সংসারপ্রপঞ্চে বিন্যস্ত হইবে কেন? যিনি জ্ঞাননেত্রে প্রাক্তন কর্ম্ম সমূহ দর্শন করিতেছেন এবং পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন, তিনি পুনরায় উহার আবৃত্তি করিবেন কেন? সংসার পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে, এখন আবার কিসের জন্য?"

অনন্তর রামদাস একান্তে যাইয়া তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে ফল মূল আহার করিতে লাগিলেন। পরে কেবল গলিত পত্রে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিরাহারী হইয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলে, তাঁহার বুদ্ধি সমাধিতে অচলা রহিল। তিনি রামভক্ত ছিলেন। রামচন্দ্র সেই ভক্তের নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া নিজ নবদূর্ব্বাদল শ্যামল মূর্ত্তি তাঁহাকে প্রদর্শন করাইলেন। এইরূপে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল।

তদনন্তর তিনি কঠোর ও সাধনার বিঘ্নজনক বিবেচনা করিয়া অনাহার বৃত্তি পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্নান করিয়া দ্বিপ্রহর কালে ভিক্ষার ভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করিতে আরম্ভ লাগিলেন। তিনি বৈরাগ্য- শীল হইয়া অহরহঃ শ্রীরামের চরণ চিন্তনেই নিযুক্ত রহিলেন। তিনি পারৎপক্ষে লোক সমীপে যাইতেন না, কারণ উহা দ্বারা তিনি ভবমায়ায় পড়িতে পারেন, এই আশঙ্কা তাঁহার অন্তরে নিরন্তর জাগরিত ছিল।

আষাঢ়ী একাদশী উপলক্ষে কোন সময়ে যাত্রীগণ "পাণ্ডারপুর" তীর্থে গমন করিতেছিল। তিনি তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় গমন করিলেন। পাণ্ডারপুরে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তিনি সেই বিগ্রহ দর্শন করিয়া মনে মনে করিলেন, "আমি যে শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করি, ভক্তের হরি ভক্তের মনোরথ বিফল করেন না।" রাত্রিযোগে রামদাস না-নিদ্রা না-জাগরণ এইরূপ অবস্থাযুক্ত হইলে, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার মনঃক্ষেত্রে উদয় হইলেন। তখন রামদাস শ্রীরামচন্দ্রের পদপ্রান্তে পতিত হইলে, তিনি তাঁহার মস্তকে দক্ষিণ হস্ত রক্ষা করিয়া আশীর্ব্বাদ করত

অন্তর্ধান হইলেন। এইরূপ ভগবানের সৃষ্টি যে মনোমধ্যে যেরূপ মূর্ত্তির সংকল্প করা যায়; ব্রহ্মযোনিরূপ নির্ম্মল দর্পণে তদনুরূপ মূর্ত্তিই প্রতিফলিত হয়; বাস্তবিক তাঁহার কোন রূপ বা আকার নাই, তিনি নিরাকার, নির্ব্বিকল্প, ও নিরাময়। তিনি অজন্ম ও অমর কখন যে হইয়াছিলেন, হইবেন বা এখনই হইয়াছেন এরূপ নহে। তিনি নিত্য, শাশ্বত, সনাতন ও পুরাণ-পুরুষ। তিনি স্থাণুসম অচল ও বিকার রহিত। কাল তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, তিনি চিরকালই সমভাবে বর্ত্তমান আছেন। আনন্দই তাঁহার স্বরূপ; তদ্ভিন্ন অন্যরূপ তাঁহার নাই।

পাণ্ডারপুর হইতে রামদাস জাম্ব নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তথা হইতে তিনি 'সাটারার' অন্তর্গত 'চাপারা' আখ্যাযুক্ত পল্লীতে আগমন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি অতি বলিষ্ঠ ছিলেন। চাপারাতে তিনি নিজ হস্তে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সময়ে সময়ে সেই মন্দিরে অবস্থিতি করিতেন; কিন্তু ঐ স্থান লোকের জনতায় পরিপূর্ণ হওয়ায়, তিনি প্রায়ই কোন পর্ব্বতগুহায় অথবা নদীতীরে ভগবানের আরাধনার নিমিত্ত থাকিতেন।

তিনি যে একজন প্রধান সাধু, তাহা সকলে অবগত হইলেন। তাঁহার মাহাত্ম্য-যশ দিক্‌দিগন্তর পরিব্যাপ্ত হইল। আদিগেসোয়া ব্রাহ্মণ নৃপতি শিবজী তাঁহার গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি নিজ দুর্গ 'রায়গড়' হইতে যাত্রা করিয়া চাপারায় উপস্থিত হইলেন। তথায় রামদাসনির্ম্মিত মন্দিরমধ্যে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে জানিয়া তিনি মনে মনে করিলেন, "স্বামীজী নিশ্চয়ই এখানে আছেন।" কিন্তু তথায় তিনি স্বামীজীর দর্শন পাইলেন না। তথায় কিছুক্ষণ থাকিয়া তিনি ধ্রুবচরিত্রের কীর্ত্তন শ্রবণ করত স্পষ্ট জানিতে পারিলেন যে, গুরুদীক্ষা ব্যতীত উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। অনন্তর তিনি মুক্তির উপায়ান্বেষণ করিতে সমুৎসুক হইয়া, তিনি "প্রতাপগড়" নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এই স্থানে দেবী মহিষমর্দ্দিনীর একটী মন্দির ছিল। সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি সেই দেবীর আরাধনানন্তর মনে মনে স্থির করিলেন যে, সদ্‌গুরুর নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি আহারাদি করিবেন না। পরে তিনি নিদ্রাভিভূত হইলে, মহিষমর্দ্দিনী স্বপ্নে উদয় হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "শিবজী! তুমি রামদাস স্বামীর নিকটে গমন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ কর।" রাত্রি প্রভাত হইলে, শিবজী চাপারায় পুনরায় যাত্রা করিলেন; কিন্তু পুনরায় স্বামীজীর দর্শন পাইলেন না। তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, তিনি প্রতাপগড়ে উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রতাপগড় হইতে স্বামীজীর উদ্দেশে স্থানে স্থানে চর প্রেরণ করিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার অবস্থিতি স্থান অবগত হইতে পারিল না। শিবজী দেবী মহিষমর্দ্দিনীকে সদাই সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন, কোথায় যাইতে হইলে

তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহার অনুচরগণ স্বামীজীর তল্লাস করিতে না পারিলে, শিবজী পুনরায় সেই দেবীর ষোড়ষোপচারে পূজা বিধান করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঃ! জগজ্জননি! স্বামীজীর উদ্দেশ কোথায় পাওয়া যায়?" তখন সেই দেবী পুনরায় স্বপ্নে উদিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রামদাস তোমার নিকটে আসিয়াছেন।" নিদ্রাভঙ্গ হইলে, শিবজী দেখিলেন যে, স্বামীজী দক্ষিণ হস্ত তাঁহার মস্তকে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করত বলিতেছেন, "রাজন্! আমি গোদাবরী তীরবর্ত্তী পঞ্চবটী[২] স্থানে অধুনা বাস করি; তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি। বৎস! তুমি সত্য বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছ। আমি তোমাকে ইহাই এখন উপদেশ করি যে, তুমি রাজকার্য্যে মনোযোগ প্রদান করতঃ যাহাতে প্রজাবর্গের সুখবৃদ্ধি হয় ও যাহাতে ম্লেচ্ছদ্বারা কলুষিত হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।" এইরূপ বলিয়া স্বামীজী অন্তর্দ্ধান হইলেন। প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে তিনি আহ্লাদিত চিত্তে তদীয় মাতা 'জিজাবাই' এবং প্রথম পত্নীকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। অনন্তর শিবজী কিছুদিন "মহাবালেশ্বর" (ইহা পর্ব্বত বেষ্টিত; গ্রীষ্মকালেও ইহা অতি শীতল; জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দাক্ষিণাত্যের লোক এই স্থানে প্রায়ই গমন করে। এখানকার জলবায়ু অতি উত্তম) এবং "ওয়াই" (এই স্থানে নানা দেবদেবীর মন্দির থাকায় ইহা তীর্থস্থান মধ্যে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের লোকেরা ইহাকে কাশীতুল্য জ্ঞান করে) নগরে অবস্থিতি করিয়া "মাহালি" নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। মাহালিতে রামদাস প্রায়ই দিবাভাগে অবস্থান করিতেন। এই স্থানে একখানি পত্র লিখিলে, শিবজী তদীয় গুরু রামদাস স্বামীর নিকট হইতে একখানি প্রত্যুত্তর পান। পত্রবাহক একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বলিলেন, "স্বামীজী এক্ষণে চাপারাতে আছেন; কিন্তু তাঁহার অবস্থিতি স্থানের কোন স্থিরতা নাই, আজ এখানে, কাল ওখানে এইরূপে স্বামীজী পরিভ্রমণ করিতেছেন।" সেই পত্রের উত্তর দিয়া, শিবজী স্বামীজীর উদ্দেশে চাপরায় যাত্রা করিলেন। তথাকার মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী বিধবা স্ত্রীলোক তথায় বাস করিতেছেন। সেই বিধবা বলিলেন, "আপনার পত্র যথাসময়ে পৌঁছিয়াছে। এক্ষণে দ্বিপ্রহরকাল উপস্থিত; আপনি এই স্থানে ভোজনাদি করুন। রামদাস স্বামীর শিষ্য "কল্যাণস্বামী" আপনার পত্র যথাস্থানে লইয়া যাইবে।" এইরূপে সম্মানিত হইয়াও শিবজী তথায় ভোজন করিলেন না। তিনি স্বামীজীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার পত্র আসিয়াছে। অনন্তর তিনি

২ এই স্থানে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক 'সূর্পণখার' নাসিকা ছেদন হওয়ায় ইহার আধুনিক নাম নাসিক হইয়াছে। এই স্থানে অদ্যাবধি 'পঞ্চবট' ভূগর্ভমধ্যে রাম সীতার কুটীর ও লক্ষ্মণের তপোবন বর্ত্তমান আছে। পুণ্য-সলিলা গোদাবরী এই সকল স্থান দিয়া অদ্যাবধি প্রবাহমানা।

গুরুচরণ দর্শন করিয়া আনন্দিত চিত্তে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন তিনি দীক্ষাপ্রার্থী হইলে, স্বামীজী তাঁহাকে যথাবিধি দীক্ষিত করিয়া নানাবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব সকল জ্ঞাপন করত, তাঁহার হস্তে একমুষ্টি ধুলা ও এক মুষ্টি ঘোড়ার নাদ প্রদান করিলেন। উহার দ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইল যে, তিনি তাঁহাকে ধরিত্রী ও অশ্বালয় শাসন করিতে আদেশ করিতেছেন। অনন্তর শিবজী তাঁহাকে সদাসর্ব্বদা দর্শন ও তাঁহার পূজা বিধান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি বলিলেন, "বৎস! তোমাকে সর্ব্বদা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে; আমিও অরণ্য মধ্যে অথবা গিরিগুহায় বাস করিয়া থাকি; অতএব আমার পাদোদক গ্রহণ কর। তখন শিবজী স্বামীজীর পাদোদক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত প্রস্থান করিলেন।

শিবজীর অতিশয় গুরুভক্তি ছিল। কথিত আছে, মোগলেরা তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিলে, তিনি স্বামীজীর প্রসাদ গ্রহণে ইচ্ছুক হয়েন। তাঁহার পারিষদেরা তাহাকে বলেন, এখন স্বামীজী কি করিবেন? দেশ রক্ষা করিতে প্রযত্ন করাই এক্ষণে বিধেয়।" কিন্তু তিনি কাহারও কথায় মনোযোগ না দিয়া, একজন 'কার্ক্‌নূকে' স্বামীজীর তল্লাসে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কার্ক্‌নূ স্বামীজীর কোন উদ্দেশ না পাইয়া ফিরিয়া আসিলে, তিনি সাতিশয় চিন্তাযুক্ত হইলেন। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "শিবজি! এক্ষণে আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, তুমি যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত হও, তুমি এই যুদ্ধে জয়ী হইবে।" কথিত আছে, স্বামীজীর এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হইয়াছিল। শিবজী সেই যুদ্ধে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন।

শিবজীর রায়গড়ের দুর্গমধ্যে অবস্থিতিকালীন একদা কোন ব্যক্তি তাঁহাকে অতি উত্তম আম্রফল উপঢৌকন প্রদান করিলে, তিনি তাঁহার গুরু তথায় উপস্থিত না থাকায় সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তখন রাত্রিকাল। কিন্তু শিবজীর মনের ভাব অবগত হইয়া রামদাস তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। শিবজী সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি কিরূপে তথায় আগমন করিলেন। তখন স্বামীজী এক পা ভূতলে ও অপর পা দুর্গোপরি রক্ষা করিয়া বলিলেন যে, এইরূপে তিনি আসিয়াছেন ও যাইবেন, তদ্দর্শনে রাজার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না।

একদা শিবজী চাপারার নিকটস্থ "নিম্ব" পল্লীতে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তিনি, স্বামীজীকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে, স্বামীজী তাঁহার মুখের মালিন্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি পিপাসার্ত্ত হইয়াছেন, ইহা জ্ঞাপন করিলেন। তখন নিকটে জল নাই জানিয়া স্বামীজী এক প্রস্তর খণ্ড পদদ্বারা সরাইয়া ফেলিলে, মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে অতি পরিষ্কার পানীয় জলের একটী ফোয়ারা উত্থিত হইল। রাজা পিপাসা নিবারণ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। কথিত আছে, যে ক্ষুদ্র নদী অদ্যাবধি নিম্ব

গ্রামের ধার দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভূমির সর্ব্বশক্তি বৃদ্ধি করিতেছে, উহা এইরূপে সৃষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর দ্বিপ্রহর কাল উপস্থিত হইলে, স্বামীজী তাঁহাকে তথায় আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্বামীজীর অবস্থিতি স্থান সামান্য একটী গুহা। উহা আবার অরণ্যমধ্যে অবস্থিত; দ্রব্যাদি গ্রাম হইতে সহজে আনিবার উপায় নাই। বিশেষ শিবজীর সহিত এক হাজার অনুচরবর্গ। তখন স্বামীজীর এইরূপ প্রস্তাবে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং ফল বিষয়ে বিস্ফারিত নয়নে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর স্বামীজী তাঁহার শিষ্য কল্যাণস্বামীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "কল্যাণ! এই প্রস্তর খণ্ড কয়টী সরাইয়া ফেল।" তাঁহার আদেশানুযায়ী সেই প্রস্তরখণ্ড কয়টি উদ্‌ঘাটিত হইলে, কয়টি গুহা প্রকাশ হইল এবং তন্মধ্যে উষ্ণ বহুবিধ খাদ্য দ্রব্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। নৃপতিসহ সকলে ভোজন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তখন শিবজী, সেই অরণ্যমধ্যে মুহূর্ত্তকালে কোথা হইতে এরূপ উত্তম ভোজ্যাদি প্রস্তুত হইল, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, স্বামীজী তাৎকালিক 'সাধু তুকারাম বাবাকে' উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিলেন।

স্বামীজীর নিকট এইরূপ শুনিয়া, শিবজী 'পুনা' হইতে আট ক্রোশ অন্তরে তুকারামের অবস্থিতি স্থান 'দিহু' নগরে উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই নগরের প্রান্তর হইতে শিবজী কোন কার্কুনকে তাঁহার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তুকারামের নিকট প্রেরণ করিলেন। সেই কার্কুন, শিবজীর আগমন বার্ত্তা প্রদান করিলে, তুকারাম বলিলেন, "এখন দ্বিপ্রহর কাল সমাগত; আমি অনুচরবর্গসহ নৃপতির আহারীয় দ্রব্যাদি করিব, পরে সায়ংকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" তখন সেই কার্কুন মুখে এইরূপ বিদিত হইয়া শিবজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুকারাম কি এত ধনী ব্যক্তি যে, সানুচরসহ তাঁহার অতিথি সৎকার করিবেন!" তদুত্তরে সেই কার্কুন বলিল, "আমি তুকারামের ধনের বিষয় কিছুই জানি না; তবে এইমাত্র দেখিলাম যে, দেহুনগরসমীপস্থ "ইন্দ্রিয়াণী" নদী তীরে তিনি দুই খণ্ড প্রস্তর গ্রহণ করিয়া করতালের স্বরূপ বাদ্য করিতে করিতে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। অনন্তর শিবজী সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিতেছেন জানিয়া, তুকারাম তদীয় পুত্র "নারায়ণ বাবাকে" এক প্রশস্ত কুটীর নির্ম্মাণ করিতে এবং অনুচরসহ নৃপতিকে যথাবিধি সম্মান পুরঃসর তথায় গ্রহণ করিতে আদেশ করত তাঁহাকে উপযুক্ত ভোজ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। রাজা সেই নবনির্ম্মিত কুটীর মধ্যে যথাবিধি ভোজ্য পানীয় ও বিশ্রামস্থান দর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। 'নারায়ণবাবা' নৃপতির অতিথিসৎকার সুসম্পন্ন করিয়া সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে পিতৃসমীপে লইয়া গেলেন। শিবজী তুকারামকে একটী অতি পুরাতন ভগ্নপ্রায় গৃহে ভজন করিতে দেখিলেন এবং

তাঁহাকে যথাবিধি প্রণিপাত করিলে, তথায় তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর নৃপতি অরণ্য মধ্যে রামদাস কিরূপে অনুচরবর্গসহ তাঁহার অতিথিসৎকার করিলেন, ইহা জ্ঞাত হওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য, এইরূপে ব্যক্ত করিলে, তুকারাম বলিলেন, "নৃপতে! যখন 'বিটোবার' কৃপায় তিনি (তুকারাম) এই অতিথি সৎকার করিতে সমর্থ হইলেন, তখন রামদাসরূপধারী স্বয়ং মারুতীর পক্ষে উহা আর কিরূপে কঠিন হইবে?" এই ঘটনা ১৫৭১ শকাব্দের আষাঢ় মাসে সঙ্ঘটিত হয়।

অনন্তর শিবজী তদীয় গুরু রামদাসকে 'রায়গড়' 'প্রতাপগড়' অথবা 'প্যারোনি'র দুর্গে বাস করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি প্যারোনিতেই থাকিতে মনস্থ করিলেন। এই স্থানে শিবজী নিজ গুরুর সম্মানার্থ একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। উহা অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। ঐ মন্দির স্থাপনাবধি প্যারোনির আর একটি নাম 'সাজনগড়' হয়। অদ্যাবধি ঐ স্থান এই দুই নামেই খ্যাত। রামদাস 'অঙ্গরাই' নাম্নী যে দেবীকে আগমনকালে আনয়ন করেন, উহাই ঐ মন্দিরমধ্যে স্থাপিত হয়। এই ঘটনা ১৫৭২ শকাব্দের কার্ত্তিকমাসে নিষ্পন্ন হয়।

কথিত আছে, শিবজী একদা স্বামীজীকে সিংহাসন প্রদান করিয়া নিজে তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলে, তিনি তাহা অস্বীকার করেন।

প্যারোনি হইতে স্বামীজী 'রামেশ্বর' দর্শন করিয়া "চন্দ্রয়ার" নামযুক্ত নগরে উপনীত হন। এই স্থানে শিবজীর ভ্রাতা 'ভেঙ্কুজী' রাজত্ব করিতেন। জ্যেষ্ঠের গুরুর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তিনি তাঁহাকে সমাদরে নিজগৃহে আনয়ন করত, তথায় থাকিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন, 'ভেঙ্কুজী আমি এক স্থানে স্থির থাকি না, অতএব তুমি আমার শিষ্য 'ভিকাজী'কে এখানে রাখিতে পার।" নৃপতি তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে, তথায় ভিকাজীকে রক্ষা করিয়া তিনি প্যারোনিতে ফিরিয়া আসিলেন।

একদা তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলে, রামদাস গৃহে আগমন করিতে মনস্থ করিলেন। শিবজী তাঁহার সঙ্গে আসিতে ইচ্ছুক হইলে, তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। রামদাম গৃহে আসিলে, তাঁহার আত্মীয়েরা নিকটস্থ রামনবমী পর্য্যন্ত তাঁহাকে গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। রামদাস তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর তিনি চাপারায় গমন করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার জননী সাংঘাতিক পীড়িতা হয়েন। জননীর মৃত্যুর পূর্ব্বে, রামদাস পুনরায় গৃহে আগমন করায় মাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ১৫৭৭ শকাব্দের জৈষ্ঠ্যমাসে তাঁহার জননীর কাল হয়। সাধুশ্রেষ্ঠ রামদাস অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে তাঁহার "দাসবোধ" ও "মনঃসম্বন্ধীয় শ্লোক"ই সুবিখ্যাত।

শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।

ফুল।*

সংসারে বিমল সুখ বিরল, নির্ম্মল আনন্দলাভ করা সুকঠিন। আত্মীয় স্বজনের প্রেমালাপেও অক্ষুন্ন সুখ পাওয়া যায় না; স্নেহোপহারেও সকল সময় মন উঠে না। ফুলে কেবল দেবতা তুষ্ট, সকলে তুষ্ট। এমন ফুল পাইয়া কাহার না আনন্দ হয়? কিন্তু ভয় হয় পাছে ফুল শুকাইয়া যায়, সৌরভ-বিহীন হইলে পাছে তাহাকে পদদলিত করিতে হয়। কিন্তু পুষ্পোপহারের ভিতরও তারতম্য আছে, পুষ্পের ভিতরও বিশিষ্ট পুষ্প আছে। হারাণবাবুর "ফুল" সেই বিশিষ্ট কল্পনাপুষ্প-স্তবক; এ পুষ্পোপহারে ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্যও বিমল আনন্দ লাভ করিয়াছি। এ পুষ্প মলিন হইবার নহে, এ ফুল শুকাইবার নহে। পত্রিকা সম্পাদক অনেক উপহার পাইয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ প্রকৃত কবির অশ্রুকণাধৌত, মর্ম্মস্থান হইতে সদ্যোচ্ছিন্ন-মুকুল সকল সময় ভাগ্যে ঘটে না। এ পুষ্পস্তবকের শোভা মুগ্ধকরী, সৌরভ চিত্তোন্মাদী, আকার কোমল ও চিত্তরঞ্জন।

"ফুলে" রসচূড়ামণি নন্দদুলালের ব্রজলীলার চিত্র নাই,

"মদন কুঞ্জপর, বৈঠল নাগর
বৃন্দাসখি মুখ চাই"

নাই, বসন্তকাতর কোকিলকাকলী নাই, মলয় সমীর নাই, অথবা আশ্রমবাসিনী ঋষিকন্যা নাই, মৃগয়ার্থী ক্ষত্রিয় রাজপুত্র নাই, হরিণশাবক নাই, প্রেমোৎফুল্লহৃদয় নবদম্পতির রসচাতুরী নাই! ইহাতে—,

"ফুটল কুসুম নব কুঞ্জকুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওইরে।
মলয়ানিল হিম শিখরসি ধাবল
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে॥
চাঁদ-চন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহুঁ দূরদেশ
জানলু বিহি প্রতিকূল॥
অনিমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয় নয়ান।
এ সুখ সময়ে সহজে এত সঙ্কট
অবলাক কঠিন পরাণ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিণত।"—

প্রভৃতি বসন্তভাড়নাতুরা বিরহিনীর কাতরোক্তি নাই। কিন্তু ইহাতে যাহা আছে তাহা সচরাচর গীতির ভিতর পাওয়া যায় না। ইহাতে সংসারের গূঢ় রহস্য আছে, প্রেমের দীক্ষা আছে, সাম্যের মন্ত্র আছে, হৃদয়বৃন্তচ্যুত কোমল কলিকা আছে, হৃদয়চ্ছেদের সম্মোহন কুহক আছে এবং আশ্রম রমণীর স্নিগ্ধভাব আছে।

কবির যে হৃদয় আছে তাহা প্রতি খণ্ড-কবিতা হইতে উপলব্ধি হয়। কবি প্রেমিক —তিনি বোধ হয় লাভালাভগণনা শূন্য

* "ফুল", শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত।

বিশ্বপ্রেমের আভাষ পাইয়াছেন। কবিতাগুলি বিশেষ ঔদাস্যব্যঞ্জক। সংসারের ধূলাখেলায় কবি পরিতৃপ্ত হয়েন নাই। তিনি ভবিষ্যজগতের শান্তিনিকেতনের শোভায় মুগ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া আছেন।—

"আশা বাসা হোক্ ভস্ম নিরাশা অনলে
ধন, অর্থ, মান, যশ যাক্ রসাতলে।"
"হ'তেছে রে ঊর্দ্ধে তোর আবাস নির্ম্মাণ;
প্রীতি-প্রেম-শান্তিপূর্ণ ভিত্তি সুমহান্।"

হারাণ বাবুর ভাষা তাঁহার গভীর ভাবুকতার পরিচায়ক। তাঁহার বিশেষণ ও সন্ধিগুলি বেশ অর্থপূর্ণ।

"অচিন্ত্য অবক্ত্য ভাব,
'আমি আমি' এইরাব,
অসীম অনন্ত ব্যাপী অনন্ত সংসারে;
ক্ষুদ্র কীট অনু হ'তে,
পশুপক্ষী তরুসাথে,
স্থাবর জঙ্গম আদি বিশ্ব-চরাচরে।
নর নারী সমুদয়,
'আমি আমি' সর্ব্বময়,
সুন্দর বিচিত্র কিবা আহা মরি মরি।
অকুলে পড়ি যে ভ্রমে,
ভাবিয়ে ভাবিয়ে ক্রমে,
'আমি আমি' এইভাবে উন্মত্ত হইয়ে;
যত ভাবি তত দূরে যাই পিছাইয়ে।
আমি যদি সর্ব্বময়,
এ নিখিল সমুদয়,
তবে সে কেমন 'আমি' বুঝিতে না পারি
সে কারণে বলি তাই বাহবা বা-আমি
আমি গ্রাহী, আমি দাতা,
আমি বক্তা, আমি শ্রোতা,
আমি রূপ, আমি গুণ, ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে;
আছি আমি প্রবৃত্তি যে,
আমি পুনঃ নিবৃত্তি সে,
নাহিক ব্যত্যয় কভু তিলেকের তরে।
আমি পুণ্য আমি পাপ,
মায়া মোহ শোক তাপ,
মন বুদ্ধি চিত্ত তমঃ ইন্দ্রিয়-নিচয়;
যোগ তপ আরাধনা,
প্রেম ভক্তি উপাসনা,
সগুণ নির্গুণ আদি সত্য জ্ঞানময়।
আমি রোগী, আমি ভোগী,
সূক্ষ্ম স্থূল সর্ব্বত্যাগী,
আমি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অদ্বৈত কাহিনী;
আমা ভিন্ন কিছু নাই,
এ জগতে কোন ঠাঁই,
আমি সত্য, ধ্রুব ইহা মহাজন বাণী।
তাই ভেবে মরি সদা কেমন বা-আমি।"

ইহার ভিতর কেবল "গ্রাহী" কথা তত সুন্দর বোধ হয় না। "সে কারণে বলি তাই," একস্থানে "কারণ" ও "তাই" দুইটী কারণনির্দ্দেশ বাচক পদ ব্যবহারে ভাষাটা কেমন অসঙ্গত হইয়াছে।

হারাণবাবুর কল্পনাও লীলাময়ী, চাতুর্য্যময়ী ও ভাবময়ী। কিন্ত ইহার লীলা চাতুর্য্যে ব্যভিচার নাই। হারাণবাবুর কল্পনা সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মশীলা পুরস্ত্রী, অভিসারিকা নহে। ইহার স্থৈর্য্য আছে, সংযম আছে ও নিষ্ঠা আছে।

"ঐ শুন ভীমরবে গর্জ্জিছে জলধি!—
চপলা বিকট হাসি, উজলিছে দশদিশি,
মুহুর্মুহু বজ্রনাদে কাঁপিছে হৃদয়;
তরঙ্গ হিল্লোল উঠে,
সুদূর আকাশে ছোটে,

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা একাকারময়।
কালের করাল-ছায়া
মা, ঐ ভীষণ কায়া,
ক্রমে আসে আগুসরি' গ্রাসিতে আমায়
'মাভৈ মাভৈ'রবে
সান্ত্বনা কর মা সবে
প্রকৃতিরে প্রকৃতিস্থ কর এ সময়।
(নহে)
দেহ তরি ডুবে যায়, আয়ু-বায়ু হয় ক্ষয়,
'ভেলায় ভরসা' বল থাকে কত ক্ষণ;
কোথা যা'ব—কি করিব,
(এ) অকূলে কি কূল পাব,
অনন্ত অপার এযে দিগ্বিদিক হীন,
নারকীর পরিণাম কি ভীষণ দিন!
ইহ-পর উভলোক গভীর আঁধার,
তবে কোথা যা'ব মাগো কি হ'বে আমার?"

অপরপক্ষে—

কহ কহ সখি　　নিকুঞ্জ মন্দিরে
আজ কি হইল দ্বন্দ!
চপলে ঝাঁপল　　জনু জলধর
নীল উৎপলে চন্দ॥
ফণী মণিবর　　উপরে নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে　　সুর-তরঙ্গিনী
কেবল তরল ভেল॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ　　করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে　　তুরিবতি কহুঁ
ঐছন সকল শোহে॥
নায়ক গোপনে　　জপে নিরজনে
ইহ বুঝি' অনুমান॥"

এরূপ কবিতা কল্পনার ব্যভিচার ফলমাত্র।[১]

হারাণবাবুর কবিতার পদগুলি বেশ সুন্দর ও সুললিত। "কল্পনা আবাহন"টী কেমন সুন্দর!

"আয় লো কল্পনা-সখি, হৃদয়ে আমার!
তোমার কৃপায় সতি,
গাহিব কবিতা গীতি,
ভাবময়ী প্রেমময়ী দেবী প্রতিমার;
ভজিব পূজিব তাঁয়,
ভক্তি-ফুল দিয়ে পায়,
বড় সাধ দিব তাঁরে প্রেম-উপহার।
আয় সখি ত্বরা করি'
ভাবময়ী মূর্ত্তিধরি'
সৌন্দর্য্যের ডালা ল'য়ে এস সুহাসিনি;
ভাষা-রাণী লয়ে সনে,
উদয় হও লো মনে,
আলো কর লীলা-ভূমি খেলি আমোদিনি
লাগে ভাল যা'র ভাল
সে বিচারে নাহি ফল,
দেখিব মোরা কেবল প্রাণের মিলন;
আপনা বঞ্চিয়ে যেন,
অসত্যে না যায় মন,
স্বভাব-অভাব নাহি হয় কদাচন।
জীবন-সঙ্গিনী তুমি,
এস আনন্দ-দায়িনি,
শান্ত কর মহাপ্রাণী প্রান্তভবরণে;
তোমারি কৃপায় সতি,
ভুলিব সে দুঃখ-স্মৃতি,
গাহিব কবিতা-গীতি দেবী প্রতিমার;
আয় লো কল্পনা-সখি, হৃদয়ে আমার!"

---

১ "The flaunting harlotry of dishevelled enthusiasm."—*W. S. Landor.*

কবির "শঙ্কর স্তব"টী বিশেষ সুললিত ও সুখপাঠ্য। "শ্মশান" ঔদাস্যব্যঞ্জক ও গম্ভীর ভাবপূর্ণ।—

"প্রশান্ত গম্ভীর স্থির বিজয় শ্মশান
অনন্ত-কালের সাক্ষী পবিত্র মহান্!
প্রেম-শিক্ষাদাতা-বন্ধু মুক্তির সোপান,
তুমি সত্য, নিত্য, ধ্রুব, বিজয়-নিশান!
পাপ-দর্প খর্ব্বকারী সত্যের বিকাশ,
তোমার মাহাত্ম্যে হয় ধর্ম্মের প্রকাশ।
পরিণাম তুমি স্থান—মহা-সম্মিলন,
চিতা-ভস্ম স্মৃতি রাখ হরিনাম গান।
চির-শান্তি সাম্য-নীতি ভুবন বিদিত,
'অনিত্য সংসার' শিক্ষা তোমাতে নিহিত
আদিগুরু, মহাগুরু, নমি তব পায়,
হে শ্মশান! কর ত্রাণ, বন্ধন-কারায়।"

এই "শ্মশানে-নিহিত" "অনিত্য-সংসার শিক্ষা"র পরিদৃশ্যমান ফল কবির "শ্মশান"। "ফুল" প্রকৃতই নয়নরঞ্জনঃ—

"ধাতার অপূর্ব্ব-সৃষ্টি মরি কি সুন্দর!
হে ফুল! কাহার তরে' ফুটিয়াছ ফুল্লভরে,
সুবাসিত প্রীতিপূর্ণ স্তবকে স্তবকে;
দশদিশি করি' আলো, হাস কেন অবিরল,
মনের আনন্দে খেল' পলকে পলকে?
কাহার উদ্দেশে তুমি, উজলিয়ে বন-ভূমি,
নাচিছ সমীরভরে মনের হরষে;
কভু বা নোওয়ায়ে শির, কার তরে হও স্থির,
যোগমগ্ন-যোগীশ্বর হর নির্ব্বিশেষে?
প্রেমিক পবিত্র তুমি, মূঢ় অভাজন আমি,
স্বর্গ মর্ত্ত বহুদূর——প্রভেদ বিস্তর;
বিশ্বের দেবতা যিনি, তাঁহার চরণ কিনি,'
তুমি ফুল, হইয়াছ ধরায় অমর!
তুমি বন্ধু, গুরু মম, প্রেম-শিক্ষা অনুক্ষণ,
দেহ এ অধম শিষ্যে হে প্রেমিক-ফুল!
তোমার মতন যেন, দেবের সেবায় প্রাণ
উৎসর্গ করিতে পারি না হ'য়ে আকুল।
বিপদ কণ্টকাঘাতে, অচঞ্চল স্থির-চিতে,
জীবনের লক্ষ্যপথে করি হে গমন;
ফুটিয়া বিজন-স্থানে, গুণের সৌরভ-দানে
জগতের হিত-কার্য্য করি হে সাধন।
হে ফুল তোমার কাছে এই আকিঞ্চন!!"

'ধাতার অপূর্ব্ব-সৃষ্টি মরি কি সুন্দর!'— কবিতার কেবল এই ভাগটা কেমন যেন অসংলগ্ন বোধ হয়, যেন একটু cant'র মত বলিয়া মনে হয়। এরূপ জোর করিয়া কবিতার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকরণ ভাল বোধ হয় না, বেঁধে প্রেম হয় না।

কবির ধর্ম্মভাব পুস্তকের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমধিক বিকাশমান। তাঁহার এই অনিত্য সংসারের "চল্‌তি চক্কির" 'কীল' ধরিয়া থাকিবার গভীর বাসনার পরিচয় এই কবিতাস্তবকের যে কোন কবিতা হইতে সম্যক্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার গীতির ভিতর করুণরস ও ধর্ম্মভাব সমরূপ প্রবল। এ গীতির করুণরস চলিত গীতির বিরহবিধুরা বিরহিনীর কাতরোচ্ছ্বাসসম্ভূত নহে, অথবা প্রেমোন্মত্ত যুবকের অশান্ত প্রেমতৃষ্ণার শোচনীয় দৃশ্যজড়িত নহে!

"সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে, তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি
আধ হি নয়ান তরঙ্গ
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥

একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন
পাস পসারল কাম॥
দশন মুকুতা পাতি অধর মিলায়তি
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা।"

ইহার ভিতরও করুণরস আছে কেন, যথেষ্ট পরিমাণে আছে; কিন্তু এ করুণরস রসগ্রাহী যুবকের মনই চঞ্চল করিতে সক্ষম। ইহা এ সংসারের ধুলাখেলার অঙ্গ।

আবার—"সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুণে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে লেখি
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র্য বেড়ল,
মানিক হারানু হেলে॥
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলাম,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বজর পড়িয়া গেল॥"

এ কবিতায়ও কেবল বিরহিনীর কাতরোচ্ছ্বাসজড়িত করুণরস রহিয়াছে, তবে পূর্ব্ব-কবিতার করুণরস অপেক্ষা ইহা কিছু উচ্চ অঙ্গের। কিন্তু যে করুণরস ধর্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গ, যাহা এ মায়ামোহের অনিত্যতার উপলব্ধি হইতে সম্ভূত, যাহা হৃৎপিণ্ডউৎপাটনের তীব্রযাতনাজনিত ও শোকসন্তপ্ত নিরাশহৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসজড়িত তাহা ইহাতে নাই। এবং এই করুণরসই হারাণবাবুর কবিতার প্রাণ!—

"বাছনি রে! না কাঁদিস আর—
এ ধরা নহেক তোর,
পাপে সদা এ যে ভোর,
স্বার্থের জ্বলন্ত মূর্ত্তি হেথা বিদ্যমান;
সুতীক্ষ্ণ-কৃপাণ করে ভ্রমে সর্ব্বস্থান।
শঠতা বঞ্চনা যার,
সর্ব্ব কাজে জয় তার,
গুণীনের অনাদর হেথা চির-রীতি
সুজন ধার্ম্মিক সদা পায় দুঃখ ভীতি।
পরিহাস পরবাদ,
হিংসা দ্বেষ বিসম্বাদ,
নিদারুণ বিভীষণ রিপুর পীড়ন;
নশ্বর-জগতে এই সৌন্দর্য্য ভূষণ।
দয়া স্নেহ মমতার,
নাহি লেশ কণাকার,
হৃদয় মরুভূ সম অতীব কঠিন;
নীরস প্রকৃতি সবে ন্যায় ধর্ম্ম-হীন।
পৈশাচিক অত্যাচারে,
জর্জ্জরিত পরস্পরে,
সুধা বোধে বিষপানে উন্মত্ত সবায়;
মোহিনী মায়ার চক্র পাতিত হেথায়।
রে বাছনি!
যে জগতে হেন রীত,
না বুঝি আপন হিত,

আপন পায়েতে মারে আপনি কুঠার :
সে জগতে কিবা তুমি আশা কর আর।”
হারাণবাবুর কবিতার শিক্ষা কি ?—
“ল’তেছ মাটীর দেহ মাটীতে মিশাও,
বিপদে বিরলে কাঁদ মরম-ব্যথায় ;
গৌরব-জগত হ’তে হওরে উধা’ও,...”
“পরের সম্ভ্রম মান বিদ্যা বুদ্ধি দান,
ভোগৈশ্বর্য্য প্রতিপত্তি তেজস্বিতা হেরি ;
অধীর হ’ওনা কভু হিংসায়, অজ্ঞান !...”
“ছি ছি ছি ছি ! তবু কেন এত অহঙ্কার
মনে ভাব ‘একজন’ তুমি অবনীতে !
“রে বাতুল ! একি তোর বৃথা অভিমান,
হা ধিক্ ! অসার গর্ব্ব অন্তর-নিহিত ;
রাবণের চিতা বুকে ল’য়ে রে অজ্ঞান,
চিরদিন দুরাশার কর প্রায়শ্চিত।”

যে গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রাণটা কতকপরিমাণেও উদাস হয়, কতক পরিমাণেও ধর্ম্মভাবের আভাষ পাওয়া যায় তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় সাহিত্য জগতে কখন’ অনাবশ্যক হইতে পারে না। অধিকাংশ কবি এ ছার সংসারের উপর কল্পনার রামধনুর ছায়া বিস্তার করিয়া মায়াময় মনকে আরও মোহান্ধ করেন, বৈষয়িক কামনায় মনের দুষ্প্রবৃত্তি আরও উত্তেজিত করেন ; কিন্তু সমালোচিত কবিতায় ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্যও আমরা সংসার ভুলিতে শিখি, ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্যও ধর্ম্মপীযূষ পান করি, ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্যও লালসা হইতে বিরত হইয়া অপার্থিব ধনে মনোযোগী হই, আর ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্যও সাংসারিক মন মোহাবরণ ভেদ করিয়া কোষভেদী প্রজাপতির মত দশদিকে রূপচ্ছটা বিস্তার করিয়া পরমানন্দে মত্ত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় ও গাহিতে থাকে—
“যেপ্রেমে মত্ত হ’য়েছিল নিতাই গৌরগোঁসাঞী
সে প্রেম এক বিন্দু যদি পাই !—”

শ্রীগোপালচন্দ্র সোম।

সেই ফুল।

করে যেন স্বজনেতে
আধভাঙ্গা ঘুম ঘোরে
যতনে কে দিয়ে ছিল
একটী কুসুম মোরে,
ফুটন্ত লাবন্য মাখা
সেই পরিজাত ফুলে
ভ্রমেতে ঘুমের ঘোরে
রেখে দিনু হৃদে ভুলে।
প্রভাতে ভাঙ্গিল ঘুম
বিহগ কুজনে হায়,
দেখিলাম শূন্য হৃদি
ভূমে পড়াগড়ি যায়।

কত দিন গেছে আজ,
সে মাধুরি, সেই ফুলে
আজিও হৃদয়ে গাঁথা,
আজিও যাইনি ভুলে।
আজিও প্রভাতকালে
মনে পড়ে সেই হাসি,
মনে পড়ে সেই ফুলে
ছিল কার অশ্রুরাশি।
বরিষার বারি ধারা
থেকে থেকে হয় ভুল,
পবিত্র নিহার মাখা
বসন্তের সেই ফুল॥

শ্রীপ্রমিলা নাগ (বসু)।

মুক্তি।

যে পবিত্র নাম শীর্ষদেশে লিখিত হইল, আমাদিগের তদ্বিষয়ে অলোচনা করিবার, লিখিবার, বুঝিবার, বুঝাইবারও অধিকার নাই; তবে লিখি কেন?—আমার লেখা যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহারাও এই পবিত্রধামের সুদূরে অবস্থিত; তবু লিখি কেন?—কি লিখিব বলিয়া লিখি; আর অনধিকার চর্চ্চা কোন্ লেখকই বা না করেন? আর লিখি—বিদ্বদয়ের গভীর গবেষণা, আত্ম-সংযম এবং অসামান্য প্রতিভার বিষয় আলোচনা করিয়া পবিত্র হইবার ও পবিত্র করিবার জন্য। বন্ধনে কে না ভয় করে? স্বল্পজ্ঞান পাখীটী পর্য্যন্ত বন্ধনের ভয়ে ব্যাকুল। ক্ষুদ্র পাখীটীরও কাঞ্চন পিঞ্জরে বাস ভাল লাগে না; রাজার করকমলের অঙ্গমার্জ্জনাও পাখী চাহে না; স্বাদু শীতল সলিল পান করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় না; পক্ক দাড়িম্বের মধুর রসেও তাহার মন উঠে না। সে চাহে, পাখা বিস্তার করিয়া গগন পথে মনের সাধে উড়িতে। পাখী, সেই "জন্মবিটপি ক্রোড়ে" স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মানুষ কেন বন্ধনে ভয় করে না? উৎকৃষ্ট-জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ, কেন আপনা আপনি বন্ধন-জালে জড়িত হয়?—বন্ধন কাহাকে বলে জানে না বলিয়া। মানুষ ত আপনাকে চিনে না। সে যেমন ভাবে আপনাকে চিনিতে পারিয়াছে, সেইরূপ বন্ধনে ভয় করে। মানুষ রাজার কারাগারে ভয় করে, লৌহ রজ্জুপাশে বন্ধন সম্ভাবনায় বিচলিত ও বিরক্ত হয়, কিন্তু প্রকৃতবন্ধনের জন্য সে লালায়িত হয়; বন্ধন যে কি তাহা ত সে জানে না। আত্মহারার এই ভ্রমে দোষ কি?

এই জন্য অধিকার-সম্পন্ন মানুষ মাত্রেরই 'আমি কে' জানিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। সেটুকু যতক্ষণ পরিজ্ঞাত না হয়, ততক্ষণ তাহার চেষ্টা জ্ঞানীর চক্ষে মত্ত-চেষ্টাবৎ প্রতিভাত হইতে থাকে। এ সম্বন্ধে একটী প্রসিদ্ধ গল্পও আছে। মাতালের সভা, খুব গঠরা চলিতেছে, রাত্রি গভীর, তন্মধ্যে এক জন ক্রমে বেহুঁস হইবার মত হইতেছে; তখন তাহার এক বন্ধু বলিল, "ভাই রাত্রি অধিক হইয়াছে, তুমি বাড়ী যাও, আমরাও যাইতেছি"—শুনিয়া মাতাল-প্রবর জড়িত-স্বরে উত্তর করিলেন, "হাঁ, যাইব বটে, কিন্তু কোন্ আমি যাইব, আমি-আমি যাইব না, —তুমি-আমি যাইব।"

মাতাল তখন আত্মহারা, 'কে আমি' সে জ্ঞান তাহার তখন বিলুপ্ত; তাই সে আপনাকে স্থির করিতে না পারিয়া উক্ত বাক্য প্রয়োগকরে। মাতালের একথা শুনিয়া যে বুঝিবে, সেই হাসিবে। আর তোমার আমার অন্যায় আত্মহারার চেষ্টা দেখিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি না হাসিবেন কেন?

কিন্তু 'আমি কে' বুঝিতে হইলে একটু বোকা হইতে হইবে, হয় ত শাস্ত্রও মানিতে হইবে। না মান ত এ দিকে আসিও না; আসিতে হয়, চুপ করিয়া শুন।

আমরা সচরাচর সহজ ভাষায় ও সরল জ্ঞানে দেহকেই 'আমি' বলিয়া ব্যবহার করি বটে; কিন্তু বস্তুগত্যা এই জড়পিণ্ড ভৌতিক

দেহ অস্মৎপদ বাচ্য নহে। এ সম্বন্ধে 'আমার দেহ' এই ব্যবহারটাই বেশ উৎকৃষ্ট প্রমাণ। দেহ আমি হইলে আমার দেহ এ ব্যবহার থাকিত না। বিশেষতঃ দেহের ধ্বংস ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ; দেহ 'আমি' বা আত্মা হইলে জন্মান্তর, অদৃষ্টবাদ,—এ সমস্তই বিলুপ্ত হয়। বস্তুতঃ এ সমস্ত অস্বীকার করিবার যো নাই। যাহাকে আমি 'আমি' বলিয়া বুঝিব ; ওপরে তাহাকেই অপর লোক 'তুমি' বা 'সে' বলিয়া বুঝিবে। দেহইযদি আত্মা হয়, তবে মরিয়া গেলেও যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ 'তাহার' অস্তিত্ব মনে করিয়া কেহ ক্ষণকালের তরেও শোক সম্বরণ করে না কেন ? সে ত তখন বর্ত্তমান ?—তাই বলিতেছিলাম, দেহ 'আমি' নহে। যিনি চৈতন্যের আশ্রয় তিনিই আমি। ইন্দ্রিয়াদিও আত্মা নহে। ইন্দ্রিয়াদির বিনাশ হইলেও 'আমার' অস্তিত্ব সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। একমাত্র দেহকে সেই চৈতন্যের আশ্রয় বলিলে, মৃত্যুর পর চৈতন্য থাকে না কেন ? দেহ ত থাকে। সুতরাং কত সমবেত শক্তির উপর, শিথিল মুল মহাভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া চৈতন্যের কারণ স্থিতি ও আশ্রয় স্থির করিতে হয়। তাহাতে গৌরব ভিন্ন লাঘব নাই। নানা ক্ষণভঙ্গুর বস্তুকে চৈতন্যের উপাদান বলিয়া স্থির করা অপেক্ষা একটা অখণ্ড নিত্যবস্তুকে চৈতন্যের কারণ বলিতেই বরং লাঘব ; তদ্ভিন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ শাস্ত্র, এই পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।

গীতা

"আত্মাকে ছেদন করা যায় না, দাহ করা যায় না, জলে পচান যায় না, শুষ্ক করাও যায় না ; ইনি নিত্য, সর্ব্বত্র্যা স্থিরতর, অবিকারী এবং অপরিণামী।"

শেষ কথা এই যে, দেহকে আত্মা বলিলে যোগোক্ত প্রক্রিয়া সকল সংঘটিত হইতেই পারে না ; আজকাল বিলুপ্তই হউক, আর বিরলই হউক, কিন্তু যোগোক্ত বিজ্ঞান যে সম্পূর্ণ সত্য ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ এখনও অনেক আছে। সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদি আত্মা নহে। মাদৃশ ব্যক্তি কি ইহা বুঝিতে পারে ? কাজেই মুলেই যখন ভুল, তখন তাহারা আপনার প্রকৃত পন্থা নিরূপণ করিবে কি প্রকারে ?

এই অজ্ঞানমুলক মমতাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবের বন্ধনের হেতু। 'আমি' যে পদার্থ, বস্তুত তাহার সঙ্গে জড় জগতের কোন বস্তুরই সম্বন্ধ নাই, অথচ 'আমার পুত্র' 'আমার স্ত্রী' 'আমার ধন' এই অজ্ঞান সমুদ্ভূত দৃঢ় সংস্কারই জীবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতেছে। শৃঙ্খল দুই প্রকার, লৌহময় এবং স্বর্ণময় ; পাপী, লৌহময় শৃঙ্খলে আবদ্ধ ; আর পুণ্যবান্ স্বর্গগত ব্যক্তি, স্বর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যাই হউক, পাপ পুণ্যের অধীনে থাকিয়া আত্মা যে স্বাধীন ভাবে একেবারেই বঞ্চিত তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কোথায় নির্ম্মল নির্ব্বিকার পূর্ণচিদানন্দময় আত্মা, আর কোথায় ক্ষণবিনশ্বর দুঃখ-অসন্তোষ-মুল সুখ-দুঃখ-পরিণাম !! এই অদ্ভুত সংমিশ্রণের প্রকৃত সম্ভাবনা একেবারে না থাকিলেও ঘটনায় তাহাই পরিণত। এই বন্ধনকে ক্লেশকর

বলিয়া ধারণা করা, অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি দূর করা ও সেই পরম পুরুষার্থমুক্তি লাভ করা হিন্দু জীবনের উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম, বন্ধনের নিদান হইলেও ধর্ম্মফলে আত্মপ্রসাদ হয়; এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।"

কিন্তু এই আত্মপ্রসাদক ধর্ম্মসঞ্চয় যে কত জন্মে হয়, তাহা বলা যায় না। বন্ধন রজ্জু ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে জীবের প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে দুঃখের দিকে।

পাপের ফলভোগে ত দুঃখ আছেই; তদ্ভিন্ন পুণ্য ফল স্বর্গভোগেও দুঃখ। সর্ব্বদাই মনে মনে আশঙ্কা থাকে, এই পুণ্যটুকু ক্ষয় হইলেই ত সর্ব্বনাশ। আবার ত সেই পার্থিব যন্ত্রণা; আবার ত সেই সংসার দাবদহনে স্ত্রীপুত্রবিরহজ্বালা সহ্য করিতে হইবে; আধিব্যাধির প্রবল শিখায় পরামৃষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং ভাবিদুঃখের আশঙ্কা এই সুখভোগেও দুঃখসঞ্চয় করিয়া থাকে। আবার স্বর্গসুখেরও উৎকর্ষাপকর্ষ আছে; অধিক পুণ্যবানের অধিক সুখ, তদপেক্ষা স্বল্পপুণ্যবানের তদপেক্ষা কম সুখ; এই উৎকর্ষাপকর্ষ স্বর্গগতের অসন্তোষ ও দুঃখপ্রদ। আর পার্থিব সংসারের ত সদা দুঃখ; প্রবল রাজরাজেশ্বর হইতে কুটীর বাসী দীন দুঃখী পর্য্যন্ত—কোন-না-কোন মহান্ দুঃখ সকলেরই অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া আছে। এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করার ফল, ঐহিক পারত্রিক ফলভোগবিতৃষ্ণা। এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ বাসনাই মুমুক্ষুত্ব। 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক মুমুক্ষার অনতর কারণ। কেবল ব্রহ্মই নিত্য, আর তদ্ভিন্ন সকল বস্তুই অনিত্য;—এই বিষয় দৃঢ়ধারণাই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক।

আর সঙ্গে সঙ্গে চাই শমদমাদির সাহায্য; তাহা হইলেই জীব, ক্রমে গুরুকৃপাবলে বন্ধনের দায় হইতে অব্যাহতি পায়—ইহাই মুক্তি।

মুক্তির পরিচয় এইরূপে প্রদত্ত হইলেও মুক্তির স্বরূপ নিরূপণে মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন, নিত্যসুখসাক্ষাৎকারই মুক্তি। নিত্য সুখ অবিনশ্বর চিরস্থায়ী সুখ, সবার জন্যই আছে, যে খুঁজিয়া লইতে পারে, সেইই ধন্য। সেই নিত্য সুখ খুঁজিয়া পাওয়াই মুক্তি। কেহ বলেন অদৃষ্ট নিবৃত্তিই মুক্তি। জ্ঞানবলে যে অদৃষ্ট ক্ষয় হয় তাহাই মুক্তি। কেহ বলেন সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তিই মুক্তি। যে দুঃখ ধ্বংস আর কোন দুঃখেরই সমকালে থাকিবে না, তাহাই মুক্তি। তোমার আমারও দুঃখ ধ্বংস হয় বটে, কিন্তু সেই ধ্বংস অপর দুঃখের সমকালীন। ধ্বংসের আর ধ্বংস নাই; এক বার ধ্বংস আসিলে তাহা আর কাহারও নষ্ট হয় না; সুতরাং এই অনন্তকালের মধ্যে একবার দুঃখঘটনা হইলেই এই দুঃখ, সেই দুঃখধ্বংসের সমকালীন হইবে। অতএব এইরূপ দুঃখধ্বংস মুক্তি নহে। যে দুঃখ ধ্বংসের পর আর কখন দুঃখ হয় না, তাহাই মুক্তি। কেহ বলেন, সুখদুঃখের চরম ধ্বংসই মুক্তি। মুক্ত পুরুষের সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না; তবে যে বেদে আছে,

'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতম্।'

অর্থাৎ "আনন্দই ব্রহ্ম স্বরূপ, মুক্তিই সেই আনন্দময়ের আনন্দ রূপ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, মুক্তিতে দুঃখের সম্বন্ধ নাই; ভারবাহী ভার ফেলিয়া শ্রম দূর হওয়াতে আপনাকে সুখী মনে করে, অথচ তাহা বস্তুতঃ দুঃখ নিবৃত্তি ভিন্ন সুখপদবাচ্য হইতে পারে না; মুক্তির আনন্দরূপতাও তদ্রূপ। দুঃখধ্বংসাত্মকত্বই এ স্থলের আনন্দরূপত্ব। শৈববৈষ্ণবগণ, পঞ্চবিধ মুক্তি বলিয়া থাকেন, সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য এবং নির্ব্বাণ।

১—সারূপ্য। উপাস্যের সমরূপাক্রান্তিই একবিধ মুক্তি।

২—সালোক্য। উপাস্য দেবের সহিত এক লোকে বা এক ধামে বাস।

৩—সামীপ্য। উপাস্য দেবতার সমীপে অবস্থান।

৪—সাযুজ্য। উপাস্য দেবে মিলিত হওয়া।

৫—নির্ব্বাণ। ইহাই শ্রেষ্ঠ মুক্তি, আপনার অস্তিত্বের উপাস্য দেবে পর্য্যবসানই এই নির্ব্বাণ মুক্তি। শুক, নারদ, বৈষ্ণবগণের মতে বিষ্ণুদাস্য সমুদয় মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সনক, সনন্দ, সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন। হায়! এক আত্মজ্ঞান অভাবেই আমরা মুক্তিলাভে বঞ্চিত, উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল সংসারসাগরে নিপতিত!!

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ।'
(শ্রুতি)

আমরা আত্মঘাতী, আত্মার প্রকৃতভাব বিনষ্ট করিতেছি, অন্ধতমসাবৃত অসূর্য্যলোক জননীজঠর আমাদিগকে পরিণামেও ভোগ করিতে হইবে। মধুসূদন হে! পরিত্রাণ কর।

অস্তিত্ববাদ।

অস্তি এবং নাস্তি আছে ও নাই। যাহারা আছে বলে তাহারা আস্তিক এবং যাহারা নাই বলে তাহারা নাস্তিক। মানব জগতের আদি হইতেই এই বিবাদ উভয় সম্প্রদায় মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। এই বিবাদ লইয়াই বেদ, উপনিষদ, সংহিতা; এই বিবাদ লইয়াই বেদান্ত, ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন; এই বিবাদ লইয়াই পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র; এই বিবাদ লইয়াই কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ। এই বিবাদ লইয়াই চার্ব্বাক দর্শনাদি নাস্তিক শাস্ত্র।

যতই কেন বিবাদ হউক না, সত্যের গতি অপ্রতিহত। যে যে ধর্ম্মেই থাকুক না কেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অতি অল্প লোকেই অস্বীকার করে। বোধ হয়, মানব জগতে আস্তিকের সংখ্যা পনের আনারও অধিক।

সংসারে প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকিলে কেহই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হিংসা, কঠোরতা প্রভৃতিই মানব সমাজকে দৃঢ়তা

শিক্ষা প্রদান করে। সেই জন্য ঈশ্বর বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই নাস্তিক সৃষ্টি করিয়াছেন। নাস্তিকতার মূল দৃঢ় করিবার জন্যই যেন মুষ্টিমেয় নাস্তিক দল আজিও মানব জগতে আস্তিকতার পথের কণ্টক হইয়া রহিয়াছে. নচেৎ যে সকল ব্যক্তি সংসারে বুদ্ধিমান শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাহারাও কেন সেই অসীম জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তার অস্তিত্ব বিষয়ে অন্ধ হইবে?

যে অস্তিত্বের সম্বন্ধে সমস্ত আস্তিক ভুরি ভুরি অকাট্য প্রমাণ দ্বারায় আস্তিকতার মূল বজ্র বন্ধনে দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে, তদ্বিষয়ে মাদৃশ জনের হস্তক্ষেপ করা বাচালতা প্রকাশ মাত্র। যাঁহার অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব অনুভূত হয়, তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। যিনি স্বপ্রকাশরূপ অনন্ত মহিমাময় বিশ্বনিয়ন্তা, যিনি আদ্য-অন্ত, মধ্য রহিত, বেদ পুরাণাদির অগোচর-অনন্ত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রচনাকৌশল ও সুনিয়মের পরিচয় প্রদান করিতেছে, সৃষ্ট জগতের একটি ক্ষুদ্রতম পরমাণু কি তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়া পূর্ণব্রহ্মসনাতনের মহিমা বৃদ্ধি করিবে? না এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া গভীর জ্ঞান সমুদ্র মথিত আস্তিক শাস্ত্রের উজ্জ্বল প্রভা মলিন করিয়া লোক সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিবে? না, এই উন্মত্তের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া এ প্রবন্ধের অবতারণা হইতেছে না। তাঁহার অপার মহিমার বিষয় আলোচনা করিলে হৃদয় আনন্দরসে পূর্ণ হয় বলিয়াই বেদ, পুরাণ, দর্শনাদির প্রতিপাদ্য যুক্তির অনুসরণ করা হইতেছে।

নাস্তিক দুই প্রকার, এক প্রকার নাস্তিক যাহারা প্রকাশ্যভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া আস্তিক মত খণ্ডনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। আর একপ্রকার নাস্তিক যাহারা সমাজের অনুরোধে বা অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য মুখে মাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভান করিয়া কার্য্যতঃ অনাস্থা প্রদর্শন ও তাঁহার অসীম মহিমার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে। এবং উপাসনা গৃহে বা শ্রেষ্ঠ সমাজে লোক নিন্দা ভয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত আচরণ ও কতকগুলি অযৌক্তিক তর্কের অবতারণা করিয়া উপাসনার অনাবশ্যকতা প্রভৃতি বাক্য দ্বারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অস্বীকার করে। পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক সম্প্রদায়ের সংখ্যা জগতে অতি বিরল। প্রত্যেক স্থলে প্রত্যেক সমাজেই শেষোক্তের সংখ্যা অধিক। প্রথমোক্ত নাস্তিক সম্প্রদায় দ্বারা আস্তিকতা বা জাতিয়তা ধর্ম্মের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। বরং প্রতিদ্বন্দিতায় আস্তিকতার লৌহ আবরণ আরও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শেষোক্ত গুপ্তবেশী নাস্তিকদল ধর্ম্মের ও সমাজের ঘোর শত্রু। তাহারা সাধু-বেশী চোরের ন্যায় গুপ্তভাবে ক্রমে ক্রমে সমাজের মহদনিষ্ট সাধন করিতেছে। তরলমতি বালকগণ ঐ কুসংসর্গের মোহিনী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিকৃত ভাবাপন্ন হইতেছে। সরলা কুলকামিনীগণও ঐ কুহকে ভুলিয়া ক্রমে বিপথগামিনী হইতেছে।

শেষোক্ত নাস্তিকগণ মধ্যে কেহ বলে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব প্রকৃতি-সম্ভূত এবং স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালিত, কেহ বলে, ঈশ্বর থাকিলেও তাঁহাকে আমাদের উপাসনা করিবার আবশ্যক নাই। কেহ বলে, পুরুষকার দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সাধিত হইতেছে, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। কেহ বলে, ঈশ্বর-জ্ঞান কেবল আমাদের বাল্য শিক্ষার কুফল বৈ আর কিছুই নহে। এইরূপ অযৌক্তিক নানা কথা দ্বারাই সমাজের ভবিষ্যত চিত্র ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। এ প্রবন্ধে পূর্ব্বাচার্য্যগণের পদানুসরণ করিয়া ঐ সমস্ত অযৌক্তিক কথার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সাঙ্খ্য শাস্ত্র দুই প্রকার, "নিরীশ্বর সাঙ্খ্য" ও সেশ্বর সাঙ্খ্য"। মহর্ষি কপিল কৃত কাপিল সূত্রই "নিরীশ্বর সাঙ্খ্য" এবং মহামুনি পতঞ্জলি কৃত পাতঞ্জল দর্শন সেশ্বর সাঙ্খ্য নামে অভিহিত। কপিল মতে নিরীশ্বর সাঙ্খ্য দর্শনে প্রকৃতিই সৃষ্টির মূল, প্রকৃতির বিকৃতিই সৃষ্টি। সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই "মূলা প্রকৃতি" সংজ্ঞায় অভিহিতা। সাঙ্খ্য মতে প্রকৃতি ভিন্ন স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা আর কেহই নাই।

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" সূত্র দ্বারা কপিলাচার্য্য পৃথক ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন। এবং "সেশ্বর সাঙ্খ্য পাতঞ্জল দর্শন" প্রকৃতি হইতে পর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশক্তিমান, একজন প্রধান পুরুষকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে "ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ" কপিল-শিষ্য, ব্রহ্মমীমাংসা ও সাঙ্খ্য প্রবচনের ভাষ্যকার, বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, কপিলদেব যে ঈশ্বর নাই বলিয়াছেন, সে কেবল বাদী পক্ষকে নিরস্ত করিবার জন্য। নচেৎ প্রকৃত পক্ষে কপিল মতেও ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে। কপিল মতে যদি পৃথক ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করা না হইত, তথাপি আমরা তাঁহাকে নাস্তিক মতের পথপ্রদর্শক বলিয়া স্বীকার করিতাম না; কারণ, তিনি যে ত্রিগুণাত্মিকা মূলা প্রকৃতিকে বিশ্ববীজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত "আদ্যা শক্তি" পদবাচ্য। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের আদ্যা-কালিকার সহিত কাপিল শাস্ত্রের মূলা প্রকৃতির বিশেষ কোন প্রভেদ নাই।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আদ্যাশক্তি কেবল উদাসীন পরব্রহ্মের ইচ্ছা মাত্র অবলম্বন করিয়া থাকেন। এবং কাপিল মতের মূলা প্রকৃতি পৃথক্ ব্রহ্মের ইচ্ছার সাপেক্ষ না করিয়া স্বয়ংই সৃষ্টির কার্য্য সম্পন্ন করেন।

বিশেষতঃ যে মহর্ষি কপিলাচার্য্যকে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি প্রধান প্রধান হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থে ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তিনি কখনও নাস্তিক হইতে পারেন না। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর নাস্তিকগণ কাপিল মতের বিপরীত অর্থ করিয়াই প্রকৃতি শব্দের সাধারণ স্বভাব স্থির করিয়া থাকেন। এবং স্বভাব হইতেই জগতের উৎপত্তি ও স্বাভাবিক শক্তি বলে পরিচালিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বস্তুতঃ এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক! প্রথমত দেখিতে হইবে, প্রকৃতি বা স্বভাব কোন ভৌতিক

পদার্থের গুণবিশেষ না ভৌতিক মূল পদার্থ। প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থেরই কত গুলি গুণ আছে, ঐ গুণের নাম বস্তুগত ধর্ম্ম বা স্বভাব। চেতন অচেতন উদ্ভিদ যাবতীয় জাগতিক পদার্থ মাত্রই কোন-না-কোন স্বভাবাক্রান্ত। এইরূপ প্রত্যেক পদার্থেই পৃথক পৃথক প্রকৃতি বিদ্যমান, পদার্থগত প্রকৃতিই পদার্থের পরিচায়ক, এবং প্রকৃতিবৈষম্যই সৃষ্টিবৈচিত্রের কারণ। কিন্তু প্রত্যেক পদার্থের প্রকৃতি বা ধর্ম্ম পৃথক হইলেও জাগতিক সমস্ত পদার্থই সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা মূলাপ্রকৃতির অধীন। সৃষ্টি স্থিতি লয় এই তিনটি গুণ সমস্ত পদার্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ভৌতিক পদার্থের সমষ্টিরূপ দৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ও সেই ত্রিগুণাত্মিকা মহা প্রকৃতির অধীন, এবং প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত। কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃতি বিশ্বোৎপত্তির কারণ নহে। তোমার, আমার, অগ্নি, জল প্রভৃতি সমস্ত পদার্থেরই যে এক একটি স্বভাব আছে, তাহা তোমার আমার অভাবে কথনই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। ভৌতিক পদার্থের গুণস্বরূপ প্রকৃতি; পদার্থোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হয় এবং পদার্থনাশের সঙ্গে সঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির সহিত ভৌতিক পদার্থের "ধর্ম্ম ধর্ম্মী" রূপ অপরিহার্য্য সমবায় সম্বন্ধ। প্রকৃতি বা স্বভাবের নাম ধর্ম্ম ও ভৌতিক পদার্থের নাম ধর্ম্মী। প্রকৃতি ভিন্ন শুদ্ধ পদার্থ থাকিতে পারে না, এবং পদার্থ ভিন্নও প্রকৃতির সত্তা থাকে না। সুতরাং পদার্থ সমষ্টিরূপ বিশ্ব জগতের মহা প্রকৃতিও যদি বিশ্বোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত এবং সৃষ্টি লয়ের সহিত অত্যন্তাভাব প্রাপ্ত হয় তবে আর পুনঃ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। এবং বর্ত্তমান সৃষ্টির প্রতিও প্রকৃতি উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। আর যদি সৃষ্টিনাশে প্রকৃতির অত্যন্তাভাব স্বীকার না করা যায় তবে গুণ বা ধর্ম্মস্বরূপ প্রকৃতি কোন্ ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে? অতএব ধর্ম্ম স্বরূপা মূলা প্রকৃতির আশ্রয় জন্য একজন ধর্ম্মীর প্রয়োজন এবং সেই "ধর্ম্মীই" পরম পুরুষ ঈশ্বর পদ বাচ্য। যেমন আমার সহিত আমার প্রকৃতি বা স্বভাবের অভিন্ন সম্বন্ধ তদ্রূপ ত্রিগুণাত্মিকা মূলা প্রকৃতির সহিত পরম ব্রহ্মের অভেদ সম্বন্ধ। সেই পরমপুরুষের ইচ্ছানুসারেই প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সাধারণ জীব যেমন প্রকৃতি বা মায়ার অধীন, ঈশ্বর তাহা নহেন, তিনি প্রকৃতিকে স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত করিয়া থাকেন।

এস্থলে পঞ্চদশীকার বেদের অভিপ্রায় লিখিয়াছেন যে,—

> "চিদানন্দ পরমব্রহ্ম ইচ্ছায়া সমুপার্জ্জিতা
> রজস্তমঃ সত্ত্বময়ী প্রকৃতি র্দ্বিবিধা ভুবা
> সত্ত্ব শুদ্ধ বিশুদ্ধাভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তে মতে।
> মায়া বিম্বো বশীকৃত্য স স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
> অবিদ্যা বশগ স্তন্যঃ তৎ বৈচিত্র্যা দনে কধা।"

সত্ত্ব রজঃ তম স্বরূপা প্রকৃতি চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের ছায়া স্বরূপা, এবং সেই প্রকৃতি সত্ত্বাসত্ত্ব ভেদে মায়া ও অবিদ্যা সংজ্ঞায় অভিহিতা। যিনি মায়া বিম্বকে বশীভূত করিয়া ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। তদ্ভিন্ন আর সমস্তই

অবিদ্যার অধীন। এবং সেই অবিদ্যার বিক্ষোভিত অবস্থাই সৃষ্টির নানাত্ব প্রতিপাদক সাঙ্খ্য পাতঞ্জল দর্শনে সৃষ্টি কার্য্যার্থে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত দর্শনে কেবল একমাত্র পরম ব্রহ্ম ভিন্ন আর পদার্থান্তর স্বীকৃত হয় নাই।

"অজামেকামিত্যাদি" (শ্রুতিঃ) "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ" (ইত্যাদি শ্রুতি) দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরতাদি গুণক অন্তর্যামী একমাত্র ঈশ্বরকেই জগৎ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঈশ্বরের আবরণ শক্তি (মায়া) ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বারাই জগৎ সৃজন করিয়া থাকেন। আবরণ শক্তি (মায়া) দ্বারা ঈশ্বরে জগৎ ভ্রম হয় ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা জগৎ সৃজিত হয়। যথা—

"বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদিব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ।"

এই দ্বিবিধা ব্রহ্মশক্তিই প্রকৃতি পদ বাচ্য। সৃষ্টির উপকরণ (তত্ত্ব) সম্বন্ধে সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের সহিত বেদান্ত দর্শনের মতভেদ থাকিলেও ঈশ্বরের সত্তা বা সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে মতের অনৈক্য নাই। ইষ্টকাদি নির্ম্মিত অট্টালিকার সৃষ্টিকর্ত্তা যেমন নানা পদার্থের সহায়তায় শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হন, তদ্রূপ ইন্দ্রজালাদি কুহকে তাদৃশ অট্টালিকাদি প্রদর্শন করাইয়াই ঐন্দ্রজালিকগণ ততোধিক প্রশংসার্হ হইয়া থাকেন।

সুতরাং পদার্থান্তর দ্বারা জগত সৃজন অপেক্ষা কেবল স্বপ্নবৎ মায়া দ্বারা ভ্রমাত্মক জগৎ সৃজন করা পরমেশ্বরের মহিমার লাঘবতার কারণ নহে।

যিনি নিদ্রিতাবস্থায় পদার্থান্তরের সহায়তা ভিন্ন স্বপ্ন বা মায়া বলে দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবকে সুখদুঃখাদির বশীভূত করিয়া থাকেন, স্বপ্ন প্রদর্শিত বিষয়কে তৎকালে ভ্রান্তি বলিয়া বিশ্বাস করিবার উপায় নাই, সেই অসীম মহিমাময় জগৎ কারণ ঈশ্বর যে মায়াবলে জাগ্রতাবস্থায় ভ্রমাত্মক জগৎ প্রদর্শন করাইয়া জীবকে সুখদুঃখাদির বশীভূত করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? মোহবশে স্বপ্নাবস্থায় যদি স্বপ্নের বিষয় প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়, তবে মোহময় জাগ্রতাবস্থার বিষয়গুলিও ভ্রমাত্মক না হওয়ার কোন কারণ নাই।

মহর্ষি কণাদ কৃত বৈশেষিক দর্শন ও মহর্ষি গোতম কৃত ন্যায় দর্শনের অভিপ্রায় প্রায় একইরূপ। উভয়েই অনুমানকে প্রধান প্রমাণ স্বীকার করিয়া কার্য্যরূপ সৃষ্ট জগতের কারণ স্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। যখন সামান্য ঘট পটাদি কোন কার্য্যই কর্ত্তার অভাবে সম্পাদিত হয় না। তখন এই অনন্ত জগৎ কাণ্ড কিরূপে কর্ত্তার অভাবে সম্পন্ন হইতে পারে যথা—

"সাপেক্ষত্বাদনাদিত্বাদ্বৈচিত্র্যাদ্ বিশ্ববৃত্তিতঃ।
প্রত্যাত্মনিয়মাদ্ভুক্তেরস্তি হেতুরলৌকিকঃ॥
কুসুমাঞ্জলি।

যখন কারণ ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না, তখন এই মানুসিক সৃষ্টিকার্য্যেরও একজন অসীমশক্তিসম্পন্ন স্বতন্ত্র কর্ত্তা আছেন;

ন্যায় দর্শনে যে অনুমানকে প্রধান প্রমাণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে ঐ অনু-

মান নানা প্রকার হইলেও সন্দেহাত্মক ও নিশ্চয়াত্মক অথবা ব্যভিচারী ও সদ্ধেতুক, এই দুই প্রকার অনুমানই প্রধান। ভেকধ্বনি দ্বারা বৃষ্টির অনুমান সন্দেহাত্মক বা ব্যাভিচারী অনুমান, এবং সঙ্গীত শ্রবণে গৃহস্থিত পুরুষের জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক অনুমান। জগৎ কার্য্য দর্শনে যে জগৎকর্ত্তার অস্তিত্ব জ্ঞান হয় এইটিই সেই নিশ্চয়াত্মক অনুমান। সৃষ্টির অলৌকিক কৌশল ও সুনিয়ম দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব বিষয়ে কখনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ষড়দর্শনান্তর্গত মীমাংসা দর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন, শৈব দর্শন, রামানুজ দর্শন, নকুলীশ পাশুপত দর্শন, আর্হত দর্শন প্রভৃতি প্রায় সমুদায় উপদর্শনও একবাক্যে প্রকৃতি হইতে পৃথক সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

এই দৃশ্যমান জগৎ যাঁহার অনন্ত মহিমার জ্বলন্ত প্রমাণ বৃহৎ সূর্য্য চন্দ্র গিরি সমুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম কীটাণু পর্য্যন্ত যাঁহার সৃষ্টি নৈপুণ্য এবং অখণ্ড প্রতাপের পরিচয় দিতেছে, কে সেই পরাৎপর পরম পুরুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবে? এস্থানে একটি প্রকৃত ঘটনা দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রকাশ করিতে হইল।

একজন ইউরোপীয় আস্তিক জ্যোতির্ব্বিদ সায়ংকালে ছাদের উপর বসিয়া কতকগুলি যন্ত্রের সহায়তায় জ্যোতিস্তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় তাঁহার এক জন নাস্তিক বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত বন্ধুকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি নিয়মিত উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছি, বন্ধু উপহাস করিয়া বলিলেন আপনার ন্যায় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে এরূপ কুসংস্কারাপন্ন দেখিয়া আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, জ্যোতির্ব্বিদ জ্ঞানের বিশদ আলোকেও যে আপনার অস্তিত্বের অন্ধতামিশ্র ভেদ করিতে পারিল না ইহাই দুঃখের বিষয়। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত বলিলেন, এখন আমার উত্তর দিবার অবকাশ নাই। আমি যতক্ষণ ভজনালয় হইতে প্রত্যাগত না হই, ততক্ষণ আপনি এই গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি নির্ণায়ক যন্ত্রের পরিচালন ক্রিয়া ও মনোনিবেশ পূর্ব্বক আকাশস্থ জ্যোতিশ্চক্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করুন। আমি উপাসনান্তে আসিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব, এই বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ভজনালয়ে গমন করিলেন। এবং নাস্তিক বন্ধুও যন্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত উপাসনান্তে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার নাস্তিক বন্ধু আকাশ পটে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। তখন তিনি বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনার প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করুন। বন্ধু চকিতের ন্যায় আকাশ পট হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পুলকিত ভাবে বলিলেন, "আমি উত্তর পাইয়াছি"। জ্যোতির্ব্বিদ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আপনাকে উত্তর প্রদান করিল? বন্ধু বলিলেন আপনার কৌশল ও এই জ্যোতির্ম্মণ্ডল। জ্যোতির্ব্বিদ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উত্তর

পাইলেন? বন্ধু উত্তর করিল, এত দিন যে, মোহান্ধকারে নয়ন আবৃত ছিল অদ্য তাহা প্রস্ফুটিত হইল, এখন আর আমাকে নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করিবেন না। অদ্য আপনার অনুগ্রহে সেই অনন্ত মহিমাময় সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হইলাম, আপনি আমার নিকট হইতে গমন করিলে আমি প্রথমতঃ গতি নির্ণায়ক যন্ত্রের ক্রিয়া দেখিয়া যন্ত্র নির্ম্মাতার রচনা কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিলাম তৎপরে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া আকাশস্থ জ্যোতির্ম্ময়গণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, জ্যোতির্ম্ময় প্রকাণ্ড গ্রহ উপগ্রহগণ অনন্ত আকাশ পথে প্রচণ্ডবেগে ঘূর্ণিত হইয়া নিজ নিজ কক্ষাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। তখন আমার মনোমধ্যে অপূর্ব্ব অভাবনীয় ভাবের উদয় হইল। ভাবিলাম, সামান্য একটি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র যন্ত্রের ক্রিয়া দেখিয়া তাহার নির্ম্মাতাকে বুদ্ধি ও কৌশলের জন্য শত শত প্রশংসা করিতেছিলাম, আর যে অনন্ত মহিমাময় ঈশ্বরের অসামান্য সৃষ্টি কৌশলে এই অসীম গগণাঙ্গনে উড্ডীয়মান বালুকা রাশি সদৃশ অসংখ্য সৌর জগৎ নিজ নিজ গতি পথে প্রধাবিত হইতেছে, সেই বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের বিষয় একবারও কল্পনায় উদিত হয় নাই। কি আশ্চর্য্য! এই প্রচণ্ড বেগ বিঘূর্ণিত প্রকাণ্ড জ্যোতিঃপিণ্ডগণের যদি একটিও কক্ষভ্রষ্ট হয়, তবে যে কি ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত হইবে, তাহা কল্পনারও অগোচর। কিন্তু সেই অসীম শক্তিমান জগৎকর্ত্তার অখণ্ড আদেশে কেহই নির্দ্দিষ্ট গতি পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছে না। অতএব অনন্ত জগতের কর্ত্তা যে অনন্ত শক্তিমান তাহার সন্দেহ নাই। যখন সামান্য একটি যন্ত্র দেখিয়া তাহার নির্ম্মাতার অস্তিত্বের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন এই অনির্ব্বচনীয় কৌশল পূর্ণ বিশ্ব যন্ত্র দেখিয়া কে না তাহার নির্ম্মাতার অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী হইবে? কে, না তাঁহার অনন্ত মহিমায় বিমোহিত হইবে?

মানব যখন নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হয়, যে বিপদে মনুষ্য বুদ্ধি, মনুষ্য ক্ষমতা, বিপদুদ্ধারে অক্ষম হইয়া থাকে, সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য মানব তখন আর একটি উদ্ধারকর্ত্তার অন্বেষণ করে। বুঝিতে পারুক বা না পারুক, স্বভাব যেন আর এক জনকে আশ্রয় করিবার জন্য উপদেশ দেয়। যদি উহার একটি বিশেষ কারণ না থাকিবে, তবে কেন অনাদিকাল হইতে কোটি কোটি কাতরকণ্ঠ নিরুপায় হইয়া অগতির বন্ধুকে ডাকিয়া আসিবে? এ স্থলে কেহ বলেন, এই সংসারটি কেবল শিক্ষার ফল। জগতের অধিকাংশ কার্য্যই শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে। শিক্ষা বলে মনুষ্য, মনুষ্য নামের অধিকারী হইতেছে, এবং তাহার অভাবে পশুত্ব লাভ করিতেছে। শিক্ষা ও অভ্যাস বলে মনুষ্য অসাধ্য সাধন করিতেও সক্ষম। শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা সৎকার্য্যও কুকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং কুকার্য্য ও সৎকার্য্য বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং বিপদে ঈশ্বর চিন্তা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান কেবল আমাদিগের শৈশবাভ্যস্ত ও পুরুষানুক্রমিক শিক্ষার ফল। কিন্তু আমরা ঐ

রূপ যুক্তিকে নিতান্ত হেয় বলিয়া বোধ করি, কারণ যাহার সত্তা নাই, শিক্ষা বা অভ্যাস কখনও তাহা সম্পন্ন করিতে পারে না। যাহাতে যাহা আছে, শিক্ষা বা অভ্যাস তাহারই বিকাশ করে মাত্র। মনুষ্যের উড়িবার শক্তি নাই, সুতরাং তাহাকে শত শিক্ষা দিলেও সে কদাচ পক্ষীর ন্যায় উড়িতে সক্ষম হইবে না। অনাদি কালের চেষ্টাতে এ পর্য্যন্ত একটী মনুষ্যও উড়িতে শিক্ষা করে নাই। হরবোলা বা ময়না প্রভৃতি কতকগুলি পাখীর শব্দানুকরণ শক্তি আছে সুতরাং শিক্ষা দিলে তাহারা "রাধাকৃষ্ণ" প্রভৃতি নানা শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে। তাই বলিয়া শত চেষ্টা করিলেও ভেড়াকে "রাধাকৃষ্ণ" শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে না। কারণ সে শক্তি তাহার নাই। যাহাতে সুখ-দুঃখ-দয়া-কঠোরতা প্রভৃতির সত্তা আছে, শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা তাহারই বিকাশ বা হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মনুষ্যের স্বভাবতঃ ঈশ্বরজ্ঞান আছে বলিয়াই শিক্ষা দ্বারা তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়। যে উপযুক্ত শিক্ষা পায় না বা চেষ্টা করে না, সে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না; আর যাহার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ হয় সে পরম যোগী হইয়া থাকে।

আরও এ সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা এই যে, জগতে সময়ের গতি বশে এ পর্য্যন্ত কত কত বিষয়ের আলোচনা; কত কত ধর্ম্মের, কত কত জাতির উৎপত্তি; কত কত কার্য্যের অবতারণা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু যেটী অসত্য কখনও কি তাহা সুদীর্ঘকাল স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে? "না" কখনই নহে। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই যে কত বিষয়ের আন্দোলন উঠিয়া অতীতের গভীর অন্ধকারে বিস্মৃতির অতল তলে লুক্কায়িত হইল তাহারই সংখ্যা নাই; আর এই ঈশ্বর লইয়া অনাদি অনন্ত কাল হইতে যে জাতিবিশেষে সম্প্রদায়বিশেষে ঘোর আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, তাহার কি কখন বিরাম দেখিতে পাইয়াছ? কোন পুরাকালের ইতিহাস কি কখন জগতে নাস্তিকতার একাধিপত্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিয়াছে? "না," কখনও সে অখণ্ড সত্য পবিত্র ঈশ্বরের নাম পৃথিবী হইতে লোপ পায় নাই। জগতের অস্তিত্ব থাকিতে কখন পাইবেও না। কারণ অস্তিত্ব জ্ঞান স্বাভাবিক। শিক্ষা প্রাপ্ত হউক বা না হউক, জগৎকাণ্ড দেখিয়াই স্বভাবতঃ মনুষ্য হৃদয়ে এই কয়েকটী প্রশ্নের উদয় হয়, "আমি কে"? "জগৎ কি"? "কে এ জগৎ সৃজন করিলেন"? এবং এই প্রশ্ন হইতে তত্ত্বানুসন্ধান বৃত্তি প্রবল হইয়া ঈশ্বরের সত্তা প্রতিপন্ন করে। প্রবল শক্তির নিকট মনুষ্য মস্তক স্বভাবতঃই অবনত। তাই মানবজ্ঞান প্রথমতঃ ঈশ্বরের পৃথক পৃথক শক্তি, অগ্নি বা জল প্রভৃতিকে পূজা করিয়া পরিশেষে জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সমূহের পরিণাম রূপ ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হয়। অনাদি কাল হইতে কত কত জ্ঞানী কত অশেষ-শাস্ত্রার্থ-পারদর্শিগণ: পিতা পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ যাঁহার সত্তা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, আমি কোন্ সাহসে কোন্ যুক্তিবলে সেই জগৎকারণ পরমপুরুষের অস্তিত্ব অস্বীকার করিব?

শাস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া একবার বিশ্বাসের চক্ষে জগতের প্রতি, আপনার প্রতি, আত্ম পরিবার ও গৃহাদির প্রতি চাহিয়া দেখ প্রত্যেক পদার্থেই তাঁহার সত্তা, তাঁহার দয়া, তাঁহার অপূর্ব্ব কৌশল প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। তুমি আমি যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম, সেই দুর্গম শঙ্কটপূর্ণ স্থানে কে আমাদিগকে রক্ষা করিল, কে সেই জন্মিবার পুর্ব্বে মাতৃস্তনে আহারীয় প্রদান করিল? আসিবার সময় আমরা একটুকু দুধ কিনিবার জন্য একটী পয়সাও কি সঙ্গে আনিয়াছিলাম? "না"। তবে আজ এসব কোথা হইতে যুটিল? কে এত ধন দিল, কে স্ত্রীপুত্র পরিবার দিল? আজ আমার শক্তি হইয়াছে, উপার্জ্জন করিতে শিখিয়াছি, না হয় সেই ধনের বিনিময়ে সমস্ত জুটিয়াছে, কিন্তু যখন আমার পাশ ফিরিবার, কি কথা বলিবার শক্তি ছিলনা তখন কে আমাকে দুর্লভ স্বর্গীয় স্নেহে প্রতিপালন করিল? কে সেই মাতৃহৃদয়ে বিমল স্নেহ প্রদান করিল? কে আমাকে উপার্জ্জন পন্থা শিখাইল? কেহ বলেন, ভবিষ্যদুপকার প্রত্যাশায় পিতামাতা সন্তানকে লালন পালন করেন, এবং শিক্ষাদান করেন। সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। স্বার্থপর মনুষ্য একথা বলিতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃতির প্রতি চাহিয়া দেখ, দেখিবে, সর্ব্বত্রই মাতৃস্নেহ বিরাজমান, অপত্যস্নেহ কিছুরই অপেক্ষা করে না। আত্মাভিমানী মানব মনে করে যে আমার মাতার যথেষ্ট উপকার করিয়েছি, কিন্তু বল দেখি পশু পক্ষী কোন উপকারের জন্য আপনি অনাহারে থাকিয়া শাবককে আহার যোগায়? কোন্ ধনের অভিলাষে কপোতদম্পতি সন্তানের জন্য অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করে? মূঢ় যাহাই কেন বলুক না, কিন্তু কে সেই জগৎপাতার সুনিয়মের বিরুদ্ধে চলিতে পারিবে? তুমি শত চেষ্টা করিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছ না, আর অপোগণ্ড শিশু মাতৃ-অঙ্কে সুখে নিদ্রা যাইতেছে; স্বহস্তে খাইবার শক্তি নাই, তথাপি না খাইতে চাহিলেও আহারীয় দ্রব্য তাহার উদরস্থ হইতেছে; কেন এমন হয়? ইহা দেখিয়াও কি, মনে কিছু বোধ হয় না? এই লীলাবৈচিত্র দেখিয়াও কি বিচিত্র কর্ম্মীর অস্তিত্ব হৃদয়ে ধারণা করিতে ইচ্ছা হয় না? যদি না হয়, তবে সে তাঁহারই ইচ্ছা, নচেৎ নিরক্ষর এক জন সামান্য মনুষ্য কেন তাঁহার প্রেমে মত্ত হইয়া পরমযোগী বা ধর্ম্মপ্রচারক রূপে জগতের পূজনীয় হইতেছে, আর একজন সুশিক্ষিত বিচক্ষণ ব্যক্তিই বা কেন তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া নিন্দিত হইতেছে!

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

ঈশ্বরের মহিমা।

দিবস বিগত, সন্ধ্যা সমাগত,
স্থাবর জঙ্গম যত।
বিষয়-বিরত, হরিপ্রেমে রত,
পূজে তাঁরে নানামত॥
শ্যামল বরণে, অরুণ চন্দনে,
নব দুর্ব্বাদল যত।
অঘ্য সাজায়ে, আনন্দে মাতিয়ে,
ঈশ পদে অবনত॥
কিবা সমীরণ, করিছে সিঞ্চন,
নির্ঝর শীকর লয়ে।
কিবা সরোবর, প্রফুল্ল অন্তর,
কোকনদ সমর্পিয়ে॥
দেখ হেমলতা, মিলি যত লতা,
লয়ে সচন্দন ফুল।
বিহগের রাগে, মহা অনুরাগে,
পূজে তাঁরে তরুকুল॥
সেউতি মালতী, বেল যাঁতি যুথি,
সেফালিকা আদি যত।
বিনত হইয়া, অঞ্জলি ভরিয়া,
সেবিতে চরণে রত॥
দেখ আম্র নিম্ব, রসাল দাড়িম্ব,
কদম্ব প্রভৃতি কত।
তরু নানা জাতি, পূজে ফুলমতি,
ফুল ফলে অবনত॥
যত পাখিগণ, আনন্দিত মন,
মাতিয়া করিছে গান।
তাহে মধুকর, প্রফুল্ল অন্তর,
মাঝে মাঝে মারে তান॥
দেখ মৃগকুল, প্রেমেতে আকুল,
মাতিয়াছে হরিধ্যানে।
স্থাবর জঙ্গম, ছাড়িয়ে সম্ভ্রম,
মাতিয়াছে যশোগানে॥
দিবস রজনী, শশী দিনমণি,
গ্রহতারা সনে সবে।
প্রকৃতি সুন্দরী, মান পরিহরি,
শ্রীচরণ যাঁর সেবে॥
মহদাদি তত্ব, প্রেমেতে উন্মত্ত,
ভূতেন্দ্রিয় দেবগণ।
সদা ভক্তিভরে, অবনত শিরে,
পূজে যাঁর শ্রীচরণ॥
আকাশ পাতাল, হইয়া মাতাল,
সহ ধরা রসাতল।
চরণ সেবন, করে নিশি দিন,
সবে আনন্দে বিহ্বল॥
আমি মাত্র দীন, বিবেক-বিহীন,
তাঁরে না করি স্মরণ।
ইন্দ্রিয়ের বশে, সদা হিংসা দ্বেষে,
আছি বিষয়ে মগন॥
অতএব মন, শুনহ বচন,
যদি নিজ শুভ চাও।
ত্যজিয়া প্রবৃত্তি, ভাব রে নিবৃত্তি,
সদা হরিগুণ গাও॥
ত্যজ মায়া মোহ, পবিত্রিবে দেহ,
শ্রদ্ধা ভক্তি পুষ্পলয়ে।
পূজ শ্রীচরণে, অতি সযতনে,
প্রেম চন্দন মাখাইয়ে॥
সকল বিভূতি পাবে অনুগতি,
মুক্তি হবে করগত।
যোগী-ঋষি-ধ্যেয়, অজ্ঞের অজ্ঞেয়,
ব্রহ্মানন্দ সমুদিত॥

শ্রীমথুরাচন্দ্র মজুমদার।

মুসে গাম্‌বেতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশতের পর)

৪

গাম্‌বেতা, ইতালির গৌরবস্তম্ভ গারিবল্ডিকে এই মর্ম্মে এক পত্র লেখেন।

"প্রিয় সুহৃৎ,

ফ্রান্সে যাহাতে সাধারণতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় তদ্‌বিষয়ে আপনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। একথা ফরাসিজাতি কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। আপনি ফরাসিদের সহোদর জ্ঞান করিয়া থাকেন। সে জন্য তাহাদের বিপদকে নিজ বিপদ মনে করেন। আপনার স্বাভাবিক সদাশয়তা ও সহানুভূতি গুণে যেখানে তাহাদের বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি বুক দিয়া ফরাসিদের সেখানে উদ্ধার করিয়াছেন। তাহারা আপনার নিকট চিরঋণী থাকিবে; সে ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে না। আপনি এখন সিওনা নিওয়ার বিভাগের কর্তৃত্ব করিতে থাকুন এবং স্বাগীতে গিয়া সসৈন্যে অবস্থিতি করুন।

আমাদের বিপদসঙ্কুল অবস্থার পরিবর্ত্তন যাহাতে শীঘ্রই ঘটিতে পারে, তাহার বিশেষ উপায় আমি করিয়াছি। আপনি সহায় হইলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে। যুদ্ধ পুণরারম্ভ হইলে আমাদিগকে সাধারণতন্ত্রীর উপযুক্ত ব্যবহার ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। মনে করিয়াছি, নিয়ম প্রণালী বজায় রাখিয়া সঙ্কল্প সিদ্ধি করিব। উত্তরে আপন কুশল সমাচার লিখিয়া পরিতুষ্ট করিবেন ইতি।

স্নেহাস্পদ,
লিও গাম্‌বেতা।"

ঊনবিংশ শতাব্দীতে একা এক ব্যক্তি কতদূর কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়াছিলেন তাহাই চিরস্মরণীয় হইবে। নূতন সেনা সংগ্রহ, সংগঠন, অস্ত্রশস্ত্র আহরণ; সেনাদের আহার সামগ্রী সংস্থান করা এ সমস্তই গাম্‌বেতা কৃত। এত পরিশ্রম, লাভের প্রত্যাশায় বা প্রশংসার লোভে, তিনি কখনই স্বীকার করেন নাই। স্বদেশের জন্য স্বজাতির মঙ্গলের জন্য তিনি আপন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

জীবন কি?—কাল, সত্তা, অবস্থা না অনন্ত? ব্যাপ্তিতে জীবন পরিমিত নহে। জীবন কুর্ম্মমালা; ইহার পরিমাণ কর্ম্মসমষ্টি। নিষ্কাম কর্ম্মযোগে যে জীবন ব্যয়িত হয় তাহারই মূল্য অধিক। গাম্‌বেতার জীবননদীতে ক্রিয়ার স্রোত বহিয়াছে, দেখ সে স্রোত কেমন অবিরল গতি!

ফ্রান্সের নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ ক্রমে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

জর্ম্মণিবাসীরা ফরাসিদের সহিত এক রকম সন্ধি স্থাপন করিল। বোঁর্দো নগরে ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এক সভার অধিবেশন হয়। সেই সভার উদ্দেশ্য সকল ফরাসিকে সমবেত করিয়া তাহাদের মনে স্বদেশ বাৎসল্যের ভাব উদ্দীপন করা। গাম্‌বেতা এই সুযোগে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন।

"হে স্বদেশবাসীগণ! বিদেশীয়েরা ফরাসিদের উপর অত্যাচার করিবে। প্যাঁরিবাসীরা শত্রুহস্ত হইতে আপনাদিগকে আর রক্ষা করিতে পারিবে না। যে প্যাঁরিকে এত

দিন কেহই সৈন্যবলে পরাস্ত করিতে পারে নাই, আজ দুর্ভিক্ষে সে পাঁরি হীনবল হইয়া-পড়িয়াছে। ২৮এ জানুয়ারিতে পাঁরিবাসীরা আত্মসমর্পণ করিয়াছে। পাঁরির দুর্গ সমুহ শত্রুদের অধীনত হইয়াছে। খাঁটি সহরটী এখনও বজায় আছে, কিন্তু আর থাকে না। কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা যে, এ পর্য্যন্ত কেহ পাঁরিকে সাহায্য করিল না। শত্রুরা আমাদের অনিষ্ট করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছে। পতনে পাই-লেই আমাদের উচ্ছেদ সাধন করিবে।

হে ফরাসিগণ, তোমরা আপন পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কথা একবার স্মরণ কর, তাঁহারা তোমাদের হস্তে অখণ্ড ফরাসি রাজ্য অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এখন কোন্ প্রাণে তোমরা সেই মাতৃভূমিকে অসভ্য শত্রু প্রুসিয়ানদের করে অর্পণ করিবে? প্রুসী-য়েরা ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়াছে, এখন ফরা-সিরা সকলে এক হইয়া উঠুক, এবং শত্রুদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিউক। হে ফরাসিগণ! আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া দেশোদ্ধারকল্পে তোমরা বদ্ধপরিকর হও। প্রাণ, মন, উৎসাহ, বল, বিক্রম, অর্থ সকলই সেই মহাব্রতে উৎসর্গ কর।

পাঁরি পাঁচ মাস কাল ধরিয়া অবরুদ্ধ ছিল। তৎকালে পাঁরিবাসীরা না জানি কতই কষ্ট সহ্য করিয়াছে। সমগ্র ফরাসী-দের এই শিক্ষা ও বিষম পরীক্ষার স্থল বুঝিয়াঝি, জাতীয় জীবন বলিয়া ফরাসীদের এপর্য্যন্ত কোন সামগ্রী নাই। যদি সেই তাহাদের অমূল্য নিধিই থাকিবে, তাহা হইলে কি পাঁরির এতটা দুর্দ্দশা ঘটে। এখন আমাদের সেই অমূল্য নিধি বিশেষ প্রয়োজন। একতাসূত্রে সকল ফরাসিকে সম্বদ্ধ হইতে হইবে নতুবা জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব।

পাঁরি বাসীরা আমাদের শিক্ষা দিয়াছে, স্বদেশ ভক্তির পরাকাষ্ঠা, সাহস ও অধ্য-বসায়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, আত্মত্যাগের অসীম পরিচয় পাঁরিবাসীরা প্রদর্শন করিয়াছে। আমরা বীর বলিয়া এখন অভিমান করি, স্বদেশ বাৎসল্যের আদর্শ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি, কিন্তু কৈ! আমরা ত তাহার পরি-চয় দিতে পারি না। এখনও উদ্ধারের পথ আছে, এখনও শত্রুর প্রতিহিংসা করিবার উপায় আছে। শুনিলাম, গোপনে গোপনে শত্রুদের সহিত এক সন্ধি হইয়াছে। সন্ধি-পত্রে যে সমুদায় যুক্তির কথা উল্লেখ আছে সে ত প্রুসীয়দের সাপক্ষে। পূর্ব্বে ফ্রান্সের যে যে বিভাগ ফরাসিদেশ দ্বারা রক্ষিত ছিল সে সমস্তই এখন শত্রুদিগকে অর্পণ করা হইয়াছে। সুতরাং তত্তৎ বিভাগ প্রুসিয়ান সেনা দ্বারা পরিপূর্ণ। চুক্তিপত্রে আর এক ঘৃণাজনক কথায় উল্লেখ আছে। পত্র স্বাক্ষর হইবার তিন সপ্তাহ কাল আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইবে; অর্থাৎ আমরা যুদ্ধের জন্য কোন আয়োজন বা যোগাড় যন্ত্র কিছুই করিতে পারিব না। ধিক্! শত ধিক! সহস্র ধিক! কেমন করিয়া সে কুলাঙ্গার-দল কাপুরুষের ন্যায় সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিল? কোন্ প্রাণে যে তাহারা এ হীন ঘৃণিত কার্য্য করিল, বলিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট তরফ কোন কর্ম্মচারীর পাঁরি হইতে আসিবার কথা ছিল। আমারাও তাঁহার আগমন

প্রতিক্ষায় বহুদিন ছিলাম। কিন্তু এখন আর অপেক্ষা করিতে পারা যায় না, আর কালবিলম্ব সহে না। এখন তাহার প্রতি-বিধানে তৎপর হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে। প্রুসিয়ানদল এই সুযোগে আমাদের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া আমাদের নীতিভ্রষ্ট করিবার ও আমাদের সেনাদল বিশ্লিষ্ট ও বিচ্যুত করিবার চেষ্টায় আছে। সন্ধিপত্রে আর এক কথার সমাবেশ আছে—সেই তিন সপ্তাহকাল মধ্যে আমাদিগকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—"তোমরা একটী জাতীয় সমিতি করিয়া সভাস্থলে সমস্ত গণ্য মান্য লোক লইয়া পরামর্শ কর; পরে শ্রেয় বিবেচনা করিলে আমাদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিও।" ইহার অর্থ আর কিছুই নহে—ফরাসীরা এই সকল ক্লেশ ও দুর্ঘটনা সহ্য করিয়া যুদ্ধে নিরস্ত হইবে। তৎপরে প্রুসিয়ানরা ফ্রান্স জয় করিবে।

যুদ্ধে আমরা কখনও পরাঙ্মুখ ছিলাম না, কখনও হইব না। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি পশ্চাদ্‌পদ হইব না। সন্ধি করিব না—কলঙ্কের ডালি আর মাথায় তুলিব না। জাতীয় সমিতি এরূপ ভাবে গঠিত করিব যে তাহার সদস্যগণ অপার সাহস ও বীরত্বের অবতার বলিয়া যেন পরিচয় দিতে পারেন। যাহাতে সেই সমিতি বস্তুতঃ জাতীয়ত্ব লাভ করে ও সাধারণতন্ত্র নিয়মে পরিচালিত হয়, তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। সন্ধিসাক্ষরকারীদের সে সভায় প্রবেশাধিকার আদৌ থাকিবে না। সে সভাস্থলে একমাত্র বীরবায়ুই বহন করিতে থাকিবে। সে সভাকে জাতীয়ত্ব ও একতা বলে অনু-প্রাণিত করিতে হইবে। স্বদেশোদ্ধার কল্পে সভ্যগণকে এরূপে দীক্ষিত করিতে হইবে যেন সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে—প্রাণ চাহি না, মান্ চাহি; সন্ধি চাহি না, বিগ্রহ চাহি। আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিব না, তবে আর কেও ঘৃণিত কার্য্য করিবে? ন্যায়প্রিয় লিজিটিমিষ্টদল ফ্রান্সের জন্য এক সময়ে অকাতরে শত্রুকে আপন বুক পাতিয়া দিয়াছে, তাহাদের দ্বারা এ কার্য্য সম্ভাবিত নহে। সম্ভ্রান্তবংশীয় ফরাসীরা এ পাপ কার্য্য করিতে সাহস করিবে কি? তাহারা এক সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় গুলির পার্থক্য রহিত করিয়াছিলেন। তবে এ জঘন্য কার্য্য গরীব মুটে-মজুর চাষা-ভূষা লোক দ্বারা সম্পাদিত হইবে না কি? না—তাহারা এ গর্হিত কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হইবে না। কারণ তাহারাই ত দেশের অস্থি-মজ্জা স্বরূপ। সকল দেশেই চাষাভূষা মুটে-মজুরের দল অধিক আর ধনকুবের ও জমীদারদল মুষ্টিমেয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ চাষা-ভূষা নগণ্য। তাহারা রাজদ্বারে হেয় ঘৃণিত নীচ বলিয়া সমাজের অধস্তন পদবীতে অবস্থাপিত। যত অত্যাচার অবিচার সকলই তাহাদের উপর। তাহাদের মুখ নাই যে প্রকাশ করিয়া আপন দুঃখ বলে, সাহস নাই যে প্রাণের কষ্ট জানায়, অর্থ নাই যে প্রতি-কারের চেষ্টা করে। তাহারা অসাড় নিস্পন্দ স্থাণুবৎ পদদলিত হইয়া পড়িয়া রহি-য়াছে। যিনি তাহাদের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনি বলেন-খাঁটি মনুষ্যত্ব তাহা-দেরই অন্তরে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। ধর্ম্ম-জ্ঞান ও ধর্ম্মবল তাহাদের বিলক্ষণ আছে।

স্বজাতি প্রেম, স্বদেশ বাৎসল্য, সহানুভূতি, একতা এ সমস্ত গুণ গরীবের হৃদয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যতার প্রচণ্ড আলোকে কোমলতা নাই, মাধুর্য্য নাই—কেবল তীব্রতা আছে। সে বিষবৎ তীব্র আলোকে হৃদয় ক্ষেত্র একেবারে জ্বলিয়া যায়। যে কুসুমে কীট প্রবেশ করে নাই তাহা আজিও সুশ্রী আছে, তাহারই সৌরভ অধিক; ফ্রান্সের গরীবলোকই ফরাসিজাতির মেরুদণ্ড। তাহারা আপন বুক চিরিয়া রক্ত দান করিয়াছে, স্বাধীনতাবীজ রোপণ করিয়াছে, সকলকে একতাসূত্রে সম্বদ্ধ করিয়াছে, আপন গৃহসামগ্রী বিক্রয় করিয়া যুদ্ধভার বহন করিয়াছে। এ হেন গরীব লোক কি কখন অপকর্ম্ম করিতে পারে।

এই সময়ে গাম্‌বেতা একটী গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি এক নিয়ম বাহির করেন, যাঁহারা সম্রাজ্যভুক্ত হইবেন তাঁহারা জাতীয় সমিতির সভ্য মনোনীত হইতে পারিবেন না। এই কথা লইয়া চারিদিকে আন্দোলন উঠিল।

ইহার কিছু দিন পরেই গাম্‌বেতা একখানি পত্র পাইলেন। পত্রের নিম্নভাগে বিস্‌মার্কের নাম স্বাক্ষর রহিয়াছে।

"আপনি যে কুনিয়ম বাহির করিয়াছেন আমি তাহার অনুমোদন করি না বরং প্রতিবাদ করি। আমি সেই রাক্ষস নিয়মের ঘোর বিদ্বেষী। জানিতে চাহি, কোন্ আইনবলে আপনি স্বাধীন জাতির নির্ব্বাচিত হইবার স্বত্ব লোপ করিতে চাহেন ?

কাঃ বিস্‌মার্ক।"

কত লোকে কত রকমে গাম্‌বেতাকে নিয়ম ও পত্র প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য অনুরোধ করিল, তিনি কাহারও কথা শুনিলেন না। গাম্‌বেতা সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। যাহা একবার তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইবে তাহা আর ফিরিবার নহে। তিনি দৃঢ়সংকল্প করিয়া বসিয়াছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার নহে—সে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। যখন দেশের বড় বড় লোক তাঁহার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, যাঁহাদের উপর তাঁহার বিস্তর ভরসা ছিল, যাঁহারা তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন, যখন তাঁহারা তাঁহার মতবিরোধী হইলেন, তখন গাম্‌বেতা কার্য্যভার পরিত্যাগ করিলেন।

১লা মার্চ্চ ১৮৭১ সালের বোঁর্দো নগরে এক বিরাট সভা হয়। ঐ সভায় প্রুসিয়ানদের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ঐ কলঙ্কের দিনে গাম্‌বেতা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ফরাসীরা আলসাকা ও লোরেন প্রদেশ প্রেসীয়ানদের অর্পণ করে। এই ঘৃণাজনক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া তিনি শোকে, দুঃখে ঘৃণা ও লজ্জায় দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিস্পানি সীমান্তে সাংসিবাসিন্ নগরে গিয়া অতি হীনভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

হায়! গাম্‌বেতা! আজ দেশ, শোকের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া গেল। হায়, এত কঠোর ব্রত উদ্যাপন হইল না, হায়, এত পরিশ্রম সমস্ত ব্যর্থ হইল। না, না, গাম্‌বেতা, নিরস্ত হইও না, তোমার পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নাই। তুমি বহু যত্নে যে বীজ বপন করিয়াছ তাহার অঙ্কুর আজ দেখা দিল না বটে, কালবশে

উহা অঙ্কুরিত হইবে, কালবশে উহা বৃক্ষে পরিণত হইবে। বৃক্ষে ফল ফলিবে। এ বিশ্বে যাহা কিছু দেখিতেছ তাহার ধ্বংশ বা বিনাশ নাই। যাহা ছিল, তাহা আছে ও থাকিবে। তবে অবস্থা ভেদে, কাল ভেদে, স্থান ভেদে ও পাত্র ভেদে উহার সত্তার ভাবান্তর হয় মাত্র। গুণ ও জ্ঞান ভেদে উহা আমাদের লক্ষ্য বা অলক্ষ্য হয়। এই যে পঞ্চভূত দেখিতেছ, উহা এক একটী শক্তির আধার জানিবে। সেই শক্তি সমষ্টি দ্বারা এই প্রপঞ্চ পরিচালিত। সেই শক্তি নিত্য ও অব্যয়। সেই শক্তিবলে শত যোজন অন্তরে মেঘ আসিয়া শ্রাবণের ধারায় তোমার মস্তকোপরি বর্ষণ করে, পর্ব্বত গহ্বরে নিহিত যুগযুগান্তরের শিলাখণ্ড সেই অনৈসর্গিকবলে উত্তোলিত হইয়া আবার নূতন পর্ব্বতের ভিত্তি স্থাপন করে। পর্ব্বত সমান সাগরোর্ম্মি অতল সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া যায় আবার ভাসিয়া উঠে। তুমি আজ পথে পতিত যে বালুকাকণা মাড়াইয়া গেলে হয় ত উহা কোন রাজপ্রাসাদের চূর্ণীকৃত ভগ্নাবশেষ হইবে। আজ তুমি ভিখারিবেশে এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালাইত, হয় ত তুমি সময় সহকারে জগতের অধীশ্বর হইবে।। দম্পতি যুগল মহাকাল বিচ্যুত হইয়া ২০০০ বৎসর পরে পুনর্ম্মিলন সুখ ভুঞ্জিবে। কে বলিতে পারে, পৃথিবীর লোক অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া নক্ষত্রে বাস করিতে পারিবে না? ঐ যে ব্যোম, সকল সত্তার আধার—অণুপরমাণু দ্বারা পরিব্যাপ্ত,—উনি অনন্তদেব,—উঁহারই ক্রোড়ে তুমি আমি উভয়ে ছিলাম, আজ ও থাকিব।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

সন্তানের প্রতি মায়ের আহ্বান।

উঠ উঠ বাছাগণ! ঘুমাইও না আর,
সগর ও ভগীরথ,
দিলীপার দশরথ,
ভরত, লক্ষ্মণ, রামচন্দ্র রঘুবর,
শত্রুঘ্ন, কুশী, লব,
গিয়াছে, গিয়াছে সব ;
নাই আর পৃথু ও শান্তনু ভীমবীর,
মহাবাহু ধনুর্দ্ধর
নাহি পাণ্ডু বীরবর,
নাহি ভীমার্জ্জুন, সহদেব যুধিষ্ঠির ;
নাহি নয়নাভিরাম
কৃষ্ণচন্দ্র বলরাম,
সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব নাহিক আমার ;
নাহি এবে সে বিক্রম
কোথা বাপ্পা রাও মম
আমার সে হামির, প্রতাপ নাহি আর,
নাহি চণ্ড চণ্ড সম
নাহি রাজসিংহ মম
কোথা ব্যাস, বাল্মীকি কালিদাস, হায়!
নাহি বরাহ মিহির,
নাহি বররুচি ধীর,

পাতঞ্জল, পরাশর, কণাদ কোথায়?
বুদ্ধ ও চৈতন্য হায়!
ছেড়ে গিয়াছে আমায়।
কোথায় দ্রৌপদী, সীতা, চিন্তা, দময়ন্তী;
কোথায় সাবিত্রী সতী,
কোথা খনা, লীলাবতী;
কোথা কুন্তী, গান্ধারী, রুক্মিণী গুণবতী?
দেখ দেখ, বাছাধন
তোদের ভগিনীগণ,
কেবল বিলাস ঘুণে জর জর হয়ে,
অসার পুত্তলী প্রায়,
কেবল সাজায় কায়;
আমি অভাগিনী আর কত রব সয়ে?
এতগুলি শোক আর না পারি সহিতে
তোরা একবার জাগ,
জেগে মা বলিয়া ডাক,
অতীতের শোক যদি পারি পাসরিতে।

শ্রীমতী কুঃ।

শান্তি-জল।

অকালে 'প্রতিমা'পূজে, কি হ'তে কি হ'ল রে
—"হা বিধি-লিখন!
মর্ম্ম-গ্রন্থি ছিঁড়ে গেল, হৃদি পুড়ে খাক হ'ল,
সমাধি জীবন!!
কোথা 'বাম' গুণধাম, সুকবি 'প্রেমিক' নাম
'ভালবাসা' রচি।
এই কি সেই ভালবাসা, এযে দেখি প্রাণনাশা,
নির্ম্মম, অশুচি॥
সারাটা জীবন যা'বে, এ অশুচি নাহি যা'বে,
—দেখি যে আঁধার।
হা নিঠুর, কোথা গেলে, শোক ফাঁসি দিয়ে গলে
বন্ধু পরিবার॥
কাঁদিতে পারি না আর, শোকসিন্ধু অনিবার,
গরজে গভীর।
যা'র মুখ পানে চাই, তা'রে দেখে ব্যথা পাই,
চঞ্চল, অস্থির॥
সাহিত্য-সংসারে সদা, বিজয়া-দশমী রে,
দারুণ বিষাদ।
এ বিষাদ-অন্ধকারে, কাজ নাই পূজা করে,
কে সাধিবে বাদ॥
সযতনে 'হীরালাল', গঠিয়ে 'প্রতিমা' কাল,
হ'ল সর্ব্বনাশ।
নিজে ম'ল ধনে প্রাণে, তার সনে 'বাম' ধনে,
দিলা বনবাস॥
স্বর্গভ্রষ্ট 'শিশু-মুখ', 'ঢোলের' সে স্মৃতি-সুখ,
অন্তরে রহিল;
তা'র সনে একজন, নিজ শিব অকারণ,
চরণে দলিল॥ ***
সে ব্যথা যাবে না আর, মুছিবে না অশ্রুধার,
চিতায় উঠিলে।
হা প্রতিমা, মনোরমা, প্রেমময়ী অনুপমা
*** কি হ'ল সরলে॥

* * * * * *

এই ত প্রেমের রীতি, পিরীতি প্রসাদ রে,
নিঠুর সংসার।
যে যাহারে ভালবাসে, সেই তা'র প্রাণনাশে,
বিচিত্র ব্যাপার॥
তবে মা 'প্রতিমা' তোরে, ভাসাই জাহ্নবীনীরে,
জন্মের মতন।
প্রাণেপ্রাণে বেঁচে থাকি, যে কদিন আছে বাকী,
মায়ার বন্ধন॥
সাধনার ধন তুমি, জান মা অন্তরযামী,
চৈতন্য-রূপিণী।
তাই প্রাণে দাগা দিলে, ভালবাসা দেখাইলে,
তুমি আমোদিনি॥
বাজিছে বিষাদ বাদ্য—বিজয়া-দশমী রে,
সাহিত্য সংসারে।
এস এস ভক্ত সুত, 'প্রতিমা' সেবক যত,
কাতারে কাতারে॥
লও আসি 'শান্তি-জল', ভক্তিভরে বিল্বদল,
বিসর্জ্জিব মায়ে।
মনোবাঞ্ছা যার যাহা, প্রার্থনায় পূরাও তাহা
প্রতিমার পায়ে॥
আবাহনে বিসর্জ্জন, সকলি বিধি-লিখন,
দুঃখ নাহি তায়।
'বামের' 'প্রতিমা' যাবে, 'শ্যামের' 'প্রতিমা' রবে
—আছেও ধরায়॥
মানস-প্রতিমা হায়, যা গেছে কি পাব তায়,
প্রাণের বন্ধন।
মিছা কেন তবে মরি, কল্পনায় মূর্ত্তি গড়ি
স'বে না যখন॥

* * * * * *

সংসারের পাপী তাপী দীন হীন জন রে।
আয় ছুটে, আয় হেথা, যে যথা আছিস রে॥
ব্যথিত পরাণে আর, না কাঁদিস্ বার বার,
মর্ম্মভেদী হাহাকার, ক্ষণেক সম্বর রে।
দেখ চেয়ে আঁখি ভরে, 'বামের প্রতিমা' পরে,
মনোব্যথা যাবে দূরে, অন্তর-কালিমা রে॥
'শান্তি-জল' নিবি আয়, যায় দিন ব'য়ে যায়,
হেলায় আর কত কাল, কাটাবি অবোধ রে,
মায়ের করুণা পেলে, ইহলোকে স্বর্গ মিলে,
পরলোকে মোক্ষ ফলে, যা চাহিবি তাই রে॥
বহিছে প্রেম তুফান, কে আছ পিপাসী প্রাণ,
হও আজি পরিত্রাণ 'প্রতিমা' পুজিয়ে রে।
শান্তি-জল নিলে পরে, ভবব্যাধি যাবে রে॥

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সমাপ্ত।